পঞ্চমাতৃকা

ডঃ দীপক চন্দ্র

৪৭০/২ ব্লক-বি, লেকটাউন কলকাতা ৭০০ ০৮৯

প্রকাশক : অমিতা চট্টোপাধ্যায়
আশীর্বাদ প্রকাশন
৪৭০/২ ব্লক-বি, লেকটাউন
কলকাতা ৭০০ ০৮৯

প্রথম প্রকাশ : ৩০ জানুয়ারি ১৯৬০

উপদেষ্টা :
অ্যাসোসিয়েশন অফ্ ইণ্ডিয়ান স্মল ইণ্ডাস্ট্রি,
বিজনেস অ্যাণ্ড রুরাল ডেভেলপমেণ্ট

অলংকরণ : গোপাল সান্যাল

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা : বিজন কর্মকার

মুদ্রক : অসীমকুমার সাহা
দি প্যারট প্রেস
৭৬/২ বিধান সরণি (ব্লক কে-১)
কলকাতা ৭০০ ০০৬

আমি তোমাদেরই সীতা

অগ্রজ প্রতিম

অধ্যাপক ডঃ ক্ষেত্র গুপ্ত

ও

অধ্যাপক ডঃ রামদুলাল বসু

পরম শ্রদ্ধাস্পদেষু

দৃষ্টিকোণ

'সপ্তকাণ্ড রামায়ণ' কাহিনী নিয়ে এ-পর্যন্ত লেখা উপন্যাসগুলোর চতুর্থপর্ব 'আমি তোমাদেরই সীতা। এর আগের পর্বগুলি হল যথাক্রমে 'লঙ্কেশ রাবণ', 'জননী কৈকেয়ী', 'রামের অজ্ঞাতবাস'। প্রত্যেকটি খণ্ডই আলাদা আখ্যানে স্বয়ংসম্পূর্ণ। এক ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে রামায়ণ কাহিনীর মূল্যায়ন করা হয়েছে উপন্যাসের আঙ্গিকে।

উত্তরকাণ্ডে সীতার বনবাস অংশটি আলোচ্য উপন্যাসের পটভূমি। সীতাকে বনে পাঠানোর মূলে বেশ কিছু রহস্য আছে। এই রহস্য লুকোতে বা ঢাকতে অনেক তথ্যকে বিকৃত এবং সত্যকে গোপন করেছেন বাল্মীকি। ফলে এই কাণ্ডে নানারকম অসঙ্গতি এবং অপ্রাসঙ্গিকতা সৃষ্টি হয়েছে। রামায়ণে রাম-মহিমা কীর্তন করতে গিয়ে সীতার ওপর অনেক অবিচার হয়েছে। সারাজীবন অনেক অপমান আর হেনস্তা ভোগ করতে হয়েছে তাকে।

এরও বোধহয় কিছু কারণ ছিল। রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধি করতে রামচন্দ্র শত্রুপক্ষের মেয়ে সীতাকে বিয়ে করল। রামচন্দ্র সীতাকে কোনদিন ভালবাসেনি। তাই আসন্নপ্রসবা সীতাকে শ্বাপদসংকুল অরণ্যে একেবারে একা রেখে এসে রামচন্দ্র প্রকারান্তরে সীতাকে মেরে ফেলতে চেয়েছিল। শত্রুপক্ষের মেয়ে ও তার পেটের সন্তানকে নির্মূল করাই ছিল তার মতলব।

চমকে ওঠারই কথা; কিন্তু আশ্চর্য হওয়ার কিছু নয়। রামচন্দ্র সত্যিই যদি সীতাকে বাল্মীকির আশ্রমে পাঠাত তাহলে তার খোঁজ-খবর করত। সীতার পুত্র প্রসবের খবর রাখত। লবকুশেরও পিতৃপরিচয় জানা বাধা হত না। কিন্তু এসব কিছুই হয়নি। কেন? রহস্যটা এখানেই। লব-কুশের প্রাণহানির আশঙ্কায় সম্ভবত সীতা পুত্রদের কাছে পিতৃপরিচয় গোপন রেখেছিল। বাল্মীকিও তাদের পিতার নাম-ধাম বলেননি। কেন? এই রহস্য ভেদ করা দরকার মনে করেই অন্যভাবে চিন্তা করেছি।

সীতার বনবাস, রামচন্দ্রের শম্বুক হত্যা, রামচন্দ্রকে পুত্রশোকাতুর ব্রাহ্মণের ভর্ৎসনা, অভিযোগ এবং অভিশাপ, রামচন্দ্রের রাজ্যব্যাপী অরাজকতা, বিশৃঙ্খলা, মড়ক, বাল্মীকির রামায়ণ রচনা এবং লবকুশের অশ্বমেধের বাজী ধরা প্রভৃতি ঘটনাগুলো লুকোনো রহস্যের সংকেত-সূত্র। এগুলো গোছানো কিছু নয়, খাপছাড়া। কিন্তু একটার সঙ্গে একটাকে বেশ গাঁথা যায়। সীতার বনবাসের অন্তরালে যে লুকোনো রহস্য আছে বলে আমার মনে হয়েছে উপন্যাসের আয়তরেখায় তাকেই বাণীরূপ দিয়েছি। কল্পনায় রঙিন করে নয় কিংবা মূল রামায়ণ ঘটনাকে বিকৃত করেও নয়, তথ্য ও সংকেত সূত্রগুলোকে প্রয়োজনমত ভেঙে সাজিয়ে নিয়েছি। তাতেই চিরকালের রূপটা একেবারে বদলে গেল। বাল্মীকিরও প্রায়শ্চিত্ত হল।

সে প্রসঙ্গে দু'চার কথা বলা আবশ্যক। শূদ্রক যুবরাজ শম্বুকের উপাখ্যানকে রূপান্তর করেছি। রামরাজ্যের অশান্তি, বিশৃঙ্খলা এবং সংহতি বিনাশের মূলে বঞ্চিত মানুষের হতাশা এবং অস্তিত্বরক্ষার সঙ্কট শূদ্রক যুবরাজ শম্বুককে সন্ত্রাসের পথে নিয়ে গেল। এই আলেখ্যটিকে সন্ত্রাসবাদের ছায়া পড়েছে।

বলাবাহুল্য, রামায়ণে আছে শম্বুকের তপস্যার জন্যই রামরাজ্যে অরাজকতা, বিশৃংখলা এবং মড়ক হচ্ছিল। তাই রামচন্দ্র তপস্যারত শম্বুককে সাক্ষাৎ হওয়ামাত্র হত্যা কবল। এর মধ্যে রূপক ও রহস্য দুই আছে। শম্বুকের তপস্যা স্বজাতির মুক্তি স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রতীক। আর তার হত্যা ব্যাপারটি রামচন্দ্রের সঙ্গে তার প্রবল শত্রুতারই ইঙ্গিত।

মূল রামায়ণে লবকুশের অশ্বমেধের বাজী ধরার গল্প নেই। কিন্তু অন্য পুরাণে আছে। অশ্বমেধের যজ্ঞের সূচনা থেকে রামায়ণ কাহিনী এক নতুন মোড় নিল। পালাবদলের বার্তা নিয়ে এল। সীতা ও লবকুশের সঙ্গে রামচন্দ্রের মিলন ঘটল। কিন্তু সীতার পক্ষে অযোধ্যায় ফেরা কঠিন হল। এই সংকটই সীতার অগ্নিপরীক্ষার রূপক। একদিকে রামচন্দ্রের আহ্বান পতিপ্রাণা সীতাকে যেমন সবেগে তার দিকে আকর্ষণ করছিল, তেমনি অপরদিকে পাতালপুরীর মানুষের প্রতি অপরিসীম কৃতজ্ঞতা বোধ তাকে অচল করে রাখল। স্বামীর প্রতি নিদারুণ অভিমান, পুঞ্জীভূত ক্ষোভ রামচন্দ্রের প্রতি তাকে বিরূপ করল, দুর্দিনের পরম বন্ধু পাতালপুরীর মানুষের প্রতি তার সুগভীর স্নেহ মমতার বন্ধন কাটিয়ে ওঠা তেমন কঠিন হল। এদের ফেলে স্বার্থপরের মত স্বামীর সঙ্গে অযোধ্যায় যায় কি করে? আকর্ষণের টানাপোড়নে সে দোদুল্যমান। অবশেষে তার মধ্যে আত্মমর্যাদাসম্পন্ন এক নারী জেগে উঠল। যে স্বামী তাকে শুধু হেনস্তা করল, অপমান করল তার কাছে ফিরে যাওয়ার মত অপমান কিছু নেই। তাই পাতালপুরীর মানুষের মধ্যে থেকে গেল সে। একেই সীতার পাতাল প্রবেশের রূপকার্থ বলে মনে হয়েছে। সীতা দুঃখী, দুর্গত, অসহায়, বিপন্ন, বঞ্চিত মানুষের জননী, তাদের দেবী। সুখের প্রলোভনে সীতা তাদের ত্যাগ করেনি। সব উদ্বেগের অবসান ঘটিয়ে তাই সে বলল "আমি তোমাদেরই সীতা"। বাংলা উপন্যাসে এপিকের এক নতুন ডাইমেনশন সৃষ্টি হল। সীতা আরো নবতর হল।

ডঃ দীপক চন্দ্র

বিরাট গর্জন করে মাটি থেকে শূন্যে ঝাঁপ দিল পুষ্পক রথ। কত বন উপবন, নদী পাহাড়, জনপথ, দেশ গ্রামের উপর দিয়ে উড়ে চলল। লঙ্কার প্রাসাদ, দুর্গ, সীমানা সব দিগন্তের বুকে মিলিয়ে গেল। অনন্ত নীল আকাশ আর রাশি রাশি তুলো পেঁজার মত সাদা মেঘরাশির ভেতর দিয়ে পরীর মত স্বচ্ছন্দে ভেসে চলল।

পুষ্পক রথে লক্ষ্মণ এবং হনুমানের পিছনে বসল রাম ও সীতা। তারা কেউ কথা বলছিল না। কৌতূহলহীন নির্বিকারত্বে সময়টা বড় ভারী হয়ে ওঠল। নীরবতা সীতাকে ক্লান্ত করল। ছ'মাস ধরে জমানো রামকে কথা বলার জন্য তার ভেতরটা অস্থির হল।

পুষ্পকরথ শূন্যে একজায়গায় স্থির হয়েছিল। চলছে কি চলছে না টের পাওয়া যাচ্ছিল না। জানলা দিয়ে যাত্রাপথের দিকে চেয়ে গতিটা অনুভব করার চেষ্টা করল সীতা। কিন্তু সামনে পশ্চাতে আদিগন্ত নীল আকাশ ছাড়া আর কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। সব ফাঁকা। যতদূর দৃষ্টি যায় সব শূন্য। কিন্তু নীচে ধরণীর শান্ত স্নিগ্ধ সবুজ রূপের লাবণ্য যেন ঘন জমাট বেঁধে আছে।

আকাশ থেকে পৃথিবীকে বড় রূপসী লাগল সীতার। মাইলের পর মাইল পাহাড় আর অরণ্য। কে কতটা মাথা উঁচু করে আকাশ দেখতে পারে, সূর্যের আলো প্রাণভরে নিতে পারে তার এক নিঃশব্দ প্রতিযোগিতা করছে যেন তারা। আর এদের পায়ের কাছ দিয়ে শাড়ির পাড়ের মত কত নদী বয়ে চলেছে। বাতাসে তাদের অস্ফুট কলধ্বনি নূপুরের মত বাজছিল।

খুবই চিন্তিত দেখাচ্ছিল সীতাকে। দু'হাত জড়ো করে তাতে থুতনি রেখে সীতা শূন্য চোখে চেয়েছিল। কিন্তু এভাবে অবিরাম শূন্যে ভেসে বেড়ানোর ভেতর কোন আনন্দ পেল না। মনটা বিষাদে ভরে গেল। কিছুই ভাল লাগছিল না। বুকের ভেতর তার উত্তাল ঝড়। সে ঝড় যেন থামতে চায় না। একটা বীতশ্রদ্ধভাব তাকে বড় অস্থির আর উতলা করে তুলল।

মাত্র তিনটি ঋতু * রামচেন্দ্রর সঙ্গে ছিল না সীতা। এই সামান্য সময়ের ভেতর জীবনটা কত বদলে গেছে। কাছে থেকেও রামচন্দ্র যেন কতদূরের মানুষ। উভয়ের মাঝখানে যোজনব্যাপী ব্যবধান যেন। সেই ফাঁকটা কিছুতেই সে অতিক্রম করতে পারছিল না। রামচন্দ্রের সঙ্গে তার মধুর সম্পর্ক এমন বিস্বাদ হল কি করে? ভাবতে গিয়ে শবরীকে মনে পড়ল। অমনি বিবর্ণ ভয়ে আতঙ্কে তার দু'চোখের পাতা বুজে এল। চোখ বুজে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে শবরীর মৃত্যু দৃশ্যটা কল্পনা করে সে শিউরে ওঠল। ভয়মুক্ত হয়ে চোখ মেলতে কয়েকটা মুহূর্ত সময় লাগল।

সীতা বিস্ফারিত চোখে চেয়েছিল আকাশের দিকে। মনের মধ্যে অনেক উল্টোপাল্টা যুক্তিহীন কার্যকারণ কাজ করে যাচ্ছিল। নিজেকে প্রবোধ দিতে পারছিল না। রামচন্দ্রকে তার অপরাধী মনে হল। কৈকেয়ীর কাছে সত্যগোপন করে যে ভুলের সূত্রপাত করেছিল এ তার পরিণতি। রামচন্দ্র একটা ভুল শুধু করেনি, এরকম সহস্র ভুলের গোলকধাঁধায় হারিয়ে গেছিল। মিথ্যেকে মিথ্যে দিয়ে ঢাকতে গিয়ে মিথ্যের জালে জড়িয়ে পড়েছিল। এখন কিছু করার নেই আর।

সীতার গায়ে সহসা উষ্ণ নিঃশ্বাস লাগল রামচেন্দ্রর। মনে হল দেহের সমস্ত স্নিগ্ধ নমনীয়তা তার

---

* বন বাসের চোদ্দবছরে রামচন্দ্র পঞ্চবটীতে বাসা বাঁধে। এইসময় সীতার নিরাপত্তার জন্য তাকে অন্যত্র লুকিয়ে রাখা হয়। রাবণ সীতারূপী শবরী হরণ করেছিল। অপহরণের ছ'মাস পরে সীতারূপী শবরীকে রাম উদ্ধার করল। কার্যত এই ছয় মাস সীতা রামের সঙ্গে ছিল না। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হলে কৌতূহলী পাঠককে মৎলিখিত "রামের অজ্ঞাতবাস" অবশ্যই পড়তে হবে।

উত্তাপে শুকিয়ে গেল। রামচন্দ্রের শরীরে যে এত তাপ জমেছিল রামেরও বোধ হয় জানা ছিল না। সীতার নিজেরও না। অজান্তে একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল তারও। মনে মনে বলল; সবই নিয়তি।

পুষ্পকরথ তীব্র গর্জন করে মেঘের পর মেঘ ভেদ করে চলেছে। মুক্ত আকাশে আলো আর হাওয়া। এত হাওয়া সত্ত্বেও একঘেয়েমি ক্লান্তি, বিষণ্ণতায় সীতার দমবন্ধ হয়ে আসছিল। অথচ একদিন ছিল, যখন রামের কাছে এলেই শান্তিতে বুক ভরে উঠত। দুঃখ অশান্তি বলে কিছু থাকত না। একটা নতুন প্রাণ পেত। ফুরিয়ে যাওয়া মনটা নবীকৃত হয়ে যেত। বুকের ভেতর তখন কত কথার তোলপাড় হত। প্রাণভরে মনে মনে বলতে ইচ্ছে করত : প্রাণের বন্ধু, বুকের বন্ধু, সুখের বন্ধু, দুঃখের বন্ধু— কত কি? কিন্তু মুখ ফুটে এসব কিছুই বলা হয়নি কোনদিন। মনের আবেগে বুক ভরে থাকত। কৃতজ্ঞতায় গদ গদ হয়ে যেত চিত্ত। কিন্তু আজ এ মুহূর্তে এসব কিছুই হল না। বরং রামচন্দ্রের জন্য তার খুব দুঃখ হচ্ছিল। মনটা সেই কষ্টে ভারাক্রান্ত হল।

রামচন্দ্রের বাঁ দিকে সীতা মুখ নীচু করে বসেছিল। কত অদ্ভুত অদ্ভুত কথা তার মনে হচ্ছিল। জীবন বোধহয় অনেক টুকরো টুকরো ঘটনা দিয়ে তৈরি একটা কিছু। আলাদা আলাদা ভাবে ভাগ করা আছে সব। সব কিছুর মধ্যে দিয়ে না গেলে সমস্ত ভালমন্দ সুখ দুঃখের মধ্যে দিয়ে নিজেকে না নিয়ে এলে বোধ হয় পূর্ণ হয় না। বিয়ের আগের জীবন, বিয়ের পরে অযোধ্যার রাজপ্রাসাদের জীবন এবং চোদ্দ বছর বনবাসের জীবন এক নয়। তার ভেতরও মস্ত ভাগ। অনেক বাঁক, অনেক বাধা পেরিয়ে চলেছে কোন বৃহৎ উদ্দেশ্য পূর্ণ করতে; কে জানে? এসবেরও হয়ত একটা মানে আছে, কিন্তু সে অর্থটা কি এই মুহূর্তে সীতার মনে এল না।

শূন্যে, আকাশের গায়, এতবড় আকাশ, এত আলো, এত হাওয়া চারদিকে এত মুক্তির শ্বাস যে নিজের মতা চিন্তা করতে পারার সুযোগ কম। তাই নিজের কাছে সীতার প্রশ্ন নিজের অজান্তে মানুষের জীবনে কত কি হয়, কত কিছু হারায় তার; বোধ হয় কোন হিসাব সে করে না। অথচ নিজের ভুলে সে হারাচ্ছে অনেক, নিঃস্ব করছে নিজেকে। তবু হারানোর এই বেদনা আর দুঃখটাকে হৃদয় দিয়ে ছোঁয়ার গভীরতা তার নেই। থাকলে বোধ হয় এমন করে হারিয়ে কাঁদতে হত না তাকে।

রামচন্দ্র নির্বিকার। তার যে কোন প্রতিক্রিয়া আছে বোঝা গেল না। বোবার মত সে চেয়ে আছে সামনের দিকে। কিন্তু সেখানে সব ফাঁকা। তাহলে রামচন্দ্র অত নিবিষ্ট মনে কি দেখছে তার ভেতর!

ঘোলা চোখে সীতা একবার রামচন্দ্রকে দেখল। তার বুকের ভেতর কে যেন রামচন্দ্রের গলায় বলল, বাইরের কান্নাটা সকলে দেখতে পায়, কিন্তু ভিতরে ভিতরে যে কাঁদছে তা যদি কেউ সত্যি বুঝতে না পারল তাহলে সেই মানুষের কাছে নিজের দুঃখকষ্টকে জানান দিয়ে নিজেকে ছোট করতে যাবে কোন দুঃখে? সীতার বুকের ভেতরটা সির্ সির্ করে গেল। তবে কি রামচন্দ্র বোবা কান্না বুকে করে অমন পাথর হয়ে গেছে?

রোদ ঝলমলে আকাশে স্বচ্ছ উষ্ণতার তাপ এসে লাগছিল সীতার সর্বাঙ্গে। আচমকা একটা অনুভূতি হল তার। মনে হল তারা স্বর্গের পাখির মত ডানা মেলে দিয়ে চলেছে শান্ত নীলিমার মাধুরী পান করতে করতে।.হঠাৎ প্রেমহীনতার তীব্র অভাবে সীতার বুকটা কেমন অস্থির আর ব্যাকুল হল। কিন্তু তা এত দ্রুত ঘটল যে, দু'চোখ জল ধরে রাখতে পারছিল না। হঠাৎ আসা তীব্রতর আবেগ, কষ্ট, দুঃখ—অভিমানের সঙ্গে মিশে গিয়ে লাল হওয়া চোখ ফেটে স্ফটিক স্বচ্ছ জল গড়িয়ে পড়ল গাল বেয়ে। একেবারেই হঠাৎ। যা পরম প্রার্থনায় ভরে উঠতে চাইছিল।

রামচন্দ্রের দৃষ্টি এড়াল না। গভীর এক দৃষ্টিতে সীতার দিকে চেয়ে রইল। মনে হ'ল, সীতার শব্দহীন কান্না যেন তার প্রতি জমে ওঠা ঘৃণাটাই উগরে দিচ্ছে। তাকে বিদ্রূপ করছে। তবু ঐ কান্না ছিল তার অন্তরের সৌন্দর্য। যা কিছু সুন্দর অনুভূতি তা ঐ কান্নাতে স্পন্দিত হচ্ছিল। পৃথিবীর সব নারীই কান্নার মধ্যে নতুন করে বেঁচে ওঠে। এই রকম একটা অনুভূতি রামচন্দ্রকে বার বার অবাক করে দিল।

সীতা চিরদিনই বড় কাঙাল একটু ভালবাসার, একটু সান্নিধ্যের। একথা জেনেও তার এরকম চুপ করে থাকার ভেতর একরকমের চাপা নিষ্ঠুরতা আছে। সীতার সঙ্গে সম্পর্কটা এমনিতে মরে যাবার মতই হয়েছে। কিন্তু ভালবাসার পুকুরটা তাদের শুকিয়ে যায়নি একেবারে। কঠিন বরফ হয়েছে

শুধু। সান্নিধ্যের উষ্ণতায় হয়ত গলে নিঃশব্দে ভালবাসার সমুদ্রে হারিয়ে যেতে পারে তারা। রামচন্দ্রের মনের ভিতরে রোমহর্ষ রহস্যময় এক অদ্ভুত অনুভূতি সৃষ্টি হল। বুকটা উথাল-পাথাল করছিল। কানের লতি গরম হয়ে উঠল। এক ধরনের অপ্রকাশ্য আতঙ্ক মেশা আনন্দে তার গলার স্বরটা একটু কেঁপে গেল। সম্মুখে দিগন্তহীন শূন্যতার দিকে তাকিয়ে ফিস্ ফিস্ করে বলল : বৈদেহী! তুমি কাঁদছ! কার জন্য কাঁদছ?

সীতার বুকের মধ্যে সামান্য তরঙ্গ বয়ে গেল। ভিতরে যে শক্ত জমি তৈরি হয়েছিল তা হঠাৎ বানের জলে কাদামাটি হয়ে গেল। সীতা দাঁড়াতে পারছিল না তার ওপর। ভীষণ পিছল। তবু রামচন্দ্রের প্রতি তার প্রত্যাখানের ভাবটা এল।

জলভরা চোখে সীতা বাইরের দিকে তাকাল। ফাঁকা দীর্ঘ নীল আকাশের দিকে শূন্য চোখে চেয়ে রইল। জলভরা চোখে রোদের দিকে তাকানোর জন্য সাতরঙা রামধনু দেখে। নানা কথা, ছোটবেলাকার কথা, পাখির গায়ের গন্ধ, নানা শব্দ চকিতে তার চেতনা স্পর্শ করে গেল। বুকের মধ্যে সামান্য তরঙ্গ বয়ে গেল।

রামচন্দ্র সীতার দিকে চেয়ে বিভ্রম বোধ করল। সীতাকে শাপগ্রস্তা, প্রস্তরীভূতা দেবীর মত দেখাচ্ছিল। রামচন্দ্র চমকে উঠেছিল। আতঙ্ক মেশা বিস্ময়ের সঙ্গে মিশে ছিল ভয়। বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে ভাবল। আস্তে আস্তে ডাকল : বৈদেহী। নিজের কানেই গলাটা কাঁপা কাঁপা শোনাল।

সীতা চুপ করে গা ঘেঁসে বসল। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে নিরাসক্তভাবে উদাস গলায় বলল : কে জানে? নারীর সকল সুখতো বিধাতা কান্না দিয়ে গড়েছেন। কান্নার সুখ একটা আলাদা সুখ। সব নারীর ভুলে থাকার উপায় এটা।

এক দারুণ মুগ্ধ চমকে, চমকে উঠল রামচন্দ্র। করুণ নয়নে সীতার দিকে চেয়ে গম্ভীর গলায় বলল : তোমার মনের প্রতিক্রিয়া আমি জানি। কিন্তু আমিও নিরুপায়। কত যে অসহায় তুমি যদি জানতে, তাহলে রাগ করতে না। জীবনে প্রতিমুহূর্ত এমন অনেক ঘটনা ঘটছে যে মানুষের মন টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে। ওর এক টুকরো দিয়ে আর এক টুকরো পাচ্ছে। জীবন বোধহয় এমন অনেকগুলো টুকরো দিয়ে তৈরি। আলাদা আলাদা ভাগ করা আছে সব। সব ভাগই ভিন্ন, স্বতন্ত্র আবার সমস্ত ভাগ নিয়ে তা সম্পূর্ণ। সব কিছুর মধ্যে দিয়ে না গেলে জীবন বোধহয় পূর্ণ হয় না। হয়ত, সব কিছুরই মানে আছে। না থাকলে, এসব ঘটবে কেন বল? তোমার কি একবারও এসব কথা মনে হয় না, বৈদেহী? মন দিয়ে কিছু মেনে নেবার আগে নিজের বুদ্ধি-বিবেচনা দিয়ে একটু বিচার করে দেখলে না কেন?

কয়েক মুহূর্ত সীতা চুপ করে থাকল। একটা গভীর দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে জমানো কষ্ট বেরিয়ে গেল। সেই সঙ্গে অভিমানের বরফও গলল। দু'ফোঁটা চোখের জল হয়ে গড়িয়ে পড়ল। উদাসভাবে বলল : জীবনের সব ক্ষেত্রে যারাই আলাদা, যারাই ব্যতিক্রম হয়, তাদের মূল্য দিতেই হয়। নিজের মত হতে পারার, থাকতে পারার জন্য দাম দিতে হয় অনেক। তারও সুখ একটা আলাদা সুখ। তাই না?

রামচন্দ্র সহসা কথা বলতে পারল না। বুকটা ব্যথিয়ে উঠল। একটা তিক্ত হতাশায় খাঁ খাঁ করতে থাকে মন। তবু কষ্ট করে মৃদু হাসল। সীতার হাতের উপর হাত রাখল। আস্তে আস্তে চাপ দিল। একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ক্ষীণ গলায় বলল : আমারও অনেক সাধ ছিল জীবনে। কিন্তু সব ভাগ্যের দোষে আর নিজের দুর্বলতায় পণ্ড হয়ে গেল। আমার চারপাশে তার জালটা বোধহয় আজও আছে। মাঝে মাঝে বড় দুর্বল লাগে। বিশ্বাস কর বৈদেহী, আজ আমি বড় ভগ্নহৃদয়, বড় হতাশ, বড় যন্ত্রণাবিদ্ধ। তোমার ভর্ৎসনা আমার প্রাপ্য।

সীতার শরীর রামের আকস্মিক স্পর্শে ঝংকার দিয়ে উঠল। ভিতরে ভিতরে মৃদু বিদ্যুতের তরঙ্গ বয়ে যাচ্ছিল। তারপর কথাগুলো শুনে বুকটা ব্যথিয়ে উঠল। শুরু হল তার নিজের ভেতর বিচার বিশ্লেষণ এবং সমাধানের চেষ্টা। রামচন্দ্রের প্রতি বাঁধন ছেঁড়া আকর্ষণ তার সব প্রতিরোধ যুক্তি তর্ক ভাসিয়ে নিয়ে গেল। ভেতরটা ক্ষমার স্নিগ্ধতায় প্রসন্ন হল। হতভম্ব চোখে সে রামচন্দ্রের মুখের দিকে

বাক্যহারা হয়ে চেয়ে রইল। কেমন একটা আচ্ছন্নতায় আক্রান্ত হয়ে সীতা চেয়েছিল রামচন্দ্রের দিকে। বুকে তার উথাল পাথাল ভাব।

রামচন্দ্র কিছুক্ষণ ভুরু কুঁচকে সীতার হাতের দিকে তাকিয়ে থাকল। তার আঙুল এবং নখ দেখল। তারপর পেলব কোমল হাতখানা নিয়ে নিজের শ্রীময় মুখের উপর চেপে ধরল। কয়েকটা মুহূর্ত কাটল। তারপর মৃদুস্বরে বলল : তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্কে বোধহয় আর সহজ নেই। তোমাকে ফিরে পেতে হলে আবার হারানো দরকার, নিজেরও দরকার একেবারে হারিয়ে যাওয়া।

হঠাৎ শিহরিত হল সীতা। বুকের ভেতর ঝাঁৎ করে উঠল। বুকজোড়া ভয় উৎকণ্ঠা নিয়ে ব্যাকুল কণ্ঠে প্রশ্ন করল, এ কথা বলছ কেন?

কি জানি। থেকে থেকে শুধু মনে হয় তোমাকে নিয়ে আমি ভালবাসার খেলা খেলেছি। ভালবাসিনি। আমাদের মধ্যে ভালবাসাবাসি নেই।

দাম্পত্য কলহ নেই, ভুল বোঝাবুঝি নেই, মান অভিমান নেই, পরস্পরকে দখলের চেষ্টা নেই। সীতার বুকে এক বুক ভালবাসা টন টন করে উঠল। তীক্ষ্ণস্বরে প্রতিবাদ করল। বলল : এ তোমার মনের কথা নয়। তুমি সারাজীবন নিজেকে ঠকিয়েছ। আসলে তুমি ভালবাস না, তাই এসব কথা বলতে পারলে। কখনও আমাকে তোমার বলে ভাবলে না, ভালবাসলে না। নিজের একটা পৃথিবী তৈরি করে নিয়ে সেখানে নির্বাসিত করেছ নিজেকে। বাইরের প্রেমময় মায়াময় ঘটনাবহুল পৃথিবীর সেখানে প্রবেশ নিষেধ। সেখানে কোন ঘটনা ঘটে না, শব্দ হয় না।

রামচন্দ্র বিস্ময়ে স্তব্ধ। ভিতরের সব স্পন্দন যেন কয়েকমুহূর্তের জন্য স্তব্ধ করে দিল। যেন বা থেমে গেল রক্তের প্রবহমানতা। ম্লান মুখে, অবনত মস্তকে খুব ধীরে ধীরে রামচন্দ্র মুখ ফেরাল। স্তিমিত বিস্ময়ে চেয়ে রইল সীতার দিকে। সীতার চোখ থেকে অবাধ্য জল অজস্রধারায় গড়িয়ে পড়ছিল তার গাল বেয়ে। ঠোঁট দাঁতে কামড়ে কান্না সামলানোর চেষ্টা করল। রামচন্দ্র কয়েকমুহূর্তের জন্য বোবা হয়ে গিয়েছিল। সীতার দিকে চেয়ে শান্ত কণ্ঠে বলল : কাঁদছ কেন? কান্নার কিছু নেই। কান্না শুধু দুঃখ দেয়, দুঃখ বাড়ায়।

পুষ্পক রথের কর্কশ আওয়াজ আর বাতাসের সোঁ-সোঁ শব্দের ভেতর কিছুই শোনা গেল না। কথোপকথনও খুব কাছ থেকে শোনা কঠিন হচ্ছিল। রামচন্দ্রের কথায় সীতার বুক তোলপাড় হল। রাগে অভিমানে সীতার গলা দিয়ে ফোঁপানির শব্দ বার হল। কিন্তু পুষ্পক রথের বিকট আওয়াজের মধ্যে তা চাপা পড়ে গেল। শোনা গেল না। সীতা হঠাৎ খামচে ধরল রামচন্দ্রের হাত। প্রবল শ্বাসের সঙ্গে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল : আমি আর ভার বইতে পারছি না। এ তুমি বুঝবে না। তবে একথা জেনো আজও তোমাকে আমি যত ভালবাসি আর কেউ ভালবাসে না।

রামচন্দ্রের একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল। ধীরে ধীরে শান্ত গলায় গম্ভীর কণ্ঠে বলল : ভালবাসাটা মুখে বলে বোঝানোর জিনিস নয়! সকলের প্রকাশভঙ্গিও এক নয়। ভালবাসার বিচারও বোধ হয় একজীবনে শেষ হয় না।

সীতা কষ্টে মাথা নাড়ল। বলল অথচ একটাই তো জীবন।

ঠিক তবু দ্যাখ মানুষের নিজের হাতে গড়া প্রত্যেকটি জিনিস থাকে কেবল মানুষ থাকে না। এই বিপুল পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চে মানুষের ভূমিকা খুবই যৎ-সামান্য। নায়ক নায়িকার প্রবেশ প্রস্থানের মত জীবন নাটিকার এটা কোন ব্যাপারই নয়।

সীতা এই হেঁয়ালিতে খুশি হল না। চোখ বড় বড় করে রামের দিকে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে কথাগুলো বেরিয়ে এল। বলল : আসলে আমরা কেউ বেঁচে থাকি না, বাঁচতে জানি না বলেই নিজের মত করে যুক্তি খাড়া করে ভেতর থেকে বাইরের দিকে পালাই।

রামচন্দ্রের মুখে কথা জোগাল না। সীতার ক্রন্দনোন্মুখ মুখখানার দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকল। সীতা আঁচলে চোখ মুছল। তাদের কথোপকথনের মধ্যে পুষ্পকরথ কখন মাটি স্পর্শ করল তা টের পেল না। হঠাৎ সব আওয়াজ বন্ধ হলে তারা সম্বিৎ ফিরে পেল। রামচন্দ্র আড় চোখে সীতাকে দেখল। সীতা একটু ঝিলিক দিয়ে হাসল। বড় অদ্ভুত সুন্দর সে হাসি। রামচন্দ্রের খুব কাছ ঘেঁষে ঘোমটা

মাথায় টেনে দিল। গা থেকে তার একটা সুন্দর গন্ধ বেরোল। কেমন একটা বিভ্রমের সৃষ্টি হল। কি দারুণ একটু মায়া হল। রামচন্দ্রের মনে হল পৃথিবীটাই এরকম মায়া ও মোহের।

রামচন্দ্র অযোধ্যায় যাওয়ার আগে ভরদ্বাজ আশ্রমে অবতরণ করা যুক্তিযুক্ত মনে করেছিল। সেখানে কিছুকাল অবস্থান করে অযোধ্যায় যাত্রা করবে। সেইমত পুষ্পক রথ ভরদ্বাজ আশ্রমে নামল।

জাহ্নবী নদীর তীরে ভরদ্বাজ মুনির আশ্রম।

চারপাশে নানারকম গাছের ঘেরাটোপে ঢাকা। সার সার কত রকমের গাছ নীরব প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে আশ্রম পাহারা দিচ্ছে। সূর্যের আলো পাতার ফাঁক দিয়ে মাটিতে আলপনা এঁকে দিয়েছে। গাছের স্নিগ্ধছায়া, বনের ফিস ফিস শব্দ, ঝিরঝিরে মিষ্টি হাওয়া, নিথর স্তব্ধতা, পাখির কূজনের সঙ্গে ঋষিবালকদের সুমিষ্ট সুরেলা কণ্ঠের বেদগান, হোমের গন্ধ মিশে যেন এক স্বপ্নরাজ্য সৃষ্টি হয়েছে। কেমন একটা স্বর্গীয় সুষমায় পবিত্রতায় ভরে আছে জায়গাটা। সব কিছুই মধুময় বোধ হল।

এসব কিছুই সীতার মন কেড়ে নিতে পারল না। এখানকার এত বড় আকাশ, এত আলো, এত হাওয়া, বনে বনান্তরে, প্রান্তরে, উপত্যকায় এত মুক্তির শ্বাস সব একঘেয়ে লাগল সীতার। বড় পুরনো বোধ হল। জীবনের অনেকগুলো বছর অরণ্যে ও আশ্রমে কেটেছে। জীবনটা তার তপোবনের মতই রহস্যে ভরা। নিবিড় ছায়া ঘেরা তপোবনে ফিস্ ফিস্ করে চাপা গলায় কারা যেন কথা বলে সবসময়। এদের রহস্যময় চলাফেরা সব সে জানে। তাই ওর প্রতি আর কোন ঔৎসুক্য নেই।

সীতা নিজের কথা বেশি করে ভাবছিল। মুনিঋষি এবং স্বামী রামচন্দ্রের কাছে সে একটা খেলার পুতুল। তাই তাকে নিয়ে যা খুশি চলছে। সে শুধু উদ্দেশ্য সিদ্ধির চাবিকাঠি। তাদের পরিকল্পনার রহস্য কোনকালে ভেদ করতে পারল না। রহস্য, রহস্যই রয়ে গেল। একে জানার তার কোন মোহ নেই, আগ্রহও নেই। তবু এই অসম্মানটা তার বুকে গেঁথে রইল।

ঝরনার ঝির ঝির শব্দে মুখর হয়ে আছে তপোবনের চারধারে। সেই শব্দ ছিদ্রিত হচ্ছিল চোখ গেল পাখির আর্ত হাহাকারে, বিঘ্নিত হচ্ছিল ভয় পাওয়া হরিণের চকিতে ছুটে যাওয়ার শব্দে। নিথর মৌনী জঙ্গলও বনের ফিসফিস কথায় চমকে উঠছিল বার বার।

সীতাও মনের ভেতর কাঁপুনি টের পাচ্ছিল। সেখানে এক অসহ্য ছটফটানি। তপোবনের জীবনে সে হাঁপিয়ে উঠল। এখানে সে বেঁচে আছে বটে, কিন্তু কোনক্রমে। প্রশ্বাস নেওয়া, নিঃশ্বাস ফেলা আর বেঁচে থাকার ভেতর অবশ্যই একটা তফাত আছে। আজকাল সেটা ভাল করেই অনুভব করে সে। বেঁচে থাকাটা অন্য ব্যাপার। একেবারেই অন্য ব্যাপার। কিন্তু কোন কিছু নিজে অনুভব করা এক জিনিস, আর অন্যের অন্তরে পৌঁছে দেওয়া সম্পূর্ণ আর এক জিনিস।

সীতা ভাবছিল। তপোবনের মত নিরিবিলিতে একা থাকলে তাকে ভাবনায় পায়। নিজের মত করে ভাবতে পারার সুখ একটা আলাদা সুখ। তবু এক একটা ভাবনা এমনভাবে হৃদয়ে গেঁথে যায় যাকে কিছুতে উন্মূল করা যায় না। কিছু মুহূর্ত, কিছু স্মৃতি, কিছু অনুভূতিতে মনটা ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। তখন এমনি আকুলি বিকুলি করে বুকের ভেতরটা যে পাগল পাগল লাগে।

সীতার সব বিস্ময় রামচন্দ্রকে ঘিরে। এক অদ্ভুত মানুষ সে। তার সমস্ত জীবনটাই তো পরস্পর বিরোধিতার উদাহরণ। অন্য যে কোন মানুষ হলে এই টানাপোড়েনে, অন্তর্দ্বন্দ্বে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যেত এত দিনে। কিন্তু রামচন্দ্রের ভেতর কোন প্রতিক্রিয়া সে দেখেনি। সীতার বিস্ময় লাগে। মানুষটা কি তবে পাথর দিয়ে তৈরি? তার হৃদয়, মন বলে কি কিছু নেই? নিজের জগতে সে ভীষণ নির্বিকার। একটা পারিপার্শ্বিক জগৎ তৈরি করে নিয়ে নিজেকে নির্বাসিত করেছে সেখানে। বাইরের শব্দময় ঘটনাবহুল পৃথিবীর সঙ্গে বিনা আয়াসে মিলে যেতে, মিলিয়ে নিতে পারার এক অসাধারণ দক্ষতা তার। এমন অদ্ভুত মানুষের সংস্পর্শে আসা লোকের সৌভাগ্যের ব্যাপার ছিল। কিন্তু নিজের সম্বন্ধে সে কথা ভাবতে পারে না সীতা। ভাবনাটা তার কোথায় আটকে যায়। নিজেকে বড় দুর্ভাগা মনে হয়। রামচন্দ্রকে কে কবে নরচন্দ্রমা বলেছিল মনে নেই। কিন্তু শব্দটি শ্রীরামের নাম গৌরব কিছু বাড়ায়নি বরং হ্রাস

করেছিল। চন্দ্রের সঙ্গে চন্দ্রের কলঙ্ক ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। তেমনি রামচন্দ্রের বীরত্ব, আদর্শ, নীতি ও ব্যক্তিত্বের গায়ে লেগেছে কিছু কলঙ্কের দাগ যা রামচন্দ্রের গৌরবের নয়, সম্মানেরও নয়। চাঁদের কলঙ্কের মত এই দাগটুকু তার চরিত্রে থাকবে চিরদিন। রামচন্দ্র হাজার ভাল কাজ করলেও কলঙ্কের দাগ মুছবে না। কথাটা বিদ্যুৎ চমকের মত সীতার সমস্ত মনটাকে যন্ত্রণায় চিরে দিয়ে গেল।

বেলা পড়ে এল।

বিকেলের মরা রোদে ছায়া দীর্ঘতর হল। বোবার মত সীতা কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে সেই দিকে চেয়ে রইল।

এমন সময় তার কুটীরের দিকে একজন তাপসকে আসতে দেখল। চুলগুলো তার উস্কখুস্ক। রুক্ষ। মৃদু বাতাসে চূর্ণ কুন্তলগুলো উড়ছিল। মাথার উপরে লম্বা লম্বা চুল চূড়া করে বাঁধা। মুখে চোখে এক অদ্ভুত অপার্থিব মুগ্ধতার ভাব। চাহনিতে বিভোর বিহ্বলতা।

তাপস তার সামনে এসে দাঁড়াল। সীতার বুকের ধক্‌ধকানিটা শুরু হল এ সময়ে। তাপস কথা না বলে দুটি চোখে পেতে রাখল সীতার মুখের উপর। অধরে তার টেপা হাসি।

সীতা কেমন যেন হয়ে গেল। চোখ সরিয়ে নিল অন্য দিকে। সে বুঝতে পারছিল তাপস তাকে একটা কিছু বলতে চায়। এ হল তাব ভূমিকা।

কিন্তু ভিতরে এক শিহরিত ভয়ে তার হাত পা হিম হয়ে গেল। নিজের শ্বাসে তার মৃদু কম্পন টের পাচ্ছিল।

তাপসের দুই চোখের তীব্র আর্কষণের ফাঁদে সীতা যেই ধরা পড়ল অমনি তাপস একটু প্রগলভ হয়ে সাহস করে ডাকল : দেবী! আমাকে তুমি চিনতে পারলে না তো! আমি হতভাগ্য ভরত। তোমার কিঙ্কর।

সীতা এই আচমকা কথায় চমকিত হয়ে স্থাণুবৎ দাঁড়িয়ে রইল। কিছুক্ষণ কথা বলতে পারল না। বিস্ময়ে তার দুই চোখ বিস্ফারিত হল। ভিতরে এক শিহরিত আনন্দের উজ্জীবক স্পর্শ তার চোখ-মুখকে উজ্জ্বল করে দিল। চাপা গলায় বলল: দেবর! কিন্তু তোমার এ বেশ কেন?

ভরতের মুখে স্নিগ্ধ হাসির লাবণ্য ঝরে পড়ল। আস্তে আস্তে বলল: এই বেশে তো চোদ্দ বছর কাটল। লোকে বলে ছদ্মবেশ। আমারও মনে হয় অন্য এক ভূমিকায় আমি অভিনয় করছি। তাই রাজা না সেজে সন্ন্যাসী হয়েছিলাম। রাজ্য, সিংহাসন, ঐশ্বর্য, সম্পদ কিছুতে নিজেকে জড়াইনি। সিংহাসনে আমি রামচন্দ্রকেই দেখতাম।

সীতার গায়ে কাঁটা দিল। অবাক লাগল খুব। বিস্ময়ের ঘোর আর কাটতেই চায় না। এক পরিপূর্ণ আনন্দে তার হৃদয় মথিত ও ব্যথিত হতে লাগল। মনে মনে বারংবার উচ্চারণ করল; অদ্ভুত! অদ্ভুত! ভরতের চোখেও সেই তদগত দৃষ্টি যা সাধকদের থাকে। তবে বৈরাগ্য ও নিস্পৃহতা নয়। সত্যের প্রতি অকুণ্ঠ প্রত্যয় ও শ্রদ্ধায় তাকে উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল।

বেশ কিছুক্ষণ নিঃশব্দে, নীরবে কাটল। সীতা মৃদুস্বরে ডাকল, দেবর! সব কুশল তো?

সীতার আচমকা ডাক দামামার মত বাজল ভরতের বুকে। কিছুক্ষণ বাক্যহারা হয়ে চেয়ে রইল। একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল। মৃদু হেসে বলল: কতকাল পর তোমাকে দেখলাম। তোমার সে রঙ আর নেই দেবী। দুচোখের কোণে কালি জমেছে। টুকটুকে মুখখানায় সে লাবণ্য কে যেন চুরি করে নিয়েছে। অনেক বদলে গেছ। মানুষের যে এতটা ওলট পালট সম্ভব এটা ধারণাই ছিল না। তারপর বুকের গভীর থেকে একটা শ্বাস ফেলে বলল: কারো কোন জানাই বোধহয় অভ্রান্ত নয়। জানার জগৎ প্রতিদিনই হয়ত বদলে যায় এমন করে। এমন না হলে হয়ত সকলের জীবন এক নিশ্চল বিন্দুতে স্থির হয়ে যেত।

ভরতের কথাগুলো বেশ লাগল সীতার! মন দিয়ে শুনল। ভরত চুপ করলে নাভি থেকে টেনে খুব জোরে শ্বাস নিল সীতা। নিঃশ্বাস পড়তে বুকের ভেতর শূন্যতাটা হাহাকারের মত ছড়িয়ে পড়ল বাতাসে। কষ্টে মুখ টিপে হাসল সীতা। বলল: তুমি অনেক বোঝ। নিজের মত থাকতে পারার জন্য

দুঃখ পেতে হয় অনেক। মানুষের মত মানুষ হয়ে উঠতে বোধহয় অনেক দুঃখ ভোগ করতে হয়, ত্যাগ করতে হয়।

ভরতের মুখে অনির্বচনীয় হাসির দ্যুতি। বলল : দুঃখ ভোগ না করলে মানুষ বড় কিছু করতে পারে না। এক একজন মানুষকে ভগবান শুধু দুঃখ দিয়ে পাঠান। জীবনে তারা কোনদিন সুখের মুখ দেখে না। শ্রীরামের কথাই ভাব না। আর্যদের বিপন্ন অস্তিত্ব রক্ষার জন্য, অযোধ্যার গৌরবের জন্য কত দুঃখ কষ্ট করল, ত্যাগ করল, তবু অযোধ্যার মানুষ তাকে ভুল বুঝল। তার বিরূপ সমালোচনা করল। অথচ তাদের স্বার্থেই চোদ্দ বছর অজ্ঞাতবাসে কাটাল। ভেবেছিল নিজেকে নিঃশেষে উৎসর্গ করে অযোধ্যাকে স্বর্গ বানাবে। কিন্তু মানুষ বড় অকৃতজ্ঞ। এই নিষ্ঠুর, নির্মম প্রেমহীন পৃথিবীতে কারও বুকে যদি অন্য কারো প্রতি একটু প্রেম থাকে তো তা আছে শ্রীরামের প্রাণে।

সীতা কথা বলল না। বুকের গভীর থেকে উঠে এল একটা লম্বা দীর্ঘশ্বাস। অপলক স্থির চোখে অন্যদিকে তাকিয়ে রইল। তাকে ভীষণ গম্ভীর এবং অন্যমনস্ক দেখাল। রামচন্দ্রের মুখখানা তার চোখের উপর ভাসতে লাগল। আর শরতের মেঘের মত কত ঘটনা কত চিত্র চোখের উপর দিয়ে ভেসে গেল। চিত্রকূট পর্বতে ভরতের আগমন নিয়ে রামের সন্দেহ, ভরত সম্পর্কে রামচন্দ্রের কটূক্তি, গুহক কর্তৃক ভরতের সততা ও আন্তরিকতা পরীক্ষা, শ্রীরামের কাছে ভরতের ক্ষমা প্রার্থনা, পাদুকা গ্রহণ, প্রত্যাবর্তনের জন্যে দীনা জননী কৈকেয়ীর কাতর অনুনয়, কত দৃশ্য চোখের সামনে দেখছিল সীতা। আর একটা অক্ষম রাগ ও গভীর বেদনায় এমন সুন্দর বিকেলটা মরা রোদের মতই বড় বিবর্ণ লাগছিল। এক জ্বালাভরা চোখে অস্তোন্মুখ সূর্য দেখছিল আর অন্য কথা ভাবছিল।

ভরত ভীষণ সরল। মানুষকে বড় বেশি বিশ্বাস করে। তাই, রামচন্দ্রের সন্দেহকে একবারও তলিয়ে দেখল না কোনদিন। একবারও বুঝতে চাইল না, রামচন্দ্র অযোধ্যায় না গিয়ে ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমে প্রবেশ করল কেন? লঙ্কা থেকে হনুমান রামচন্দ্রের প্রত্যাবর্তনের বার্তা নিয়ে অযোধ্যায় গেল কিন্তু কি উদ্দেশ্যে অযোধ্যায় গেল খোঁজ নিল না। হনুমানের আগমন নিয়ে তার কোন মাথাব্যথা নেই, আবার শ্রীরাম ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমে অবস্থান করছে কেন? কার প্রতীক্ষা করছে? এসব জানার কোন আগ্রহ নেই তার। সরল মনে শ্রীরামকে নিয়ে যেতে এসেছে। ভরত সত্যই মহাপ্রাণ। তার দিল্ রামচন্দ্রের কোথায়? এমন ভাইকেও মানুষ সন্দেহ করে?

কেমন এক থমধরা ব্যথায় সীতার বুকের ভেতরটা টাটাছিল। এক পিতার সন্তান তারা। তবু রামে ভরতে কত তফাত। স্বভাবে, আচরণে, আদর্শে, নীতিতে একটুও মিল নেই। দু'জন যেন দুই গ্রহের অধিবাসী। রামচন্দ্র যদি হয় মানুষ, ভরত তবে দেবতা! রামচন্দ্র এবং ভরতের ভিন্ন জগৎ আর ভিন্ন অস্তিত্বের কথাই বিবশ হয়ে ভাবছিল সীতা।

চিন্তিত মুখে সীতা খানিকক্ষণ অপলক চেয়ে রইল ভরতের মুখের দিকে। চোখের পলক পড়ছিল না মোটে। নিজের অজান্তে একটা লম্বা দীর্ঘশ্বাস পড়ল তার। আর তাতেই সে চমকাল। খুবই বিস্ময়ের সঙ্গে বলল : সত্যিই মহান তুমি। তোমার ভ্রাতৃপ্রেমের কোন তুলনা হয় না। সিংহাসন, রাজ্য, ক্ষমতা, প্রভুত্ব পেলে মানুষের সৎ ইচ্ছেও মরে যায়। কিন্তু তুমি বোধহয় সকলের থেকে একটু আলাদা।

ভরত হাসল। বলল: শ্রীরামের মনটাই অন্যরকম। এই পৃথিবীতে জীবনকে যে চোখে দেখে সে, মোটেই সেভাবে আমি ভাবি না। সুসন্তান বলেই শ্রীরামকে দেশ ও জাতির জন্য কাজ করতে হয়। সরল অকপট গলায় বলল ভরত।

সীতা মৃদু একটু হেসে বলল: বেশ কথা বল তুমি। কিন্তু আমরা যে এখানে আছি, এ খবর তোমাকে দিল কে?

ভরতের ভুরু কুঁচকে গেল। কিছুক্ষণ অন্যদিকে চেয়ে রইল। আপন মনে মাথা নাড়ল। কি যেন ভাবল কয়েক মুহূর্ত। তারপর আস্তে আস্তে মৃদু হাসল। বলল : এসব কথা চাপা থাকে না। মানুষের মুখেই শ্রীরামের আগমনের কথাটা রটে গেল। নিজের রাজ্য অযোধ্যায় না ফিরে শ্রীরামের এই আশ্রমে ওঠা খুবই বিস্ময়কর। তবু এসব জটিল জিজ্ঞাসায় বড় ভয় পাই। গম্ভীর করে ভাবলে সম্পর্কটা বিষিয়ে যায়। মনের শান্তি নষ্ট হয় তাই, ও নিয়ে মাথা ঘামাই না। আসলে সব গন্ডগোলের জন্য তো আমি

দায়ী। আমাকে দায়ী ভেবেই হয়ত শ্রীরাম এখানে অবস্থান করছে। আমি এসেছি তাকে নিজের দেশে, নিজের জায়গায় নিয়ে যেতে। তোমাকেও। আমার জন্যে তোমরা কত কষ্ট আর দুঃখ ভোগ করলে।

সীতার বুকটা আনন্দে চিনচিন করে উঠল। চোখ বুজে একটা লম্বা দীর্ঘশ্বাস নিল।

রাজকীয় সমারোহে ভরত রামচন্দ্রকে নিয়ে অযোধ্যায় যাত্রা করল। অশ্ব, হস্তী, পদাতিক বাহিনীর মধ্যস্থলে রামচন্দ্র ও সীতার সুদৃশ্য সুবর্ণমণ্ডিত রথ শোভা পাচ্ছিল। ভরত ছিল রামচন্দ্রের রথের আগে। পশ্চাতে ছিল লক্ষ্মণ ও হনুমানের রথ। এবং সবশেষে ছিল বাদ্যযন্ত্রীর দল।

দীর্ঘপথ।

চারিদিকে রোদ। নীল আকাশ এবং গাছগাছালিতে ঢাকা শান্ত গ্রামাঞ্চল। পথে একটাও মানুষ দেখা যাচ্ছিল না। হঠাৎ বিশাল রাজকীয় শোভাযাত্রা দেখে গ্রামের ছেলে বুড়ো সবাই বেশ হকচকিয়ে গেল। কোলাহল করে এ ওকে ডেকে ছুটে এল। অবাক বিস্ময় নিয়ে তারা পথপার্শ্বে দাঁড়িয়ে রইল।

বিশাল বাহিনীর পদধূলিতে গোটা অঞ্চলটা ধুলোয় সাদা হয়ে গেল। গাছের পাতা ধুলোয় মাখামাখি হয়ে কিম্ভুতাকার ধারণ করল।

অযোধ্যায় যেতে বিশাল বাহিনীকে বেশ কয়েকবার থামতে হল। প্রতিবারেই খোলামেলা গ্রামের বাইরে তারা শিবির স্থাপন করল। কখনও বা সামান্য কিছুক্ষণ অবস্থান করে একটু বিশ্রাম ও তৃষ্ণা নিবারণ করে আবার চলতে লাগল।

মধ্যাহ্ন শেষ হয়ে গেছে। ধীরে ধীরে অপরাহ্ন গড়িয়ে আসছে। কেমন একটা দীপ্তিহীন পাণ্ডুরতায় ছেয়ে আছে চরাচর। অযোধ্যা নগরীর আকাশেও একরকম মায়াবী আলো। চেনা নগরীর সব দৃশ্যই তাতে বদলে যায়। সব কিছুতেই একটু রহস্যের স্পর্শ লাগে।

অযোধ্যার প্রশস্ত রাজপথের দুধারে অপেক্ষমান কৌতূহলী জনতার ভিড় এখন বেশ। সকাল থেকে সারি সারি লোক অপেক্ষা করছে। তাদের নানা রঙের পোশাক-পরিচ্ছদ। রামধনুর সাত রঙের মত টুকরো টুকরো করে ছড়ানো। যতদূর দৃষ্টি যায় ততদূর পর্যন্ত তারা দেখার চেষ্টা করল। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভিড় উপচে রাস্তায় পড়ল। তাদের সামাল দিতে সিপাহী সান্ত্রীরা হিমশিম হয়ে গেল। শীতের দিনেও তাদের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম মুক্তোর মত ফুটে বেরোল।

চৌদ্দ বছর পর রামচন্দ্র অযোধ্যায় ফিরছে, রামচন্দ্রের চেয়েও সীতাকে দেখার এমন একটা টান ছিল যে, জনতা জায়গা ছেড়ে নড়ছিল না। আবার কোথাও কোথাও চেনা অচেনা মানুষের একটি ছোট খাটো দল দাঁড়িয়ে জটলা করছিল। তাদের কোন ব্যস্ততা ছিল না। নিজেদের মধ্যে দুটো দল হয়ে গেল। ভরতের পক্ষেই লোকের সংখ্যা বেশি। এদের অধিকাংশই তরুণ।

প্রবীণদের রামচন্দ্রের প্রশংসায় অসহিষ্ণু হয়ে একজন সাহসী যুবক সহসা প্রতিবাদ করল। বলল: দেশের ও দশের স্বার্থে রামচন্দ্র কি করেছে চোখে দেখেনি। জানিও না। দেখার ও জানার মত একটা হিতকর কাজের দৃষ্টান্ত আমাদের সামনে নেই। শুনতে পাই, সাধারণ মানুষের মধ্যে নেমে এসে তিনি তাদের অভাব-অভিযোগের খোঁজখবর নিতেন। কিন্তু তাদের অভাব-অভিযোগের কোন প্রতিকার করতে শুনিনি। রামচন্দ্রের মন ভোলানো এই ছোট্ট সান্নিধ্যটুকু পেয়েই সে যুগের মানুষ ধন্য হয়ে গেছে। রামচন্দ্র আমাদের বয়সী তরুণদের কাছে সত্য-মিথ্যে মেশানো এক কিংবদন্তির নায়ক।

কৃষ্ণকায় এক তরুণ তাকে সমর্থন করে বলল: কিন্তু ভরত আমাদের চোখে আদর্শ পুরুষ। মহান মানুষ, তাঁর মত রাজা হয়? হয় না। রাজর্ষি ভরতের সঙ্গে কারো তুলনা চলে না। অথচ, আমাদের বাপ-ঠাকুর্দারা রামচন্দ্র বলতে অজ্ঞান। রামচন্দ্রের নামের ভেতর কি মধু আছে জানি না। চোখ থাকতেও তারা ছিল অন্ধ। ভরতের ত্যাগ, সততা, স্বার্থহীন মনোভাব, মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা ও মমতা, প্রজাপ্রীতি রামচন্দ্রের কোথায়?

প্রবীণদের একজন অসহিষ্ণু হয়ে বলল : তোমরা ছেলে-ছোকরার দল। তোমাদের সঙ্গে তর্ক করব কি? রামচন্দ্র সম্পর্কে তোমরা কতটুকু জান?

কৃষ্ণকায় তরুণটি রুক্ষস্বরে বলল: আপনাদের চোখ থাকলে দেখতে পেতেন রামচন্দ্রের মত যুদ্ধবাজ ভূ-ভারতে নেই। তাঁর ভেতরে সাম্রাজ্যলোভী এক জঙ্গী রাজা লুকিয়ে আছে। তিনি যুদ্ধ চান, মানুষকে শৃঙ্খলে বাঁধতে চান, অধীনতার নাগপাশে আটকাতে চান, মানুষের স্বাধীনতা হরণ করাই তাঁর অন্যতম কাজ। বনবাসের চোদ্দ বছর তিনি শুধু যুদ্ধের উত্তেজনাই সৃষ্টি করেছেন। রামচন্দ্রের কাছে মানুষের দুটো শ্রেণী, আর্য আর অনার্য। আর্য কুলতিলক রামচন্দ্রের অধীনতা যারা মানতে নারাজ, তারাই শত্রু তাঁর। বনবাসের চোদ্দ বছর ধরে অনার্য অধ্যুষিত ভারতবর্ষে তিনি শুধু রাজনৈতিক অস্থিরতা সৃষ্টি করেছেন। সাধারণের স্বার্থে রামচন্দ্র কিছু করেননি। গর্ব করে বলার মতও কিছু নেই তাঁর সম্পর্কে।

তরুণের মুখ চোখ উত্তেজনায় রাঙা হল।

প্রবীণটি অদ্ভুত ভঙ্গিতে হাসল! বলল : অর্বাচীন, তোমার সঙ্গে বকাই মিছে। রামচন্দ্র রামচন্দ্রই।

কৃষ্ণকায় তরুণটি প্রবীণের এহেন তাচ্ছিল্যকর কথায় অসহিষ্ণু ও উত্তেজিত হল। একটু উষ্মা প্রকাশ করে বলল : আপনি নতুন কথা আর শোনালেন কি? সকলেই জানে রামচন্দ্র কখনও ভরত হয়না।

অন্য একটি তরুণ ভিড়ের ভেতর থেকে প্রবীণদের উদ্দেশ্যে টিপ্পনী কাটল। ছড়া কেটে বলল:

তাহলে জবাব কাল দেব হনুমানকে খুঁচিয়ে।
আজকের মত ছেড়ে দে বাবা প্রাণটাকে বাঁচিয়ে।

হাসির স্রোত বয়ে গেল ভিড়ের ভেতর। সকলে বেশ উপভোগ করল।

মধ্যবয়স্ক এক ব্যক্তি অবস্থাটা সামাল দিতে বলল: দ্যাখ ভাই তোমার আমার সমালোচনা ও নিন্দেতে রামচন্দ্রের গৌরব কিছু কমবে কিন্তু—

ভিড়ের ভেতর দাঁড়ানো তরুণটি তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে চোখ টানটান করে বলল: প্রকৃত সত্য প্রকাশ পাবে।

প্রথম তরুণটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল : একরত্তি বয়স থেকে বাপ-ঠাকুর্দার কাছে শুনছি ওরে তোরা রামচন্দ্রের মত হ'। কিন্তু রামচন্দ্রকে অনুসরণ করার মত আছে কি? আমরা সবাই যদি রামচন্দ্রকে অনুসরণ করি তাহলে মানুষের সংসারটা জঙ্গলে পরিণত হবে।

প্রবীণরা এ ওর মুখের দিকে তাকাল। দু'চোখ কপালে তুলে বিস্ময় প্রকাশ করে বলল : বল কি? সত্যিই দেশটা উচ্ছন্নে গেল অবিশ্বাসে সন্দেহে। ধর্ম বলে কিছু থাকল না। মহামানবের নামে কুৎসা করতে, তার চরিত্রস্খলন করতে এদের সরমে লগে না। ছিঃ! এসব অপপ্রচার কে বা কারা করছে কোন মতলবে; আমাদের জানতে বাকি নেই।

কৌতুকপ্রবণ তরুণটি মুচকি হেসে বলল: ও দাদু, ঐ অধর্ম অবিশ্বাস, সন্দেহ এসব তো রামচন্দ্রের কাছ থেকে শেখা। রামচন্দ্রই শেখাল স্নেহময়ী জননীকে বিশ্বাস কর না, সন্দেহ কর। ভাই শত্রু; তাকে বিশ্বাস কর না। বন্ধু বলে কেউ নেই। সকলকে সন্দেহ করে ঠকা ভাল, কিন্তু বিশ্বাস করে নিজের সর্বনাশ কর না।

প্রথম তরুণটি একটু উৎফুল্ল হয়ে বলল: রামচন্দ্রকে অনুসরণ করার মত সত্যি কিছু নেই। তিনি ভীষণ স্বার্থপর, বিবেকহীন নিষ্ঠুর। রাবণের বুকে যে প্রেম মমতা স্নেহ বিশ্বাস করুণাটুকু আছে তার কানাকড়ি রামচন্দ্রের ভেতর নেই। নারীকে সম্ভ্রম দেখানোর শিক্ষাটুকুও তাদের দু'ভাই-র নেই। অথচ রাবণ ভগিনীর সম্মান বাঁচাতে, তার অপমানের প্রতিশোধ নিতে এক বিরাট যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ল। রামচন্দ্রই কৌশলে যুদ্ধটা বাইরে থেকে তার উপর চাপিয়ে দিল। শূর্পনখার অপমান না করলে রাবণ সীতা হরণ করত না। যুদ্ধও বাধত না। যার জন্য এত রক্তক্ষয় হয়, উদ্ধারের পর পতিপ্রাণা সেই সীতার প্রতি তিনি এত নির্দয় হলেন কেমন করে? শ্রীরামের মধ্যে এতটুকু প্রেম থাকলে কিছুতেই সর্বজনসমক্ষে সীতার সতীত্বের পবিত্রতা পরীক্ষা করে অপমান করতেন না। রামচন্দ্রের এই নারী নিগ্রহ এবং লাঞ্ছনার কোন তুলনাই হয় না। নিজের স্ত্রীকেও তিনি সম্মান করতে শেখেননি।

প্রবীণরা বেশ একটু উত্তেজিত হল। উষ্মা প্রকাশ করে একজন বলল: তোমার সঙ্গে কথা বলাই আমার অন্যায় হয়ে গেছে।

শ্বেতাঙ্গ যুবকটি বলল: এ কথা বলছেন কেন? অনুমতি করলে আমি বিষয়টা খোলসা করে দিতে পারি। কথাটা ছিল তার ভূমিকামাত্র। তাই কোনরূপ জবাবের অপেক্ষা না করেই বলল: আচ্ছা বলুন তো মুমূর্ষু পিতাকে অসহায়ভাবে গৃহে রেখে কোন ছেলে যদি নিষ্ঠুরের মত স্ত্রীর হাতধরে বাড়ি ছেড়ে চলে যায় লোকে তাকে কি বলত? আপনিই বা তার সম্পর্কে কি ভাবতেন? এই কাজ যদি নিষ্ঠুর অমানবিক, নীতিহীন এবং ধর্মহীন বলে নিন্দিত হয় তবে মহারাজ দশরথের মৃত্যুর জন্য রামচন্দ্র নিন্দিত হবেন না কেন?

জননী কৈকেয়ী তাঁকে পুত্রাধিক স্নেহ করতেন তবু রামচন্দ্র তাঁকে বিশ্বাস করল কি? কৈকেয়ী বিমাতা এবং ভরত জননী বলেই রামচন্দ্র অভিষেকের কথাটা তাঁর কাছে গোপন করলেন? অভিষেকের মত গুরুত্বপূর্ণ পারিবারিক এবং রাজনৈতিক আনন্দানুষ্ঠানে ভরত শত্রুঘ্ন অনুপস্থিত কেন? ঐসময় তো তাদের মাতুলালয়ে পাঠানো হল কার স্বার্থে? ভরতের মত প্রিয় ভ্রাতাকে বাদ দিয়ে রামচন্দ্র অভিষেকের কথা ভাবল কেন? কেকয় থেকে তাদের নিয়ে আসার জন্য রামচন্দ্র কি করেছিলেন? রামচন্দ্রের আচরণ শুধু সংশয় বাড়ায়। ভরতকে সিংহাসনের প্রতিদ্বন্দ্বী ভেবে সকলের চোখে তাকে অপরাধী করতেই রামচন্দ্র হনুমানকে সরজমিনে অযোধ্যা দেখতে পাঠালেন। আর কত বলব? বীরাঙ্গণা তাড়কাকেও হত্যা করতে রামচন্দ্র কুণ্ঠিত হননি। নিরপরাধ বালিকে গুপ্ত ঘাতকের মত হত্যা করার মত নীতিহীন কাজ পৃথিবীতে খুব কমই হয়েছে। স্বার্থের জন্যে রামচন্দ্র পারেননি এবং করেননি এমন কোন অন্যায় নেই।

প্রবীণদের মধ্যে একজন বয়স্ক লোক নিজেদের মধ্যে ফিস্ ফিস্ করে বলল: সব কিছুকে মন্দ চোখে দেখা একালের যুবকদের স্বভাব। ভালকে মন্দ বলতেই ওরা ভালবাসে। ওটাই ওদের এক ধরনের আবিষ্কারের মজা। অবিশ্বাসের যুগে সব কিছুকে সন্দেহের চোখে দেখা, তাকে বিকৃত করা কিংবা সত্যকে উল্টেপাল্টে, ভেঙেচুরে চমক লাগানোই হল ঐ বয়সের ধর্ম।

আর একজন কানের কাছে মুখ এনে চাপা গলায় বলল: বোঝ না, এসব অপপ্রচার। রামচন্দ্রের ভাবমূর্তি নষ্ট করতে শত্রুরা উঠতি তরুণদের ব্যবহার করছে।

প্রবীণ শ্রোতা কয়েকবার মাথা নেড়ে বলল: ঠিক। তারপর যুবকদের দিকে তাকিয়ে বেশ জোরে বলল: দ্যাখ বাপু, স্থূল বুদ্ধি দিয়ে রামচন্দ্রকে বিচার করা যায় না। সত্যের জন্যে আদর্শের জন্যে মানুষের অনেক দুঃখ কষ্ট মেনে নিতে হয়, অনেক বেশি কঠোর হতে হয়। সংসারে স্নেহ, মায়া মমতা, মোহ এগুলি সত্য ও আদর্শ রক্ষার পথে সবচেয়ে বড় বাধা। এই মোহ কাটানোর দৃষ্টান্ত রামচন্দ্র তাঁর জীবন দিয়ে প্রমাণ করলো। জীবনের চেয়ে আদর্শ অনেক বড়; বড় আদর্শের আলো যখন মানুষের উপর পড়ে তখন সব দুর্বলতা কেটে যায়। মহান আদর্শে বড় হয়ে উঠে তার অন্তঃকরণ। সঙ্কীর্ণ গন্ডিতে তখন তাকে ধরে না আর। রামচন্দ্রের কাছে দেশ ও আর্যজাতির গৌরব বাড়ানো এবং ধর্মরাজ্য স্থাপন ছিল এক বড় কর্তব্য। সেই কর্তব্য করতে রামচন্দ্র করেননি এমন ত্যাগ নেই।

এমন সময় 'ওই আসছে ওই আসছে ওই আসছে', বলে জনতার মধ্যে রব উঠল। অমনি তর্ক ফেলে ছিটকে গেল সবাই। বহুদূর থেকে জনতার উল্লাস উত্তেজনা, আনন্দের কোলাহল সমুদ্র কল্লোলবৎ শোনা যাচ্ছিল। সেই কোলাহল ক্রমেই নিকটতর হতে লাগল। জনতা মুখর হল সীতা-রামের জয়ধ্বনিতে। মহাত্মা ভরতের জয়ধ্বনি দিতেও জনতা ভুলল না।

আস্তে আস্তে অশ্ব হস্তী, পদাতিক বাহিনী রাজপ্রসাদের দিকে এগিয়ে চলল। বেশ কিছুক্ষণ পর একটি সুসজ্জিত সুবর্ণ রথে রামচন্দ্র ও সীতাকে দেখল জনতা। বিপুল আনন্দে আর উল্লাসে তারা জয়ধ্বনি দিল। রাম ও সীতার দিকে রাশি রাশি ফুল আর মালা ছুঁড়তে লাগল। কিছু ফুল ও মালা সীতা ও রামের পায়ে ও গায়ে পড়ল, বেশিটাই মাটিতে পড়ে দলিত ও পিষ্ট হল।

জনতার অধীর উল্লাস ও বিপুল উৎসাহ এবং আনন্দ সীতাকে অভিভূত করল। সীতাকে অপরূপ প্রতিমার মত দেখাচ্ছিল। মমতা মাখানো শ্রীমন্ডিত মুখখানায় এক অপার্থিব মুগ্ধতার ভাব নেমে এসেছিল।

ভিতরে এক শিহরিত আনন্দের উদ্দীপক স্পর্শ তার চোখ মুখকে উজ্জ্বল করে দিল। উদ্দীপ্ত আনন্দ নিয়ে জনতার দিকে তাকিয়ে মৃদু মৃদু হাসছিল। আর হাত নেড়ে তাদের অভিনন্দন জানাচ্ছিল।

জনতা বিপুল হর্ষে মুহুর্মুহু সীতার জয়ধ্বনি দিতে লাগল।

দুই

সীতা এখন অযোধ্যার রাজমহিষী। অযোধ্যার রাজসিংহাসনে রামচন্দ্রের পাশেই তার গৌরবময় স্থান। প্রতিদিন রাজসভায় পাত্র-মিত্র, সভাসদ এবং অর্থী-প্রার্থীর সঙ্গে কিছুক্ষণ কাটাতে হয়। এই সময়টা মন্দ লাগে না। বেশ কিছুক্ষণ ভুলে থাকা যায়। নিজেকেও বেশ হাল্কা আর ভারমুক্ত লাগে। মনে হয়, তার কোনো দুঃখ নেই, বেদনা নেই, অভাব নেই। আকাশের মত উদার, বায়ুর মত মুক্ত লাগে। মানুষের সংস্পর্শে বড় মধুর মনে হয়।

এক সময় সভা ভঙ্গ হয়।

সীতা নিজের কক্ষে ফিরে আসে। বড় একা লাগে তখন। ভীষণ একা। শূন্যতা, নিঃস্বতা যেন গ্রাস করে তাকে। কিছুতে একাকীত্ব কাটিয়ে উঠতে পারে না। কাঁচা বয়সের ভাবাবেগ সাতচল্লিশ বছর বয়সে থাকার কথা নয়। থাকেও না। তবু স্বামী-স্ত্রীর প্রণয় মধুর ভাললাগার অনেক কিছুই থকে। বুকে টেনে নেয়া, একটু ছোঁয়া, আদর করা, একটু হাসি, কাজের কথা, বাজে কথা—এসব ফুরোয় না। কিন্তু তার জীবনে সেটুকুও মেলে না।

রামচন্দ্র তাকে এড়িয়ে চলে। তিরিশটা অস্থির বসন্ত কেটে গেছে তার জীবনে। এখন বসন্তের বাতাস গা জ্বালায় না। যৌবনের চঞ্চলতা এখন কিছুটা শান্ত, স্তিমিত। যদিও সারা অঙ্গে তার লাবণ্য উপচে পড়ছে। আরও সুন্দর দেখতে হয়েছে তাকে। তবু রামচন্দ্রের চোখে আকর্ষণীয় হতে পারল না। রাতে একান্ত কাছে পাওয়া মুহূর্তগুলো তাকে নতুন নারী করে তুলল না। রামচন্দ্রকে দিয়ে তার কোন সাধ পূর্ণ হল না। এই ব্যর্থতা তার বুকে কাঁটার মতো খচ্ খচ্ করে বেঁধে। বড় শূন্য লাগে। চোখ দুটো অপমানের জ্বালায় জলে ভরে যায়। যৌবনের নারীত্বকে ধিক্কার দেয়। নিজের মনে বলে, ছাই যৌবন। কি লাভ মেয়ে মানুষের শরীর বয়ে বেড়ানো। স্বামীর যদি মন না পেল তবে মেয়ে মানুষের এই কাঠামোর দাম কি? তার নিজেরও কি ভালো লাগে? না, একটুও না। বারবার মনে হয় তার মেয়ে হয়ে জন্মানোটাই মিথ্যে হয়ে গেছে।

নিরালায় নিজেকে প্রশ্ন করে রামচন্দ্রের কাছে কি চায় সে? তার চাওয়ার পাত্র হয়ে উঠছে না কেন সে? তার আকর্ষণ রামের কাছে তীব্র হচ্ছে না কেন? রাম তার প্রতি এত উদাসীন কেন? কী করেছে সে রামের?

বুকের ভেতর থেকে একটা পাল্টা প্রশ্ন সহসা উঠে এল। রামের নিস্পৃহ ঔদাসীন্য ভাঙতে সে বা কী করেছে? নিজেকে কতটুকু তার কাছে মেলে ধরেছে। কোথায় তার শৈথিল্য? ভেতর থেকে একটা নিঃসীম শীতলতা দুর্বলতা তাকে গ্রাস করে ফেলে। আর দু'চোখের তারায় ফুটে ওঠে শবরীর পোড়া দেহটা। রামচন্দ্রের নিষ্ঠুরতা।

অথচ এরকম অনুভূতি আগে কখনো হয়নি! দেহ মন প্রাণ সব কিছু স্বামীকে পূজার ফুলের মত ডালি দিয়েছিল। কিন্তু দেহ ছাড়া রাম সব গ্রহণ করেছিল। সীতা মন প্রাণ ছাড়া রামের কাছে আরো কিছু চেয়েছিল? সে চাওয়া অনেক বড়, অনেক বেশি কিছু চাওয়া। রামচন্দ্র তার চাওয়াটা বুঝত, কিন্তু আমল দেয়নি তার কামনা। হয়ত ভয় পেয়েছিল। সে ভয় তার এখনও কাটেনি। বরং যত দিন গেল ততই পেয়ে বসল তাকে। সীতার কেমন সন্দেহ হয়। শারীরিক অক্ষমতার কথা সর্বাগ্রে মনে হয়। তবু বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় না। ভাবতে চায় না। মনে হলে, বরং ভয় পায়।

সব মেয়েমানুষের মত সীতারও মনে খটকা লাগল, তবে কি রামচন্দ্রের ভাল লাগে না তাকে? তার সব ইচ্ছে আকাঙ্খা কি একটা বিন্দুতে এসে থেমে গেছে? তাই কি নিজেকে বিস্তৃত করতে পারছে না? রামচন্দ্রের নীরব বোবা জিজ্ঞাসার জোড়া জোড়া চোখের সামনে বোবা হয়ে থাকতে তারও কষ্ট হয়। দু'জনের মনই একটা ভীষণ কিছুতে একাগ্র চিন্তায় বিমর্ষ।

অনেক রাত পর্যন্ত ঘুমোতে পারে না। আসলে ঘুম আসে না। বুকের কাছে নিঃশ্বাস চেপে চুপ করে শুয়ে থাকে। মুখে কোন ভাবান্তর প্রকাশ করে না। এমনি করে দিন কাটে সীতার। গোটা ব্যাপারটাই তার সয়ে গিয়েছিল বিতৃষ্ণা আর গ্লানিতে।

বিশাল পালঙ্কে অন্য একদিকে একভাবে শুয়ে থাকে রামচন্দ্র। ঘরের জমাট অন্ধকার ঘন হয়ে তাদের যেন ঢেকে দিল। অন্ধকারে মুখোমুখি হয়ে তারা শুয়েছিল। কিন্তু কেউ কারো চোখ দেখতে পাচ্ছিল না। সীতা রামের কোঁকড়া চুলের দিকে, বুকের উপর রাখা হাতখানার দিকে তাকিয়ে ছিল। রামচন্দ্র সীতার দিকে তাকিয়েছিল কি চোখ বুজেছিল অন্ধকারে ঠাহর করতে পারল না সীতা।

খোলা জানলা দিয়ে শরতের উজ্জ্বল তারাভরা স্নিগ্ধ নীল আকাশের অনেকখানি দেখা যাচ্ছিল। তুলোয় পেঁজা রাশি রাশি মেঘ আকাশের গায়ে ডানা মেলে দিয়ে চকোরের মত কৃষ্ণা দ্বাদশীর আধখানা চাঁদের মাধুরী পান করতে করতে চলেছে। এই মেঘেরা কতদূর থেকে, কত কাল ধরে যে আসছে সীতা জানে না। তার জানার ইচ্ছে নেই। শূন্য চোখে তাকিয়ে সে দেখছিল মেঘেরা কত অরণ্য, পাহাড়, নদী, সাগর, জনপদ, নগর, গ্রাম, অতিক্রম করে চলেছে। কিসের টানে? কে জানে? তারারা তাদের পথ দেখাচ্ছে। তার মত ঘরের চার দেয়ালের বন্দী জীবন নয় মেঘেদের। তারা বাঁচতে জানে। জীবনের সুখ আনন্দ, তৃপ্তির স্বাদ বুকে করে বয়ে এনে ছড়িয়ে দেয় আকাশের গায়। কী খুশিতে ভরে ওঠে আকাশ, দিগন্ত, পৃথিবী।

এদের কোন ঘর নেই। কিন্তু প্রেম, অফুরন্ত, মুক্ত। বন্ধনহীন। কেমন একটা বিমর্ষ চেতনা গ্রাস করে তাকে। ভাল লাগে না তখন কিছু। কেবল মনে হয় মানুষ হয়ে জন্মানোর অনেক জ্বালা। এখানেও কোথাও প্রেম নেই। সবটাই স্বার্থ আর প্রয়োজনের সম্পর্ক। মন মাপামাপির ব্যাপারে বেহিসেবী হয়েছ তো খেসারত দাও। কিন্তু মেঘের পরীদের ওসব কিছু নেই। সুখের পাখি হয়ে সটান উড়ে যাও শুধু।

সীতারও স্বপ্ন ছিল, এমন আকাশ ভরা জ্যোৎস্নার মেঘ হয়ে উড়ে বেড়াতে। জ্যোৎস্নার মাধুরী মেখে, শিশিরে ভিজে, বাতাসের গন্ধ মেখে, পৌঁছে যেত সেই মেঘের দেশে। যেখানে অনন্ত প্রেম, অনন্ত জীবন।

ঘর অন্ধকার। কিন্তু বাইরে আঁধার খুব গাঢ় নয়। সেখানে আছে কৃষ্ণা-দ্বাদশী চাঁদের ক্ষীণ আলো, নীল আকাশ। নরম আলোয় ঘেরা রাত্রির অন্ধকারে স্নিগ্ধতা সীতার বুকের উষ্ণতাকে শীতল করতে পারে না। সে হতভাগিনী। অদৃষ্ট তার মন্দ। এই পৃথিবীতে সে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। তার জলভরা চোখে বিন্দু বিন্দু আলো স্পন্দিত হতে থাকে। চাঁদ, আকাশ, গাছ, পাহাড়, অরণ্য সবাই চেয়ে চেয়ে দেখছে তাকে। সীতার ভেতরটা বড় কাঙাল লাগল একটু আদর আর ভালবাসার জন্য। এই বুক জোড়া অতৃপ্তি, আর কষ্ট নিয়ে তাকে বেঁচে থাকতে হবে। কাল কাটাতে হবে। অপূর্ণতার যন্ত্রণা নিয়ে রামচন্দ্রের সঙ্গে রোজ রাজসভায় পাত্র-মিত্র সভাসদের সামনে হাজির হতে হবে। জোড়া তালি দেয়া জীবনের অপমানে তার চোখ ভরে জল এল। মনে মনে বার বার আওড়ালো এমন বিষণ্ণ মন নিয়ে যেন কেউ না জন্মায়।

রামচন্দ্র তার পাশেই শুয়ে আছে। অন্ধকারের ভেতর সে ঘুমিয়ে পড়েছে কি না বোঝা গেল না। একটা মানুষ যে দুঃসহ মনঃকষ্টে এবং দুঃখ কাতরতা নিয়ে রামের সঙ্গেই আছে অথচ তা নিয়ে তার কোন মাথাব্যথা নেই। সীতার মন বলে যে কিছু আছে কিংবা তার কোন দুঃখ আছে বা থাকতে পারে রামচন্দ্র কোনদিন তাকিয়েও দেখল না। নিজের দুর্ভাগ্য নিয়ে আজকাল দুঃখ করে না আর। দুঃখ জানানোর মানুষ নেই। রামচন্দ্র চিরকাল তার কল্পনায় মানুষ হয়ে রইল। স্বপ্নেই তার সঙ্গে যত প্রেম। স্বপ্নের মধ্যে বেঁচে আছে সে। স্বপ্নের ফুল দিয়ে স্বপ্নের সুতো তার আবেগ ভালবাসা বিরহের মালা গাঁথে। সে স্বপ্ন যখন ভাঙে তখন বড় কষ্ট হয়। বুকটা হাহাকার করে। নিজেকে বড় নিঃস্ব রিক্ত লাগে। মনে হয় সে ধরিত্রীর মেয়ে। রাজ রাজেন্দ্রানী। অনন্ত তার ঐশ্বর্যের ভান্ডার। দিতে পারে অনেক কিছু। কিন্তু গ্রহণ করার মত মানুষ নেই। বন্ধুও জুটল না। ঊষর বুকে জীবনের একটু স্পন্দন শোনাব জন্য কত না ব্যাকুল! রামচন্দ্রের ঔদাসীন্যে নিস্পৃহতায় জীবন একটা বিন্দুতে এসে থেমে গেছে। মরুভূমির মত খাঁ খাঁ করছে।

রামচন্দ্রের একটু করুণা পেলে তার জীবনটা এমন অর্থহীন হতো না। কষ্টে সীতার বুকটা টন টন করে উঠল। পাছে রামের অকল্যাণ হয় তাই উদ্গত নিঃশ্বাস জোর করে চাপল। সীতার মনে প্রশ্ন জাগল, রামচন্দ্র কি তার মতো ছোট্ট একটি শিশুর স্বপ্ন দেখে? তুলতুলে নরম একটি শরীরের উষ্ণতা পাওয়ার জন্য তার মন কি লালায়িত হয়? রামচন্দ্রের মন ও ইচ্ছে সম্পর্কে সীতার কোন ধারণা নেই। থাকবে কোথা থেকে? বিয়ের পর ত্রিশটা বছর তার কাটল। কিন্তু পুরুষের দেহের সংস্পর্শে নারীর কি সুখ জন্মে রমণীর আনন্দ বা তৃপ্তি কি আজও অজানা তার?

রামচন্দ্র তাকে নিয়ে কী করতে চায়? নিজেকে প্রশ্ন করে সীতা এবং নিজেই তার উত্তর দেয়। বাঁধাধরা কতকগুলো আদর্শের ছক তার মনকে দৃঢ় করে ধরে আছে, যেমন শেকড় দৃঢ়ভাবে মাটিতে আঁকড়ে থাকে ঠিক তেমন। সে বন্ধন একটুও আলগা হতে দেয়নি কখনও। এমন একটা বদ্ধ মনের সঙ্গে নিজেকে আর কোনমতে খাপ খাওয়াতে পারছিল না। নীতি আর আদর্শের সংস্কারের প্রাণহীন শুকনো চেহারা দেখে দেখে আজ ক্লান্ত। নীতি এবং আদর্শের ধারণাগুলো জীবনের চেয়ে তার কাছে প্রিয়। এগুলোকে সে অনেক বড় দেখতে চায়, বড় করে রাখতেও চায়। স্ত্রীকে সেজন্য তার ভয়।

রামচন্দ্রকে তার বড় বোকা মনে হয়। তার জন্য মাঝে মাঝে বড় করুণা আর মায়া হয়। সমবেদনা জাগে। আবার রাগ দুঃখ অভিমানও হয়। জীবনের সবচেয়ে প্রিয়, সুন্দর আর রমণীয় মুহূর্তগুলোর মুখোমুখি কখনও হয়নি বলেই এ ভয়ঙ্কর ভয় তাকে গ্রাস করেছে। নারী সম্পর্কে কতকগুলো সংস্কার আর ভীতি শ্রীরামের মনে এমন ভয়ঙ্করভাবে বিঁধে আছে বলে নিজেকে এভাবে আড়াল করে রাখে। বোধহয় নরচন্দ্রমা রামের এই ফাঁকটাই তাকে রিক্ততার যন্ত্রণায় ছিন্নভিন্ন করে।

রামচন্দ্রের আচমকা নিঃশ্বাসের শব্দে সীতা চমকে ওঠল। রামচন্দ্র যে জেগে আছে তার শ্বাস পতনের শব্দেই টের পেল। কি একটা বলার জন্য ঠোঁটটা কয়েকবার কেঁপে থেমে গেল। কিছু পরে অস্পষ্টভাবে বলল: আমার সঙ্গে বিয়ে না হওয়াই ভাল ছিল তোমার।

রামচন্দ্র অনুভব করতে পারছিল তার পাশে শুয়ে আছে রক্তমাংসের মানুষের ভেতর একটা বুভুক্ষু, বিক্ষুব্ধ প্রাণ। তার বুকের ধুক্ ধুক্ শব্দ সে শুনতে পাচ্ছিল। সীতার জন্য তার মায়া হল আবার ভয়ও করল। তবু সব ভয় কাটিয়ে রামচন্দ্র ধীরে ধীরে একটা হাত সীতার পিঠের ওপর রাখল। একটু কাছেও টানার চেষ্টা করল। হাসিহাসি গলায় আস্তে করে বলল : তোমার সঙ্গে বিয়ে না হলে আমার জীবন বৃথা হয়ে যেত এমন কথাটা ভাবা কি ঠিক? এই কথা কি তুমি আমার মুখে শুনতে চাইছ?

রামের কথাটা বড় নির্মম। ভীষণ কষ্ট লাগল সীতার। বুকের ভেতরটা তার ধক্ করে ওঠল। প্রচন্ড অভিমানে রামের হাতখানা সে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করল। পিছন ফিরে শোয়ার জন্য একটু বলপ্রয়োগও করল। রামের শক্ত হাতের বাঁধানের মধ্যে ছটফট করতে করতে সীতা বলল : আমি কিছু শুনতে চাইনি। ছাড়। কন্ঠস্বরে তার যুগপৎ বিরক্তি ও বিতৃষ্ণা। রামের বুকের ওপর ছটফট করতে করতে বলল : আমাকে বিয়ে করে তুমি সুখী হতে পারছ না, এইটে আমার জ্বালা।

রামচন্দ্র কিন্তু সীতার নারীসুলভ রাগ অভিমান এবং বিরাগে একটুও অসহিষ্ণু কিংবা বিরক্ত হল না। বরং প্রাপ্তির এক নিবিড় সুখের উল্লাসে সীতাকে আরো বুকের কাছে টেনে নিল। কি একটা অদ্ভুত পাওয়ার সুখ তাকে ভরিয়ে তুলছিল। সহজ প্রসন্ন গলায় রাম বলল : বোকা। ভীষণ বোকা। কে বললে তোমায় পেয়ে সুখী হইনি আমি? সব কথা কি মুখে বলতে হয়? তুমি বোঝ না?

সীতা মুহূর্তে কেমন হয়ে গেল। স্নায়ুর ভেতর শির শির করে উঠল। গলা দিয়ে তার স্বর নামল না। গলার ভাঁজে তার বিন্দু বিন্দু ঘাম জমল। আঁচলের প্রান্ত দিয়ে রামচন্দ্র তার গলার ঘাম মুছিয়ে দিল। কি একটা বলতে গিয়ে থেমে গেল। সীতা নড়াচড়া করছিল না আর। রামচন্দ্রের শরীরের সঙ্গে লেপ্টে রইল। ঘরের জমাট অন্ধকার ঘন হয়ে ওদের যেন ঢেকে ফেলল ধীরে ধীরে।

সীতা নিস্পন্দ। ইচ্ছে হচ্ছিল, রামচন্দ্রের গোটা শরীরটাকে পেঁচিয়ে ধরে। বুকের উপর তার হাতখানা টেনে নেয়। লোমশ বুকের উপর মুখ ডুবিয়ে মাংসের, রক্তের গন্ধ নেয়, বুকের ধক্ ধক্ শব্দ শোনে।

বাইরে কৃষ্ণাদ্বাদশীর মরা জ্যোৎস্না। বেলফুলের গন্ধের সঙ্গে রাতের গন্ধ, জ্যোৎস্নার গন্ধ, নিশিজাগা প্রেমিক-প্রেমিকার গায়ের গন্ধ মিশে গেছে। প্রকৃতিময় নরম চাঁদের আলো। শুধু সীতার ঘরেই অন্ধকার।

রামচন্দ্র সম্মোহিতের মত সীতার কোমর জড়িয়ে ধরল।

কোথা থেকে একটা তীব্র বিতৃষ্ণা আর অভিমানে তার বুক ছাপিয়ে উঠল। হাতখানা সরিয়ে দিয়ে শোবার চেষ্টা করল। কিন্তু রামচন্দ্র তাকে ডানহাত আঁকড়ে দিয়ে আরো বুকের কাছে টেনে নিল।

সীতার বুকে বর্ষা নামল। এই প্রথম! এ-জীবনে। রামচন্দ্র মুখ নামিয়ে আনল সীতার ঠোঁটের খুব কাছে। চোখে চোখ রাখল। অন্ধকারের মধ্যে অনেকক্ষণ তাকে দেখল। তারপর নিবিড় আশ্লেষে হঠাৎ সীতার ঠোঁটে ঠোঁট রাখল। এই প্রথম। চুমু খাওয়ার জন্য নয়, সীতার সব ব্যথাকে কষ্টকে বিক্ষোভকে নিঃশেষে শুষে নেবার জন্য।

সীতা আপত্তি করল না। বাধা দিল না। এই মুহূর্তে অন্য দশজন মেয়ে যা করে সীতাও তাদের মত দুটি হাত দিয়ে রামকে বুকের উপর জড়িয়ে ধরে প্রকাশ করল তার গাঢ় নিরুচ্চার ভালবাসা, ভাললাগা। সমর্পণের নীরব স্বীকৃতিতে পূর্ণ কলসের মত ভরে উঠতে লাগল সীতা। শরীরের ভেতর যে এত আনন্দ, এত উল্লাস আর এত সুখ লুকনো ছিল সীতা এই প্রথম টের পেল। তাই এক পরিপূর্ণ দানের মধ্যে গভীর সুখে সে হারিয়ে যাচ্ছিল।

দূরে গাছের ডালের ফাঁকে ভোরের পাখি 'গেরস্থের খোকা হোক' বলে উল্লাসে আনন্দে কয়েকবার ডেকে রাতের অবসান ঘোষণা করে নীল আকাশের রক্তে রাঙানো মেঘের দিকে উড়ে গেল।

তিন

সীতার উৎকণ্ঠিত বুক থেকে অনেককালের একটা কষ্টের ভার নেমে গেল। মাতৃত্বহীনতার অপমান আর ব্যর্থতা সব মেয়ের মত তার বুকেও অহরহ কাঁটার মত বিঁধত, যন্ত্রণা দিত, তার অবসান হল মাতৃত্বের সম্ভাবনায়। এখন তার অনুভূতির মধ্যে কেমন একটা পরিপূর্ণতার সুখ, লজ্জা, মিশে আছে। আর আশ্চর্যরকমভাবে একটা ইন্দ্রিয় সব সময় সজাগ যেন। শরীরের ভেতর আর একটা প্রাণের উত্তাপ, তার নড়াচড়া দপদপিয়ে উঠছে শিরায় শিরায়। শ্বাস-প্রশ্বাসে কোমল একটা খুশি খুশি ভাব। গর্বও হয়।

সীতার মধ্যে হঠাৎ চোখে পড়ার মত কিছু দেখে রামচন্দ্র বিস্ময়ে থমকে চেয়ে রইল। সীতাকে ভীষণ সুন্দর লাগল। লজ্জা যে নারীর একটা রূপ, সৌন্দর্য রামচন্দ্র সীতার ভেতর প্রথম দেখল। আকস্মিক পুলকে বুকটা তার থরথরিয়ে উঠল। অধরে স্মিত হাসির ভাব।

রামের কৌতুহলী দৃষ্টির দিকে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকতে পারল না সীতা, কারণ তার শিরায় শিরায় অনেকটা গলিত আগুনের স্রোতের মত প্রবাহিত হচ্ছিল গভীর লজ্জা, এবং কৌতুক যা তাকে থরথরিয়ে কাঁপিয়ে দিচ্ছিল শুধু বাইরে নয় ভেতরেও। রামের বিস্মিত মুগ্ধতার আলোর ছিটেয় যে চঞ্চলতা জাগল সীতার মনে তাকে পুরস্কার মনে হল। আর এই ভাবটা তার চকিতবিদ্ধ লজ্জার সঙ্গে জড়িয়ে এক অপরূপ আচ্ছন্নতার মধ্যে স্থায়ী হয়ে রইল কিছুক্ষণ। নিজেকে তার কেমন অশক্ত লাগছিল। মনে হচ্ছিল একটা কিছু আঁকড়ে ধরে আশ্রয় না পেলে স্থির হয়ে দাঁড়াতে পারবে না। এ তার ভীরুতা কিংবা লজ্জা নয়, অনুরাগ সিঞ্চিত এক জ্বালাধরা অনুভূতি। তীব্র আনন্দের যন্ত্রণায় দেহটা নুয়ে পড়ল। যা কিছু তার গর্বের, পরিচয়ের শ্লাঘার তা তো রামচন্দ্রের কাছ থেকেই পাওয়া। নইলে, তার আমিত্ব অনস্তিত্বের অন্ধকারে ডুবে থাকত চিরকাল। নারীর সমস্ত কিছুকে অর্থবাহী করে তোলে পুরুষের ভালবাসা। মাতৃত্ব তার পুরস্কার। মাতৃত্বের মতো শ্রেষ্ঠ মহৎবোধ আর কি আছে জগতে? পুরুষের কাছে এইটুকু পেয়ে নারী যে জীবনে কত দামী কত মহার্ঘ হয়ে ওঠে সীতা এই প্রথম জানল। তার এই অশান্ত সুখের ভাগটুকু রামচন্দ্রকে দেওয়ার জন্য সম্মোহিতের মত তার কাছে এসে দাঁড়াল, এক আশ্চর্য উজ্জ্বল অথচ দ্বিধাভরা চোখে রামচন্দ্রের দিকে চেয়ে মুখ টিপে অদ্ভুত ভঙ্গি করে হাসল। সমর্পণের নীরব আনন্দ সুখে রামচন্দ্রের বিশাল বুকের উপর সীতা আস্তে আস্তে মাথা রাখল। আর নিরুচ্চার ভালবাসার স্বরে জিগ্যেস করল : অমন করে কি দেখছ? আমার বুঝি লজ্জা করে না?

সলজ্জ সীতাকে তখন দুরন্ত সুন্দর দেখাচ্ছিল। রামচন্দ্রের অধরে হাসি, চোখে মুগ্ধতা। সীতার দু'গালে দুটি হাতের পাতা ছুঁইয়ে আস্তে আস্তে তার মুখের ওপর চোখ মেলে ধরল। অনেকক্ষণ খুঁটিয়ে

খুঁটিয়ে তাকে দেখল। এক নরম ভালবাসা কার্পাস তুলোর মত পিঁজে পিঁজে শরীরের মধ্যে স্নায়ুর মধ্যে ছড়িয়ে যাচ্ছিল। সীতার দু আঁখিতে মুগ্ধতা নামল। রামের দিকে অবাক হয়ে চেয়ে রইল। তাম্বুলরঞ্জিত ঠোঁটে তার সলজ্জ হাসি, চোখের তারায় অন্তর্ভেদী নিবিড়তা।

রামের মনে হল পুরুষ এবং নারী যখন নীরব থাকে তখনই তাদের সবচেয়ে সুন্দর দেখায়।

দু'জনের দৃষ্টির বিনিময়ের কতকগুলো মুহূর্ত কেটে গেল। সীতার মুখের কাছে মুখ এনে রামচন্দ্র স্খলিত নিচু স্বরে বলল : তোমার ভেতর আমার আমিকে দেখছি। সেকি সত্যি?

মুগ্ধ বিস্ময়ে সীতা কেমন যেন শিথিল অসাড়তার ভেতর ডুবে গেল। রামের বুকে দু'হাত রেখে সপ্রেমে তাকাল। ঠোঁটের কোণে লেগেছিল বিগলিত প্রসন্ন হাসি। চোখের চাহনিতে ছিল বিনম্র লজ্জার ভাব। গদ্গদ হয়ে বলল : আমি তোমার কথার মাথামুন্ডু কিছু বুঝতে পারছি না।

রামের অধরে চটুল হাসি। বলল : আগের থেকে তোমাকে অনেক সুন্দর দেখাচ্ছে।

রামের প্রশংসা সীতার ভাল লাগল। ভুরু কুঁচকে তার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে ফিক করে হাসল। বলল: তোমাকে বলেছে?

রামচন্দ্রের লুব্ধ চোখ ও চাহনির দিকে তাকিয়ে সীতা পেটের কাছে কাপড়টা টেনে ঢেকে দিল। মুখটিপে হাসল। বলল : কেমন করে বুঝলে আমি দিন দিন সুন্দর হচ্ছি?

রামচন্দ্রও বেশ একটা খুশির মেজাজ পেল। চোখে কৌতুক। অধরে টেপা হাসি। বলল: আন্দাজ কর।

সীতা ভুরু কুঁচকাল। কৌতুকে ঝলকাল দুচোখ। হাসি হাসি মুখ করে বলল : বারে, আমি কেমন করে জানব? আমার চোখে তো তুমি নিজেকেই দেখছ। কী দেখছ, সেত তুমি জান?

সীতা যে এরকম উত্তর দেবে রামচন্দ্র ভেবে নিয়েছিল। সীতার কথা বলার ভঙ্গি অপূর্ব। গলার স্বর ভারি মিষ্টি, উচ্চারণও স্পষ্ট। মুগ্ধ হয়ে গেল রামচন্দ্র। অদ্ভুত ভঙ্গি করে একটু হাসল। বলল: শরীরের মহত্তম উৎসবের পূর্ণতায় তুমি বর্ষার নদীর মতই ভরে উঠেছ। পূর্ণ যত হচ্ছ, কলেবরও তত—বলে সীতার উদরের আয়তন ও উচ্চতাকে হাতে দিয়ে দেখাল।

রামচন্দ্রের কৌতুকে সে একটু লজ্জা পেল। একটা নারীসুলভ খুশি খুশি ভাব তার মুখখানা সহসা উজ্জ্বল করল। তবু কোথা থেকে একটা দুরন্ত লজ্জা এসে তাকে রাঙাল। মৃদু হাতে রামচন্দ্রকে একটু ঠেলা দিয়ে দুম দুম করে তার আদুল বুকে কয়েকটা কিল বসাল। বলল: যা। ভারি অসভ্য। যত সব বাজে কথা।

দু'জনে দু'জনের দিকে তাকিয়ে হাসল। কিছুক্ষণ তাদের দু'জনের নিঃশ্বাসের শব্দ শোনা গেল।

মানুষের আশা-আকাঙ্খা অপেক্ষা করে, কিন্তু দিনরাত কারো অপেক্ষা করে না। হঠাৎ সুখের দিনগুলো যে সীতার জন্য আর অপেক্ষা করে থাকবে না, এটা কিন্তু অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তনের পর কোনদিন মনে হয়নি। শবরীর স্মৃতিটা তার মন থেকে একেবারেই মুছে গেছে। একটা কষ্টকর স্মৃতিকে পুষে রেখে জীবনকে ব্যর্থ করে দেওয়ার কোন মানে হয় না। জীবনটা থেমে থাকার জন্য কিংবা হেরে যাওয়ার জন্য নয়। চলার বেগেই সব কিছুকে পিছনে ফেলে এগিয়ে চলাই হল জীবনের ধর্ম। জীবনের ক্ষেত্র অনেক বড়। শবরীর মৃত্যু সেই মহাজীবনের একটি বুদ্বুদমাত্র। এই অনুভূতিটাই সীতার জীবনের ছকটাকে পালটে দিল। বৃহত্তর জীবনের সুখস্বপ্নে দু'চোখ তার বিভোর হয়েছিল কিন্তু সে প্রত্যাশায় হঠাৎ ব্যথা লাগল রামচন্দ্রের চরম ঔদাসীন্যে।

শান্ত ও নম্র স্বভাবের কোমলহৃদয়া সীতা তার কারণ জানে না। কখনও কোন কৌতূহল প্রকাশ করেনি। ইচ্ছে করেই জিজ্ঞেস করে না। রামের খুশির উপর জবরদস্তি করতে চায় না। যে কোন রকমের জবরদস্তিতে চিরকাল তার অনীহা। তাছাড়া, রামচন্দ্রও চায় না যে সীতা তার জীবনের সর্বক্ষেত্রে কৌতূহল দেখায়।

বেশ কয়েকমাস হল রামচন্দ্র সীতাকে এড়িয়ে চলল। কিছুই বলল না তাকে। রামের ভাব বোঝাই

ভার। কিন্তু সীতা প্রতি মুহূর্ত চায় রামচন্দ্র তাকে কৈফিয়ত তলব করুক। মনেতে কোথায়, কতরকমের যে ঝগড়া আছে তা মানুষ নিজেও ভাল করে জানে না। তা নিয়ে দুজনের একটু কথা কাটাকাটি হোক না কিছুক্ষণ। তাতে উভয়ের মধ্যে যে গুমোট আছে কেটে যাবে। ব্যবধানও ঘুচে যাবে। পরস্পরের কাছে তারা আরো স্পষ্ট হবে। রামচন্দ্র কেন তাকে প্রশ্ন করে না? কেন তার কষ্টের কথা, সমস্যার কথা বলে না-কেন? কেন? নিজের মনে সীতা নিরুচ্চারে বলে রামচন্দ্র হয়তো তাকে যোগ্য স্ত্রী মনে করে না। স্বামী বন্ধনটা ও তার ঢিলেঢালা। এমন আলগাভাব কোন স্ত্রীর ভালো লাগে? জবরদস্তি করে স্ত্রীর অধিকার দাবি তার ভালো লাগে না। জোর করে কিছু আদায় করলে তা থাকে না। তাতে আত্মসম্মান চলে যায়।

রামচন্দ্রের চোখের চাহনিতেই সীতা তার মনের ক্ষোভ বিস্ফোরণের জমা আগুন আঁচ করতে পারে। মনটা তার জন্যই অস্থির। তার অশান্ত মন নিজেকে প্রশ্ন করে এমন কি হল যে রামচন্দ্র এই কদিনে এতো অস্থির, অশান্ত? এই অস্থিরতা তার কাছে প্রকাশ করল না কেন? রমণী বলে কি অযোগ্য সে? এই কথাগুলো কানের পর্দায় ঝংকারে বাজতে লাগল। বুকের ভেতর কোথায় একটা ব্যথা-ব্যথা করছিল। নিজের অজান্তে চোখ দিয়ে টপটপ করে জল পড়ল। কাঁদতে কাঁদতেই নিজেকে প্রশ্ন করল: তবে কি ফুরিয়ে গেল সে? তার চারপাশে এ কিসের দেয়াল? এ দেয়াল ভাঙতে পারছে না কেন? সীতার বুকে অভিমানের সমুদ্র।

রামচন্দ্রকে রোজ ভীষণ উদ্‌ভ্রান্ত বিচলিত দেখে। সীতার বড় কষ্ট হয়। নিশ্চয়ই কোন দুরন্ত সংকটে রামচন্দ্র ভীষণ অসহায় এবং বিপন্ন। মুশকিল রামচন্দ্রের আপনজন বলে কেউ নেই। কাউকে আপন মনে করে না, বিশ্বাসও করে না। এমন কি প্রাণের লক্ষ্মণকেও পুরোপুরি বিশ্বাস করে না। রামচন্দ্র নিজের কষ্টের একজন নিঃসঙ্গ সঙ্গী।

রামচন্দ্রের বিষণ্ণতা এবং নিস্পৃহতা সীতার কাছে দুঃসহ হয়ে উঠল। কি করবে সে ভেবে স্থির করতে পারছিল না। রামচন্দ্র যদি অনুগ্রহ করে কখনো কিছু বলে এই প্রত্যাশায় তার বহুদিন কাটল। এখন ক্লান্ত সে। মনে মনে ভাবল রামচন্দ্রর জন্য অনেক ভেবেছে, করেছে। আর করবে না। তার উৎকণ্ঠা, প্রত্যাশা দুরারোগ্য ব্যধির মত তাকে শুধু ঝাঁঝরা করে দিয়েছে। রামচন্দ্র তার প্রত্যাশা প্রতীক্ষা কিংবা প্রণয়ের কোন মূল্য দেয়নি। নিজেকে তার বড় তুচ্ছ ক্ষুদ্র এবং অত্যন্ত সামান্য মনে হল। হীনম্মন্যতার যন্ত্রণায় মনটা কুঁকড়ে গেল। ভালবাসা মানে যে এত দুঃখ এত যন্ত্রণা আগে টের পায়নি।

মলমলের ওড়নার মত স্বচ্ছ অন্ধকার আকাশ থেকে ধীরে ধীরে বাতাসে গা ভাসিয়ে নেমে এল। এমন শান্ত স্নিগ্ধ আর মিষ্টি অন্ধকার দেবলোকের আশীর্বাদের মত মানুষকে শুধু সান্ত্বনা পাঠায়। সেইরকম অন্ধকারে তারা দু'জন খুব সামান্য তফাতে দাঁড়িয়েছিল। উভয়ের ব্যথিত যন্ত্রাণার্ত চোখদুটি পরস্পরকে অন্বেষণ করছিল।

গাঢ় অন্ধকার। দেওদারের গন্ধে সুরভিত। আকাশের তারা ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে। কে যেন টেনে নিয়ে চলে যাচ্ছে। তবু সেই ফিকে পাতলা অন্ধকারের ভেতর তাদের চোখ যন্ত্রণায় দীর্ণ ফাটা আয়নার মত। ফাটলের ফাঁক দিয়ে তারা পরস্পরের রক্তাক্ত হৃৎপিন্ডকে দেখতে পাচ্ছিল। সান্ত্বনা কিংবা সহানুভূতি দেখানোটাই ছিল তাদের সমস্যা।

অন্ধকারের ভেতর রামচন্দ্র একটু নড়ে উঠল। অন্ধকার থেকে ত্রস্ত স্বরে ডাকল : বৈদেহী।

রামের ডাক শুনে সীতা চমকে উঠল। একটা বড় নিঃশ্বাস বুকে চেপে মুখ তুলে তাকাল। মুখের কোন ভাবান্তর প্রকাশ করল না। আস্তে আস্তে রামচন্দ্রের দিকে হেঁটে গেল। বলল : ডাকছ? সহজ শোনাল সীতার গলা। কিন্তু চোখের কোণে তার জলের ফোঁটা টলটল করতে লাগল।

রামচন্দ্র ফিকে অন্ধকারের মধ্যে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। অনেকক্ষণ পর কণ্ঠে গাঢ় বেদনা নিয়ে বলল: বৈদেহী তুমি আমাকে এত আচ্ছন্ন করে রেখেছ যে রাজ্যের কোথায় কি ঘটছে কিছুই টের পাই না! কোন সিদ্ধান্ত নিতে গেলে তোমার ঐ সুন্দর মুখখানা আমাকে দুর্বল করে দেয়। তোমাকে ভালোবাসি বলেই আমি মন্দ কিছু দেখতে পাই না। আমার এই সর্বগ্রাসী ভালবাসাই রাজা রামচন্দ্রের জীবনের সবচেয়ে দুর্বলতা, বড় অভিশাপ। কিন্তু এ যে আমার কত বড় বন্ধন তা তোমাকে বোঝাতে

পারব না। বলতে পার সর্বগ্রাসী ভালবাসা আমার জীবনে পুরস্কার না হয়ে শাস্তি হয়েছে। বিশ্বাস কর, এই কঠিন দন্ড আমি আর বইতে পারছি না। আমার ভীষণ ভয় হয় তোমার জন্য। আমাদের জীবনে কিছু না কিছু একটা ঘটবে শিগগিরি।

রামচন্দ্রের কথা শুনে সীতা ভীষণ চমকে উঠল। ভয় পেল। তার প্রতিটি কথায় মনের অস্থিরতা গ্লানি যেমন প্রকাশ পেল, তেমনি চতুর ভাবে মনটাকে প্রেমের রসে ডুবিয়ে তার হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্য ব্যাকুল প্রত্যাশা নিয়ে চেয়ে রইল। সীতার মুখে রামচন্দ্র প্রত্যাশিত জবাবটি শোনার আগ্রহে উৎকর্ণ হয়ে রইল।

সীতা শান্ত। কোন চঞ্চলতা নেই। কেবল বুকের ভেতরটা কাঁপে, যেমন করে আলো কাঁপে, তেমনি করে। রামের কথায় যে এত যন্ত্রণা বেদনা আর অপমান লুকনো থাকতে পারে সীতা চিন্তা করার সুযোগ পায়নি। কথাগুলো উদ্দেশ্যপ্রসূত। রামের মতলব টের পায় সে। আগে রাম সম্পর্কে যা ভাবত এখন তা আর ভাবতে পারে না। তার স্বপ্নের রাজকুমার রূপকথার দেশে হারিয়ে গেছে। সীতার চোখের দৃষ্টি করুণ হল। অবশ্যম্ভাবী আঘাতে কিংবা কোন বৃহৎ শোকে চোখের চাহনিতে যেমন একটা ব্যথিত বিস্ময় লেগে থাকে অনেকটা সেরকম একটা বিস্ময়ে সে বিমূঢ় অন্যমনস্ক। চোখের দৃষ্টিতে তার কত প্রশ্ন। রামচন্দ্র এত নিষ্ঠুর হল কেন, এমন কথা বলল কেন, তার জীবনটা বা এরকম হল কেন? প্রশ্ন বা বিস্ময় কিছুই ফুরোয় না তার। যেহেতু এসব প্রশ্নের কোন অর্থ নেই, উত্তর নেই সেহেতু চুপ করে থাকে।

এ হল নারীর অদৃষ্ট। বিধাতার নিষ্ঠুর অভিশাপ। পৃথিবীর সব মেয়েকে স্বামীর স্বার্থ, সুখ-সুবিধা, ইচ্ছে অনিচ্ছের জন্য তিল তিল করে নিজেকে নিঃশেষ করে দিয়ে স্বামীর অনেক জুলুম, অধিকার, আদর্শ, নীতির ঋণ মেটাতে হয়। অপমানকে নিঃশব্দে বরণ করতে হয়। মেয়েমাত্র একথা জানে। তবু প্রতিবাদের সাধ্য তাদের নেই। থাকলে হয়ত অন্যরকম হত। তা যে হয় না মেয়েরা শুধু শরীরসর্বস্ব প্রাণী বলে। আর এই শরীরের মুখ চেয়ে পুরুষের সব অপমান অবিচার লাঞ্ছনা অত্যাচার নিঃশব্দে সহ্য করতে হয়। প্রতি মুহূর্ত পুরুষের কৃপা অনুগ্রহ নিয়ে বেঁচে থাকার বিড়ম্বনা যন্ত্রণা এবং কষ্ট ভোগ করে যে নারী সহিষ্ণুতার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সংসারে অপমান লাঞ্ছনাকে শিরোভূষণ করে বেঁচে থাকে, সে যথার্থ পতিব্রতা। অথবা যে মেয়ে মুখ বুজে মরতে পারে নিঃশব্দে, তার পরাজয় মেনে নিতে পারে, চুপি চুপি অধিকার থেকে সরে থাকতে পারে এবং তারপরেও স্বামীদেবতাকে ভজনা করে যেতে পারে প্রকৃতপক্ষে সেই নারী সতীলক্ষ্মী, আদর্শ নারী শিরোমণি। মুখ বুজে পুরুষের সব জুলুম অধিকাবকে মেনে নেওয়া নারীর অদৃষ্টলিপি। বিদ্যুতের মত কথাগুলো মস্তিষ্কের মধ্যে ঝিলিক দিল। মনটাকে যেন চিরে চিরে দিয়ে গেল। কোনদিন এরকম প্রশ্নচিহ্নের সামনে দাঁড়িয়ে গোটা জীবনের কথা ভাবতে হয়নি সীতাকে। আজ ভাবতে গিয়ে মনে হল, তার নিজের ভেতরে যে অন্ধকার রয়ে গেছে অনাবৃত হয়েই তার সামনে হাজির হল। সেই অন্ধকার এবং অজ্ঞতার সঙ্গেই তার লড়াই। নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করে এই অবস্থা থেকে বেরিয়ে এসে তবেই মুক্তি দাবি করতে পারে। কিন্তু দাঁড়ানোর জায়গা কোথায়? এই প্রশ্নে কিছুক্ষণ মুহ্যমান হয়ে থাকল। অনুভব করল, চারপাশে নিজের তৈরি কারাগার থেকে যদি মেয়েরা বেরিয়ে আসতে পারে তবেই মুক্তি। সে মুক্তি কেউ দেয় না। নিজেকে তার ব্যবস্থা করতে হয়।

ভেতরটা তার প্রতিরোধে শক্ত ও কঠিন হল। এক আশ্চর্য দৃঢ়তায় তাকে আরো সুন্দর ও উজ্জ্বল দেখাল। সুমিষ্ট গলায় বলল : আমার জন্য কষ্ট পাচ্ছ একথা শুনতে বুক ফেটে যাচ্ছে। নিজেকে শাপগ্রস্ত মনে করছ এরকম নিদারুণ সংবাদ কানে শোনার চেয়ে মৃত্যু অনেক ভাল ছিল। বুকের ভেতর ব্যথাটাকে চেপে চেপে কথাগুলো থেমে থেমে সীতা বলল। একটা ভীষণ কষ্টে তার চোখদুটো বসা ছিল। গোটা মুখখানাই শ্রান্তি আর অবসন্নতায় ভারী। চোখে কোন জল ছিল না। একটা তীব্র জ্বালায় যেন জ্বলছিল। ক্লান্ত ও গম্ভীর গলায় বলল : জান ঈশ্বর আমার কপালে সুখ লেখেনি। তুমি কি করবে? স্বামীর প্রিয় হতে না পারার মত বিড়ম্বনা মেয়েদের জীবনে আর কিছু নেই। তোমার অনুরাগের পাত্র যদি শূন্য হয়ে থাকে তবে অসম্ভব দুঃখে যন্ত্রণায় অবসাদে ক্ষতবিক্ষত হয়ে পরস্পরকে আঁচড়ে

কামড়ে, পরস্পরের রক্ত খেয়ে বেঁচে থাকা, পাশাপাশি বাস করার মত অপমান কিছু নেই। অধিকারের দড়িতে নিজেকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে অহরহ মুক্তি চাইবার আগে আমরা দুজনে দুজনকে মুক্তি দেব। তোমার কাছ থেকে তার প্রস্তাব এসেছে। কয়েকদিন ধরে নিজেকে তুমি প্রস্তুত করেছ, সিদ্ধান্ত নিয়েছ। সুতরাং তোমার মুখে সেই নিষ্ঠুর কথাটা শোনবার আগেই আমি তোমার কাছ থেকে ছুটি চাইছি।

নিজের অজান্তে সীতা সেখান থেকে সরে গেল। কক্ষসংলগ্ন খোলা বারান্দায় দাঁড়াল।

বাইরে বিচিত্র গভীর নৈঃশব্দ তার চারদিক থেকে ঘিরে ধরল। অন্ধকারে দেওদার গাছগুলো ভূতের মত দেখাচ্ছিল। আরণ্যক প্রকৃতিতে কোথায় যেন ভয় লাগানো একটা রহস্য লুকনো আছে। আবার সর্বব্যাপী একটা শুচিতায় কেমন স্নিগ্ধ, শান্ত, সুন্দর ও সমাহিত। কোন বেদনা নেই, বিক্ষোভ নেই, বিদ্রোহ নেই অশান্তি নেই, একেবারে নির্বিকার, নিঃশব্দ। দূরের পাহাড়, দেওদার বনে বড় বড় গাছের জঙ্গলে এমনই নিস্তব্ধ যে সেখানে একটি পাখিও ডাকে না, মৌমাছি গুঞ্জন করে না, প্রজাপতি ওড়েনা।

দূরে কোথাও সূর্যোদয় হচ্ছে। ঋষিরা এক বুক জলে দাঁড়িয়ে সূর্য প্রণাম করল। পাখির দল আতপ্ত প্রভাতে উড়ে গেল বন্দনা জানাতে, সোনালি মৌমাছিরা ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে এল প্রার্থনার আসরে। খোলা বারান্দায় প্রকৃতির মুক্ত রূপের মধ্যে নাক ডুবিয়ে সীতা জীবনের ঘ্রাণ নিল প্রাণভরে। চোখের তারায় তার সুন্দর তপোবনের দৃশ্য ভাসে।

বারান্দায় দাঁড়িয়ে সীতা প্রথম আঁচল দিয়ে চোখ মুছল। একা একা অন্ধকারে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদল অনেকক্ষণ। এখন তার বুকের ভার নেই আর। বেশ হাল্কা বোধ করল। ঘাড় ফেরাতে রামচন্দ্রকে দেখল। রামচন্দ্র তার পিছনে পিছনে বারান্দায় এসেছিল। সীতা টের পায়নি। চোখাচোখি হতে অন্যদিকে দৃষ্টি ফেরাল।

বহুদূর থেকে একটা রাতজাগা পাখির ডাক শোনা যাচ্ছিল। বেশ কষ্টে অন্ধকারে সে একাই ডাকছিল। একেবারে একা। তার ধারের কাছে সঙ্গী পাখিটাকে ডাকছিল। হয়ত ডেকে ডেকে তাকে কিছু বলছিল। কে জানে এত গভীর অন্ধকারের মধ্যে সে কাকে খুঁজে বেড়াচ্ছিল! রামচন্দ্রের মনে হল হয়ত ঐ পাখিটা সীতার মত কিংবা তার মতই বড় অসহায় বড় একা! একেবারে ভীষণ একা।

রামচন্দ্র ব্যাপারটাকে হাল্কা করার জন্য সীতার খুব কাছে এসে দাঁড়াল। অপরাধীর মত বিব্রত কণ্ঠে বলল: আচ্ছা তুমি কি ছেলেমানুষিটা করলে বলতো? রাগ করার মত কোন কথাই আমি বলেনি। তুমি খামকা আমাকে অনেকগুলো কথা শোনালে। আসলে তুমি, অনেক বদলে গেছ। তুমি আর সেই বৈদেহী নেই। এখন মানুষের কাছে তোমার একটা অন্য পরিচয় হয়েছে। তুমি আর রামচন্দ্রের পত্নী নও, অযোধ্যার লোকমাতা। এই কথাটাই বলতে এসেছিলাম। আমার ভালবাসার রত্ন, প্রেমের মানিক যাকে আমি গলায় পরি, বুকে রাখি; যে আমার সামান্য বিচ্ছেদটুকু সইতে পারে না, আমার কথার প্রতিবাদ করে না—তার ভালবাসায় এ কোন সর্বনাশের ইঙ্গিত!

এই অভিযোগের কোন জবাব দিল না সীতা। উজ্জ্বল দ্বিধাভরা দুইচোখে রামচন্দ্রের মুখের দিকে তাকাল। রামচন্দ্রের মুখের রেখার ভাষা, সীতা ভাল করেই পড়তে পারল। বুঝতে পারল। নরমে গরমে মেশানো রামচন্দ্রের কথাগুলো হৃদয় ধরে যেমন নাড়া দিল, তেমনি শ্লেষ বিদ্রূপের কশাঘাত মর্মস্থল পর্যন্ত জ্বালা ধরিয়ে দিল। ক্ষণিক দুর্বলতায় সে একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলল। স্বামী সংকটে পড়েছে শুনলে কোন স্ত্রী স্থির থাকতে পারে? সে তো আর দেবী নয়, রক্তমাংসের সাধারণ মানবী। মানুষের অভিমান, দুর্বলতা থাকে বলেই সে মানুষ।

তবু একটা অপরাধবোধে সীতার দুচোখের কোণে জল এল। অভিমানে ছাপিয়ে উঠল কণ্ঠস্বর। বলল: সারাজীবন আমাকে নিয়ে শুধু খেলেছ, তছনছ করেছ। আমার মন বলে যে কিছু আছে একটুও ভাবনি কোনদিন। তুমি কি পার না কয়েকটা দিন আমাকে একটু সুখী করতে? তোমার কি কোনো নিজস্বতা নেই? তুমি কি পাথর? প্রাণ বলে কিছু নেই তোমার?

রামচন্দ্র মুখ টিপে হাসল। তার দুই চোখে কৌতুক; ছাইছাই অন্ধকারে ভয়ংকর লাগল। আমাকে ক্ষমা করে দাও বৈদেহী। আমি তোমাকে বোঝাতে পারব না। আমি কারো চেয়ে মহৎ নই,ভাল নই

আমি শুধু অন্যরকম। আমার মতন আমি। তোমার কাছে আমার অনেক অপবাধ। নিজগুণে আমাকে মার্জনা করে দাও। দেবে যে, তাও জানি।

তোমার জানার অঙ্ক তো ভুল হতে পারে। যদি কোনোদিন আর তোমাকে ক্ষমা করতে না পারি। যদি...

থামলে কেন বল। তোমার নিজস্বতা নিয়ে তুমি তোমার পথে চললে আমি বাধা দেব কেন? আমার দ্বারা যখন সুখী হওয়া হল না তখন অন্য কারো দ্বারা হয়ো। আমি তো বলেছি তুমি তো আর রামচন্দ্রের পত্নী নও, মানুষের কাছে তোমার অন্য একটা পরিচয় হয়েছে।

ক্রোধে-অপমানে সীতার ভুরু কুঁচকে গেল। কণ্ঠস্বর একটু তীক্ষ্ণ শোনাল। বলল: জীবনটা নাটকের সংলাপ নয়। আমি যখন সন্তানের জননী হতে চলেছি তখন আমাকে তুমি মুক্তির পথ বাতলাচ্ছ। সত্যি! তুমি না কী? তোমাকে কিছুতে বুঝতে পারলাম না।

রামচন্দ্রের কোন চঞ্চলতা নেই। শান্ত ও স্থির। গম্ভীর গলায় নির্বিকারভাবে বলল: কেই বা কাকে বোঝে বল? বোঝা কি অত সহজ? বোঝাটা হয়তো বড় কথা নয়, বোঝার চেষ্টা চালিয়ে যাওয়াটা জরুরী। বুঝতে চাইলে একদিন নিশ্চয়ই বুঝবে।

কিছু বোঝার নেই আমার। আমাকে তোমার যে ভাল লাগে না আজকাল, সেটা বুঝি। তোমার মত বীরপুরুষের কাছে সেটা ভালবাসা ভালবাসা খেলা। এহেন প্রেমের বেদনা বিলাস করা তোমাকেই মানায়। আমার মত মন্দভাগ্য মেয়েরা চিরদিন তোমাদের ভালবাসার খাদ্য হয়ে জীবন কাটায়। তুমি তো আর মেয়ে নও যে, আমার মনের ভাব বুঝবে।

রামচন্দ্রের রাগ হল। কিন্তু মুখে হাসিটা বাঁচিয়ে রাখল। আস্তে আস্তে বলল : তোমার মনে ব্যথা দেবার কোন ইচ্ছে আমার নেই। সে উদ্দেশ্য নিয়ে আসিনি। আমার সম্বন্ধে তোমার সব অভিযোগ মেনে নিলাম। তোমার স্বামী একটা অপদার্থ, কাপুরুষ এবং বাজে লোক। তুমি তাকে খরচের খাতায় লিখে রেখেছ। কিংবা সে হারিয়ে গেছে তোমার মন থেকে। কিছু বলার নেই। এককথার চর্বিত চর্বণ করতে আমার ভাল লাগে না।

সামান্যক্ষণ চুপ করে রামচন্দ্র বলল : তোমাকে একটা কথা জানানো খুব জরুরী। দুর্মুখ গোপনে জেনেছে এই রাজপ্রাসাদের আঁশেপাশে একজন লোক ছদ্মবেশে ঘোরাঘুরি করে। প্রহরীদের কাছে সে সীতা মায়ের খোঁজ নেয়। তোমার সঙ্গে তার দেখা করা নাকি খুব জরুরী।

সীতা এমনিতে রামের কথায় খুব বিরক্ত হয়েছিল। বেশ একটা বড় নিঃশ্বাস ফেলে চুপ করেছিল। মুখখানা থম থম করছিল। রামচন্দ্রের কথা শুনে তার খুব আশ্চর্য লাগল, ভয়ও হল। মুখখানা মুহূর্তে শুকিয়ে গেল। লোকমাতা বলে রামচন্দ্রের ব্যঙ্গ করার হেতু এতক্ষণে বুঝল। ভয়ে ভয়ে রামচন্দ্রের দিকে তাকাল। রামচন্দ্র তাকে সন্দেহ করছে কি? শবরীকেও সন্দেহ করেছিল। সন্দেহ কি রামের একটা বাতিক হয়ে দাঁড়াল? একজন মানুষ অন্যজনকে তখন সন্দেহ করে মনটা যখন তার ছোট হয়ে যায়। রামচন্দ্র কি এত নীচে নেমেছে? নিজের স্ত্রীকেও তার অবিশ্বাস। এমন হলো কি করে? রামচন্দ্রের সন্দেহ প্রবণতার সুযোগ নিয়ে কেউ হয়তো তার উপর প্রতিশোধ নিচ্ছে। কিন্তু তার তো কারো সঙ্গে শত্রুতা নেই। তা হলে তারা শত্রুর চোখে দেখছে কেন তাকে? এমন সর্বনাশ করছে কেন তার? এই জিজ্ঞাসায় মনটা তোলপাড় করল বেশ কিছুক্ষণ। ভুরু কুঁচকে গেল। চোখদুটো বড় বড় হয়ে উঠল আপনা আপনি। বেশ একটা বড় নিঃশ্বাস পড়ল। মুখের চেহারায় বিরক্তির ভাব ফুটে উঠল। রুক্ষ গলায় বলল: যত সব বাজে কথা। গুপ্তচরের মুখে এসব বানানো রসাল গল্প শুনতে তোমার ইচ্ছে হয়? তোমার নিজস্বতা কিছু নেই?

রামচন্দ্র একটু হাসল। স্পষ্ট করে বলল : শম্বুক। শম্বুককে চেন না?

সীতার মুখখানা মুহূর্তে শুকিয়ে গেল। ভয়ে ভয়ে তাকাল রামচন্দ্রের দিকে। বলল: শূদ্রক শম্বুককে আমি চিনি। অগ্নিমুনির আশ্রমে যখন আমায় রেখেছিলে তখন তার সঙ্গে হঠাৎ পরিচয় হয়। সে একটা গল্প। নদীর ধার চিরদিনই আমার বড় প্রিয়। এই নদীর তীরে বসে নিজের মনে সুখ-দুঃখের কত গল্প করি। মাঝে মাঝে প্রশ্ন করি, দুঃখ, সুখ ছাড়া মানুষের আর কি অনুভূতি আছে। সে অনুভূতির

নাম কী? আচ্ছা দুঃখ নেই, সুখও নেই সেই অবস্থাকে কী বলে? নদী নিশ্চুপ। কোন শব্দ নেই। তোমার জন্য মনটা কেমন করছিল। আনমনে নদীর ধার ধরে হাঁটছিলাম। ভেতরটা তীব্র ব্যথায় টনটনিয়ে উঠছিল। হঠাৎ সমস্ত নিস্তব্ধতাকে বিদীর্ণ করে একটা ক্ষুধিত হিংস্র ভল্লুক আমার দিকে তেড়ে এল। বুকের মধ্যে জমা আতঙ্ক হঠাৎ আবর্তিত হতে হতে গলা থেকে একটা প্রচন্ড আর্তস্বর বেরিয়ে এল। বনভূমি কেঁপে উঠল। আমার কণ্ঠস্বরে স্তব্ধতা বিদীর্ণ হল। জ্ঞান হারানোর আগে দেখলাম, ভল্লুকের দুই ভুরুর মাঝখানে তীর মেরে এক কৃষ্ণাঙ্গ যুবক আমার ভয় ভাঙাবার জন্যেই দারুণ উল্লাসে অট্টহাসি করছে। তার দুরন্ত হাসিতে আমার ভয় কাটল, কিন্তু কিছুক্ষণের জন্যে সংজ্ঞা হারালাম। জ্ঞান ফিরলে যুবক বলল, জননী, অধম সন্তান তোমাকে রক্ষা করতে পেরে ধন্য হয়ে গেছে। এখন আদেশ করলে তোমাকে কুটিরে পৌঁছে দিতে পারি।

রামচন্দ্র নীরব।

সীতা বেশ একটা খুশির মেজাজ পেল। কৌতুক চোখে সবিস্ময়ে তার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল : কোথায় সেই ছেলে? কবে এসেছিল? কেন এসেছিল আমাব খোঁজে? কিছু বলেছে? তুমি কি দেখেছ তাকে? ছেলেটি বেশ লম্বা, কৃষ্ণবর্ণ, সুঠাম তনু, সুন্দর মুখশ্রী। দেখলে ভীষণ মায়া হয়।

রামচন্দ্র অদ্ভুত দৃষ্টিতে সীতাকে দেখতে লাগল। বলল : তোমার বর্ণনার সঙ্গে অবিকল মিলে যাচ্ছে।

গভীর দীর্ঘশ্বাস পড়ল সীতার। বলল : বহুকাল পরে সেই শম্বুক আমার কাছে এল, অথচ, তাকে তোমরা আমার কাছে আসতে দিলে না। আশ্চর্য! কতদিন তাকে দেখি না। বড্ড ভাল ছেলে। ভীষণ দুঃসাহসী। পরোপকারী। বড় বেশি স্পষ্ট আর আত্মসচেতন। নিজের উপর ভীষর আস্থা। অফুরন্ত প্রাণপ্রাচুর্যে ভরা এক দুরন্ত যৌবন তার। ঝরনার মত উচ্ছল। বুনো ঘোড়ার মত তার তেজ। তাকে দেখলে শ্রদ্ধা হয়। আবার ভয় হয় ভীষণ। এমন ছেলের সম্পর্কে ইতর উক্তি দুর্মুখের মত লোকের মুখেই মানায়। কে রেখেছিল ওর দুর্মুখ নাম?

রামচন্দ্র গম্ভীর হল। মনে মনে একটু বিরক্তও হল। কিন্তু রাগল না। সীতার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ বুঝল এই আবেগের সদব্যবহার তার জরুরী। গম্ভীর হয়ে কথা বললে আর অভিযোগ করলে তার মনের দরজায় পৌঁছনো যাবে না। বরং বাজে গল্পেই সীতাকে বেশি করে ভোলানো সম্ভব।

বিয়ের পর কত অর্থহীন গল্প গুজবে, আলাপে রাত কেটেছে। সে সব কথা মনে পড়লে প্রলাপ বলে মনে হবে। কিন্তু তবু সমস্ত রাতভোর দু'জন মুখোমুখি বসে গল্প করেছে। সে গল্পের কোন প্রয়োজন ছিল না সেদিন, কিন্তু আজ তার সঙ্গে গল্প করাটা খুব প্রয়োজন।

রামচন্দ্র কথার উত্তর না দিয়ে কক্ষে ঢুকল। ঘরের আলোটা একটু উস্কে দিল। সীতা দোরের কাছে দাঁড়িয়ে রইল। কিছুক্ষণ। রামচন্দ্রের ব্যবহারটা তাকে বেশ অবাক করেছিল, কিছুটা আহতও করেছিল। গম্ভীর মুখে দোরগোড়ায় কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। তারপর ধীরে ধীরে ভেতরে ঢুকল। পালঙ্কে বসল। রামচন্দ্রও হাসতে হাসতে সীতার পাশে গিয়ে বসল। বলল : সারাক্ষণ ধরে মিছে মিছে আমার সঙ্গে শুধু ঝগড়াই করলে। আজে বাজে কথায় সময়টা শুধু বাজে খরচ হল। তাই এখন ভীষণ ইচ্ছে করছে তোমাকে একটু আদর করি। একটু চুমু খাই।

রামচন্দ্রের কথা সীতার বুকের ভেতরটা থরথর করে উঠল। চোখের পাতা দুটো বিস্ময়ে আবেগে কেমন যেন স্বপ্নালু হয়ে উঠল। কিন্তু তার শরীরটা অস্বস্তিতে আর সংকোচে কিছুটা শক্ত হয়ে রইল। একটা সীমাহীন বিরক্তিতে শরীর মন সংকুচিত হল। ইচ্ছে করেই রামের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখল নিজেকে।

রামচন্দ্র সীতাকে একদৃষ্টে দেখছিল। কিন্তু একবারও সীতা তার দিকে তাকাল না। রামচন্দ্র সীতার মনোযোগ কাড়ার জন্য বলল : কি গো রাগ করলে? কথা বলবে না?

সীতা নরম গলায় বলল : ইচ্ছেটাই মরে গেছে। তুমি সব তেতো করে দিয়েছ। একটুও ভাল লাগছে না।

রাম হাসি হাসি মুখ করে বলল : নারী-পুরুষের এরকম ঝগড়া লেগেই থাকে। এতো নতুন কিছু নয়। পিতৃতান্ত্রিক মাতৃতান্ত্রিক সমাজের দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্বই নারী-পুরুষের জীবনকে সুন্দর করে। দুজনের

বিরোধে মাঝে মধ্যে এমন অবস্থা হয় যেখানে পুরুষ বলে, হে নারী প্রেম দাও, আর নারী বলে ওগো পুরুষ তোমার প্রেমে আমাকে ডুবিয়ে দাও, ভাসিয়ে দাও। নারী-পুরুষের সম্পর্কের মধ্যে এরকম একটা বিরোধভাব না থাকলে জমে না।

সীতা চুপ করে রইল। রামের বিস্ময়ের চেয়ে তার খুশি খুশি উচ্ছল আচরণটাই বেশি অবাক করল। নিজেকে সংযত করে আস্তে আস্তে বলল: লোকমাতা বলে আমাকে ঠাট্টা করার কারণ কি জানতে পারি? এটা কি খুব প্রেমের ভাষা। বাহাদুরির কথা?

দুর্বল স্বরে রামচন্দ্র বলল : কিন্তু এ কথায় তোমার রাগ হল কেন, জানতে পারলে আমারও জবাব দেওয়া সোজা হত।

সীতার মসৃণ কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমল। আঁচল দিয়ে কপালের ঘাম মুছে রামের দিকে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। কথা বলতে গিয়ে ঠোঁট দুটো একটু কাঁপল। নরম গলায় বলল : এখনও পর্যন্ত মা হতে পারলাম না। কেবল মা হতে যাচ্ছি। অথচ তুমি আমাকে লোকমাতা বলে ব্যঙ্গ করলে। লোকমাতা হওয়ার মত যোগ্যতা আমার কতটুকু? কি এমন কাজ করলাম যে, লোকমাতা বলে উপহাস করছ? বলতে বলতে সীতা অশ্রুরুদ্ধ হল।

রামচন্দ্র চমকে তাকাল, সীতার চোখের কোণ বেয়ে টপ টপ করে জল পড়ছিল। অবাক হয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। ভাবতে খুব আশ্চর্য লাগছিল যে, অযোধ্যার দক্ষিণাংশে তমসা নদীর তীর ধরে যতদূর অগ্রসর হয়েছে, যত অঞ্চল ঘুরেছে সর্বত্রই শুনেছে শূদ্রক রাজকুমার শম্বুকের সুনাম ও খ্যাতি। বুদ্ধিমান, সুদর্শন, অক্লান্ত কর্মী শম্বুকের জীবনকাঠির যাদুস্পর্শে, বিচিত্র নেশায় লক্ষ লক্ষ মানুষের স্তিমিত প্রাণে হঠাৎ যে আবেগ সঞ্চার হয়েছে তা শত শত বছরের পুঞ্জীভূত অন্ধকার ভেদ করে প্রতিটি আদিবাসীর প্রাণে দেশপ্রেমের পরম গৌরববোধকে উদ্ভাসিভ করে তুলেছে। তারা যে, মানুষ হিসাবে কারো চেয়ে ছোট নয়, হীন-নীচ অধম নয় এই চেতনাটুকু সীতার কাছে পেয়েছিল। মানুষের অধিকার মর্যাদা নিয়ে সকলের সঙ্গে সমান অধিকারে বাঁচার স্বাধীনতা তাদেরও আছে। এই বড় আদর্শের আলো তাদের জীবনধারা বদলে দিল। প্রাণরক্ষাকারী শম্বুকের প্রতি তীব্র সহানুভূতি আর সমবেদনার টানে সীতা দুঃখী শূদ্রক জাতির জীবনধারার খুব কাছাকাছি এসে পড়েছিল। কোমলপ্রাণা সীতার সহজাত দয়া মায়া মমতা করুণা সহানুভূতি দুঃখ কাতরতা তাদের প্রতি শুধু সমবেদনাই দেখিয়েছিল। কিন্তু এতে যে কোন রাজনৈতিক সংকট সৃষ্টি হতে পারে একথা ভাবেনি সীতা। কিন্তু তার সমবেদনা, জীবন সম্পর্কে তার নিজস্ব ভাবনাগুলোকে শম্বুক শূদ্রকদের জীবন গঠনের কাজে লাগাল। রাজশক্তির সঙ্গে জনদাবির সংঘাতের এক ক্ষেত্র তৈরি করল। গভীর অরণ্যে আদিবাসী শূদ্রকদের বিদ্রোহের সঙ্গে এই সম্পর্কের সূত্র ধরে অযোধ্যায় এক নতুন রাজনৈতিক সংকট সূচনা হল। এমনিতে অযোধ্যায় তার রাজকীয় সম্বর্ধনা, দিগ্বিজয়ের আনন্দোৎসব এবং আড়ম্বরের জন্য যে বিপুল অর্থ ব্যয় হয়েছিল তা বিরোধীরা খুব সুনজরে দেখেনি। ভরতের কৃচ্ছ্র সাধনে দেশে যে সম্পদ ও সমৃদ্ধি সূচনা করল এবং গোটা রাজ্যে যে আর্থিক স্বাচ্ছল্যের মুখ জনগণ দেখল তা থেকে রামচন্দ্রই তাদের বঞ্চিত করল এরকম একটা অপপ্রচারে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করা হল। রামচন্দ্রের প্রতি সাধারণ লোকের অবজ্ঞা ও ঘৃণার ভাব প্রকাশ পেল। শম্বুকের বিদ্রোহ তাদের অশ্রদ্ধাকে শুধু উস্কে দিল।

শম্বুকের বিদ্রোহের সঙ্গে সীতার মত নিষ্পাপ ফুলের মত সুন্দর কোমলপ্রাণা নারীও বিরোধীদের কুনজর থেকে রেহাই পেল না। সীতা সম্পর্কে একটা ভুল ধারণা সৃষ্টি করে তারা রামচন্দ্রের গৌরবকে হেয় করার পন্থা নিল। রামচন্দ্রের উপর তাদের বিরূপতা ও বিদ্বেষের প্রতিশোধ নিতে সীতাকেই অস্ত্র করে তুলল। আড়ালে সীতাকে নিয়ে লোকে হাসে। নানারকম অপ্রাসঙ্গিক, অসম্মানজনক গল্প করে। সীতা জনকের ঔরসজাত কন্যা নয়, পালিত কন্যা। মিথিলার এক চাষী ব্রাহ্মণ ক্ষেতে লাঙল দিতে গিয়ে সদ্যোজাত পরিত্যাক্ত একটি শিশুকন্যাকে তাম্রাধারে ক্রন্দনরত অবস্থায় পেয়েছিল। দরিদ্র ব্রাহ্মণ জনকরাজাকে অজ্ঞাতকুলশীলা ঐ শিশুকন্যাকে অর্পণ করল। জনকরাজার ঐ পালিতা কন্যা সীতার সঙ্গে রামচন্দ্রের বিবাহ হল। কুলশীলমানে সীতা রাজবধূ হওয়ার উপযুক্ত কি না এক শ্রেণীর প্রজাকুলের ভেতর তার সংশয় এখন তীব্র। সীতার রূপ যৌবনে রামচন্দ্র এত তীব্র আসক্ত যে দীর্ঘকাল

পরপুরুষের গৃহে বসবাস সত্ত্বেও তার শুচিতা সম্পর্কে একটুও সন্দিহান নয়। এই ধরনের অজস্র কুৎসা ও অপপ্রচারে রামচন্দ্রের সম্মান এবং অযোধ্যার রাজপরিবারের গৌরব একশ্রেণীর মানুষের দ্বারা ক্ষুণ্ণ ও বিপন্ন হচ্ছিল। দুর্মুখের মুখে এইসব বৃত্তান্ত প্রতিদিন শুনতে শুনতে রামচন্দ্রের মনটা তেতো হয়ে গেল। শুধু রক্তচক্ষুর শাসনে এই সব অপবাদ কুৎসা বন্ধ হয় না। এই ধরনের নির্যাতনে, অত্যাচারে শান্তিও ফিরে আসে না। সমস্যার সমাধানও হয় না। বরং রাষ্ট্রদ্রোহের মত গুরুতর রোগের উপসর্গগুলো প্রকাশ পায় মাত্র। ব্যাধির মূল শিকড়টা উৎপাটিত করাই হল প্রতিপক্ষকে হারানো এবং নির্মূল করার শ্রেষ্ঠ উপায়। রামচন্দ্র জনগণের শুধু একজন নৃপতি নয়, প্রজানুরঞ্জক রাজা, সে একটা আদর্শ শক্তি এবং প্রত্যাশা। সীতা ও শম্বুককে জড়িয়ে তার প্রত্যাশা আদর্শ ও শক্তির সঙ্গে নিয়ে সংঘাত বেঁধেছে। তার ঝড় বুকে নিয়ে সীতার মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে।

বলিষ্ঠ উষ্ণবীর্য পুরুষ জীবনের যে বিরাট অংশ সীতার সন্ধ্যাদীপশিখার মত স্নিগ্ধ ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে পূর্ণ হয়েছিল হঠাৎ বিনা পরোয়ানায় সেখানে একটা দুরন্ত দুঃসহ শূন্যতা সৃষ্টি হল, এই অনুভূতিটা রামচন্দ্রকে পীড়া দিচ্ছিল। রামচন্দ্র, প্রজানুরঞ্জক রাজা, শুধু এই নামের মোহে সীতার স্নিগ্ধ অস্তিত্বকে প্রবল ধাক্কায় বহুদূরে সরিয়ে দেবার জন্য নিজের মনকে প্রস্তুত করে রেখেছিল। রামচন্দ্র বুঝতে পারছিল সীতার আকর্ষণ যত দুর্নিবার হোক, যত উন্মাদনাই তার প্রেমে থাকুক তারচেয়েও বড় অনেক বেশি মূল্যবান তার নিজের পদমর্যাদা এবং গৌরব। সহজাত বাস্তববুদ্ধি দিয়ে রামচন্দ্র বুঝেছিল তার সম্পর্কে যত কুৎসা, অপবাদ ও মিথ্যে প্রচার থাকুক না কেন, তাকে ঢাকার জন্য এমন কোন আলোর প্রয়োজন যা জনচক্ষে তার জীবনকে অভিনব গৌরবে উদ্ভাসিত করবে। একমাত্র সীতার নির্বাসনের বিনিময়েই লোকের চোখে সে সার্থক পুরুষ হয়ে উঠতে পারে। এই সার্থকতার মধ্যে হয়তো অনেক ফাঁক ও ফাঁকি থাকবে। তবু রামের মনে হল, অন্যায় অবিচার স্খলন পতন এবং সার্থকতা নিয়ে সে একদিন প্রজাপুঞ্জের খুব কাছে পৌঁছে যাবে।

এত কথা রামচন্দ্র এক লহমায় চিন্তা করল। মনের ভেতর তার ঝড়। তবু যথাসম্ভব নিজেকে শান্ত সংযত ও স্থির রাখল। সীতার দিকে তাকাতে একটা বড় নিঃশ্বাস পড়ল। ভেতরের সব উদ্বেগ নিশ্বাসের সঙ্গে বেরিয়ে যাওয়াতে সে সহজ ও স্বাভাবিক হল। সমস্ত ব্যাপারটাকে হাল্কা করার জন্য এবং নিজেকে সীতার কাছে মেলে ধরার জন্য বলল : কথা বলা আমার সত্যিই দোষের হয়েছে। এত বড় একটা বিশেষণে তুমি চটে যাবে জানলে এমন সুন্দর রাত্রি কখনও নষ্ট করতাম? তারপর সীতার খুব কাছে সরে এসে চোখের উপর চোখ রেখে বলল : বিয়ের পর এত রাগতে তোমাকে দেখিনি। ঘটনাচক্রে সেটা দেখা হয়ে গেল। হাসি হাসি মুখ করে বলল : কাঁদলে তোমাকে ভীষণ সুন্দর লাগে।

সীতার মনটা নরম হল। বাঁ হাতে কপালের চুল সরিয়ে রামের দিতে তাকাল। মুখখানা থমথমে। কিন্তু বৃষ্টিধোয়া আকাশের মত শুচিতায় শুভ্রতায় মনোরম আর স্নিগ্ধ। কথা বলার জন্য ঠোঁট দুটো কাঁপছিল। নীচের ঠোঁটটা কামড়ে ধরে সে চুপ করে রইল কিছুক্ষণ। তারপর বলল : বুঝলাম।

কিন্তু কথা এগোয় না। রামচন্দ্র একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল। রামচন্দ্রের মনের ভেতর কথাগুলো যেন পাকিয়ে পাকিয়ে জট বেঁধে যেতে লাগল। অব্যক্ত এত প্রশ্নের চাপে মাথার ভেতরটা তার ঝিম ঝিম করতে লাগল। অথচ অনেক কথা অনেক কৌশল একসঙ্গে তার মনে ভিড় করে এল। বলল: আমাকে একটু জল দেবে বৈদেহী?

সীতা জল এনে দিল। তার মুখের ভঙ্গিটা মৃদু হাসিভরা সংকোচে ভরে উঠেছিল। রামচন্দ্র কৌতুক অনুভব করে হেসে ফেলল। ঢক্ ঢক্ করে জলের পাত্র নিঃশেষ করে বলল : বড় তৃপ্তি দিলে।

সীতা মুখ ফিরিয়ে হাসল। বলল : তাতে আমার লোকসানটাই বাঁচল।

কিন্তু আমি ষোল আনা লাভটা পেলাম। বলল রামচন্দ্র।

সত্যি বলছ? সীতার দুই চোখে কৌতুক ও আনন্দ যেন একসঙ্গে ঝিলিক দিল।

রামচন্দ্রের মুখে সেই অনির্বচনীয় রহস্যময় হাসি। বলল: সত্যি বলছি। আমাকে বিশ্বাস কর।

সীতা একটু ভয় পেয়েই প্রশ্ন করল : একথা বলছ কেন?

রামচন্দ্রকে সহসা খুব চিন্তিত দেখাল। বলল : একটা গুজব শুনছি। তাতে মন ভারী হয়ে আছে।

কিসের গুজব?

গুজবটা শম্বুককে নিয়ে।

সেও গভীর অরণ্যের একটি ক্ষুদ্র অঞ্চলের রাজপুত্র। তাকে নিয়ে দিগ্বিজয়ী অযোধ্যা নরপতির তো কোন দুশ্চিন্তা থাকার কথা নয়।

কথাটা এমন শান্তভাবে জোর দিয়ে উচ্চারণ করল সীতা, যে রামচন্দ্র রীতিমত স্তব্ধ হয়ে গেল। কিন্তু ভিতরে ভিতরে একটা দুরন্ত রাগে তার সর্বশরীর জ্বলতে লাগল।

রামচন্দ্র কোন কথা বলার আগে সীতা পুনর্বার প্রশ্ন করল : শম্বুক মোটেই ভাল লোক নয়।

সীতার সরল জিজ্ঞাসা। কেন? সে আবার কি করল? তার অপরাধ কি?

তার অঞ্চলের মানুষ শুধু নয়, অযোধ্যার আদিবাসী চাষী, মজুরকে সে ক্ষেপিয়ে তুলছে আমার বিরুদ্ধে।

ওঃ। এই জন্যই সে লোক ভাল নয়!

হ্যাঁ। তার চরিত্র খারাপ।

মিছে কথা।

গোটা আর্যাবর্তের লোক বলছে।

ও তাই বল। আর্যাবর্তের লোক আর তোমরা তো একই ব্যক্তি, একই জাতি, একই ধর্ম ও ভাষার মানুষ। কিন্তু আমি বলছি, নিজেদের স্বার্থ বিপন্ন হওয়ার জন্য তারা শম্বুকের নামে মিথ্যে কুৎসা রটাচ্ছে। অযোধ্যার মত বিশাল সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার মত জনবল অর্থবল, সৈন্যবল, অস্ত্রবল থাকলে তবেই তো সে বিদ্রোহী হবে। কিন্তু শম্বুকের দেশে আছে কি? বিশাল অযোধ্যার অন্তর্গত একটা ক্ষুদ্র অঞ্চল অযোধ্যার নরপতির কাছে তাদের কিছু দাবিদাওয়া থাকতে পারে। কিন্তু তাকে বিদ্রোহ বলে না।

রামচন্দ্র এবার ভয়ানক রেগে গিয়ে বলল: তুমি যা জান না, বোঝ না, তা নিয়ে কথা বল না।

আমি তো আর আগ বাড়িয়ে কথা বলতে যাইনি। কিছু কর্তাভজা আর স্তাবক তোমাকে খুশি করতে যা বলেছে এবং বুঝিয়েছে তাতে তুমি উদ্বিগ্ন ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়েই কথাটা বলেছ। মনে রেখ, ওরা কেউ তোমার মঙ্গল চায় না। তোমাকে সন্তুষ্ট করে স্বার্থসিদ্ধি করা ওদের লক্ষ্য। কিন্তু তোমার সঙ্গে আমার প্রাণের সম্পর্ক, ভালবাসার, মঙ্গলের এবং কল্যাণের। আমার চেয়ে বেশি তোমার কেউ ভাল চায় না। একথাটাকে বিশ্বাস কর। শম্বুককে আমি ভাল করেই জানি। সে মহাপ্রাণ আদর্শবাদী স্বদেশপ্রেমিক যুবক। নিজের গোষ্ঠীর মানুষ তার ধ্যান জ্ঞান। স্বজাতি এবং স্বদেশের ভাল চায়। বাপ-মায়ের একমাত্র ছেলে। ভাল ঘরের ছেলে। ধনদৌলত স্নেহ প্রেম, বিলাস, সুখ সব ত্যাগ করে নিরস্ত্র দুঃখী দুর্গত অত্যাচারী মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে। দারুণ অন্নাভাবের দিনে নিজেদের শয্যাভান্ডার সে উন্মুক্ত করে দিয়েছে। তার কোন লোভ নেই। সে চায় মানুষের কল্যাণ। দেশের ভাল। এজন্যেই কি তার নামে দুমুর্খের মত লোকেরা দুর্নাম আর কুৎসা রটিয়ে আর্যাবর্তের মানুষের মন বিষিয়ে তুলছে।

তুমি এত কথা জানলে কি করে?

শুধু আমি কেন? তুমি জান না? এই ছেলেটার পিছনে কেন লেগেছে? তুমি তো প্রজানুরঞ্জক রাজা। শম্বুক' তো তোমারও প্রজা। রাজার কাছে তার আর্জি থাকতে পারে না? অভাবের কথা, দুঃখের কথা, বঞ্চনার কথা, অধিকারের কথা—জানানো কি অপরাধ তার?

তুমি তো দেখছি তার একজন বিরাট ভক্ত এবং সমর্থক। এত কথা জান অথচ এটুকু জান না, সে আমার শত্রু।

সীতা এবার সত্যিই অবাক হল। চমকে প্রশ্ন করল : শ-অ-ত্রু-উ! তোমার! মৃদু হাসিতে অধর একটু বেঁকে গেল। বলল: সে তোমার শত্রু হবে কেন? তার আছে কি? সাহস আত্মবল আর নির্ভয় অন্তর এটুকুই তো তার সম্বল। এ নিয়ে রাজার বিরুদ্ধে কেউ লড়াই করে? সসাগরা অধিপতি রামচন্দ্রের প্রতিপক্ষ হওয়া কি মুখের কথা? উন্মাদেরও এত স্পর্ধা হয় না?

জানি না। তবে আমার বড় শত্রু সে। আমার প্রবল প্রতিপক্ষ।

প্রতিপক্ষ হলেই বুঝি শত্রু হয়? আমি তো অনেক বিষয়ে তোমার সঙ্গে একমত হতে পারি না। তোমার বিরুদ্ধাচারণ করি। তোমার উপর রাগ করি। কাঁদি। অভিমান করি। তা হলে আমিও তোমার প্রতিপক্ষ। কিন্তু শত্রু কি?

তোমার কথা আলাদা। কিন্তু সে আমার মারাত্মক শত্রু। আদিবাসীদের ক্ষেপিয়ে তুলছে। তাদের নিজের ঘরে ফেরার ডাক দিয়েছে। সরল নিরীহ মানুষগুলোকে কুবুদ্ধি দিয়ে তাদের মনে অযোধ্যার বিরুদ্ধে বিদ্বেষ বিষ ছড়াচ্ছে। বলছে: রামচন্দ্র অনার্য এবং আদিবাসীদের কেউ নয়। সে আর্যদের রাজা। অযোধ্যা আর্যাবত আর আর্যজাতির উন্নতি সুখ-স্বচ্ছন্দ্য সমৃদ্ধি দিন দিন বাড়িয়ে তুলছে। অথচ জঙ্গলের মানুষদের জন্য কিছু করছে না। তাদের দারিদ্র্য দুঃখ অভাব শুধু বাড়ছে। কিন্তু আর্যদের ঘরে কোন অভাব হাহাকার নেই। ক্রীতদাসের মত জীবন যাপন করছে তারা। রাজার সৈন্যবাহিনী ভারী করাই তাদের কাজ। নির্মূল করার জন্যেই তাদের শুধু যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠানো হয়।

সীতা বেশ কিছুক্ষণ গম্ভীর হয়ে রইল। তারপরে ধীরে ধীরে বলল : রাজা তুমি' তো অবিবেচক নও। মানুষের বিবেক হল শ্রেষ্ঠ বিচারক। তার কাছে নির্দোষ থাকলে পাপ স্পর্শ করে না, চিত্তও বিচলিত হয় না। স্বামী, মানুষের নিত্য বঞ্চনা চিত্তক্ষোভ চিরদিন চাপা থাকে না। তুষের আগুনের মত ভেতরে ভেতরে জ্বলে। হঠাৎ একদিন দপ করে জ্বলে ওঠে। এসব কথা তো জান। এই অপবাদ সংশয়ে তোমার কোন গৌরব বাড়ছ না। বরং অব্যক্ত সত্য প্রকাশ পাচ্ছে। তুমি নিরুত্তর থাকলে মানুষের সংশয় সন্দেহ শুধু বাড়বে। শম্বুককে ডেকে তার কথা শুনলে তোমার অপমান হবে না, বরং তোমার সততা আন্তরিকতা দরদ বেশি করে প্রকাশ পাবে। যথার্থ প্রজানুরঞ্জক রাজার ধর্ম কিন্তু তাই।

একেই বলে স্ত্রীবুদ্ধি। রাজনীতি বড় কঠিন খেলা। রাজনীতিককে সমস্যা জীইয়ে রাখতে হয়। সমস্যা সহজে মিটিয়ে ফেললে দাবি বেড়ে যায়। দাবি মেটানো যখন অনিবার্য হয়ে পড়ে, যখন না করে উপায় নেই তখন এমনভাবে করতে হবে যাতে প্রতিপক্ষ দুর্বল ও পঙ্গু হয়ে পড়ে, অল্পতে তুষ্ট হয়। রাজনীতির গোড়ার কথা হল প্রতিপক্ষকে সমস্যার পাকে পাকে, ফেরে ফেরে জড়িয়ে একেবারে কাবু করে তাকে হারানো। রাজনীতিতে প্রতিপক্ষকে নির্মূল করাই রাজধর্ম। তবেই রাজার মান সম্মান গৌরব অটুট থাকে।

সীতাকে স্তম্ভিত ও চিন্তিত দেখে রামচন্দ্র পুনরায় মৃদু হেসে বলল : শম্বুক মহাবল দানবের মত আমার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে চাইছে। মানবিক দৃষ্টিতে এটা দোষের কিছু নয় কিন্তু রাজনীতিতে ভয়ংকর অপরাধ। এটা রাজদ্রোহিতা। রাজদ্রোহীকে ধ্বংস করে জনতাকে জয় করা এবং তাদের ভুল ধারণা বিভ্রান্তিগুলো দূর করে বিরুদ্ধাচরণের মোহগুলো কাটিয়ে তোলা এবং বিদ্রোহের কোন অংকুর থাকলে তাকে ধ্বংস করাই হল রাজার রাজনীতি। এসব জটিল খেলা তুমি বুঝবে না। তবে জ্ঞান থাকা ভাল। বিশৃংখলাকে এক চরম পর্যায়ে এনে কূট রাজনীতির খেলায় যে রাজা জেতে সেই কীর্তিমান।

রামচন্দ্রের মুখে সাফল্যের প্রত্যয় তৃপ্তির মৃদু হাস্য এমন এক অব্যয় অভিব্যক্তিতে রূপায়িত হল যে সীতার অন্তঃকরণটা বারংবার আতঙ্কে শিহরিত হল।

সে মুহূর্তে তাদের আর কোন কথা হল না।

সীতা নিঃশব্দে খাটে গিয়ে শুয়ে পড়ল।

অন্ধকার ঘরে পাশাপাশি দুজন শুয়ে। কিন্তু কেউ কাউকে ছুঁয়ে নেই। দুজনের মাঝখানে বেশ একটা ফাঁক।

রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘরের অন্ধকার আরও ঘন হয়ে এল। কিছুক্ষণ আগে সীতার অতৃপ্তির ভাবনাটা ফিকে হয়ে এল। কেমন একটা ঘুম ঘুম ভাব চোখে নামল। বিরাট একটা হাই তুলে সীতা বলল: ঘুমোচ্ছ?

রামচন্দ্র পাশ ফিরল সীতার দিকে— কেন?

আমাকে কিছুদিনের জন্যে একটু কোথাও পাঠিয়ে দেবে? বড্ড ক্লান্ত আর একঘেয়ে লাগছে।

রামচন্দ্র ঠিক এরকম একটা মুহূর্তের প্রতীক্ষা করছিল। জানত, বিষণ্ণ মন নিয়ে সীতা নিজেই কিছু বলবে। সীতার কথা শুনে অনেক কথা ভাবল সে। নিজের স্বার্থেই তাকে কোথাও সরিয়ে দেওয়া দরকার। কথাটা সীতা নিজে থেকে বলায় সে বেশ হাল্কা আর ভারমুক্ত বোধ করল। কিন্তু সীতার জিজ্ঞাসায় মুখে হাঁ না কিছু বলল না। চুপ করে রইল।

কয়েকটা মুহূর্ত নিঃশব্দে কাটল।

সীতার কিছু ভাল লাগছিল না। বুকের ভেতর একটা দুরন্ত ভয় ও আশঙ্কায় ছটফট করছিল। বলল: তুমি চুপ করে থাকলে আমার কথার জবাব পাব কি করে? ভেবেছিলাম এই সঙ্কট সময়ে আমাদের ছাড়াছাড়িটা তোমার ভাল লাগবে।

রামচন্দ্র বেশ একটু গম্ভীর উদাস গলায় বলল : তুমি তো তাই বলবে। চিরদিন তুমি শুধু দুঃখই দিলে। প্রাণভরে যত পার কষ্ট দিয়ে যাও। আগামী দিনগুলোতে আমাদের জীবনে অনেক কিছু ঘটে যেতে পারে। তোমার সিদ্ধান্তও বদলাতে পারে। আমার এ অনুভূতি নাও থাকতে পারে। এত তাড়া কেন? কাল রাত পোহালেই সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে।

সীতা প্রতিবাদ করল না। কথাগুলো তার দিক থেকেও সত্যি। মাঝে মাঝে তারও মনে হয় আর পাঁচটা মেয়ের মত সেও শান্তির জন্য ব্যক্তিত্বকে সম্পূর্ণভাবে বিসর্জন দেবে। রামচন্দ্রের বাধ্য স্ত্রী হয়ে থাকবে। স্বামীকে সুখী করবে। কিন্তু তার ভেতরটা অন্য ধাতু দিয়ে গড়া। সন্ধ্যাদীপশিখার মত শান্ত ব্যক্তিত্ব। কিন্তু উজ্জ্বল আর দীপ্ত।

একটু লজ্জা পেয়ে সীতা বলল : স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কগুলি নিশ্চয়ই সংঘর্ষের, সংগ্রামের দ্বন্দ্বের কিন্তু বৈরিতার নয়। তবু আমাকে নিয়ে তোমার সারা জীবন যুদ্ধ আর বৈরিতা করে কাটাতে হল। এই সংঘর্ষ তোমার নিজের সঙ্গে নিজের, দেশের সঙ্গে তোমার। আমি চিরদিন তোমার ব্যক্তিগত জীবনের সুখের পথে কাঁটা হয়ে থাকলুম। আমিও সুখ কি টের পেলাম না, তোমাকেও শান্তিতে থাকতে দিলাম না। এই দুঃখটাই আমাকে বড় বেঁধে। আসলে, আমি নিজের ব্যক্তিসত্তাকে তোমার রাজ্য-রাজনীতির হাতে তুলে দিতে রাজি নই আদৌ। আমার স্বাতন্ত্র্য নিয়ে তোমার সঙ্গে লড়তে হচ্ছে অনুক্ষণ। এটা কখনও সুস্থ দাম্পত্য জীবনের লক্ষণ নয়। তাই আমার কোথাও চলে যাওয়া ভীষণ দরকার। অনেককাল হল গঙ্গা দেখি না। অথচ আমার কি ভাল লাগে জায়গাটা যে তোমাকে কি বলব। গঙ্গা আমার প্রিয় নদী। কতকালের সম্পর্ক যেন। অনাঘ্রাত অশ্রুত অদেখা কতদৃশ্য, কত গন্ধ বিভিন্ন ঋতুতে ঋষি অগ্নিমুনির আশ্রমে থাকতে দেখেছি। তবুও আশ মেটে না চোখের, কানের মনের।

রামচন্দ্র কথা খুঁজে পায় না। ভাবে সীতা চিরদিনই বড় বেশি ঠান্ডা শান্ত অনুযোগহীন এক রমণী। কিন্তু প্রচন্ড ব্যক্তিত্বসম্পন্ন নারী! তবু সে বড় ভাবপ্রবণ, এটাই রামচন্দ্রের আশ্চর্য লাগে।

চাঁদের আলো পড়েছিল সীতার মুখে। আশ্চর্য সমর্পণ তন্ময়তা তার মুখের রেখায় স্পষ্ট। তার শুকনো ঠোঁটের আশ্চর্য হাসিতে অশেষ ক্ষমা মাখানো ছিল। সীতা নিজেই ঘর ছেড়ে যেতে চাইল। রামচন্দ্রের কাছে সবকিছু কিছুক্ষণের জন্য অন্ধকার হয়ে গেল। মাথার মধ্যে বিদ্যুৎচমকের মত একটা যন্ত্রণা বোধ করল। ঝুপ করে হঠাৎ ঠান্ডা মেরে গেল যেন। সীতার দাবিটা গা শিরশির করা ভীষণ ভয়ের এক অনুভূতি যেন। আস্তে আস্তে বলল, ভারি অদ্ভুত তোমার খেয়াল। আমাদের সম্পর্কের তফাতটা যদি তুমি নিজে থেকে বুঝে থাক, তাহলে আমার সাধ্য কি তোমার ভুল ভাঙি। মানুষ মাত্রেই কিছু কিছু ব্যাপার থাকেই। সেটা তার নিজের একার। সেখানে আমার প্রবেশধিকার নেই কোন, তবে তাড়াতাড়ি করার কিছু নেই। নিজের মনের আবরণ খুলে আগে ভাল করে দেখে নিই। জীবন মাটিতে পা ফেলে হেঁটে একে অন্যকে ছুঁতে পারি কি না, কাছে আসতে পারি কি না? তারপর যা হয় করা যাবে।

খোলা জানলা দিয়ে হেমন্তের বনের আর আকাশের তারাদের আর পাখিদের গন্ধ ভেসে এল। বড় মন খারাপ করা গন্ধ এ।

চার

রামচন্দ্র অবিশ্বাস, সন্দেহ সংশয়ে দিশেহারা। *প্রাণপ্রতিম, অনুগত ভ্রাতা ও বান্ধব লক্ষ্মণ, পতিপ্রাণা কোমলস্বভাবা সীতা সন্ন্যাসীর মত নির্লোভ সর্বত্যাগী মোহমুক্ত ভরত, অনুরক্ত ও অনুগামী ভ্রাতা শত্রুঘ্ন অত্যন্ত স্নেহবৎসল জননী কৈকেয়ী এবং রাজ্যের প্রজাকুল, কোথায় কে কি করছে, বলছে এবং কি ধরনের আলোচনা করছে এসব খোঁজ খবর প্রতিদিন সে গোপনে নিল। এদের প্রত্যেকের কথাবার্তা গতিবিধির উপর তীক্ষ্ম নজর রাখার জন্য নিজের তত্ত্বাবধানে এবং একান্তে গোপনে একটি গুপ্তচর সংস্থা তার ছিল। যে সব খবর রাজার কাছে পৌঁছয় না কিংবা পৌঁছতে নানা কারণে বিলম্ব হয়; সেই সব খবর চটপট যাতে পৌঁছয় তার জন্যই এই বিশেষ গুপ্তচর বাহিনীকে নিযুক্ত করেছিল। এদের প্রধান ছিল ভদ্র।

ভদ্র স্পষ্টবক্তা এবং নির্ভীক সংবাদদাতা। রামচন্দ্রের মুখ চেয়ে কিংবা তাকে সন্তুষ্ট করার জন্য সংগৃহীত তথ্যকে কখনও বিকৃত করেনা। সত্য যত অপ্রিয় কিংবা নিষ্ঠুর হোক, অকুণ্ঠভাবেই তা রামচন্দ্রকে সতর্ক ও সাবধান করার জন্য জানায়। ভদ্র সেজন্য রামচন্দ্রের প্রিয়। কিন্তু তাকে ঘিরেই আবার সংশয়। এবং ভয়। ভদ্র বন্ধুর ভূমিকায় তার কোন শত্রুতা করছে না' তো? মনের অভ্যন্তরে সংঘাতের ক্ষেত্র প্রস্তুত করার জন্য কিংবা তাকে দুর্বল এবং অশক্ত করে তোলার জন্য চতুর কূটকৌশলী শত্রুর মতো কোন চক্রান্তে যে লিপ্ত নয় সে, কে বলতে পারে? খুব সম্প্রতি এ ধরনের একটি সংশয় ও বিভ্রান্তিতে সে কষ্ট পায়। বেশ বুঝতে পারে তার বিশ্বাসে টান ধরেছে। ভয় তাকে জীর্ণ করছে।

অথচ যৌবনে বনে বনে রাক্ষস দৈত্য দানবদের দমনের সময় এরকম কোন আতঙ্ক ছিল না। মুনি ঋষিরা তার বিক্রম দেখে বলত— কোটি কোটি মানুষের সবরকম ভালমন্দের ভার বিধাতা তার উপর ন্যস্ত করেছে। এ ভার বইবার যোগ্যতা শুধু তারই আছে। তাদের প্ররোচনায় এক বড় আদর্শের আলো তার উপর পড়েছিল। সে ভাবতে আরম্ভ করেছিল, পৃথিবীতে শক্তিমান নির্ভীক দুঃসাহসী বীর ঐশ্বর্যভোগী সম্পদবিলাসী সৌন্দর্যলোভী সংস্কৃতিবান আর্যদেরই বেঁচে থাকার অধিকার আছে। শাসন এবং জয়ে শুধু তাদের অধিকার। আর্যজাতি কোন প্রতিপক্ষ চায় না। শত্রু তার দুশমন। তাকে জয় অথবা নির্মূল করাই তাদের ধর্ম। কিন্তু আজ ইতিহাস যখন বিচার করতে বসেছে তখন বারংবার মনে হচ্ছে একজন অসাধারণ মানুষও আর দশজন মানুষের মতই সাধারণ। তার দৃষ্টি অনিবার্য কারণে সীমিত। চিত্ত দুর্বল ও চঞ্চল। শক্তি পরিমিত। বুদ্ধি ও বিবেচনা অসমাপ্ত। রাজার কাছে প্রজার শাসন শ্রেয় তার হতে পারে। কিন্তু সেও বেশ কঠিন কাজ। কারণ, রাজার কোন আকাঙ্ক্ষার শেষ নেই। এটাই তার জীবনে সবচেয়ে মর্মন্তুদ দুঃখের ও বিষাদের ঘটনা। প্রজার কিছু নেই, আকাঙ্ক্ষা তার পরিমিত। শাসন যেমন রাজার রক্তের বীজ, শাসনে প্রজার প্রতিরোধও তেমন মজ্জাগত। এটাই চলে আসছে চিরকাল। রাজার কাজের কঠিন বিচারক হলো ইতিহাস।

একা থাকলে নিজেকে নিয়ে রামচন্দ্রের বিচার বিশ্লেষণ গবেষণার অন্ত থাকে না। বেশ বুঝতে পারে রাজনীতি এখন তার নেশায় পেয়েছে। রাজনীতিতে উত্তেজনা বৈচিত্র্য, আবেগহীন প্রেম, মমতা, নিষ্ঠুরতা. ক্ষমার মধ্যে ঘৃণা, প্রেমের মধ্যে প্রতিহিংসা, ত্যাগের মধ্যে লোভ, মৈত্রীতে বৈরীতা, বন্ধুত্বের নামে বিশ্বাসঘাতকতা; এই আপাতবিরোধ অসামঞ্জস্য অসঙ্গতির টানাপোড়েনের এক অপূর্ব খেলা। এর ভেতরে কোথায় যেন একটা সুখ আনন্দ লুকনো আছে। নেশার মত সে শুধু আকর্ষণ করে না, মাতিয়েও রাখে। আর তার ভেতর ডুবে থাকায় আছে এক অদ্ভুত মজা আর বিস্ময়। এই বিস্ময়টা রমণীর নেশার মত কিছুতে কাটতে চায় না।

লঙ্কা থেকে প্রত্যাবর্তনের পর সে এক অন্য মানুষ। রাজ্য, সিংহাসন, ক্ষমতা, প্রশংসা, জনপ্রিয়তা

---

* মহারাজ রাম জিজ্ঞাসিলেন, ভদ্র! এখন নগরে কি কি জল্পনা হইয়া থাকে? গ্রাম ও নগরবাসীরা আমার বিষয়ে কি বলিয়া থাকে? সীতা সংক্রান্ত কোন কথা হয় কিনা? সকলে ভরত, লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নের বিষয় কি বলে এবং মাতা কৈকেয়ীর কথাই বা কি হয়? দেখ, রাজার কথা লইয়া কি বন, কি নগর সর্বত্রই আন্দোলন হইয়া থাকে:—বাল্মীকি রামায়ণ-হেরম্ব ভট্টাচার্য, পৃ: ৮৮৪, ভারবি, সং।

খ্যাতি সম্মান গৌরব সব কিছুতে কেমন একটা নেশা ধরে গেছে। নিজের সুনাম বাঁচিয়ে রাখার জন্য এখন ব্যস্ত। রাজনীতির ক্ষমতা লাভ ও লোভের ঘূর্ণিপাকে এমন করে জড়িয়ে গেছে যে এর থেকে মুক্তির পথ বুঝি আর খোলা নেই। জ্ঞানীরা বলে সুন্দরী রমণীর নেশা কাটে কিন্তু ক্ষমতার মাদকতা আর খ্যাতির নেশা কিছুতে কাটতে চায় না। রামচন্দ্রও জানে রাবণের পরাজয়ে ভারতে তার সম্মান ও গৌরব বেড়ে গেছে। সুতরাং এই গৌরব খ্যাতিকে শিরোভূষণ করে বয়ে বেড়ানোর উপযুক্ত ব্যক্তিত্ব আর্যাবর্তে একমাত্র তারই আছে। কিন্তু সেই বিশ্বাসেরও জোর কমে গেছে। কোথায় যেন এটা ভীষণ টান ধরেছে। আর্যাবর্তের গৌরবকে ভারতময় করার ব্রত নিয়ে যৌবনে প্রত্যাখ্যান করেছিল পিতার স্নেহ, জননীর মায়া, প্রজাদের ভালবাসা সিংহাসনের লোভ, রাজকীয় বৈভব, বিত্ত বিলাস আরাম সুখ। শুধু ত্যাগ ও কৃচ্ছ্রসাধনের পুলকিত হওয়ার নেশায় মগ্ন ছিল সেদিন। ভারতত্রাস, রাবণের হাত থেকে ভারতবর্ষ সম্পূর্ণ মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত রাবণের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে দেশ শাসন করা, স্বজাতি প্রেম ও স্বদেশ প্রেমের বড় অপমান। বিশ্বামিত্রের এই বিশ্বাসের একজন সমর্থক রামচন্দ্র। বিশ্বামিত্রের কর্মপন্থাকে রূপ দিয়ে ভারতবর্ষের মাটিতে আর্যাবর্তের উপনিবেশ বিস্তৃত ও সম্প্রসারিত করতে বন্ধুত্বের ভ্রাতৃত্বের এক নয়া ছদ্মবেশ নিয়ে বনবাসী হল। অরণ্যের নিঃসঙ্গ একাকীত্বের জীবনে সকল কর্মের সহচর হল ভ্রাতা লক্ষ্মণ। আর পত্নী সীতাকে নিল তার বিজয় পথের কর্মসঙ্গিনী করে। সীতার সেই স্নিগ্ধ অস্তিত্বকে কর্তব্যের খাতিরে প্রবল ধাক্কায় বহুদূরে সরিয়ে দিতে হবে। এই মানসিক সংকট একদিকে, অন্যদিকে কি উপায়ে নিজের স্বার্থকে নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত করা যেতে পারে তার চিন্তা পরিকল্পনা তাকে এক অন্য মানুষ করে তুলল। এই আত্মঘাতী অন্তর্বিরোধে রামচন্দ্র কিংকর্তব্যবিমূঢ়। যার থেকে নিস্তার, পলায়নের উপায় নেই।

সীতার সঙ্গে গভীর রাত্রির কথোপকথনের অনেক কথা মাঝে মাঝে হঠাৎ অন্যমনস্কভাবে মনে পড়ে যায়। ফুরফুরে হাওয়ায় গাছের শাখা যেমন দোলে মনটাও তেমনি নাড়া খায়। বিছানায় শুয়ে রামচন্দ্র সীতাকে হঠাৎই প্রশ্ন করল : আচ্ছা, আমি অযোধ্যার রাজা হওয়ায় তুমি খুশি হয়েছ তো?

সীতা আচমকা প্রশ্নে বিন্দুমাত্র বিব্রত না হয়ে তৎক্ষণাৎ জবাব দিল: সব মেয়েই তার স্বামীর প্রতিষ্ঠায়, জয়ে, সম্মানে খুশি হয়। আমি ব্যতিক্রম নই।

তুমি উত্তরটা কিন্তু এড়িয়ে গেলে। স্পষ্ট করে বললে না।

আমি চিরদিন তোমাকে অনুসরণ করে এসেছি। ভরতকে গোপনে কেকয়ে পাঠিয়ে চুপি চুপি যখন অযোধ্যার যুবরাজ হতে চাইলে তখন কিন্তু জানতে চাওনি, আমি খুশি হয়েছি কি না?

তুমি জানতে চাওনি বলেই বলা হয়নি।

তবে আজ জিজ্ঞেস করছ কেন?

রামচন্দ্র নীরব। সীতা একটু থেমে গম্ভীর গলায় প্রশ্ন করল: চুপ করে রইলে কেন? আসলে সিংহাসন আর রাজনীতিতে তুমি ইদানীং এত মত্ত হয়ে আছ যে তোমাকে দেখে ভারি মজা লাগে। বিস্ময় জাগে। নিজেকে জিগ্যেস করি—ইনি কি আমার স্বামী রামচন্দ্র? যিনি দেশসেবা মানব কল্যাণ এবং সত্য রক্ষার জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করেছিলেন? কালস্রোতে সব বদলে যায়। মানুষের মন স্বভাবও বদলে যায় তাতে আশ্চর্য হওয়ার কি আছে?

একটু চুপ করে থেকে বলল : ঠিক কথা। আর্যজাতির গৌরব তুমি। দেশের রাজা তুমি। দেশকে শাসন করতে হবে। সেজন্য তুমি আরো ক্ষমতা চাইছ, শক্তি চাইছ। সবাই তোমার কাছে শুধু চাইছে। কেউ আর না চাওয়ার দলে নেই। কেবল ভরত কিছু চাইল না। পেল না। তাকে দেখে অন্তর আমার শ্রদ্ধায় ভক্তিতে ভরে গেছে। রাজ্য রাজনীতির মধ্যে দীর্ঘকাল থেকেও ক্ষমতার সুরা তার নেশা ধরাতে পারল না। ভরত বোধ হয় শুধু সেবার জন্য ত্যাগের জন্য নিজেকে তৈরি করেছিল। দেশসেবার জন্য ভরতের মত, হরিশ্চন্দ্রের মত রাজা চাই।

রামচন্দ্র কি জবাব দেবে? শুকনো গলায় বলল : হয়তো তাই। একটা চাপা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলল: সতেরো বছর আগে দেশের অবস্থা যা ছিল, এখন তা আর নেই। কয়েক বছরের ভেতরে সমস্যা এবং রাজনীতি অনেক জটিল হয়ে গেছে। তোমার আমার সম্পর্কের কথাই ধর না, আমরা

কি আগের মত আছি আর? পরস্পরের কাছে আমরাই কত দুর্বোধ্য হয়ে গেছি। আমাদের সেই সহজ স্বাভাবিকতা, সরলতা, প্রেম, মমতা হারিয়ে গেল কোন জগতে? আমরা পাশাপাশি বাস করি কিন্তু আমাদের ভেতর কোন বনিবনা নেই। বেশ একটা প্রচ্ছন্ন সংঘাত আছে।

সীতা কোনরকম প্রতিবাদ করল না। বলল : আমার স্বামী দেশের সেবায় কৃচ্ছ্র সাধনার পথে স্বেচ্ছায় আমাকে ডেকে এনেছিল, তার মাহাত্ম্য ও গুণে আমার মন ভরে আছে। সেদিন ছিলাম স্বামীর সর্বকর্মের সঙ্গিনী। তার পাশে দাঁড়িয়ে, নির্ভয়ে, কর্তব্যবোধে, প্রেমে, আদর্শের উত্তাপে যে কাজ করেছি সেই কাজের পৃথিবীটা আমার হারিয়ে গেল কার দোষে? এ প্রশ্ন আমারও। আজ আমার মত দুঃখী কে আছে বল? এই রাজসম্মানের চেয়ে বড় অপমান আমার আর কিছু নেই। এই সুখের চেয়ে স্বেচ্ছাকৃত সেই দুঃখ ও আদর্শের পথ অনেক বড় ছিল।

জটিল চিন্তায় রামচন্দ্রের দেহমনে ক্লান্তি আর অবসাদ জড়িয়ে ছিল। মনকে কিছুতে শান্ত করতে পারছিল না। ভুলে থাকতে পারছিল না তার রাজনৈতিক সংকট। শূদ্র রাজপুত্র শম্বুককে নিয়ে তার যত ভয় ও ভাবনা। তার দুই নীল নয়নে শম্বুকের মুখ চোখ চেহারাটা স্পষ্ট হয়ে উঠল।

অযোধ্যার রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে শম্বুকের আবির্ভাব নাটকীয়। দীর্ঘকায় কৃষ্ণাঙ্গ যুবকের আজানুলম্বিত দুই বাহু মাথাভর্তি গভীর কাল কুঞ্চিত কেশদাম, পিঙ্গল দুই চোখে বিদ্রোহের আগুন ধক্‌ধক্ করে জ্বলছে যেন। অনুন্নত নাসিকা চাপা ও চওড়া। মুখে ও চিবুকে কেমন এক কোমলতা। ব্যক্তিত্বের ব্যঞ্জনা নম্র ও বিনীত। চেহারায় প্রদীপ্ত ভাব। কথা বলে খুব আস্তে। হাসে লাজুক অপ্রতিভতায়। অথচ এমন এক সুদৃঢ় স্থৈর্য গাম্ভীর্য তেজ ব্যক্তিত্ব তার আয়ত্ত যে মানুষ তাকে দেখলে আকৃষ্ট হয়। প্রভাতের সূর্যের মতই শান্ত স্নিগ্ধ উজ্জ্বল দীপ্ত বলেই কেমন একটা আস্থা হয় তার উপর। এই আস্থাটুকু পাথেয় করে সে রামচন্দ্রের প্রতিদ্বন্দ্বী। কেড়ে নিতে চাইছে তার রাজনৈতিক সুনাম, মর্যাদা গৌরব। উপেক্ষা কিংবা অবহেলা দেখানোর মানুষ নয় সে। তাকে কেন্দ্রে রেখে যে একটা রাজনৈতিক ঝড় উঠবে এটুকু বুঝতে রামচন্দ্রের বিলম্ব হল না। আর্যাবর্তের নৃপতিদের একটা বড় অংশ বিপরীত পথে চলতে চাইছে। তার জনপ্রিয়তায় ঈর্ষান্বিত হয়ে রামচন্দ্র বিরোধী একটা হাওয়া সৃষ্টি করতে তারা গোপনে খুব প্রচ্ছন্নভাবে শম্বুককে সাহায্য করছে। এই সব নৃপতিদের পরস্পরের প্রতি সন্দেহ এবং অবিশ্বাস প্রবল। তাই ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের নেতৃত্ব দানা বাঁধতে পারছে না। বিরোধী শক্তিগুলি এখনও দুর্বল অস্থিরচিত্তে বিক্ষিপ্তমতি। কিন্তু শম্বুক সম্পর্কে এদের গভীর আগ্রহ এবং আস্থা। শম্বুককে দিয়ে তারা গোপনে হিংসার ছুরিতে শান দিচ্ছে। রামচন্দ্রের সকল শঙ্কার কারণ এখানে। চরিত্রগুণেই শম্বুক অনেক মানুষের বিশ্বাস আস্থা ও শ্রদ্ধার পাত্র। এই ক্ষমতা তার অর্জিত, কারো দয়া দান কিংবা অনুগ্রহ নয়। এ ক্ষমতার সদ্ব্যবহার হলে রামচন্দ্রের আদর্শ ও নীতির পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। তাই শম্বুক তার মানসিক সংকটের এক নতুন উপসর্গ। আর্যবর্তের এক গৌববময় ইতিহাস তৈরি করতে গিয়ে সে নিজেই ইতিহাসের হাতে বন্দী। একেই বলে অদৃষ্টের পরিহাস।

পরিহাস নয়ত কি? ত্রিভুবন বিজয়ী রাবণ যার কাছে পরাজিত, নিহত সে সামান্য একজন বনবাসী যুবকের ভয়ে বিব্রত? লোকে একথা জানে না তাই রক্ষে। জানলে তার সম্পর্কে কি ভাবত? কোন অসতর্ক মুহূর্তে পাছে সে দুর্বলতা ফাঁস হয়ে পড়ে তাই রামচন্দ্র নিজেকে প্রশ্ন করল: শম্বুক কে? তার আছে কি? আছে কে? প্রশ্নগুলো একসঙ্গে করে একটু থমকে তাকাল। দীর্ঘশ্বাস পড়ল। উত্তরটা মনে মনে নিজেকেই শোনাল। জনস্বার্থের সঙ্গে দেশের সঙ্গে নিজের স্বার্থ মিলিয়ে সে একেবারে মাটি থেকে উঠে এসেছে। নিজের অর্জিত নেতৃত্ব নিয়ে মানুষের শ্রদ্ধা ওআস্থা অর্জন করেছে। রাজনীতির এলাকাও সে বেছে নিয়েছে। এখন শুধু ক্ষেত্র তৈরি করা। অজ্ঞাতবাসের দিনগুলিতে গভীর অরণ্যে নিঃশব্দে জনস্বার্থের সঙ্গে নিজের স্বার্থ মিলিয়ে রাবণবধের ক্ষেত্র প্রস্তুত করছিল, অনুরূপ কৌশলে শম্বুকও রামচন্দ্রের পতনের কাজ ত্বরান্বিত করল।

কথাটা মনে হতে রামচন্দ্রের হাসি পেল। সে হাসি ক্রমে ঠোটের ফাঁকে বক্র ও কুটিল হল। নিজেকে প্রবোধ দিয়ে বলল: উত্তম। জনগণ মানলেও আমি তোমাকে মানব কেন? এই বিশাল দেশ শাসন করতে তুমি পার না। রাজনীতিতে তোমার মত সাধারণ লোকের কোন ভূমিকা নেই। তারা শুধু

নেতৃত্বের খেলনা। তাদের নিজের কোন অস্তিত্ব নেই। কার্যসিদ্ধির জন্যে সুবিধাভোগী রাজনৈতিক মুনাফাবাজরা তাদের নিয়ে যেমন খেলতে চায় তারা সেই ভাবে খেলে। জনগণ তো খেলনার পুতুল তাদের সমর্থন পেয়ে যদি ভেবে থাক রামের প্রতিদ্বন্দ্বী হওয়ার স্পর্ধা হয়েছে তা হলে ভুল করবে শম্বুক। তোমরা শুধু রামচন্দ্রের বাইরেটা দেখেছ ভেতরটা দেখনি। জনতাকে খেপিয়ে রাজ্যে বিশৃঙ্খলা ঘটিয়ে কিছু রাজনৈতিক মুনাফা সাময়িকভাবে জোটে সত্য কিন্তু তা দিয়ে রাজ্য চালানো যায় না। দেশের বিরোধী নেতা হওয়া সহজ কিন্তু দেশ শাসন করা খুব শক্ত কাজ। শাসকের হাতে যতক্ষণ ক্ষমতা থাকে ততক্ষণ কোন শাসকই তার প্রতিপক্ষকে মুখ্য অস্ত্র ব্যবহারের সুযোগ দেবে না। সময় থাকতে সেই অস্ত্র কেড়ে নেবে অথবা অকেজো করে দেবে। কোন শাসকই প্রতিদ্বন্দ্বী চায় না। আমিও চাই না। তোমাকে বেড়ে ওঠার সুযোগ দিয়ে আমি শুধু জেনে নিতে চাই—কে মিত্র আর কে মিত্র নয়, কার কি ভূমিকা তাও জানা হবে। তারপর তোমার আমার বোঝাপড়া।

এক গভীর অসহায়তাবোধ থেকে সম্মোহিতের মত যন্ত্রবৎ কথাগুলো নিরুচ্চারে উচ্চারণ করল। কিন্তু মনের মধ্যে দাঁড়ানোর মত শক্ত মাটি পাচ্ছিল না। সেখানে ভীষণ পিচ্ছিল। বিশ্বাস প্রত্যয় কেবলই পিছলে যাচ্ছিল।

রামচন্দ্রের খুব আশ্চর্য লাগল। এরকম ভাবে আগে কখনও ভাবার অবসর পায়নি সে। ভয় যখন দুর্বলতার উপর দখল নেয় তখন বিশ্বাস, প্রত্যয় ভয় পাওয়া কাঠবিড়ালীর মত মনের পাতার আড়ালে লুকিয়ে পড়ে।

রামচন্দ্রের বুকের মধ্যে ভয়মিশ্রিত উত্তেজনাজনিত এক ভীষণ উদ্বেগ উৎকণ্ঠায় কষ্ট বোধ করতে লাগল।

পাঁচ

বিশাল অরণ্য অঞ্চল জুড়ে নিষাদ, শবর, শূদ্রক উপজাতি সম্প্রদায়ের বসতি। দশ পনেরটি ছোট ছোট ঝোপড়ি বা ঘর নিয়ে একটা পাড়া। সাধারণত বসতি গড়ে উঠেছে উঁচু জায়গায়, সারিবদ্ধ গাছের ছায়ায়। বাঁশ কঞ্চি গাছের ডাল-পালা দিয়ে তৈরি বেড়ায় কাদা আর গোবরের প্রলেপ দিয়ে মসৃণ করা দেয়াল। সুন্দর লেপা-মোছা। কুঁড়েঘরগুলো সারি সারি গাছের মত পাশাপাশি। প্রতিটি কুটিরের সঙ্গে পাথরের চাঁই নিয়ে মজলিশের বেদি। এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে উলঙ্গ কিছু শিশু আর বালক। আর একটু বড় যারা পরনে এক টুকরো ছেঁড়া কাপড় ল্যাঙোটির মত করে পরা। আর মেয়েদেরও খুব স্বল্পবাস! ঘাঘরার মত কাপড় হাঁটু পর্যন্ত ঢাকা।

বাইরে রান্নার চুল্লী। চুল্লীর একপাশে গাদা করে গাছের শুকনো গাছ-পালা, পাতা। মাটির কালি পড়া হাঁড়ি, কয়েক জোড়া মাটির শান্‌কি এদের ঘরকন্নার বাসনপত্র। মাটির বাসনে রান্না করা কিছু খাবার।

প্রকৃতির মনোরম পরিবেশের মধ্যে এরা বসবাস করে। এদের কোন অভাব নেই। রাজার সুখে রেখেছে অরণ্য। এর জমির মালিকও তারা সকলে। উর্বর মাটিতে যে খাদ্যশস্য হয় তাই দিয়ে সম্বৎসর ভরপেট চলে। এ-ছাড়া বনের অপর্যাপ্ত ফল-মূল তাদের দুর্দিনে আহার জোগায়।

বনের মানুষেরা অত্যন্ত সমাজবদ্ধ। গ্রামীণ গোষ্ঠীগত ভিত্তিতে অরণ্য অঞ্চল এক একটা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য। জনগণের মূল আনুগত্য ছিল গোষ্ঠীর রাজার উপর। রাজা তাদের জীবনযাত্রার উপর, সম্পত্তির অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ করত না। ভীষণ শান্তিতে, আনন্দে ছিল বনের মানুষ। প্রকৃতিতে এরা ছিল ভীষণ শান্ত স্বভাবের, সরল আর সহজ।

রামচন্দ্র আসার আগে এই ছিল বিশাল দণ্ডকের জনজীবন। গ্রামের অধিবাসীরা ছিল একটা বৃহৎ পরিবারের অংশবিশেষ। এক অঞ্চলের মানুষের সঙ্গে আর এক অঞ্চলের মানুষের কোন দ্বন্দ্ব নেই, বিদ্বেষ নেই, রেষারেষি নেই, শ্রেণীভেদ নেই, নেই নারীপুরুষে ভেদাভেদ। সর্বত্র একটা সম্প্রীতির হাওয়া ছিল। ছিল মিলনের সুর। ঐক্যের গান।

এই অপার শান্তির রাজ্যে একদিন রামচন্দ্র এল। তারপরে চলেও গেল। কিন্তু তার এই হঠাৎ

যাওয়া আসার অলক্ষ্যে কি যেন হয়ে গেল। সব স্বপ্নের মত মনে হয়। চোখের উপর গোটা সমাজটা, জীবনটা বদলাতে শুরু করল অথচ তারা তা বুঝতে পারল না। এই বিস্ময়ে বনের মানুষেরা নীরব। চোখে কেবল তার ছবি ভাসে।

রামচন্দ্র চলে যাওয়ার কিছুকাল পরে ক্রমান্বয়ে উত্তরাঞ্চল থেকে শ্বেতকায় আর্যরা আসতে লাগল। বিনা বাধায় তারা বসবাস করতে লাগল। বনের মানুষেরা কখনও তাদের শত্রু বলে ভাবল না। বিধাতার রাজ্যে সকলের বসবাসের সমান অধিকার। সহবস্থানের এই নীতির উপর বনের মানুষের সমাজ গড়ে উঠেছিল। তাই শ্বেতাঙ্গদের সঙ্গে তাদের কোন দ্বন্দ্ব বা বিরোধ বাধল না। এদের সরলতা, ও সহজ বশ্যতার সুযোগ নিয়ে আর্যরা আদিম উপজাতিদের পল্লীর অনতিদূরে নতুন বসতি গড়ল। একটি নতুন পল্লীর জন্ম হল। নতুন সমাজের সূচনা হল।

শ্বেতাঙ্গ নবাগত আর্যদের চেহারায়, চলাফেরায়, কথাবার্তায়, আলাপ ব্যবহারে, জীবনযাত্রার ভেতর চোখ কেড়ে নেয়া এমন একটা চুম্বক আকর্ষণ আর লুকনো সম্পদ ছিল যা বনের মানুষদের অভিভূত করে রেখেছিল। এমন ভদ্রশ্রেণীর সুন্দর, সুশ্রী, সুভাষী মানুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ, দর্শন তাদের জীবনে এই প্রথম। তাদের সামান্য সান্নিধ্যে, কিংবা স্পর্শে চোখে মুখে কৃতজ্ঞতার ছাপ স্পষ্ট হয়ে উঠত। একটা গভীর সন্তোষ জাগত মনের মধ্যে। সেই ভাললাগার তৃপ্তিটুকু পেতে তাদের জন্যে যা কিছু দরকার তাই করতে তারা প্রস্তুত। এটাই ছিল তাদের অন্তরের অভিলাষ। নিবেদনের যে এত সুখ বনের মানুষ প্রথম জানল।

কিন্তু নবাগত আর্যরা ভেতরে ভেতরে অন্য মতলব আঁটছিল। এদের কৃতজ্ঞতা, বশ্যতা আনন্দকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করে খুব গোপনে এবং নিঃশব্দে তাদের জমিগুলি কেমন করে গ্রাস করা যায় তার ছক কষছিল। খুব কৌশলে জমি থেকে তাদের অধিকার কেড়ে নেওয়ার একটা সুন্দর ফন্দি করল। কিন্তু তাদের উদ্দেশ্য মতলব বনের মানুষেরা টের পেল না। শ্বেতাঙ্গদের সহানুভূতির স্পর্শে তাদের মন গলে গিয়েছিল। তাদের বন্ধুত্বের উপর আস্থা জন্মেছিল। তারা কোন ক্ষতি করতে পারে এমন চিন্তাভাবনাই করত না।

কিন্তু তারা যে প্রতারিত হচ্ছিল কিংবা তাদের প্রতারণা করা হচ্ছিল এরকম কোন ভ্রান্তির কাজ নবাগত আর্যরা করল না। তাদের ও আদিবাসীদের লাগোয়া জমির মধ্যে যে আলের সীমারেখা ছিল আর্যরাই সেটা উড়িয়ে দিল প্রথমে। তাদের বোঝানো হলো জমিতে আলটাই তাদের বন্ধুত্ব ও বিশ্বাসের মাঝখানে একটা দেয়াল। তাই ওটা থাকা উচিত নয়। জমির সীমানা চিহ্ন মুছে গিয়ে সব জমি একাকার হয়ে গেল। যার যা প্রয়োজন সেই মত ফসল নিত! এই ভাবেই চলল বেশ কয়েক বছর।

শ্বেতাঙ্গ আর্যরা বনের সরল কৃষ্ণাঙ্গ মানুষদের ঠকিয়ে এইভাবে জমি গ্রাস করল। তাদের জমির পরিমাণ ধীরে ধীরে বাড়াল। এই বাস্তব সত্যতা বুঝতে এবং টের পেতে কৃষ্ণাঙ্গদেরা কয়েকটা বছর লাগল।

লঙ্কায় যুদ্ধ তখন সবে শেষ হয়েছে। রামচন্দ্র জয়ী হয়েছে। এই যুদ্ধের ফলাফল দেখার জন্যে নবাগত আর্যরা অধীর আগ্রহী ছিল। যুদ্ধ শেষ হওয়ার অব্যবহিত পরই এই সব সভ্য মানুষদের স্বভাব, চরিত্র ও আচরণ বদলে গেল। একটা বর্বর, লোভী, দানবে রূপান্তরিত হল তারা।

তাদের বদলে যাওয়াটা বনের মানুষদের অবাক করল। বিস্ময়ে চমকাল তারা। দেবতার ভেতর এ কোন দৈত্যকে দেখল? প্রশ্ন জাগল: বন্ধুত্ব, বিশ্বাস, সরলতা আনুগত্য, ভালবাসা; এর কি কোন মূল্য নেই? সরলতা বিশ্বাসের অনেক মূল্য দিতে হল তাদের জীবন দিয়ে। কিন্তু এরকম ঘটনা যে, কখনও ঘটতে পারে স্বপ্নেও ভাবেনি। শ্বেতাঙ্গদের ব্যক্তিত্ব, সৌন্দর্য এবং মুগ্ধ আচরণের আকর্ষণে তাদের অন্তরে প্রীতি উৎপাদন করল।

জঙ্গলের বাসিন্দারা এখন আর জমির মালিক নয়! জমির উপর ন্যায়সঙ্গত দাবি ও অধিকার হারিয়ে তারা শ্বেতাঙ্গদের মজুর এবং ক্রীতদাস হল। রামচন্দ্রের লঙ্কা বিজয়ের পরেই দণ্ডকবাসীর জীবন অধ্যায়ে অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটল দ্রুত। শ্বেতাঙ্গরা হঠাৎ ফসলের ভাগ বন্ধ করল। জমির উপর তাদের কোন দাবি মানল না। পরিবর্তে নানারকম ঘৃণ্য অপরাধমূলক দুর্ব্যবহার করতে

লাগল। জোর করে যদি কেউ ন্যায়সঙ্গত নিজের জমি উদ্ধার করতে যেত তাহলে, তার লম্বা লম্বা চুলের সঙ্গে হাত-পা একসঙ্গে বেঁধে দুমড়ে দু'ভাঁজ হওয়ার দেহটার উপর চাবুক চালাতো নির্দয়ভাবে। অবাধ্য, দুর্বিনীত কিছু সাহসী জঙ্গলের মানুষকে শায়েস্তা করতে প্রকাশ্যে তাদের অঙ্গগুলো টুকরো টুকরো করে ছিন্ন করে ভয়ঙ্কর যন্ত্রণা দিয়ে হত্যা করত। একটা দুরন্ত ভয়, বীভৎস অত্যাচারের আতঙ্কে জঙ্গলের নির্ভীক মানুষগুলো কেমন যেন হয়ে গেল। ভূমিহীন মানুষগুলো কোনক্রমে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য কাজের প্রয়োজনে শ্বেতাঙ্গদের দাসত্ব করতে লাগল। নিজের জমিতে অন্যের মজুর হয়ে কাজ করতে লাগল। দুর্ভাগ্যকে অসহায়ের মত মেনে নিল। মেনে না নিয়ে বাঁচার কোন উপায় ছিল না। কারণ তারা তখন অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠীতে বিভক্ত ও বিচ্ছিন্ন। এক গ্রামের সঙ্গে অন্য গ্রামের এক গোষ্ঠীর সঙ্গে অন্য গোষ্ঠীর সদ্ভাব ছিল না। রেষারেষি বৈরীতায় জীর্ণ হচ্ছিল তাদের সংহতি ও ঐক্য। ফলে তাদের মনে জন্ম নিল অস্তিত্বের সংকট।

বিশাল দন্ডকের অরণ্যে কয়েকটা গোষ্ঠী বাস করলেও কার্যত তারা একটা জাতি ও সম্প্রদায়। তাদের ভাষা এক। মানসিক যোগাযোগের সেই সেতুটি আর্যরা ভেঙে দিল কৌশলে। দূরত্বের এক প্রাচীর গড়ে উঠল তাদের ভেতর।

তারপর অনেকগুলো বছর কেটে গেল। বিচ্ছিন্নতার সঙ্কটে ভুগতে লাগল তারা। অসন্তোষে ক্ষোভে বঞ্চনায় তাদের ভেতরটা ধিকি ধিকি জ্বলতে লাগল। আর্য ভূস্বামীদের উপেক্ষায় বৈরীতায় জ্বলছিল জঙ্গলের মানুষের জাতিসত্তা। সকলেই মনেপ্রাণে চাইছিল এই অভিশম্পাতের শেষ হোক। কিন্তু কে বহন করে আনবে বিধাতার সে রুদ্ররোষ? রোষবহ্নির সে মশাল জ্বালানোর মানুষ কোথায়?

অশান্ত অস্থির নিষ্প্রাণ পরিবেশে জীবনের যতটুকু স্পন্দন তা শুধু প্রতিটি জঙ্গলের মানুষের নিভৃত স্বাধীন সত্তায় বিজুরীর মত স্পন্দিত হয় শুধু। যতদিন যেতে লাগল, গভীর হতাশায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল তারা।

সময় চুপ করে বসে থাকে না। অপরিচয়ের অন্ধকার থেকে বিস্ময়করভাবে কতকটা উল্কার বেগে রাতারাতি ভীরু দুর্বল জঙ্গলের মানুষের পাশে দাঁড়াল শূদ্রক যুবরাজ শম্বুক।

তখন ভরদুপুর। রোদ ঝাঁ ঝাঁ করছিল। সূর্যের ছায়া পড়ে না মাটিতে। নিঝুম চারিধার। কেবল ঘুঘু ডাকছিল। তাতেই দুপুরটা বড় বিস্বাদ আর বিষণ্ণ লাগছিল। বড় বেশি শূন্য মনে হচ্ছিল।

খোলা জানলার দিকে তাকিয়েছিল শম্বুক। নিজের ঘরে চুপ করে বসেছিল একা। অনেকক্ষণ। ঘুঘুর ডাকে তার মনটা কেমন বিধুর হয়ে গেল। কেবলই মনে হতে লাগল এ ঘুঘুর ডাক নয়। দন্ডকের কান্না। দন্ডকবন গুমরে গুমরে কাঁদছে। শম্বুকের বুকের ভেতরটা ব্যথিয়ে উঠল। মনে হল দন্ডকের অসহায় কান্নার কোন সঙ্গী নেই। সে বড় একা। ভীষণ একা। দন্ডকের দুর্দশার কথা ভেবে মনটা তার কেমন করতে লাগল। কেবলই মনে হতে লাগল কিছু একটা ঘটবে আজ। কিন্তু কি ঘটবে বা ঘটতে পারে সে সম্পর্কে তার নিজের কোন স্পষ্ট ধারণা নেই। কেবল একটা আশঙ্কায় তার বুকের ভেতরটা টাটাচ্ছিল। কিছু ভাল লাগছিল না। নানা অপ্রয়োজনীয় অপ্রাসঙ্গিক কথা মনের ভেতর ভিড় করে এল।

ঘুঘুর ডাকে বারংবার মনটা কেমন এলোমেলো আর উদাস হয়ে গেল। পথ দিয়ে মাঝে মধ্যে দু'একজন মেয়ে পুরুষ ধুলো উড়িয়ে যাওয়া-আসা করছিল। শুয়ে শুয়ে এসব দৃশ্য সে দেখছিল কিন্তু কিছুতে তার মন কেড়ে নিতে পারছিল না। মনের ভারটা হাল্কা হল না।

রাজগৃহের পাশ দিয়েই পথটা চলে গেছে। দু'ধারে তার নানারকম গাছ নীরব প্রহরীর মত সারি সারি দাঁড়িয়ে আছে। শম্বুকের মনে হতে লাগল, শ্বাসরুদ্ধ উৎকণ্ঠা ভয় ও আতঙ্কে তারা যেন জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে আছে।

রাজগৃহের পাশের রাস্তা ধরে দু'জন পথিক বেশ সরবে কথা বলতে বলতে যাচ্ছিল। তাদের কথাবার্তায় দুপুরের স্তব্ধতা গমগম করে উঠল। গাছপালার শাখায় শাখায়, পাতার মর্মরে দন্ডকের অরণ্যে সেই স্বর অণুরণিত হতে লাগল। বাতাস পাহারাদারের হাঁকের মত সেই স্বর অনেকদূর পর্যন্ত বয়ে নিয়ে গেল।

শম্বুক সটান উঠে দাঁড়াল। কথাটা বোঝার চেষ্টা করল। তারপর কি ভেবে সে দৌড়ে গেল রাস্তার দিকে বারান্দায়।

হাওয়ার তোড়ে বেশ খানিকটা ধুলো উড়ল। লাল ধুলো। জৈষ্ঠ্যের উত্তাপ সবুজ ধানের গন্ধ তার গায়ে। অবাক হয়ে চেয়ে রইল সেদিকে শম্বুক। লোক দুটি কথা বলতে বলতে আসছিল। তাদের একজন বলল: দন্ডকের কি হালটা করেছে সাদা চামড়ার মানুষ। ওদের প্রাণে দয়া মায়া বলে কিছু দেয়নি বিধাতা।

অন্যজন বলল: থাকবে কোথা থেকে? দস্যুর জাত ওরা। লুটেপুটে নেওয়াই ওদের স্বভাব। আমরা ওদের বিশ্বাস করে ঠকেছি।

এই ভুলের শেষ কোথায় জানি না। শূদ্রক রাজা ন্যগ্রোধের এলাকাটুকুই ছিল দন্ডকবাসীর একমাত্র নিজের জায়গা। সেখানেও ওদের চোখ পড়েছে। ওদের দৃষ্টিতে লোভ ঘৃণা গোপন নেই আর।

শুনলাম ও পাড়ার খট্টাঙ্গের জোত জমি সব কেড়ে নিয়েছে ঐ শালা সম্বুদ্ধ।

ভায়া একটু আস্তে বল। কে কোথায় শুনবে শেষে। মনের জ্বালা, অসন্তোষ অমন চড়া গলায়, কড়া কথায় কেউ বলে? না বলতে আছে? মাখমের মত মাখ মাখ করে বল সামন্তরাজ সম্বুদ্ধ।

ভাল কথা মুখে আসে না আর। খট্টাঙ্গকে ধরে নিয়ে যাওয়া থেকে মনটা তেতো হয়ে আছে। খট্টাঙ্গের অপরাধ কি? সম্বুদ্ধ পেয়াদার মুখের উপর বলেছে, সে তার গোলাম নয়। যখন খুশি তার কাছে পেয়াদা পাঠানোর কোন এক্তিয়ার নেই। সে তার এলাকার প্রজা নয়। সুতরাং তার যাওয়ার কোন প্রশ্ন উঠে না। দরকার থাকলে সম্বুদ্ধই তার কাছে আসতে পারে। এতে কি অন্যায়টা করল সে?

তার এত বড় স্পর্ধা আর দম্ভটা সম্বন্ধের অহঙ্কারে লাগল। তাই দলবল নিয়ে নিজেই এল। তাকে কোল-পাঁজা করে ঘর থেকে তুলে নিয়ে গেল। সকলে দেখল, কিন্তু কেউ সাহস করে বাধা দিতে এগোল না। অসহায়ের মত ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। খট্টাঙ্গের সঙ্গে তার লাঙল গরুও নিয়ে গেল।

এ কি অবিচার বলতো?

এ হল রাজায় রাজায় যুদ্ধ। মহারাজ ন্যাগ্রোধের ক্রোধ সহিষ্ণুতা সাহস ও শক্তিকে পরিমাপ করে দেখবে বলেই খট্টাঙ্গকে ধরে নিয়ে গেল সম্বুদ্ধ। মহারাজের প্রতিক্রিয়া বুঝে সে এ অঞ্চলের দখল নেবে।

রাজা ন্যাগ্রোধ এতবড় খবরটা এখনও পাননি বুঝি?

দেবার মত মানুষ কোথায়?

কেন, আমরা দিতে পারি।

তুমি একটা আস্ত নির্বোধ। মাথার উপর খাঁড়া ঝুলছে। যার সাহসে আমাদের সাহস তিনি যদি সব শুনে চুপ করে থাকেন, তা হলে এই দুঃসাহস দেখানোর পরিণাম কি হবে ভেবেছ? খট্টাঙ্গের মত একশ ঘা চাবুক তোমার বেয়াদপির জন্যে বরাদ্দ থাকবে, জেনো।

বেচারার জন্যে বড্ড কষ্ট হচ্ছে।

শুনলাম এই ঝাঁ ঝাঁ রোদ্দুরে গাছের ডালে ঝুলিয়ে তাকে বেত মারার আদেশ দিয়েছে সম্বুদ্ধ। সেকথা শুনে খট্টাঙ্গের মেয়ে মোহিনী ছুটেছে সম্বুদ্ধের গোলাবাড়িতে, বাপের প্রাণ বাঁচাতে। সামন্তরাজের হাতে পায়ে ধরে যে করেই হোক, তার ঐ একগুঁয়ে বাপের জন্য মার্জনা চাইবে।

মুখ বেজার করে বলল: দানবের মন তাতে গলবে না। শুধু মেয়েটাই শেষ হয়ে যাবে।

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে অন্যজন বলল: আমারও তাই আশঙ্কা। খট্টাঙ্গের কপালটাই মন্দ। একসঙ্গে সব হারাল। ওর কথা ভাবলে কষ্ট হয়।

শম্বুক আর স্থির থাকতে পারল না। দুরন্ত ক্রোধে উত্তেজনায় তার তারুণ্যের রক্ত চন্ চন্ করে উঠল। কাল বিলম্ব না করে সে ন্যাগ্রোধের কক্ষে প্রবেশ করল। প্রৌঢ় রাজা তখন দিবানিদ্রায় মগ্ন। কিন্তু শম্বুকের পায়ের শব্দে তার আঁখি উন্মুক্ত হল। রাঙা দুই চোখে পুত্রের দিকে তাকিয়ে বলল:

শম্বুক তোমাকে খুব উত্তেজিত মনে হচ্ছে। তোমার কি হয়েছে? কেউ কিছু বলেছে? শরীর ভালতো?

পিতা আমাদের সর্বনাশ হয়েছে। সামন্তরাজ সম্বুদ্ধ আমাদের রাজ্যের দিকে হাত বাড়িয়েছে। সে চায় বশ্যতা পরাভব।

তোমার কোন কথাই আমি বুঝতে পারছি না।

খট্টাঙ্গের উপর চাবুক হানার দৃশ্যটি সে মনে মনে কল্পনা করে চমকে ওঠল। শিউরে ওঠল বারবার। তার মুখে উদ্বেগ, কণ্ঠস্বরে উৎকণ্ঠা। বলল : পিতা সামন্তরাজ সম্বুদ্ধ আমাদের খট্টাঙ্গকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গেছে। এতক্ষণ হয়ত তার শরীর চাবুকে ক্ষত বিক্ষত হয়ে কত না রক্ত ঝরাচ্ছে। পিতা আমার আর ধৈর্য সহ্য হচ্ছে না। তাকে উদ্ধার করার আদেশ দাও তুমি। আমাদের কোন শৈথিল্য দেখানো উচিত নয়। তুমি শুধু আমাকে অনুমতি দাও।

ন্যাগ্রোধ বিস্ময়ে পুত্রের দিকে অপলক চেয়ে রইল। বুকের ভেতরটা তার উথলে ওঠার ভাব। স্নেহ যেন মোমের মত গলে গলে পড়তে লাগল। হৃদয় গহন থেকে উঠে এল একটি লম্বা শ্বাস। বড় তৃপ্তির, আর আরামের প্রশ্বাস। স্মিতহাস্যে বলল : পুত্র লোকে বলে তুমি দুরন্ত দুর্মদ, তোমাকে বশ করা যায় না। দন্ডকের বাঘ তুমি। তোমাকে নিবৃত্ত করব না। নির্ভয়ে তোমার কর্তব্য কর। উৎপীড়িতের ক্রন্দন তোমার বুকে যে সাগর রচনা করেছে আমি তাতে বাধা দেব না। তুমি যাও। অবাধ হোক তোমার যাত্রা। ঈশ্বর তোমার সহায় হউন।

শম্বুক আর এক মুহূর্ত দাঁড়াল না। বড় খুশি হয়ে পিতার পদধূলি নিল। তারপর বেরিয়ে গেল।

বনের সরু পথ ধরে অশ্বের পিঠে চেপে ঝড়ের বেগে শম্বুক তার পাঁচ অনুচরকে নিয়ে সম্বুদ্ধের গোলাবাড়িতে ভর দুপুরে হাজির হল। কপালের ঘাম মুছতে মুছতে সে ও তার সঙ্গীরা অশ্ব থেকে লাফিয়ে নামল। কৃষ্ণবর্ণ মুখখানা তার লাল টকটক করছিল। রাঙা দুটি চোখ মধ্যাহ্নের তপ্ত রোদের মত জ্বলজ্বল করছিল।

মাটিতে পা দিয়েই থমকে দাঁড়াল শম্বুক। একটা মহুয়া গাছের ডালে খট্টাঙ্গকে ঝুলিয়ে দৈত্যের মত একটা লোক চাবুক মারছিল, আর নিজে হাঁফাচ্ছিল।

খট্টাঙ্গের কোন হঁশ ছিল না। সারা পিঠে কপালে পেটে বুকে চাবুকের কালশিরে দাগ কেটে কেটে বসেছে। আর তা থেকে অঝোরে রক্ত চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ছে। জঙ্গলের বাঘ শম্বুকের বুকের ভেতরটা তোলপাড় করে উঠল হিংস্র রাগে। ভয়ঙ্কর আক্রোশে বাজখাই গলায় চিৎকার করল। গমগম করে ওঠল জায়গাটা সাবধান করে দেওয়া পাহারাদারের হাঁকের মত।

থমকে দাঁড়িয়ে গেল জল্লাদ। সম্বুদ্ধও খাঁড়া হয়ে বসল। চিৎকারটা কে করল এবং কেন করল তা বোঝার চেষ্টা করল।

আবারও চিৎকার হল: হুঁশিয়ার। মানুষ নয় বাঘের হুংকার যেন। আবার গমগম করে উঠল গোটা অঙ্গন। ভয় পেয়ে মহুয়া গাছের পাতাগুলো থরথর করে কেঁপে উঠল যেন। ঘরের চালে অবিরাম বক্-বকম করা পায়রা উড়ে গেল নীল আকাশের মাঝখানে শন্‌শন্‌ করে।

আওয়াজটা যেদিক থেকে এল সেদিকে অবাক হয়ে চেয়ে রইল সম্বুদ্ধ। ভাল করে নজর করে দেখল দন্ডকের বাঘ শম্বুক হিংস্র শার্দূলের মত জল্লাদের উপর লাফিয়ে পড়ে তার হাত থেকে চাবুক ছিনিয়ে নিল। শূন্যে সপাং সপাং করে শব্দ করল। চোখের পলকে তার অসি ঝলসে উঠল। বাঁধন কেটে খট্টাঙ্গকে মুক্ত করল। শুইয়ে দিল সবুজ ঘাসের উপর। তারপরে ঘুরে দাঁড়াল সম্বুদ্ধের দিকে। চোখ দুটো তার হিংস্র ক্রোধে জ্বলছিল। সম্বুদ্ধ ভয় পেল। আচমকা হুংকারে বুকের মধ্যে তার হঠাৎ কি যেন একটা ঘটে গেল। গভীর এক অনাস্বাদিত ভীতি যে তার বুকে লুকিয়েছিল, আগে কখনও জানত না। হঠাৎ করে সহস্র হাতে যেন ছুরি মারল তার বুকে। খুব ভয় হল সম্বুদ্ধের। ভয় শম্বুককে এবং তার কৃষ্ণকায় প্রহরীদের। শম্বুককে দেখার পর ওরা কি করে এই ভাবনায় সে দুর্বল হয়ে পড়ল। জঙ্গলের বাঘের চোখ এড়িয়ে পালাবে কোথায়? কিছু বুঝতে না পেরে পায়ে পায়ে সে এগিয়ে গেল শম্বুকের দিকে।

শম্বুক কাছে আসতেই সম্বুদ্ধ তাকে দুই হাত জড়িয়ে ধরে আলিঙ্গন করল। বলল: ধন্য ধন্য বীর।

তোমার সাহস দেখে আমি মুগ্ধ হলাম। সাহস প্রত্যয় ছাড়া মানুষের কি আছে? জীবনকে সুন্দর, এবং স্বাস্থ্যবান করতে চাই সাহস। সাহস শক্তিই মানুষের ভাগ্যলক্ষ্মী। দন্ডকের সৌভাগ্য ফেরানোর জন্য তোমার মত একজন সাহসী বুদ্ধিমান প্রত্যয়বান যুবকের বড় দরকার দন্ডকের। তোমার নেতৃত্বে দন্ডকের সেই সুদিন আসতে খুব বেশি দেরি নেই।

শম্বুক হক্‌চকিয়ে গেল। অবাক হল খুব। শম্বুক লক্ষ্য করল সম্বুদ্ধের গলার স্বর কাঁপছে। বুঝতে পারল ও নিজেই নিজের উপর আস্থা রাখতে পারছে না। ভীষণ ভয় পেয়েছে। তার অবস্থা দেখে একটা প্রচন্ড হাসি শম্বুকের বুক ঠেলে বাইরে বেরিয়ে এল। ঐ রাগের ভেতরেও নিজের মনে হো হো করে হাসতে লাগল।

সম্বুদ্ধ অবাক হয়ে চেয়ে রইল শম্বুকের দিকে।

হাসি থামলে শম্বুক চিৎকার করে বলল: বন্ধ করুন আপনার ঠাট্টা। আপনার ছলনায় ভোলার দিন শেষ হয়েছে। দন্ডকের দুর্ভাগ্য কাদের তৈরি? কারা দন্ডকের মানুষকে শৃংঙ্খল পরাল? দন্ডকের শান্তি সুখ সমৃদ্ধি দস্যুর মত কেড়ে নিল কে? সহজ সরল অকপট মানুষের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করল কারা? জবাব দাও সম্বুদ্ধ। জবাব দেবার দিন এসেছে। দন্ডক তোমাদের অত্যাচারে শাসনে শোষণে, লোভে বিশ্বাসঘাতকায় চঞ্চল, অস্থির, তপ্ত।

সম্বুদ্ধের সারা শরীর হিম হয়ে গেল। অপলক তার দুটি চোখ শম্বুকের মুখে স্থির হয়ে রইল।

শম্বুক রুদ্ধ ক্রোধে ও উত্তেজনায় হাঁফাচ্ছিল। গলা দিয়ে তার স্বর বেরোচ্ছিল না। কেবল একটা চাপা আর্তনাদ বেরোল শুধু। বলল: সব অশান্তির মূল নায়ক হল শ্বেতাঙ্গরা। কিন্তু কেন বলতে পার, দন্ডকের মানুষদের উপর তোমাদের এত ঘৃণা? বিদ্বেষই বা কেন এত? আমাদের গায়ের রঙ না হয় কালো, দেখতেও সুশ্রী নই। তোমাদের মত আমাদের আচরণ, চাল-চলন, কথা-বার্তা আকর্ষণীয় নয়। কিন্তু আমরা সরল স্বভাবের অকপট ভালমানুষ। সহযোগিতা, সহমর্মিতা, বিশ্বাসে আমরা আস্থাবান। কিন্তু তোমাদের কাছে ভালবাসা অপরাধ, বিশ্বাস করা পাপ। মৈত্রীর নামে বৈরীতা করাই ধর্ম। তাই তোমাদের বিশ্বাস করে, ভালবেসে আমরা ঠকেছি। বঞ্চিত হয়েছি। শুধু তাই নয়, তোমরা আমাদের হীন চোখে দেখ, নীচ অন্তজ বলে ঘৃণা কর। অস্পৃশ্য ভাব, মানুষের কোন গৌরব, মর্যাদা কোনদিন দাওনি তোমরা। কিন্তু গুণই মানুষের কৌলীন্য ও শ্রেষ্ঠত্ব নির্ণয়ের মানদন্ড হওয়া উচিত। যে মানুষের অন্তরে প্রসারতা নেই, স্নেহ, মায়া মমতা বিশ্বাস আনুগত্য নেই, মানবতার গুণগুলি যার অন্তরে থাকে না, জীবনের সুকুমার বৃত্তিগুলি যাদের অন্তরে ফুলের কীটের মত লুকিয়ে থাকে, যারা শুধু জীবনকে কুশ্রী করে, মানুষকে ঠকায় বঞ্চনা করে, প্রতারণা করে, অধিকার হরণ করে, ভেদাভেদের প্রাচীর গড়ে তোলে, তারা কি বর্ণশ্রেষ্ঠ এবং উচ্চশ্রেণীর মানুষ হতে পারে? উত্তর দাও সম্বুদ্ধ?

সম্বুদ্ধ নীরব। ভয়মিশ্রিত উত্তেজনায়, শঙ্কায় সে স্তব্ধ হয়ে শম্বুকের দিকে চেয়ে রইল। তার উদ্দেশ্য বুঝতে চেষ্টা করল। আর অতি সাবধানে মনে মনে নিজেকে মুক্ত করার নানা কৌশল করতে লাগল। কিন্তু শঙ্কিত ভাবনায় সব কেমন গন্ডগোল হয়ে গেল। কোন বুদ্ধিই খেলছিল না তার মাথায়।

কয়েকটা মুহূর্ত চুপ করে কাটল। শম্বুকের দুই চোখে হিংসায় জ্বলতে লাগল। বলল: আমার প্রশ্নের কোন উত্তর হয় না বলেই কোন জবাব দিতে পারলে না। মহামান্য সম্বুদ্ধ জঙ্গলের বাঘের হুংকার শুনেছে কিন্তু তার হিংস্র চেহারা দেখনি। তোমাদের শক্তি, মুরুব্বী তো শৃঙ্খলিত কালো মানুষগুলোর ভালমানুষী আর আনুগত্যের জোরে। কিন্তু ওরা-ও এই দন্ডকের মানুষ। ওদের এবং আমার গায়ের রঙ এক, ভাষা ধর্ম এক। ওরা আমার নিজের জাত। আমার মতই তোমার শৃঙ্খলিত। ঐ কালো ক্রীতদাসদের বুকে আগুন, চোখে ঘৃণা। তবু ওরা মুখ বুজে আছে। নিভন্ত আগ্নেয়গিরির মত ওরা কত ভয়ংকর তা তোমরা জান না। ওদের আনুগত্য তোমাদের শাসন আর অত্যাচারে অসহিষ্ণু হয়ে উঠছে। প্রতিবাদ, প্রতিহিংসায় ওরা গজরাচ্ছে। তুমি দেখতে পাচ্ছ না, কিন্তু বঞ্চিত মানুষের প্রতিনিধি হয়ে আমি দেখতে পাচ্ছি। তোমার চোখের কোন ইশারায়, কিংবা হুকুমে প্রহরীদের কেউ দন্ডকের বাঘের মুখোমুখি হবে না। তুমিও সে চেষ্টা কর না। জঙ্গলের বাঘ কখনও তার শিকার ছেড়ে পালায় না। আজ তোমার নিষ্কৃতি নেই। খট্টাঙ্গের মত তোমাকেও মহুয়া গাছের ডালে ঝুলিয়ে চাবুক মারব।

চাবুকের জ্বালা কি ভয়ংকর সমস্ত অনুভূতি দিয়ে তুমিও বুঝবে। পালাতে চেষ্টা কর না। তাহলে আমার তীরে তোমার শরীরটা ঝাঁঝরা হয়ে যাবে।

সম্বুদ্ধের সমস্ত শরীর এবং দুই হাঁটু থর থর করে কাঁপতে লাগল। ভেতরটা ভয়মিশ্রিত চাবুকের জ্বালায় যেন জ্বালা করতে লাগল। শম্বুকের পা' দুখানা জড়িয়ে ধরে তার একটু দয়া ও করুণা পাওয়ার জন্যে আকুতি মিনতি করতে লাগল।

শম্বুকের ভীষণ মজা লাগছিল। তার গোঁফের ফাঁকে হায়নার হিংস্র হাসি ফুটে উঠল। তারপর অনুচরদের দিকে তাকিয়ে তীরবিদ্ধ বুনো বাঘের মত ভয়ঙ্কর রোষে গর্জন করে উঠল: নিয়ে যাও ওকে। ঝুলিয়ে দাও মহুয়ার ডালে।

সেই সূচনা।

শম্বুকের প্রতি একটা অজ্ঞাত আকর্ষণ অনুভব করল উপেক্ষিত বঞ্চিত, শৃঙ্খলিত অরণ্যবাসী। সমস্ত দুঃখী মানুষের জন্য এই যুবক নির্ভয়ে অকাতরে নিজের প্রাণ পর্যন্ত দিতে পারে। অত্যাচারিত, শৃঙ্খলিত মানুষের মুক্তিই তার লক্ষ্য। সংগ্রামের পথেই অরণ্যবাসীর অভিশপ্ত জীবনের মুক্তি। শম্বুক শুধু তাদের চোখে আঙুল দিয়ে প্রতিকারের পথ, প্রতিরোধের পথ দেখিয়ে দিল। কিন্তু সেই পথে বেরিয়ে পড়ার সাহস তারা দেখাতে পারল না। নিজের ভেতরই যে তার একটা অন্ধকারের দিক ছিল। সেই দিকটার সঙ্গে যুদ্ধ করে বেরিয়ে এসে তার মুক্তি দাবি করতে পারল না। মৃত্যুভয় জয় না করলে, মুক্তি দাবি করবে কোথা থেকে?

শ্বেতাঙ্গদের বর্বর অত্যাচারের ভয়, দমন পীড়ন নির্যাতনের কষ্ট, বেদনা, যন্ত্রণা কৃষ্ণকায় অরণ্যবাসী ক্রীতদাসদের আত্মপ্রতিষ্ঠার ইচ্ছাকে সাহসকে মেরে ফেলেছে। তাদের স্বাধীন ও মুক্ত হওয়ার ইচ্ছাও মরে গেছে। শ্বেতাঙ্গরা অরণ্যবাসী জীবনে অনেক খর্বতা এনে দিয়েছে। তাদের জীবন ধারাই বদলে গেছে। যে মানুষ জঙ্গলের হিংস্র পশুর সামনে দাঁড়িয়ে নির্ভয়ে শিকার করে সেই নির্ভীক মানুষটির অন্তরে প্রবল শ্বেতাঙ্গ ভীতি শম্বুককে পীড়া দেয়।

এখন এদের ভয় দুর্বলতা চিত্তের বাধাকে আবিষ্কারের প্রশ্নটা শম্বুকের কাছে সব চেয়ে বড় হল। এই বাধা উত্তরণের উপরে তার কর্মপদ্ধতি নির্ভর করছে। প্রতিহিংসার বলে হঠাৎ কিছু করার মূল্য দিতে হবে নিরীহ দন্ডকবাসীকে। অবাধ্যতার শাস্তি কত ভয়ংকর আর কত নিষ্ঠুর হতে পারে তা অন্যদের দেখানোর জন্যেই তাদের চোখের সামনে তাকে জীবন্ত পুঁতে ফেলেছে, কাউকে হাত-পা কেটে যন্ত্রণা দিয়ে হত্যা করেছে। খাদ্য ও জল থেকে বঞ্চিত করে তিল তিল করে মেরেছে। এসব ঘটনাগুলো মনে পড়লে শম্বুক আর স্থির থাকতে পারে না। তার বুকের রক্ত টগবগ করে ওঠে। একটা হিংস্র প্রতিহিংসা বুকের পাঁজরে জ্বালা ধরিয়ে দেয়। নিজেকেই তাদের এই দুর্ভাগ্য এবং কষ্টের জন্যে দায়ী মনে হয়। এই বোধ উপলব্ধিই প্রতিকারের পথ দেখায়। অশান্ত অস্থিরতা তার ভেতর ঘৃণা বিদ্বেষের সংহত রূপ নেয়।

উপেক্ষা বঞ্চনার জ্বালায় জ্বলছিল গোটা দন্ডকের জাতিসত্তা। গোষ্ঠী প্রধানেরাও অসহায়ভাবে হা-হুতাশ করছিল। গোটা জঙ্গলের মানুষ অস্তিত্ব রক্ষার সংকটে ভুগছিল। শম্বুক এই অসহায়তার সুযোগ নিতে ভুলল না। অনেক আগেই সে মানুষের মন কেড়ে নিয়েছিল। তাই তাকে ঘিরে জঙ্গলের মানুষদের মধ্যে দারুণ উৎসাহ আর চাঞ্চল্য দেখা দিল। গড়ে উঠল তার এক নিজস্ব অনুগামীর দল।

শম্বুকের একটা নিজস্ব ভাবনা ছিল, সিদ্ধান্ত ছিল। একটা মনোভঙ্গিও ছিল। সেটা সময়ের থেকে পরিবেশের থেকে বেশ কিছুটা এগিয়ে। তাই শম্বুকের অল্প বয়স হলেও বুঝে নিয়েছিল, সব কিছুই অরণ্যবাসীদের পেতে হয় কঠিন সংগ্রাম করে। কিন্তু এবারে জীবন সংগ্রাম নয়, অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম। এর প্রতিপক্ষ প্রকৃতি নয় মানুষ। এ লড়াই বাঁচার লড়াই। সিদ্ধান্ত তাই খুব ভেবেচিন্তেই নিল শম্বুক। ক্রীতদাসত্ব থেকে দন্ডকবাসীকে মুক্ত ও নির্ভয় হওয়ার একটা নিজস্ব জমি পরিবেশ ও আবহাওয়া

আগে চাই। যেখানে দাঁড়িয়ে তারা মনে করতে পারে এটাই তাদের প্রকৃত আশ্রয়। এই আশ্রয় তার মানসিক ও ব্যবহারিক দুটো দিক হওয়া চাই।

এরকম একটা অনুভূতিতে আচ্ছন্ন চিত্তের মধ্যে সে জঙ্গলের বাঘের শিকার ধরার দৃশ্য দেখতে লাগল। কত বড় জন্তু কত শক্তি তার দেহে, তবু নিঃশব্দে খুব সাবধানে জঙ্গলে ঘোরে। আক্রান্তকারী বুঝতেও পারে না তার চতুর চলাফেরা। সমস্ত স্নায়ুকে সচেতনতার চরমে পৌঁছে দিয়ে দুই চোখে হিংসা জ্বেলে রাখে।

লোকে জঙ্গলের বাঘ বলে তাকে। কেন বলে জানে না। কিন্তু এই মুহূর্তে উপমাটা তার বড় সুন্দর লাগল। বাঘই বটে। শ্বেতাঙ্গরা তাকে ভয় পায়। আর ভয় পাবার কারণে কৃষ্ণকায় দাসদের উপর তাদের নানারকম নিষ্ঠুর অত্যাচার ও নির্যাতনের মাত্রা কেবলই বেড়ে চলেছে। এটাই হয় সংসারে। যে মানুষের অন্যের ক্ষতি করার ক্ষমতা অনেক তাকে সকলে ভয় করে, সমীহ করে। তার আঁচ অন্যের গায়ে যাতে না পড়ে সেজন্য এক ভয়মিশ্রিত উত্তেজনা সব সময় সৃষ্টি করা হয়, শুধু বিচ্ছিন্ন করার জন্য এবং ভয় পাওয়ার জন্য। শ্বেতাঙ্গরা কৃষ্ণাঙ্গদের মানুষ ভাবে না। জঙ্গলের নিরীহ পশু জানোয়ার মনে করে। পশুর মত পরিশ্রম করায়। এরাও দুবেলা খাবারের লোভে কেউ শান্তি ভঙ্গ করে না, শুধু এই প্রত্যাশাটুকুতে ভর করে বেশ আছে। শম্বুক ভাবে স্বাধীনতা এই সব নরম মানুষের জন্য নয়। এই সব নিষ্প্রাণ শব-এর উপর একদল নির্লজ্জ অর্থগৃধ্নু, ক্ষমতালিপ্সু, চক্ষুচর্মহীন শ্বেতাঙ্গ কাক শকুনের ভিড়। ভাবলেও গা-রি-রি করে। অথচ এই ধরনের ক্লীব মানুষের সংখ্যাই বেশী দেশে। নিজেকে মুক্ত ও স্বাধীন করার জন্য যতখানি সাহস দরকার তা দেখানো এদের ব্যক্তিত্বে কুলোয় না। অথচ আঘাত দেওয়ার জন্য এবং পাওয়ার জন্য মনে মনে প্রস্তুত করতে হয় নিজেকে। এই মেধা এবং শক্তি তাদের নেই। সুতরাং ওদের নিয়ে কি স্বপ্ন দেখবে?

শম্বুক হতাশ হয়ে এসব কথা একেবারেই ভাবতে চাইত না। কিন্তু মন মানত না। নিজেকেই সে প্রশ্ন করেছে, স্বাধীনতা মুক্তি কে কবে এমনি এমনি পেয়েছে? জীবনে যা কিছু পাওয়া যায় তার জন্য অনেক মূল্য ধরে দিতে হয়। এ হল সেই ধরে দেওয়া মূল্য। যাকে বলে, স্বাধীনতা, স্পৃহা ও চেতনা জাগানোর ইন্ধন। কেউ রক্ত দেয় কেউ অন্য কিছু। সবই মুক্তির ইমারত গড়তে লাগে। শম্বুক সেই ইমারতের কারিগর। প্রকৃত স্বাধীনতা মুক্তির পতাকা বহন করে আনে শুধুমাত্র সৎ পরিশ্রমী চরিত্রবান মানুষই। অন্তত লোকের চোখে নিজের কাছে সে তাই ভাবে। শ্বেতাঙ্গদেরও যেটুকু ভয়, দুশ্চিন্তা সে শুধু তাকেই। তাই নিজেকে জঙ্গলের বাঘ মনে করতে সে ভীষণ মজা পেল। সত্যিই সে বনের বাঘ হয়ে উঠবে। বাঘের মতই গভীর জঙ্গল থেকে নিঃশব্দে অতর্কিতে একেবারে অপ্রস্তুত অবস্থায় শিকারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে মুছে দেবে তাকে। একটা মানুষ যে কেমন করে হারিয়ে গেল জানবে না কেউ। শুধু যা থাকবে সে হল ভয়, আতঙ্ক। ভয় আতঙ্ক যখন মানুষের মনের দখল নেয় তখন ভয় পাওয়া কাঠবিড়ালির মত মন বুদ্ধি তার মনের পাতার গভীরে লুকিয়ে পড়ে।

অত্যাচারীর জবাব অত্যাচারে দেওয়াই সমাধানের সরল রাস্তা। জঙ্গলের বাঘের মত নিঃশব্দে অতর্কিতে হিংসাত্মক ঘটনা ঘটিয়ে শ্বেতাঙ্গদের মনের অভ্যন্তরে ভয় এবং অস্তিত্বের সংকট সূচনা করার কথা ভাবল শম্বুক। সে জানে শিকারের সঙ্গে লড়াইয়ে দন্ডকবাসী নির্ভীক। তীর ধনুক বর্শা সড়কী লাঠি হাতে শিকারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার আদিম উন্মাদনা তাদের রক্তে দামামা বাজায় সহজে। শম্বুক শ্বেতাঙ্গদের অবজ্ঞা বঞ্চনা অপমান অবমাননার বেদনাকে দন্ডকবাসীর স্পর্শকাতর আহত মনের দুয়ারে পৌঁছে দিয়ে অরণ্যবাসীকে বোঝাল সরল ভালবাসার বদলে ঘৃণাই যদি তাদের প্রাপ্য হয় তাহলে ঘৃণা দিয়ে প্রতিহিংসা গ্রহণ করতে হবে। শ্বেতাঙ্গ আর্যরা পরদেশী। চারাগাছের মতই দন্ডকের মাটি থেকে উপড়ে না ফেলা অবধি তাদের উন্নতির লক্ষ্যে পৌঁছানো অসম্ভব। যে জাতি নিজস্ব জাতিগত ভূমি চেনে না তাদের নাম ইতিহাস থেকে মুছে যাবে। এ হল তাদের বেঁচে থাকার লড়াই। লড়াই ঘৃণার বিরুদ্ধে। দুর্ব্যবহারের বিরুদ্ধে, বঞ্চনার বিরুদ্ধে, অবহেলার বিরুদ্ধে মানবিক মর্যাদার। তাদের সরলতা উদারতা স্বর্গীয় ভালবাসা নিয়ে শ্বেতাঙ্গরা তামাশা করে শুধু অপরাধ করেনি, তাদের অধিকার খর্ব করে ক্রীতদাসে পরিণত করে এক জঘন্যতম অপরাধ করেছে। এর কোন ক্ষমা নেই। অধিকার

কেউ কাউকে দেয় না অধিকার অর্জন করতে হয়। মনের গভীরে জঙ্গলের মানুষের যে ক্ষোভ জমে আছে সর্বগ্রাসী আগুনের লেলিহান শিখা হয়ে তা গোটা দণ্ডককে পুড়িয়ে ছারখার করে দিক। ধ্বংস করুক শ্বেতাঙ্গ সংস্কৃতি এবং অহংকারকে। শ্মশানের উপর তারা এক নতুন দণ্ডক গড়বে যেখানে সব শ্রেণীর সব মানুষের সমান অধিকার সমান মর্যাদা। শম্বুকের কথাগুলো তাদের অন্তঃচরিত্রে এক ব্যাপক পরিবর্তন ঘটানোর উৎসাহ যোগাল।

বিদ্রোহের উন্মাদনা এবং বিক্ষোভোর জ্বালায় অনেককাল ধরে জ্বলছিল তাদের জাতিসত্তা। শম্বুকের জেহাদ তাদের মন কেড়ে নিল। শম্বুকের আদেশ নির্দেশের অপেক্ষায় তারা উন্মুখ হয়ে রইল।

দণ্ডকের গ্রামগুলি শম্বুক ও তার অনুগামীদের পক্ষে খুব নিরাপদ ছিল না। আত্মগোপন করা খুব জরুরী হয়ে পড়েছিল। অতর্কিত আক্রমণ এবং হিংসাত্মক ঘটনা চালিয়ে যাওয়ার পক্ষে জঙ্গল খুব অনুকূল। তাই গহন অরণ্যের আড়ালে চলতে থাকল বিদ্রোহের প্রস্তুতি। শুরু হল অতর্কিত আক্রমণের বাহিনী গঠন।

ছয়

বেশ কিছুদিন ধরে রামচন্দ্রের মনটা ভাল যাচ্ছিল না। শম্বুককে নিয়ে তার আপাত সংকট। দণ্ডকে শম্বুক রামচন্দ্রের প্রভাব ক্ষুণ্ণ করার সংকল্প নিয়েই আত্মপ্রকাশ করল। শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গের বিরোধ বিভেদের জিগির তুলে কালো মানুষগুলোর স্পর্শকাতর মনকে শ্বেতাঙ্গ বিদ্বেষী করে তুলল। খুব সহজ ছিল না তার কাজ। তার অপূর্ব কূটনীতি রামচন্দ্রকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করল। কারণ খোলা তরোয়াল নিয়ে উন্মুক্ত প্রান্তরে সবার সামনে মুখোমুখি যে যুদ্ধ হয় সে লড়াই সকলের চোখে পড়ে। জয় পরাজয়ের মীমাংসাও হয় সবার সামনে। একে বলে সম্মুখ সমর। কিন্তু রাজনীতির গর্ভদেশে যে আগুন জ্বলে তা চোখে পড়ে না। শম্বুকের সঙ্গে লড়াই অনেকটা সেরকম। যেরকম লড়াই-ই হোক, তার মুখ্য কথা হল রাজনীতি। শম্বুকের লড়াই ঔপনিবেশিক শোষণ শাসন থেকে মুক্তি, দারিদ্র থেকে দাসত্ব থেকে এবং অর্থনৈতিক বৈষম্য থেকে মুক্তি। অর্থনৈতিক বঞ্চনার উত্তাপে রাজনীতির গর্ভদেশে সর্বদা জ্বলে, রামচন্দ্র সে কথা ভাল করেই জানে। সেই আগুনেই শম্বুক গা সেঁকে নিল সহজে। কিন্তু তার আঁচ লাগল অযোধ্যার রাজনীতিতে। লোকচক্ষুর বাইরে গোপনে সংঘাতের সেই ক্ষেত্রটি প্রস্তুত করতে শম্বুক শ্বেতাঙ্গদের মধ্যে বিরোধ ও বৈষম্যের উত্তাপ সঞ্চার করে এক জটিল অবস্থার সূচনা করল। যার ধাক্কা সামলাতে অযোধ্যার অর্থনীতি বড় রকম ঘা খেল।

এক শ্রেণীর শ্বেতাঙ্গের তাচ্ছিল্য করার পাপেই অবাঞ্ছিত রাজনৈতিক সংকটের উদ্ভব। স্বাধীনচেতা কৃষ্ণাঙ্গ জংলীদের প্রতি অমানবিক ব্যবহারের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হল এই ক্ষোভ। অপমানিত মনের বেদনা বোধ থেকে যে ক্ষোভের সৃষ্টি সেই ক্ষোভ অলক্ষ্যে তার সীমানা শুধু বিস্তৃত করছিল। মানুষের মনের গভীরে গভীরতম সে বেদনা শ্বেতাঙ্গরা ইচ্ছে করেই অবহেলা, উপেক্ষা করছিল। তাদের মানুষ মনে না করা, মানুষের মর্যাদা না দেওয়ার পরিণাম দণ্ডকের শ্বেতাঙ্গদের দুর্ভোগের এবং দুর্ভাগ্যের জন্য দায়ী। ঘটনা যাই হোক, রামচন্দ্রের শক্তিকে শম্বুক ভয় পায় না, সমীহ করে না, এই বিস্ময়টা রামচন্দ্রের কিছুতে গেল না। শম্বুকের ব্যক্তিত্বের এই তেজ ও প্রত্যয়কে রামচন্দ্র তার দম্ভ, ঔদ্ধত্য এবং স্পর্ধা বলে মনে করল। অযোধ্যা নরপতি রামচন্দ্রের বীরত্বের অহংকার এবং রাজমর্যাদা বোধকে শম্বুক তাচ্ছিল্য করে ; অশ্রদ্ধা করে ; এই অপমানবোধে তার চিত্ত জ্বালা করতে লাগল। শম্বুককে সে কিছুতে সহ্য করতে পারছিল না আবার ক্ষমাও করতে পারল না। একটা দুরন্ত ক্রোধ তার ধমনীতে ধমনীতে প্রতিহিংসার দাবাগ্নি জ্বালিয়ে দিল।

রামচন্দ্রের অপলক স্থির দুই চোখের তারায় ভাসে শম্বুকের অস্তিত্বরক্ষার সংগ্রামের ছবি। হিংসায় উন্মত্ত হয়ে দৈত্যের মত সে দাপিয়ে বেড়াচ্ছিল গোটা দণ্ডক। শ্বেতাঙ্গরা বিব্রত ও বিপন্ন বোধ করতে লাগল। সব সময় একটা উৎকর্ণ ভয় উৎকণ্ঠা আতংক নিয়ে তারা অসহায়ভাবে জীবন কাটাতে লাগল। অথচ এদের রক্ষার সব দায়িত্ব অযোধ্যার। অযোধ্যার সহিষ্ণুতা তাদের নিরাপত্তা সম্বন্ধে সন্দিহান করে তুলল।

মুনি ঋষিরা আক্রান্ত। তাদের যজ্ঞবেদী অপবিত্র করে, গৃহে বিষ্ঠা লেপন করে দন্ডক ত্যাগ করতে বাধ্য করল বিদ্রোহীরা। শ্বেতাঙ্গ সামন্তশ্রেণী এবং ভূস্বামীদের বীরদর্প, অহংকার এবং প্রতিরোধকে দুর্বল ও পঙ্গু করে দিতে অতর্কিতে তাদের সুরক্ষিত গৃহে হানা দিয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে তীর বর্ষণ করে নিঃশব্দে গা ঢাকা দিত তারা। সশস্ত্র বিদ্রোহীরা অকস্মাৎ আত্মপ্রকাশ করে দুষ্ট প্রকৃতির শ্বেতাঙ্গ মহাজনদের দিবালোকে অন্য শ্বেতাঙ্গদের সামনে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে অদৃশ্য হয়ে যেত। ভয় আতংক উৎকণ্ঠা দুর্বলতা তাদের মনের অভ্যন্তরে নিয়ে গিয়ে অস্তিত্বের সংকটকে তীব্র করে তোলা ছিল শম্বুকের কূট রাজনীতি। শ্বেতাঙ্গ আর্যরা নিরাপত্তার অভাবে ভুগছিল। অনেকে প্রাণভয়ে দন্ডক ছেড়ে অযোধ্যায় এবং আর্যাবর্তে ফিরে গেল।

কিন্তু এখন কি করলে সব কূল রক্ষা পায় সেই ভাবনাতেই রামচন্দ্রের কয়েকটা দিন কাটল। আর্যাবর্তের অবস্থা এমনিতে অশান্ত, দন্ডক থেকে সদ্য প্রত্যাগত শ্বেতাঙ্গরা তাতে ঘৃতাহুতি দিল।

অযোধ্যার রাজকোষ শূন্যপ্রায়। বিশাল দন্ডকের অরণ্য সম্পদ থেকে আদায় রাজস্ব ছিল একমাত্র ভরসা। কিন্তু সন্ত্রাসের দরুন সেখানে চাষ-আবাদ বাণিজ্য বন্ধ। শূন্য রাজকোষ পূর্ণ করতে অযোধ্যা এবং আর্যাবর্তের মানুষের উপর নানাবিধ কর চাপান হল। রাজস্ব দেওয়া হল সকলের ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক। অনাদায়ের দন্ড হল কারাবাস। স্বভাবত এই নিয়ে একটা চাপা অসন্তোষ আর্যাবর্তের মানুষের মনে ধূমায়িত হল। রামচন্দ্র-বিরোধী রাজন্যবর্গ এই অসন্তোষের ইন্ধন যোগাল গোপনে। জনগণের অসহিষ্ণুতাকে নিজেদের স্বার্থের অনুকূলে ব্যবহার করতে তারা ভুলল না।

রামচন্দ্র নিজের রাজ্যের আভ্যন্তরীণ সংকট সমস্যা নিয়ে বিব্রত। এই সংকটের মূলে আছে শম্বুক। তাকে ধ্বংস করা আশু প্রয়োজন, কিন্তু দন্ডকের গহন অরণ্যে দুর্গম অঞ্চলে তার আস্তানা। সেখানে তাকে খুঁজে বের করা সমস্যা। তাই প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের পথে না গিয়ে অন্যভাবে তার মোকাবিলার কথা ভাবতে লাগল। শম্বুকের ব্যক্তিত্বের দুর্বলতার রন্ধ্রপথটি সে মনে মনে পর্যালোচনা করতে লাগল।

রামচন্দ্রের বিষণ্ণ মুখ, তার উদভ্রান্ত চোখের বিহ্বল দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে সীতার বুকের ভেতরটা কেমন করে উঠল। স্ত্রীর কর্তব্য না করার অপরাধবোধে মনটা টাটাতে লাগল। কিছু ভাল লাগে না। বুকের ভেতর জমাট অভিমানের বরফ নিঃশব্দে গলে জল হয়ে গেল। সীতাও জানতে পারল না, কখন সে রামচন্দ্রের খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তার কেশে হাত রেখেছে।

সীতার চম্পক অঙ্গুলির স্নিগ্ধ পরশে রামচন্দ্রের চমক ভাঙল। শরীরের ভেতরটা কেঁপে উঠল। চোখে চোখ রাখতে বিদ্যুৎ খেলে গেল বুকের অভ্যন্তরে। হঠাৎ মনে হল প্রিয়তমা বৈদেহীই শম্বুকের মৃত্যুবাণ। বৈদেহীকে সে মাতৃজ্ঞানে পূজা করে, বৈদেহী তার ধ্যান জ্ঞান। বৈহেদীর ভেতর সে নাকি দুঃখিনী জন্মভূমিকে প্রত্যক্ষ করে। বৈদেহীই সে গল্প রামচন্দ্রকে শুনিয়েছিল। তার অনেক কথাই রামচন্দ্র ভোলেনি। শম্বুকের কথাগুলো সীতার কানের পর্দায় তীব্র ঝংকারে বাজতে লাগল।

উৎকর্ণ উৎকণ্ঠা নিয়ে সীতা শম্বুককে প্রশ্ন করল : পুত্র তোমার এই অশান্ত চেহারার দিকে তাকাতে পারি না। বড় ভয় করে। তোমার কি হয়েছে?

শম্বুক দীন নয়নে সীতার মুখ পানে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর ধীরে আত্মগত স্বরে বলল: জননী পায়ের তলায় আমার মাটি কাঁপছে। আমি স্থির থাকব কি করে! তুমিই তো শিখিয়েছ যে জাতি নিজের জাতিগত ভূমি চেনে না, সে জাতির নাম ইতিহাস থেকে মুছে যায়। তা হলে আমাদের জাতিসত্তা বলে থাকল কি?

পুত্র বড় কঠিন প্রশ্ন করলে আমায়। সামান্যা রমণী আমি। কখন কি বলেছি স্নেহ বশে জানিও না। ভাল করে বুঝিও না। তোমার প্রশ্নের জবাব দেবার মত বিদ্যেবুদ্ধি অভিজ্ঞতা আমার কোথায়? ইতিহাস নিজের পথে চলে, আর কাল আকর্ষণ করে তাকে। তুমি নিমিত্ত। ঠিক সময় একজন সাধারণ মানুষও ইতিহাসের নায়ক হয়ে যায়। এই যে তুমি দেশ দেশ করে অস্থির হচ্ছ। কেন? দেশের এত লোক তবু তুমি একা দেশ নিয়ে মাথা ঘামাও, ভাব। দেশের মানুষের তিক্ত দুঃখের কারণ বুঝতে পেরে সমাধানের পথ খুঁজছ, হয়ত খুব সচেতন ভাবে নয়, হয়ত সে প্রচেষ্টা এখনও খুব সীমিত; সাফল্য অনিশ্চিত, তবু তার একটা রূপরেখা তোমার মনের মাটিতে তৈরি করছে দেশ কাল। এমন

করে ইতিহাস নিজের প্রয়োজনে সুযোগ্য সন্তানকে তৈরি করে নেয়। আমার ধারণা ইতিহাস তার নিজের পথেই তোমাকে কেবল আকর্ষণ করছে। ইতিহাসের রথচক্রতলে নিজেকে নিবেদন করার জন্যে তুমি তৈরি থাক। একদিন তার ডাক পৌঁছবে তোমার কাছে।

বিদ্যুৎচমকের মত কথাগুলো রামচন্দ্রের মনের ভেতর ঝিলিক দিল। আর তখনই মনে হল সীতাকে দিয়ে শম্বুক নামক কাঁটাটিকে উৎপাটিত করা হয়ত যায়। সঙ্গে সঙ্গে এক বুক উৎকণ্ঠা যেন খালি হয়ে গেল। এরকম অনুভূতি আগে কখনো হয়নি। ভেতরের আনন্দে রামচন্দ্র একদৃষ্টিতে সীতার দিকে তাকিয়ে রইল। কথা বলতে ভুলে গিয়ে সে দেখতে লাগল শম্বুককে। নিজের সঙ্গে নিজের মনের কথা বলতে গিয়ে বুকের ভেতরটা তার কেঁপে উঠল একবার। সেই মুহূর্তে চোখটা নামিয়ে নিয়ে বলল: হঠাৎ এসময়ে তুমি?

প্রত্যাশ্যায় ব্যথা লাগার চমকানো বিস্ময়ে সীতার দুই ভুরু কুঁচকালো। চোখ তুলে প্রশ্ন করল: কেন আসতে নেই?

রামচন্দ্র উত্তরে মলিন হাসল। বলল : আস কৈ আর? তুমি আর আগের মত নেই। অনেক বদলে গেছ।

হঠাৎই সীতার ভালবাসার নরম মনটা প্রচন্ড ফুঁসে উঠল মনের ভেতর। ভীষণ বিমর্ষ দেখাল তাকে। ক্লান্ত ধরা গলায় বলল : জীবনটা বোধ হয় মানুষকে বদলে দেয়। তুমিও অনেক বদলে গেছ। এমন ব্যবহার কর যেন সম্পর্কটাই নষ্ট হয়ে গেছে। তোমার এই অবুঝপনা সইবার মত সহ্যশক্তি আমার আর নেই। অনেক সয়েছি। আমার সহিষ্ণুতাই বোধ হয় তোমাকে নিষ্ঠুর, বিবেচনাহীন জেদী করে তুলেছে।

হ্যাঁ, এখন তো আমি তোমার চোখে সবচেয়ে বাজে মানুষ আদর্শহীন পুরুষ।

সীতা গলা তুলে চিৎকার করে রামচন্দ্রের গলাকে ডুবিয়ে দেবে ভেবেছিল। কিন্তু অতখানি অশান্ত হতে পারল না। শান্তভাবে বলল : সে আমি নই। আমি এসেছিলাম তোমার কষ্টের ভাগ নিতে। কেন তুমি শান্তি পাচ্ছ না? কি হয়েছে তোমার? তুমি শান্ত না হলে আমি নিজেও শান্তি পাব না।

এক আশ্চর্য মুগ্ধ বিস্ময়ে রামচন্দ্র সীতার মুখের দিকে চেয়ে রইল। সীতা দু'পা এগিয়ে এসে রামচন্দ্রের পেছনে দাঁড়িয়ে তার হাত দুটি সোহাগে বুকের কাছে ঝুলিয়ে মালা গড়ল একটি। বলল: এখন আমরা একা নই আর। আমাদের ভালবাসার ভাগ নিতে আরো একজন আসছে। এত মান-অভিমান নিয়ে থাকলে তার সঙ্গে নতুন সম্পর্ক গড়ব কি করে?

হাসল রামচন্দ্র। বলল : ছোট্ট ঘর ছোট্ট মুখ, ছোট স্বার্থ দিয়ে বোনা আমার চারপাশ। কিন্তু বিধাতা ভুল করে ঐ গন্ডির বাইরে রেখেছে আমাকে। ছোট ছোট সুখগুলো আমাকে হাতছানি দেয়, প্রলুব্ধ করে কিন্তু আমার সীমানায় তার ডাক পৌঁছয় না। সাধারণ মানুষ হলে বলতাম, এই মান-অভিমানেই ভালবাসার আসল সম্পর্ক। মান এবং মানভঞ্জন এই টানাপোড়েন নারী-পুরুষের সম্পর্ককে বাঁচিয়ে রাখে। তাকে সঞ্জীবিত করে। কিন্তু বিধাতা এরকম বিধিবদ্ধ খাঁচার পাখি জীবন আমাকে দিল না! বোধহয় খাঁচায় আমার ব্যক্তিসত্তাটা ধরে না বলেই আমি মুক্ত স্বাধীন স্বতন্ত্র।

সীতা বেশ একটু ক্ষুব্ধ গলায় বলল: নিজেকে নিয়ে তোমার খুব গর্ব। জানি তুমি, অসাধারণ। কিন্তু আমি তো অসাধারণ নই। আমার দোষ কি?

বৈদেহী সব মানুষই পরপরস্পরবিরোধী। পুরুষ যেখানে অসাধারণ সেখানে সে ভীষণ একলা। নিদারুণ তার নিঃসঙ্গতা। সেই নিঃসঙ্গতার মানবিক যন্ত্রণা হতাশা নিয়ে তাকে চলতে হয়। কারণ, তাকে যেতে হয় অনেকদূর। সেখানে কেউ সহজে পৌঁছয় না, পৌঁছতে পারে না। একে অসাধারণ বলে ভাবলে আমার ওপরেই অবিচার করা হয়। নিজের ভেতরের নিজেকে পুরোপুরি জানার এই খোঁজ যেদিন থেমে যাবে সেদিন আমি বেঁচে থেকেও মরে থাকব বৈদেহী। আমার অনেক স্বপ্ন অনেক কল্পনা। তোমার মত নরম মনের স্ত্রী পেয়েছি বলেই' তো আমি রামচন্দ্র। আমাকে তুমি আমার মত করে বাঁচতে দাও লক্ষ্মীটি।

হঠাৎ সীতা চমকে উঠল। দুই চোখের কোণে জল ছলছল করে উঠল। ধরা গলায় বলল : সেই

কথাটাই বলতে এসেছি। রাজ্যের অশান্তিতে তোমার মন ভাল নেই। তাই নিজের উপর তুমি বিরক্ত। সর্বক্ষণ চিন্তা কর। একা একা বিড়বিড় কর। আমার সঙ্গে তোমার দুটো ভাল কথা পর্যন্ত হয় না। দেখা হলেই একটা ঝগড়া লেগে যায়। আসলে তোমার মনে যে তাপ জমেছে তার সব উত্তাপটুকু আমাকে সইতে হয়। আমিও তো একটা মানুষ। নিজের মনের সঙ্গে লড়াই করে আর কত পারি বল? তোমার মনের ঝড় বোধহয় আর থামবে না। ক্রমেই আরো উত্তাল অশান্ত হয়ে উঠবে। কারণ যারা তোমাকে ঘিরে আছে তারা এই ঝড় থামতে দেবে না, তাদের স্বার্থেই তোমাকে অশান্তি ভোগ করতে হবে। গন্ডির বাইরে থেকে খোলা চোখে মনে তোমাকে দেখি। অযোধ্যার শাসন ক্ষমতায় ফিরে আসার পর থেকে আর্যাবর্তের রাজনীতি নুতন রূপ নিল। নানারকম স্বার্থ সংগঠিত হয়েছে। এখন সংঘাত শুধু দন্ডককেশরী শম্বুকের সঙ্গে নয়, আর্যাবর্তের সঙ্গে তোমার, তোমার সঙ্গে তোমার নিজের।

সীতার কথায় রামচন্দ্র কয়েক মুহূর্তের জন্য থমকে গেল। বড় বড় চোখ করে তার দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর স্তব্ধ গম্ভীর গলায় বলল : আমি জানি। এসব খবর যে জানি না তা নয়। দক্ষিণ থেকে যে ঝড় উত্তর দিকে বইতে আরম্ভ করেছে তাকে দক্ষিণমুখী করে সাগরে বিসর্জন দেব যে-কোন মূল্যে। তুমি নিশ্চিন্ত থাক।

নিশ্চিন্ত হই কেমন করে। সংঘাতের বাইরে চেহারাটা সব নয়। রাজনীতির গর্ভদেশে যে আগুন জ্বলে তার উত্তাপ দেশময় ছড়িয়ে পড়ছে। অথচ তুমি তা চেয়েও দেখছ না। শম্বুক কিন্তু স্বেচ্ছায় সংকট ডেকে আনেনি। আর্যাবর্তের লোকেরাই তা সৃষ্টি করেছে। দন্ডকবাসীর সহজ সরল অকপট ভালবাসার সুযোগ নিয়ে বিনাবাধায় তাদের সব অধিকার কেড়ে নিয়েছে। তাদের বেঁচে থাকার দাবি খর্ব হয়েছে। অস্তিত্ব বিপন্ন করে দিয়েছে। প্রবল হতাশায় তারা মরিয়া হয়ে উঠেছে। বিক্ষোভ যত বেড়েছে আর্যরা ততই সাধারণ মানুষের শ্রদ্ধা এবং আস্থা হারিয়েছে। আর সেই শূন্যস্থান পূরণ করতে, বিক্ষোভের উর্বর জমিতে অতর্কিতে ঢুকে পড়েছে শম্বুক। জনগণের একচ্ছত্র অধিনায়ক।

রামচন্দ্র বেশ একটু ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলল : তাহলে শম্বুকের হয়ে তুমি দরবার করতে এসেছ বল।

সীতা একটু হাসল। বলল : একে দরবার মনে করলে ভুল হবে। ঝড় যদি নিজে থেকে তার পথ পরিবর্তন না করে তাহলে মানুষের সাধ্য নেই তার গতি পাল্টে দেবার। স্বামী তুমিও শম্বুককে ঈর্ষা কর, শম্বুকের সঙ্গে আমাকে জড়িয়ে অনেক কিছু কল্পনা কর। কিন্তু একটুও বোঝার চেষ্টা কর না, আমার কাছে কার আসন উঁচুতে? শম্বুক আমার জীবনরক্ষক। পুত্রবৎ। কিন্তু তুমি আমার জীবন সর্বস্ব। ইহকাল পরকাল; ধর্ম-সব। মেয়েমানুষের সব দাবি তার স্বামীর কাছে। পেটের সন্তানের কাছেও নয়। তোমার সুখের জন্য শান্তির জন্য আমি সব করতে পারি। কিন্তু শম্বুক কে? তার হয়ে তোমার আমার সম্পর্ককে তেতো করে তুলব, এত নির্বোধ আমি নই।

সারা অযোধ্যার লোক জানে শম্বুককে তুমি ইন্ধন যোগাও।

মিথ্যে কথা। অযোধ্যার লোক কিছুই বলে না। তোমার বেতনভুক কর্মচারীরাই তোমার আমার সম্পর্ক নষ্ট করছে। প্রশ্রয় দাও বলেই তারা সাহস পায়। নইলে রাজমহিষীর সম্পর্কে কোন কুৎসা কিংবা নিন্দা উচ্চারণের সাহস হত না তাদের। ছিঃ, কোন লম্পটও বোধ হয় তার স্ত্রীর সম্ভ্রম, মর্যাদা অন্যকে দিয়ে নষ্ট করে না। কিন্তু তুমি তার থেকেও নীচে নেমে গেছ। তাই স্ত্রীর সম্ভ্রম, রাজকুলের মর্যাদা নিয়ে ছেলেখেলা করছ। স্বামীর অবিশ্বাস সন্দেহ, নিয়ে বাঁচতে বড় ঘৃণা হয়। বাঁচার যন্ত্রণা অপমান নিয়ে বেঁচে থাকতে একটুও ইচ্ছে করে না। শুধু যে পেটে এসেছে, তার জন্যেই বেঁচে থাকা। সন্দেহ, উৎকণ্ঠা, উদ্বেগ, নানারকম জল্পনা কল্পনার পঙ্কিল আবর্তের মধ্যে বিবাহিত ভালবাসার বিশুদ্ধতা নষ্ট হয়ে যায়, শ্রদ্ধা অনুরাগের পুকুর শুকিয়ে যায়। পঙ্কে অবশ্য পঙ্কজ ফোটে। কিন্তু মনের পাঁকে খুব কমই ভালবাসা ফুল হয়ে উঠে।

রামচন্দ্র নিঃশব্দে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। বলল : আমিও জানি এই অবিশ্বাসের মত পাপ আর মূর্খমি এ সংসারে দুটি নেই। কিন্তু শম্বুক সম্পর্কে অনেক প্রশ্ন থেকে যায়।

প্রশ্নটা তোমার নিজের। শম্বুকের আতংকে তুমি দিশেহারা। তোমার মতলব আমি ভালই বুঝি। শম্বুকের নামের সঙ্গে আমার নাম জড়িয়ে তুমি একটা রাজনৈতিক ফয়দা তুলতে চাইছ। লঙ্কেশ্বর রাবণের বেলাতে যা করেছ এবারে তার পুনরাবৃত্তি হতে দেব না। ভারতবর্ষের মানুষের কাছে এবং

নিজের কাছেও তুমি আমাকে অনেক ছোট করেছ। তোমাকে আমি বিশ্বাস করি না। নিজের স্বার্থ নিরাপদ করতে তুমি সব পার। তোমার কাছে স্ত্রীর সম্ভ্রম পারিবারিক মর্যাদা দুইই মূল্যহীন।

বৈদেহী, আমার ধৈর্যের একটা সীমা আছে।

তোমার গৌরব বাড়ানোর জন্য আমাকে নিয়ে যা করছ তাতে আমার গৌরব নেই। আছে অপমান আর জ্বালা।

রামচন্দ্র রাগল না। চোখে মুখে ক্রোধের চিহ্নমাত্র নেই। বরং এক ক্লান্ত ঔদাসীন্যে তার মুখ পান্ডুর হল। আস্তে আস্তে বলল : বৈদেহী যে বীর, যার যোগ্যতা আছে, যে বড় কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ে অনেক অন্যায় তার দেহ স্পর্শ করে না। অন্যায় করেনি কে? দেবতারাও জেতার জন্যে কত ছলচাতুরীর আশ্রয় নিয়েছে, কত মিথ্যে বলেছে। যে দায়িত্ব নিয়েছি, সে দায়িত্ব তো পালন করতে হবে। যারা আমার নেতৃত্বের প্রতিদ্বন্দ্বী হতে চায় তাদের ধ্বংস করতে না পারলে আমার তৃপ্তি নেই।

শম্বুক তোমার রাজ্যের কোন সমস্যাই নয়। সে তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী এ কথা মনে করার কোন কারণ নেই। নিজের অঞ্চলের বাইরে তার কোন দাবি নেই। তার সমস্যা জাতিগত। সে চায় তার নিজের অঞ্চলের মানুষের নিরাপত্তা। যে ভবিষ্যৎ নষ্ট হয়ে গেছে তাকে ফিরিয়ে দেবার প্রতিশ্রুতি আর অস্তিত্বের স্বীকৃতি চাওয়াকে। বিচ্ছিন্নতা চাওয়া বলে না। তার কোন অশুভ উদ্দেশ্যও নেই। অযোধ্যার শাসনের অভ্যন্তরেই সে একটা বাঁচার মত পরিবেশ আর জাতিগত ভূমি চাইছে, এই প্রতিশ্রুতিটুকু পেলেই তাদের সব অসন্তোষ ঠান্ডা হয়ে যাবে। কিন্তু যত বাধা দেবে ততই তাদের ক্রোধ চরমে উঠবে। দাবাগ্নির মত জ্বলে উঠবে খেয়ে পরে বেঁচে থাকার অনিবার্য প্রয়োজনে।

এসব কথা আমিও যে না ভাবি তা নয়। কিন্তু আমার হাত-পা বাঁধা। উপায় নেই।

কেন নেই? সবাইকে নিয়েই তোমার বিশাল সাম্রাজ্য, দন্ডক তার বাইরে নয়। সকলে মিলে একসঙ্গে না থাকলে তার পরিবেশ তৈরি না হলে, ছোটখাট সুবিধে-অসুবিধে অমিলের কথা ভুলে না গেলে এক হয়ে বাস করতে পারবে না, বিশাল অযোধ্যাও তৈরি হবে না। দ্বীপের বাসিন্দা হয়ে কেউ বেঁচে থাকতে পারে না। দন্ডকে তাই হচ্ছে। দীর্ঘ হতাশা যে চরম বেপরোয়া মনোভাবের জন্ম দেয়, এইসত্য তোমার অজানা থাকার কথা নয়।

রামচন্দ্র নিরুত্তর। বুকের গভীর থেকে উঠে আসা লম্বা শ্বাস খুব ধীরে ধীরে পড়ল।

রাত এখন কত, কে জানে?

ঘুম আসে না রামচন্দ্রের। এপাশ ওপাশ করে। পাশ ফেরে। ঘাড় উঁচু করে দেখল বৈদেহী ঘুমুচ্ছে কিনা। ধীরে ধীরে উঠে বসল। রাতের শোভা দেখতে বারান্দায় দাঁড়াল।

আকাশ ভরা নক্ষত্র গোটা আকাশটাকে নরম উজ্জ্বলতায় ভরে দিয়ে পৃথিবীর দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে আছে। শত সহস্র চোখ মেলে তারারা যেন রামচন্দ্রকেও দেখছে।

ধ্রুবতারা এখন দক্ষিণ-পূর্ব থেকে উত্তর পশ্চিম আকাশে। ঘুমন্ত পৃথিবীর মাথার উপর নীরব প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে একা উজ্জ্বলতায় জ্বলছে। ধ্রুবতারা উত্তর আকাশে দাঁড়িয়ে চিরকাল পথ ভোলা মানুষকে পথ দেখিয়ে আসছে। কিন্তু রামচন্দ্রকে তার পথ নির্দেশ দেবার যেন কিছু নেই। রামচন্দ্রকে একা তা স্থির করতে হবে। এমন দিশেহারা রামচন্দ্র আগে হয়নি কখনও।

হঠাৎ রাতজাগা পেঁচার ডাকে রামচন্দ্রের ভেতরটা কেঁপে উঠল। পেঁচার ডাক অশুভ। রামচন্দ্রের মনটা বড় ভারী হয়ে আসে। অথচ কত দিন, কত রাত বনে জঙ্গলে এইসব ডাক শুনেছে। কিন্তু মনটা এমন করে দুর্বল হয়ে পড়েনি। আজ হঠাৎ মনের মধ্যে ঝড় উঠল। ঝড় উঠলেই উথাল পাথাল বুকের সমুদ্রে হতাশা অসহায়তার ঢেউগুলো চঞ্চল হয়। আর তখনই একটা চরম সিদ্ধান্তে পৌঁছে যায়। চরম সংকটে জড়িয়ে না পড়লে বোধ হয় মানুষ কোন সিদ্ধান্তই করতে পারে না।

সিদ্ধান্ত নিতে গিয়ে সীতার কথাগুলো বেশি করে মনে পড়ছিল। সীতা তার খোলা চোখ আর পরিচ্ছন্ন মন দিয়ে আর্যাবর্তের মানুষের স্বভাব ও চরিত্র উদ্ঘাটন করেছিল। তার পর্যবেক্ষণ ছিল

নির্ভুল। যথার্থই উপরতলার কিছু ধনী, সম্ভ্রান্ত এবং রাজানুগ্রাহী ব্যক্তিরাই অধিকার এবং সুযোগ-সুবিধাগুলো একা ভোগ করে। কিন্তু এর বাইরে আছে যে বিস্তর মানুষ, তাদের কাছে অযোধ্যার সমৃদ্ধি ও উন্নতি একেবারে মূল্যহীন। সেখানে আর্যাবর্তের অতি সাধারণ মানুষের সঙ্গে দন্ডকের শোষিত মানুষের কোন পার্থক্য নেই। তবে দন্ডকের চেয়ে আর্যাবর্তের সাধারণ মানুষের জীবন-যাপনের মান সাধারণ ভাবেই একটু উন্নত. অর্থনৈতিক দিক থেকেও তারা একটু বেশি সুখী। কিন্তু এই সুখ উন্নতি অস্বাস্থ্যের লক্ষণ। রাজা হয়ে রামচন্দ্র সেটা বুঝতে পারে না। কারণ, যারা তাকে পরিবৃত করে আছে, এই খবর কোনদিনই তারা দেবে না। প্রকৃতপক্ষে, রাজার দোষে নয়, তাদের স্বার্থ ও লোভে বঞ্চিত হচ্ছে সাধারণ মানুষ। সেই মানুষের কথা একটুও ভাবে না বলেই সীতা তাকে অভিযুক্ত করেছে। সীতার অভিযোগ মিথ্যা নয়। কিন্তু একথাও সত্য শম্বুকের আস্থা শ্রদ্ধা ভয় আনুগত্য আর তার আয়ত্তের মধ্যে নেই। সে তাকে প্রতিপক্ষের চোখে দেখে। তার রাজত্বের অনেক দোষ, স্খলন, রাজকোষের শূন্যতা, অপব্যয় অনাবৃষ্টি অজন্মা জনিত খাদ্যাভাব, দুর্ভিক্ষ দারিদ্র রাজনৈতিক বৈষম্যের কথা সে জানে। মানুষের মনে ঘৃণার বীজ সহজেই বপন করতে সক্ষম হয়েছে। এরকম একটা অবস্থা চলতে দিলে যে আস্থা ও শ্রদ্ধা অযোধ্যার মানুষের কাছে পেয়ে এসেছে তা আর গৌরবে অধিষ্ঠিত থাকবে না তাদের মনে। বিশ্বাস একবার গেলে তা পুনর্বার ফিরে আসে না। অযোধ্যা এবং আর্যাবর্তের প্রভাবশালী কিছু নরপতি শম্বুককে গোপনে রামচন্দ্র-বিরোধী প্রচারে ইন্ধন দিচ্ছে।

রাজনৈতিক স্বার্থকে শক্ত ও সবল করতে, প্রতিপক্ষ ও শত্রুর সঙ্গে লড়তে রামচন্দ্রের উৎসাহের অভাব হয় না। রমণীর ন্যায়বুদ্ধি শুধু বিভ্রান্ত করে। সীতার অভিযোগ, অনুযোগের উপর তার রাগ করা সাজে না। নিজের নীতির জন্য, আদর্শের জন্য, পথের জন্য নিজের মত হতে পারার জন্য দাম দিতে হয় অনেক। সে দাম দিয়েও একটা আলাদা সুখ পাওয়া যায়। এই সুখের নাম সীতার ভাষায় আত্মপ্রেম। সত্যিই নিজেকে ছাড়া কাউকে ভালবাসে না। শ্রদ্ধা করে না, স্বীকার করে না। যারাই আলাদা হয়, যারাই ব্যতিক্রম হয় তাদের মুখের ভাষা বুকের ভাষা সবাই বুঝতে পারে না। তাদের নিয়ে অনেক রহস্য জমে উঠে।

কত কথাই মনে ভিড় করে এল রামচন্দ্রের। ভাবনার যেন শেষ নেই। ভাবনাই বর্তমান সংকট ও সমাধান নিশ্চিত ও পরিপূর্ণ করতে সে চুপি চুপি বিছানায় এসে বসল। মনটা এখন বেশ তাজা এবং চাঙ্গা লাগল। দেহেও ক্লান্তি নেই আর। দ্বিধা কাটিয়ে কর্তব্য স্থির করতে মন দিল। কর্তব্য বড় কঠিন। কিছু কিছু কর্তব্য হল মায়া, দয়া, স্নেহ-মমতা প্রেম-ভালবাসা বর্জিত এক নিষ্ঠুর অনুশাসন।

অযোধ্যার সব মানুষ এখন গভীর নিদ্রায় মগ্ন। অযোধ্যার সম্রাট এখন আর্যাবর্তের অগ্রগতি নির্বিঘ্ন ও নিশ্চিন্ত করতে এবং রাজার আত্মত্যাগের এক ভাবমূর্তি গড়ে তুলতে সীতাকে অন্যত্র সরিয়ে দেবার সিদ্ধান্ত নিল। সীতা নির্বাসন প্রজারঞ্জক রাজার আদর্শের প্রতীক হয়ে ধ্রুবতারাব মত জ্বলতে থাকবে মানুষের মনে। আর্যাবর্তের কল্যাণে রামচন্দ্র প্রিয়তম মহিষীকেও বিসর্জন দিতে কুণ্ঠিত নয়। দেশের, দশের ও আর্যাবর্তের স্বার্থ রামচন্দ্রের কাছে দাম্পত্য প্রেমের চেয়েও বড়। ব্যক্তি প্রেমের সঙ্গে স্বাজাত্য প্রেমের এবং রাজকর্তব্যের যখন বিরোধ বেধেছে প্রজানুরঞ্জক রাজার আদর্শ তখন বড় হয়েছে তার কাছে। লোকে জানবে এবং শত্রুরা বুঝবে, রামচন্দ্রের কাছে রাজ্য ও প্রজার স্বার্থের চেয়ে বড় আর কিছু নেই। সত্যেব জন্য আদর্শের জন্য রামচন্দ্র কত কঠোর নির্দয় হতে পারে সীতাকে নির্বাসনে পাঠিয়ে দ্বিতীয়বার তা প্রমাণ করবে। নির্বাসনে সীতাকে পাঠালে বিরোধীদের পালের হাওয়া যে কিছুটা কেড়ে নিতে পারবে তাতে রামচন্দ্রের কোন সন্দেহ রইল না। বিরোধীরা সংযত হবে। শত্রু হতোদ্যম হবে। প্রজার বাধ্যতা ও আনুগত্য তখন আরও বেশি করে পাবে। আর শম্বুক সীতা নির্বাসনের নিদারুণ সংবাদে মর্মবেদনা অনুভব করবে আত্মানুশোচনায় জ্বলবে তার অন্তঃকরণ। রাজনীতির রহস্যময় নিঃসঙ্গ তায় এবং বিপুল হতাশায় ভুগবে তখন। অথবা মাতৃস্বরূপা সীতার অপমানের শোধ নিতে সংগ্রামকে আরো দ্রুত এবং প্রকাশ্য করতে পারে। এরকম একটা ধারণা রামচন্দ্রের মনে হল।

বেশ একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়ল রামচন্দ্রের। জানলা দিয়ে নিস্তব্ধ রজনীর শান্ত আকাশ অসংখ্য

তারার জ্যোতিতে আশ্চর্য সুন্দর দেখাচ্ছে। দেওয়ালে একটা টিকটিকি ঝট করে মাকড়সাকে ধরল আর আনন্দে ঝাপ্টাতে লাগল। সেই দৃশ্যের উপর রামচন্দ্রের দৃষ্টি স্থির ও অপলক।

মনের ভেতর বেশ কৌতুকবোধ করল।

চতুর্দিক খোলা বিশাল বারান্দায় চুপ করে বসেছিল রামচন্দ্র। মাথার উপর কারুকার্য করা সোনালী ছাদ। তাই আকাশ দেখতে পারছিল না। চারপাশের পরিবেশে সাজানো বাগানের নানারকম ছোটবড় গাছ আড়াল করে থম মেরে আছে।

বারান্দার পুব দিকে সকালের একফালি মিষ্টি রোদ খুবই তির্যকভাবে পড়েছিল। মসৃণ মেঝেতে তির তির করে কাঁপছিল তার আলো। সকালবেলার প্রকৃতি শান্ত, স্নিগ্ধ। একেবারে মৌন। সূর্যের আরাধনায় বসেছে যেন।

এসব মন কেড়ে নেওয়া দৃশ্যে রামচন্দ্রের মন ছিল না। মস্তিষ্কের মধ্যে একেবারেই ফাঁকা। বিশিষ্ট ব্যক্তির গাম্ভীর্য মুখে মেখে বসে আছে। ভোরেই ভাইদের সংবাদ দেওয়া হয়েছে। তাদের আসার সময়ও হয়ে গেছে।

অনেকক্ষণ অনড় হয়ে রামচন্দ্র চুপ করে বসেছিল। সকালের রোদের আলো দেবদারু কৃষ্ণচূড়া পাইন গাছের ঝিলমিল করা পাতার ফাঁক দিয়ে রামচন্দ্রের পায়ের কাছে মাকড়সার জালের মত হয়ে আছে। রামচন্দ্রের দুই চোখ তার উপর স্থির। বেশ আতঙ্কিত চোখে চেয়ে থাকে কিছুক্ষণ। তারপর বিশাল ফাঁকা বারান্দার চারদিকে তাকাল। হঠাৎ নাভির কাছ থেকে একটা কাঁপুনি উঠে এল শ্বাসের সঙ্গে।

এমন সময় দৌবারিক এসে জানাল মন্ত্রণাগৃহে কনিষ্ঠ ভ্রাতাবা অপেক্ষা করছে।

রামচন্দ্রের কুঞ্চিত ভুরু সটান হল। কিছুক্ষণ শূন্য চোখে চেয়ে রইল তার দিকে। তারপরেই বেশ একটু গম্ভীর হয়ে চোখের ইশারায় তাকে চলে যেতে বলল।

একটা ঘোরের মধ্যে মন্ত্রণাকক্ষে ঢুকল। বিবর্ণ মুখে চেয়ে রইল ভ্রাতাদের দিকে। কয়েকটা মুহূর্ত কাটল। একটু ভেবে নির্বিকার গলায় বলল : তোমাদের সঙ্গে কিছু শলাপরামর্শের প্রয়োজন হল। বর্তমানে একটা সংকটের ভেতর দিয়ে আমরা চলেছি। এই সময় তোমাদের মত পরম আত্মীয় ও বন্ধুর পরামর্শ চাই। তোমরাই বল বৈদেহীকে নিয়ে আমি কি করব? অযোধ্যায় সে আজ সর্বাধিক আলোচিত মহিলা। তাকে নিয়ে রাজ্যের জনগণের মনে অনেক সংশয় ও প্রশ্ন জেগেছে। তারা ন্যায়বিচারের প্রশ্ন তুলেছে। দেশের যে প্রচলিত আইনে পাঁচজনের বিচার হয় সে আইন রাজমহিষীর বেলায় প্রযোজ্য হবে না কেন? আইনে রাজা ও প্রজার মধ্যে বৈষম্য থাকবে কেন? অপরাধের শাস্তি সর্বক্ষেত্রে এক হওয়া উচিত। ব্যক্তি বিশেষে আইন আলাদা হবে কেন? তোমরা বল এসব কথার উত্তর দেওয়া যায়?

ভরত একটু অবাক হয়ে অস্ফুট স্বরে প্রশ্ন করল : বৈদেহীর অপরাধ।

লঙ্কেশ্বর রাবণের বৈদেহী অপহরণের ঘটনাকে তারা এখনও মন থেকে মুছে ফেলতে পারেনি। বৈদেহীর নিষ্কলুষ চরিত্র সম্পর্কে তাদের সংশয় দিন দিন প্রবল হচ্ছে। সুবিচারের হতাশায় ভুগছে। প্রজানুরঞ্জক রামচন্দ্রের ভাবমূর্তি নষ্ট হচ্ছে। এ অবস্থায় তাদের সন্তোষ উৎপাদনের জন্য এবং আমার প্রতিশ্রুতি পালনের জন্য বৈদেহীকে স্থানান্তরে পাঠানো আবশ্যক হয়ে পড়েছে। বৈদেহীকে চোখের আড়াল করলে তাদের মনের অসন্তোষ এবং নিন্দেটা চাপা পড়ে যাবে। এত বড় নিষ্ঠুর কথাটা উচ্চারণ করতে আমার খুব কষ্ট হচ্ছে, বুক ফেটে যাচ্ছে! কিন্তু কর্তব্য বড় নির্মম।

ভরত নির্বাক। রামচন্দ্রের কথাগুলো তাকে অবাক করে দিল। মুখ চোখে তার একটা অস্বস্তির ভাব ফুটে বেরোল।

লক্ষ্মণ চমকে উঠল। রামচন্দ্রের দিকে চেয়ে বলল তোমার সঙ্গে বৈদেহীর কোন কলহ হয়েছে নিশ্চয়ই। তোমার মন ভাল নেই। এমনিতে অযোধ্যা অশান্ত, দণ্ডক অগ্নিগর্ভ। তুমি শান্তিতে নেই বেশ বুঝতে পারি। কিন্তু তাই বলে স্বামী-স্ত্রীর কলহ নিয়ে মাথা উত্তপ্ত করা কাজের কথা নয়।

শত্রুঘ্ন একটু সাহস সঞ্চয় করে বলল: কোথায় কে কি ভাবল, বলল তাই নিয়ে বিচার-বুদ্ধিহীন সাধারণ লোক যা খুশি মনে করতে পারে, কিন্তু রাজার তা নিয়ে মাথাব্যথা থাকা উচিত নয়। বিশেষ করে বৈদেহী যেখানে নির্দোষ নিরপরাধ, অপাপবিদ্ধা পবিত্রা। লোকের কথায় বৈদেহীকে নির্বাসন করলে সমস্যার সমাধান হবে না। কর্তব্যের আহ্বানে তাঁদের মনের সন্দেহ এবং বিভ্রান্তি দূর করার উদ্যোগ নিতে হবে। কর্তব্যের আহ্বানে এই মিথ্যা অপবাদের বিরুদ্ধে আমাদের রুখে দাঁড়ানো উচিত।

ভরত স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলল: অগ্রজ তুমি আমাদের ধ্যান, জ্ঞান। তোমার কোন কথার প্রতিবাদ করিনি কখনও। কিন্তু বৈদেহী সম্পর্কে তোমার সিদ্ধান্তকে মেনে নিতে মন সায় দিচ্ছে না। ধর্মবুদ্ধি বাধা দিচ্ছে। এতবড় অবিচার বিধাতাও বোধ হয় নীরবে মেনে নেবে না। তা-ছাড়া যে জনগণের কথায় তুমি বৈদেহীকে স্থানান্তরে পাঠাচ্ছ তাদের সংখ্যাও খুব নগণ্য। জনগণের অন্যায় দাবি শুনে যদি বৈদেহীর নির্বাসন দাও তাহলে একদিন তাদের অনেক অন্যায় দাবি মেটাতে গিয়ে নীতির দিক থেকে তোমাকে দেউলিয়া হতে হবে। এ বড় সাংঘাতিক অবস্থা।

রামচন্দ্রের মুখ লাল হয়ে এল। একটু ভেবে বলল: আমি প্রজাদের রাজা। একজনও প্রজার মনে অভিযোগ রাখব না, এই অঙ্গীকার করে সিংহাসনে বসেছিলাম। আমার প্রতিশ্রুতিকে মূল্যহীন করে সিংহাসনে বসে থাকার মত অপমান আর নেই।

শত্রুঘ্ন বলল: মান অপমানের প্রশ্ন তুলে তুমি সমস্ত ব্যাপারটা জট পাকিয়ে ফেলেছ। আসলে নিজের সুনাম খ্যাতি বাঁচাতে গিয়ে সবচেয়ে আরো একটা বড় দায়িত্ব এড়িয়ে যাচ্ছ। বৈদেহী আসন্নপ্রসবা। এ অবস্থায় তাকে স্থানান্তরে পাঠানো মানবিক অপরাধ। অধর্ম তো বটেই। প্রজাদের এই অন্যায় অসংগতি দাবি আজ নয়, পাঁচ বছর আগে যখন অযোধ্যায় ফিরে এলে তখন গ্রহণ করা উচিত ছিল।

মৃদুস্বরে ভরত বলল: তা সত্যি।

রামচন্দ্রের নীরব বিস্মিত চোখে চোখ রেখে লক্ষ্মণ আস্তে আস্তে বলল: যদি ভয় পাও, তাহলে বৈদেহীকে ফিরিয়ে আনলে কেন? রাজনীতি রাজত্ব করা ছাড়া তোমার কি আর কোনও কাজ নেই? একদিন কর্তব্যের আহ্বানে তোমার পাশে দাঁড়িয়েছিলাম। আমার পক্ষে যতখানি ঐকান্তিক সেবা ও ত্যাগ সম্ভব তার চেয়ে বেশি করেই—

লক্ষ্মণের কথা শেষ করতে দিল না রামচন্দ্র। উত্তেজনায় কাঁপছিল। হঠাৎ একটু দিশাহারা হয়েই ক্রুদ্ধ স্বরে উচ্চারণ করল: লক্ষ্মণ।

সেই ডাকে লক্ষ্মণ থমকে গেল। তার ভিতরকার গনগনে রাগের আঁচ টের পেয়ে চুপ করল।

রামচন্দ্রের বুক জুড়ে একটা অসহিষ্ণু রাগ আর ক্ষোভের স্রোত বয়ে যাচ্ছিল। উচিত অনুচিত বোধ লুপ্ত হয়ে গেল। মুখে চোখে একটা চাপা উত্তেজনা ছিল। ঝাঁঝালো গলায় বলল : আমি শুধু তোমাদের ভাই না, অযোধ্যার রাজাও বটে। তোমরাও জান রাজার কথার উপর প্রতিবাদ চলে না। বাদানুবাদকে বলে বিরোধিতা, শত্রুতা। তোমরা আমাব বড় আদরের ভাই, সম্পর্কটা তেতো হয়ে উঠুক তা আমি চাই না। কিন্তু আমাদের কথাবার্তা সে দিকেই এগোচ্ছে। অথচ তোমরা ভাল করে জান, আমি অপবাদের ভয় করি এবং অকীর্তিকর কিছু করি না। এই দুয়ের জন্য শুধু বৈদেহীর কথা কেন, নিজের প্রাণ এমন কি তোমাদেরও পরিত্যাগ করতে পারি। লোকে কীর্তির পূজা করে। অকীর্তিকে বিসর্জন দেয়। আমিও বৈদেহীকে বিসর্জন দেব। তোমরা এসবের মধ্যে থাকতে যেও না। তারপর একটু থেমে সকলকে নিরীক্ষণ করল। লক্ষ্মণের উপর দৃষ্টি স্থির। গম্ভীর গলায় বলল: লক্ষ্মণ আগামীকাল প্রভাতে তুমি সীতাকে গঙ্গার পরপারে তমসার নির্জন অরণ্যে পরিত্যাগ করে আসবে।

লক্ষ্মণের বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠল। বুকের মধ্যে অভিমানের একটা তুফান উঠল। রামচন্দ্রের উপর রাগ হল ভীষণ। মুখে থমথমিয়ে উঠল একটা বিতৃষ্ণার ভাব। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল: এত বড় একটা কঠিন দায়িত্বের কাজ আমাকে দিয়ে কেন নিমিত্তের ভাগী করতে চাও। আরও অনেকে তো আছে। এসব থেকে আমাকে অব্যাহতি দাও। আমি আর পারছি না।

রামচন্দ্রের ভেতরটা একটু চঞ্চল হল। বিচলিত ভাবটা নিজের ভেতর গোপন করে তেজী চোখে

চেয়ে গম্ভীর গলায় বলল: সুমন্ত্রর রথে তুমিই বৈদেহীকে স্থানান্তরে রেখে আসবে। আর কেউ নয়। বিশাল পৃথিবীর কোথাও না কোথাও তার জায়গা হবে। এতে তোমার কোন অধর্ম হবে না। রাজা দেশ পালনই তোমার ধর্ম। রামচন্দ্র আর দাঁড়াল না। নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল। লক্ষ্মণের চোখ ফেটে জল এল। মনে হল এর চেয়ে শাস্তি ভাল ছিল।

রাজাদেশে লক্ষ্মণ সীতার কক্ষে হাজির হল সকালে। সদ্যস্নাতা সীতার পরিপাটি বেশবাস এমন একটা স্নিগ্ধ কমনীয়তা এবং শ্রী-দান করছিল যে. সেদিকে তাকিয়ে লক্ষ্মণের মনে হল বৈকুণ্ঠনিবাসী কমলা দাঁড়িয়েছে তার সামনে। শ্রদ্ধায় ভক্তিতে মনটা ভরে উঠল।

সাত সকালে লক্ষ্মণের আকস্মিক আবির্ভাব সীতাকে খুব অবাক করল। কিছুক্ষণ অপলক তার দিকে চেয়ে থেকে বলল: দেবর। সকাল বেলায় এদিকে পথ ভুল করে এলে কি? পরিচারিকার কথা শুনে ভাবলাম তারা ভুল করেছে। কিন্তু এখন দেখছি ভুল আমারই। এসে ভালই করেছ। তোমাকে দেখে বড় ভাল লাগছে। ভীষণ আনন্দ হচ্ছে।

লক্ষ্মণ অবনত চোখ তুলে তাকাল সীতার দিকে। চেখের পাতা কেঁপে গেল। মুখের ভাব বদলে গেল। কথা বলতে গিয়ে থেমে গেল। গলাটা কে যেন চেপে ধরল সেই মুহূর্তে। মিথ্যে কথা ভাল করে বলা অভ্যাস নেই তার। রামচন্দ্রের মত মিথ্যে বলা কিংবা মানুষের সঙ্গে ছলনা করার অভিনয়ে পটু নয় সে। তার মধ্যে কোনরকম মিথ্যেচার ব্যাপারটা নেই বলে, এই মিথ্যেচারী ভন্ড পৃথিবীতে তার এত হেনস্তা।

লক্ষ্মণকে চুপ করে থাকতে দেখে সীতা হাসি হাসি মুখ করে বলল : বুঝেছি, উর্মিলার সাথে একটা ঝঞ্ঝাট কিছু পাকিয়েছ। তোমার চোখ মুখ বলছে। সাত সকালে তাই সালিসির আর্জি নিয়ে এসেছ। আমি বাপু তোমাদের ঝগড়াঝাঁটির ভেতর নেই। তবে, তোমাদের পুরুষ জাতটার বৌদের কাছে একটু হেনস্থা হওয়া দরকার। সীতা দুচোখ টানটান করে মুখ টিপে হাসল।

লক্ষ্মণ চুপ করে সীতার দুচোখের দিকে চেয়ে রইল। কথা বলল না। সীতার চোখের মধ্যে তার চোখের দৃষ্টি এমন বিষণ্ণ আর করুণ করে তুলল লক্ষ্মণ, যেন একটুও তা চোখ উপচে বাইরে পড়ে নষ্ট না হয়। সীতা এই চাউনি চেনে। অকস্মাৎ তার সারা শরীর সিরসিরানি ওঠল। ভয় পাওয়া গলায় বলল : ভালবাসা বড় সাংঘাতিক। মানুষের প্রাণে এত ভালবাসা বিধাতা কেন দিল? ভালবেসে যদি সুখ না পাওয়া গেল, তবে কেন এই ভালবাসা। এই অসহ্য মানসিক যন্ত্রণার কোন সান্ত্বনা নেই। মনের কষ্টের কাছে শরীরের কষ্ট কিছু নয়।

লক্ষ্মণের বুকের মধ্যে ভীষণভাবে মোচড় দিল। সীতার মনে জমানো কষ্ট দেখে তার নিজের যে এত কষ্ট হবে, ভাবতে পারেনি। সীতার জন্য বুকটা টাটাতে লাগল। তার কষ্টের প্রতি একটু সহানুভূতি জানাতে বলল : সত্যি আমি তাই ভাবি। ভালবাসায় এত কষ্ট কেন? একটা হৃদয়াবেগ ছাড়া তো কিছু নয়। বলা যেতে পারে একটা অভ্যাস। এই অভ্যাস কাটানো কষ্টকর কিছু নয়। মানুষ যদি একা থাকে তা হলে অনেক বেশি সুখে থাকবে সে।

লক্ষ্মণ রাগ করে কিংবা চেঁচিয়ে নয়, শুনিয়েই কথাগুলো বলল খুব ধীরে ধীরে। সীতা কি বুঝল সেই জানে। লক্ষ্মণের দিকে তাকিয়ে একটু হাসল। মেয়েরা পুরুষের সামনে যেমন হাসে। লাজুক সহমর্মিতার সে হাসি। বলল: না তোমাকে একলা থাকতে হবে না। একা থাকার বড় কষ্ট। বড় জ্বালা তুমিও জান। যাকে ভালবাস তাকে না পেলে জীবনটা কেমন মিথ্যে হয়ে যায়। ভালবাসা সব কিছুকে অর্থপূর্ণ করে তোলে। কিন্তু যে ভালবাসেনি, তার জীবন বৃথা। শ্রদ্ধা আর সম্মান দিয়ে নর-নারীর ভালবাসার ভিত গড়ে ওঠে। যেখানে এসব কিছু নেই, সেখানে এক পক্ষের ভালবাসায় হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে পুরো সম্পর্কটা। পুরুষেরা যেদিন মেয়েদের ভালবাসা তার অনুরাগ দীপিত অভিমানকে সত্যিকারের মর্যাদা দেবে, সহানুভূতি দেখাবে, তার সমব্যথী হবে সেদিনই এদেশের নারী পুরুষের ভালবাসা নিয়ে গর্ব করতে পারবে। কিন্তু এই গর্ব করার মত কটা মেয়ে আছে? মেয়েদের ভালবাসা

মরে পড়ে আছে পায়ের কাছে ঐ রোদের মত। পুরুষের মধ্যে সেই মহৎ বোধটাই নেই। তাই এই দশা।

সীতার কথা শুনে লক্ষ্মণ চমকে উঠল। সীতার জন্য তার বড় কষ্ট হচ্ছিল। এই ছলনায় সে নিজে থেকে একটা লজ্জা বোধ করল। অনুতাপ হল। ভীষণ খারাপ লাগল। সীতার কাছে মুখ লুকোনোর মত জায়গা ছিল না। সে জানলার দিকে চেয়ে রইল। কয়েকটা মুহূর্ত নীরবে কেটে গেল। তারপরেই লক্ষ্মণ কিছু আত্মগতভাবে বলল : আজকে ঘুম ভাঙল বড় এক সুন্দর চমকে। একজোড়া পাখির ডাকে আমার ঘুম ভাঙল না শুধু, আমাকে উতলাও করে তুলল। এ পাখিদের ডাক বড় একটা শোনা যায় না এদিকে। আমার জানলার সামনে দেবদারু গাছের উপরে ডালে বসেছে একজন, আর একজন ঠিক তার নীচের ডালে। উপরের ডালের পাখিটা ভালবাসা ঠোঁটে করে ডাকছে বৌ কথা কও, বৌ কথা কও; তারপরেই নীচের ডালের পাখিটা দু'চোখের জ্বালা নিয়ে ডাকছে চোখ গেলো, চোখ গেলো। অমনি ঘুম ভেঙে গেল। ঘুম ভাঙার পরেই তোমার কথা বেশি করে মনে পড়ছিল। সুন্দর ঘুমের যা কিছু গভীরতর সুখ হারিয়ে গেল। বুকের অতল থেকে উঠে আসা কি এক দীর্ঘশ্বাস গভীর শূন্যতা, যন্ত্রণা, হাহাকার নিয়ে অনেক পাহাড় মাঠ পেরিয়ে আকাশের নীলের মধ্যে হারিয়ে গেল। কিন্তু তার সুরটুকু বাতাসে লেগে রইল। চুপিসারে পা পা করে কখন সে আমাকে এখানে এসে হাজির করল নিজেও জানি না।

সীতার মুগ্ধ দুটি চোখ লক্ষ্মণের চোখের উপর স্থির। কিন্তু অধরের ফাঁকে দুর্বোধ্য হাসি। এখন কোন কথা নেই ঘরে। অনেকক্ষণ সময় কেটে গেল। দু'জনেই কী বলবে ভেবে পায় না। সীতা জানলার কাছে গিয়ে শিক ধরে দাঁড়িয়ে বাইরের দিকে চেয়ে রইল। অস্ফুট স্বরে বলল : তোমার কথাগুলো এক নতুন মানে বয়ে নিয়ে এল। তুমি কিছু বলতে চাও, এ কেবল তার ভূমিকা। যে কপাল নিয়ে আমি এই পৃথিবীতে এসেছি তাতে কারো কাছে আমার অভিযোগ, অনুযোগ নেই। আমি সব কিছুর জন্যেই প্রস্তুত। অনুযোগ অভিযোগ কার কাছে করব? এসব চলে নিজের মায়ের কাছে আর বিধাতার কাছে। অন্যের কাছে জানাতে গেলে নিজেকে শুধু ছোট করা হয়। কী দরকার। তুমি যা বলতে এসেছ নির্ভয়ে বল।

লক্ষ্মণের বুক তোলপাড় হল। সঙ্গে সঙ্গে সে অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নিল। মাটির দিকে চেয়ে বলল: বৌঠান আমি সব জানি, সব বুঝি। তোমার জীবনটা এভাবে নষ্ট করছ কেন? নিজেকেও বোধ হয় তুমি ঠকাচ্ছ। জীবনটা বাঁচার জন্য, প্রতিমুহূর্ত পস্তাবার জন্য নয়। আমি জানি, শ্রীরামের অনুরাগ সত্য নয়। কিন্তু তিনি রাজা। রাজা হওয়ার অনেক জ্বালা।

লক্ষ্মণের সহানুভূতির স্পর্শে সীতার মনটা খারাপ হয়ে গেল। বিষণ্ণ মুখে হতাশ গলায় বলল : এসব কথা আমারও যে মনে হয় না তা নয়। কিন্তু কী করতে পারি? শ্রীরামের একটু দরদ, সহানুভূতি ভালবাসা পেলে বোধ হয় এমন করে তিলে তিলে মরতে হত না আমায়। আমাব কিছু ভাল লাগছে না। মনটা ভাল নেই। কোথাও গিয়ে নিজের মত থাকতে পারলে বেঁচে যেতাম হয়ত। আমি বুঝতে পারি, শ্রীরামের আমিটা আমার মধ্যে আঁটছে না। আমাকে উপছে অন্য মানুষের দিকে যেতে চাইছে। আমার প্রয়োজন তার কাছে ফুরিয়ে গেছে। তাই, বোধ হয় এই নিদারুণ অবহেলা। এ অপমান আমি সইতে পারছি না দেবর। এই তেতো বাঁধন থেকে আমি তাকে মুক্তি দিয়ে যাব। কিন্তু—

সীতার বেদনাবিধুর চোখ দুটো স্থির করে রাখল লক্ষ্মণের দু'চোখে। সীতার অনুক্ত কথাটি লক্ষ্মণের বুঝতে অসুবিধে হল না। কিন্তু জানার বাইরেও হয়তো কিছু আছে। তাই লক্ষ্মণ একটু অসহায় বোধ করল। মুখে তার দ্বিধাগ্রস্ততার ভাব ফুটল। একটু পরে স্বগতোক্তির মত বলল: এই তেতো বাঁধন থেকে সত্যিই আমি তোমাকে কোথাও নিয়ে যেতে এসেছি। তোমার মনটা যেখানে গেলে শান্ত হবে, স্বস্তি পাবে সেই মনোরম গঙ্গার ধারে মুনি-ঋষিদের আশ্রমে তুমি কিছুকাল অবস্থান কর। বিচ্ছেদ বিরহে ভালবাসা আরো সুন্দর হবে।

সীতা অন্যমনস্কভাবে কিছুক্ষণ ভাবল। ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় দিয়ে তার বিপদকে টের পেল। তাকে নিয়ে

বেশ কিছুকাল ধরে যে ষড়যন্ত্র চলছিল, লক্ষ্মণ প্রীতিবশত তারই বিপদ সংকেত দিল। মনটা খারাপ হয়ে গেল। কিন্তু নিজে সে ভীষণ নিরুপায়, অসহায় এবং বিপন্ন বোধ করল। নিজের জন্য তার কোন দুর্ভাবনা ছিল না। পেটের বাচ্চার কথা ভেবেই তার কান্না পেল। বহু কষ্টে নিজেকে সংযত করতে গিয়ে বেশ জোরে শ্বাস পড়ল। শ্বাসের সঙ্গে বেরিয়ে এল তার সন্তান সম্পর্কে উৎকণ্ঠা, উদ্বেগ। ধীরে ধীরে জানলার কাছে এসে দাঁড়াল। খুব আস্তে আস্তে বলল: এখন আমার অন্য জীবন। এই সময় কোথায় যাব? একদিন যখন যেতে চেয়েছিলাম, যখন সময় ছিল, তখন কেউ নিয়ে গেল না? এখন কি করে যাব?

পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে থাকা সীতার দিকে স্তব্ধ হয়ে চেয়ে রইল লক্ষ্মণ। আস্তে আস্তে বলল: অগ্রজ বলছিল, গঙ্গার দুই তীরে কুটির এবং গ্রামগুলির দেখার সাধ হয়েছে তোমার। সেই সাধ পূরণ করতেই রথ পাঠিয়েছেন। বুক ভরা দুঃখ কষ্ট নিয়ে তোমার আর প্রাসাদে থাকা উচিত নয়। লোকজনের চোখে তুমি ছোট হয়ে যাচ্ছ। বিলম্ব না করে পালাও দেবী! আমি তোমার ভালর জন্যেই বলছি। তোমার জন্য আমারও খুব কষ্ট। কিন্তু আমিও তোমার মত অসহায়।

সীতা ঘুরে দাঁড়াল। তার উদাস উদ্দেশ্যহীন দৃষ্টি যেন লক্ষ্মণের শরীর ভেদ করে বাইরে সূর্যালোকিত বন প্রান্তর ছাড়িয়ে বহুদূরে প্রসারিত হয়ে গেল। লক্ষ্মণ লজ্জায় অধোবদন হল। জলের উপর সূর্যের আলো যেমন কাঁপে, লক্ষ্মণ তেমনি কাঁপতে লাগল ভেতরে বাইরে। দুজনে আর কোন কথা হল না। নিজের নিজের ভাবনাতে তারা বুঁদ হয়ে রইল।

সময় থেমে থাকল না।

লক্ষ্মণ বেশ একটা অস্বস্তিতে ভুগছিল। একটা জ্বালা ধরা অনুভূতি তার বুকের ভেতরটা টাটাচ্ছিল। এক একবার মনে হল, একি করছে সে? রামচন্দ্রের সঙ্গে সেও কি পাগল হল? তার নিজের বিচারবোধ ভালমন্দবোধ, নীতিবোধ কোথায় গেল? কেঁপে উঠল তার বুক। একটা শ্বাস বুকে আটকে আঁকুপাঁকু করতে লাগল। ছলনা আর ছদ্মবেশ চিরদিন ধরে ঘৃণা করে এল। আজ অগ্রজের নির্দেশে বৈদেহীর সঙ্গে তাকে সেই অভিনয় করতে হল। আশ্চর্য, তার ভ্রাতৃপ্রেম। ভিতরে ভিতরে একটা অপরাধবোধ তার বিবেককে দংশন করছিল। বুকটা কেমন করছিল। একটা পাষাণভারে যেন ভেঙে গুঁড়িয়ে যাচ্ছিল।

তখনও এক আচ্ছন্নতায় সীতা আক্রান্ত। বুক জোড়া ভয়, উৎকণ্ঠা, দ্বিধা মাথায় হাজার এলোমেলো চিন্তায় সে বেশ কিছুক্ষণ বিবশ হয়ে বসে রইল। মুখখানা থমথমে গম্ভীর। পেটে তার বাচ্চা। বাড়ির বাইরে যাওয়া উচিত নয়। এসব রামচন্দ্রও জানে। আর এসময়েই তার সাধ পূরণের ইচ্ছে, সীতার মনে সন্দেহ উদ্রেক করল। এই ইচ্ছেটা যে রামচন্দ্রের কোন গভীর ষড়যন্ত্র নয়, তার নিশ্চয়তা কোথায়?

রামচন্দ্র কোনদিন সন্তান চায়নি। তবু সন্তান পেটে এল। তারপর তাকে কত বোঝানোর চেষ্টা করল তবু রামচন্দ্রের বুকে পিপাসার পুকুর সৃষ্টি হল না। তাই বোধহয় সাধ পূরণের নামে এক অতলস্পর্শী মৃত্যুর গহ্বরের দিকে তাকে ঠেলে দেওয়ার জন্যই এই ছলনা করল। রামচন্দ্রের ইচ্ছের ভেতর সীতা এক ভয়ংকর নিষ্ঠুরতাকে দেখতে পেল। সত্যিই রামচন্দ্র তাকে ভালবাসে না। খাঁচার পোষা ময়নার মত তার সঙ্গে খেলা করে। এই মানুষটা তার উপর এত অন্যায় আর এত অত্যাচার করেছে যে সারাজীবন আর কেউ তা করে উঠতে পারবে না। সীতার বুকে অভিমানের সমুদ্র টলমল করে উঠল। রামচন্দ্র যখন চাইছে একটা দূরত্ব রচনা করতে তখন সে দূরেই যাবে লক্ষ্মণের সঙ্গে।

বহুক্ষণ ধরে এই কথাই বার বার মনে হচ্ছিল। কিছুদিনের জন্য তার কোথাও চলে যাওয়া দরকার। কাছাকাছি নয়। একটু দূরে কোথাও। তমসার নিবিড় ঘন অরণ্যের পাশ দিয়ে যে গঙ্গা গেছে সেখানে গেলে বেশ হয়। সঙ্গে কেউ থাকবে না। শুধু সে একা।

যত সময় যাচ্ছিল ততই এই প্রয়োজনটা তীব্র হয়ে উঠল। একটা অভিমান নিয়ে রামচন্দ্রের কাছ থেকে কিছুদিন সরে থাকলে বোধহয় তাদের সম্পর্ক ভাল হবে। এই গৃহ থেকে দূরে গেলে রামচন্দ্রের নিষ্ঠুর প্রাণে বিরহ রাগিণীর এক আশ্চর্য সুর বাজবে। তার প্রাণও ছটফট করবে। রামচন্দ্রকে ফিরে পেতে হলে তাকে হারানো দরকার। নিজেও দরকারে হারিয়ে যাওয়া।

সীতা লক্ষ্মণকে একপলক আড় চোখে দেখে নিয়ে মুখ তুলল। তীব্র হয়ে উঠল তার চোখের দৃষ্টি। সে চোখে দ্বিধা নেই সংশয় নেই, দুঃখ নেই, অভিমান নেই, বরং দুরন্ত প্রত্যয়ে তাকে অটল দেখাল। তার চোখ মুখ শরীর থেকে একটা তেজ বেরোতে লাগল। কথা বলতে গিয়ে বুকটা হঠাৎ একটু ভারী ঠেকল। ঢোক গিলে আস্তে আস্তে শুকনো গলায় বলল: হঠাৎ আমার সাধ পূরণের কথা তোমার অগ্রজের মনে হল কেন? আমাকে নিয়ে তোমরা খুব ভাব তাই না? আমি এমন একটা কে, যে আমার কথা ভাব তোমরা। বেশ তো সকলে যখন চাইছ যাবার আয়োজন কর। সুমন্ত্রকে প্রস্তুত হতে বল। দেবর যাত্রার আগে তোমার অগ্রজকে দেখার বড় সাধ ছিল মনে। সে কোথায়?

লক্ষ্মণ কিছুক্ষণ বিহ্বল দৃষ্টিতে চেয়ে রইল সীতার দিকে। এসব কথা কিছুই তার কানে গেল না। তার বুকে উথাল পাথাল ভাব। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল : বৌঠান, আমাকে তুমি খারাপ ভাবছ না তো?

সীতা একটু কষ্টের সঙ্গে হাসল। মাথা নেড়ে বলল : কেউ আমাকে অপমান করল বলে তোমাকে খারাপ ভাবব, আমি এত বোকা নই। আমি তো তোমাকে চিনি। তবু সেই চেনাটা কোথায় যেন নতুন হয়ে উঠল আজ।

লক্ষ্মণ মাথা নিচু করে চুপ করে রইল। মানুষ গভীর ভাবে অপমানিত হলে ভিতরকার তাপে সে শুকিয়ে যায়, তাম্রাভ হয়ে ওঠে। লক্ষ্মণের মুখে চোখে সেইরকম একটা ভাব। সীতার দিকে দীন নয়নে চেয়ে বুকের কাঁপুনি ভোগ করতে লাগল। মৃদুস্বরে বলল: আমার সব অপরাধ ক্ষমা কর দেবী।

ক্ষমার কথা উঠছে কেন দেবর? তুমি তো আদেশ পালন করছ। তোমার তো কোন দোষ নেই? প্রীতি মমতার সঙ্গে তোমার কর্তব্যবোধের যে দণ্ড তার সঙ্গে সঙ্গতি সাধন করতে ওরকম একটু আধটু কথার আড়াল তো খুঁজতেই হয়। ওকে দোষ মনে করলে তোমার ভালবাসাকে অপমান করা হয়। আমি কি তা পারি?

বিস্ময়ে বিস্ফারিত লক্ষ্মণের দুই চোখ। আনন্দে তোলপাড় করে উঠল বুক। বলল : তুমি বলছ দেবী?

হ্যাঁ। আমি। তুমি কোন অপরাধ করনি। তোমার কর্তব্য করছ। স্বামী ও জনগণের কাছে তার ভাবমূর্তি অম্লান রাখতে বিরোধী গোষ্ঠীর সঙ্গে খানিকটা বিবাদ মিটিয়ে নেওয়ার কৌশল হিসাবেই আমাকে অন্যত্র স্থানান্তরিত করছে। এ কথা তোমরা না বললেও আমি বুঝি। কিন্তু সেজন্য ছলনা কেন? বিশ্বাস মরে গেলে, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক নষ্ট হয়ে গেলে নিজের স্ত্রীকে নিয়ে চরম রাজনৈতিক খেলা করা যায়। রাজনীতি জিনিসটা যেহেতু স্বামী ভাল বোঝে তাই যে কোন রাজনৈতিক সমস্যার মোকাবিলায় সর্বাগ্রে নিজের স্ত্রীকে টেনে আনে তার ঘোলা আবর্তে। আমি কি তার খেলার পুতুল? আমার হৃদয় বলে, মন বলে কি কিছু নেই? আমার তো একটা মান-অপমান আছে? রাজনীতির ভয়ঙ্কর খেলায় মেতে উঠেছে তোমার অগ্রজ। সে শুধু চায় জয়। কিছু মানুষ হল বিধাতার হাতে গড়া মহৎ জীব। এখন সে আর মানুষ নেই। অন্য মানুষ হয়ে গেছে। তার উপর রাগ করা সাজে না। তাকে দেখে শুধু করুণা হয়। আমি তো জানি তার মত একা নিঃসঙ্গ মানুষ পৃথিবীতে খুব কম হয়। সব আমাদের কপাল। আমরা দু'জনেই অভিশপ্ত নর-নারী।

বাইরে শান্ত স্নিগ্ধ সকালের রোদে ঝলমল করছে প্রকৃতি। বিচিত্র শব্দ মঞ্জরীর ও গন্ধপুঞ্জের মধ্যে থেকেও সীতার দুচোখের মণি আস্তে আস্তে রাঙা হয়ে এল। শরীরের সব রক্ত জল হয়ে হঠাৎ দৌড়ে এল রাঙাজবার মত দু'চোখে। হঠাৎ একটা তীব্র দুঃখের সঙ্গে অপমানবোধ আর অসহায়বোধ মিলেমিশে গিয়ে তার লাল হওয়া দুই চোখ ফেটে মুক্তোর মত স্বচ্ছ জলের ধারা গড়িয়ে পড়ল। বর্ষার বারিধারার মত বাধা মানল না।

নৌকা থেকে মাটিতে পা দিয়ে সীতা থ হয়ে গেল। চারদিকে তাকাল। ঘন সবুজ অরণ্যে ঢাকা বিশাল অরণ্যে কোথাও জনবসতির চিহ্ন নেই। আদিগন্ত অরণ্য মৃত্যুপুরীর মত স্তব্ধ, নির্বিকার। সীতা

চুপচাপ চেয়ে রইল অনেকক্ষণ। মুখে তার কথা নেই। বুকের ভেতরটা খিল ধরা একটা ভয়ে ব্যথা ব্যথা করতে লাগল।

নির্জন নদীতীরে নিষ্পন্দ মূর্তির মত সে দাঁড়িয়ে রইল। এই গভীর অরণ্যে সে এখন কোথায় যাবে? কি করবে? যতদূর দৃষ্টি যায় কিছুই চোখে পড়ে না। শুধু বন আর বন। অনেক অনুভূতি জাগল, যা আগে কখনও মনের কোণে আসেনি।

সীতার বুকের ভেতরটা মোচড় দিল। চকিতে একটা অনাগত শিশুর সুখ আর কান্না চোখের সামনে ভেসে উঠল। অমনি প্রাণপণ চেষ্টায় রামচন্দ্রের একটা বড় অন্যায় অবিচার প্রতিবাদ করার জন্য ঘুরে দাঁড়াল।

চকিতে অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠল। বুকের ভেতরটা হঠাৎ শুকিয়ে গেল। নদী কিনারে নৌকা মাঝি কেউ নেই। সে শুধু একা। নিমেষে তার মুখ থেকে রক্তকণাগুলো উবে গেল। নিষ্পলক চোখে চেয়ে রইল দূরে নদী আর নৌকার দিকে। কি দেখছিল জানে না। কি করবে কিছুই ঠিক করে ওঠতে পারছিল না। বিপন্ন ভয় আর অসহায় বোধে তার ভুরু কুঁচকে গেল। দুই চোখ ছোট হয়ে এল। কিন্তু চোখ দিয়ে একফোঁটা জলও গড়িয়ে পড়ল না। চোখের জলও তার শুকিয়ে গিয়েছিল।

নিজেকে সীতার বড় নিঃস্ব লাগল। তার কিছু নেই, কিছুই নেই। কতবার ভাবল গঙ্গায় জীবন বিসর্জন দেবে। রামচন্দ্রেরও সেরকম ইচ্ছে। তাই শ্বাপদ সংকুল অরণ্যেই তাকে নির্বাসিত করেছে। এখান থেকে প্রাণে ফেরার কোন পথ নেই। স্বেচ্ছামৃত্যু যদি বরণ করতে না পারে, তা হলে হিংস্র পশুর ক্ষুধা থেকে নিষ্কৃতি নেই। মৃত্যু এখানে একমাত্র সত্য। মরতে তার ভয় নেই। কিন্তু তার পেটে সন্তান! সে মা! মা হয়ে সন্তান হত্যা করবে? এই কথাটা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার মৃত্যুর সংকল্প অন্তর্হিত হল। বেঁচে থাকাটা ভীষণ জরুরী হল। তারপর থেকেই প্রতিক্ষণ মনে হতে লাগল এই দায়টুকুর জন্য অনাগত শিশু দুহাত জোড় করে তার কাছে ভিক্ষে করছে যেন।

অবাক হয়ে সীতা আরো অনুভব করল, এরকম একটা ভাবনার মধ্যেও ভারী একটা শান্তি আছে। অমনি তার থেমে যাওয়া নিঃশ্বাস আবার স্বাভাবিক হয়ে পড়তে লাগল। এক অজ্ঞাত অনুভূতি শির শির করে তার চোখের জল হয়ে টপটপ করে গড়িয়ে পড়তে লাগল। দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে অস্ফুট স্বরে বেরিয়ে এল এক বিপুল অভিমান। পুরুষ মানুষ তো নই। আমি মা। মা হয়ে কেমন করে সন্তানের ক্ষতি করি? তারপরেই হঠাৎ রুদ্ধ আবেগে তার গলার স্বর ভারী হয়ে গেল। অশ্রু বিজড়িত গলায় বলল: ওগো অরণ্য, তুমি তো ধাত্রী, জীবকে রক্ষা কর, আবার আশ্রয় দাও। আমি বড় অভাগী। আমাকে তুমি আশ্রয় দাও। আমার সন্তানকে তুমি—বলতে বলতে সীতার গলার স্বর আটকে গেল। পায়ের তলার মাটি দুলে ওঠল। চোখে অন্ধকার দেখল। দেহটা নুয়ে এল। আস্তে আস্তে সে মাটি ধরে বসল। তারপর মাটির ওপর এলিয়ে পড়ে মূর্ছা গেল।

তমসার অরণ্য এত নিবিড় এত ঘন গাছ-গাছড়ায় ভরা যে সূর্যের আলো এখানে প্রবেশের পথ পায় না। সূর্যালোকিত দীপ্ত মধ্যাহ্নে অরণ্যের অভ্যন্তরে আঁধারের ঘোর কাটে না। তমসাবৃত অরণ্যে গা ছম-ছম করা ভয় লাগানো একটা রহস্য আছে। হিংস্র জন্তু জানোয়ারের ভয়ে কোন দুঃসাহসী শিকারীও এই দুর্গম অরণ্যে প্রবেশ করে না। গভীরতর রহস্য ঘেরা তমসার অরণ্য। প্রবাদ আছে এই অরণ্যে বেশিদিন থাকলে মানুষ পাগল হয়ে যাবে, নয় আত্মহত্যা করবে। অথবা হিংস্র জন্তু জানোয়ারের পেটে যাবে। তাই এই অরণ্যকে সকলে এড়িয়ে চলে।

কেবল মহাবিদ্রোহী শম্বুকের নিরাপদ বিচরণ স্থান এই অরণ্য। তার সব স্বপ্নের জন্ম এখানে। বনের মধ্যে ছাইরঙা অন্ধকারের সঙ্গে মিশে তার ভবিষ্যতের স্বপ্ন তৈরি হয়। তমসা হল শম্বুকের স্বপ্নরাজ্য।

নদীর কাছে বড় গাছের ডালপালা ঝাঁকিয়ে হনুমানেরা একঘেয়েমির নিঃশব্দতাকে ছিঁড়ে দিয়ে হঠাৎ হুটোপাটি করে ডেকে উঠল। চকিতে তাদের ডাক অনুসরণ করে তাকাল শম্বুক। নতুন অতিথি দেখলে হনুমানেরা অমন করে অরণ্যশবরীকে জানিয়ে দেয়। শম্বুকের সমস্ত ইন্দ্রিয় টানটান হয়ে ওঠল। কালো দুই চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হল। সতর্ক অনুসন্ধানী দৃষ্টি মেলে মুগ্ধ চমকে অযোধ্যার রাজমহিষী সীতাকে দেখতে লাগল।

সীতার দুই চোখে জল। শম্বুকের বুকে করুণার সাগর উথলে উঠল। ইচ্ছে হল, একবার মা বলে চিৎকার করে ডাকে। দৌড়ে কাছে যায়। পাশে দাঁড়িয়ে বলে, মাগো তোমার কোন ভয় নেই। তোমার শম্বুক আছে। তোমার জন্য হাসতে হাসতে প্রাণ পর্যন্ত দিতে পারে। তুমি দেখে নিও একদিন শ্রীরাম তার ভুল ঠিক বুঝবে। কিন্তু এসব কিছুই বলতে পারল না। কে যেন মুখটা চেপে ধরল। শৈশবে মা'কে হারিয়েছে। মাতৃস্নেহ কেমন জানে না। মায়ের মুখখানা মনেও পড়ে না। মায়ের কথা যখন মনে হয় তখন সীতার মুখ কল্পনায় দেখে। কিন্তু এই মুহূর্তে তার যা ভাল লাগবে, সীতার কাছে তা অন্যরকমও লাগতে পারে। চোখের পলকে বাস্তব বুদ্ধি দিয়ে পরিস্থিতিটা বিচার করে নিয়ে চুপ করে অবাক চোখে দৃশ্যটা দেখতে লাগল। সেই সময়ের মধ্যে সে একটু ভেবেও নিল। তারপর ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে তাকে পাহারা দিতে লাগল।

কিন্তু শম্বুক বজ্রাহতের মত স্থির। কিছুক্ষণ সে বোধ হয় মানুষ ছিল না। পাথর হয়ে গিয়েছিল।

লজ্জা ও আত্মগ্লানিতে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে শিশুর মত কাঁদল সীতা। অনেকক্ষণ। তারপর কাঁপতে কাঁপতে কাছের একটি বৃক্ষমূলে বসল। সীতা দুহাতের উপর থুতনি রেখে শূন্য চোখে বহমান নদীর দিকে তাকিয়ে রইল। কিছুক্ষণ পর আস্তে আস্তে তার সমস্ত শরীরটা নুয়ে এল। মাটির উপর টান টান হয়ে শুল।

শম্বুক স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। বুকের মধ্যে একটা ঝড়ো বাতাসের দোলা। বেশ বুঝতে পারছিল একটা অঘটন ঘটতে চাইছে। কিন্তু কি ঘটতে যাচ্ছে তা ভেবে তার মাথা কুলকিনারা করতে পারল না। ভীত স্বরে সঙ্গীদের বলল: তোরা মায়ের পাহারায় থাক। আমি বাল্মীকি মুনির আশ্রমে খবরটা দিয়ে আসি। শম্বুক আর দাঁড়াল না। ঝড়ের মত উড়ে চলল দু'পায়ে।

ঠিক সে সময় এক ঝাঁক টিয়া পাখি মাথার উপর দিয়ে গগনভেদী আর্তনাদ করে উড়ে গেল। শম্বুকের বুকের ভেতরটা অমঙ্গলের আশঙ্কায় ধড়াস করে উঠল। মাথা নেড়ে বলল, না না, কিছু সর্বনাশ নয়। ওসব চিন্তা করতে নেই। মনে আসাও পাপ। ভীষণ অমঙ্গল। মনে কত চিন্তার ছবি ভেসে গেল। ব্যথিত ও বিমর্ষ শম্বুক তবু থামল না। শরবিদ্ধ হরিণের মত দৌড়তে লাগল।

শম্বুককে দেখে তো বাল্মীকি অবাক। অনেকটা পথ দৌড়ে সে হাঁফাতে লাগল। বুকের মধ্যে একটা কষ্ট হচ্ছিল। নিঃশ্বাস বুকের কাছে আটকে ছিল বলে মনের কথা বলতে পারল না। কিন্তু কথা বলতে উদ্যত। তার দুই চোখের তারায় বোবা উত্তেজনা। দুরন্ত অস্থিরতায় মাথা নাড়তে লাগল। চোখে মুখে স্বাভাবিকতা ছিল না।

বাল্মীকি তার কালো চোখের তারা এবং সমস্ত শরীরকে দেখে তার নানা অনুভূতির মধ্যেকার কষ্ট টের পাচ্ছিল। তার উৎকণ্ঠা, উত্তেজনা অনেক তীব্র ছিল। বুকের ভেতর থেকে একটা কিছু নিষ্কুণ্ডল হয়ে পাক খেয়ে গলাটাকে যেন চেপে ধরল। বাল্মীকির উৎসুক দুই আঁখিতারা শম্বুকের চোখের উপর স্থির। সমবেদনায় নিবিড় হয়ে উঠল। আস্তে আস্তে বলল: শম্বুক, তোমাকে খুব বিচলিত বোধ হচ্ছে। কী ব্যাপার বলতো?

শম্বুক চমকাল। সংবিৎ ফিরে পেল। মাথা নেড়ে বলল: মুনিবর আমাকে প্রশ্ন কর না। বনে আমার মা এসেছে। দেরি করলে মাকে বাঁচাতে পারব না। তুমি তার ইহকাল পরকাল। তার একমাত্র আশ্রয়।

শম্বুকের কণ্ঠস্বরে যন্ত্রণাকাতর আর্তি সম্যক উপলব্ধি করল। তার উৎকণ্ঠায় অনুচ্চারিত এমন অনেক কিছু ছিল যা নিয়তির এক অমোঘ সংকেত রূপে আবির্ভূত হল বাল্মীকির কাছে। মৃদু কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল: কে সে? কার কথা বলছ তুমি?

শম্বুকের স্বর রুদ্ধ। স্খলিত অস্ফুট স্বরে উচ্চারণ করল: তার কথা শুনতে চেও না ঋষি। তুমি সইতে পারবে না। কি বলব? আমার নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছি না। কি দেখতে, কি দেখেছি ভাল বলতে পারব না। জীবনের বাস্তব কত আশ্চর্য, কত অদ্ভুত, কী বিস্ময়কর, তুমি নিজের চোখেই দেখ এসে।

বাল্মীকি শুধু চমকাল না, অবাক বিভ্রান্ত চোখে শম্বুকের দিকে তাকিয়ে তাকে বোঝবার চেষ্টা করল। চোখের তারায় অন্তর্ভেদী নিবিড়তা। নিঃশ্বাসের সঙ্গে গলা থেকে একটি স্খলিত অস্পষ্ট শব্দ

বেরোল: জানকী।

শম্বুকের স্বরে চাপা উত্তেজনা। বলল: হ্যাঁ।

বাল্মীকি গভীর অন্যমনস্কতায় কয়েক মুহূর্ত স্থির হয়ে থাকল। বলল: তুমি কেমন করে চিনলে?

মায়ের চলাফেরা দেখলে আমি টের পাই। আমার একটুও ভুল হয় না। আমি ভুল বলি না। মায়ের আর্তস্বর আমার চেনা। ভীষণভাবে চেনা।

তবু বাল্মীকির বিশ্বাসের মাঝখানে বিঘ্নিত সংশয় একটা বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ, সেইসঙ্গে অবাক জিজ্ঞাসা। কয়েকটা মুহূর্ত চুপ করে ছিল বাল্মীকি। নিশ্চলভাবে দাঁড়িয়ে অনেকটা স্বগতোক্তির মত উচ্চারণ করল: তা হলে আর দেরি নয়, চল ডিঙিতেই যাব আমরা।

ডিঙিতে একটা কথাও হল না তাদের। শম্বুক ডিঙিটাকে এক কূল থেকে আর এক কূলে উড়িয়ে নিয়ে এল।

বাল্মীকি বুকে ধড়ফড়ানি নিয়ে ডিঙা থেকে নামল। দৌড়ে গিয়ে দেখল, সন্তানসম্ভবা সীতার ভরন্ত শরীর বৃন্তচ্যুত কুসুমের মত অত্যন্ত অযত্নে ধুলোয় পড়ে আছে। ধরিত্রী কোল দিয়েছে তাকে। আর সে বড় সুখে আরামে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে আছে। শরীরের উপর প্রকৃতির নানা দীর্ঘ ও হ্রস্ব ছায়া নড়েচড়ে। ধরিত্রী মাতা আলতো হাতে নীরব স্নেহের মত বুলিয়ে দিচ্ছে।

বাল্মীকির মাথার উপর রৌদ্রভরা আকাশ। বনানীর সবুজিমা দিগন্তহীন নদীর ভরা বুক থেকে উঠে আসে ফুরফুরে স্নিগ্ধ বাতাস, আকাশের নীলিমা রোদের দীপ্তিকে নরম উজ্জ্বলতায় ভরে দিয়ে মূর্ছিতা সীতার দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে আছে।

বাল্মীকি থমকে দাঁড়াল। নির্বাক হয়ে গেল। বুকের মধ্যে কি যেন ঘটে গেল, কি যেন গলে পড়ল। পুরো বুকটাই যেন মোমের মত গলে গলে পড়তে লাগল। আর একটা অসম্ভব থরথরানিতে শিরা উপশিরা স্নায়ু ফেটে যাবার মতো হতে লাগল। বুকের ভেতর এরকম একটা ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর বুক ভাসিয়ে এল করুণা, মায়া গভীর মমতা, ভালবাসা। গলে যাওয়া বুকে এরকম একটা অনুভূতি সঞ্চার হয়েছিল জীবনে আরো একবার।

তখন সে দুর্দান্ত দস্যু রত্নাকর। পথিকের দুশ্চিন্তা এবং আতঙ্ক, বনের বিভীষিকা। নিরীহ পথিকদের বধ করে সর্বস্ব লুণ্ঠন করাই ছিল তার ধর্ম। নরহত্যায় তার কোন বিকার ছিল না। মনও গলে না কখনও। বুকেও ছিল না কোন পাপ অনুশোচনার গ্লানি। মানুষের কাছে সে নরপিশাচ; মূর্তিমান পাপ। এটাই তার বেশি ভাল লাগত। একদিন সেই পাষাণের বুকে হঠাৎ করুণার নির্ঝর নামল।

বাল্মীকির দুই চোখে জ্বল জ্বল করে উঠল এক সুদূর অতীত। হারিয়ে যাওয়া জীবন, কী ভয়ংকর আর বিশ্রী। বিস্মৃত অতীতের সেই ভয়ংকর দিনগুলোর কথা বাল্মীকি ভুলেও মনে করে না। রত্নাকরের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সেই অভিশপ্ত দিনগুলোও মুছে গেছে তার নতুন জীবন থেকে। সে এখন কবি বাল্মীকি। কিন্তু তার নবজন্মের মুগ্ধ মুহূর্তের সেই আশ্চর্য অনুভূতি যা অব্যক্ত অস্ফুট তীব্র যন্ত্রণায় মনের ভেতর নানাবিধ মিশ্র সহানুভূতিতে প্রতিক্রিয়াশীল তা আচমকা অবচেতনার অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এল হঠাৎ। ছন্দোবদ্ধ বাক্য কণ্ঠ হতে নিঃসৃত হল। পাহাড়ের বুকে ঝরনা নামল যেন। সেই স্মৃতি অনুভূতিকে বাল্মীকি ভুলবে কেমন করে? সে যে তার জন্মান্তরের ভূমিকা।

বাল্মীকি কয়েক মুহূর্তের জন্যে অন্যমনস্ক হয়ে গেল।

দস্যু রত্নাকরের ঘরে অন্ন নেই। সংসারে শান্তি নেই। অভাবে অনটনে, অশান্তিতে ধুঁকছে গোটা পরিবার। এই জীবনস্রোতের অন্ধকারে নিজেকে ভাসিয়ে নিয়ে সে কোন কূলে পৌঁছবে? সেখানে কি আছে? এইভাবে বেঁচে থাকা বড় কষ্ট। বনের পথে চলতে চলতে নাভি থেকে টেনে খুব জোরে শ্বাস নিল রত্নাকর। নিঃশ্বাস ফেলতেই বুকের মধ্যে হঠাৎ এক শূন্যতার হাহাকার বোধ করল। সেই মুহূর্তে এর ভেতর স্বাস্থ্যোজ্জ্বল পুরুষ মানুষটা নিজের দুর্বলতা সম্পর্কে সতর্ক আর সচেতন হয়ে উঠল। নিজেকে শুনিয়ে মনে মনে বলল: খবর্দার। আমি হচ্ছি খুনী দস্যু রত্নাকর। বনের বাঘ। একটু পায়ের শব্দ পেলেই এক তীরে বুক এফোঁড় ওফোঁড় করে দিই। বেঁধা তীরের পাশ দিয়ে ফিনকি দিয়ে রক্ত

ছোটে, বড় কষ্ট পায়, ছটফট করে তবু আমার দয়া হয় না, উত্তেজনা হয় না, অনুশোচনা হয় না। বরং একজন জীবন্ত মানুষের জীবনদীপ মুহূর্তে নিভিয়ে দেওয়ার মধ্যে একটা গা শিউরানো আনন্দ আর সুখ আছে।

রত্নাকর নিজের মনে কথা বলতে বলতে বনের সব কটি পথ সারাক্ষণ ঘোড়ার মত দাপিয়ে বেড়াল। তবু একটা পথিক চোখে পড়ল না।

বেশ কিছুদিন ধরে এপথে আর পথিক আসে না। ভয়ঙ্কর অন্নকষ্টে আর উপবাসে দিন কাটতে লাগল।

ব্যর্থতায় হতাশায় রত্নাকরের মাথায় ধিকি ধিকি আগুন জ্বলে। প্রকৃতি এবং বন শান্ত নির্বিকার। সীমাহীন নির্মেঘ আকাশ থেকে সূর্য হত্যোদ্যম রত্নাকরের দিকে জ্বলন্ত চোখে চেয়ে আছে। উর্ধ্বমুখে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকে আকাশের দিকে। তার বুক থেকে উর্ধ্বে ধাবিত হয় পুঞ্জীভূত অভিমান, আমি কি করেছি? কেন এই দুঃখ দুর্ভোগ, যন্ত্রণা? কেন এই কষ্ট? কেন এই কলঙ্ক?

অনেকক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে থাকল রত্নাকর। মাথার কোঁকড়া চুল হাওয়ায় এলোমেলো হয়ে গেল। চোখ জ্বালা করতে লাগল। এক গভীর দুঃখের সঙ্গে মিশে গেল গভীর তীব্র ঘৃণা। যে ঘৃণা তার নিজের। তার একার। যার ভার আর কেউ নিতে রাজি নয়। এমন কি তার স্ত্রী সন্তান বা পিতা মাতাও নয়। মানুষের স্বার্থপরতা তার ভাল লাগে না। মানুষকে এবং তার সমাজকে তাই কোনদিন সে ভালবাসেনি। এই ঘৃণাই তাকে নিষ্ঠুর পাষন্ড করেছে। মানুষের উপর প্রতিশোধ নিতে সে হয়েছে এক শয়তান। সূর্যকে তাই প্রশ্ন করে: কি দেখছ অমন করে? কেমন আছি? কি সুখে রেখেছ জান না? আমার কে আছে, কি আছে? কোন বংশে আমার জন্ম? কে আমার পিতা? কিছু জানি না। একটা অন্ধকারে আছি। মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে এক তীরে তোমার ঐ জ্বলন্ত চোখ দুটো চিরকালের মত কানা করে দিই। পৃথিবীতে অন্ধকার আবার আসুক নেমে। অন্ধকারেই আছি অন্ধকারেই থাকব। কি দরকার ঐ আলোয়। যাদের দয়ায় আলো দেখলাম তারা আমার কেউ নয়। আমি তাদের কুড়িয়ে পাওয়া ছেলে। কামার্ত মানব মানবীর লালসার বিষ।

নির্জন বনভূমিতে দাঁড়িয়ে অবদমিত মনের কথাগুলো হঠাৎ বেরিয়ে পড়ায় সে বেশ একটু হাল্কা আর প্রসন্ন বোধ করল। নিজের মনেই হাঁটতে হাঁটতে ভাবছিল রত্নাকর, এরকম অদ্ভুত কথা কোনদিন তার মনে হয়নি। ক্ষিদেয় মানুষের পেট জ্বললে বোধহয় এরকম একটা গভীর অসহায়তাবোধ জাগে। নিজের উপরে আত্মাভিমান হয়। যা কিছু ভাল সব কিছুকে হঠিয়ে যা কিছু মন্দ তার জায়গা করে দেয়।

হঠাৎ একটা ভারী পায়ের শব্দ পেয়ে থমকে দাঁড়াল। শাল শিশুর বনের গভীরে ছাই ছাই অন্ধকারে গাছের গুঁড়ি আড়াল করে দাঁড়াল। তীরধনু নিয়ে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়াল। একটা মস্ত ধাড়ি শুয়োর এক পাল বাচ্চা নিয়ে বনের গভীর অন্ধকারে লুকোল। সেই মুহূর্তে মনে হল এটাকে মারলে মন্দ হয় না। অনেকদিন শুয়োরের মাংস খায় না। শুয়োর কেন, কোন পশু হত্যা করেনি কোনদিন। ব্যাধের ঘরে মানুষ হয়েছে। কিন্তু ব্যাধবৃত্তি করেনি কোনদিন। দস্যুবৃত্তির চেয়ে ব্যাধের জীবন অনেক ভাল ছিল। এই শুয়োরটা মেরে সে ব্যাধ জীবন শুরু করবে।

ধনুকে তীর জুড়ল। লক্ষ্য স্থির করে গুণ টানল। কিন্তু হাতটা ধনুকেব ছিলাতেই আটকে রইল। জ্যা-মুক্ত আর হল না। রত্নাকর কিছুক্ষণের জন্য বোধহয় মানুষ ছিল না। অন্য এক পৃথিবীর জীব হয়ে গেল। কত কি ভাবল কয়েক মুহূর্তে। প্রকৃতির জীব ওরা। প্রাকৃত জীবেরা প্রকৃতির কোলে বেশি সুন্দর। ওরা যা কিছু করে তাই ওদের নিজস্বতা বলে মনে করে। মানুষদের মত ওরা ভন্ড নয়। কোন পশু-মা সন্তানকে জন্ম দিয়ে ফেলে পালায় না কিংবা তাকে ছেড়ে চলে যায় না। তাকে রক্ষা করে, পালন করে। বড় হওয়া পর্যন্ত আগলে বেড়ায়। বেঁচে থাকার, আত্মনির্ভর হয়ে ওঠার কৌশল শেখায়। পশু হলেও মায়ের দায়িত্ব ও কর্তব্য ভোলে না। সভ্য জগতের মানবী মাতা কামতাড়িত হয়ে সন্তান প্রসব করে লোকলজ্জায় তাকে ত্যাগ করতেও কুণ্ঠিত হয় না। জননীর কোন কর্তব্য না

করে তস্করের মত পালায়। শিশু সন্তান বাঁচল কি মরল সে সব ভাবে না। কিন্তু পশু-মা তা করে না। সভ্যজগতের বাসিন্দা মানবী জননী প্রকৃতির কলঙ্ক! পশুর চেয়েও নিকৃষ্ট। পশুরা মানুষদের চেয়ে অনেক ভাল। বিদ্যুৎ চমকের মতো কথাগুলো মস্তিষ্কের ভেতর ঝিলিক দিয়ে গেল।

রত্নাকরের আর তীর ছোঁড়া হল না। এই প্রথম ভাবল, শুয়োরটা মরলে ওর বাচ্চাগুলো অনাথ হয়ে পড়বে। ওদের কেউ বাঁচবে না। আগলানোর কেউ থাকবে না। ওরা ভীষণ অসহায় হয়ে যাবে। পরিবেশের সঙ্গে যুদ্ধ করে স্বনির্ভর হয়ে বেঁচে থাকার কৌশল মাতৃহারা শাবকদের শেখাবে কে? মাতৃহীন হওয়ার কষ্ট সে জানে। তাই ওর হাত কাঁপল এই প্রথম।

অনেককাল পর তার ভীষণ ভাল লাগল। এই প্রথম এরকম একটা অনুভূতি হল। মনে হল মনটা অনেকদূর পর্যন্ত প্রসারিত হয়ে গেছে। অন্য কোন গ্রহের আলো পড়েছে তার বুকে। আর তাতেই মনটা উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। মনের আলোয় আভাসিত না হলে বুকের অন্ধকার ঘোচে না। বীজ অঙ্কুরিত না হলে কে কবে গাছ দেখতে পায়? বীজ থেকে চারা অঙ্কুরিত না হলে গাছ ফুল হয়ে ফুটে ওঠে না।

গাছের ডালে পাখির পাখা ঝাপ্টানোর শব্দে চিন্তা হঠাৎ থমকে গেল। চোখটা আটকে রইল গাছের ডালে। কামপাখী ক্রৌঞ্চ-ক্রৌঞ্চী একে অপরকে চঞ্চু দিয়ে আদর করছে, চুমু খাচ্ছে। আর ক্রৌঞ্চ কামতাড়িত হয়ে ক্রোঞ্চীর অনিচ্ছায় জোর করে রমনের চেষ্টা করছে। রত্নাকরের শরীরের ভেতর বিদ্যুৎ খেলে গেল। মুহূর্তে একটা প্রলয় ঘটে গেল তার মস্তিষ্কের মধ্যে। দপ করে চোখের মণি জ্বলে উঠল। মুখের ভাব পাল্টে গেল। চনমন করে উঠল রক্ত।

কামতাড়িত হয়ে পৃথিবীর সব পুরুষপ্রাণী যা করে তাই করল ক্রৌঞ্চ। প্রকৃতিগত ব্যাপার। কোথাও জিতেন্দ্রিয় পুরুষ প্রাণী নেই। কিন্তু কামতাড়িত হয়ে জৈবিক তাড়নায় এমন মরিয়া নিষ্ঠুর হবে কেন? রত্নাকরের মনে হল ক্রৌঞ্চীর অনিচ্ছায় জোর করে যেন তাকে রমণ করে ক্রৌঞ্চ প্রেমের সৌন্দর্য কদর্য করে তুলল। পুরুষের এরকম উন্মত্ত কামতাড়না অমঙ্গল ডেকে আনে। মাথায় খুন চেপে গেল তার। ক্রৌঞ্চ-ক্রৌঞ্চীর মৈথুন দৃশ্য রত্নাকর সইতে পারল না। মুহূর্তে সেই সময় তীক্ষ্ণ তীর ঝলসে উঠল বিকেলের পড়ন্ত রোদে।

আঁ-করে একটা গগনবিদারী চিৎকার শোনা গেল শুধু। তারপরেই ক্রৌঞ্চর দেহ ক্রৌঞ্চীর শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ধপ্ করে মাটিতে পড়ল। দেহটা স্থির হওয়ার আগে কয়েকবার মাটিতে পাখা ঝাপ্টাল। একটু ছটফট করল। তার বুকের পালকগুলো লাল রক্তে রাঙা হয়ে গেল। রত্নাকর দেখলে লাগল তার মৃত্যুদশা। তখনও তার চোখে শুধু ক্রোধ ছিল না, বীভৎসতাও ছিল। প্রতিহিংসার আগুনে দস্যুদের চোখ যেমন থাকে।

ক্রৌঞ্চী বোকার মত কিছুক্ষণ চেয়ে রইল ঘোলা চোখে। তারপর উড়ে এসে ক্রৌঞ্চের কাছে বসল। নিষ্প্রাণ ক্রৌঞ্চের দিকে চেয়ে রইল। চোখ দুটিতে তার আতঙ্ক, বিস্ময়। ক্রৌঞ্চের চোখ দুটো খোলা স্থির। মুখ কষ্টবিদ্ধ যন্ত্রণায় পান্ডুর। ক্রৌঞ্চী তার মুখের কাছে মুখ রাখল। ছড়ানো ডানাটাকে টেনে তাকে আরামে শুইয়ে দিল। তারপর তার গা ঘেঁসে বসল। কিছুক্ষণ কেঁই কেঁই করে চুপ করে গেল।

রত্নাকরের বুকের ভেতরটা হঠাৎ কেমন করে উঠল। অনুভব করল ভিতরে ভিতরে ক্রৌঞ্চী সাথীহারা হয়ে কাঁদছে। কান্নাটা তার একবারে ভেতরের জিনিস। তার বুকের ভেতরেও রক্তক্ষরণ হচ্ছে বাইরের কান্না তো চোখেই কাঁদে। ক্রৌঞ্চীর দুই চোখের কোণে জল চিকচিক করতে দেখল রত্নাকর। কেঁদে কেঁদে ক্রৌঞ্চী বোবা হয়ে গেল।

সন্ধ্যা নামছে। ভূত ভূত ছায়া দীর্ঘ হচ্ছে অরণ্যে। তবু ক্রৌঞ্চীর কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। তাড়া নেই নিরাপদে আশ্রয়ে ফেরার। থমথরা শোকের পাষাণভার তাকে যেন নিশ্চল করে রাখল। ক্রৌঞ্চের মৃত্যুটাকে সে ভুলতে পারছিল না। ক্রৌঞ্চের বিহনে তার কাছে গোটা পৃথিবীটাই যেন শূন্য হয়ে গেল। অর নিজের বাঁচা মরারও কোন মূল্য নেই। তাই অন্ধকারকে সে ভয় পায় না। প্রেমের জ্যোতির্ময় আলোয় তার বুক ভরে ছিল। সেখানে অন্ধকার নেই। তাই বোধহয় ক্রৌঞ্চী তার বুকের পালকের

মধ্যে মুখ ডুবিয়ে গায়ের গন্ধ নিল। মুখ লুকোল।

ক্রৌঞ্চী তার বুকের ভালবাসা এমনভাবে উজাড় করে দিল ক্রৌঞ্চের কাছে যে, বিদ্যুৎ চমকের মতই রত্নাকর বুঝল পাখি হলেও ওর প্রেম মিথ্যে নয়, ভান নয়। এই ভালবাসা মানুষের চেয়েও বেশি সত্য। ক্রৌঞ্চী সত্যিই ভালবাসে তাকে। তার ভালবাসা মিথ্যে হলে এমন সত্যি হতে পারত না তার নিবেদন।

রত্নাকরের মন খারাপ হয়ে গেল। একটা ভীষণ কষ্ট হতে লাগল। একটা অকৃত্রিম পবিত্র ভালবাসাকে সে হত্যা করেছে। এই অনুভূতিটা বিদ্যুৎ চমকের মত তার বুকের ভেতরটা চিরে চিরে দিয়ে গেল। বুকের গভীর অভ্যন্তরে তার ঝড় উঠল। মস্তিষ্কের কোষে কোষে ছড়িয়ে পড়ল তার প্রমত্ততা। চারদিক থেকে কতরকম শব্দ ও গন্ধের ছিটে চেতনা ছুঁয়ে তার মনের ভেতর কল্পনার ভেতর তারাবাজির উৎক্ষিপ্ত কণার মত ছিটকে পড়ল। অব্যক্ত যন্ত্রণা ক্ষণিকের জন্য তাকে পাগল করে তুলল। মনে হল একটা কিছু ঘটবে। ভিতরে কি যেন একটা হচ্ছিল। হঠাৎ বুক ভাসিয়ে নামল গভীর করুণা। হৃদয়ের অভ্যন্তর থেকে উৎসারিত হল:

মা নিষাদ! প্রতিষ্ঠাং তমগমঃ শাশ্বতী সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্।

গভীর অভ্যন্তরে সেইকথাই ছড়িয়ে গেল বাতাসে।

রত্নাকর বিস্মিত অভিভূত। তার মত মহাপাষন্ডের মুখে এমন ছন্দোময় বাণী কে দিল? এই সুর, এই গীত কে দিল তার কণ্ঠে? কে? কে? তবে কি বাগদেবী ক্রৌঞ্চীর ছদ্মবেশে এল পাষন্ড প্রাণের আবরণ খুলে তার ভেতরের মানুষটাকে চিনিয়ে দিতে? সপ্তস্বরা বীণার মত একটা সুর প্রাণের তারে রিন্ রিন্ করে বেজেই চলল। অনেকক্ষণ।

হঠাৎ সে একটু দিশাহারা বোধ করল। তারপর কি ভেবে লম্বা লম্বা পা ফেলে দৌড়তে লাগল। রত্নাকর দস্যু ধুলোভরা মাটি মাড়িয়ে, আদুল পায়ে, উদলা গায়ে দৌড়ে পালাতে লাগল। এক মিথ্যে জীবনের বুকের শূন্য গহ্বর থেকে অন্য জীবনের আলোকিত প্রস্তরের দিকে, সাগরে যাওয়া নির্ঝরের চলকানো জলের মতই উন্মত্ত উৎসারে।

ক্রৌঞ্চের সঙ্গে দস্যু রত্নাকরের মৃত্যু হল। দস্যুর খোলস ছেড়ে বেরিয়ে এল কবি বাল্মীকি।

বুকের গভীরে লুকনো সেই গাঢ় অনুভূতির স্বাদ বাল্মীকিকে এত বেশি আপ্লুত করল যে, অনেকক্ষণ পর্যন্ত নীরব, নির্বাক, স্তব্ধ হয়ে রইল।

বাল্মীকির আশ্চর্য মৌনতায় শম্বুকও অবাক হল। কিছুক্ষণ সেও কথা বলতে ভুলে গেল। বাল্মীকির দিকে চেয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল।

সীতা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে পাশ ফিরল। অচৈতন্যের ঘোরে আর্ত কণ্ঠে অস্ফুট স্বরে উচ্চারণ করল: পি-ই-তা-আ-আ-জি-ই-ই। ডাকটা শুনে চমকে উঠেছিল বাল্মীকি। তার বুকের ভেতর কি সব জমে থাকা জিনিস হঠাৎ করে গলিয়ে দিল, যেমন ক্রৌঞ্চী দিয়েছিল একদিন। গাঢ় গভীর নিঃশ্বাসের সঙ্গে বেরিয়ে এল বাল্মীকির স্নেহ উৎসারিত স্বর : মা-আমার, মা-গো এই তো আমি। আমি তো তোমার কাছেই আছি। চোখ খোল জননী। চোখ খোল। কথা বল। এই তো আমি।

বাল্মীকির মমতা মাখানো কথাগুলো সীতার মস্তিষ্কের গভীরে চুঁইয়ে চুঁইয়ে যাচ্ছিল, ভিতরে আস্তে আস্তে। চেনা গলার স্বর ও সমস্ত চেতনা ধরে নাড়া দিল। আস্তে আস্তে সংজ্ঞা ফিরল। চোখ মেলল। অবাক বিস্ময়ে ডাকল : পিতাজী!! এসেছ? বলেই মূর্ছা গেল।

বাল্মীকির ভেতরটা মুগ্ধ চমকে চমকে ওঠল। বলল: মা! মা আমার সোনা মা।

তমসার ঘন জঙ্গলে সীতাকে একলা ছেড়ে দিয়ে লক্ষ্মণ ফিরে আসার পর রামচন্দ্রের মনটা কেমন উচাটন হল। মনের কোণে কাঁটা ফোটার মতন খচ্‌খচ্ করতে লাগল। অথচ, জীবনে খুব কম সময়, কদাচিৎ সীতাকে তার প্রয়োজন হত। বরং সীতার অস্তিত্বই ছিল তার কাছে অস্বস্তির। অজান্তে সীতা

ধীরে ধীরে দূরে সরে যাচ্ছিল। মানে নিজেকে সে গুটিয়ে নিচ্ছিল। সে নিজেও বোঝে মনটা তারের বাজনার মত একবার ঢিলে হয়ে গেলে, সুর আর লাগে না। সেও সুর বাধার কোন চেষ্টা করেনি।

হঠাৎ সেই মনটা বুকের মধ্যেই হু হু করে উঠল। অথচ এসব কোন কিছুই তার জন্য নয় এই ধারণা নিয়ে বড় হয়েছিল। কৈশোর থেকে শুধু শুনে এসেছে; বিধাতার দূত সে। আর্যজাতির সৌভাগ্যের রূপকার। বিপন্ন আর্যদের বহু প্রার্থনা ও বহু প্রত্যাশা পূরণের দাবি নিয়ে সে এসেছে দেবতার কর্তব্য করতে। মহান আর্যজাতির গৌরব ও মর্যাদার কাছে তার ব্যক্তিগত সুখ আরাম কিছু নয়। বৈদেহীর প্রেম ভালবাসা তার জন্য নয়। অন্তত এ জন্মে নয়। এরকম একটা বোধ থাকলে মনের ভালবাসা জন্মায় না। ভালবাসাকে আলাদা করে দেয়। তাই বৈদেহীর মধ্যে কোনকালে হারিয়ে যায়নি সে। বৈদেহী নিজে তা জানেও না বোধ হয়। রামচন্দ্রের সব সময় মনে হত বৈদেহীর শরীরে পৌঁছে গেলে তার আর কোন গন্তব্যই থাকবে না। একজন মানুষ সারাজীবন পথ চলে কোন একটা বিপুল প্রত্যাশা নিয়ে। সে সাধ একবার পূর্ণ হয়ে গেলে আর উদ্যম থাকে না। চাওয়ারও কিছু থাকে না। তাই বৈদেহীর শরীরে তার একটা গভীর অনীহা ছিল। কিন্তু একদিন সে বাঁধ ভাঙল। ভাবল ভালই হল। খুশিহীন জীবনটা আনন্দে ভরে গেল। তবু মনে হল, দুদিনের তো জীবন। এসেই চলে যাওয়া। দিয়ে নিয়ে, নিয়ে দিয়ে ভরপুর করে রেখে ধন্য করে চলে যাওয়ার মত বুঝি আর সুখ নেই। কিন্তু মনে সে কুসুম ফুটে ওঠার আগেই রাজনীতির তাপে অকালে শুকিয়ে গেল, আর স্বপ্ন দেখা হল না। কেমন একটা গভীর বিষণ্ণতায় মাখামাখি হয়ে থাকল তার মন।

ভেজা স্মৃতির ঝোড়ো হাওয়ায় উথাল পাথাল গাছের মতোই উথাল-পাথাল করে তার মন। রামচন্দ্রের চোখ-মুখ জ্বালা করছিল। মনে হচ্ছিল একটু কাঁদতে পারলে হাল্কা হত। ভেতরের একটা অস্বস্তিতে সে ছটফট করেছিল। বড় ফাঁকা আর একা লাগছিল।

বেশ খানিকটা সুরা গলায় ঢালল। তবু মনের ঝড় থামল না। বার বার মনে হতে লাগল নিজের কাছেই তার বড় হার হয়েছে।

সীতার মুখখানা মনে পড়েছিল। কখনও শবরীর কথাও মনে পড়ছিল। বহুকাল আগে তাড়কার ঘৃণাভরা অবজ্ঞা মাখানো ভয়ঙ্কর মুখটাকে সে দেখছিল। জীবনের রাশি রাশি ঘটনাস্রোতের মধ্যে সে মুখখানা আজও হারায়নি। বোধ হয় কখনও কখনও কোন কোন দৃশ্য মনের চোখে অথবা বুকের ভেতর এমনি করে গেঁথে থাকে চিরকালের মতন।

কী যে করবে ভেবে পেল না রামচন্দ্র। সবই গোলমাল হয়ে যাচ্ছিল। সে নিজের সর্বনাশ নিজেই করেছে। নিজের সঙ্গে নিজের বিশ্বাসঘাতকতার দাম এখন সারা জীবন ধরে দিতে হবে। এক বুক অস্থিরতা নিয়ে রথে উঠল। একা একাই বেরোল।

বাতাস কেটে শন্ শন্ করে ছুটতে লাগল রথ। রথের গতিবেগের সঙ্গে মনের যন্ত্রণাও বাড়তে লাগল। একটা অনুভূতি তীব্র হল। বৈদেহীর উপর সুবিচার করেনি, কোন কর্তব্য করেনি। তার জন্য খুব কমই ভেবেছে। মনের ভেতর অপারগতার কথাগুলো কাঁটার মত বিঁধতে লাগল। আর ততই শক্ত হাতে লাগাম চেপে ধরল। লাগামের এক একটা ঝাপ্টা দেয় আর অশ্ব তত উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়তে থাকে। রথের গতি প্রবলতর হয়।

পথ ভাল নয়। এখানে-ওখানে গর্ত ; অসমতল। তবু রামচন্দ্র সাবধান হল না। পক্ষিরাজের মত উড়ে চলল অযোধ্যায় জনপথে। ধুলো উড়ছিল চাকায় চাকায়। মাথা গা ভরে গেল রামচন্দ্রের।

ভেতরের অস্থিরতা রামচন্দ্র টের পাচ্ছিল। সীতার জন্য বুকের ভেতর কেমন একটা উথলে ওঠার ভাব হল তার। এই যে রথে চেপে চারদিক দাপিয়ে ঢেউ তুলে বেড়াচ্ছিল, এতো মনের অস্থিরতাকে চাপা দেওয়ার জন্যই।

অনেকক্ষণ ধরে চোখের কোণ দুটো জ্বালা করছিল। এত কষ্টেতেও একটু জল গড়িয়ে পড়ল না। আশ্চর্য হল রামচন্দ্র। তবে কি চোখের জলও শুকিয়ে গেল? কান্নার বদলে রইল তার বুক ভরা জ্বালা। এই জ্বালায় জ্বলছিল তার বিবেক।

অশ্বের খুরের শব্দের মত তার বুকের স্পন্দন ধুক্‌পুক্‌ ধুকুপুক্‌ করে বেজে যাচ্ছিল অবিরল। হঠাৎ জনশূন্য পথে রামচন্দ্র একবার প্রাণ খুলে চেঁচিয়ে ডাকল: বৈদেহী! বৈদেহী।

পথের দুধারে গাছ, বন, রথের অবিরল ঘর্ঘর শব্দ তার গলার স্বরকে চাপা দিল। বৈদেহী নামটা চাকার নিচে যেন গুঁড়িয়ে গেল। রামচন্দ্রের বুকটা ভেঙে যেতে লাগল। গলার কাছে কি যে সব দলা পাকিয়ে উঠতে লাগল। নিজের মনে নিঃশব্দে বলল: বৈদেহী তোমাকে দিয়ে ভাঙতে চেয়েছিলাম অন্ধকারকে, কিন্তু ভুল বশে ভেঙে ফেললাম আলো। আমার সামনে পেছনে এখন শুধুই অন্ধকার। এত অন্ধকারের ভেতর কেউ কখনও দেবতা হতে পারে? দেবতা হওয়ার ইচ্ছেও আর নেই।

বড় রাস্তায় রথ। বিকেলের মরা হলুদ-রোদ মাখামাখি হয়ে ছিল গাছের পাতায় পাতায়। ঝরাপাতা উড়ে পড়ল গাছ থেকে হাওয়ায় গা ভাসিয়ে। নৃত্যরত রমণীর মত পাক খেতে খেতে মাটিতে থিতু হয়ে বসল যেন।

রাত নেমে আসবে একটু পরে। শ্বাপদ-সংকুল তমসার ঘন অরণ্যে রাতের বিভীষিকা নামবে। সীতা একা অসহায় নারী। তার পরিণামের কথা চিন্তা করে রামচন্দ্রের দু'চোখ ঝাপসা হয়ে গেল। এই প্রথম সীতার জন্য তার চোখ ভরে জল এল। মনে মনে বলল: ভাল থাকো। নিজের জন্যে না হলেও তোমার অনাগত সন্তানের জন্য ভালো থেকো। ভালো থেকো সব সময়।

কয়েকদিন রামচন্দ্রের এক অদ্ভুত ঘোরের মধ্যে কাটল। সর্বগ্রাসী এক জ্বালা তার মনের মধ্যে। চারদিন দিনরাত কি করে কাটল অনুভব করতে পারল না। টের পেল না, সে ঘুমিয়ে আছে, না জেগে আছে।

রামচন্দ্র চারদিন চলল পুতুলের মত। তাকে খেতে বললে খায়; স্নান করতে ডাকলে স্নান করে। যেন সে ঠিক বুঝতে পারছিল না, সে আসলে কি করছে। কথা প্রায়ই ছিল না তার মুখে। সাহস করে কেউ কিছু জিগ্যেস করত না। একা বিবশ হয়ে নিজের ঘরে চুপ করে কাটাল চারদিন। এর ভেতরে একদিনও রাজসভায় গেল না। কারো সঙ্গে দেখা করল না। নিজের অব্যক্ত যন্ত্রণায় সে একজন নিঃসঙ্গ সঙ্গী। মনের অভ্যন্তরে তার কষ্ট একা ভোগ করতে লাগল। অস্ফুট এক ব্যথা। বড় অদ্ভুত। একটা দুর্বোধ্য যন্ত্রণা, কষ্ট ভিতরে মাথা কুটে কুটে বেরোনোর পথ খুঁজছিল। এই যন্ত্রণার কোন মানে নেই। শুরু হল বিচার বিশ্লেষণ, সমাধানের চেষ্টা। নিজেকে কোনদিন সীমাবদ্ধ গন্ডিতে বিশ্বের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছে। বিশ্ব-কল্যাণ তার লক্ষ্য। বৈদেহীর প্রতি বিশেষ দুর্বলতা থাকতে নেই। বৈদেহীর সঙ্গে যে ছলনাই করুক তার উদ্দেশ্য কিন্তু বড় এবং মহান। বড় আদর্শের আলো যখন কালের দর্পণে পড়বে তখন আর তা ছোট কিংবা নিন্দনীয় হবে না। আরো বড় হয়ে যাবে। দেশের মঙ্গলের সুখ, স্বার্থ, তৃষ্ণা বিসর্জন দিয়েই একমাত্র দেশমাতৃকার পদতলে এসে দাঁড়ান যায়। মা তার সব অন্যায়, অপরাধ ক্ষমা করে তাকে কোলে তুলে নেবে। এই বোধ মনটাকে প্রসারিত করে দিল। মুখ চোখও স্বাভাবিক দেখাল।

পঞ্চম দিনের দিন রামচন্দ্র আবার রাজসভায় এল। সহর্ষ বিস্ময়ে প্রথমে ভ্রাতাদের দিকে তারপর সভাসদবর্গের দিকে চেয়ে রইল। কদিন ধরে তার মনের ওপর দিয়ে যে ঝড় বয়ে গেল, একটা বিরাট ভাঙচুর হল তার কোন চিহ্ন ছিল না মুখে। তার উজ্জ্বল কান্তিতে কেবল একটু ভাটা পড়েছিল। আর মুখ অসম্ভব গম্ভীর। তবু সব কিছু সহজ করে নেওয়ার জন্য বলল: কী হল? আপনারা এত গম্ভীর কেন? প্রত্যেক মানুষের জীবনে এমন এক দুর্দৈব মুহূর্ত আসে। যখন অনেক থেকেও কিছুমাত্র থাকে না। সকলে থেকেও কেউ নয় তার। সেইসব মুহূর্ত তাকে তার আসল আমি, একা আমির সর্বস্ব সম্বল করেই দাঁড়াতে হয়। জীবনের কিছু মূল প্রশ্নের উত্তর তাকে একা একাই দিতে হয় নিজেকে। সেইসব মুহূর্ত বড় কঠিন, পরীক্ষার মুহূর্ত। কারোর জীবনে এমন পরীক্ষা না আসাই ভাল। জানি না, আপনারা আমাব বক্তব্য ভাল করে বুঝছেন কি না। আমি নিজেও পুরো বুঝে ওঠতে পারিনি এখনও। সময় যখন হবে, তখন আমরা সবাই টের পাব তার ভালটা।

রামচন্দ্রের কথাগুলো সকলকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। ভরতের দুই চোখ অশ্রুসিক্ত হল। ভেজা গলায় বলল : অগ্রজ, তোমার মন আজ ভাল নেই। এখনও কিছুদিন তোমার বিশ্রাম দরকার।

চমকে ওঠে রামচন্দ্র ভরতের দিকে তাকাল। তারপর, মাথা নুয়ে হাসল একটু। বলল: এ কিছু নয়। আমার সভাসদদের সঙ্গে মিলতে পেরে মনে মনে কত খুশি হয়েছি জান। অন্তত তাদের কাছে দাঁড়িয়ে বলতেও পারছি দেশের মানুষই দেশের প্রকৃত পরিচয়। দেশের চেয়ে বড় আমার কাছে কিছু নেই। দেশের মানুষ বৈদেহীর নির্বাসন চায়। রাজমহিষী বলে বৈদেহী অব্যাহতি পায়নি। তাদের ইচ্ছাতেই আমি তাকে বনবাসে পাঠিয়েছি। এতে আমার যে ক্ষতি হয়ে থাকুক, জনগণ অন্তত জানুক এদেশ তাদের দেশ। রাজা ও রাজমহিষীর কার্যের সমালোচনা শুধু নয়, বিচারেরও অধিকার তাদের আছে। এই সুন্দর দেশে শুধু সুন্দর মানুষই বেঁচে থাকুক। এইটেই সুন্দর হবে। অসুন্দর জঞ্জালদের সরিয়ে দেওয়াটা একটা মহৎ কর্তব্যবোধের মধ্যে পড়া উচিত বলে মনে করি। দেশের মানুষের প্রতি সেই কর্তব্যই করছি। কর্তব্য বড় কঠিন। আরো কঠিন তাকে ভালবাসা।

সভাসদেরা সকলে নীরব। ভ্রাতারাও কেউ কোন কথা বলতে পারল না। রামচন্দ্রের দুই চোখের উপর স্থির হয়ে রইল তাদের অপলক মুগ্ধতা।

সাত

সীতার দিকে চোখ তুলে তাকাতেও বাল্মীকির কষ্ট হয়। বুকের ভেতরটা কেমন করে। সমস্ত ব্যাপারটাকে ভালো করে তলিয়ে বোঝবার চেষ্টা করল। গ্রামের কয়েকজন নারী-পুরুষ সীতা সম্পর্কে কি বলল শুধু তার উপর ভিত্তি করে রামচন্দ্র পতিপ্রাণা, সতীশ্রেষ্ঠা সীতাকে নির্বাসন দিল এই নিকৃষ্ট ভোঁতা যুক্তিটা বাল্মীকি কিছুতে বিশ্বাস করতে পারল না। সীতা নির্বাসনের পক্ষে এই কৈফিয়ত যে কোন যুক্তিবাদীর মনে সন্দেহের উদ্রেক করবে। তবু এই নিয়ে অযোধ্যায় কিংবা বিদেহতে কোন প্রতিক্রিয়া নেই। কোথাও কোন হৈ-চৈ নেই। বিক্ষোভও নেই। এরকম একটা দুষ্কর্মের জন্য রামচন্দ্রকে কেউ ধিক্কার পর্যন্ত দিল না। নিন্দেও করল না। রামচন্দ্রের ভ্রাতারাও মুখ খুলল না। আর্যাবর্তের রামচন্দ্র বিরোধী রাজন্যবর্গও তাকে কপট, খল, ক্ষমতালোভী বলল না। এই নীরবতার কারণ কি হতে পারে?

বাল্মীকির মনের ভেতরটা জিজ্ঞাসায় উত্তাল হল। রঘু পরিবারে, রাজ্যে, আর্যাবর্তে— সত্যই সীতাকে কি কেউ চায় না? সীতাকে ত্যাগ করা ছাড়া কি রামচন্দ্রের কোন উপায় ছিল না? রামচন্দ্রের মত বীরের এই নিরুপায় অসহায়তার কারণ কি?

বাল্মীকির মনে আরো নতুন নতুন জিজ্ঞাসা উদয় হল। সেই সঙ্গে সংশয় জাগল। সমস্ত ঘটনা পর্যালোচনা করলে রামচন্দ্রকে ক্ষমতালোভী, কুচক্রী, কপট একজন নরপতি মনে হওয়া কিছু অস্বাভাবিক নয়। তবু কোন সন্দেহ, অপবাদ, নিন্দা, কুৎসা রামচন্দ্রের চরিত্রকে কলঙ্কিত করেনি। তার ব্যক্তিত্ব গৌরব এবং মর্যাদা সূর্যের মত ভাস্কর এবং দীপ্ত। বাল্মীকির কাছে সব ব্যাপারটা তালগোল পাকিয়ে গেল। মনে হতে লাগল, এর ভেতর অনেক জট, অনেক জটিলতা। এই জট ছাড়াতে পারলে আসল সত্যের আলো, ঢেকে রাখা রহস্য ও বিভ্রান্তির উপর পড়ে হয়ত কিছুটা আলোকিত করতে পারে। সীতার মত মহীয়সী নারীর দুর্ভাগ্যের কারণ কোথায়, কে বা কারা দায়ী তার কারণ অন্বেষণে ব্রতী হল। সীতা কেউ নয় তার। শুধু আশ্রিতা। তবু তার সঙ্গে কোথায় একটা গভীর সম্পর্ক আছে যেন। যে সম্পর্কটা আন্তরিক এবং আত্মিক। সীতার দুঃখ, কষ্ট, যন্ত্রণা, দুর্ভাগ্যের মূল যে রামচন্দ্র তাকে নিয়ে বাল্মীকির বিচার-বিশ্লেষণ এবং গবেষণা।

বাল্মীকির দুটি চোখ বিশাল ভারতবর্ষের মানচিত্রের উপর স্থির। উত্তর ও দক্ষিণে বিভক্ত ভারতবর্ষের দুই মেরুতে আছে আর্যজাতি, আর অন্য মেরুতে আছে এদেশের আদিম অধিবাসী যাদের গায়ের রঙ কৃষ্ণবর্ণ, যারা আর্য নয়; অনার্য। আর্য-অনার্যের দ্বন্দ্ব ভারতবর্ষের এক অতি প্রাচীন সনাতন বিরোধ। যেখানে দুপক্ষই নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য মরণপণ সংগ্রাম করছে। রামচন্দ্রের সঙ্গে রাবণের যুদ্ধের রাজনৈতিক গতি-প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে আর্য-অনার্যর বিরোধ ও দ্বন্দ্ব এবং লঙ্কা যুদ্ধের পর দেশের রাজনৈতিক ছবিটা বাল্মীকির কাছে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই পরিপ্রেক্ষিতে রামচন্দ্রের আচরণ বিচার করলে

সীতা নির্বাসনের একটা উত্তর খুঁজতে বাল্মীকির দৃষ্টি বহুদূর পর্যন্ত প্রসারিত হয়ে গেল। আশ্চর্য হল, কি এক গভীর রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র রামচন্দ্রের আবির্ভাবের বহু আগে থেকেই তৈরি হয়েছিল। মানবহিতৈষণা, ধর্ম ও সততার নামাবলী গায়ে চাপিয়ে আর্যঋষিরা কি কৌশলে এবং সতর্কতায় আর্য উপনিবেশ স্থাপনের এবং বিস্তারের এক অনুকূল পরিবেশ গড়েছিল। আর্যাবর্তের রাজ্য ও রাজনীতিতে মুনিঋষিদের এই প্রাধান্যের জোরেই আর্য-নরপতিরা তাদের আশিসধন্য হয়ে রাজত্ব করত। কিন্তু কালক্রমে, বহিরাগত আর্যদের শ্রেষ্ঠত্ব যে সব দেশীয় নরপতি স্বীকার করল না, বিঘ্নিত করল আর্যঋষিরা তাদের নিশ্চিহ্ন এবং ক্ষমতাচ্যুত করার এক পরিকল্পনা করল।

প্রজ্ঞা দৃষ্টি দিয়ে আর্যঋষিরা বুঝল, একটা সার্বিক ধ্বংস ছাড়া ভারতবর্ষের মাটিতে আর্য-প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব ছিল না। এই নীতির মন্ত্রদাতা ছিল বিশ্বামিত্র। বিশ্বামিত্র তাঁর অনুগামী মুনিঋষিদের নিয়ে একটা সর্বগ্রাসী এবং সর্বশেষ ক্ষমতা লড়াইয়ের পরিকল্পনা করল। এই পরিকল্পনা হল সুদূরপ্রসারী।

একটা গোটা বংশধারা সৃষ্টি করে সুপরিকল্পিতভাবে ক্ষমতা করায়ত্ত করার সে এক অভিনব পরিকল্পনা। ভাবতেও বিস্ময় লাগল বাল্মীকির। সেই নতুন বংশধারা বা সম্পূর্ণ একটা নতুন প্রজন্মের মানুষ সৃষ্টি করে তারা তার পূর্ণ বিকাশের জন্য দীর্ঘকাল অপেক্ষা করে থেকেছে। রামচন্দ্রকে বিশ্বামিত্র নিজের মনের মত করে গড়ে উদ্দেশ্য সাধনের শক্তি রূপে ব্যবহার করেছে।

নিঃশব্দে রামচন্দ্র সম্পর্কে অদ্ভুত চিন্তাগুলো তাকে দীর্ঘক্ষণের জন্য আচ্ছন্ন করে ফেলল। রামচন্দ্র সম্পর্কে বহুকালের ধারণাগুলো পারদের মত ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়ল মনের ভেতর। রামচন্দ্রের নিজস্ব পরিচয়টাই যেন মুছে যাচ্ছিল। একটা কিছু বদলে যাওয়ার ভেতর আনন্দ, উত্তেজনা এবং যন্ত্রণা আছে। বাল্মীকির মাথার ভেতরটা ঝনঝন করে উঠল তীব্র যন্ত্রণায়। বুকটাও ব্যথা করতে লাগল। কিন্তু আবিষ্কারের চমক সব কিছুকে ছাপিয়ে গেল। প্রতিদিন বাণীময় হয়ে উঠল রামকথা, ছন্দে বাক্যে সুরে।

কয়েকদিনের পরিচর্যায় সীতা সুস্থ হল। মানসিক অবসাদ দুর্বলতাও ধীরে ধীরে কাটিয়ে উঠল। গভীরভাবে অপমানিত হলে ভিতরকার তাপে সারা শরীরটা কেমন শুকনো শুকনো লাগল। মুখের লাবণ্যেরও টান ধরল। সীতার মুখে চোখে সেইরকম একটা ভাব ফুটল।

বাল্মীকি সমবেদনার চোখ দিয়ে সীতার ভেতরটা দেখতে পায়। তার ভিতরকার উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা, দ্বিধা দুঃখ একাকিত্ব সব কিছুই সে টের পায়। কিন্তু কখনও সমবেদনা জানায় না। করুণা করে না। কারণ এগুলো করলে মানুষ আরো বেশি বিব্রত ও অপমানিত হয়। মানুষ হয়ে জন্মালে তাকে দুঃখ কষ্ট যন্ত্রণা কিছু ভোগ করতে হবে। এগুলোকে সাঁতরে যাওয়ার আর এক নাম জীবন। সীতাকেও সেই জীবদ্দশার ভেতর দিয়ে যেতে হবে। এতে নতুন কিছু নেই। আশ্চর্য হওয়ারও নেই।

তবু সে সব যুক্তি কি হৃদয় বোঝে? মায়া-মমতা মানুষের জন্মগত অভিশাপ। এর শক্ত বাঁধন থেকে মুক্ত হওয়া মুক্তি পাওয়া বড় কষ্টকর। সীতা সেই অদ্ভুত মোহে পড়ে পেটের সন্তানের জন্য বেঁচে আছে। নইলে, তার তো কোন ভাবনা ছিল না।

বাল্মীকিও কেমন একটা মায়ায় জড়িয়ে গেল সীতার সঙ্গে। অথচ একদিন সংসারের সব বন্ধন ছিন্ন করে বেরিয়ে পড়েছিল মহাপৃথিবীর দিকে। সব মায়ামোহের বাঁধন কাটল ভেবে আত্মতৃপ্ত হল। কিন্তু সে যে বড় মিথ্যে ধারণা বাল্মীকি অনুভব করল। মানুষের সংসার তাকে ছাড়ল কই? সংসারকে যত পর করতে চাও না কেন, সংসার মায়া-মোহের কেন্দ্রে ঠিক টেনে নেবে। মন্ত্রমুগ্ধ করবেই। আপন না পেলে পরকে আঁকড়ে ধরবে। মায়াবশে মানুষ আপন হয়। আত্মপর ভেদ থাকে না।

বাল্মীকি তার উস্কো-খুস্কো চুল হাত দিয়ে চেপে চেপে মাথায় বসানোর চেষ্টা করল। কিন্তু থাকল না। বারবার এলোমেলো হল। চুলগুলোই যেন তাকে স্মরণ করিয়ে দিল মুখে আর মনে যা ভাবা যায় বাস্তবে তা হয় না। মুখে নিজেকে সব কিছু থেকে সরিয়ে নেওয়ার কথা ভাবা যায়, কিন্তু ওটা হল ভাবের কথা। আসল সত্য নয়। সীতা এখন তার বাস্তব সত্য।

তবু কেন যেন বাল্মীকির বারংবার মনে হতে লাগল ঈশ্বর যা করেন মঙ্গলের জন্য। সীতাকে এ রকম সময়ে বনে নির্বাসিত করে রামচন্দ্র অমানবিক এবং নিষ্ঠুর কাজই করেছে। তথাপি এরকম একটা দুর্ভোগ ভোগ করা সীতার হয়ত দরকার ছিল। ঈশ্বরের সব কাজই উদ্দেশ্যপূর্ণ। ঈশ্বর তার পেটের সন্তানকে দিয়ে বিশ্বপৃথিবীর এমন কোন কাজ করতে চায় যা হয়ত অযোধ্যার পরিধিতে আঁটবে না। তার জন্য দরকার মহাপৃথিবীর অবারিত মুক্ত অঙ্গন। অথবা সীতার এই সন্তান থেকে রামচন্দ্র নিজের এবং তার রাজ্যের বিপদ আশঙ্কা করেই হয়ত সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার আগে উভয়কে একসঙ্গে নিশ্চিহ্ন করার কূট মতলব নিয়ে শ্বপদ সঙ্কুল ভয়াল নির্জন অরণ্যে নির্বাসিত করল যাতে কোন অবস্থায় সীতা প্রাণে না বাঁচে। কিন্তু ঈশ্বর রামচন্দ্রের নিয়তিরূপী সীতা এবং তার পেটের সন্তানের মৃত্যু চায় না। তাদের উভয়ের বেঁচে থাকাটা ঈশ্বরের কাছে খুবই জরুরী। তাই বোধ হয় মৃত্যুর গুহা থেকে নিরাপদে এবং সহজে বেরিয়ে আসতে পারল। ঈশ্বরের অভিপ্রায়েব রহস্য ভেদ করার সাধ্য ছিল না বাল্মীকির। তবে ষষ্ঠেন্দ্রিয় দিয়ে সীতার বিপদের সম্ভাবনাকে আঁচ করতে পারল। তাই সীতাকে নিয়ে বাল্মীকির ভয় ও দুর্ভাবনা দুই ছিল।

সীতা বাল্মীকির উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা অস্থিরতাকে দেখতে পায়। তার মুখে রাত্রি জাগরণের চিহ্ন, দুশ্চিন্তার ছাপ। ভীষণ কষ্ট হয়। খারাপ লাগে। বাল্মীকির চেহারার দিকে তাকানো যায় না। বৃদ্ধ শরীরের কত ধকল আর সয়! বাল্মীকির জন্য তার বুকটা ব্যথিয়ে উঠল। এই পৃথিবীতে একমাত্র এই মহান মানুষটা ছাড়া আর কেউ নেই তার।

সীতা গভীর দৃষ্টিতে দেখতে লাগল হেমন্তের রোদে পিঠ দিয়ে একটা অজিনের উপর বসে আছে বাল্মীকি। পা টিপে টিপে নিঃশব্দে তার পিছনে দাঁড়াল সে। বাল্মীকির কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। অজিনের এক প্রান্তে বসল। পিঠে হাত রাখল। নরম মমতা মাখানো একখানা হাত। বড় মিষ্টি। মনটাকে ভরিয়ে দিল অনাস্বাদিত সুখে। তারপর বাহুর উপর মাথা রেখে ভেজা গলায় অস্ফুট স্বরে বলল: পিতাজী, আমার কথা তুমি খুব ভাব তাই না? কিন্তু আমি কী করব? আমার করার কী আছে? শুধু ভাবতে পারি।

একথায় বাল্মীকি বুকের ভেতরটা কেমন করে উঠল। আচমকা একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল। তারপরেই একটু অদ্ভুত হাসল। সেই হাসির-ঔজ্জ্বল্যে বাল্মীকির মুখখানা অসাধারণ সুন্দর দেখাল। ধীর স্বরে বলল: বোকা মেয়ে। ভাবনার কিছু নেই। একটু থেমে পুনরায় উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলল: তবে কি জানিস মা; কথাটা শেষ না করে সংকোচে সীতার দিকে তাকাল।

সীতার ভুরু কুঁচকে গেল। ব্যাকুল কণ্ঠে বলল: পিতাজী, তুমি চুপ করে থেক না। কি বলবে বল। আমি সব কিছুর জন্য প্রস্তুত আছি।

বাল্মীকি সীতার চুলের মধ্যে আঙুল দিয়ে বিলি কাটতে লাগল। কয়েকবার ঢোক গিলে বলল: অনেকদিন ধরেই একটা কথা বলব বলব করছি। কিন্তু বলা হয়ে উঠছে না কিছুতে।

তুমি নিঃসঙ্কোচে বল।

তুমি যে অযোধ্যার রাজমহিষী শ্রীরামের পত্নী, জনকনন্দিনী এই কথাগুলো গোপন রেখ। ঘুণাক্ষরে তোমার পরিচয় দেবে না। তোমার সন্তানও জানবে না কে তুমি। তাদের পিতা কে, কক্ষনো বলবে না। শুধু এই প্রতিশ্রুতি আমাকে দাও। এই আশ্রমে আর সব আশ্রিতা মহিলার মতই তুমি থাকবে। তাদের সঙ্গে মিশে যাবে। তোমার অতীতকে মুছে ফেলে একজন আশ্রমিকার মত জীবনযাপন করবে। তাহলে কেউ তোমাকে সন্দেহ করবে না। নিজেকে প্রচ্ছন্ন রাখা সহজ ও সরল হবে তোমার। বল, আমার নির্দেশগুলো পালন করবে?

এই আদেশ! আমি ভাবলুম কি না কি? —বলে সীতা বড় বড় চোখ করে তাকিয়ে রইল বাল্মীকির দিকে। বেশ দেখাল তাকে। তারপরেই একটু হাসল। মুচকি হাসি। নীলাকাশ থেকে ঝরে পড়া জ্যোৎস্নাধারার মত দেহমনকে স্নিগ্ধ করে দেওয়া সে হাসি।

বাল্মীকির মুখেও বেশ একটা আত্মতৃপ্তির ভাব ফুটল। ইচ্ছে করল সীতাকে বুকে জড়িয়ে একটু আদর করে।

বাল্মীকির মুগ্ধ বিহ্বল দুই চোখের দিকে তাকিয়ে সীতা আবার একটু হাসল। লাজুক হাসি। আঁচলের প্রান্তে আঙুল জড়াতে জড়াতে বলল : পিতাজি শরীর ভাল বোধ করছি না। কয়েকদিনের ভেতর কিছু একটা হবে। লাজুক অপ্রতিভতায় মাথা হেঁট করল সীতা।

আশ্রমে সীতার ছয়পক্ষ কাল পূর্ণ হল।

সকাল থেকেই তার গর্ভযন্ত্রণার সূচনা। বর্ষীয়সী আশ্রমিকারা সূতিকাগারে সীতার পরিচর্যায় সর্বক্ষণ নিযুক্ত।

তপোবনের বিশাল আঙ্গিনায় বাল্মীকি একা অত্যন্ত অস্থিরভাবে পায়চারি করছিল। বিব্রত ভয় আর উৎকণ্ঠায় তার চোখে মুখে কালি পড়েছিল। ভীষণ শ্রান্ত দেখাচ্ছিল। নিজের চিন্তায় অন্যমনস্ক হতে গিয়ে দেখতে পেল সীতার যন্ত্রণাক্লিষ্ট করুণ মুখখানা আবীর রাঙানো চোখের জলে মাখামাখি। তার আয়ত কালো চোখের গভীরে এক অসহায় দৃষ্টি। সীতা এখন তার কাছে বাস্তব সত্য। সব দৃশ্য ও অনুভূতির ভেতর যা কিছু ক্রিয়াশীল তা সীতাকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হচ্ছিল।

বাল্মীকি বনস্পতির নিবিড় ছায়ায় চুপ করে বসেছিল। চোখের সামনে ঝিমঝিম করে ভরা দুপুর। ভারি নির্জন নিরিবিলি অথচ রোদে ঝলমলে। ঝিরঝির করে অবিরাম কথা বলছে বনস্পতি। এইসব শব্দ ও দৃশ্য নির্জন দুপুরে বাল্মীকির চারদিকে নেমে আসে। অদ্ভুত দ্রুততায় বুনে চলে এক স্বপ্নের জাল। উঁকি দেয় একটি শিশুর ফুলের মত মুখ।

হঠাৎ স্বপ্নের জাল ছিঁড়ে গেল। একটু চমকে উঠে নিজের বৃত্তের বাইরে চোখ তুলে তাকাল। দেখল আকাশটা ধুলোয় ভরে গেছে। গাছপালা দিগন্ত ধুলোয় ঢাকা পড়েছে। শব্দের ঢেউ তুলে ধুলোর আগে আগে ছুটে আসছে ঝাঁকে ঝাঁকে অশ্ব। গাছের ফাঁকে ফাঁকে মাঝে মাঝে তাদের দেখা যাচ্ছিল।

বাল্মীকি আতঙ্কিত চোখে সেইদিকে চেয়ে রইল। তার ভেতরটা কেঁপে উঠল। ঘোড়ার খুরের শব্দ তার হৃৎস্পন্দের মত ধুকপুক ধুকপুক করে বেজে যাচ্ছিল অবিরল। বাল্মীকির সমস্ত ভয় আর ভাবনা সীতাকে নিয়ে। সীতার সন্ধান পেয়ে অনুতপ্ত রামচন্দ্র রাজকীয় সমারোহে তাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে সৈন্যসহ হয়ত কোন রাজ প্রতিনিধি পাঠিয়েছে। অশ্বক্ষুরধ্বনি একটা বিপদ সংকেতের মত বাজতে লাগল বুকের অভ্যন্তরে। অযোধ্যা থেকে লোক এলে বাল্মীকি কি করবে? নিজেকে তার ভীষণ অসহায় লাগল। কেমন বিভ্রান্ত লাগছিল। তার সূক্ষ্ম অনুভূতিময় জীবনে সীতা একটি পুষ্পোদ্যান। রামচন্দ্র হঠাৎ দৈত্যের মত তার সেই পারিজাতটি হরণ করে নিতে আসছে যেন।

বাল্মীকি বনস্পতির নিবিড় ছায়ায় স্থাণুর মত বসে রইল।

অনেকটা পথ ঘুরে বিশাল বাহিনীর সম্মুখভাগ তার আশ্রমের সামনে দাঁড়াল। সুসজ্জিত রথ থেকে একজন সুদর্শন, রূপবান রাজপুত্র নামল। তার কাছেই এল। মণিরত্নখচিত বহুমূল্যবান পোশাকের উপর পড়েছে বিকেলের পড়ন্ত হলুদ রঙের আলো।

দিশেহারা হয়ে বাল্মীকি অবিশ্বাসের চোখে আগন্তুকের দিকে অবাক চোখে চেয়ে থাকল কিছুক্ষণ। রাজপুত্র রামচন্দ্রের অনুজ শত্রুঘ্নকে চিনতে তার কষ্ট হল না। সেই মুহূর্তে মনটা আবার ঝাঁৎ করে উঠল। কেমন একটা সন্দেহ ঘুলিয়ে উঠল মনে।

শত্রুঘ্ন বাল্মীকির পদধূলি নিয়ে আত্মপরিচয় দিল। বলল : আমি রামানুজ শত্রুঘ্ন।

বাল্মীকির ভেতরটা এক অজানা ভয়, উৎকণ্ঠা আর অস্বস্তিতে ছটফট করতে লাগল। মনের অভ্যন্তরে সেই প্রতিক্রিয়া শত্রুঘ্নের কাছে একটুও যাতে প্রকাশ না হয় সেজন্য সহাস্য কণ্ঠে বলল: বৎস, তোমাকে দেখেই আমি চিনেছি। বৃদ্ধ হয়েছি তো! দূরের মানুষকে ভাল ঠাহর করতে পারি না। তারপর এত সৈন্য-সামন্ত দেখে ধন্দ লাগল।

শত্রুঘ্ন একটু লজ্জার হাসি হাসল। বলল : ঋষিবর। সব কুশল তো?

শত্রুঘ্নের কুশল প্রশ্নে বাল্মীকির উদ্বিগ্ন উৎকণ্ঠা একটু ধাক্কা খেল। খানিকক্ষণ সময় নিয়ে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল: নিশ্চয়ই, বনবাসীর সহজ সরল জীবনযাপনে অসুখী হওয়ার কিছু নেই। কিন্তু তুমি হঠাৎ কোথা থেকে উদয় হলে? এত সৈন্য-সামন্ত নিয়ে কোথায় চলেছ?

শত্রুঘ্ন হাসি হাসি মুখে নিরুদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলল: যুদ্ধে। মধুবনের অপরাজেয় সম্রাট লবণের সাম্রাজ্য আক্রমণ করতে আপনার আশীর্বাদ নিতে এসেছি। রাতটুকু এখানে বিশ্রাম করে কাল প্রত্যুষেই যাত্রা করব।

বাল্মীকি অবাক গলায় প্রশ্ন করল : যুদ্ধ! আবার! লঙ্কার রক্তক্ষয়ী মহাযুদ্ধের মহাশ্মশানের পর যুদ্ধের কথা ভাবে কেউ? যুদ্ধের ভূতটা বোধ হয় কখনও মরে না। শত্রুঘ্ন, তোমরা নগরে বাস কর। তাই জান না, মহাযুদ্ধের জন্য বনের মানুষদের কি দাম দিতে হয়? যুদ্ধ অযোধ্যার মানুষ করে না, কোন আর্যসন্তানও নয়। এই নিরীহ শান্তিপ্রিয় মানুষগুলো ছিল লঙ্কা যুদ্ধের বিশ্বস্ত সৈনিক। লঙ্কাযুদ্ধে তারা পেল কি? তাদের ঘরে ঘরে আজ বুক ফাটা কান্না আর হাহাকার! কত নারী স্বামী হারাল, কত শিশু পিতা হারাল, কত জনক-জননী তার পুত্র হারাল, তার খোঁজ রাখ কি? শুনতে পাও তাদের দীর্ঘশ্বাস? যুদ্ধের সেই ক্ষত শুকিয়ে যাওয়ার আগে আবার যুদ্ধ! হবে না কেন? অযোধ্যার লোককে তো সে জন্যে কোন দাম দিতে হয়নি। হারাতেও হয়নি কিছু।

অভিভূত আচ্ছন্নতায় কয়েকটা মুহূর্ত কাটল শত্রুঘ্নর। কিছুক্ষণ কোন কথা বলতে পারল না। দীর্ঘশ্বাস পড়ল ধীরে ধীরে। গম্ভীর গলায় বলল : শ্রীরাম বলেন, জন্ম থেকেই জীবকুলকে যুদ্ধ করতে হয়। তার পরিবেশের সঙ্গে এবং নিজের সঙ্গে। প্রকৃতিলোকে অহরহ এই যুদ্ধ লেগে আছে। যুদ্ধ করে টিকে থাকতে হয় প্রাণিকুলকে। যুদ্ধের তাই শেষ নেই। যুদ্ধ জীবনের ধর্ম। জীবের প্রকৃতি ও স্বভাব। মানুষ জীবকুলের সর্বকনিষ্ঠ প্রাণী। প্রাণীর স্বভাব ও ধর্ম সেও পারেনি ছাড়তে। মানুষের বেলায় তার যুদ্ধ কৌশল, পদ্ধতি এবং যুক্তি শুধু বদলায়নি, বিস্তৃতও হয়েছে।

বাল্মীকি দু'চোখ মেলে ভাবলেশহীন দৃষ্টিতে শত্রুঘ্নের দিকে চেয়ে রইল। তার দৃষ্টিতে কোন প্রশ্ন ছিল না। কেমন একটা দার্শনিকতায় বিভোর। উদ্গত নিঃশ্বাস বুকে চেপে আস্তে আস্তে বলল: ঠিক বলেছ। এমন একটা বিস্ময়ের ভাব করল যেন বাল্মীকি আগে শোনেনি কথাগুলো একটা দার্শনিক ঔদাসীন্যে আচ্ছন্ন করল তাকে। স্বগতোক্তি করে বলল: তাহলে বেঁচে থাকার আর এক নাম যুদ্ধ। মানবচরিত্রের সম্ভবত একটা স্বাভাবিক ধর্ম হল যুদ্ধ করা।

শত্রুঘ্ন বাল্মীকির চোখের তারায় এক রহস্যের দ্যুতি দেখতে পাচ্ছিল এবং তার নিজের প্রাণও দ্যুতিময় হয়ে উঠল। বাল্মীকির সব কথার তাৎপর্য ভাল করে বুঝতে পারছিল না। বিভ্রান্ত বিস্ময়ে তার দিকে তাকিয়ে রইল।

শত্রুঘ্নের মনে হল, বাল্মীকির চোখ মুখ, কথা, হাসি সব মিলিয়ে তাকে কেমন অস্বাভাবিক লাগছিল। বেশ বুঝতে পারল, তার ভেতর একটা তীব্র বিচলিত ভাব বর্তমান। তার অন্যমনস্ক আচরণে, চোখের তারায় তা যেন স্পষ্ট হয়ে ওঠল।

বাল্মীকি তার আত্মবিস্মৃত ভাবটা সহসা কাটিয়ে উঠে বলল: তুমি পথশ্রান্ত। বিশ্রাম করবে চল।

পরের দিন প্রভাতে শত্রুঘ্ন বাল্মীকির পদধুলি নিয়ে পশ্চিমদিকে যাত্রা করল। কিন্তু তার আকস্মিক আগমন এবং প্রত্যাগমনের রহস্যভেদ করতে পারল না বাল্মীকি। কারণ তার ধারণা হয়েছিল শত্রুঘ্ন সীতাকে নিতে এসেছে। অথবা সে এই আশ্রমে আছে কি নেই, সেই অনুসন্ধানও তার উদ্দেশ্য হতে পারে। কিন্তু শত্রুঘ্ন সীতা সম্পর্কে কোন কৌতুহল কিংবা আগ্রহ দেখাল না। রাত্রে আযোধ্যা নিয়ে তাদের মধ্যে কত কথা হল। কিন্তু সীতাকে নিয়ে কোন কথা হল না। ইচ্ছে করেই সীতা সম্পর্কে নীরব ছিল। অথচ, ঐ সময়ে সে সর্বক্ষণ উদ্বেগ, উৎকণ্ঠার উত্তাপ ভোগ করছিল। একটুও স্বস্তিতে ছিল না।

শত্রুঘ্নের সন্ধানী দৃষ্টি সে ফাঁকি দিতে পারেনি। তার অস্থির বিচলিত ভাব লক্ষ্য করে বলল : মুনিবরকে খুব বিচলিত এবং উদ্বিগ্ন দেখছি। বোধ হয়, কোন চিন্তা, দুর্ভাবনায় আছেন।

বাল্মীকি বেশ একটু অপ্রস্তুত হয়ে হাসল। ভুরু কুঁচকে বলল: তোমার অনুমান যথার্থ।

ঠিক সেই সময়ে একটি শিশুর তীক্ষ্ণ কণ্ঠের কান্না শোনা গেল। বাল্মীকি শব্দের দিকে কান এবং

ইন্দ্রিয় সজাগ রেখে বলল: শুনতে পাচ্ছ। সব মানবশিশু ঐভাবে চিৎকার করে তার আবির্ভাব ঘোষণা করে। একদিন তুমি,আমি করেছি। জান শত্রুঘ্ন, আমার ভীষণ আনন্দ হচ্ছে এখন। বুক থেকে উৎকণ্ঠার পাহাড়টা নেমে গেল। ভীষণ ভারমুক্ত আর হাল্কা লাগছে।

আবার একটা তীক্ষ্ণ কান্নার স্বর রাত্রিকে বিদীর্ণ করল। বাল্মীকির আন্তরাত্মা কেঁপে উঠল তরাসে। শ্বাসরুদ্ধ উৎকণ্ঠা আর উত্তেজনা নিয়ে ঘর থেকে বেরোল। নিজের মনে বলল : বোধহয় শেষ রক্ষা হল না। আমার আশার দীপ বোধ হয় নিভে গেল। কথাটা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বুকের ভেতরটা হাহাকার করে উঠল। অমঙ্গল আশঙ্কা করার জন্য নিজেকে নিজে ভর্ৎসনা করল।

আঙিনায় এসে থমকে দাঁড়াল। দীপ হাতে একজন বয়স্ক আশ্রমিকাকে তার দিকে আসতে দেখল। প্রত্যাশায় ব্যথা লাগা চমকানো বিস্ময় নিয়ে অন্ধকারে হতভম্বের মত কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল।

আশ্রমিকা চুপিসারে ফিস ফিস করে বলল : যমজ পুত্র হয়েছে। একটা দুরন্ত উল্লাস বাল্মীকির বুকের ভেতরটা প্লাবিত করে গেল। অনেকক্ষণ পর্যন্ত সে কোন কথা বলতে পারল না।

শঙ্খ ও উলুধ্বনিতে আশ্রম মুখর হল। কুটীরে কুটীরে দীপ জ্বলল। রাত্রি সহসা জেগে উঠল। বাতাস মধুময় হল। হঠাৎ এক অদ্ভুত অনাস্বাদিত আনন্দ নামল আশ্রমে।

শত্রুঘ্ন আশ্রমে থেকেও সেই আনন্দের শরিক হল না। অথচ, তার ভয়েই কন্টকিত হচ্ছিল বাল্মীকির আনন্দ। তার উপস্থিতিটা সমস্ত চেতনার ভেতর জড়িয়ে ছিল। শত্রুঘ্ন আশ্রম পরিত্যাগের অব্যবহিত পরেই সেই স্মৃতিটা বাল্মীকির মনকে স্পর্শ করল। তার কৌতূহলহীন নির্বিকারত্বকে সে ভুলতে পারল না। আবার তার রহস্য উদ্ঘাটনও কঠিন হল।

কিন্তু সন্দেহ এমন এক জিনিস যে, একবার মনের ভেতর ঢুকলে তা আর যায় না। নিজের নিজের বিশ্বাস অবিশ্বাস নিয়ে সে শুধু বড় হয়। শত্রুঘ্নর প্রভাব প্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত করে নানাভাবে বাল্মীকি তার কৌতূহলহীন নির্বিকারত্বকে বিশ্লেষণ করল। কিন্তু কোন সমাধানে কিংবা সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারল না। কেবল সন্দেহটা নতুন করে বেঁচে রইল। যে কথাটা বাল্মীকি কখনও ভাবতে চায়নি সেই কথাটা মনের সব প্রতিরোধ ভেঙে বেরিয়ে এল যেন হঠাৎ।

তমসার জঙ্গলে সীতার মৃত্যু হয়েছে। এই কথাটা রামচন্দ্র থেকে রাজধানী অযোধ্যার সকলের কাছেই সত্য। কারণ শ্বাপদ সংকুল তমসার অরণ্য থেকে কেউ প্রাণ নিয়ে ফেরে না। দুর্দান্ত দুঃসাহসী ব্যাধও তমসার অরণ্যে শিকার করতে যায় না। তাই সীতাকে নিয়ে রামচন্দ্রের কোন কৌতূহল নেই। রাজধানী অযোধ্যার মানুষও জানে রামচন্দ্র পাপের শাস্তি দিতে সীতাকে হিংস্র জন্তু জানোয়ার ভরা তমসার জঙ্গলে নির্বাসিত করেছে। জঘন্য পাপের শাস্তি দিতে পাপীকে তমসার নির্বাসন দেওয়া হয়। সুতরাং সেখানে অসহায় সীতার বেঁচে থাকা কিছুতে সম্ভব নয়। তাই গুপ্তচরের সন্ধানী দৃষ্টিও তার ওপরে ছিল না। সীতা সম্পর্কে শত্রুঘ্নের নির্বিকার থাকার এটাই অন্যতম কারণ মনে হল বাল্মীকির।

ভাবতেও কষ্ট লাগল রামচন্দ্রের জীবনে সীতার আর প্রয়োজন নেই। সীতা তার কাছে ফুরিয়ে গেছে। একেবারেই মুছে গেছে জীবন থেকে। বাল্মীকির মনের ভেতর ঝড় উঠল। এই নির্মম নিষ্ঠুর প্রেমহীন পৃথিবীতে সীতার আপনার বলে কেউ রইল না। সে একা। ভীষণ একা। এরকম একটা অনুভূতিতে বাল্মীকির বুক ব্যথা করতে লাগল। করাতে কাটার মত ব্যথা অথচ আওয়াজহীন। বাল্মীকির বুকটা চিরে চিরে যায়।

নিজেকেই প্রশ্ন করল বাল্মীকি কেন এমন হল? সীতার মত মিষ্টি স্বভাবের মেয়ে তো রামচন্দ্রের উন্নতির পথে, উচ্চাশার পথে কোন বাধা নয়। রামচন্দ্রকে পূর্ণ করতে, তাকে ভরপুর করতে এবং সুধন্য করতে সে নিজেকে এবং নিজের প্রেমকে উৎসর্গ করেছিল। আর কেউ না জানতে পারে, কিন্তু সে জানে। এটা জানা সম্ভব হয়েছিল সীতা তার আশ্রমে থাকত বলে।

অনেক দিনের অনেক কথা, ঘটনা এবং স্মৃতি তার মনকে তোলপাড় করল। বিস্মৃত সেই অতীতের মধ্যে ইচ্ছে করে ডুবে যেতে বাল্মীকির ভীষণ ভাল লাগছিল। হারিয়ে যাওয়া সীতাকেই খুঁজছিল সে।

লঙ্কা যুদ্ধের অনেক আগের কথা।

রাক্ষসরাজ রাবণের ভগিনী শূর্পনখা লক্ষ্মণকে প্রেম নিবেদন করতে গেলে সহসা এক দুর্ঘটনা ঘটল। লক্ষ্মণের হস্তধৃত ফলায় শূর্পনখার নাকের অগ্রভাগ বেশ কিছুটা কেটে গেল। তাতেই ব্যাপারটা

ঘোরাল হয়ে উঠল। রাবণ ভগিনীর অপমানের প্রতিশোধ নিতে সীতার মর্যাদাহানি করতে পারে এরকম একটা আশঙ্কা রামচন্দ্রের মনে প্রবল হল। তাই আগেভাগে সীতাকে অগ্নিমুনির আশ্রমে রেখে এল রামচন্দ্র। সেই দিনের ছবিটা বাল্মীকির চোখের তারায় ফুটে উঠল।

রামচন্দ্র জানকীর কাছে বিদায় নিতে এসে বলল: প্রিয়তম প্রেয়সী এবার আমাকে যেতে হবে। তুমি মুখ ভার করে থাকলে আমি শান্তি পাব না। কর্তব্য বড় কঠিন, তাকে ভালবাসা আরো কঠিন। তোমাকে এবং আমাকে সে কঠিন পরীক্ষা বার বার দিতে হয়। এবার তার এক নতুন পরীক্ষা। এতদিন একসাথে ছিলাম। উদ্ভূত পরিস্থিতি আমাদের বিচ্ছিন্ন করল। কিন্তু আমার তোমার প্রেমকে এ জীবনে কেউ আলাদা করতে পারবে না। তুমি নিশ্চিন্ত থাক, আমি শীঘ্রই ফিরে আসব। লক্ষ্মী আমার। অবুঝ হয়ো না। তুমি তো সব জান। আমাদের সাথে থাকা তোমার নিরাপদ নয়। যে কোন মুহূর্তে অতর্কিতে বিপদ আসবে তোমার উপর। তুমিও বিপদে পড়বে, আমরাও বিপন্ন হব। অথচ, তুমি না থাকলে আমাদের কোন বিপদ নেই।

সীতার দুই চোখে নীরব ব্যথার বেদনাময় আর্তি। নির্বাক ভাষাহীন চাহনিতে চেয়ে রইল রামচন্দ্রের দিকে। কিছু যেন ভাবছিল সীতা। তারপর বুকের ওপর মাথা রেখে কান্নায় ভেঙে পড়ল। রামচন্দ্র তাকে আদর করে খুশিতে ভরিয়ে তুলল। প্রবোধ দিয়ে বলল: বোকা! কেউ কাঁদে? তুমি না বীরের পত্নী। তোমার কাঁদতে আছে?

অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে সীতা ভেজা গলায় বলল: না, কাঁদব না। খুব হাসব। তুমি যে আমার সব ওগো। আমার স্বপ্ন, আমার সুখ, আমার গর্ব। তুমি ছাড়া আমার কেউ নেই, কিছু নেই। তোমায় ছেড়ে এখানে আমি কি নিয়ে থাকব? আমার কি আছে? তুমি তো কিছু দাওনি আমাকে? শুধু দুঃখ দিয়েছ। সেই দুঃখ তোমার সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছি। গলায় হার করে পরেছি। তুমি চলে গেলে থাকবে শুধু অন্ধকার। সেখানে আমি একা। ভীষণ একা। একেবারেই নিঃস্ব রিক্ত। মেয়েমানুষের জীবনে সে যে কত বড় অভিশাপ পুরুষমানুষ হয়ে কল্পনাও করতে পারবে না।

রামচন্দ্রের অধরে অনাবিল হাসির স্নিগ্ধ মাধুরিমা। বলল: চোখের সামনে সবুজ বন, জাহ্নবীর অজস্র বকুনি, বাতাসের ঝির ঝির শব্দ, ঝরনার সুর, পাখির কাকলি। তোমার মনকে নীরবে সুরে ভরিয়ে দেবে। তখন আমার কথা ভুলে যাবে। তপোবনের জীবনে বড় শান্তিময়।

রামচন্দ্র চলে যাওয়ার বেশ কিছুক্ষণ পর বৃষ্টি নামল। বন পাহাড় গাছপালা একটা ধোঁয়াটে সাদা পর্দার আড়ালে ঢাকা পড়ে গেল। কুটিরের খোলা জানলার উপর চোখ রেখে সীতা বৃষ্টি দেখতে লাগল। তার মনে লাগল বাদলের ছোঁয়া। বাইরের বর্ষণমুখর পৃথিবীর সঙ্গে তার মনের একটা বেশ মিল ছিল। তাই বোধ হয়, বর্ষার জলে তার শূন্য বুক হাহাকার করে উঠল। বুক ঠেলে উঠে এল নীরব কান্না।

তার ভাষাহীন নীরব কান্নায় শিউরে উঠল বাল্মীকির কোমল প্রাণ। বাল্মীকি চুপ করে পিছনে দাঁড়িয়ে দেখছিল তাকে। তারপর, আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে তার পাশে বসল। মাথায় হাত দিল। বড় স্নেহ কোমল সে হাতের স্পর্শ। সীতার ভেতরটা জুড়িয়ে গেল যেন। তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছে বাল্মীকির দিকে তাকাল। তার নীরব দুইচোখে একটা ব্যাকুল বেদনাময় আর্তি ফুটে উঠল— অসহায় সেই চিরন্তনী নারীর।

সীতার বিধুর চাহনি দেখে বাল্মীকি তার অব্যক্ত প্রাণের ভাষা বুঝল। অজানতে তার মুখে নিজের একটা সমব্যথীর ভাব ফুটল। ইচ্ছে করল তার বিমর্ষতাকে একটু আদর করে খুশিতে ভরিয়ে দেয়। বলল: যখন মানুষ একেবারে একা থাকে তখনই সে তার প্রকৃত মনটাকে খুঁজে পায়। সেই মনের চিন্তা দিয়ে বোঝা যায়; কে সংসারী কে প্রেমিক আর কে ধার্মিক। নির্জনের অবকাশে একাকী ব্যক্তিত্বটাই তার আসল ব্যক্তিত্ব। সেই ব্যক্তিত্বটাই তার পরিচয়।

সীতা বাল্মীকির এত কথার উত্তরে একটি কথাও বলল না। ফ্যাল ফ্যাল করে তার মুখের দিকে বেশ কিছুক্ষণ চেয়ে রইল। একটা অব্যক্ত গভীর দীর্ঘশ্বাস পড়ল খুব ধীরে। তারপর উদাস অন্যমনস্কতার গভীরে ডুবে গিয়ে ক্লান্ত স্বরে বিষণ্ণ গলায় বলল: মানুষের জীবনে সব কিছুই নদীর মত। উৎসতে নদী এক রকম, উপত্যকায় পৌঁছে এক রকম, মোহনায় পৌঁছলে তাকে আর চেনা যায় না। বিশালতার মধ্যে হারিয়ে যায়। ঝরনা তখন নিজের জলধারা চিনতে পারে না।

বাল্মীকির ভুরু কুঁচকে গেল। বিভ্রান্ত বিস্ময়ে বলল : কেন বলছ এ কথা?

আমার ভীষণ ভয় করছে।

কেন? ভয় করে কেন? কিসের ভয়?

সীতা সহসা গম্ভীর হল। দ্বিধায় চোখের পাতা কাঁপল। মুখ নিচু করল। তারপর ধীরে ধীরে মুখ তুলল। ভুরু কুঁচকে বলল: জানি না। তবে ভয় করে। হয় তো নিজের কথা ভেবে। তারপর একটু ম্লান হেসে বলল: মেয়েমানুষ তো। বড় স্বার্থপর। শুধু নিজেকে নিয়ে ভাবে। নিজের বাইরে পৃথিবীটা তার কাছে খুব ছোট।

তার কথা শুনে বাল্মীকি হাসল। হাসি হাসি মুখ করে বলল: একটু পরিষ্কার করেই বল। আমার কাছে তোমার লজ্জার কিছু নেই। আমার শূন্য বুকে এক মরুদ্যান তৈরি করেছ তুমি।

সীতা গভীর দৃষ্টিতে তাকাল বাল্মীকির চোখে। তারপর, অন্য দিকে চোখ ফেরাল। আস্তে আস্তে ডাকল: পিতাজী!

'পিতাজী' ডাকটা বাল্মীকির বুকের ভেতর কি সব জমে থাকা জিনিসকে হঠাৎ করে গলিয়ে দিল। সেই গভীর হারানো অনাস্বাদিত বোধটা তার বুকে যে বিশ্বাসঘাতকের মত লুকিয়ে ছিল কখনও জানা হয়নি। 'পিতাজী' বলে ডাকার যে কেউ আছে পৃথিবীতে এখনও একথাটা ভুলেই গিয়েছিল। হঠাৎ করে সীতার ডাকে বুকের গভীরে চোরাবালির মতন লুকোনো অপত্য স্নেহ হঠাৎ উৎসারিত হয়ে প্রবল বেগে সীতার দিকে ছুটে গেল। আর কি মধুর আবেশে, গভীর তৃপ্তিতে তার দুই চোখ বুজে এল। মুগ্ধ চমকে চমকানো বিস্ময়ে ডাকল : মা!

সীতাও এক দারুণ মুগ্ধ চমকে চেয়েছিল বাল্মীকির দিকে। নিরুচ্চারে বলল : নিজের লোকও এমন করে গভীর অভ্যন্তরের কথা শুনতে চায় না। যেখান থেকে পাওয়ার ছিল, সেখান থেকে শূন্যতা নিয়ে ফিরতে হল। আর যেখানে প্রত্যাশার কিছুমাত্র ছিল না, সেইখানেই আমি ভরে উঠলাম। আমার সব শূন্যতা তুমি পূর্ণ করে দিলে। আমি পিতা হলাম, কন্যা পেলাম। তোমার কাছে আমার আর লজ্জা নেই। পিতার কাছে কন্যার সংকোচ থাকে না। জান পিতাজী, স্বামী আমার সামান্য পুরুষ নয় বলেই ভয় করে। বেশ বুঝতে পারি আমার মত একটি নারীতে কোনদিন তাকে ধরে না। ধরবেও না কোনদিন। পৃথিবীর কোন পুরুষ মানুষের সব চাওয়াকে বোধহয় এক জীবনে এক নারী পূর্ণ করতে পারে না। আমিও বোধহয় পারিনি। কিন্তু চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। স্বামীর বিশাল আকাঙ্ক্ষার জগতে পৌঁছনোর জন্যে কি না করেছি। রাজবালা, রাজবধূ থেকে ভিক্ষুকিনী হয়েছি। শুধু কি তাই? তাকে পূর্ণ করতে, ভরপুর করে দিতে, সুধন্য করতে আমি তার জীবনস্রোতে ভেসেছি। ভাসিয়ে দিয়েছি নিজের সুখ, স্বপ্ন, সাধ, বাসনা, আহ্লাদ, আকাঙ্ক্ষা সব। যদি খুশি হয়। তবু মনের নাগাল পেলাম কৈ? এখন আমাকে ছাড়াই ও ভেসে যাবে নিজের গন্তব্যের দিকে, নিজের প্রকৃত সুখের দিকে। আমাকে দিয়ে সেটুকু বোধ হয় পূর্ণ হচ্ছিল না, তাই আলাদা থাকা তার।

সীতার কথাগুলো বাল্মীকির বুকে বিঁধল। সীতার জন্য তার কষ্ট হল। বুক কাঁপিয়ে দীর্ঘশ্বাস পড়ল। এক দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে স্নেহভরে বলল : কল্যাণী, ভবিষ্যতের কথা ভবিষ্যৎ জানে। আমি চাই তুমি সুখী হও। সত্যিকারের সুখী। রামচন্দ্রের সঙ্গ ছাড়াই দিব্যি সুখে, আনন্দে এখানে তোমার সময় কেটে যাবে। কোথা থেকে কখন দিনটা ফুরিয়ে গেল টেরও পাবে না। শ্রীরামচন্দ্র ঠিকই বলেছে, তপোবনের পরিবেশ বড় শান্তিময়। এখানকার নির্জনতায় তুমি উপলব্ধি করবে প্রত্যেক মানুষই স্বয়ংসম্পূর্ণ। দুঃখ যা পাবার তা আমরা নিজেরাই নিজেদের দিই, আর অন্যকে দায়ী করি মিছিমিছি।

নিজের চিন্তায় বাল্মীকি ভীষণ অন্যমনস্ক ছিল। তাই পূজার সময় বিস্মৃত হয়েছিল। সুতিকাগৃহ থেকে সীতা বাল্মীকিকে লক্ষ্য করছিল। পূজার শুভক্ষণ উত্তীর্ণ হয়ে যেতে দেখে একজন আশ্রমিকাকে পাঠিয়ে দিল বাল্মীকির কাছে। আশ্রমিকা রুদ্ধ কণ্ঠে অতি কষ্টে উচ্চারণ করল: গুরুদেব পূজার সময় হয়েছে।

বাল্মীকি একটা ঘোর লাগা আচ্ছন্নতাভাব থেকে জেগে উঠল। হঠাৎ মুখ তুলে আশ্রমিকার দিকে

তাকাল। বিভ্রান্তের মত বলল : তুমি! তোমাকে পাঠাল কে?

আশ্রমিকা বোকা নয়। বাল্মীকির প্রশ্নের মধ্যে যে গভীরতর ইঙ্গিত ছিল তা বুঝল। তাই কথা বলল না। আঙুল দিয়ে সীতাকে দেখাল।

বাল্মীকি মুখ ফেরাল। সীতার শান্ত মুখ দেখতে পেল। মুখে হাসি। সে হাসিতে কি অপরূপ দেখাল তাকে। বিহ্বল বাল্মীকি সেইদিকে চেয়ে রইল।

পূজায় মন বসল না বাল্মীকির। বার বার রামচন্দ্রের শ্রীময় মুখখানা মনে পড়ল। কিন্তু সেই মুখের শ্রী আর নেই। সেই মুখ কুটিল লোভী, নিষ্ঠুর এক দানবের মুখের মত দেখতে হয়েছে। রামচন্দ্র এখন আর মানুষ নেই। সে সীতার পবিত্র প্রেমকে সমাদর করেনি। তার পাতিব্রত্যকে অপমান করেছে। তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। তাকে বনে নির্বাসন দিয়েছে। তার মধ্যে যদি এতটুকু প্রেম থাকত তাহলে সীতাকে পৃথিবীর অন্য কোথাও সুখে থাকার পৃথক ব্যবস্থা করে দিত। অথবা কোন মুনি ঋষির তত্ত্বাবধানে রাখত। নিয়মিত খোঁজখবর করত। কিন্তু রামচন্দ্র সে সব কিছুই করেনি। শত্রুঘ্ন তার আশ্রমে এল তবু সীতার কোন প্রসঙ্গ তুলল না। সীতা তার আশ্রমে আছে কি নেই, সে প্রশ্নও করল না। এইসব ঘটনা প্রমাণ করে, পৃথিবী থেকে মুছে দেওয়ার উদ্দেশ্য নিয়ে রামচন্দ্র সীতাকে বনে পাঠিয়েছিল। নিষ্কণ্টক রাজ্য ভোগের পথে সীতা ছিল বড় বাধা। সেই পথের কাঁটাকে সরিয়ে ফেলতে শ্বাপদসংকুল অরণ্যে একা ছেড়ে দিল তাকে। দৈব সহায় বলে সীতার মৃত্যু হল না। বাল্মীকি আর ভাবতে পারে না। তার মাথাটা ঝিম ঝিম করতে লাগল। বিশ্বাসভঙ্গের যন্ত্রণায় দুই চোখ অশ্রুসজল হল। মনে মনে বলল: রামচন্দ্র তুমি বড় নিষ্ঠুর। রত্নাকরের চেয়েও পাষণ্ড। রত্নাকরের হৃদয় ছিল। সংসারের জন্য তার প্রেম ছিল, মমতা ছিল। কিন্তু নিজের প্রতি ছিল ঘৃণা। তুমি তার বিপরীত। তুমি শুধু নিজেকে ভালবাস। তোমার আত্মপ্রেমের জন্য গোটা পৃথিবীকে মূল্য দিতে হচ্ছে। কিন্তু রত্নাকরের জন্য কাউকে কোন মূল্য দিতে হয়নি। দস্যু থেকে নিজেই সাধু হয়েছে সে। আর তুমি? সাধু থেকে শয়তান হয়েছে। ঈশ্বর তোমায় ক্ষমা করবে না। লোকে যে চোখেই দেখুক তোমার কলঙ্ক যাবে না কোনদিনই! তুমি নরোত্তম হতে পারবে না।

এমন সময় মন্দিরের বাইরের আঙিনায় দাঁড়িয়ে সীতা ডাকল: পিতাজী! ডাক শুনেই চকিতে ফিরে তাকাল তার দিকে। বাল্মীকির চোখ মুখে উদ্বিগ্ন ব্যাকুলতা। ত্রস্তে উঠে এল তার কাছে! গভীর এক দৃষ্টিতে তার দিকে কয়েকটা মুহূর্ত চেয়ে স্নেহ ভরে জিজ্ঞেস করল: মা-মণি, কিছু বলার আছে বুঝি?

সীতার দু'চোখে কৌতুক ঝিলিক দিল। কিন্তু হঠাৎ-ই অভিমানে তার গলাটা একটু ভারী শোনাল। বলল : কেমন আছি জানতে চাইলে না তো?

বাল্মীকি মুহূর্তে তার অপ্রস্তুত ভাবটা কাটিয়ে উঠে বলল : বড্ড ভুল হয়ে গেছে মা। কিন্তু মুখের কথাই কি সব? মনের উৎকণ্ঠা চোখে দেখা যায় না। কিন্তু একটু চেষ্টা করলে অনুভব করা কিছু কঠিন নয়।

পিতাজী তুমি একটুও কৌতুক বোঝ না। তোমার সঙ্গে মজার কথা বলতে গেলে এমন ভাবাবেগসম্পন্ন হয়ে পড় যে কৌতুক করার মজাটাই নষ্ট হয়ে যায়।

ঠিক বলেছিস মা। তোর ব্যাপারে আমি বড় আত্মসচেতন। আমার সব কিছু দিয়ে যে তোকে আগলে বেড়াই। পাছে ত্রুটি হয় তাই সচেতন থাকি।

আমার কথা তুমি খুব ভাব তাই না?

বোকা মেয়ে!

পিতাজী আমি তোমার কে?

তুমি আমার সাত সাগরের মানিক। আমার মেয়ে। আমি হয়ত জন্মদাতা নই, কিন্তু আমার অন্তরে তোমাকে আমি সৃষ্টি করি। তুমি আমার মানস কন্যা মা।

সীতা সহসা ভীষণ গম্ভীর হল। বাল্মীকির চোখের উপর তীক্ষ্ণ জ্বল জ্বল চোখ পেতে রাখল অনেকক্ষণ। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল : পিতাজী তোমার কি হয়েছে বল তো? কাল থেকে

তোমাকে ভীষণ বিচলিত দেখছি। বেশ বুঝতে পারছি, তোমার মনের অভ্যন্তরে কিছু একটা হয়েছে। তুমি সর্বক্ষণ ভাব।

দূর পাগল। ভাবনার কি আছে? আমার দুটো দাদাভাই হয়েছে। তাদের কথা ভাবলে বুক আমার আনন্দে ভরে থাকে। এত খুশি বুকে আঁটছে না, উপছে পড়ছে।

পিতাজী তুমি আমাকে গোপন করতে চাইছ।

সব কথা শুনতে নেই। তাতে অশান্তি বাড়ে। মনের সুখ নষ্ট হয়।

কি সুখে রেখেছে আমাকে সে? তুমি বল? গতকাল আমাদের আশ্রমে কে এসেছিল?

নিরুচ্চারে বাল্মীকি বলল: শত্রুঘ্ন।

কেন? ভুরু কুঁচকে প্রশ্ন করল সীতা।

যুদ্ধে যাচ্ছিল। পথে রাত না কাটিয়ে আশ্রমে কাটাল।

সীতাকে কয়েকমুহূর্ত অন্যমনস্ক লাগল। বলল: আমার কথা কিছু জিগ্যেস করল?

না।

কিচ্ছু না!

বললাম তো না। বাল্মীকির কণ্ঠে চাপা উত্তেজনার ভাব। উষ্মা ও বেদনা একসঙ্গে ঘনিয়ে উঠল তার বুকের ভেতর। বলল : কি হবে শুনে? যে কথা শুনলে দুঃখ হয়, দুঃখ বাড়ে, সেকথা শুনতে নেই। তারপর একটু ভেবে বলল : দুঃখের কপাল যখন—তবে শোন। শত্রুঘ্ন নির্লিপ্ত। সে তোর কোন কথাই জিগ্যেস করেনি। তোর বেঁচে থাকার খবরটাই বোধহয় রাখে না। রামচন্দ্র এবং অযোধ্যার মানুষের কাছে তুই মৃত। অতীতের স্মৃতি শুধু।

প্রত্যাশায় ব্যথা লাগা চমকানো বিস্ময়ে, হতাশায় এবং দুঃখে তার বুকটা ভীষণ ভারী ঠেকল। এক প্রগাঢ় যন্ত্রণার গভীর থেকে উঠে আসা চাপা দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে বেরিয়ে এল: ওঃ।

আট

বাল্মীকির মুখ নিঃসৃত কথাগুলো সর্বক্ষণ তার কানের ভেতর ঝংকারে বাজতে লাগল। "সীতা, রামচন্দ্রের জীবনে তোমার আর কোন দাম নেই। তার কাছে তুমি মৃত। অযোধ্যার লোক জানে শ্বাপদে তোমাকে ভক্ষণ করেছে। তুমি বেঁচে নেই।" নিজেকে তার বড় অসহায় এবং একলা লাগল। নিজেকেই শুধাল: এ জীবনের কি মূল্য আছে তার? বেঁচে থাকাই তার এখন বিড়ম্বনা। বাকি জীবনটা কাটাতে হবে মিথ্যে কলঙ্কের বোঝা বয়ে, নারীর অপমান লজ্জা আব অন্তরের দৈন্য-গ্লানি নিয়ে। এই নিয়ে চিরকাল বেঁচে থাকা যায়? সে বেঁচে থাকার কোন মানে হয়? কি হবে বেঁচে? কার জন্য বাঁচা?

আচম্বিতে চমকে উঠল তার বুকের ভেতরটা। এখন লবকুশের জননী সে। তাদের জন্যে বাঁচতে হবে তাকে। এই দুই নিষ্পাপ শিশুর তো কোন দোষ নেই। ওদের সুকুমার জীবনকে অভিশপ্ত করে তোলার অধিকার তার নেই। ওরা তার বড় আদরের, বড় আনন্দের। ওদের রেখে তার মরেও সুখ নেই। এই কথা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করল কেন মরবে? কার জন্যে মরবে? এভাবে মৃত্যু মানে তো হেরে যাওয়া। জীবন যুদ্ধে কোন অবস্থায় তো হেরে যায়নি? তাহলে এমন উদ্ভট কথা মনে আসে কেন? নিজের কাছে ইচ্ছে করে কেউ হেরে যায়?

তবু একটা কিছু ভিতরে স্পন্দন তোলে। পিতার পরিচয়েই সব মানুষের পরিচয়। কিন্তু লবকুশ পিতার কাছে উপেক্ষা, অবহেলা আর নিষ্ঠুরতা পেয়েছে। জন্য তাদের বাপের বুকে এতটুকু প্রেম, মমতা, স্নেহ আবেগ নেই। শুধু সম্পর্ক আছে। কিন্তু সে সম্পর্কটাকে বড় অশুচি মনে হয় সীতার। তার কাছেও এটা খুব অসম্মানজনক। সে কথা মনে হলে ভীষণ অপমান লাগে। বড় ঘেন্না হয়। ছেলেদের সঙ্গে রামচন্দ্রের সম্পর্ককে তাই জড়াবে না। কেন জড়াবে? সন্তানের সব সম্পর্ক তো তার মায়ের সঙ্গে। এক প্রাণ থেকে আর এক প্রাণের প্রদীপ জ্বালিয়ে তোলে জননী। জননীর প্রাণের অম্লান শিখা থেকে যায় সন্তানের বুকে। শুধু কি তাই? তার প্রাণ, শরীর, শিরা-উপশিরা, স্নায়ু

পেশী সব কিছু মায়ের গর্ভে একটু একটু করে চোখের অলক্ষ্যে জটিল সৃষ্টিলীলার নিয়মে তৈরি হয়। মায়ের নিশ্বাস থেকে নিশ্বাস নেয়। বুকের অনন্ত স্নেহ ভান্ডারে সঞ্চিত অমৃতধারা পান করে দেহকে পুষ্ট করে। মুখের হাসি আর কথা থেকে হাসতে ও কথা বলতে শেখে। জননীর সব কিছু নিয়ে মানব শিশুর বিকাশ। পিতার সঙ্গে শিশুর সম্পর্ক কতটুকু? সে শুধু সৃষ্টির একটা কারণ বলেই তার সঙ্গে সম্পর্ক দেখানোর যৌক্তিকতা আছে মনে করল না সীতা। লব কুশকে সে পিতার পরিচয় ছাড়া মানুষ করবে। এ'হল তার সমস্ত পুরুষ শাসিত সমাজের বিরুদ্ধে দুরন্ত প্রতিবাদ। সভ্য সমাজে নারীর যে পুরুষের মতো একটা নিজস্ব পরিচয় আছে, এবং সে পরিচয়টা কোন অংশে ছোট কিংবা হেয় নয়। বরং তার আত্মদানের গৌরব, ত্যাগের বৈভব অনেক মহান এবং সুন্দর। এই কথাটা জীবন দিয়ে সমগ্র নারীর হয়ে জগতকে বোঝাবে। পিতৃ-পরিচয় ছাড়াই মায়ের পরিচয় নিয়ে একজন মানবশিশুর যে সগর্বে বেঁচে থাকার অধিকার আছে এই কথাটাই প্রমাণ করে যাবে। রামচন্দ্রের অনুকম্পায় তার দরকার নেই। তার কৃপাও চায় না। এই অনুভূতিতে হঠাৎ শিহরিত হল সীতা। তীব্র হয়ে উঠল তার চোখের দৃষ্টি। টানা দুই চোখে তার আর লজ্জা নেই। বরং প্রচন্ড একটা তেজ ধক ধক করছিল। প্রাণ প্রতিষ্ঠিত প্রতিমার মত তাকে দুর্জয় এবং দুরন্ত সুন্দর দেখাল।

সীতা উঠল। লব কুশ কোথায় কি করছে তার খোঁজে বেরোল। কিন্তু বেশিদূর যেতে হল না।

লব-কুশের সঙ্গে মজা করতে করতে একটা লোক তার দিকেই আসছিল। সীতার বেশ একটু অবাক লাগল। লোকটাকে তার চেনা লাগল। বুকের ভেতরটা একটা অনুভূতি ঢেউ দিয়ে গেল। শম্বুকের কথা মনে পড়ল। অনেক দিন পরে হলেও দেখেই চিনল তাকে। আগের মতই তার মধ্যে এমন একটা মাধুর্য ও খুশির ভাব আছে যে সেটা অজান্তে সীতার ভিতরকার আড়ষ্টতাকে কাটিয়ে দিচ্ছিল। স্বাভাবিক গলায় প্রশ্ন করল : তুমি তো শম্বুক? কোথা থেকে এলে? লব কুশের সঙ্গে তোমার পরিচয় হল কেমন করে? তুমি ওদের চেন?

শম্বুকের দুই চোখে খুশির ভাব উপচে যাচ্ছিল। আর চমৎকার হাসিটা ঠোঁটের কোণে লেগেই রইল। বলল : ওদেরই জিগ্যেস কর, আমি কি বলব? লব কুশকে তোমার মত আমিও আগলে বেড়াই। বনের জীবন নিরাপদ নয়, বড় কষ্টের আর দুঃখের। বিপদ ওৎ পেতে আছে। একটু অসাবধান হয়েছে তো গিয়েছ। এসব তো তোমার অজানা নয়। কিন্তু পাহারা ঠিক আছে। এখানে তুমি সম্পূর্ণ নিরাপদ। কথাটা শুনে সীতার ভেতরটা গলে গেল। বুকের মধ্যে এক অচেনা আনন্দ চিন চিন করে উঠল। হঠাৎ দারুণ আবেগে দু-চোখ ভরে জল এল।

শম্বুক হাসি হাসি মুখ করে বলল : এত অল্পে চোখে জল এলে হয়? জীবনভোর অনেক ত্যাগ করেছ, দুঃখ কষ্ট সয়েছে— এত সহ্য করতে পেরেছ আর সামান্য একটু খুশির কথাতেই বুকের সমুদ্রের বাঁধ কেটে গেল।

চমকানো বিস্ময়ে সীতা ডাকল—শম্বুক!

মা। বনবাসী আমরা। বিপদ নিয়ে ঘর করি। প্রতিটি ইন্দ্রিয় সজাগ রাখতে হয়। ঘ্রাণশক্তি, শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তিকে শানিয়ে তুলতে হয়। ছোট থেকেই এসব আয়ত্ত করতে হয়। লব কুশকে খেলতে খেলতে আমি সেই বিদ্যে শেখাই। ওরা মজা পায় আর শেখে। এই বয়সেই উড়ন্ত পাখিকে এক তীর মেরে এফোঁড়-ওফোঁড় করে দেয়। শব্দ শুনে ঠিক লক্ষ্যভেদ করে। মাটিতে কান পেতে বলে দিতে পারে সেটা কার পদধ্বনি। বনে প্রতিনিয়ত পরিবেশের সঙ্গে লড়ে বাঁচতে হয়। অনেক অনিশ্চিত অবস্থার ভেতর কাটাতে হয়। ওরা এখানকার মত তৈরি হচ্ছে।

দু'চোখে বিস্ময়ের দীপ জ্বালিয়ে সীতা চেয়ে থাকল শম্বুকের দিকে। অপলক মুগ্ধ দুই চোখে বেশ কিছুক্ষণ চেয়ে থাকার পর বলল : আমি বড়ই হতভাগিনী। জীবনে কোন কিছুকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি না। যা ঘটবার ঘটে যাচ্ছে, আমার যেন কিছু করার নেই।

শম্বুক বলল : ওরকম করে বল না মা। মানুষ সব সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারে না। যে উদ্দেশ্যের জন্য যে মানুষ জন্মেছে তাকে দিয়ে ঈশ্বর সেই কাজ ঠিক করে নেয়।

সীতা খুব অন্যমনস্ক। গভীর বিষণ্ণ। তবু একটু হাসতে চেষ্টা করল। বলল: ঠিক। আমিও জানি। তবু বিস্ময় লাগে। তারপর একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বলল : লব-কুশ তোমরা কুটিরে যাও। আমি শম্বুক দাদার সঙ্গে একটু গল্প করি। লব কুশ সমস্বরে বলল : আমরা গল্প শুনব।

সীতা মাথা নাড়ল। বলল: মুনি দাদু তোমাদের জন্য বসে আছেন।

লব কুশ অনিচ্ছায় মুখ বেজার করে চলে গেল।

সীতা আড়ষ্টতা কাটিয়ে উঠতে কয়েকটা মুহূর্ত সময় নিল। কথা বলার সময় বুকের মধ্যে সামান্য তরঙ্গ রয়ে গেল। বলল: দেখে মনে হল লব কুশের সঙ্গে তোমার সম্পর্ক অনেককালের। অথচ. আমি জানি না। তোমার এই লুকোচুরি কেন? আমার অগোচরে এভাবে তাদের গড়ে তোলা তোমার উচিত কাজ কি?

শম্বুক কিছুক্ষণ সীতার দিকে চেয়ে রইল। এক মায়াবী আলো যেন ঘিরে আছে তার দৃষ্টি। সীতা বিভ্রম বোধ করল। কিন্তু শম্বুক বিচলিত হল না। বিনীত কণ্ঠে বলল : তোমাকে আমার সব কথা বোঝাতে পারব না। ধরা পড়ার ভয়ে পালিয়ে বেড়াই। আমাকে স্বদেশ, জন্মভূমি যে চেনাল সে নিজেই নির্দয় অত্যাচারীর হাতে বন্দী, অসহায়। অথচ তার এই পরিণতি, দুর্ভোগ এবং দুর্ভাগ্যের মূল যে আমি; এই কথাটা কাঁটার মত বিঁধে থাকে বুকে। শম্বুককে প্রীতি দেখাতে গিয়ে তুমি কষ্টই পেলে। আর আমি নীরব দর্শক হয়ে তা সহ্য করছি। এই লজ্জায় তোমার কাছ থেকে পালিয়ে বেড়াই। সাক্ষাৎ হলে পাছে নতুন দুঃখ কষ্ট পাও এই ভয়ে এড়িয়ে চলি। সেদিন তুমি আমাকে যত কাছে টেনেছিলে তত কাছে টানা তোমার উচিত হয়নি। একটু তফাত রাখলে বোধ হয় এই নির্দয় রাষ্ট্রিক শাস্তি তোমায় পেতে হত না।

সীতার বুকের ভেতরটা কেমন করে উঠল। তার সব কথা ভাল করে বুঝতে পারল না। ফ্যাল ফ্যাল করে তার দিকে নিষ্পলক চোখে চেয়ে রইল। দীর্ঘশ্বাস পড়ল। ধীরে ধীরে প্রশ্ন করল : শাস্তি বলছ কেন?

শাস্তি নয় তো কি? আমার অপরাধের দন্ড তুমি ভোগ করছ। অথচ তুমি কিছু তার জান না। দৈবক্রমে আমাদের সঙ্গে যদি দেখা না হত তাহলে কি ঘটত কে জানে? তোমার সরলতা এবং বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে অযোধ্যাপতি পৃথিবী থেকে মুছে ফেলার জন্য তোমাকে বনবাসে পাঠাল। সেখানে কিছু হলে কেউ জানতে পারত না। অযোধ্যাপতিরও লোকপবাদ হত না। তুমি নিখোঁজ হয়ে যেতে। নিখোঁজ হয়ে যাওয়াটা সাদা চোখে কোন অত্যাচার, দমন কিংবা হত্যা নয়। এরকম নিখোঁজ হয়েই থাকে।

শম্বুকের কথা শুনে সীতা শিউরে উঠল। মনে হতে লাগল, বুকটা ভেঙে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে পাষাণভারে। বুকেই যত যন্ত্রণা। এই যন্ত্রণার কোন সান্ত্বনা নেই। বিভ্রান্ত বিস্ময়ে হতভম্ব চোখে শম্বুকের মুখের দিকে কিছুক্ষণ বাক্যহারা হয়ে চেয়ে রইল। একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস পড়ল। স্খলিত গলায় বলল : তোমর কথাগুলো মিথ্যে বলে উড়িয়ে দেব এমন জোর নেই মনে। আবার বিশ্বাস করতেও কষ্ট হচ্ছে। এত হীন চোখে অযোধ্যাপতিকে দেখতে আমার বুক ভেঙে যাচ্ছে। এরকম একটা অদ্ভুত ধারণা তোমার হল কেন?

রাজনীতি বড় জটিল মাগো। এখানে স্বামী-স্ত্রী নেই, ভ্রাতা ভগিনী, বন্ধু পুত্র-কন্যা বলে কেউ নেই। রাজনীতিতে স্নেহ, প্রেম, ভালবাসা, মমতা বলে কিছু নেই। সমাজবদ্ধ সভ্য মানুষের নিজের তৈরি এক জঙ্গল। জঙ্গলের জীবকুলের মত এখানেও মানুষকে লড়তে হয় তার নিজের সঙ্গে, পরিবেশের সঙ্গে, লোভ-স্বার্থ এবং উচ্চাকাঙ্খার সঙ্গে। এই ভয়ংকর জঙ্গলের ভেতর প্রবেশ কর না জননী। যত জানবে তত ঘৃণা হবে মানুষের উপর নিজের ওপর। তুমি নিজেই রাজনৈতিক পীড়নের শিকার। আমাকে ঠেকাতে আমার ওপর প্রতিশোধ নিতে রাজধানী অযোধ্যা তোমাকে অস্ত্র করেছে। আমাকে কব্জা করতে তোমাকে বনের পশুদের মুখে ছেড়ে দিয়েছে। কারণ কোথায় আমার দুর্বলতা ভালই জানে। সেখানে মোক্ষম আঘাত হানতে তোমাকে দরকার। আমার জন্য তুমি শাস্তি

পেয়েছ একথা শুনলে ঘেন্নায় দুঃখে অভিমানে কদর্য রাজনীতি থেকে আমি সরে দাঁড়াতাম। নিজের মাতৃভূমি ত্যাগ করে চলে যেতাম অন্য কোথাও।

সীতা বড় বড় চোখ দুটো শম্বুকের চোখে রাখল। তারপর স্ফুরিত অধরে বলল: এত অল্পে তুমি হেরে যাও? নেতার কোন আবেগ থাকতে নেই। নিরাবেগ চিত্তে রাজনীতিকে গ্রহণ করতে না পারলে দেশ ও জাতিকে অনেক মূল্য দিতে হয়। মুক্তি সংগ্রামে তুমি একা নও। বহু মানুষের মিলিত আবেগ স্বদেশ প্রেম, আত্মত্যাগ দিয়ে তৈরি এক মহান আদর্শ। ব্যক্তিগত দুঃখ কষ্টে আত্মহারা হয়ে গিয়ে তার অকালমৃত্যু ঘটানোর কোন অধিকার তোমার নেই। আবেগের বশে হঠকারিতা করলে আমি শান্তি পেতাম না। মরে গিয়েও তোমাকে অভিশাপ দিতাম। কেন দিতাম জান, স্বাধীনতা মুক্তির আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টির ব্যাকুলতা, আত্মিক জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। এই শর্ত পালন না করে ব্যর্থ করে দেওয়াও অপরাধ। একজন দেশনেতার সে অপরাধ ক্ষমার যোগ্য নয়।

এক অজানা স্পন্দনে শম্বুকের বুকের ভেতরটা আন্দোলিত হতে লাগল। এমন একটা শিহরণ অনুভব করল যা দৈনন্দিন নয়, স্বাভাবিকও নয়, অনাস্বাদিত। অভিভূত আচ্ছন্ন গলায় বলল : এ তিরস্কার আমার প্রাপ্য । তুমি আমার চোখ খুলে দিলে। নিজের হাতে প্রাণের ভিতর দীপ জ্বেলে দিলে। তোমার মধ্যে আমার ধ্যানের জগৎকে দেখি, আমার স্বদেশকে অনুভব করি। আমার ধরিত্রীর বার্তা শুনি। তুমি আমার আলোকবর্তিকা।

সীতা মুগ্ধ দুই চোখে শম্বুকের দিকে তাকিয়ে মৃদু মৃদু হাসছিল। বলল : থাক, আর বলতে হবে না।

আমাকে থামিয়ে দিও না জননী। আমাকে বলতে দাও। একদিন ত্রাসগ্রস্ত জীবনে তুমি প্রাণ বলিদানের দীপ জ্বালিয়েছিলে। তোমার কথা শুনে আত্মদৈন্যের গ্লানি, ভীরু ভয়, কাপুরুষতার ঘোর কেটে গিয়েছিল। হীনম্মন্যতা দূর হয়েছিল। আমরাও মানুষ, মানুষের গৌরব মর্যাদা নিয়ে বেঁচে ওঠার আলো এসে পড়ল আমাদের নির্জীব জীবনে। অমনি বিদেশী শ্বেতাঙ্গ রাষ্ট্রশক্তির জোর জুলুম, অবিচার অত্যাচার, অনাচার অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ প্রতিবাদ, বেপরোয়া সাহস কোথা থেকে ছুটে এসে আমাদের ভাসিয়ে নিয়ে গেল। আমাদের কোন আত্মনিয়ন্ত্রণ ছিল না। তাই ঘৃণা বিদ্বেষের উত্তেজনায় অসহিষ্ণু অসংগঠিত জনতা বিদেশী বিতাড়নের মহোৎসবে শুধু মাতল না, শুভ কামনাকে রক্তে রাঙাল। ঘৃণাই তাদের আবেগ। ঘৃণা এখানে নির্দয় নিষ্ঠুর। পুঞ্জীভূত অবমাননা এবং অপমান তাদের মধ্যে হিংসার বিস্ফোরণ ঘটাল। গভীর এক ভয় আতঙ্ক তাদের সাফল্য এনে দিল। ভাবল জয়ী হল তারা। মুক্তি পেল দাসত্ব থেকে। কিন্তু তাদের বিজয়ের আড়ালে লুকিয়ে ছিল তাদের বড় পরাজয়। রক্তের দাগ মিলিয়ে যাওয়ার আগে শুরু হল আর এক নতুন নাটক। হঠাৎই শম্বুক প্রশ্ন করল তুমি কি ক্লান্তি বোধ করছ জননী? খুব একঘেয়ে লাগছে?

সীতা এক গভীর আচ্ছন্নতার মধ্যে মাথা নেড়ে বলল: না। তুমি বল, ভাল লাগছে।

শম্বুকের ক্লান্ত দীর্ঘশ্বাস পড়ল। বেশ কিছুক্ষণ বিবশ হয়ে চেয়ে রইল অন্যদিকে। একটু মাথা নাড়ল। তারপর বলল: আসলে এটা কোন মুক্তির অভিযান নয়, এ ছিল তাদের বিরূপ অন্তরের প্রতিক্রিয়া। তাই নির্বোধ জনতা উন্মত্ত ক্রোধে হিংসায় অন্ধ হয়ে অত্যাচারী ভূস্বামীর ক্ষতি করার চিন্তা করে মজুত শস্যের গাদায় আগুন লাগিয়ে দিল, গোলা ভরা ফসল লুট করল। কটা মাস কাটতে না কাটতেই বুঝতে পারল ভূস্বামীর ক্ষতি করতে গিয়ে ক্ষতি যা হয়েছে তাদের নিজের। পেটের জ্বালায় সব খাদ্য শস্য খেয়ে ফেলল। চাষের বীজ রইল না। মজুর নেওয়ার লোক নেই, চাষ করার বীজ নেই, ঘরে অন্ন নেই, এক নেই রাজ্যের গোলকধাঁধায় তারা সব হারিয়ে বসল। অভাব দারিদ্র্য ক্ষুধা তাদের অসহিষ্ণু করে তুলল। বেঁচে থাকার তীব্র সংকট বাধ্য করল শ্বেতাঙ্গ ভূস্বামীর কাছে মাথা হেঁট করতে। মানুষের দুরবস্থা ক্ষুধার সুযোগ নিয়ে আমার বিরুদ্ধে তাদের লেলিয়ে দিল। ভুখা মানুষের চোখে শত্রু হয়ে গেলাম। তাদের অভাব, দুর্ভোগ, দারিদ্র্য কষ্টের জন্য দায়ী করল আমাকে। জীবন বিপন্ন হল। বাধ্য হয়েই সকল জীবের ধাত্রী ও আশ্রয় যে জঙ্গল সেখানেই আত্মগোপন করলাম। নিজের মনে প্রশ্ন জাগল : শুধু শুভবুদ্ধির জোরে অত্যাচার অবিচারের

কলঙ্ক মুছে যাবে না। অথচ জাগ্রত বিবেক, গভীর মঙ্গলবোধ এবং শুভবুদ্ধিই আমার সম্বল। কিন্তু কোন পথে গেলে, কি দৃষ্টিভঙ্গি নিলে আমার স্বজাতির অস্তিত্ব রক্ষার সংকটের ওপর অবিচার অত্যাচারের ওপর, চিরকালের মত একটা পূর্ণচ্ছেদ টেনে দিতে পারে তার কথা ভেবে উঠতে পারছি না। নৈরাশ্য হতাশা আমাকে চারদিকে থেকে ঘিরে ধরেছে। এখন মনে হচ্ছে ভয়ের একটা সাম্রাজ্য গড়ে আমি জীবন যুদ্ধে জিততে চাই।

সীতা অবাক হয়ে শুনছিল। ক্রমে বিস্ময়ে স্থির হয়ে গেল দুই চোখ। শম্বুকের চোখমুখও কেমন অন্যধারা হয়ে গেছে। চোখদুটো তার জ্বলজ্বল করছে। মন্ত্রমুগ্ধের মত জিজ্ঞেস করল: কেমন করে জিতবে?

শম্বুক একটু বিব্রত বোধ করল। কিন্তু চট করে সে একটু ভেবে নিয়ে বলল: তোমার নির্বাসনে আর্যাবর্তের রাজনীতির চিত্রটা সম্পূর্ণ বদলে গেল। সাধ্বী স্ত্রীকে নির্বাসন দিয়ে রামচন্দ্র যে ক্ষমাহীন অমানবিক নিষ্ঠুরতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করল তা বিরোধীপক্ষকে বেশ অস্বস্তিতে ফেলল। তারা সন্ত্রস্ত হল। নিজেদের নিরাপত্তার বলয় গড়ে তুলতে এখন রাজনৈতিক তৎপরতা চালাচ্ছে। রাজনৈতিক ফয়দা তুলতে একদিন যারা গোপনে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল, এখন অবস্থা বুঝে তারা হাত গুটিয়ে নিল। কিন্তু আমার তো কোন উপায় নেই। এখন আমি একা। আমাকে সাহায্য করার কেউ নেই। আমার হয়ে কথা বলার মানুষ নেই। কোথাও ন্যায্য বিচার চেয়েও পাব না। আবার মুখোমুখি যুদ্ধ করে ঔপনিবেশিক শক্তিকে হটিয়ে দেব সে লোকবল, বাহুবল আমার কোথায়? অথচ একটা প্রত্যাশা নিয়ে এই জঙ্গলে আশ্রয় নিয়েছিলাম। এখন তা ব্যর্থ হতে বসেছে। নিজের কাছে এই পরাজয় আমি কিছুতে মেনে নেব না। আমি তোমার বীর পুত্র। চুপ করে সয়ে থেকে মুছে যেতে রাজি নই। দেয়ালে আমার পিঠ ঠেকে গেছে। যুদ্ধের নিয়ম হল শত্রু যত কঠিন পরিস্থিতিতে পড়ে ততই মরিয়া হয়ে মরণ কামড় দেবার চেষ্টা করে। আমাকেও শত্রুর মনের অভ্যন্তরে মৃত্যুর আতঙ্ক সৃষ্টি করে তাদের দুর্বল করে দিতে হবে। ভয়ের আঘাতে সব প্রতিরোধ ভেঙে ফেলা সহজ। সন্ত্রাস সৃষ্টি করে বৃহত্তর রাষ্ট্রকেও বিব্রত রাখা সহজ। জানি সন্ত্রাস কিছু দিতে পারে না। তবু দুর্বলকে জেতার জন্য সন্ত্রাসের পক্ষ বেছে নিতে হয়। আতঙ্ক সৃষ্টি করে একটা দেশকে খুব সহজে দুর্বল করে দিতে পারি। ভয় যত মানুষের মনে ডানা মেলে দেবে, অস্তিত্বের যত গভীরে তার শিকড় চাড়িয়ে দেবে, ততই শাসনযন্ত্র বিকল হয়ে পড়বে, ভেঙে পড়বে প্রতিরোধ। দেশের অভ্যন্তরে আরো পাঁচটা নানা সমস্যার সাথে জড়িয়ে জটিল হয়ে উঠবে পরিস্থিতি। তাতে আর কিছু না পাই আমার মায়ের অপমানের, আমার ধরিত্রীর লাঞ্ছনার প্রতিশোধ তো নেওয়া হবে।

অস্থিরতায় সীতা মাথা নাড়ল। বিষাদ মাখা মুখে আস্তে আস্তে উচ্চারণ করল : প্রতিশোধ নেবে?

শম্বুকের কণ্ঠস্বরে তখনও উত্তেজনার উত্তাপ লেগেছিল। তাই একটু জোর দিয়ে বলল : হ্যাঁ, প্রতিশোধ নেব। সর্বগ্রাসী আগুনের লেলিহান শিখা হয়ে আমি ছড়িয়ে পড়ব দিকে দিকে। ছারখার করে দেব অযোধ্যার সব অহংকার।

হঠাৎ শিহরিত হয়ে উঠল সীতার ভেতরটা। শম্বুকের হাত চেপে ধরল তীব্র উৎকণ্ঠায়। বলল: শম্বুক, তোমার কি মাথা খারাপ হল?

শম্বুক বেশ একটু ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেল। কেমন একটু দমে গেল। সংকোচে একটুক্ষণ চেয়ে থাকল তার দিকে। সীতাকে নতুন করে উদ্বেগে ফেলতে চায় না শম্বুক। কুণ্ঠায় চক্ষু নত করে বলল: তুমি অযোধ্যার রাজমহিষী এ কথাটা একেবারে ভুলে গিয়েছিলাম। এ সব কথা তোমাকে বলা উচিত ছিল না। আমি তোমার যেমন শ্রীরামের ও তেমনি। আমার বিস্মৃতি ক্ষমা কর জননী।

শম্বুকের কথায় সীতা অপ্রস্তুতভাবে একটু হাসল। মায়াবী দৃষ্টি মেলে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকল তার দিকে। ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল। বলল: তুমি মিথ্যে কিছু বলনি। একশ্রেণীর মানুষের হৃদয়হীন আচরণের প্রতিবাদ সত্তার অনেক গভীরে যে ক্ষোভ, বেদনা জমিয়ে রেখেছে, তাতো ঘৃণার-প্রেমের নয়। বিশ্বাস চলে গেলে, নির্ভরতা হারিয়ে গেলে, ভালবাসা মরে গেলে সম্পর্কটা কি আর বেঁচে থাকবে? মানুষের মত মানুষ হয়ে বেঁচে থাকার অনিবার্য প্রয়োজনের একটা দাবি তো মানুষের থাকবে। নিজস্ব সত্তা

প্রকাশের এই আকাঙ্ক্ষাটুকু তার দাবি আদায়ের সংগ্রাম। বাঁচার লড়াই। এত আমাদের উভয়ের জীবনে সত্য। আমি তো তোমার মত নির্যাতিত, লাঞ্ছিত, অপমানিত, উপেক্ষিত, বঞ্চিত। তোমার আমার মধ্যে কোন প্রভেদ নেই। তবু একটু অমিল আছে। আমার সঙ্গে তার কতকালের সম্পর্ক। কত স্মৃতি। সে সব ভুলবে কেমন করে? আমার প্রেমকে সে সম্মান করেনি তাই বলে নিজের ব্যর্থ প্রেমের প্রতিশোধ নিতে তার নামলে নেমে এলে আমার ভালবাসার গৌরব থাকবে কোথায়? ভালবাসার ফুল শুকিয়ে গেলে কি নিয়ে থাকব? আমি সইতে পারব না সে যন্ত্রণা।

শম্বুক একটু চুপ করে থেকে সতর্ক গলায় বলল: তোমার এই আবগেপ্রবণতার কোন মানে হয় না। শ্রীরাম তোমার মৃত্যু চেয়েছিল। তুমি বেঁচে আছ একথা শ্রীরাম জানলে অন্য কৌশলে তোমাকে শমন ভবনে পাঠানোর চেষ্টা করত। এসব বুঝেও তুমি ক্ষমা করবে তাকে?

সীতা সহসা গম্ভীর হল। থমথমে গলায় বলল: ক্ষমা করার আমি কে? সে আমার শত্রু। তার চেয়ে বড় শত্রু আমার কেউ নেই। হবেও না কোনকালে। আমার সব কিছু উজাড় করে তার মন বদলাতে চেয়েছিলাম। কিন্তু পারলাম কৈ? তার চোখে তোমার মতই আমি শত্রুপক্ষের মেয়ে ছাড়া কিছু নই। আমার সঙ্গে সে চিরকাল শত্রুতা করে গেল।

শম্বুক কথাটা শুনে ভীষণ চমকে উঠেছিল। অবাক গলায় আস্তে আস্তে উচ্চারণ করল : তুমি শত্রুপক্ষের মেয়ে! বলছ কি?

অভিমানে সীতার কণ্ঠস্বর রুদ্ধপ্রায় হল। খুব অসহায় গলায় কাঁদ কাঁদ হয়ে বলল : অযোধ্যাপতি হরধনু ভেঙে শত্রুপক্ষের মেয়েকে বিয়ে করে যে রাজনৈতিক খেলা শুরু করল তার শেষ বোধ হয় আমার বনবাসে। সেদিন তরুণী সীতা এসবের কিছুই জানত না। তাই, নিবেদন করে ধন্য হতে চেয়েছিল। কিন্তু কোনদিন ভরে উঠল না তার চাওয়া-পাওয়া। আজ সব কিছু বড় নগ্ন লাগে। অযোধ্যাপতি কোনদিন বিয়েটাকে প্রয়োজন ভাবেনি। কেবল সমাজ আর ধর্মের অনুশাসনের শেকলে বাঁধল আমায়। আমাদের দাম্পত্য জীবনটা শেকলে বাঁধা একটা সম্পর্ক। এর ভেতর স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরকে আবিষ্কার করার কোন আনন্দ ছিল না। বিয়ের সঙ্গে অযোধ্যাপতির মানসিক কোন সম্পর্ক ছিল না। দাম্পত্য প্রণয়কেও কোন স্বীকৃতি দিল না। এই কথাটা কিন্তু সেদিন এরকম করে অনুভব করতে পারিনি। নিজেদের পবিত্র সম্পর্ককে অবিশ্বাস করে কেউ? কার্যত একটা রাজনৈতিক প্রয়োজনকে বিয়ে নাম দেওয়া। এটা কেমন করে বুঝব বল? আমি তো আমার প্রেমকে সম্মান করেছি। স্বামীর উত্তাপহীন সম্পর্ক নিয়ে মনের অন্তরালে সব সময়েই তো দৈহিক মানসিক স্বপ্নের ভাঙাগড়া চলছিল, কিন্তু তাকে অবিশ্বাস করেনি। এখন বুঝতে পারি, রাজনৈতিক প্রয়োজন, নিয়ম ও উদ্দেশ্য মেনেই আমার সঙ্গে একটা সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল। দুর্ভাগ্য, সেই সম্পর্ক প্রয়োজনকে কখনও অতিক্রম করেনি। প্রয়োজনের বাইরে যে একটা জগৎ আছে, সেই জগৎ প্রেমের, সৌন্দর্যের, অযোধ্যাপতি সর্বদা এড়িয়ে গেছে তাকে। শত্রুপক্ষের মেয়ে হয়ে বেঁচে থাকার আনন্দ, ও সার্থকতাকে শ্রীরাম সম্মান দেয়নি। তবু নারী পুরুষের কোন এক দুর্বল মুহূর্তে খুবই অসতর্কতার কারণে নারীজন্ম সার্থক হয়ে গেল। তাকে মুছে ফেলার তখন চক্রান্ত হল।

সীতার জন্য একটা গভীর দুঃখে, সহানুভূতিতে শম্বুকের অভ্যন্তরটা টাটাচ্ছিল। তার অপাপবিদ্ধ মুখের শ্রী তার ভেতরে এক কোমল অনুভূতির সৃষ্টি করল। উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলল : তোমার কোন কথা বুঝতে পারছি না। সব কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। তুমি সব খুলে বল।

জীবনের সব কথা সকলেব কাছে খুলে বলা যায় না বৎস।

সন্তানের কাছে মায়ের কোন লজ্জা থাকে না। আমাকে তোমার সেই দারুণ দুঃখের কথা বলতে যদি বাধা থাকে তা হলে শুনব না। কিন্তু তুমি শ্রীরামের শত্রু কেন? নিজেকে শত্রুপক্ষের মেয়েই বা ভাবছ কেন, এই কথাটা একটু বুঝিয়ে বল। নির্ভয়ে বল। লব-কুশ থেকে আলাদা করে আমাকে দেখ না।

শম্বুকের ব্যাকুল জিজ্ঞাসার সামনে সীতা একেবারে প্রতিরোধহীন। তার জন্য একজন অনাত্মীয় মানুষের ব্যাকুলতা কত গভীর, কত ভেজালহীন, তা দেখে সীতা ভীষণ আশ্চর্য হয়ে গেল। লক্ষ্মণ

ছাড়া আর কাউকে তার জন্য এত উতলা হতে দেখেনি। শম্বুকের সহানুভূতি সমবেদনায় বুকের ভেতরটা তার গলে যেতে লাগল যেন। কয়েক ফোঁটা জল চোখের কোণে টল টল করতে লাগল। কেমন বিষণ্ণ আর শান্ত চোখে শম্বুকের দিকে তাকাল। ভাঙা একটা শ্বাস ছেড়ে আস্তে আস্তে বলল: এসব কথা বলছ কেন? অনুতাপের কোন কাজ করনি তুমি। কোনও পাপ, কোনও অন্যায় তো নয়ই।

দুপুর ঝাঁ ঝাঁ করছিল। একটা ঘুঘু ডাকছিল। কুটিরের চালের ওপর ঝুঁকে পড়া গাছের ডালের পাতায় খস খস শব্দ। গাছের ফাঁক দিতে গলিয়ে পড়া রোদের আঁকিবুকি ছড়িয়ে আছে তপোবনের আঙ্গিনায়। চতুর্দিক ভারি আর নিরিবিলি। ভারি সুন্দর একটা আবহাওয়া। সীতা চারদিকটা একবার তাকিয়ে দেখল। ভারী একটা নিশ্বাস পড়ল। কয়েকমুহূর্ত ভাবল। চোখ বন্ধ করে বলল : পুত্র, সে এক আশ্চর্য গল্প। বিধাতা আমার কপালে সুখ দেয়নি। সুখে রাখেনিও। এক সংকটের মধ্যে জীবনটা কাটল। কে আমার পিতা? কে আমার মাতা? কিছুই জানি না। জ্ঞান হতে জানলাম আমি জনক রাজার পুত্রী। সন্তানহীন জনকের অগাধ বাৎসল্যের ভেতর বড় হয়েছি। ঐশ্বর্য, প্রাচুর্য, সুখ, আনন্দ কোন কিছুর অভাব ছিল না। পরে অবশ্য জনক রাজার একটা কন্যা হল। তাতে আমার আদর কমল না। আমার বিয়ের বয়স হল। কিন্তু জনকরাজ অপত্য স্নেহে বিয়েটা নানা ছলে বিলম্ব করছিল। একদিন শ্রীরাম বিশ্বামিত্রের সঙ্গে জনকের রাজ্যে এল। হরধনু ভঙ্গের পণ পূর্ণ করে শ্রীরাম আমায় পত্নীত্বে বরণ করল। তারপরেই এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটল। আমাদের যাত্রাপথে হঠাৎই ক্ষাত্রতেজ সম্পন্না মহাবলী পরশুরাম রামচন্দ্রের পথরোধ করে দাঁড়াল। বলল : কোথা যাও রামচন্দ্র? দাঁড়াও। পরশুরামের চোখ ফাঁকি দেওয়া অত সোজা? তুমি বোধ হয় জেনেছ, আমার কন্যা সীতাকে জনক পরম সমাদরে নিজ কন্যার মত পালন করেছে। কিন্তু তুমি আমার চিরশত্রু দশরথের পুত্র। আমার ক্ষাত্রগর্ব এবং শক্তির বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করতে চুপিচুপি আমার হরধনু ভঙ্গ করে কার্যত: আমাকেই অগ্রাহ্য আর অপমান করলে। *আশ্চর্য তোমার সাহস! তোমার ঔদ্ধত্যের কোন পরিমাপ হয় না। তুমি বৈষ্ণব আমি শৈব। আমাদের কোন আত্মীয়তা হতে পারে না। আমার কন্যাকে হেয় করার জন্য তার বিয়েতে কোন স্বয়ম্বরসভা হল না, রথীমহারথী এল না, শৌর্য-বীর্য দর্শনের জন্য কেউ উপস্থিত থাকল না। সাজানো কতকগুলো লোককে সাক্ষী রেখে সীতার পাণিগ্রহণ করলে। ধিক্-ধিক্ তোমাকে রামচন্দ্র। জেনেশুনে শত্রুর ছেলের হাতে আমার মেয়েকে দেব না। শত্রু কোনদিন মিত্র হয় না। শত্রুতার অবসান হয় না কোনকালে।

রামচন্দ্র কোন প্রতিবাদ করল না। তর্কেও গেল না। পরশুরামের দুই পদযুগল স্পর্শ করে প্রণাম করল। বলল: মহাত্মন, আপনার তীব্র ভর্ৎসনায় আমার হৃদয় বিদীর্ণ হচ্ছে। অথচ আমার অপরাধ কি জানি না। এখন আদেশ করুন কি করলে আপনাকে সন্তুষ্ট করতে পারি। আপনি যে কন্যার পিতা সে তো এখন জানলাম। অথচ আপনার প্রতি আমার প্রথম কর্তব্য করা হয়নি। ঘটনাটা আপনার কাছে শোনা থেকে ভিতরে ভিতরে নিজেকে দোষী মনে হচ্ছে। দোষী এবং অপরাধী ভেবে যে শাস্তি দেবেন তাই মাথা পেতে নেব। অন্যায় না জেনে করলেও অন্যায় হয়। আমার অনিচ্ছাকৃত ভুল এবং অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত তো আমাকে করতে হবে। শুধু সে সুযোগ পেলে কৃতার্থ হয়ে যাই।

এ পর্যন্ত বলে সীতা বেশ একটা জোরে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। বলল: সেদিন প্রথম জানলাম যাঁর কাছে আমি আদরে স্নেহে বড় হলাম তিনি আমার জন্মদাতা নন, ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে পিতার পরম শত্রুর পুত্রবধূ হলাম। শত্রুপক্ষের মেয়ে কথাটা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কেমন ভয় করতে লাগল। ভয়বিহ্বল দুই আঁখির দিকে তাকিয়ে পিতা বললেন : যা অনিবার্য তাই ঘটেছে। রামচন্দ্র তোমার আচরণে এবং বাক্যে আমি প্রীত হয়েছি। তোমার উপর আমার আর রাগ নেই। পিতার চোখের দৃষ্টি স্নিগ্ধ হল। তাঁকে অনেক শান্ত ও সুস্থ দেখাল। আতঙ্কমুক্ত স্বস্তির শ্বাস পড়ল। মন্ত্রমুগ্ধ স্বরে বলল : পুরুষের একান্ত আকাঙ্ক্ষায় যা তুমি গ্রহণ করলে, তা কখনো দায়িত্বহীন হতে পারে না এ আমি বিশ্বাস করি। শুধু কথা শুনে মানুষকে চেনা যায় না ঠিক, কিন্তু প্রাণের ভাষার রূপ

* রামায়ন কথা—সুকুমার সেন

গন্ধ-স্বাদ একটু আলদা। তোমার কথাগুলো বুকের অতল থেকে উঠে আসা। কত সুধা তার ভেতর, তার বলবতী ধারায় কী তীব্র বেগ, কত গভীরকে সে আঘাত করতে পারে। ভাষার মাধুর্যে শত্রুও বৈরিতা ভুলে, পরম মিত্র হয়ে যায়। জীবনের বাস্তব কি আশ্চর্য! অলৌকিক। স্থান কাল পরিস্থিতি এই মুহূর্তে সীতা ও তোমাকে নিয়তির এক অমোঘ সংকেতরূপে আমার ও দশরথের শত্রুতার মধ্যে এনে দাঁড় করল। তোমাদের আমি অস্বীকার করি কেমন করে? নিয়তির অনিবার্যতাকে মেনে নিতে হয়। আমিও মেনে নিলাম।

সেই মুহূর্তে আমার বুকের মধ্যে কি যেন ঘটে গেল। অনুভূতির মধ্যে একটা তরঙ্গ ছড়িয়ে পড়ল। হৃদয় মথিত করে বেরিয়ে এল একটি ডাক : পিতা। তরঙ্গায়িত অনুভূতির প্রবল ঝাপ্টা সামলাতে পিতার বুকে আছড়ে পড়লাম। স্নেহের সমুদ্রে ডুবে গেলাম। কথাগুলো বলতে বলতে সীতার মুখে একটা বিষণ্ণতা ও গাম্ভীর্য ফুটে বেরোল।

শম্বুকের প্রস্তরবৎ আচ্ছন্নতা কেঁপে উঠল। সীতার প্রত্যেকটি কথা তার বুকে বিস্ময়ের ঢেউ তুলল। ধীরে ধীরে বলল: অতীতকে বিস্মৃত হওয়া এবং ভবিষ্যতের চিন্তা না করাটাই মানুষের স্বভাব এবং ধর্ম। মানুষের সব চিন্তা বর্তমান নিয়ে। তোমার পিতা মহাপ্রাজ্ঞ পরশুরামও তাই করেছিলেন। অতীতকে মনে রেখেই বর্তমানের কর্তব্য স্থির করা উচিত।

সীতার অধরে এক অদ্ভুত সুন্দর হাসি ফুটল। বলল: রাজনীতির খেলায় রমণীর ন্যায়বুদ্ধি দিয়ে জয়লাভ করা অসম্ভব। তুমিই বল কি করলে আমাদের ভাল হয়?

শম্বুক একটু উৎফুল্ল হয়ে বলল: প্রতিপক্ষের সঙ্গে লড়াইতে আমার আনন্দ। শ্রীরাম আমাদের উভয়ের শত্রু। শত্রুকে তার নিজের অস্ত্রে পরাজিত করা হল কূট রাজনীতি। রামচন্দ্র তোমাকে বিয়ে করে পরশুরামকে হারাল। এটা যেমন কোন অন্যায় নয় তেমনি লব-কুশের হাতে রামচন্দ্রের হারও কোন অন্যায় নয়। তুমি তাদের সেইভাবে তৈরি কর। মানুষকে চিরদিন আদর্শের জন্য সত্যের জন্য লড়তে হয়। সারাজীবন ধরে তুমি সত্যের সঙ্গে আর মিথ্যের সঙ্গে লড়ে এসেছ। এবার অস্তিত্বের জন্য, গৌরবের জন্য, নষ্ট আত্মমর্যাদার পুনরুদ্ধারের জন্য স্বামীর বিরুদ্ধাচারণ করতে হবে। এ লড়াই স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীর নয়; এ হল মিথ্যে এবং কপটতার সঙ্গে সত্যের ও আদর্শের লড়াই।

শম্বুকের কথা শুনে সীতা শুধু স্মিত হাসল। বলল: কিন্তু এমন এমন আদর্শ এবং সত্য আছে যা শেষ পর্যন্ত মিথ্যা মরীচিকার মত কেবল টানে, কখনও ধরা দেয় না।

তুমি ভারতবর্ষের সেই সনাতন নারী হয়েই আছ। সমাজ ও ধর্মের শেকল কেটে, বিশ্বাস ও সংস্কারের বেড়ি ভেঙে কিছুতেই বেরিয়ে আসতে পার না। কোন নারী পারে না? তোমাদের নীরব সহিষ্ণুতা পুরুষের অবিচার অত্যাচারের স্পর্ধার সীমাকে শুধু বাড়িয়েছে। ক্ষতি যা হয়েছে তা তোমাদের। স্বার্থত্যাগের কি মূল্য পেলে তোমরা? নারী বলে পুরুষের করুণার কৃপার পাত্র হয়ে থাকবে কেন? মুখ বুজে তাদের অবিচার অত্যাচার সইবে কেন? মর্যাদা অধিকার কেউ কাউকে দেয় না। এগুলো আদায় করে নিতে হয়। এ হল বেঁচে থাকার দাবি, তার অস্তিত্বের লড়াই। রামচন্দ্রের অপমান সহ্য করে নয়, তাকে প্রতিবাদ করে বেঁচে উঠতে হবে। অস্তিত্ব রক্ষার জন্য তুমিও যে জ্বলে উঠতে পার, তার সকল অবিচার, অন্যায়ের বিরুদ্ধের রুখে দাঁড়াতে পার, এই কথাটা জানান দেবার প্রয়োজন আছে। বেঁচে থাকাই জীবন ধর্ম। আর বেঁচে ওঠার জন্যই লড়তে হয়, প্রতিরোধ করতে হয়।

সীতা কথা বলতে পারল না। তার চোখের সামনে রামচন্দ্রের মুখ ভাসছিল। প্রত্যাখ্যানের মুখ। তার কথাগুলো মনে পড়ছিল, আর কেমন যেন চমকে দিচ্ছিল। একটা অপমান এত গভীরভাবে তার মনের ভেতরে বেজে যাচ্ছিল যে কথা বলতে পারল না। একটা চকিত অপমানের ব্যথা নিয়ে অসহায়ের মত তাকিয়ে রইল। যদিও তার চোখের তারায় ফুটে উঠল বেঁচে ওঠার আর বেঁচে থাকার এক অপরাজেয় কাল্পনিক ছবি।

সীতাকে অভিভূত আচ্ছন্নতায় অন্যমনস্ক দেখে শম্বুক বলল: মাগো, এটা মনে রেখ ইতিহাস বড় বিচিত্র পন্থায় মানুষের উপর প্রতিশোধ নেয়। লবকুশ বালক। তারা সাধারণ বালকের চেয়ে

একটু বেশি স্বতন্ত্র। নিজের পথে তাদের চলার সাহস আছে। আদর্শের জন্য কষ্ট ভোগ করার মত মনোবল ও দৃঢ়তা এই বয়সে তাদের হয়েছে। কি দারুণ অধ্যবসায়ে ধনুর্বিদ্যায় পারদর্শী হয়ে উঠেছে তুমি ভাবতেও পারবে না। রাজনীতির রহস্যময় খেলায় এই দুই বালক যে হঠাৎ রামচন্দ্রের মাথা ব্যথার কারণ হবে না, কে বলতে পারে?

সীতার বুক কাঁপছিল। মুখে কোন কথা জোগাল না। ভিতরকার উদ্বেগে, উৎকণ্ঠায় ভয়ে খানিকক্ষণ থম ধরে বসে রইল। কি বলবে তার মাথায় আসছিল না। মাথা নত করে পায়ের আঙুলে মাটি খুঁটতে লাগল। আস্তে আস্তে বলল : পুত্র তুমি বলছ, আমি শুনছি। আমার বলার মত কিছু নেই। আমি জানি, সময় নিরপেক্ষ। কাল শুধু আকর্ষণ করে। তার আকর্ষণ টের পাওয়া যায় না। নিঃশব্দে আসে। তার পদধ্বনি পর্যন্ত শুনতে পাওয়া যায় না। সে কি চায় তাও বলে না। কেবল সঙ্গে আছে। কিন্তু চিনবার উপায় নেই। কালের আকর্ষণ থেকে আমি তুমি কেউ মুক্ত নই। লবকুশও থাকবে না। ভয় করেও কোন লাভ নেই। যা হওয়ার তা হবেই। তোমার আমার ইচ্ছা নিমিত্ত মাত্র।

শম্বুক সহসা উল্লসিত হলো। দুই চোখে খুশি উপচে পড়ল। বলল : রুদ্রের ডমরুধ্বনি বাজছে আমার বুকের ভেতর। মনে হচ্ছে, সব বন্ধন মুক্ত আমি। এক বন্ধন ছিলে তুমি। সে দ্বিধাও ঘুচল আজ। এখন নির্দ্বিধায় নিজের প্রাণ উৎসর্গ করতে আর বাধা নেই। মাগো তুমি শুধু আশীর্বাদ কর, আগুনের মত জ্বলে উঠে দিকে দিকে প্রাণের দীপশিখা ছড়িয়ে দিতে পারি যেন।

অভিভূত আচ্ছন্নতায় সীতার দুই চোখ অজানিতে ভিজে গেল। শম্বুকের 'মাগো' ডাকটা তার ভেতরটা এলোমেলো করে দিচ্ছিল বার বার। শম্বুকের জন্য এক গভীর বেদনা অনুভব করতে লাগল। তার মা ডাক বহুকালের নারী মনের সংস্কার, বিশ্বাস ব্যক্তিত্ব, অহংকে যেন তছনছ করে দিল। ঘেন্নায় অপমানে অভিমানে নিজেকে বড় বেশি দূরে সরিয়ে রেখেছিল। এখন তীব্র ভাবাবেগে তার ভেতরে বাঁধ কেটে যাচ্ছিল। শম্বুকের প্রতিকারের ব্যাকুল আর্তি তার নিজের বেলাতেও প্রযোজ্য এতকাল একবারও বুঝতে পারেনি। যে থাকাকে সে না থাকা বলেই জানত, সে যে আরো কত বড় করে থাকা এই প্রথম টের পেল। শীতের পত্রহীন ডালপালার মধ্যেও যে প্রাণ সুপ্ত থাকে, নবীন বসন্তের সঙ্গে সঙ্গে তা টের পাওয়া যায় তার রিক্ত ডালে কচিপাতার উদগমে। সবুজ কিশলয়ে ভরে উঠে প্রমাণ করে, তার প্রচন্ড প্রাণশক্তি লুকিয়ে ছিল অস্তিত্বের গভীরে। কিন্তু এ কথা বুঝিয়ে বলার মত ক্ষমতা ছিল না তার। বোবা চোখে তাকিয়ে রইল শম্বুকের দিকে অনেকক্ষণ। ইচ্ছা করল তাকে একটু আদর করতে। তার স্নেহের সাগরে ডুবিয়ে দিতে। ফুলের গন্ধের মতই তার মহান মনের সৌরভ লেগে রইল মনে।

মনের ইচ্ছা মনেই রইল। নিঃশ্বাস ভারী হয়ে গেল। এক গভীর আচ্ছন্নতার মধ্যে ডুবে গিয়ে বলল : জয় হোক তোমার। তোমার ব্রত, পূজো বিদ্রোহ ব্যর্থ হবে না। রাজনৈতিক পীড়ন দমনের শিকার যারা তোমার পরিচয়ে তারা শুধু গর্ব বোধ করবে না, নিজেরাও এক একজন শম্বুক হয়ে উঠবে। তোমার এত বড় আত্মদান ব্যর্থ হবে না, এ আমি তোমায় বলে রাখলাম। একদিন নিপীড়িত মানুষের মুক্তি আন্দোলনের নাম হবে শম্বুক। শম্বুক তখন কোন ব্যক্তি বিশেষের নাম নয়। শম্বুক একটা জাতীয় আবেগ। শম্বুক হল ত্যাগ, তেজ, বীর্য, সাহস, সংকল্পের আর এক নাম। অত্যাচারিত, নিগৃহীত মানুষের পথচলার আলোকবর্তিকা। অন্তর দিয়ে আজ তোমাকে এই আশীর্বাদ করছি। এস পুত্র আজ তোমাকে সাজিয়ে দেব নিজের হাতে।

সীতার কথাগুলো ফুরিয়ে যাওয়া শম্বুককে নবীকৃত করে তুলল। কেমন এক অনাস্বাদিত সুখের মাধুর্যে ভরে উঠল তার ভেতরটা। প্রতিটি কথাই তার হৃদয়ের ভেতরটা গলিয়ে দিল। হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশ থেকে উঠে আসা বলেই এমন করে তার হৃদয়কে ভাললাগায় স্তব্ধ করে দিল। এমন গা শিরশির করা স্নেহ পাওয়া সে স্বপ্নেও কল্পনা করিনি। অথচ বড় কাতর হৃদয়ে এরকম একটা আহ্বানের হাল্কা গোলাপ রাঙা ছবি এঁকেছিল সে মনে। শম্বুক আর থাকতে পারল না। মনে

হল আদুল পায়ে উদলা গায়ে সে দৌড়ে গেল সীতার দিকে; ব্যর্থ জীবনের শূন্য অন্ধকার গহ্বর থেকে অন্য জীবনের আলোকিত প্রান্তরের দিকে সাগরে যাওয়া; নদীর মত অনন্ত উৎসারে।

নয়

আর্যাবর্তের পূর্বাঞ্চলে এবং পশ্চিমাঞ্চলের মধ্যবর্তী রাজ্য মধুবন। পার্বত্য উপজাতি অধ্যুষিত এই অনার্যভূমির সম্রাট ছিলেন রাক্ষসাধিপতি লবণ। লবণের শক্তি সাহস তেজ, ব্যক্তিত্ব, বিক্রম রণকৌশল তাকে অপরাজেয় করে রেখেছিল। শ্বেতাঙ্গদের কোন ছাপ কৃষ্ণাঙ্গদের মনে না পড়ে যাতে, সেজন্য নিজের রাজ্যের চারপাশে একটা সীমানা চিহ্নিত করে রেখেছিল। সেখানে শ্বেতাঙ্গ আর্যদের প্রবেশ ছিল নিষিদ্ধ। অনার্য বংশোদ্ভুত কোন ব্যক্তি, সে যে গোষ্ঠীর হোক আর্য মুনি, ঋষি, ব্রাহ্মণ কিংবা বণিকদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করা তার নিষিদ্ধ ছিল। একটাই যুক্তি তার। শ্বেতাঙ্গ আধিপত্যের দেয়ালটা চূর্ণ করতে কৃষ্ণাঙ্গ মানুষের সমবেত শক্তির ও অনুভূতি সমন্বয় চাই। যা একটি আকাঙ্ক্ষাকে জন্ম দেবে একটি স্বপ্নকে রক্তে বহন করবে। এরকম একটা বোধই পারে প্রতিরোধের পরিবেশকে শক্ত ও মজবুত করতে। লবণের রাজনৈতিক প্রজ্ঞাই স্বাধীনতার শিখাটিকে প্রজ্জ্বলিত রেখেছিল। কালো মানুষের এতবড় স্পর্ধা ঔদ্ধত্য লঙ্কা বিজয়ী রামচন্দ্রের সহ্য হল না।

তাই রামচন্দ্রকে দিনের পর দিন রাতের পর রাত ভাবতে হল কিভাবে লবণের রাজ্যকে অধিকার করা যায়। সমস্যা এবং বাধা দুই ছিল। সাদা মানুষের দেওয়া মূল্যবোধের পথ ধরে এখানে এগোনোর কোন পথ খোলা ছিল না। কৃষ্ণাঙ্গদের দ্বৈত অস্তিত্বের সংকট এখানকার কালো মানুষের মনে কোন ছাপ ফেলেনি। বিচ্ছিন্ন বোধের বিষ ছড়িয়ে এদের মনের অভ্যন্তরে প্রবেশ করা ছিল দুরূহ। আত্মমর্যাদা ও অস্তিত্ব রক্ষার সঙ্গে যদি শ্বেতাঙ্গদের সংগ্রাম হয় তাহলে তারা প্রাণপণে লড়বে। তাদের সংগ্রামে কালো মানুষের চেতনাবোধ জাগ্রত। মধুবনে কৃষ্ণাঙ্গদের ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ, রাজনৈতিক রোষ ও জাতিগত ঐক্যের সামনে শ্বেতাঙ্গ বাহিনী কতক্ষণ দাঁড়াবে? এই চিন্তাই রামচন্দ্রকে ভাবিয়ে তুলল।

কিন্তু আর্যাবর্তের পূর্বাঞ্চলের সঙ্গে পশ্চিমাঞ্চলের সংযুক্তি ছিল খুবই জরুরী। লবণের মধুবন সেই সংযুক্তিকরণের বাধা। আসমুদ্র হিমাচল পর্যন্ত রামরাজ্য গঠনের যে স্বপ্ন রামচন্দ্রের ছিল, লবণের জন্যে কার্যত তা বাধা প্রাপ্ত হল। আকাঙ্ক্ষার অকাল মৃত্যু তার ভাবমূর্তি ম্লান করল। প্রাকৃতিক বাধা উত্তীর্ণ হয়ে মধুবন আক্রমণ করা ছিল অসম্ভব ব্যাপার। পাহাড় ঘেরা মধুবনের সুউচ্চ গিরিশৃঙ্গে লবণের দুর্গ ও প্রাসাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়া যে কোন শত্রুর পক্ষে দুরূহ। স্নায়ুযুদ্ধের পরিবেশ সৃষ্টি করে লবণকে কব্জা করার চেষ্টাও ব্যর্থ হল। সমস্যার সমাধান করতে লবণ-রাজ্য আক্রমণ করা ছাড়া রামচন্দ্রের গত্যন্তরে ছিল না। শত্রুঘ্নকে তার দায়িত্ব দিল এবং সে মধুবন আক্রমণের এক দুঃসাহস পরিকল্পনা করল। দীর্ঘকাল ধরে লবণকে অবরুদ্ধ করে রাখল। সমতলভূমিতে নেমে আসার সব পথ বন্ধ করে পাহাড় আগলে বসে রইল। দীর্ঘকালের অবরোধের ফলে লবণের মজুত খাদ্য ও অস্ত্রের টান ধরল। শত্রুঘ্নের কাছে বশ্যতা স্বীকার করা ছাড়া অন্য কোন পথ ছিল না। শত্রুঘ্নর হাতে বন্দী হয়ে বেঁচে থাকার মত অপমান এবং লজ্জা কিছু নেই। নির্যাতন, লাঞ্ছনা এবং যন্ত্রণার কষ্ট ভোগ করে প্রতিমুহূর্তে বেঁচে থাকার ভেতর যে মানবিক অপমান আছে তার চেয়ে দৈহিক মৃত্যু অনেক সম্মানজনক এবং গৌরবজনক। আত্মসমর্পণের আগে নিজের হাতে ছোরা চালিয়ে এপাশ থেকে ওপাশ পেট চিরে বীরের মত মৃত্যুবরণ করল।

মধুবন অধিকার করল শত্রুঘ্ন। রামচন্দ্রের বিজয়পতাকা উড়ল প্রসাদ শীর্ষের গম্বুজে। পূর্ব ও পশ্চিম আর্যাবর্তের মধ্যে যে দেয়ালটা ছিল এতকাল, লবণের পতনের সাথে সাথে শেষ হল। পূর্ব ও পশ্চিম যুক্ত হল। এই সংযুক্তিকরণের ফলে রামচন্দ্রের একটা স্বতন্ত্র ভাবমূর্তি তৈরি হল। এই ভাবমূর্তি অক্ষুণ্ণ রাখতে মুনি ঋষি এবং ব্রাহ্মণদের সহযোগিতা বহু আগে থেকে রামচন্দ্র পেয়ে আসছিল। বলতে কি এদের সাহায্যেই এক বিরাট জয় সে আদায় করে নিল। রামচন্দ্রবিরোধী হাওয়াও ঘুরে গেল তার ফলে। যাদের সাহায্য সহযোগিতা ছিল এই ভাবমূর্তি গড়ে তোলার মূলধন তাদের

দাবি মেটাতে গিয়ে রামচন্দ্রের বর্ণাশ্রম নীতি আরো কঠোর হল। লবণের মৃত্যুর পর অযোধ্যায় বর্ণবিদ্বেষ, বর্ণবৈষম্য প্রকট হল।

রামরাজ্যে বর্ণাশ্রমদ্রোহীদের রাজদ্রোহী বলে ঘোষণা করা হল। রাজার প্রতি কৃষ্ণাঙ্গ প্রজাদের পবিত্র কর্তব্যের অবহেলা গুরুতর পাপ বলে গণ্য হল। এই অপরাধের শাস্তি প্রাণদন্ড।

বর্ণাশ্রম নীতির অবাঞ্ছিত অতিনির্দয়তায় আর্যাবর্তের কৃষ্ণাঙ্গদের জীবনও অতিষ্ঠ হয়ে উঠল। আর্যাবর্ত শুধু শ্বেতাঙ্গদের বাসস্থান। এখানে কালো মানুষের স্থান নেই। এই বোধটা শ্বেতাঙ্গ আর্যদের সঙ্গে তাদের মোটা দাগের এক ব্যবধান সৃষ্টি করল। এতদিন ধরে তারা শ্বেতাঙ্গ আর্যদের সঙ্গে পাশাপাশি ছিল। সমস্ত সামাজিক সম্পর্কের ব্যাপারটা ছিল হাতের পাঁচ আঙুলের মতই সমান নয় গোছের। জাতি বর্ণ ভাষায় সংস্কৃতিতে আলাদা হয়েও তারা স্বভূমির প্রগতি সমৃদ্ধি ও উন্নতির স্বার্থে শ্বেতাঙ্গদের সঙ্গে একযোগে কাজ করছিল। কালো হলেও এই মাটিতে তাদের জন্ম। সাদা মানুষের সঙ্গে তাদের যোগ। এই মাটি-মানুষের সম্পর্ক তো কোনদিন মুছবার নয়। তাই আর্যনৃপতির স্বার্থের সঙ্গে কৃষ্ণাঙ্গ প্রজার স্বার্থ ও কর্তব্য এক হয়ে মিশল। কিন্তু সেই অনুভূতি এবং ধারণা যে কত অলীক, ফাঁকা এবং শূন্য ছিল, রামচন্দ্রের অদ্ভুত ঘোষণায় তারা তা টের পেল। তাদের বহুকালের বিশ্বাস ধাক্কা খেল। সাদা-কালোর সম্পর্কের মধ্যে আকাশ জমিন ফারাক। কালোমানুষের অস্তিত্বের সংকটকে প্রবল করল। রামচন্দ্র ভাল করে জানত কৃষ্ণাঙ্গ মানুষের জীবন-বৃক্ষের শিকড় চলে গিয়েছিল বিবিধ দায়িত্ব পালনের নিষ্ঠায়, আস্থায় ও ভালবাসায়। আর্যাবর্তের কৃষ্ণাঙ্গরা অস্তিত্বের এই দ্বৈততায় ভুগবে। শ্বেতাঙ্গদের বিরুদ্ধে তারা কখনো যাবে না।

আর্যাবর্তের বাইরে কৃষ্ণাঙ্গ মানুষের আশার প্রদীপ ছিল মধুবনের লবণ। সুতরাং পথের সেই কাঁটাটা উপড়ে ফেলার একটা তাগিদ ছিল রামচন্দ্রের। লবণের আধিপত্যের পাহাড় চূর্ণ হলে কৃষ্ণাঙ্গদের উৎপাত চিরতরে বন্ধ হবে। কালো মানুষের স্পর্ধা সাহস, ঔদ্ধত্য যাবে ঘুচে। কিন্তু লবণের পরাজয়ে এবং মৃত্যুতে সে সব কিছুই হল না। রামচন্দ্রের অখন্ড আর্যাবর্ত গঠনের অবাধ ছাড়পত্র দিল না শম্বুক। অযোধ্যার দেমাক ভাঙতে শম্বুক এবং তার দলের লোকেরা বেছে বেছে রামরাজ্যের ব্রাহ্মণ-পুরোহিতদের পল্লীর উপর হামলা আরম্ভ করল। তাদের আক্রমণ এতই অতর্কিত এবং দ্রুত যে কয়েক মু্হূর্তে এক বিরাট ক্ষয়ক্ষতি করে নিঃশব্দে গা ঢাকা দিত। তাদের কালো শরীরে রক্তের আঁচড় পর্যন্ত লাগত না। বর্ণ বিদ্বেষের ঘৃণা অপমান এবং বিপন্ন অস্তিত্বের জ্বালা নিয়ে তারা জ্বলে উঠল। ব্রাহ্মণ এবং পুরোহিত বলে তারা কালো মানুষের করুণা কিংবা ক্ষমা পেল না। প্রতিশোধ পূরণের তৃপ্তি নিয়েই তারা নির্মম ও নিষ্ঠুর হয়ে উঠল। গোটা আর্যাবর্তে এক সংকটজনক আপৎকালীন অবস্থা সৃষ্টি হল। শম্বুক সুপরিকল্পিতভাবেই জাতিগত বিদ্বেষ ঘৃণা ও ক্ষোভের প্রভাব স্থায়ী করতেই বর্ণাশ্রমের পৃষ্ঠপোষক ও হোতা ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের রামচন্দ্রের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলল। তাদের শিশুপুত্রদেরও হত্যা করল।

অযোধ্যার জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর মানুষ নিজেদের অত্যন্ত বিপন্ন এবং অসহায় বোধ করতে লাগল। ভয় এবং আতঙ্কের মধ্যে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে তারা বাস করতে লাগল। চতুর্দিক থেকে একটা ভয় উৎকণ্ঠা উত্তেজনা তাদের গ্রাস করতে লাগল। শ্বেতাঙ্গদের ভয় বিদ্রোহী শম্বুককে। প্রতিবেশী কালো মানুষের মধ্যে ছদ্মবেশে কিংবা প্রচ্ছন্নভাবে বিদ্রোহীদের কেউ আছে কি নেই তা নিয়ে সাদা মানুষের দুর্ভাবনার অন্ত ছিল না। আবার বিপরীতভাবে কালো মানুষরাও নিশ্চিন্তে এবং সুখে ছিল না। রামচন্দ্রের ক্রোধের ভয়ে তারা ভীত এবং অশান্ত। সাদা কালো মানুষ পরস্পরকে সন্দেহের চোখে দেখল, অবিশ্বাস করল, শত্রু ভাবল এবং উভয়েই সর্বক্ষণ একটা অঘোষিত আচমকা আক্রমনের আশংকায় দিন কাটাতে লাগল।

গোটা আর্যাবর্তই আক্রান্ত। একটা অঘোষিত যুদ্ধ দেশ ও জাতির মনোবল ভেঙে দিল। শক্তি বিশ্বাস হারিয়ে তারা ক্লীবে পরিণত হল। বীর্যবান একটা দেশ ও জাতি যে ভীরুতায় হীনমন্যতায় এরকম পঙ্গু হয়ে যেতে পারে রামচন্দ্র স্বপ্নেও ভাবেনি। ভয়ের ভূত বীর্যবান নির্ভীক আর্যজাতিকে ক্লীবে পরিণত করল। এ কথা ভাবতে বিস্ময় লাগে। কিন্তু ভয়ের ভূত বাস্তব সত্য। পরিস্থিতিতে

এক অবাঞ্ছিত অনাবশ্যক জটিলতা সৃষ্টি করতে শম্বুক সফল হল। এটাই হল তার সমর কৌশলের সাফল্য।

শম্বুকের সাফল্য রামচন্দ্রকে হতাশ করল। তার সব গৌরব ম্লান হয়ে গেল। তার রাজনৈতিক মান-মর্যাদাও বিপন্ন। শম্বুক তার বড় শত্রু। মানুষের মনকে সে এমন গভীর করে নাড়া দিল যে রামচন্দ্রের প্রতি সাধারণ মানুষের আস্থা শ্রদ্ধা বিশ্বাসের ভিত টলে গেল। দিগ্বিজয়ী সমরশক্তি ও তার এই অভিনব আক্রমণের মোকাবিলা করতে ব্যর্থ হল।

রামচন্দ্র এরকম গভীর সংকটে আগে কখনও পড়েনি। খোলা সমরক্ষেত্রে সবার দৃষ্টির সামনে যে যুদ্ধ হয় তাকে বলা হয় বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম। হারজিত বড় নয়, শৌর্য-বীর্য প্রদর্শন এই যুদ্ধের গৌরব। কিন্তু শম্বুকের এ লড়াই আড়ালে আবডালে-কাপুরুষের মত যুদ্ধ। এতে কোন নীতি নেই, ধর্ম নেই, আত্মরক্ষার সুযোগ নেই, বীরত্ব দেখানোর পরিবেশ নেই, সবটাই আচমকা এবং প্রস্তুতিহীনভাবে হয়। এ হল কপট যুদ্ধ। এক ভয়ংকর মারাত্মক স্নায়ু যুদ্ধ। রামচন্দ্রের খ্যাতি, গৌরব, রাজকীয় মর্যাদা, ক্ষমতা, যোগ্যতার মূল ধরে যেন টান দিল। রাজশক্তির বিরুদ্ধে প্রজাদের ক্ষেপিয়ে তাদের অসন্তোষ ঘৃণা ক্ষোভের ইন্ধন শুধু দিল না, প্রতিবেশীর সঙ্গে রেষারেষি সৃষ্টি করে তাদের মধ্যে একটা দূরত্ব রচনার এক জঘন্য ঘৃণ্য চক্রান্তে বিদ্রোহীরা লিপ্ত থাকল। শম্বুকের এই অভিনব যুদ্ধ কৌশলে রামচন্দ্র দিশেহারা।

গভীর করে ভাবতে গেলে পুত্রহারা শোকার্ত এক ব্রাহ্মণের মুখ, অবাক জিজ্ঞাসু চোখ, অভিযোগ, তিরস্কারের কথা মনে পড়ে গেল রামচন্দ্রের। সেই অভিযোগ এত গভীরভাবে মনে জেগেছিল যে, ব্রাহ্মণের তিরস্কারের প্রত্যুত্তরে বিশেষ কোন কথাই বলতে পারেনি। একটা চকিত বিদ্ধ ব্যথার সঙ্গে কথাগুলো হৃদয়ে গাঁথা হয়ে ছিল।

সমস্যার মূলোৎপাটন করতে রামচন্দ্র একাকী সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশে জনস্থানের অরণ্যে প্রবেশ করল। শম্বুকের অভিপ্রায়, অবস্থান তার গতিবিধি জেনে নেওয়া ছিল উদ্দেশ্য।

তাপসের ছদ্মবেশে একাকী দন্ডকের পথে যেতে যেতে রামচন্দ্র কল্পনায় দেখতে পাচ্ছিল পুত্রশোকাতুর এক পিতা ভয়ংকর বিভীষিকার মত হাত জোড় করে অশ্রুসজল কণ্ঠে তাকে প্রশ্ন করছে : মহারাজ পঞ্চদশ বর্ষ বালকের মৃতদেহ বয়ে নিয়ে এক হতভাগ্য পিতা বিচার চাইতে এসেছে। আমি এ কোন রামরাজ্যে আছি, রাজা? রামরাজ্যের কি মৃত্যু হয়েছে? স্বপ্নের রামরাজ্য আমি চাই না। ফিরিয়ে দাও আমাদের পুরনো অযোধ্যা। সেই আমাদের ভাল ছিল।

ব্রাহ্মণ উদ্গাত কান্না বুকে চেপে রামচন্দ্রের দিকে তাকাল। পুত্রশোকাতুর পিতার মর্মন্তুদ শোক জ্বালা তখন অতি তীব্র এবং ঝলকানো বিদ্যুতের মত। রাগে বিতৃষ্ণায় ঘৃণায় দুই চোখ জ্বলজ্বল করছিল। দুই ঠোঁটের ফাঁকে থমকে ছিল দুর্জয় প্রতিবাদ।

ব্রাহ্মণের গম্ভীর বিষণ্ন মূর্তি রামচন্দ্রের মন খারাপ করে দিল। বুকের ভেতর সহানুভূতি সমবেদনা গলে গলে পড়ছিল। তার নিজের চেহারা ও দৃষ্টি কেমন যেন বদলে গিয়েছিল সেই মুহূর্তে। কিন্তু তার সমবেদনা শুধু তর্কের অবতারণা করবে এই ভেবেই ব্রাহ্মণের রাগ বিতৃষ্ণার দিকে অবাক জিজ্ঞাসুর চোখে তাকিয়ে চুপ করেছিল। যদিও কষ্টে তার চোখ ছলছলিয়ে উঠেছিল। বুকের ভেতরটাও টাটাচ্ছিল। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল, ব্রাহ্মণ আপনি পুত্রশোকে কাতর। কি করলে আপনার তাপিত হৃদয়ের যন্ত্রণার উপশম করতে পারি, জানি না। এ রাজ্যের রাজা যখন আমি, সব দোষ তো আমারই।

রামচন্দ্রের স্বীকারোক্তিতে ব্রাহ্মণের ভেতরটা হঠাৎ তীব্র ঘৃণায় নতুন প্রত্যয়ে শক্ত হয়ে উঠল। কয়েক পলক তার মুখের দিকে তাকিয়ে রোষবহ্নিতে জ্বলে উঠল। বলল: কে চেয়েছে আপনার সান্ত্বনা? আমি তো কোন করুণা অনুগ্রহ কিংবা মৌখিক সহানুভূতি, মামুলি সান্ত্বনা পেয়ে ধন্য হতে আসেনি? আমি যা হারালাম ভগবান রামচন্দ্রের কোন কথায় ফিরে পাব না কোনকালে। পিতার বাৎসল্য কি পূরণ হয়? তবু আমি মৃতপুত্রের শব বুকে নিয়ে এসেছি। কিসের আশায়? কেন? একথা তো জানতে চাইলেন না রাজা?

ব্রাহ্মণের উচ্চ গম্ভীর স্বরের মধ্যে যেন একটা শক্তির উৎস বেজে উঠল। রামচন্দ্র বিমর্ষ গম্ভীর মুখে কয়েক পলক তাকিয়ে রইল ব্রাহ্মণের দিকে। আর একটা ভীষণ অস্বস্তিবোধ করছিল। চোখমুখের অভিব্যক্তিতে সেই অস্বস্তি ফুটে উঠল। সমস্ত চেতনা জুড়ে বিষের মত ছড়িয়ে যাচ্ছিল তার অপরোধবোধের যন্ত্রণা। একটা ধিক্কার বশেই কতকটা স্বগত স্বরে বলল: আমি সেটা অনুভব করেছি।

ব্রাহ্মণের দুইচোখ দপ্ করে জ্বলে উঠল। পুত্রকে দেখিয়ে বলল: মহারাজ চেয়ে দেখুন কী পুঞ্জীভূত ঘৃণার বিষ নিয়ে পুত্র আমার ঘুমিয়ে আছে। সারা মুখ ওর বিষের যন্ত্রণায় নীল হয়ে গেছে। আমি তো জীবনে কোন অসৎ কর্ম করিনি, অধর্ম করিনি কারো সঙ্গে। সকলের সঙ্গে সদ্ভাব রেখে চলেছি। তবু আমার সর্বনাশ হল কেন? কার পাপে আমি পুত্র হারালাম? এ'কার কর্মফল? এক শ্রেণীর মানুষের অসন্তোষ, ক্রোধ, হিংসা, ঘৃণা, বিদ্বেষের যে তান্ডব চলেছে, সে কার সৃষ্টি? এই অভিশাপ কে ডেকে আনল? কার ভুলে এই নরকের উৎপত্তি? রামরাজ্যের সুখ শান্তি হরণ করে নিল কে? এ কোন সর্বনাশ পাপ ঢুকল রামরাজ্যে? এ তো বিধাতার রুদ্রদোষ নয়, মানুষই এর স্রষ্টা? সেই মানুষটি কে? তার কি কোন শাস্তি হয়েছে?

রামচন্দ্র নির্বাক। অপমানে কালো হয়ে উঠল মুখ। ব্রাহ্মণের কপট ভর্ৎসনা বিদ্রূপ এত গভীরভাবে তার মনে বেজেছিল যে প্রত্যুত্তরে কোন ক্রোধ কিংবা উষ্মা প্রকাশ করতে পারল না। একটা চকিত বিদ্ধ ব্যথার সঙ্গেই যেন তীব্র অপরাধবোধ তার আচ্ছন্নতায় স্থায়ী হয়েছিল। নিজেকে তার কেমন অসহায় লাগছিল। মনে হচ্ছিল, অলৌকিক কোন ভয়ংকর ঘটনা যেন আসন্ন। ব্রাহ্মণের কটূক্তি কেবল সংকেত। আত্মরক্ষার ভিতটা তার একটু শক্ত হয়। হতাশ চোখে একটু তাকাল। একটা অজ্ঞাত উদ্বেগ মস্তিষ্ক জুড়ে ছড়িয়ে গেল। দীর্ঘশ্বাস পড়ল। এক অভূতপূর্ব অসহায়তায় জড়ানো তার কণ্ঠস্বর। আস্তে আস্তে বলল: ব্রাহ্মণ আপনার বিদ্রূপ অতি নির্মম। ভর্ৎসনা নিষ্করুণ। তবু এই তিরস্কার অভিযোগ আমার প্রাপ্য। প্রজাদের নিরাপদে রাখা তো আমার দায়িত্ব। কিন্তু আমি সে কাজে ব্যর্থ হয়েছি। আমার ব্যর্থতার জন্যই স্বপ্নের রামরাজ্য এখন উপহাসের বস্তু। কিন্তু আমি তো প্রজাদের ভাল চেয়েছিলাম। মানুষ সুখে শান্তিতে আনন্দে থাকুক—এই শুভ কামনাই করেছিলাম। মানুষ ধর্মে সুন্দর হোক, আদর্শে মহান হোক এই প্রত্যাশা নিয়েই তো নিজের সুখ স্বার্থ আরামের দিকে তাকায়নি। কিন্তু কেমন করে যেন সব ধ্বংস হয়ে গেল। অমৃত গরল হয়ে উঠল। এতো আমারই ভুল। জবাবদিহি করার মত কিছু নেই আমার।

একা একা পথ চলতে চলতে কথাগুলো রামচন্দ্রকে কেমন যেন চমকে দিচ্ছিল। হেঁটে যাচ্ছিল রামচন্দ্র নিস্তব্ধ দন্ডক অরণ্যের শুকনো পাতায় ঢাকা লালমাটি আর কাঁকুরে পথে। পায়ের পাতার চাপে শুকনো পাতাগুলো গুঁড়ো করে দিয়ে যাচ্ছিল প্রায় নিঃশব্দ শব্দে।

হঠাৎ একটা কালো মানুষ তার পেছন পেছন আসতে লাগল অনুরূপ নিঃশব্দে। একটা কিছু ভেবে রামচন্দ্র একমুহূর্ত থমকে দাঁড়াল। ঘুরে দাঁড়াতেই লোকটার মুখোমুখি হল। লোকটাও অপ্রস্তুত হয়ে রণং দেহি ভঙ্গিতে দাঁড়াল। বাম হাতে উদ্যত ধনুক, ডান হাতে তীর। তাকে দেখে হাসি পেল ছদ্মবেশী রামচন্দ্রের। নির্ভয়ে একটু হাসলও।

দাড়ি গোঁফ সমেত চূড়া বাঁধা একমাথা জটাওয়ালা রামচন্দ্রকে কালো লোকটা চিনতে পারল না। বেশ একটু ঝাঁঝালো গলায় বলল: মহাত্মন এই অরণ্যে-মুনি-ঋষি কিংবা সন্ন্যাসীর প্রবেশ নিষেধ। আর এগোলে আপনার বিপদ হবে। এখান থেকেই ফিরে যান।

রামচন্দ্র লোকটাকে খুঁটিয়ে দেখল। সতর্ক দুই চোখে তার নিশানা স্থির। সমস্ত দৃঢ়তার মধ্যে ফুটে উঠেছিল নিষেধ অমান্যের পরিণাম। লোকটার মুখের দিকে কিছুক্ষণ বিহ্বল দৃষ্টিতে চেয়ে রইল রামচন্দ্র। তারপর একটু কষ্টের সঙ্গে হাসল। বিনয়ের সঙ্গে বলল: ভদ্রে, গহন অরণ্যে সাধনা করব বলে সংকল্প করেছি। ফিরে যাই কেমন করে? সন্ন্যাসীর সংকল্পচ্যুত হতে নেই। তাতে তপোবল নষ্ট হয়ে যায়। তুমি আমার মনস্কামনা পূর্ণ হওয়ার অন্তরায় হয়ো না। আমাকে নিবৃত্ত করো না বন্ধু।

নিষিদ্ধ এলাকা। সামনের ঐ সীমানা পেরোলেই আপনার মৃত্যু অনিবার্য।

আমি সন্ন্যাসী। মরণের ভয় আমার নেই। মোক্ষলাভের পথ খুঁজছি। শুধু তুমি আমাকে বাধা দিও না প্রহরী।

অরণ্য প্রহরী নীরব।

রামচন্দ্রের মনের গভীরে সঞ্চারিত হচ্ছিল বিপরীত কুটিল এক জিজ্ঞাসা। আর কৌতূহলী মনে জাগল সংবাদ সংগ্রহের ব্যাকুল আগ্রহ। প্রহরীর দিকে ভীত চোখে তাকানোর একটু অভিনয় করল। ভয়ার্ত স্বরে প্রশ্ন করল: ভদ্রে, এঘোর অরণ্যে তোমবা কার প্রহরায় নিরাপত্তাকে এমন নিশ্ছিদ্র করে তুলছ? তিনি কে?

অন্তরাল থেকে এক এক করে আরো অনেক প্রহরী এসে রামচন্দ্রকে ঘিরে ধরল। রামচন্দ্রের কথা শুনে তারা পরস্পরে সন্দেহের চোখে এ-ওর দিকে তাকিয়ে দৃষ্টি বিনিময় করল। অন্য একজন্য প্রহরী বাজখাঁই গলায় বলল: আপনি খুব চতুর। এ আপনার ছদ্মবেশ। শত্রুপক্ষের কোন গুপ্তচরও হতে পারেন। আমরা কোন সংশয়ে যাব না। গুপ্তচরের শাস্তি প্রাণদন্ড।

অন্য প্রহরীরা এক সঙ্গে বলল: আপনাকে আমরা হত্যা করব।

রামচন্দ্রের মুখে নির্বিকার হাসি। একটু ভয়ে বিচলিত হল না তার অন্তঃকরণ। মৃদু হাস্যে ওষ্ঠাধর বঙ্কিম হল। বলল: হত্যা করবে? কিন্তু ব্রহ্মহত্যার ভয়ংকর পাপে তোমরা নরকগামী হবে। নরকের ভয় যদি না থাকে তাহলে নিরপরাধী নিরীহ এক সন্ন্যাসীকে হত্যা করতে পার।

এক কাল্পনিক নরকের ভয়ে প্রহরীরা চমকে উঠল। তাদের চোখে মুখে ভয়মিশ্রিত উত্তেজনা সঞ্চারিত হল। আতঙ্কে ভয়ে সে একটু দমে গিয়ে সংকুচিত গলায় বলল: উত্তম। আপনি তাহলে আমাদের বন্দী।

সর্বনাশ! নিরুচ্চারে বলল ছদ্মবেশী রামচন্দ্র। বন্দী মানে বন্দীশালা। কারাগার এক ভয়ংকর জায়গা। মর্তের নরক। ওই নরকে আমাকে আটকে রেখ না ভাই। আমি সন্ন্যাসী, আমার সাধনা নষ্ট করে কয়েদী করতে চাইছ কেন?

সব প্রহরীরা অবাক হয়ে চেয়ে রইল তাপসের দিকে। একজন বিরক্ত হয়ে চড়া গলায় বলল: তাহলে কোথায় যাবে?

তোমরা যাকে পাহারা দিচ্ছ, তার কাছে আমাকে নিয়ে চল। তাকে বরং বুঝিয়ে বললে বুঝবে সে। তা-ছাড়া আমার একটা ভীষণ গোপন কথাও আছে তার সঙ্গে।

কার কথা বলছেন তাপস?

আপনি কোথা হতে, কার কাছ থেকে আসছেন?

গোপন কথা আবার কি?

আমরা কাকে পাহারা দিচ্ছি?

আপনাকে কার কাছে নিয়ে যাব খুলে বলুন।

চারপাশে থেকে প্রহরীরা নানারকম প্রশ্ন করল।

রামচন্দ্র একটু রাগল না। ভয় পেল না। নির্ভয়ে ওদের দিকে চেয়ে হাসি হাসি মুখ করে বলল: গোপন কথা তোমাদের বললে তো আর গোপন থাকে না। আমি কেবল শূদ্রক শম্বুককে কথাগুলো বলতে পারি।

প্রথম প্রহরী চটপট উত্তর দিল: শম্বুককে আমরা চিনি না।

শম্বুককে চেনে না একথা দন্ডকের মানুষ কেউ বিশ্বাস করবে? তোমরা মিছিমিছি আমাকে সন্দেহ করছ। শত্রু ভাবছ।

সন্ন্যাসী, অত কথার দরকার কি? আপনার ফিরে যাওয়াই ভাল।

রামচন্দ্র কপট দীর্ঘশ্বাস ফেলল। ভ্রূ কুঁচকে একটু চিন্তা করল। বলল: তাহলে, সত্যিই আমাকে ফিরে যেতে হয়। সবই অদৃষ্ট শম্বুকের। নিরাপত্তার কড়াকড়িতে জানানো হল না দন্ডকের প্রজাবিদ্রোহ দমন করতে ভগবান রামচন্দ্র তমসার এই অরণ্যকে ঘিরে ফেলেছে। জঙ্গলের মধ্যাঞ্চলে শিবির সন্নিবেশ করেছে। চতুর্দিক থেকে তার সুশিক্ষিত জংলি বাহিনী চক্রাকারে গভীর অরণ্যের মধ্যে

ঢুকছে। শম্বুকের পলায়নের সব পথ বন্ধ। গোপনে তাকে সতর্ক করে দেওয়াই ছিল আমার ইচ্ছা।

এরকম অদ্ভুত ইচ্ছা হল কেন?

অর্বাচীনের মত প্রশ্ন করলে বন্ধু। তোমরা কোন স্বার্থে তার পক্ষে সংগ্রাম করছ? তোমাদের মত আমিও দন্ডকবাসী। দন্ডককে তোমাদের মত ভালবাসি। আমারও কিছু কর্তব্য আছে। আমার ও তোমার মধ্যে পার্থক্য আমি সন্ন্যাসী, তুমি সৈনিক। আমাদের কাজের ক্ষেত্র তাই আলাদা আলাদা। দন্ডকারণ্যবাসী সমস্ত দুঃখী মানুষের স্বার্থে ও কল্যাণে শম্বুকের সংগ্রাম। আমরা সকলে তার কর্মের এ আদর্শের সঙ্গী। তার মত মহাপ্রাণ মানুষের জন্য এটুকু করা আমার কর্তব্য।

প্রহরীরা একটু চমকাল। তাপসের কথার ভেতর এমন এক গভীর অপকট আন্তরিকতা মিশে ছিল যে তাদের ভীষণ ভাল লাগল। অবিশ্বাসের জায়গায় একটা গভীর প্রত্যয় দানা বাঁধল। তবু সংশয় সম্পূর্ণ গেল না। আরো ভাল করে যাচাই করতে প্রহরীদের দলপতি এক অদ্ভুত বিভ্রান্তি সৃষ্টি করল। বলল: তাপস, আপনার বিচার বিশ্লেষণ অনুমান বিশ্বাস যথার্থ নয়। আপনার এরকম অদ্ভুত প্রত্যয় হল কেন? আমরা তো শ্রীরামের প্রহরীও হতে পারি।

ছদ্মবেশী রামচন্দ্র এবার কালো মানুষের চতুর ছলনার জালে আটকে পড়ল। তারা শ্রীরামের প্রহরী নয় এরকম এক দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করলে ছদ্মবেশ ধরা পড়ে যায়। তাই সব দিক যাতে রক্ষা পায় সেইভাবেই বলল : কি জানি ভাই। আমি সাধু সন্ন্যাসী মানুষ, কে কার প্রহরী, সৈনিক চিনব কেমন করে?

হঠাৎ অশ্বখুরের শব্দ, অশ্বের হ্রেষারবে রামচন্দ্র একটু চমকাল। আচম্বিতে বিস্ময়ে সকলের সঙ্গে সেও তাকাল। ঘন বনের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল প্রাণপ্রাচুর্যে ভরা যৌবনদৃপ্ত এক তরুণ। মধ্যাহ্ন সূর্যের মত তেজ। তরুণটি সোজা রামচন্দ্রের সামনে অশ্ব নিয়ে দাঁড়াল।

যুবককে দেখেই তাকে শম্বুক বলে অনুমান করতে রামচন্দ্রের ভুল হল না। তাকে দেখেই কেমন একটা শঙ্কা জাগল বুকে। নানাবিধ মিশ্র অনুভূতির প্রতিক্রিয়ায় ভারাক্রান্ত হল চিত্ত। রামচন্দ্র ভাবছিল শম্বুক বুদ্ধিমান বিদ্বান, বিচক্ষণ এবং চমৎকার ভারসাম্যসম্পন্ন মানুষ। তার চেহারা ভাবভঙ্গি দেখেই আন্দাজ করতে পারল তার ছদ্মবেশ ধরা পড়বে। তখনকার কথা ভাবতে গিয়ে তার নিঃশঙ্ক অন্তঃকরণ একটু কাঁপল। তবু তার ভেতর নিশাশেষের আকাশে ধ্রুবতারার মত জেগে রইল একটা বিশ্বাস, সব মানুষের কিছু কিছু দুর্বোধ্য দুর্বলতা থাকে। সেই দুর্বলতার ছিদ্র পথ দিয়ে ব্যর্থতা ঢুকে তার জীবনকে তছনছ করতে পারে। কিন্তু সেটা চিনে নেওয়াও খুব কঠিন কাজ। তবু রামচন্দ্র চোখ কান খোলা রাখল। মনে মনে বলল শম্বুক তাকে ঠিক চিনে নেবে। তখন কি করবে?

শম্বুক অশ্বপৃষ্ঠ থেকে নামল। ছদ্মবেশের মধ্যেও রামচন্দ্রকে সে ঠিক চিনল। একমুহূর্ত থমকে দাঁড়াল। আর আশ্চর্য হয়ে ভাবতে লাগল : ব্যক্তিত্বের সত্যই একটা চমক থাকে। একটা ভাল লাগার নেশা থাকে। সেটা বলতে হয় না। চুম্বকের মতই তা আকর্ষণ করে। যে রামচন্দ্র তাদের জাতীয় জীবনের অভিশাপ, যাকে শত্রুর চোখে চিরকাল দেখছে, এই মুহূর্তে তাকে অদ্ভুত ভাল লাগল। শ্রদ্ধায় শির নুয়ে পড়ল।

ভাবতে খুবই মজা লাগল সেই বরেন্য মানুষ, শত্রুশ্রেষ্ঠ আর্যকুলতিলক অযোধ্যাপতি রামচন্দ্র ছদ্মবেশে, গোপনে, একা এসেছে তার সাক্ষাৎপ্রার্থী হয়ে। পাছে আগমনের বার্তা জানাজানি হয়ে পড়ে তাই নিজের পরিচয় গোপন রাখতে খুব সতর্ক। কিন্তু রামচন্দ্র নিজের ব্যক্তিত্বের গন্ধ চেনে না তা কখনও হয়? সংশয়ে সন্দেহে মনটা ভয়ংকর দুলে উঠল শম্বুকের তা হলে কি মায়া করে ভোলাতে এল তাকে? অমনি মনটা কঠোর হল তার। বুকের মধ্যে পাকা ফোড়ার মত একটা ক্ষোভ ও আক্রোশের দপদপানি অনুভব করল। ইন্দ্রিয় এবং বুদ্ধির গতি তখন নিরন্তর। অপ্রতিহত।

রামচন্দ্রের দিকে ভাল করে চেয়ে দেখল। মুখে তার বিরক্তির ভাব ফুটল। দুই ভুরুর মাঝখানটা কুঁচকে গেল। রামচন্দ্রের চোখের ওপর চোখ রেখে বলল : আমি নিষাদ যুবক শূদ্রক বংশের শম্বুক।

তারপর চোখ দুটো ছোট করে বলল : ঐ নবদুর্বাদলশ্যামবর্ণ শ্রীরামচন্দ্র ছাড়া আর কারো হয় না। আপনার গাত্রবর্ণ আপনার পরিচয়। ভস্মাবৃত করেও তনুর বর্ণ গোপন করতে পারেননি।

রামচন্দ্র জবাব দিল না। শম্বুকের দিকে চুপ করে চেয়ে রইল।

শম্বুক স্মিত হাসল। মৃদু কণ্ঠে বলল: মহারাজ রামচন্দ্র আপনি কিন্তু ধরা পড়ে গেছেন। তাপসের ছদ্মবেশ চিনতে আমার কোনো অসুবিধে হয়নি। কিন্তু তাপসের বেশে কেন? এই গহন অরণ্যে আপনার মত দেবচরিত্রের মানুষের পদার্পণ ঘটল কেন জানতে পারি? আজ্ঞা করুন ভগবান রামচন্দ্রকে কি করে পরিতুষ্ট করব?

শম্বুকের শ্লেষ নির্মম। এই ব্যজস্তুতির কোন জবাব রামচন্দ্রের জানা ছিল না। তবু কথাগুলো তার রাজমর্যাদা এবং অহংকারকে আঘাত করল। ইচ্ছে করল, অনল শিখার মত তার তেজ, ব্যক্তিত্বের গর্ব শক্তির দম্ভ চূর্ণ করে দিয়ে বলে, নিষাদ, আমার শত্রু তুমি। আমার সব গৌরব তুমি ম্লান করে দিচ্ছে। ভারতবর্ষের মানুষের কাছে আমি বড় ছোট হয়ে গেছি। তোমার শত্রুতার কোন ক্ষমা নেই। তোমার সঙ্গে আমার কোন আপসও হবে না। তোমার আমার বোঝাবুঝির ইতি ঘটাতে এসেছি। কিন্তু মনের কথাটা মনেই রইল তার। সে শুধু শম্বুকের কথাবার্তা, লাল চোখের দৃষ্টি, পা ফেলার ভঙ্গির ওপর তীক্ষ্ণ নজর রাখল। একটু ভাবলও। ভাবার অনেক কিছুই আছে। এখন মাথা ঠান্ডা রাখা দরকার। চঞ্চলতা বা উত্তেজনার সময় নয়। সময়ের গতি এখন দ্রুত এবং নিরন্তর।

কিন্তু তার ভেতরটা তীব্র অপমানে জ্বালা করতে লাগল। কিছুটা বিরক্ত এবং চিন্তিত মুখে অবাক স্বরে উচ্চারণ করল: তুমি এসব কথা বলছ কেন জানি না, নিষাদ।

শম্বুকের অধরে বিচিত্র হাসির বিদ্যুৎ খেলে গেল। বলল: আমার মত এক দীনতম প্রজার সঙ্গে মহামান্য প্রজানুরঞ্জন রাজা রামচন্দ্রের এধরনের ছলনা কোন গৌরব বৃদ্ধি করবে না। নিজের সঙ্গে কেউ ছলনা করে? অবশ্য সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশেই শ্বেতাঙ্গরা কালো মানুষের হাতে লোহার শিকল পরিয়ে দিয়েছিল একদিন। সেই সনাতন ছদ্মবেশে অযোধ্যাপতিও এই অরণ্যের মাটিতে পা রাখলেন। তবে কি বুঝব প্রজানুরঞ্জণ রাজা পুনরায় মানবধর্ম অপমান করতে এখানে পদার্পণ করছেন? আপনি বলুন, কালো মানুষ হওয়া কি পাপ? কি অপরাধ করেছে কালো মানুষ? রাজানুগত্য তো অস্বীকার করেনি তারা? ধিকৃত কিংবা নিন্দিত হওয়ার মত কোন কাজও করেনি? সাদা মানুষের মত মানবিক মর্যাদা আর অধিকার নিয়ে নিজের একখন্ড ভূমির ওপর নিজেদের সংস্কৃতি নিয়ে স্বাধীনভাবে বাঁচতে চায় এটা কি খুবই অপরাধযোগ্য কিছু চাওয়া তাদের? একটা জাতির নিজস্ব অস্তিত্ব রক্ষার জন্যও এক টুকরো ভূভাগ তো চাই। কিন্তু নিজের ভূভাগেই সে আজ উদ্বাস্তু পরবাসী এবং পরদেশী। এই দুর্ভাগ্যের অবসান ঘটানোকে রাজানুগত্য অস্বীকার করা বলে কি? এর নাম কি বিদ্রোহ? অথচ রামরাজ্য সম্পর্কে এমন একটা ভাবমূর্তি সকলের মনে গড়ে উঠেছিল যে আমরা ভেবে নিয়েছিলাম সাদা-কালোর বর্ণবৈষম্যের অধ্যায় শেষ হল। ক্রীতদাসত্বের অবসান হল। রামরাজ্য মানে ভাল করে থাকা, সুখে শান্তিতে থাকা, বিশ্বস্ত সৌভ্রাত্র, বন্ধুত্ব নিয়ে পাশাপাশি মিলেমিশে এক হয়ে বাস করা। কিন্তু কিছুদিন যেতে স্বপ্নভঙ্গ হল। আমরা যে ক্রীতদাস সেই ক্রীতদাসই রইলাম। আমাদের অবস্থার উন্নতি হলনা। সাদা-কালোর সম্পর্ক অপরিবর্তিত থাকল। রামরাজ্য কালো মানুষের কোন উপকারে এল না। রামরাজ্যে সাম্য এল না। বরং তারা গ্রাসিত হল। রামরাজ্য মানেই শ্বেতাঙ্গদের স্বর্গরাজ্য। সাদা মানুষের সুখ, আরাম, বিলাসিতা, বিত্ত, বৈভব, শ্রী ও সমৃদ্ধির স্বার্থে কালো মানুষের নিবেদিত প্রাণ হওয়া। তারা যে মানুষ, তাদের যে একটা অনুভূতি আছে, ইচ্ছে থাকতে পারে এই স্বীকৃতিটুকুও সাদা মানুষ দিল না।

এই পর্যন্ত বলে শম্বুক শ্বাস নেবার জন্য একটু বসল। হঠাৎ এক অদ্ভুত আবেগে বিভোর হয়ে বলল: সেই অভিশপ্ত জীবনের খোলস থেকে বেরিয়ে পড়ার চেষ্টাকে রামরাজ্যের আদর্শ ও লক্ষের বিরুদ্ধাচারণ বলা যায় কি? রামরাজ্যে মমতা সৃষ্টির যে আকাঙ্ক্ষা অযোধ্যাপতি স্বপ্নে ও রক্তে বহন করেছে, তাকে কালো মানুষের ন্যায়সঙ্গত দাবির স্বার্থে যদি বিস্তৃত ও বাস্তবায়িত করার দাবি করে শম্বুক, তা-হলে সেটা কি অপরাধযোগ্য কাজ হবে তার? সাদা রঙ যেমন কালো রঙকে গ্রাস করে, তেমনি কালো রঙেও সাদার শুভ্রতা ঢাকা পড়ে। বিশাল রামরাজ্যে সাদা কালো স্ব-স্ব অস্তিত্ব নিয়ে সৌভ্রাত্র নিয়ে এক পরিবারভুক্ত হয়ে বাস করলে রামরাজ্যের গৌরব তাতে বাড়ে বৈ কমে

না। প্রজানুরঞ্জন রাজা কালো প্রজার মর্মবেদনাকে, তার ক্ষুব্ধ সত্তার যন্ত্রণাকে, তার আত্মদ্রোহকে, ঠিকমত উপলব্ধি না করেন, তার প্রতিকারে অগ্রণী না হয়ে কণ্ঠরোধ করেন তবে সেই রাজাই হলেন মানবধর্ম বিরোধী, রাজধর্মদ্রোহী বিজাতিদ্রোহী। ইতিহাস তাকে ক্ষমা করবে না।

অপমানিত রামচন্দ্রের দুই চোখ ক্রোধে জ্বলে উঠল। বুকের সব তাপ যেন তার কণ্ঠে এসে জমা হল। চিৎকার করে রোষরূঢ় কণ্ঠে বলল: স্তব্ধ হও, ভন্ড নিষাদ। তোমার চোখে আমি রামচন্দ্রই। রামচন্দ্রের একটা সহ্যের সীমা আছে। তোমার স্পর্ধা ঔদ্ধত্য অশালীন উক্তি ভব্যতার মাত্রা লঙ্ঘন করছে। আমাকে নিরস্ত্র নিঃসহায় দেখে কাপুরুষের মত বীর্যের আস্ফালন করছ। কথায় অবশ্য পাপ নেই, কিন্তু তোমার আস্ফালনের ভেতর কোন পৌরুষ নেই। দস্যুর মত নির্বিচারে যে নিরীহ মানুষের জীবন সংহার করে, হরণ করে ; তার মুখে রামরাজ্যের কথা মানায় না। রামরাজ্যে কপট মিথ্যাচারী দুর্বৃত্তের কোন স্থান নেই। তার শাস্তি মৃত্যু।

শম্বুকের অধর প্রত্যয়দৃপ্ত হাসিতে উজ্জ্বল হল। বলল: মহারাজ রামচন্দ্রের সাহসের প্রশংসা করি। মহাপ্রাণ রাজার পক্ষেই সম্ভব স্বেচ্ছায় ধরা দিয়ে অভিনব নজির সৃষ্টি করা। বন্দীর মুখে শাস্তির কথা মানায় না। সে নিজেই মৃত্যুর আসামী।

রামচন্দ্রের অকম্পিত হৃদয়ের অভ্যন্তরে একটা ভয় মুহূর্তের জন্যে তাকে চঞ্চল করে তুলল। বিশ্বাস করতে সাহস হল না হীন কৌশলাবলম্বী নিষাদ যুবক শম্বুককে। সুতরাং কিছু একটা ঘটার আগেই রামচন্দ্রের গাত্রাবরণের অন্তরালে থেকে লুকনো অসি মুহূর্তে ঝলকে উঠল বিকেলের পড়ন্ত আলোয়। শম্বুক কিছু বুঝবার আগেই ছিন্নশির হল।

তার আচম্বিত মৃত্যুতে প্রহরীরা হতভম্ব। বিভ্রম দৃষ্টিতে পাষান-মূর্তির মত অপলক চোখে শম্বুকের ছিন্নমুন্ডের দিকে তাকিয়ে থাকল। সমস্ত বিস্ময় জমাট কঠিন শিলাখন্ডের মত আঘাত করল তাদের অন্তর। সেই আঘাতে তারা স্তব্ধ নির্বাক চলৎশক্তিহীন।

দশ

সীতার আচমকা ঘুমটা ভেঙে গেল। সে উঠে বসল। কে যেন জাগিয়ে দিল তাকে। শরীরে ঝাঁকুনি দিয়ে বলল: জননী আমি এসেছি। দ্যাখ তো, আমায় চিনতে পার কি না? স্বপ্নে শম্বুককে কবন্ধ অবস্থায় দেখল। সীতার বিস্ময়ের অন্ত নেই। তার মাথাটা শরীর থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। মাটিতে রক্তাপ্লুত হয়ে পড়ে আছে। যন্ত্রণাকাতর দুটি চোখ তার দিকে স্থির। মরা হাসি তার অধরে। একসময় সে হাসি কৌতুকে বর্তুল হল।

স্বপ্নে সীতা নিজেকে দেখল: ভয়ে আঁচল দিয়ে মুখ ঢেকে বসে আছে। আর শম্বুক বলছে, তুমি কিন্তু আমাকে একটুও দেখছ না। চোখ বুজে আছ। আমি তো শম্বুক। তোমার সেই শম্বুক যার এক ফোঁটা রক্ত থেকে আর এক শম্বুক জন্মায়। তোমার ভাষায় গোটা দেশটাই শম্বুক হয়ে গেছে। তুমি তো বল, শম্বুক মরে না। শম্বুকের মরতে নেই, তবে ভয় কি জননী? চোখ খোল। বলেই কবন্ধ শম্বুক সীতাকে দুহাতে ধরে প্রচন্ড ঝাঁকুনি দিল। আর তাতেই সীতার ঘুম ভেঙে গেল। ভয় পেয়ে ধড়মড় করে উঠে বসল।

ঘরের ভিতরে ছোট্ট প্রদীপ মিটমিট করে জ্বলছিল। নিষ্প্রভ ম্লান আলোয় কাউকে দেখতে পেল না। তার ভীষণ ভয় করতে লাগল। ঘরে সে একা। ভয়টা তার শরীরের ভেতর কাঁপুনি ধরিয়ে দিল। আস্তে আস্তে বিছানা থেকে নামল। তারপর খুব সন্তর্পণে দরজার কপাট খুলল। অমনি এক ঝলক ফুরফুরে শীতল হাওয়া লেগে শরীরটা জুড়িয়ে গেল।

সীতা পায়ে পায়ে একেবারে বাইরে এসে দাঁড়াল। এখন আর কোন ভয় নেই। শরীরটা বেশ হাল্কা আর ঝরঝরে লাগল। মাথার উপর মুক্ত আকাশ, চোখের সামনে অবারিত প্রকৃতি মূক মৌন স্তব্ধ। কোথাও তার বিক্ষোভ নেই। অজস্র নক্ষত্র যেন তার দিকে লক্ষ চোখ মেলে কৌতুহলী হয়ে তাকিয়ে আছে। মনে হল, এই নিস্তব্ধ নিশুতি রাতে সে নিজেই হয়ে উঠেছে প্রকৃতির কৌতুহল।

তবু সে স্থির থাকতে পারছিল না। ভেতরটা তার ভীষণ অশান্ত অস্থিরতায় ছটফট করছিল।

শম্বুকের কথা ভেবে মনে মনে ভীষণ শঙ্কিত ও উদ্বিগ্ন হল। স্বপ্নে কবন্ধ শম্বুক, তার শরীর ছিন্ন শির, হাত ধরে ঝাঁকুনি দেওয়ার সব দৃশ্যগুলি মনে করতে পারছিল। আর কেমন একটা অমঙ্গল চিন্তায় বিমর্ষ হল।

এক বুক উৎকণ্ঠা, উদ্বেগ আর দুর্ভাবনা নিয়ে সীতা বাল্মীকির কুটিরে গেল। খুব সন্তর্পণে দরজায় হাত রাখল। একটুতেই দরজাটা খুলে গেল। ভেতর থেকে দ্বার রুদ্ধ নেই দেখে, বেশ অবাক হল। ঘরে ঢুকে প্রদীপের আলোটা বাড়িয়ে দিল। বিছানায় লব কুশ জড়াজড়ি করে অঘোরে ঘুমিয়ে আছে। কিন্তু বাল্মীকি নেই। তাঁর শয্যা খালি। সীতার বুকের ভেতরটা ঝাঁৎ করে উঠল। ত্রস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। অন্ধকারে কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক দেখল। কৃষ্ণপক্ষের মরা চাঁদের আলোয় কদম্ব গাছের নীচে ছায়ার মত কি একটা দেখল। বাল্মীকির শুভ্র কেশ ও দাড়ি ছাই রঙা অন্ধকারেও দেখা গেল।

এই গাছটি বাল্মীকির খুব প্রিয়। সীতা কতদিন আড়ালে থেকে দেখেছে, বাল্মীকি একা একা বসে এই গাছটার সঙ্গে বন্ধুর মত গল্প জুড়ে দেয়। এখানে বসেই পুঁথি লেখে প্রতিদিন। কিন্তু কাকে নিয়ে পুঁথি লেখে জানে না। কিন্তু এই কদমগাছ তলা তার বড় সুখের জায়গা, আবার দুঃখেরও এক পরম আশ্রয়স্থল। মধ্যরাতে এমন করে গাছের তলায় বসে থাকার অর্থ কি? প্রশ্নটা সীতার নিজের কাছেই। এখন বাল্মীকির মনে কিসের পালা? দুঃখের না সুখের? কোনটা? দুঃখ কিংবা সুখ ছাড়া মানুষের আর কি কোন অনুভূতি নেই? দুঃখও নেই, সুখও নেই, মনের এরকম অবস্থাকে কি বলে? সীতা নিজেও জানে না। তবু বাল্মীকির ঋষিসুলভ মৌন স্তব্ধতা সীতাকে তার দিকে টানছিল। একটা নিঃশ্বাস তার বুকের কাছে আটকে রইল। যুগপৎ উৎকণ্ঠা ও বিস্ময়ে তার বুক টনটন করতে লাগল।

সীতা আর অন্ধকারে দাঁড়াল না। নিঃশব্দে বাল্মীকির সামনে এসে দাঁড়াল। বাল্মীকি অমনি প্রশ্ন করল: তুমি? এত রাতে? ঘুম আসছে না বুঝি?

সীতা বাল্মীকির খুব কাছে বসল। তার প্রশ্নের কোন জবাব দিল না। নিঃশব্দে মাথা নাড়ল শুধু। তার বুকের ভেতর উৎকণ্ঠার মেঘস্তূপ। তার মস্তিষ্কের মধ্যে তখনও স্বপ্নের ঘোর লেগেছিল। সীতার মনে হল বাল্মীকির মত আপনজন পৃথিবীতে তার কেউ নেই। স্বামী, পিতা কেউ নয়। কিন্তু সে এত আপন কেন? মায়া-বন্ধনমুক্ত সাধু সন্ন্যাসী মানুষ এত আপন হয় কি করে? নিজেকে প্রশ্ন করল সীতা। কিন্তু তার ভাবতে ভাল লাগল, এই অদ্ভুত আশ্চর্য সুন্দর ঋষি বাঁচিয়ে রেখেছে তাকে এবং তার ছেলেদের বড় করার মধ্যেই রয়ে গেছে তার জীবনের সর্বস্ব। লব কুশ বড় হবে, বীর হবে, যশখ্যাতি নিয়ে পিতাকে ছাড়িয়ে যাবে এই পণ করে যেন দুর্ভাগ্যের সঙ্গে বাজি খেলতে বসেছে। আর যারা আপনজন, তারা কেউ খোঁজ নিল না কোনদিন। মানে, খোঁজ করা দরকার হল না। তারা আজ বহু দূরের মানুষ। এদের স্নেহ ভালবাসা, প্রেম, সমাদর নিঃস্বার্থ ছিল না। কিন্তু এই মহাপ্রাণ ঋষির জীবনে সে এক মরুদ্যান। একদন্ড চোখের আড়াল করে না তাকে। কোথাও, গিয়ে স্বস্তি পায় না। কৃতজ্ঞতায়, অনুরাগে শ্রদ্ধায় সীতার চিত্ত ভরে গেল। বাল্মীকির একটু স্নেহের জন্যে তার ভেতরটা কাঙাল হয়ে উঠল। আস্তে আস্তে তার কাঁধের ওপর দুহাতের মালা রচনা করে মাথা রাখল। দুফোঁটা জলও গড়িয়ে পড়ল নিজের অজান্তে।

ভারাক্রান্ত গলায় থেমে থেমে বলল : ঘুম ভাঙিয়ে দিয়ে গেল শম্বুক। স্বপ্নে তার এক বীভৎস রূপ দেখলাম। ভাবলে, গা শিউরে ওঠে। ছেলেটার এখন কোন অমঙ্গল না হলে হয়। আমার কিছু ভাল লাগছে না পিতাজী। শম্বুকের জন্য ভাবনা হয়। অনেক দিন সে আসে না। তুমি তার খবর জান?

বাল্মীকির ভেতরটা কি যেন একটা ঢেউ দিয়ে গেল। একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস পড়ল। বিষণ্ণ গলায় নিস্পৃহভাবে বলল: জানি।

সীতা ভুরু কুঁচকে বলল: ভাল আছে তো?

না।

কি হয়েছে তার?

বাল্মীকি একটু চিন্তা করে জবাবটা অন্যভাবে পরিবেশন করল। বলল: মাতৃহীন শম্বুক তোমাকে জননীর চোখে শুধু দেখত না, তোমার মধ্যে সে খুঁজে পেয়েছিল তার হৃতশ্রী স্বদেশকে। তোমার মত তার দেশমাতৃকা হৃতসর্বস্বা, লাঞ্ছিতা, বঞ্চিতা, উপেক্ষিতা অনাদৃতা। তাই বোধ হয়, তোমাকে স্বপ্ন দিল সে।

কিন্তু সে যে ভীষণ বীভৎস কুৎসিৎ স্বপ্ন। চোখ খুলে দেখা যায় না। ভাবলেও গায়ে কাঁটা দেয়। অতি বড় শত্রুরও যেন অমন পরিণতি না হয়।

বাল্মীকি নীরব। তার বুকটা কেমন করছিল। ঋষিসুলভ সংযম রক্ষা করাও কঠিন হল। একটা দুঃসহ যন্ত্রণায় তার বুকের ভেতরটা বরফের মত গলে যাচ্ছিল। আর তার সবটুকু যেন চোখের জল হয়ে গন্ড বেয়ে গড়িয়ে পড়ল বুকে যেখানে হৃৎপিন্ডটা থাকে। কিন্তু কণ্ঠ থেকে কোন শব্দ বার হল না। ক্রৌঞ্চের মৃত্যু একদিন তার নিষ্করুণ অন্তরে যে মর্মদাহী যন্ত্রণা আর হাহাকার জাগিয়ে ছিল, ঠিক অনুরূপ এক বিষণ্ণ বিধুরতায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল তার চিত্ত।

সীতার বাহুমূলে তপ্ত অশ্রুর ফোঁটা পড়ল। অমনি সারা শরীরে তার বিদ্যুৎ তরঙ্গ বয়ে গেল। চমকে তাকাল বাল্মীকির দিকে। কৃষ্ণপক্ষের মরা চাঁদের আলোয় চিক চিক করে উঠল তার চোখের কোণের আশ্রুবিন্দু। সীতা তৎক্ষণাৎ কেমন হয়ে গেল। ভেতরটা তরাসে কেঁপে উঠল বারংবার। স্থির দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ বাল্মীকির মুখের দিকে চেয়ে সভয়ে অস্ফুট কণ্ঠে জিগ্যেস করল: পিতাজী, তোমার চোখে জল! তুমি কাঁদছ? শম্বুকের কথা বলতে তুমি আনন্দ পাও। কিন্তু আজ তোমার বিপরীত আচরণ কেন? শম্বুকের কি হয়েছে? তার জন্যে আমার বুক কেমন করছে? কি হয়েছে তার? বলো, বলো। আমার আর তর্ সইছে না।

দিশেহারা বাল্মীকি আতঙ্কিত চোখে চেয়ে থাকল সীতার দিকে কিছুক্ষণ। অবোধ দৃষ্টি। শূন্য চোখে অসহায়ভাবে সীতার মুখের মধ্যে কি যেন খুঁজল। নাভির কাছ থেকে নিঃশব্দে যে কান্নাটা উঠে এল তাকে গিলতে গিয়ে বিষম খেল। সীতা এক বুক উৎকণ্ঠা নিয়ে তার বুকে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। আর তাতেই বাল্মীকির বুকটা ভরে উঠল নিরবচ্ছিন্ন সুখে। বুকের ভেতরটা থরথরিয়ে কেঁপে গেল। কথা বলতে গিয়ে তার স্বরভঙ্গ হল। ভাঙা গলায় বলল: কি বলি বলতো? মায়ের মন দিয়ে তুমি যা স্বপ্নে দেখেছ তাই হয়ত ফলে গেছে তার জীবনে।

সীতা ভীষণ অবাক হয়ে অবিশ্বাসের চোখে চেয়ে থাকল বাল্মীকির দিকে কিছুক্ষণ। তারপর চমকানো বিস্ময়ে আর্তনাদ করে উঠল : পিতাজী!

সীতার বুকের ভেতর টাটানো যন্ত্রণার খামচা খামচি শুরু হয়ে গেল। হু হু করে উঠল বুকটা। একটা অস্বাভাবিক বিকট গলায় শব্দ করে কেঁদে উঠল। বাল্মীকিকে দুহাতে আঁকড়ে ধরে বুকের মধ্যে মুখ গুঁজে পাগলের মত কাঁদতে লাগল। কান্নায় ডুবে গেল তার কণ্ঠস্বর।

বাল্মীকি সেই কান্নায় বাধা দিল না। দেবে কোথা থেকে? তার নিজের বুকেই শোকের সাগর উথলে উঠল।

অনেকক্ষণ চুপ করে অনড় হয়ে বসে রইল বাল্মীকি। তার মুখে কষ্টের ছাপ শোকের বিষণ্ণতা ফুটে উঠেছিল? পিতা-পুত্রী দু'জনে মুখোমুখি চিত্রার্পিতের মত বসে রইল। নিশুতি রাত্রি হঠাৎ যেন ভীষণ শব্দহীন হয়ে গেল।

বাল্মীকি এক অতলান্ত জিজ্ঞাসায় ডুবে রইল। শম্বুকের নারকীয় হত্যাকান্ডের দৃশ্যটা সে কল্পনায় দেখছিল। আর দুর্জয় প্রতিরোধের চিন্তায় মনটা ক্রমে শক্ত হয়ে উঠল।

ভোরের আলো ফুটল আকাশে।

পাখিরা মহানন্দে, মুক্তির উল্লাসে কলরব করতে লাগল।

বাল্মীকি আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। অরুণিমার দিকে অপলক চোখে চেয়ে রইল অনেকক্ষণ। সব যন্ত্রণার গভীর থেকে নিজের অজান্তে দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে বেরিয়ে এল: রাতের সব তারাই থাকে দিনের আলোর গভীরে। তেমনি জীবনেও অন্ধকার থেকে আলোয় ফেরা বড়ই যন্ত্রণার। অস্তিত্ব

থেকে অনস্তিত্বে ফেরাও বড় কষ্টের।

বাল্মীকির কথাগুলো সীতার প্রাণ স্পর্শ করল। নরম চোখ মেলে দেখল, প্রকৃতি যেমন করে ভোরের সূর্যকে দেখে।

সীতার অবচেতন মন নানা মিশ্র অনুভূতিতে প্রতিক্রিয়াশীল। মস্তিষ্কের মধ্যে শম্বুকের মুখটি ভেসে উঠল এক ঝলক। বাল্মীকির মুখের মধ্যে সে শম্বুককে দেখল। মনে হল বাল্মীকি যেন শম্বুক হয়ে গেছে।

অন্ধকারের ঘোর কেটে যাচ্ছে। ছাইরঙা আকাশে পাখিরা উড়ে যাচ্ছে অস্পষ্ট ভোরের আকাশ থেকে মাঝ-সকালের আকাশে। অভ্রকুচির রোদের নরম টুকরোগুলো গাছের ডালপালার ফাঁক দিয়ে মাটির উপর ছড়িয়ে যাচ্ছে। একটু একটু করে সূর্যোজ্জ্বল বনের অস্তিত্ব, ঘাস, মাঠের অস্তিত্ব তার নিজের এবং বাল্মীকির অস্তিত্ব চেতনার মধ্যে থেকে তার চোখের সামনে বাস্তব হয়ে উঠল। আর অবচেতন মনে নিজের সব অতীতকে মাড়িয়ে সীতা হেঁটে যাচ্ছিল এক অচেনা ভবিষ্যতের দিকে। যেমন করে পাখিরা ভোরের আকাশে ডানা মেলে দেয় নির্ভয়ে।

সীতা অনেকক্ষণ বাল্মীকির চোখের দিকে চেয়ে থেকে আস্তে আস্তে বলল: শম্বুকের এই মৃত্যুটা যতদিন আমার মনে থাকবে ততদিন অযোধ্যাপতির প্রতি আমার ঘৃণাও বোধ হয় যাবে না। এতদিন ধরে তার প্রতি যতখানি আমার প্রেম, শ্রদ্ধা আর অনুরাগ ছিল, আজ বোধ হয় ঠিক ততখানিই তাকে ঘৃণা করি। শম্বুক এই পাহাড়, বন, নদী, প্রকৃতির মতই আমার জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে ছিল, তার শূন্যতা আমার কাছে এবং জঙ্গলের অসহায় মানুষের কাছে কতখানি তা তুমি ছাড়া অন্য কেউ বুঝবে না। নিপীড়িত উপজাতিরা যে কতখানি হারাল, আমিও বা কি হারালাম তা অযোধ্যাপতি কিংবা আর্যাবর্তের মানুষ কোনদিন অনুভব করতে পারবে না। লবকুশ বড় হয়েছে, তারা বুঝলেও বুঝতে পারে। কিন্তু আমার মনের সব কথাও তারা জানে না। তবু তারা যদি নিরীহ অসহায় অবহেলিত, উপেক্ষিত কালো মানুষদের কোন কাজে লাগে তার শিক্ষাই দাও তুমি। সেই হবে, অযোধ্যাপতির ভণ্ডামির প্রায়শ্চিত্ত।

বাল্মীকি অবাক বিস্ময় নিয়ে সীতাকে দেখতে লাগল। কী যে দেখছিল হতভাগিনী সীতার মধ্যে কে জানে? এক দারুণ দীপ্তিতে বাল্মীকির মুখ দীপ্ত হয়ে উঠল। বলল: জানকী, লব কুশ আর্যপুত্র। আমি অনার্য। এই দুই জাতির বর্ণ, ধর্ম, ভাষা, সংস্কৃতি নিয়েই এই ভারতবর্ষ। শ্রীরামচন্দ্র সেই সত্যটা ভুলে গেছেন। ভারতবর্ষের ঐক্য ও সংহতি ভাঙতে বসেছে। লবকুশ আর আমাকে দিয়ে আর্য-অনার্যর মিলিত শক্তি, বুদ্ধি, বীর্য ও আকাঙ্ক্ষার যে সমন্বয় চাইছ তার অর্থ শ্রীরামের সঙ্গে সংঘর্ষে যাওয়া। কিন্তু আমাদের সে শক্তি কোথায়? আজকের মানুষের কাছে এই সব সামাজিক চেতনার কিছুমাত্র ভূমিকা নেই। তবু তুমি যখন বললে, আমার বাকি জীবনটা তোমার কথার একটা মানে খুঁজে দেখব। নতুন শরীরে, নতুন মনে। ভাল মন্দ যাইই হোক, নতুনত্বের স্বাদ তো পাব।

লব তপোবনে ফিরে দেখল সীতা কুটির সংলগ্ন বারান্দায় এক কোণে একটা শালের খুঁটিতে হেলান দিয়ে আঁচলটা ভাল করে গায়ে জড়িয়ে ভূত ভূত অন্ধকারে চুপ করে বসেছিল। সুন্দর কালো কাজল চোখ দুটিতে প্রাণের প্রকাশ নেই। সন্ধ্যার ম্লান আকাশের প্রতিপদের মরা চাঁদের মত নিষ্প্রভ লাগছিল তাকে। জননীর বুকে কোথায় যেন একটা লুকনো ব্যথা আছে। সেটা অনুভব করতে পারল লব। বিস্ময়ে জননীর দিকে স্থির অপলক চোখে তাকিয়ে রইল। নিজের কাছে তার প্রশ্ন, কিসের ব্যথা? কার জন্যে? কেন? এসব প্রশ্ন প্রায়ই উদয় হয় মনে।

কতদিন কত কথা ভেবে আকুল হয়েছে দু'ভাই। কতবার ভেবেছিল, জননীকে জিগ্যেস করে জানবে তাদের পিতা কে? কোথায় থাকেন তিনি? পিতার সান্নিধ্য স্নেহ হতে তারা বঞ্চিত কেন? মা'কে তিনি বা দুঃখ দিচ্ছেন কেন? দু'ভাই নিভৃতে মনের এইসব জিজ্ঞাসা নিয়ে কত কথা, কতভাবে বলাবলি করে, তবু মুখ ফুটে প্রশ্ন করতে পারেনি মাকে। মানে করা হয়নি। পাছে জননী কোন

দুঃখ পায়, বিব্রত হয়, লজ্জা পায় তাই নিজেদের মনের সঙ্গে লড়েছে তারা। জননীকে বুঝতে দেয়নি তাদের অন্তঃরাজ্যের প্রতিক্রিয়া।

জননীর মুখের দিকে তাকিয়ে, গোপন কোন লজ্জার কথা কল্পনা করে অবাধ্য জিজ্ঞাসা তারা সংযত করেছে। নদীর মত জীবন স্রোতের সঙ্গে ভাসিয়ে দিয়েছে নিজেদের। জননীর কুল ভাসানো স্নেহ ভালবাসা মমতায় ভেসে গেছে তারা নিজের নিজের গভীর গন্তব্যের দিকে, নিজেদের ও জননীর প্রকৃত সুখের দিকে। ভান, ভন্ডামি, লোকভয় সব ছিঁড়ে তারা বুক ফুলিয়ে মাথা উঁচিয়ে চলেছে কারো কাছে কোন জবাবদিহি না করেই। প্রশ্বাস নেওয়া আর নিঃশ্বাস ফেলার মত প্রত্যেক মানুষ পিতৃপরিচয় নিয়ে বেঁচে আছে। কিন্তু প্রত্যেকের জীবন তো তার নিজের নিজের। পিতৃপরিচয়, বংশপরিচয় এ সব কিছু নয় বাল্মীকি মুনি এই শিক্ষাই দিয়েছে তাদের। বাল্মীকি কথাগুলো তাদের কানের পর্দায় ঝংকারে বাজে। প্রত্যেক মানুষকে মানুষ হয়ে উঠতে হলে তার নিজস্ব পরিচয় তৈরি করে নিতে হয়। সেটাই তার প্রকৃত পরিচয়। নিজের পরিচয় নিয়ে বেঁচে থাকার মত গর্ব, সুখ আর কিছুতে নেই। জীবন মানে তো শুধু জীবিত থাকার চেষ্টা নয়, আরো কিছু। সেজন্য দাম যা লাগে লাগুক। বিনামূল্যে এ জীবনে কিছু কি আর মেলে? দাম দিতে ভয় পেয়ো না দাদাভাইরা। মনে রেখ, কোন মানুষকে নষ্ট করে দিতে পারে না অন্য কেউ, যদি সে নিজে না নষ্ট হয়। লব স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল তার সামনে সাদা দাড়িওয়ালা পট্টবস্ত্র পরিহিত মুনি বাল্মীকি হাসি হাসি মুখে চেয়ে আছে যেন।

সত্যিই, পিতার স্নেহ, আদর সঙ্গ ছাড়াই তো জীবনটা বেশ চলে যাচ্ছে। নিত্য নতুন হয়ে, জীবনে ভরপুর হয়ে এগিয়ে চলেছে অনন্ত উৎসারে। পিছন ফিরে তাকানোর অবসর নেই। থাকবে কোথা থেকে? প্রত্যেক মানুষ তো স্বয়ংসম্পূর্ণ। বাল্মীকি দাদু লবকুশকে বারংবার স্মরণ করে দিয়েছে, এই পৃথিবীতে সব মানুষ নিজের মধ্যে একা এবং পূর্ণ। প্রত্যেকেই আলাদা। নিজের আনন্দ, সুখ, তৃপ্তি, স্বাধীনতার অন্বেষণ করে বেড়াচ্ছে। জীবনটা আসলে নদীর মোহনার মত। চারদিক থেকে নানা ঘটনা স্রোত এসে মিলছে। তাদের দু'ভাইয়ের জীবনও কম আশ্চর্যের নয়। কত মানুষের, কত রকম ঘটনার মিছিল এক জীবনে, কত কর্মের আহ্বান, কত অভিনব সংগ্রাম তবু কি দুরন্ত তৃষ্ণা একটু পিতৃস্নেহ লাভের জন্যে।

অথচ এ প্রকৃতিলোক কোন কিছুর জন্যে থেমে নেই। উদার আকাশ সীমানা হারিয়ে ফেলেই যেন সুখী; সমুদ্র যেন বিপুল হর্ষে, উন্মত্ত উচ্ছ্বাসে যতদূর খুশি চলে যায়, বনস্পতি নিজের পরিচয়ের জোরে সগর্বে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে এবং অন্যদেরও আশ্রয় দিচ্ছে। মানুষ হয়ে উঠতে হলে এই পরিচয়টাই বড়।

তবু মাঝে মাঝে বুকের ভেতরটা চিনচিন করে। কি যেন তাদের নেই। কি যেন হারিয়ে গেছে। অথচ খোঁজার অভ্যাসটা রয়ে গেছে। নিছকই একটা কৌতূহল। কিন্তু বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে কৌতূহলও মরে গেল। নিদারুণ অভিমানে পিতার কথাটা ভুলেও মনেতে ঠাঁই দিত না। যে পিতা তাদের চায় না, তার কথা ভাববে কেন? পিতার আদর স্নেহ সান্নিধ্য ছাড়াই তো বড় হয়েছে। বাকি জীবনটাও পিতার কোন দরকার নেই। কি দরকার পিতার? পিতৃপরিচয় হল মানুষের অভ্যাসের ঘরে নিরাপদে বাস করা। পিতৃপরিচয় কিছুই দেয় না জীবনকে। নিজের পরিচয় নিজেকে তৈরি করতে হয়। নামী দামী ক্ষমতাশীল প্রভাবশালী বিখ্যাত ব্যক্তির পুত্র হওয়া পাপ। পিতার জ্যোতির পাশে পুত্রের সব ব্যক্তিত্ব এবং ক্ষমতা মিটমিট করে। পিতার পরিচয়ই ঢেকে দেয় তার সব কীর্তি ও কৃতিত্বকে। তখন কীর্তিমান হয়েও তাকে হা-হুতাশ করে কাটাতে হয়। তারা কোন আলাদা সম্মান কিংবা স্বীকৃতি পায় না। তাদের বাল্মীকি দাদু অযোধ্যাপতি রামচন্দ্রের জীবনের একটা সুন্দর ঘটনা দিয়ে জিনিসটা ব্যাখ্যা করেছিল। লবের মস্তিষ্কের মধ্যে ঝলক দিল সেই গল্প।

দশরথের বীরত্ব খ্যাতির পাশে রামচন্দ্রের ব্যক্তিত্ব কৃতিত্ব ক্ষমতা কিছুতে স্বীকৃতি পাচ্ছিল না। তাই রামচন্দ্র হা-হুতাশ না করে নিজেই সেই বন্ধন কেটে বেরিয়ে গেল বিশ্বামিত্রের সঙ্গে। নোঙর ছিঁড়ে রামচন্দ্র সেদিন যদি বেরিয়ে না পড়ত তা-হলে এই ভুবনবিজয়ী রামচন্দ্র হয়ে উঠতে পারত

না। রামচন্দ্র শ্রেষ্ঠ বীর, আদর্শবান রাজা তবু তার প্রতি লবকুশের কিছুমাত্র শ্রদ্ধা নেই। জানকীর প্রতি স্ত্রীর কোন কর্তব্য করেনি রামচন্দ্র। নিজের উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করতে জানকীকে তার দরকার ছিল। সেই প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে আসন্নপ্রসবা জানকীকে শ্বাপদসংকুল বনে নির্বাসিত করতে তার একটুও কষ্ট হয়নি। তারপর থেকে জানকী নিখোঁজ। কেউ তার খোঁজ জানে না। রামচন্দ্র নিজের সুখকে নিয়ে বেঁচে থাকতে গিয়ে জানকীর জীবনকে নষ্ট করে দিয়েছে। তবু স্বামীর প্রতি ছিল না কোন অভিযোগ। মুখে না বললেও মনে মনে, নির্বাসনের সময়েও বলেছে তুমি যাতে খুশি হও তাই কর। তুমি ভাল থেকো। আনন্দে থেকো। এই আমি চাই। এটুকু হলেই আমি সুখী। লবের খুব আশ্চর্য লাগে, জানকীর মত কেন সব ভারতীয় নারী এক অসীম ক্লান্তিকর অভ্যাসের মধ্যে বাস করে। এই অভ্যেসের ভেতর কোন আনন্দ নেই। জীবনের আলো পৌঁছয় না সেখানে। জীবনার শূন্য পাত্রের সামনে দাঁড়ানো গরুর মত বেঁচে থেকেই, তারা বলে বেঁচে গেলাম। ভারতীয় নারীদের এই আনন্দবোধ কেমন অদ্ভুত। সুখকে কল্পনা করেই তারা বেঁচে থাকতে ভালবাসে। জননী অন্তত তাদের থেকে একটু আলাদা। এজন্যই লবের ভাল লাগে। অপমান অনাদর অবহেলা সয়ে নয়, জীবনের নোঙর ছিঁড়ে বাঁচাকে ভাল মনে করেছে। ভন্ড মিথ্যাচারী অত্যাচারীর স্বামীর জন্য কিংবা প্রেমিকার জন্য অত্যন্ত মূল্যবান জীবনকে অপচয় করেনি; মিছিমিছি নষ্ট হতে দেয়নি। পুরুষের সহযোগিতা ছাড়াই যে নিজের গন্তব্যের দিকে, নিজের প্রকৃত সুখের দিকে, জীবনকে ভরপুর করে এগিয়ে যাওয়া যায়, নিজের জীবন দিয়ে এই কথাটা প্রমাণ করল জননী। এই দৃঢ়তা, সাহস, ব্যক্তিত্ব, তেজ লবকে শ্রদ্ধাশীল করে। মায়ের প্রতি আরো অনুরক্ত করে তোলে। তার জননী যে সকলের থেকে আলাদা, একটু স্বতন্ত্র—এই গর্বে বুক ভরে থাকে। অষ্টাদশ বর্ষীয় তারুণ্যের বলিষ্ঠ সাহস আর নির্ভয় ব্যক্তিত্ব দিয়ে লব জীবনের নতুনত্বকে অনুভব করে। তাকে স্বীকার করে। অসহায়ের মত হেরে যায়নি জননী, কিংবা হেরে যাওয়ার গ্লানিতে জ্বলে পুড়ে নিঃশেষ হয়েও যায়নি, এটাই বড় মনের পরিচয়। কোন রহস্যের আড়ালে ঢাকা পড়ে যায়নি। তাঁর ব্যক্তিত্ব সত্যই অসাধারণ। তপোবনের সকলে তাকে আশ্রমিকা মা বলতে অজ্ঞান। ওটাই তার মায়ের নাম বলে জানে তারা। জননীর প্রকৃত নাম নিয়ে কোনদিন মাথা ঘামানো দরকার হয়নি। তবু কৌতূহল বড় সাংঘাতিক জিনিস। মাঝে মাঝে মনে হয় এই নামের গভীরে যেন একটা লুকনো রহস্য আর দুঃখের কাহিনী জমা হয়ে আছে। সেই দুঃখের সাগর বোধ হয় এই সান্ধ্য মুহূর্তে তার বুকে তোলপাড় করছে। তাই হয়ত এমন বিষণ্ণ, গম্ভীর।

কুশ একটু দেরিতেই আশ্রমে ফিরল, জননীর কুটীরের দিকে এগোতে দৃষ্টি পড়ল লবের উপর। লবকে মনে হল সম্মোহিত। আর; জননী প্রস্তরমূর্তিবৎ অন্ধ বধিরের মত একটি খুঁটিতে পিঠ দিয়ে চুল এলো করে বসে আছে। নিজের চিন্তায় আত্মসম্মোহিত ভাব। তার অপলক চোখের দৃষ্টি আকাশে সন্ধ্যাতারার দিকে স্থির। আর ঈষৎ খোলা ঠোঁটের ফাঁকে ঝকঝক দাঁতের উপর তার দৃষ্টি নেমে এল। এরকম একটা রহস্যের সম্মুখে গভীর জিজ্ঞাসায় ভুরু টানটান করে অপলক চোখে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল কুশ। নিঃশ্বাস বন্ধ করে দম আটকানো এরকম পরিবেশে চুপ করে প্রতীক্ষা করা কষ্টকর। তার নিজেরও মন খারাপ করছিল। চোখেমুখে একটা অস্থিরতা দেখা দিল। অথচ এরকম একটা উদ্ভুত অবস্থার মধ্যে তার কোনো ভূমিকা নেই। কুশের মনে হল, দুজনের চোখের তারায় অপরাধের নিবিড় ছায়া ঘন হয়ে উঠল। একজন দীন চোখে চেয়ে আছে। অন্যজন মুখ ফিরিয়েও দেখছে না।

কুশ থমকে দাঁড়াল। নিজের ইচ্ছায় নয়, ওর পা দুটো যেন কেউ ধরেছিল। এক অভূতপূর্ব অসহায়তার মধ্যে কয়েকমুহূর্ত কাটল। তারপরেই তার উদ্বেগের রূপ বদলাল। প্রাণের উদ্বেলতা ভাসিয়ে নিয়ে গেল সব কিছু। খুব সন্তর্পণে পিছু হেঁটে বনস্পতির আড়ালে লুকোল। কুশের মস্তিষ্কের কোষে কোষে স্বর্ণ হরিণের বিভ্রম সৃষ্টির সেই মজার গল্প সহসা তার কৌতুকপ্রবণ মনকে নাড়া দিল। কুশের গলা থেকে স্খলিত অস্পষ্ট শব্দ উচ্চারণ হল : ভাই লব রক্ষা কর প্রাণ গেল। লব-অ-অ। বহুদূর থেকে কণ্ঠস্বর যেরকম শোনায়, সেরকম গলা করেই ডাকল।

কুশের আর্ত কণ্ঠস্বর লব ও সীতার মৌন-আচ্ছন্নতার ওপর আছড়ে পড়ল। একসঙ্গে চমকে উঠল দুজনে। ছুটে যাবার জন্যে উঠে দাঁড়াল সীতা। লবকে দেখে থমকে গেল। হৃৎপিন্ডের সব উদ্বেগকে কণ্ঠে সংহত করে প্রশ্ন করল: অন্ধকারে অপরাধীর মত এমন চুপ করে দাঁড়িয়ে কেন বাবা? কি হয়েছে কুশের?

লবের দুই চোখে দিশাহারা ভাব। সীতা তার দুই বাহুমূল ধরে ঝাঁকুনি দিল। কণ্ঠস্বরে তার উদ্বেগ। বলল: চুপ করে কেন? বল, কি হয়েছে কুশের?

লব বুঝতে পারে না। ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকল। অনুভবের ক্ষমতা ছিল না তখন। মস্তিষ্কও কাজ করছিল না। অসহায় দৃষ্টিতে জননীর দুই চোখের তারার দিকে চেয়ে রইল। অন্ধকারে সীতার মুখ ভাল দেখা যাচ্ছিল না, তবু সে চেয়ে রইল। মাথা নাড়ল। যার অর্থ, জানি না।

উদ্বিগ্ন উৎকণ্ঠায় সীতার হৃৎপিন্ড গলার কাছে উঠে এল। কোনরকমে উচ্চারণ করল: কুশের কি হয়েছে বাবা? মন খারাপের সময় নয় এখন। তাকে না নিয়ে তো কোনদিন একা ফিরে আসিস না? আজ কেন এমন হল লব?

লব থমকিয়ে গেল। তার সারামুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমল। অবাক বিভ্রান্ত চোখে সে অন্ধকারের দিকে তাকাল। তারপরেই দৌড়তে উদ্যত হল। কয়েক পা গেলও।

কুশ চমকে দিয়ে লবকে জড়িয়ে ধরল। বলল? এই তো আমি। কি সুন্দর একটা মজা করা গেল বল তো?

কুশ? সীতার স্বস্তিসূচক শব্দে তীক্ষ্ণ ভর্ৎসনা করে বলল: ছিঃ! এ কী ধরনের কৌতুক তোমার!

কুশের মুখে হাসি লেগেছিল। বলল: এসে দেখি তোমরা মুখ আঁধার করে বসে আছ। লব অপরাধীর মত থম ধরা একটা কষ্ট নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, আর তুমি? কেমন যেন উদাস অন্যমনস্ক হয়ে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বসে আছ। এসব ভাল লাগে কার? তাই গুমোট ভাবটা কাটিয়ে উঠতে মারীচের স্বর্ণ মৃগয়ার গল্প মনে পড়ল। মারীচ নিজের প্রাণের মূল্যে রাম লক্ষ্মণের ভ্রাতৃপ্রেমকে চিরন্তন করে রাখল। এ দিনটা আমাদেরও স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

রামচন্দ্রের কথায় সীতার আত্মবিস্মৃতি ঘটল। তাকে সহসা গম্ভীর হতে দেখে কুশ একটু বিব্রত হল। তাড়াতাড়ি মায়ের একখানা হাত ধরল। হাতখানা তার খুব ঠান্ডা ভেজা এবং কম্পিত। মৃদুস্বরে বলল : মা তুমি ভয় পেয়েছ খুব, তাই না? লবও ভয়ে কী রকম ঘেমে উঠেছে দ্যাখ।

বাল্মীকি ঘাড় হেঁট করে পুঁথি রচনা করছিল। সীতা চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল তার পাশে। আর, তখনই রামচন্দ্রের কথা খুব বেশি করে মন পড়ল। রামচন্দ্র কেমন আছে এখন? তার কথা ভাবে কখনও? রামের কি তার জন্য খুব কষ্ট হয়? কে জানে? হয়তো জেনে গেছে তার প্রাণের বৈদেহী বেঁচে নেই। কোনদিন তাকে খুঁজেছে কি সে? সন্তানের কথাও কি মনে হয়নি তার? তাই বা হবে কেন? রামচন্দ্রের কাছে তার নিজের অস্তিত্বটাই মুছে গেছে। কিন্তু সে কথা জেনে রামচন্দ্রের কষ্ট কিংবা দুঃখ খুব বেড়ে গেছিল কি? পরক্ষণেই মনে হল, এসব কথা ভাবাই মিছে। ভেবে লাভ কি? রামের কাছে সে মৃত। সেখানে ফেরার কথা আর ভাবে না, ফেরার রাস্তাও বন্ধ তার। সীতার শূন্যস্থান পূর্ণ করতে প্রমোদকক্ষের সুরা নারী আছে রামের। সুরায় মাতাল হয়েই হয়ত নিজেকে ভুলোয়। ঘুমোয় না। হয়ত একাকী বসে রাত কাটায়। ভালবাসার কাঙাল মনটা তখন কি তার মুখখানা মনে মনে কল্পনা করে? কি জানি? মুখ বিকৃত করল সীতা। তার বুকের গভীর থেকে যন্ত্রণায় উৎসারিত হল একটা লম্বা দীর্ঘশ্বাস।

দীর্ঘশ্বাসের শব্দটা তীরের মত এসে বিঁধল বাল্মীকির বুকে। চমকানো বিস্ময়ে তাকাল। নির্বাক পাষাণ মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে সীতা। এক গভীর জিজ্ঞাসায় ভুরু টান টান হল। উৎকণ্ঠায় ত্রস্ত হয়ে বলল : তুমি কিছু বলবে মা-মণি?

সীতা ধরা পড়ার ভয়ে ভীত অপরাধীর মত দ্রুততায় বলল: পিতাজী সর্বক্ষণ পুঁথি নিয়ে আছ। তোমাকে দু'দন্ড কাছে পাওয়ার উপায় নেই। তুমি লব-কুশ সব্বাই ব্যস্ত। কেবল আমার কোন কাজ নেই, দায়িত্ব নেই। সময় কাটে না। বড় একা দুঃসহ লাগে।

বাল্মীকি সীতার মনে তল খোঁজার চেষ্টা করল। বুঝতে অসুবিধা হল না তার অতীত ঘটনার কোথায় যেন একটা ধাক্কা লেগেছে। তার স্নেহপ্রবণ অন্তঃকরণ টলটল করে উঠল। বিষণ্ন মুখে হাসি আরো একটু বিস্তৃত করে বলল : আমার কি চোখ মন বলে কিছু নেই? কিন্তু এখন হল অনুশীলনের কাল। আরো কত ত্যাগ করতে হবে কে জানে? তবে, আর বেশিদিন নয়। তারপর আশপাশ সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে একটু দেখে নিয়ে বলল : একে যুদ্ধ বলে?

ঘটনার আকস্মিতকায় সীতা চমকাল। বিষণ্ন মুখে চকিতে একটু রক্তের ঝলক লাগল, এবং চোখেও। জিজ্ঞাসা নিবিড় দুই চোখে বাল্মীকির দিকে তাকিয়ে বলল : পিতাজী, তুমি যেভাবে শুরু করছ, তার শেষ কোথায় এবং কিভাবে হবে, জানি না। বলতে বলতে সীতার দৃষ্টি এবং কণ্ঠস্বর কেমন বদলে গেল। তার গম্ভীর বিষণ্ন মূর্তিরও পরিবর্তন হল।

বাল্মীকির ভুরু কুঁচকে গেল। বিজ্ঞের মত একটু হাসল। উৎকণ্ঠা দূর করতে স্পষ্ট করে সীতার দিকে চেয়ে বলল: সব কাজের আরম্ভটা চোখে দেখা যায়। শেষটা সুপরিকল্পিত কর্মের সিঁড়ি ভেঙে পৌঁছতে হয়। নিষ্ঠার সঙ্গে কর্ম করা আর সযত্নে স্বার্থ রক্ষা করা হল জয়ের চাবিকাঠি।

সীতা একটু চিন্তিত গলায় বলল : আমার ভীষণ ভয় করছে।

বাল্মীকির মুখে অনাবিল হাসির স্নিগ্ধতা। বলল : ভয় কিসের মা?

তোমাকে ঠিক বোঝাতে পারব না। আর কেউ না জানলেও, তুমি তো জান, এ লড়াই পিতার সঙ্গে পুত্রের।

বাল্মীকির কণ্ঠস্বর অকস্মাৎ প্রতিবাদে দৃঢ় ও গম্ভীর হল। বলল : না। এ হল শাসক শক্তির সঙ্গে বঞ্চিত অত্যাচারিত শোষিত মানুষের বেঁচে থাকার লড়াই। পিতা-পুত্র সম্পর্কের সংকীর্ণ পরিচয় এখানে খাটে না। ঘটনাচক্রে এখানে তারা দুই বিবদমান পক্ষ। এ হল অদৃষ্টের বিচার। উভয়ের মত, পথ, নীতি, ধর্মবোধ আলাদা। একেবারে দুই মেরুর মানুষ। তাদের মেলানো যায় না। রামচন্দ্র যা করেছে তার দাম তো ষোল আনা তাকেই দিতে হবে।

পিতাজী! অন্তরে জমানো উদ্বেগ উৎকণ্ঠা থেকে উৎসারিত হল সীতার চমকানো ডাক। আচমকা একটা অনুভূতি হল। উদাস গলায় স্তিমিত কণ্ঠে বলল: সত্যিই দাম মানুষ দেয়? অদৃষ্টের কোন দাম বিধাতাকে দিতে হয় না? পুত্র পিতাকে চেনে না, পিতা জানে না তার পুত্র কে? নিজের দেশ, জাতি রাজা আত্মজন থেকে তাদের আলাদা করে রাখল কে? অযোধ্যাপতিই তো। সুতরাং এর যত মূল্য সব দিতে হবে অযোধ্যাপতির স্ত্রী-পুত্রকে। প্রাগৈতিহাসিককাল হলে মানুষ এই মূল্য নিয়ে মাথা ঘামাত না, মন খারাপ করত না। কারণ আত্মজন পরিবার পরিজন বলে তখন কেউ ছিল না। সে হল জঙ্গলের জীবন। কিন্তু সময়ের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কও কত বদলেছে। তবু সেই জঙ্গলেই আমরা বাস করছি।

বাল্মীকি সীতার বিপন্ন অসহায়তার দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে থেকে একটু হাসল। বলল: কিন্তু ভেতরটা বাইরের মত বদলে যায় না দ্রুত, এত কান্ডের পরও শ্রীরামের প্রতি তোমার দুর্বলতা একটুও কমেনি। এজন্য তোমাকে দোষী করছি না। এক সময়ের সাথী হিসেবে মনের সম্পর্ক তো থাকবে।

আমি তো মেয়ে। অভ্যাসের ঘরে বাস করি। সেখান থেকে জীবনের আলোয় ফেরা বড় যন্ত্রণার। কৃত্রিম সুস্থতা থেকে সত্যকার সুস্থতায় ফেরা কিংবা আরোগ্য পাওয়া কষ্টকর হয় কখনও?

বাল্মীকির গলার স্বরে এমন কিছু ছিল যে, সীতা জবাব দিতে পারল না। চুপ করে রইল।

আশ্রমে রামায়ণ গান হচ্ছিল তখন। তার সুর কেবলই সীতাকে অন্যমনস্ক আর উদাস করে দিচ্ছিল। মানুষের মনের ধর্ম হল হাওয়ার মত, জলের মত, সীমানার মধ্যবর্তী কোন এলাকায় শূন্যতা সৃষ্টি হলে স্বাভাবিক নিয়মে পারিপার্শ্বিক থেকে সেই শূন্যতা পূরণ করত ছুটে আসে তার

অতীত। আশ্রমের রামায়ণ গান শূন্যতা পূর্ণ করতেই যেন সীতার মনকে ছেয়ে ফেলল।

লবকুশ আশ্রমের ছেলে এবং বনের কালোমানুষদের সঙ্গে মিশে রামায়ণ গান গাইছিল। গানের কথাও স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিল সীতা। তাদের অভিনয় এবং নৃত্য দেখতে পাচ্ছিল।

অভিনয়ের ভঙ্গিতে লব বিশাল হরধনুর সামনে করজোড় করে দাঁড়িয়েছিল, যেমন রামচন্দ্র ছিল। লবের দুই চোখে পূজারীর বিভোর বিহ্বলতা, মুখে বিনম্র শ্রদ্ধার ভাব। সীতার স্মৃতি ছুঁয়ে গেল। এক সুদূর অতীত তার চোখের তারায় ভেসে উঠল কয়েক মুহূর্তের জন্য। নৃত্যের ছন্দে লব এক কাল্পনিক হরধনু প্রদক্ষিণ করল। তারপর আস্তে আস্তে সেটা উত্তোলনের ভঙ্গি করল। মূক অভিনয় করে ধনুতে গুণ লাগানোর সময় মুখ চোয়াল শক্ত হল, হাতের পেশী ফুলে উঠল, হঠাৎ ধনু ভেঙে গেলে রামচন্দ্র যেমন চমকে উঠেছিল, লবও তেমনি গা ঝাড়া দিয়ে হাসল। জনকের ভূমিকায় কুশ মহোল্লাসে বলল: ধন্য ধন্য রামচন্দ্র। হরধনু ভঙ্গ করে প্রমাণ করলে এদেশের মাটি থেকে বীর্যবলে তুমি শৈব ধর্ম উৎখাত করতে পারবে। তোমাকে আমার অদেয় কিছু নেই। আজ আমার মহা আনন্দের দিন। বড় খুশির দিন। কার্যত বীর্যবান অনার্য নরপতিদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে আমি বন্দীর মত আছি। সীতাকে পণ রেখে আমি সেই বীরের সন্ধান করছি। কিন্তু কোন আর্য নরপতির হরধনু ভাঙার দুঃসাহস হয়নি। সিংহবিক্রমে তুমি যে একদিন অনার্য সাম্রাজ্য ধ্বংস করে এক নতুন ভারতবর্ষ গড়ে তুলবে এই প্রত্যয় নিয়ে বৈদেহীকে তোমার হাতে সমর্পণ করছি। আমার দুঃখ এই যে তোমার মত বীরের যোগ্য সম্মান ও সমাদর দেখানোর কোন উপযুক্ত ব্যবস্থা করতে পারিনি। এই সভাকক্ষ যথেষ্ট নয়, স্বয়ম্বর সভাই বীরবরণের যোগ্য স্থান। তবু বিশেষ কারণে, খুব গোপনে পণরক্ষার এবং বীরবরণের কাজ করতে হল। বৎস, বীরভোগ্যা নারী। কন্যা জানকীকে আমি আর্যসাম্রাজ্যের স্বার্থে তোমার মত যোগ্য বীরের হাতে সম্প্রদান করতে পেরে কৃতার্থ। তুমি বৈদেহীকে গ্রহণ করে ধন্য কর আমায়।

সীতার মস্তিষ্কের কোষে কোষে সমস্ত অতীতটা চমকে উঠেছিল। সে লবকে নয় রামচন্দ্রকে দেখছিল। কিছুক্ষণের জন্য ভীষণ অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। চোখের ওপর দৃশ্যগুলো সে দেখছিল এবং গান শুনছিল। কিন্তু তাতে তার মন ছিল না।

হঠাৎ রে-রে করে ছুটে এল একজন বিশাল চেহারার মানুষ। অমনি চমকে সীতা সেদিকে তাকাল। লোকটা শম্বুকের বিশ্বস্ত অনুচর আতঙ্ক। কুঠার হাতে পথ আগলে দাঁড়াল। রাগে ঘনঘন মাথা নাড়াচ্ছিল দুই চোখ আগুনের গোলার মত জ্বলছিল। হঠাৎ যেন অরণ্যের ঘুম ভাঙিয়ে কেশর ফুলিয়ে জেগে ওঠল পশুরাজ। পরশুরামের ভূমিকায় আতঙ্ক হুংকার দিয়ে বলল : কোথায় যাচ্ছ রামচন্দ্র? এ হল শৈব ভূমি। এদেশের মেয়েকে চোরের মত চুপি চুপি কোথায় নিয়ে চলেছ? * আমাদের মেয়েকে তস্করের হাতে দেব না। তোমরা দস্যুর জাত। লুণ্ঠন হরণ তোমাদের জাতের ধর্ম। তোমরা বিদেশী। পরস্ব অপহরণকারী। আমাদের বিশ্বাস সরলতার কোন মূল্য তোমরা দাওনি। তোমাদের আমরা বিশ্বাস করি না। শৈবদের শত্রুর চোখে দেখ তোমরা। আমাদের দেশের মেয়েকে তোমরা যে শ্রদ্ধা করবে না, মর্যাদা দেবে না সে আমরা জানি। তোমার ঐ বিয়ে বিয়ে খেলায় বাদ সাধতে এসেছি। তুমি আমাদের বোকা বানিয়ে চলে যাবে তাও হবে না। আমার হাতেও হরধনু আছে। এ হল শক্তি দম্ভ, ক্ষমতার প্রতীক। হরধনু ভাঙা যায়, কিন্তু অনার্যদের গৌরবকে মুছে দেওয়া যায় না।

কথা শুনে সীতা চমকে উঠল। বুকের মধ্যে কি একটা তরঙ্গ বয়ে গেল। আতঙ্ককে পরশুরাম মনে হল না। আতঙ্কের ভেতর বনের জংলি কৃষ্ণবর্ণ মানুষটা তার অধিকারবোধ নিয়ে যেন জেগে উঠল। তাই অভিনয় এত জীবন্ত ও বাস্তব। পরশুরাম আর পরশুরাম নেই আতঙ্ক হয়ে গেছে। কেমন একটা স্বপ্নাচ্ছন্ন চোখে সীতা নিষ্পলক চেয়েছিল, শূন্য দৃষ্টি। এক মায়াবী আলো যেন ঘিরে আছে তার মুখমন্ডলে।

নিজের ভাবনার গভীরে ডুবে গিয়ে সে শ্বাস ফেলল। অজানিতে অন্যমনস্কভাবে বলল: পিতাজী সত্য যা এমনি অমোঘভাবেই হঠাৎ প্রকাশিত হয়ে পড়ে। অভিনয় কথা বলে, জীবন্ত হয়।

নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারানো সীতা বলল : এই রামায়ণ গানে তুমি কোন অস্ত্রে শান দিচ্ছ?

---

* রামায়ন কথা—সুকুমার সেন

কেন দিচ্ছ, কার স্বার্থে? স্নেহবশে তুমি স্বজাতিদ্রোহী হবে?

বাল্মীকি মাথা নাড়ল। একটু হাসল। আস্তে আস্তে তার ভিতরটা কঠিন হতে লাগল। দানা বেঁধে উঠল প্রতিরোধের যুক্তি ও বাক্য। বলল : আমি আর্য নই। নিষাদের ছেলে। একদিন দস্যুতা করেছি। হঠাৎ বোধোদয় হল। জ্ঞানহীনতা থেকে জ্ঞানে ফেরার জন্যই সংসার লোকালয় ত্যাগ করেছি। বেদজ্ঞ হতে পেরেছি। ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেছি। সাধনালব্ধ এই ফল আর্য মুনি ঋষিরা শুধু নিজেদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছিল। অন্যজাতের মানুষের তাতে অধিকাব ছিল না। তাই নানা অদ্ভুত অলৌকিক গল্প ফেঁদে তারা আমার আর্যীকরণ করল। বলল : আমি দশম প্রচেত। একজন ব্রহ্মজ্ঞ ঋষির কামজ পুত্র। রহস্যাবৃত এই জন্মপরিচয় নিয়ে এক বিভ্রান্তি সৃষ্টি হল। আমি কে? কোন বংশে জন্ম? সত্যই কি আমি আর্য? তা হলে নিষাদের ঘরে প্রতিপালিত হলাম কেন? কেন ব্যাধের মত জীবন যাপন করলাম। তবু অনার্য রমণীর পুত্রকে আর্যকরণ করা হল। কিন্তু আর্যঋষির মর্যাদা গৌরব দায়িত্ব পেলাম কৈ? কাব্যচর্চায় নিমগ্ন থাকায় এসব ছোট ছোট ব্যাপারে মাথা ঘামাইনি। শম্বুক আমার চোখ খুলে দিল। তোমার নির্বাসন আমাকে ভাবিয়ে তুলল। তার মৃত্যুতে আমি দায়িত্বশীল হলাম। শম্বুকের আরব্ধ কাজ শেষ করতে কে যেন আমাকে ভেতর থেকে নির্দেশ দিল। জংলি কালো মানুষগুলোর ভেতর আমার অর্ধসভ্য, আরণ্যক জীবনকে খুঁজে পাই। আমার চারপাশের পরিবেশকে দেখি। জীবনটা গাঁথা হয়ে আছে বনের মানুষের জীবনযাত্রার সঙ্গে। এই অরণ্য, আদিবাসী এরাই তো আমার সব এদের সঙ্গেআমার শিকড় গাঁথা। আমার মাতা ভ্রাতা ভগ্নী স্ত্রী বন্ধুবান্ধব সহকর্মী সবই তো এরা। এদের ছেড়ে আমি যাব কোথায়? বনের জীবন, অনার্য সংস্কৃতি, বিশ্বাস, দুঃখ অবহেলার সঙ্গে আমার মনের মিল। প্রাণের এই সম্পর্ক ভালবাসা আর্যদের সঙ্গে গড়ে ওঠল কোথায়? বাকি জীবনটা এদের স্বার্থে, ভাবনায় কাটালে দোষ কি? লব কুশের কথা বলবে? পিতার কাছে তারাই বা কী পেল? এই অরণ্য পরিবেশ তাদের ছায়া দেয় আহার দেয়। বনের কালো মানুষ তাদের খেলার সাথী, বিশ্বস্ত বন্ধু এবং সহকর্মী। এদের সঙ্গে তাদের মনের মিল। এদের ছেড়ে কোথায় যাবে? এত ভালবাসা পাবে কোথায়? এসব অবজ্ঞা করে অকৃতজ্ঞ হওয়ার শিক্ষা তো আমি দিতে পারব না। আমি মনে করি, তারা কোন অন্যায় অধর্ম করবে না। মানুষের মত বাঁচার অধিকার তো আর যুদ্ধ করতে, হিংসা করতে, রক্তক্ষয় করতে শেখায় না। তবু মনটা কলুষিত হয় স্বার্থে, বিভেদে, বিদ্বেষে, ঘৃণায়, ক্ষোভে। লবকুশ আর্য-অনার্যের বিরোধের মিলন সেতু।

সীতার চোখেমুখে তবু একটা আতঙ্কের ভাব ফুটে ওঠল। আমতা আমতা করে বলল : কিন্তু তবু সংঘর্ষের একটা ক্ষেত্র তৈরি হচ্ছে বৈকি?

বাল্মীকি একটু হেসে বলল : মাটির সংস্পর্শ ছাড়া তো চাকা এগোয় না মা। এই সংস্পর্শের ফলে চাকা ও মাটির নিরন্তর সংঘর্ষ হচ্ছে, আর তাতেই চাকাটা এগিয়ে চলছে। তাই সংঘর্ষ মানেই বিরোধ নয়, যুদ্ধ নয়। সংঘর্ষ হল এগোনোর উপায়। আমার রামায়ণ গান পথ চলার গান। শম্বুকের মত রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ আর বীভৎস মৃত্যুর আতঙ্ক ছড়ানো আমার পথ নয়, আমি গানের ভেতর দিয়ে মানুষের মনের দরজা খুলে দেব। লব কুশের সুকণ্ঠ সেই দ্বার খুলবে। কথা যেখানে পৌঁছয় না, গান মানুষকে সেখানে নিয়ে যায়। মর্মের ভিতর সুরের রেশ অনেকক্ষণ ধরে দ্রিমি দ্রিমি করে বাজে। কথার চেয়ে সুর মনকে বেশি স্পর্শ করে। কানের ভিতর দিয়ে মরমে পশিবে আকুল করিবে প্রাণ। সুরের সেই মায়া বিস্তার করতে আমার রামায়ণ গান রচনা।

কিন্তু এ গানে রামের মহিমা প্রকাশ পাচ্ছে কৈ?

বাল্মীকি চকিতে সীতার মুখের দিকে তাকাল। কিছুক্ষণ তার চোখের ওপর চোখ রেখে বসে রইল নিজের জায়গায়। একটু চিন্তা করে বলল: মহিমা তো হাতে গড়া জিনিস নয়, কর্মের ভেতরে প্রচ্ছন্ন থাকে। আগুন যেমন চাপা থাকে না, তেমনি কারো শ্রেষ্ঠত্ব, মহিমাকে মুছে ফেলা যায় না। রাবণের ভাবমূর্তি মুছে ফেলতে চেষ্টার কসুর হয়নি। তবু কৈ তার শ্রেষ্ঠত্বকে মোছা গেল? রাবণের ধ্বংস ও মৃত্যু কামনা করে রামচন্দ্র যে যজ্ঞানুষ্ঠান করল তার ঋত্বিক স্বয়ং রাবণ। শত্রুর ইচ্ছে পূরণের জন্য নিজের মৃত্যু ও ধ্বংস কামনা করে কেউ যজ্ঞ করে শুনেছ? পৃথিবীতে এরকম

মহাপ্রাণ রাবণ ছাড়া আর দ্বিতীয় নেই। একেই বলে মহিমা।

সীতা কথা বলতে পারল না। রাবণের কথা শুনে আচমকা একটা অনুভূতি হল। স্তিমিত গলায় বলল: জানি। তবু মায়া হয় মানুষটার ওপর। অনেককালের সম্বন্ধ তো। ভুলতে পারি না। কঠোর হতেও কষ্ট হয়। আমি মেয়েমানুষ।

বাল্মীকি হেসে বলল : রামচরিতের মহিমা কীর্তন করে গণ-জাগরণের ভূমিকা করছি শুধু।

সীতার অসহায় দুই চোখে আর্তি ফুটে বেরোল। উদ্বিগ্ন কণ্ঠে ডাকল: পিতাজী। আমার বুকের আধখানা শম্বুকের জন্যে হাহাকার করে, আর আধখানা স্বামীর জন্য কাঁদে।

. জানি। তোমার উদ্বেগেরও কোন কারণ নেই। আদিবাসীদের শিক্ষাদীক্ষা, জীবনের অভিজ্ঞতা খুব কম। সরলতা, বিশ্বাস, সাহস তাদের দুর্বলতা। সেই দুর্বলতার মুক্তি ঘটানো দরকার আগে। তারা দেশ, জাতি, ধর্ম সংস্কৃতি ঐক্য এসবের মর্ম বোঝে না। অর্থ জানে না। দেশ কি, দেশের মানুষের সঙ্গে একজন নাগরিকের সম্পর্ক কি, নাগরিক হিসেবে প্রত্যেকের দায়িত্ব কর্তব্য কি? অধিকার কি? অধিকার রক্ষার জন্য চাই ঐক্যবোধ, দৃঢ়তা, শক্তি, সাহস, প্রত্যয়—এ সব ধারণাগুলো রামায়ণ কথা দিয়ে তাদের কাছে সহজবোধ্য করে তোলা। এতে সত্য রক্ষা পেল, আবার জাতীয়তাবোধের একটা বাস্তব অনুভূতিও হল। এমনি করে জনশিক্ষার বাহন হয়ে উঠবে রামায়ণ গান।

এই কথাটা বড় কম নয়। তবু সীতার মন মানল না। কোনও প্রশ্ন করল না। বুকের ভেতর এক অপ্রতিরোধ্য অস্থিরতাকে টের পেল। শরবিদ্ধ হরিণের মত কাতর চোখে বাল্মীকির দিকে চেয়ে রইল।

হঠাৎ একঝলক হাওয়া এল অদ্ভুত এক হাহাকারের শব্দ নিয়ে। সীতার বুকের ভেতরটা কেমন হু হু করে উঠল। মনটাও খারাপ হয়ে গেল। দীর্ঘশ্বাস পড়ল খুব জোরে। বাল্মীকির বুকের ভেতর কেঁপে গেল। আস্তে আস্তে বলল সীতা : পিতাজী তোমার কথায় মন ভরল না। কেবল উদ্বেগ বাড়ল।

কেন মা?

এ প্রস্তুতি, সংগ্রামকে বাদ দিয়ে হয় না। যুদ্ধ হবেই। মানুষ অধিকার আদায়ের জন্য তৈরি। একটা আদর্শ নিয়ে তারা লক্ষ্যে পৌঁছতে চাইছে। এগুলি তো সংগ্রামের কৌশলগত দিক। সংগ্রামের প্রস্তুতি আছে, উত্তেজনা আছে অথচ সংগ্রাম নেই এ কেমন কথা? এসব ভুলে গেল এই প্রস্তুতির কোন মানে থাকে? অধিকারবোধ হল হঠাৎ পাওয়া ক্ষমতার সুরা। তাকে পান করে মত্ত হবার জন্য তো এত আয়োজন, চতুর্দিকে এত উন্মাদনা, তুমিও এসব বোঝ, তবু আমার কাছে লুকোচ্ছ।

বাল্মীকি হাসল। সেই হাসিতে মুক্তো ঝরে। মৃদু কণ্ঠে বলল: তুমি ঠিক, বলেছ মা-মণি। এসব হল বড় সংগ্রামের প্রস্তুতি। এরও একটা মানে নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু মাঝে মাঝে রক্তক্ষরা যুদ্ধকে এড়িয়ে নিরক্ত সংগ্রামেও যে একটা বিশাল জয় আদায় করা যায়, লক্ষ্যে পৌঁছানো যায় এ হল আমার সেই উদ্যোগ। আমার বিশ্বাস তাতে ভাল ফল হবে। বহুর কল্যাণ মঙ্গল এবং উন্নতি হবে। এই সংগ্রাম সাম্রাজ্যবাদী রাজার সঙ্গে অধিকার বঞ্চিত মানুষের সংগ্রাম নয় এ হল আধিপত্য স্থাপনের অভিযান। নিরঙ্কুশ সার্বভৌমত্ব অর্জনের জেহাদ। অযোধ্যার রাজপরিবারের মধ্যে সে জেহাদ বাধবে পিতা ও পুত্রের মধ্যে। স্বামী ও স্ত্রীতে।

সীতা চমকে উঠল ভয়ে বিস্ময়ে। চমকানো বিস্ময়ে আর্তস্বরে উচ্চারণ করল: পিতাজী।

বাল্মীকি নির্লিপ্ত। তার কোন ভাবান্তর নেই। এ হল অন্তর্বিরোধ। রামচন্দ্রের মনের অভ্যন্তরে সংগ্রামের সেই তাপ সঞ্চার করব। এক আত্মঘাতী অন্তর্যুদ্ধ সূচনা হবে সম্রাট রামচন্দ্রের সঙ্গে পিতা ও ভর্তা রামচন্দ্রের। যার থেকে তার নিস্তার নেই, পলায়নের উপায় নেই। এবার ভুবনজয়ী রামচন্দ্রের পরাজয় তার নিজের কাছে। আমার রামায়ণ গান সেই যুদ্ধ জয়ের হাতিয়ার।

সীতার দুই চোখে অবাক মুগ্ধতা। কথা বলতে পারল না। কিছু মুহূর্ত, কিছু স্মৃতি তরঙ্গের মত আছড়ে পড়ল বুকের তটে।

এগারো

অযোধ্যার রাজনৈতিক অস্থিরতা রামচন্দ্রকে স্বস্তিতে থাকতে দিল না। ভেবেছিল, উপজাতি বিদ্রোহের নায়ক শম্বুক নিহত হলে সব সংকট কেটে যাবে। কিন্তু তা হল না। যে ব্রাহ্মণদের পরামর্শে এবং সহায়তায় রামচন্দ্র বিশাল ভারতবর্ষে আর্য আধিপত্য বিস্তার করেছিল, তারা আর বশে ছিল না। প্রকৃতপক্ষে তারাই হয়ে উঠল সবচেয়ে রামচন্দ্র বিদ্বেষী। রামচন্দ্রের ভাবমূর্তি কলঙ্ক লেপন করতেও কুণ্ঠিত হল না। স্পষ্ট ভাষায় তার কার্যের সমালোচনা শুধু করল না, তীব্র ও কটুবাক্যে ভর্ৎসনা করল। অভিযুক্তও করল। রামচন্দ্রের সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ এখন প্রকাশ্য। দেশব্যাপী অরাজকতা এবং বিশৃঙ্খলার জন্য রামচন্দ্রকে দায়ী করল তারা। দায়িত্বজ্ঞানহীন রাজা বলেই প্রজারা কষ্ট পাচ্ছে। গোটা অযোধ্যার এক ভয়ংকর অবস্থা চলছে। পুত্রশোকাতুর এক ব্রাহ্মণ পিতা তো স্পষ্ট ভাষায় পুত্রের অকাল মৃত্যুর জন্য রামচন্দ্রকেই দায়ী করল। সমস্ত নাগরিকের প্রতিনিধি হয়ে বলল, রাজা থাকতেও অধিকাংশ মানুষ যদি মনে করতে শুরু করে যে রাজ্যে রাজা নেই, শাসন নেই, আইন নীতি বলে কিছু নেই, তাহলে সে তো জঙ্গলের রাজ্য, সে রাজ্যে মানুষ বাস করবে কি করে? যে রাজ্যের রাজা নিজের আসন্নপ্রসবা স্ত্রীকে হিংস্র পশুর মুখে ছুঁড়ে দেয় তাঁর মত নির্দয় প্রজাপীড়ক রাজার কাছে সুবিচারের প্রত্যাশা করে কেউ? আমাদের মত দুর্ভাগা কে আছে? রাজা থেকেও আমরা অনাথ। প্রজাদের অভাব-অভিযোগের কোন খোঁজই রাখেন না। তাদের দুঃখ, কষ্ট, অভাব অভিযোগের প্রতি মহান অযোধ্যাপতির কোন লক্ষ্য নেই। প্রতিকারেরও কোনো চেষ্টা নেই। একটু থেমে বলল: মহামান্য রাজাধিরাজ। অপ্রিয় বাক্য হলেও বলতে বাধ্য হচ্ছি, নৈরাজ্য সৃষ্টির জন্য আপনি দায়ী। রামরাজ্য মানেই দুর্ভোগের রাজ্য, অনাচার, অবিচার, বিশৃঙ্খলার রাজ্য। সুবিধাভোগীদের স্বর্গরাজ্য। রামরাজ্য নিয়ে গর্ব করার কিছু নেই। মানুষের দীর্ঘশ্বাস ভরা এক অভিশপ্ত রাজ্যের অধীশ্বর আপনি। আপনার পাপেই অযোধ্যার এই দুরবস্থা। *

রামচন্দ্রের সম্মুখে দাঁড়িয়ে এই কথাগুলো বুক ফুলিয়ে বলা কম কথা নয়। কথাগুলো হাওয়াতে গা ভাসিয়ে যেন রাজ্যময় ছড়িয়ে গেল। রামরাজ্য কটূক্তিতে পরিণত হল। এক অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্যে পড়ল রামচন্দ্র। শম্বুক নিহত হলে ব্যাপারটা চুকে যাবে ভেবেছিল। কিন্তু তা হল কোথায়? চিরকাল প্রজাদের পক্ষে এবং আর্যাবর্তের স্বার্থে সে দাঁড়িয়েছে বারবার। তবু কি সন্তুষ্ট হল তারা? রাজা ও প্রজার স্বার্থ পরস্পরবিরোধী— রামচন্দ্র একথা কখনো বিশ্বাস করে না। রাজা ও প্রজার পারস্পরিক সহযোগিতায় বিশ্বস্ততায় এবং আদর্শ পরিস্থিতিতে এক প্রজাতান্ত্রিক রাজ্য গঠন কোন অসম্ভব নয়, এরকম একটা উদ্যম নিয়েই কাজ শুরু করেছিল রামচন্দ্র। রাজা হবে আদর্শ শাসক, প্রজাও হবে আদর্শ প্রজা। দেশানুরাগী এবং রাজানুগত। রাজা রাজস্বের যতটা সম্ভব প্রজাদের কল্যাণে বিনিয়োগ করবে। আর প্রজা দেশের সম্পদ বাড়ানোর কাজে দেবে দেহের ঘাম, অন্তরের আনুগত্য, মস্তিষ্কের বুদ্ধি। এই হল আদর্শ রামরাজ্য গঠনের দর্শন। তাই রাজ্যের প্রধান শাসক হিসাবে প্রতিবেশী রাজায় রাজায় বিবাদ কলহ, প্রজায় প্রজায় বিরোধ ও বিদ্বেষ, শাসক ও শাসিতের ক্ষোভ, যথাসম্ভব আপসে মেটাবার চেষ্টা করে এসেছে। কিন্তু তবু কি প্রতিবেশী রাজা কিংবা প্রজা শুনেছে তার কথা? বরং তার আপোষ মনোভাবকে দুর্বলতা মনে করে এক শ্রেণীর লোক রাজায় রাজায় বিরোধ পাকিয়ে সর্বনাশের রাস্তা তৈরি করেছে। এদের হাত থেকে সাম্রাজ্যকে নিরাপদ করতে জনগণকে অনুগত রাখতে নিজের যশ, সম্মান প্রতিপত্তি বাড়াতে কিছু একটা করা জরুরী বোধ হয়।

নিজের কর্মপন্থাকে সফল করে তুলতে হলে অশ্বমেধ যজ্ঞ করা উচিত। অশ্বমেধ যজ্ঞ করলে যেমন বর্তমান পরিস্থিতি সামাল দেওয়া সম্ভব তেমনি যারা খানিকটা ঈর্ষা ও প্রচ্ছন্ন অবজ্ঞার ভাব দেখায় তাদেরও সুকৌশলে এড়ানো সম্ভব। সূক্ষ্ম কঠিন ক্ষুরধার পথে রামচন্দ্রের মেধা বিদ্যুতের মত জ্বলন্ত ক্ষিপ্রতায় কাজ করে।

রামচন্দ্র বিলম্ব না করে অশ্বমেধ যজ্ঞের সিদ্ধান্ত করল। ভারতবর্ষে অযোধ্যার সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার

* উত্তরকাণ্ডের অন্তর্গত ৭৩ সর্গ

এক নয়া ইতিহাস তৈরি হবে। নতুন উপায়ে অযোধ্যার সাম্রাজ্য গড়ার এক অভিনব উদ্যোগে ব্রতী হল রামচন্দ্র। অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্ব বহন করে আনবে রামচন্দ্রের সার্বভৌম প্রতিষ্ঠার বার্তা।

খবরটা চাপা ছিল না। বাতাসের বেগে ছড়িয়ে পড়ল দ্রুত। সীতা শোনা থেকে এক দারুণ উৎকণ্ঠায় দিন কাটাচ্ছিল। কিছু ভাল লাগছিল না। কেবলই মনে হচ্ছিল একটা কিছু ঘটবে। ভয়ংকর একটা কিছু। সে কথা ভেবে ভেবেই সীতা ভীষণ শীর্ণ ও শ্রান্ত হয়ে পড়ল। ভাবনা তার লব কুশকে নিয়ে। ছেলে দুটি শুধু দুরন্ত নয়, বেপরোয়া এবং জেদী। কোন কিছুতে ভয়-ডর নেই। যুদ্ধটা তাদের কাছে খেলার মত। খেলায় যেমন এক ধরনের নেশা আছে তেমনি যুদ্ধের উন্মাদনাটা তাদের খেলায় পাওয়া নেশার মত, সহজে মন থেকে যায় না। জেদের তপ্ত স্বাদ তাদের প্রিয়। জেদ বয়ে বেড়ানোর ব্যক্তিত্ব, তেজ, দৃঢ়তা শক্তি তাদের আছে। সেজন্য সীতার কিছু ভাল লাগে না। যুদ্ধ, জেদ আর রাজনীতি এমন এক জিনিস যে তা বশে থাকে না। কখন কোন দিকে কি ধরনের মোড় ঘুরবে আগে থেকে তার কোন ছক করা যায় না। তাই বাল্মীকির কথায় প্রত্যয় জন্মালেও নিশ্চিন্ত থাকতে পারছিল না। রামচন্দ্রের রাজনীতির কদর্য চেহারাই তাকে ভাবনায় ফেলল। কারণ তার রাজনীতিতে ভ্রাতা নেই, মাতা নেই, স্ত্রী নেই, ন্যায়, ধর্ম, নীতি বলে কিছু নেই। এমন কি বিশ্বাস নির্ভরশীলতাও নয় * তার হৃদয় প্রেম মমতার পাত্রও শূন্য। সুতরাং বাল্মীকি যা ভাবছে তা কি সত্যি হবে কখনও? রাজ্য ও রাজত্বের নেশা রামচন্দ্রকে ভূতের মত ভর করেছে। ক্ষমতা ছাড়তে রামচন্দ্র রাজি নয়। তাই নিজের ব্যর্থতা ঢাকতে অশ্বমেধ যজ্ঞ করছে। রামচন্দ্র নিরঙ্কুশ ক্ষমতা ভোগের জন্য, খ্যাতির জন্য, প্রতিপত্তি লাভের জন্য করেনি এমন কোন কাজ নেই। শবরীর সরল বিশ্বাস, ভরতের সহজ ভ্রাতৃভক্তির সঙ্গেও শঠতা করতে কুণ্ঠিত হয়নি, নিরপরাধ বালীর সঙ্গে ধর্মের বদলে অধর্ম করেছে, রাবণকে প্রতারণা করেছে, বিভীষণকে ভ্রাতৃদ্রোহী স্বজাতিদ্রোহী করে এক কুৎসিত লড়াই করেছে।

তারপরের কথা ভাবতে গিয়ে বুকের ভেতরটা তার কেমন করে উঠল। লোকচক্ষে তার প্রেমকে চিরজয়ী করতে শবরীকে অগ্নিতে আহুতি দিয়েছে। কিন্তু সে কোন প্রেম? দাম্পত্য প্রেম না আত্মপ্রেম? রামচন্দ্র নিজেকে ছাড়া কাউকে ভালবাসেনি কোনদিন। নিজের রাজনৈতিক বেসামাল অবস্থা সামলাতে প্রেমকে হত্যা করল। প্রেমকে অন্তর থেকে যে নির্বাসন দিতে পারে তার মত পাষণ্ডকে বিশ্বাস করে কেউ? তার ওপর নির্ভর করতেও বুক কাঁপে।

এইসব ভাবনার মধ্যে রামচন্দ্রের জন্য মনটা হঠাৎ হু-হু করে উঠল সীতার। রামচন্দ্রের মত হতভাগ্য মানুষ পৃথিবীতে খুব কম হয়। পৃথিবীতে বড় একা সে। ভীষণ একা। নিঃসঙ্গ সহানুভূতির সমবেদনায় গলে যেতে লাগল সীতার ভেতরটা।

উদাস অন্যমনস্কতায় ভাবতে লাগল, তার ওপর থেকে হঠাৎই একদিন রামচন্দ্র সব দাবি তুলে নিয়ে ঝাড়া হাত-পা হয়েছে। কোন কিছুই তার কাছে এখন আবশ্যিক নয়। কোন মায়া বন্ধনে সে নিজেকে বাঁধেনি। মায়ায় আটকে পড়ার আগেই মূল সমেত তাকে উপড়ে ফেলেছে জীবন থেকে। হঠাৎই একটা অনুভূতি হল সীতার। বুকের মধ্যে শক্ত করে কুলুপ আঁটা দরজা-জানালাগুলি ভেঙে কি এক গভীর যন্ত্রণা আর অনুশোচনার স্রোত তাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। ঝঞ্ঝা যেন আছড়ে পড়ে ছিন্ন ভিন্ন করে দিল তাকে। মনটা দুর্বল হল। কেবলই মনে হতে লাগল কত কিছুর পরেও এই মানুষটার কথা মনে রেখেছে? ধিক্কার দিল নিজেকে। ঘৃণা হল রামচন্দ্রের উপর। পরমুহূর্তে ব্যক্তিত্বসম্পন্না আত্মসম্মানজ্ঞানসম্পন্না ভাবাবেগবর্জিতা এক নারী তার মধ্যে ফিরে এসে মনের হাল ধরল আবার শক্ত হাতে।

নানা কথা মনের মধ্যে ঝড় তুলল। কদিন ধরে কিছুতে শান্তি পাচ্ছিল না। মনে কুকথা আসছিল। ভিতরে জমে উঠল উদ্বেগের ভাব। রামচন্দ্রের অশ্বমেধ যজ্ঞের সঙ্কল্প সীতার ভাবনাকে এলোমেলো করে দিচ্ছিল বারবার। এতবড় একটা কর্মকাণ্ড হচ্ছে অথচ তারা কেউ শরীক নয় তার। এতবড়

* মৎ-লিখিত 'রামের অজ্ঞাতবাস' দ্রষ্টব্য।

একটা দুর্ভাগ্যের কথা ভেবে মনটা তার আকুল হল। নিজের জন্য এবং সর্বোপরি লবকুশের জন্য এক গভীর বেদনা অনুভব করতে লাগল। জানলা দিয়ে বাইরে তাকাল। বোবা চোখে তাকিয়ে রইল অনেকক্ষণ। আপনা থেকেই চোখ অজানিতে ভিজে গেল। এক বিস্মৃত অতীতকে দেখছিল সীতা।

অযোধ্যার প্রাসাদ। নিজের ঘর। শয়ন ঘরের পালঙ্ক। দাসদাসী। তাদের গলার স্বর, তাদের কাজের তদারকি করতে আর চালাতে তার নিজের বকাবকির স্বর কানে বাজছিল। এসবের মধ্যে একা ঘরে থেকেও সে একটা সঙ্গ পেত এদের। জানত এরা ঘিরে আছে তাকে। তার পাশে আছে জীবন্ত অনেকগুলো মানুষ। ডাকলেই দৌড়ে আসবে এক সঙ্গে অনেকে। একটা প্রাণচঞ্চল, দুরন্ত ফেনিল সমুদ্রের ঢেউর মত ঘরেতে আছড়ে পড়বে। জিগ্যেস করবে, রানীমা কি চাই, আমায় ডেকেছেন? কিছু বলবেন আমাকে? বুড়ী দাসী নাকী সুরে অনুযোগ করে বলত: পারি না বাপু। খেটে খেটে হাড়মাস শুকিয়ে গেল। তুমি বাপু বড় ঝামেলা কর।

চাইবার মত কিছুই চাই তো না তাদের কাছে, করত না কোন ফরমাস। বড্ড যখন একা লাগত তখনই একে ওকে ডাকত। বলত জানলাটা একটু খুলে দে, হাতের পাত্রটা নামিয়ে রাখ। চিরুনি দিয়ে চুলটা আঁচড়ে দাও; কাপড়টাকে গুছিয়ে জায়গায় রাখ, এইসব।

এরকমভাবেই রাজঅন্তঃপুরের সঙ্গে জড়িয়ে ছিল। সকলের মধ্যে বেঁচে ছিল। তবু মনে হচ্ছিল কি যেন নেই। সংসারে, গৃহে সন্তানই শ্রী। সন্তান ছাড়া মেয়েমানুষকে মানায় না। সন্তান হলে কত কাজ। সেটুকুই ছিল তার একান্ত চাওয়া। তাও বড় দেরি করে পেল। কিন্তু পেয়েই হারাতে হল সব। পাওয়াটাই মিথ্যে হয়ে গেল। ঘর ছেড়ে কখনও একা বেরোয়নি, সেই ঘরে বোধ হয় তাকে আটল না। তাই ছোট ঘরের পরিবর্তে বিশ্বনিখিল লিখে দিল তাকে বিধাতা। একেবারে খোলা আকাশের নীচে এসে দাঁড়াল। একেবারেই মুক্ত স্বাধীন। কোথাও জীবনের আড়াল রইল না।

মাথা ঘুরতে লাগল সীতার। স্বামীর কাছ থেকে নিষ্ঠুর আঘাত পেয়ে মনের মধ্যে যে বিরূপতাকে তিল তিল করে পাহাড়ের মত জমিয়ে তুলেছিল, সেই পাহাড়ের ভেতর লুকনো আগ্নেয়গিরিতে হঠাৎই এই বিস্ফোরণ ঘটে গেল। বুঝতে পারল, তার উদাস অন্যমনস্কতার অন্তরালে ভারতীয় নারীর পতিপূজার বেদিটি ভেঙে খানখান হয়নি, এখনও অটুটই আছে। এত সব ঘটনার পরেও শ্রীরামের প্রতি দয়া, ক্ষমা, মমতা, প্রেম যে বেঁচে আছে ভাবতে পারেনি। গভীর অভিমানে নিজেকে বড় বেশি দূরে সরিয়ে রেখেছিল। অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘোড়া অনেক দেশ ঘুরে যত জোরে ছুটে আসছে ততই সীতার মনে হতে লাগল সর্বনাশের দূত আসছে তার সব কেড়ে নিতে। লব কুশকে সব বুঝিয়ে বলা দরকার। পিতা পুত্রের মধ্যে সাঁকোটি ভেঙে গেছে অনেকদিন আগেই। তার অস্তিত্বই নেই। পারাপার করবে কি করে? কি বলবে তাদের? বলতে গেলে ওরা হয়ত বুঝবে না। বুঝিয়ে বলার ক্ষমতাও তার নেই। থাকবে কোথা থেকে? শম্বুক ওদের কানে পাখি পড়ার মত বলেছে মাকে কখনও দুঃখ দিবি না ভাই। এমন ভাল মা, সকলের হয় না। আর তোমার মাই-ই তোমাদের সব। মার মনে যারা দুঃখ দিয়েছে তাদের সঙ্গে কোন আপস করবি না, ক্ষমা করবি না।

শম্বুকের আমিত্ব, ব্যক্তিত্ব অহং সবই তার কানের পর্দায় ঝংকারে বাজতে লাগল। আর কি এক গভীর যন্ত্রণা ও অনুশোচনার বোধ ফেনিল সমুদ্র হয়ে যেন তেড়ে এসে ছিন্নভিন্ন করে দিলে তার সব দুর্বলতাকে। একটা ঘোর লাগা আচ্ছন্নতার মধ্যে নিজেকে প্রশ্ন করে আর পাঁচজন সাধারণ রমণীর মত কি অভ্যেসের আবেগের দাস হয়ে থাকবে? অমনি এক সচেতন নারী তার মনের হাল ধরল শক্ত হাতে।

বুকের মধ্যে কেমন একটা ভূমিকম্প টের পেল। রক্ত দপ দপ করছিল সীতার। হঠাৎই মনে হল মানুষের জীবনে অনেক কিছুই ঘটতে পারে তা যতই দুঃখবহ বা যন্ত্রণার হোক। তবে তার উৎকণ্ঠা কিসের? পিতার সঙ্গে পুত্রের লড়াই আশঙ্কা তার মন খারাপ করে দিল। তবু যদি ঈশ্বরের ইচ্ছেয় তা ঘটে, কি করবে সে? ঈশ্বর যাই-ই করেন তার পেছনে যুক্তি থাকে। সে যুক্তি সব সময় বোঝার ক্ষমতা নেই বলেই তাঁর বিধানকে বলি, ঈশ্বর নিষ্ঠুর। রামচন্দ্রের শাস্তি পাওয়া হয়ত দরকার। ঘটনাস্রোত সেই দিকেই নিয়ে যাচ্ছে যেন।

সীতা আর ভাবতে পারছিল না। মাথার ভেতর ভীষণ টনটন করছিল। রগের পাশটা চেপে ধরে এক তীব্র অস্বস্তিতে মাথা নাড়ছিল সে। চোখের পাতায় গভীর বিষণ্ণতা নেমে এল।

জনস্থানের মধ্যে দিয়ে রামচন্দ্রের অশ্বমেধের অশ্ব সহিস ছাড়াই বিজয়পত্র বহন করে একা একা গর্বোদ্ধত ভঙ্গিতে লম্বা লম্বা পা ফেলে নিজের ইচ্ছেয় যাচ্ছিল। আর এক বিশাল সৈন্যবাহিনী তার অনুগমন করছিল। এরকম ধরনের অদ্ভুত অভিযান লব-কুশকে বিস্মিত করল। বিরল দর্শনের অদ্ভুত অশ্ব তাদের দৃষ্টি কেড়ে নিল। অশ্বের গাত্রবর্ণ মেঘের নায় কৃষ্ণবর্ণ, মুখের কাছটা সোনালী লোমে ঢাকা, তার কপালে সাদা লোমের অর্ধ চন্দ্রাকৃতি চিহ্ন। পুচ্ছ তুষারশুভ্র রেশমের মত সুবিন্যস্ত, পেটের কাছটা কুন্দফুলের মত শ্বেতবর্ণ, পায়ের গোড়ালি হরিৎ বর্ণ লোমে আবৃত, কান সিঁদুরের মত রক্তিম, জিহ্বা প্রজ্বলিত অগ্নিশিখার মত, চক্ষু সূর্যের মত দীপ্ত আর সর্বাঙ্গ থেকে একটা সুন্দর মিষ্টি গন্ধ বেরোচ্ছে। সর্বলক্ষণ সম্পন্ন শ্রীময় এই বাজিটি * লব কুশের ভীষণ পছন্দ হয়ে গেল। চোখে চোখে দু'ভাইয়ের কথা হয়ে গেল, এই অদ্ভুত দর্শনের বাজী তাদের। অমনি দলবল নিয়ে বন্ধন মুক্ত, স্বেচ্ছাভ্রমণরত বাজীর পথ আগলে দাঁড়াল। উল্লাসের কলধ্বনি বাজতে লাগল দু'ভাইয়ের বুকের রক্তে।

সৈন্যবাহিনীর পুরোভাগে ছিল লক্ষ্মণ। একদল জংলি মানুষের স্পর্ধা তাদের আশ্চর্য করল। বনবাদাড় ভেঙে দ্রুত ছুটে এল তাদের কাছে। কিন্তু নিকটে এসে অবাক হল। শান্ত সংযত ভঙ্গিতে দুই তরুণ অশ্বের লাগাম ধরে তার দিকে তাকিয়ে মৃদু মৃদু হাসছিল। সে হাসি বড় মিষ্টি। আমন্ত্রণের হাসি। তাদের দিকে দৃষ্টি পড়তেই লক্ষ্মণের ডাগর দুই কালো চোখে কেমন একটা মুগ্ধ তন্ময়তা নেমে এল। জনস্থানের এই কালো মানুষদের মধ্যে এত সুন্দর বলিষ্ঠ আর এমন কন্দর্পকান্তি চেহারার মানুষ হয় না, হতে পারে? আকস্মিক এ এরকম একটা জিজ্ঞাসায় সে একটু অবাক হল। তারুণ্যের সুঠাম সুন্দর তনুশ্রী, দৃপ্তভঙ্গি, অনির্বচনীয় রূপ আগুনের মত গায়ের রঙের দিকে তাকিয়ে চোখ ফেরাতে পারল না অনেকক্ষণ। নিজের অজান্তে চোখ দুটো অনুরাগের আভাসে কেমন গভীর, স্নিগ্ধ আর মায়াময় হয়ে উঠল। অশ্ব থেকে অবতরণ করে উদীপ্ত, নির্ভীক দুই তরুণের চওড়া বুকের কাছাকাছি ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়াল। আস্তে আস্তে বলল : তোমরা কে? এই বাজীর পথরোধ করলে কেন?

লব নির্ভয়ে নির্বিকারভাবে বলল : আমাদের পছন্দ হল বলে।

মৃদু হেসে লক্ষণ বলল : এ কার বাজী? সৈন্যবাহিনীর তত্ত্বাবধানে মুক্তভাবে পরিভ্রমণ করছে কেন, —এসব তো জানতে হয়?

কুশ বলল : জেনে কি হবে? অশ্বটি মনে ধরেছে—ওটা আমাদের চাই। দরকার হলে যুদ্ধ করব।

লক্ষ্মণের বেশ মজা লাগল। হাসি হাসি মুখ করে বলল: চাইলেই সব পাওয়া যায়?

চাওয়া আর ভিক্ষে করার মধ্যে যে তফাত আমরা জানি। জেনেই এই বাজী ধরেছি।

লক্ষ্মণ হাসল। বলল : সত্যিই তোমরা পাগল। এই বাজী ধরলে কি ভয়ঙ্কর বিপদ হয় তোমরা জান? এই বাজী খেলার পুতুল নয়। রাজার দিগ্বিজয়ের প্রতীক। তোমরা সাধারণ মানুষ। বনবাসী। তোমাদের রাজ্য, সৈন্য, কিছু নেই। তোমরা রাজশক্তির প্রতিদ্বন্দ্বী নও। রাজার সঙ্গে তোমাদের কোন বিরোধ নেই। তোমরা এই বাজী ধরবে কেন? এত ছেলেখেলা নয়? এ হল এক বড় রাজার সঙ্গে আর এক বড় রাজার প্রতাপ প্রতিপত্তি এবং শক্তি সামর্থ্যের যুদ্ধ। মহারাজ রামচন্দ্রের সার্বভৌমত্ব যে রাজা মানতে রাজি নয়, কিংবা তাঁর অধীনতা অস্বীকার করবে কেবল তিনিই পারেন এই অশ্বের গতিরোধ করতে। তোমরা তো আর রাজা নও। তাঁর প্রতিপক্ষও নও। তোমাদের এই বাজী ধরে কী লাভ? এ কৌতুক তোমাদের মানায় না। আগুন নিয়ে খেলতে নেই। তোমরা এ বাজী ছেড়ে দাও।

---

* পুরাণ বর্ণিত অশ্বমেধের ঘোড়ার লক্ষণ বর্ণনা।

লব কুশ দুজনের দিকে তাকাল। রামচন্দ্রের নামটা শুনেই একটা দুরন্ত আক্রোশে জ্বলে উঠল। তাদের বুকের আধখানা শম্বুকের জন্যে হাহাকার করে উঠল। তার নিষ্ঠুর মৃত্যুর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য তীব্র একটা জ্বালা স্নায়ুতে তরঙ্গায়িত হয়ে গেল। পেশীগুলো ফুলে ফুলে উঠল। ক্রোধে ডাগর দুই চোখে তাদের আগুন জ্বল জ্বল করছিল। তবু যথাসম্ভব নিরাবেগ চিত্তে নিজেকে শান্ত ও সংযত করে লব বলল : মহাত্মনের পরিচয়?

আমি রামানুজ লক্ষ্মণ।

আমরা লব কুশ। বিপ্লবী নায়ক অরণ্য শার্দুল শম্বুকের অনুগামী। ঈশ্বরের একান্ত ইচ্ছেয় আমরা মুখোমুখি হলাম। কিন্তু আত্মসম্মানজ্ঞান আর ভিক্ষা চাওয়া ব্যাপার দুটো একসঙ্গে হয় না। যে বাজী ধরেছি সে বাজী ছেড়ে দেওয়ার পথ আর খোলা রইল না। আমরা শ্রীরামের প্রতিদ্বন্দ্বী তাঁর সার্বভৌমতা স্বীকার করি না। তাঁর অধীনতাও মানতে রাজি নই। কথা বলতে বলতে লবের কানদুটো লাল হল।

এবার লক্ষ্মণের অবাক হওয়ার পালা। তরুণদ্বয়ের দুর্মর সাহস, নির্ভীক উত্তর তাকে চমৎকৃত করল। সারা মুখ তার প্রদীপের আলোর মত উজ্জ্বল হয়ে ওঠল। কিন্তু চোখের পাতায় চিন্তার ছায়া পড়ল। ফুরফুরে হাওয়া গাছের পাতায় পাতায় ঠোকা খেয়ে অব্যক্ত যন্ত্রণায় গোঙাতে লাগল যেন। অসংখ্য জবাব না পাওয়া জিজ্ঞাসায় তার বুকের ভেতরটা চিনচিন করতে লাগল। কিন্তু কিছুতে তার ভেতরটা ক্রোধে উত্তপ্ত হল না। বরং এক মুগ্ধ তন্ময়তায় অবাক হয়ে চেয়ে রইল। মনে হতে লাগল, এর ভেতর কোথাও একটা অদ্ভুত রহস্য লুকনো আছে। সেই রহস্য কি? তার কোন সূত্র না পাওয়া পর্যন্ত খুন জখম, রক্তপাত ঘটিয়ে কোন অনর্থ কিংবা মহাযুদ্ধ বাধানো ঠিক হবে না। মধুর ব্যবহার করে কিভাবে তাদের শান্ত এবং সংযত করা যায় তার উপায় চিন্তা করতে লাগল।

লক্ষ্মণ ধীরে ধীরে লব কুশের দিকে এগিয়ে গেল। তাদের দুজনের কাঁধে হাত রাখল। সস্নেহে সোনালি রঙের চুলের ভেতর আঙুল দিয়ে বিলি কেটে দিতে লাগল। আর কেমন একটা সুখে তৃপ্তিতে ভরন্ত কলসের মত ভরে উঠতে লাগল। দীর্ঘতপ্ত গ্রীষ্মের পর মরুভূমিতে প্রথম বৃষ্টি নামলে যেমন হয় সেরকম একটা অনুভূতি হওয়ায় লক্ষ্মণ অবাক হল।

লক্ষ্মণ ভাবছিল নীরবে। বেশ কিছুক্ষণ পরে অন্তরঙ্গ আত্মীয়ের মত ডাকল : লবকুশ। রামায়ণ গানে তোমাদের যশ ও খ্যাতির কথা অনেক শুনেছি। বড় প্রীত হলাম। তোমরা আমার কে জানি না। কিন্তু তোমাদের দেখে আমার ভারি মায়া হচ্ছে। তোমরা কে? মায়া না মিথ্যে? লৌকিক না অলৌকিক? তোমরা এই গ্রহের মানুষ, না অন্য কোন গ্রহের অধিপতি? তোমাদের দেখে আমার মনে হচ্ছে, অজানা এক আলোর রাজ্য থেকে যেন নেমে এসেছে কোনো দেবদূত। সত্যি কি তাই? না পথ ভুল করে আমি কোন দেবলোকে এসে পড়েছি?

লক্ষ্মণের গলার দ্রবীভূত স্বরে এক মহৎবোধ জেগে ওঠল লবের অন্তঃকরণে। এক দারুণ মুগ্ধ চমকে কুশ বারংবার চমকে ওঠলেও কোন কৌতূহল কিংবা ঔৎসুক্য দেখাল না। শান্ত নির্বিকার দুই চোখের দৃষ্টি লক্ষ্মণের চোখের ওপর স্থির।

মৃদু স্নিগ্ধ কণ্ঠে লব বলল: দেবলোক তো মানুষের কল্পনা। আমরা এই পৃথিবীর রক্তমাংসের মানুষ। পাতালপুরীর* অধিবাসী।

কুশ হঠাৎ একটু গম্ভীর হয়ে বলল: মহাত্মন, আপনি খুব সুন্দর কথা বলেন। নিজের অজান্তে মনটা ভরে ওঠে। কিন্তু আমরা শ্রীরামের প্রতি বীতশ্রদ্ধ। তাই এসব কথায় মন ভেজে না। ভালও লাগে না। যুদ্ধে আমরা ভয় পাই না। যুদ্ধ করেই আমাদের ফুরিয়ে যাওয়া জীবন নবীকৃত হয়ে উঠবে।

লক্ষ্মণ একটু অবাক হল। ভর্ৎসনা করে বলল : বৎস, যুদ্ধ কোন খেলনা নয়। জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলে বোকারা আর মুর্খেরা। তোমাদের সামনে কত বড় জীবন পড়ে আছে। সুস্থ শরীর

* সমুদ্র নিকটবর্তী অঞ্চল।

আর সুস্থ মন নিয়ে কি দারুণভাবে বাঁচা যায় তার এক আদর্শ দৃষ্টান্ত তৈরি করতে শ্রীরামচন্দ্র মুক্ত হস্তে দান শুরু করেছেন। ধন, ধেনু, গৃহ, ভূমি, অলংকার, যার যা আকাঙ্ক্ষা দাবি সব কিছু নিঃসংকোচে অর্পণ করে মানুষের মনের ক্ষোভ, অভাব, দুঃখ দারিদ্র্য দূর করার ব্রত নিয়েছেন। এই পৃথিবীতে একজনও দুঃখী মানুষ রামরাজ্যে থাকবে না। মানুষের সব ক্ষোভ বঞ্চনার অবসান ঘটিয়ে শ্রীরাম অশ্বমেধ যজ্ঞ করছেন। এর পরে আর কোন রাগ-বিদ্বেষ তার উপর থাকে? কতদিক থেকে কত মানুষ আসছে। অযোধ্যা আজ মহামানবের মিলনতীর্থ। তোমাদের পবিত্র পদরজ'য় ধন্য হবে অযোধ্যা।

বিচিত্র হাসি খেলে গেল লবের অধরে। বলল : তাই বুঝি? তবু প্রয়োজনের তুলনায় সে দান অকিঞ্চন। শুধু ভঙ্গি দিয়ে শ্রীরাম মানুষ ভোলানোর খেলা করছেন?

লক্ষ্মণ চমকাল। অবাক হল। বলল : একথা বলছ কেন?

লব একটু হেসে বলল : বিশাল ভারতবর্ষে শ্রীরামের এই দান কতটুকু পৌঁছবে? কটা মানুষ উপকৃত হবে? রাজভাণ্ডার অফুরন্ত নয় কারো। রাজার সাধ্য কি ভারতবর্ষের অভাব দূর করবেন, আকাঙ্ক্ষা পূরণ করবেন? যার যা দাবি মেনে নেবেন? কেউ যদি দাবি করে ধনু, ধেনু, অলংকার, ঐশ্বর্য বিত্ত, সম্পত্তি কিছু চাই না, শুধু আমাদের স্বাধীনতা ফিরিয়ে দাও, আমাদের মানুষের মত মানুষের অধিকার নিয়ে স্বাধীনভাবে বাঁচতে দাও তাহলে শ্রীরামচন্দ্র সে দাবী পূরণ করবেন কি?

কুশ বলল : কার ধন কাকে দিচ্ছেন? এসব তো প্রজাদের শোষণ করে, বঞ্চনা করে পাওয়া, অন্যের ধন সম্পদ হরণ করে সংগ্রহ করা। রামচন্দ্র এই ধনের গৌরব করেন? এই দান আদৌ দান নয়। বেসামাল অবস্থা সামাল দিতে কিছু মানুষের মুখ বন্ধ করতে শ্রীরামের এ অভিনব ফন্দী। ভবিষ্যতের রঙিন স্বপ্ন দিয়ে মানুষকে ভুলিয়ে রাখার এসব কথায় আমরা ভুলব না। তাঁর কোন করুণা, অনুগ্রহ আমরা চাই না। আমরা শুধু মানুষের অধিকার, স্বাধীনতার দাবি নিয়ে বাঁচার মত বাঁচতে চাই। সে দাবি পূরণ না হলে এই বাজী ছাড়ব না। তার জন্য যে কোন মূল্য দিতে আমরা প্রস্তুত।

লক্ষ্মণের শ্বাস পড়ল খুব ধীরে। আস্তে আস্তে বলল : তোমাদের অল্প বয়সের রক্ত তো, চট করে গরম হয়। তোমরা একটু বুঝতে চেষ্টা কর। অশ্বমেধের বাজী ধরার অধিকারী শুধু রাজার। এযুদ্ধ রাজায় রাজায়। তোমাদের মত সাধারণ মানুষের সঙ্গে এ সংগ্রাম কেমন করে হয়? তোমাদের মত রাজ্যহীন সাধারণ বনবাসীর সঙ্গে সংঘর্ষ বাধলে রাজমর্যাদা নষ্ট হয়। অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে তোমরা যা করছ তা হল বিদ্রোহ। বিদ্রোহীদের হত্যা করা বন্দী করাই হল রাজাদেশ। কিন্তু এধরনের কোন নিষ্ঠুর কর্মে অশ্বমেধ যজ্ঞ মসীলিপ্ত হোক, এ আমি চাই না। কিন্তু তোমরা আমাকে বাধ্য কর না। এত বোঝ এটুকু বোঝ না, এ হল রাজনীতি যুদ্ধনীতি।

লব একটু হেসে বলল : মহাত্মা রামানুজ, আপনার মহানুভবতার কোন তুলনা হয় না। তবু এ হল নীতির লড়াই। অশ্বমেধ যজ্ঞকারী রাজার সার্বভৌমত্ব কিংবা তাঁর অধীনতা যে স্বীকার করে না সে যেই হোক অশ্বমেধের অশ্ব ধরার অধিকারী। সে অধিকার জনগণেরও থাকতে পারে। রাজ্য রাজা তো জনগণকে নিয়ে। জনগণই দেশের রাজা। কিন্তু সাধারণ মানুষ নিজের সে অধিকার জানে না, তাই এ রাজতন্ত্র চলছে। জানলে চলত না। আসত সর্বব্যাপী বিপ্লব। শম্বুক সেই বীজ মানুষের মনে বুনে দিচ্ছিল বলেই প্রজানুরঞ্জন রাজা রামচন্দ্র তাকে সহ্য করতে পারল না। কোন যুদ্ধ নীতি না মেনে তাকে একজন গুপ্ত ঘাতকের মত হত্যা করলেন। একদিন নিরপরাধ বালীকেও ঠিক এরকমভাবেই হত্যা করেছিলেন।

লক্ষ্মণের ধৈর্যের বাঁধ ভাঙল। বিরক্তিতে জ্বলে গেল তার মাথার ভেতরটা। সহসা চীৎকার করে বলল : চুপ কর। তোমাদের ঔদ্ধত্য সব সীমা ছাড়িয়ে গেছে। নির্বোধদের সঙ্গে কথা বলাটাই ভুল হয়েছে। আদর্শ আর লক্ষ্য নিয়ে বিবাদের মীমাংসা যুদ্ধ করেই হবে। কিন্তু কার সঙ্গে যুদ্ধ করব?

কুশ নিঃসংকোচে বলল : যুদ্ধ হবে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সঙ্গে সর্বহারা শোষিত বঞ্চিত

মানবসমাজের। রাজার সঙ্গে প্রজার। শাসকের সঙ্গে শাসিতের। অধর্মের সঙ্গে ধর্মের। বিবেকহীন মনুষ্যত্বের সঙ্গে মানবিকতার। কুশের বজ্রদীপ্ত কণ্ঠের ঘোষণা অরণ্যের প্রগাঢ় স্তব্ধতাকে বিদীর্ণ করল। ফুরফুরে হাওয়া হর্ষ প্রকাশ করতে করতে যেন ছড়িয়ে গেল বনে বনান্তরে।

সারা বনভূমি সচকিত করে মেষশৃঙ্গের শিঙ্গা বেজে উঠল। চারদিক অরণ্য কাঁপিয়ে সম্মিলিত কণ্ঠের প্রত্যুত্তর এল রে-রে-রে করে। সেই আওয়াজ শুনলে আতঙ্কে, ভয়ে হৃৎপিন্ড স্তব্ধ হয়ে যায়।

আশ্রমে বাল্মীকি চমকে উঠল। সীতার মন উচাটন হল। খুব ভয় হল ঐ আওয়াজকে। বনে বনে পাতার খস্‌খস্ শব্দে ভয় পেল। উদ্বিগ্ন গলায় ডাকল : পিতাজী।

বাল্মীকি কি যে বলবে ভেবে পেল না। সীতার চোখের আয়নাতে সে নিজের হারিয়ে যাওয়া অনার্য নিষাদের মুখ খুঁজে পেল। যে এই সরল নিষ্পাপ তরুণদের রক্তে বয়ে এনেছে এক চরম সর্বনাশা যুদ্ধের উন্মাদনা। সেই অভিশপ্ত যুদ্ধের সংকেত যেন ছড়িয়ে পড়েছে অরণ্যময়। বাল্মীকির ভেতরটা চঞ্চল হয়ে উঠল। তবু তাকে শান্ত করার জন্যে শান্ত সংযতভাবে বলল : কিছু বলবে মা। ঈশ্বর করুণাময়। তুমি তাঁর ওপর আস্থা রাখ। এই পৃথিবীতে একটা কীটও তার নিজের মত স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকে। কিন্তু মানুষের যে মনুষ্যোচিত অনেক ব্যাপার থাকে, অনেক আনন্দ এবং দুঃখ থাকে যা শুধু মানুষের জানার কথা। একদিন শম্বুকের বুকে তুমিই সেই অনুভূতির বীজ বুনেছিলে। কিন্তু আজ নিজের জন্য সেই সুন্দর বোধটিকে আবিল করে ফেলার মত নির্বোধ মেয়ে তো তুমি নও। এই উদ্বেগ কার স্বার্থে করছ জননী? নিয়ে দিয়ে, দিয়ে নিয়ে সকলকে ভরপুর করে সুধন্য করে রেখে চলে যাও এটাই তো জীবনের নিয়ম। ছেলেরা তোমার কোন অন্যায় অধর্ম করবে না। তারা যাই করুক জীবনের শত আবিলতাতেও তা মলিন হয়ে যাবে না। মানুষের মনে গেঁথে থাকার মতই কাজ করবে তারা।

বাল্মীকি আর দাঁড়াল না। দ্রুতপায়ে দৌড়ে যেতে লাগল যে দিক থেকে আওয়াজ আসছিল। বিকেল শেষ হয়ে এল। দিনান্তের সূর্য অতিকায় নরম লাল বলের মত গাছের মাথায় আটকে আছে। লাল আকাশের বুক চিরে এক ঝাঁক সাদা বক নীল আকাশে গা ভাসিয়ে দিয়ে উড়ে গেল অন্য দিগন্তের দিকে। গাছের ডাল পাতায় পাতায় ফিস ফিস করে কথা বলছিল। পাখিরা রাতের আশ্রয়ের জন্য ব্যস্ত হয়ে কিচির মিচির করছিল ডালে ডালে। সেই সঙ্গে মানুষের গমগমে চিৎকারে মৌনী জঙ্গলও চমকে উঠল।

শালবনের ভেতর দিয়ে বাল্মীকি যাচ্ছিল। শালবনের পাশে পাশেই একটা খোলা বিরাট জায়গায় এসে থমকে দাড়াল। নানা রঙের পতাকায় সুশোভিত এক বিশাল সৈন্যবাহিনীকে দেখল সেখানে। অশ্বমেধের একটি অশ্বও দূরে বাঁধা ছিল। অশ্বটিকে ধরে রেখেছে লব-কুশ। আর তাদের সুমুখে যে দাঁড়িয়ে আছে ধবধবে ফর্সা তার গায়ের রঙ। দূর হলেও বাল্মীকির ঐ ছায়ান্ধকারেই তাকে চিনল। এক দারুণ মুগ্ধ চমকে চমকে উঠল বাল্মীকি। শালবনের পাশ থেকেই চিৎকার করে ডাকল : দাদুভাই ই-ই! পাহারাদারের হাঁকের মত ডাকটা বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে গেল। জঙ্গলে জঙ্গলে অনুরণিত হল সেই ডাক। দাদুভাই ই-ই-ই-ই।

লক্ষ্মণ একটু চমকে অবাক হয়ে তাকাল। চিৎকারটা কে করল, কেন করল তা বুঝবার চেষ্টা করল। কণ্ঠস্বরটি তার খুব চেনা মনে হল।

আবারও চিৎকার হল— দাদুভাই-ই—

আতংকের হাতের লাগাম ছেড়ে দিয়ে লব দৌড়ে গেল বাল্মীকির দিকে।

লক্ষ্মণের মনে হল সে যেন ঝরনার চলকানো জলের মতই উন্মত্ত উৎসারে ভেসে গেল এক অন্ধকার গহ্বর থেকে অন্য জীবনের আলোকিত প্রান্তরের দিকে। দু'চোখে তার অবাক বিস্ময়। কে ঐ বৃদ্ধ? কি তার পরিচয়? এই তরুণদ্বয়ের সঙ্গে সম্পর্কই বা কি?

বাল্মীকির কোমর জড়িয়ে ধরে একরকম তাকে হাওয়ায় উড়িয়ে নিয়ে এল লব। একেবারে অশ্বের কাছে নিয়ে এল। বাল্মীকির হাঁটু দুটি থর থর কাঁপছিল। জোরে জোরে শ্বাস পড়ছিল। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল: এমন করে কি দৌড়তে পারি? আমার কি আর তোর বয়স আছে বাপু।

মুগ্ধ বিস্ময়ে বাল্মীকি অশ্ব দেখতে লাগল। শ্বাস ফেলে বলল : এত অশ্বমেধের বাজী!

চোখ বড় বড় হয়ে গেল লক্ষ্মণের। কিছুক্ষণ অপলক চেয়ে থেকে অবাক স্বরে উচ্চারণ করল : ঋষিবর আপনি! আমি রামানুজ লক্ষ্মণ। আমার প্রণাম গ্রহণ করুন।

বাল্মীকির সারা শরীরে সিরসিরানি ওঠল। লক্ষ্মণের মুখের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকল। নিচু গলায় স্বগতোক্তির মত বিড় বিড় করে বলল : তুমি লক্ষ্মণ! মহারাজ রামচন্দ্র কি অশ্বমেধ যজ্ঞ করছেন?

হাঁ, ঋষিবর! অনেককাল পরে আপনার দেখা পেলাম, কি ভাল যে লাগছে? কিন্তু এই তরুণ দুইটি কে?

উত্তরে বাল্মীকি বুকের ওপর হাত রেখে দেখাল এবং বলল : ওরা আমার বুকের ব্যথার সাগরের দুই পদ্ম।

বাল্মীকির কথাটার অর্থ অনুধাবন করতে পারল না লক্ষ্মণ। অবাকই হল একটু। হাসবার চেষ্টা করল। অর্থ না বুঝে অনেক সময় মানুষ যেমন হাসে।

লব কুশও অবাক হল না কম।

কয়েকটা মুহূর্ত নীরবে কাটল। লক্ষ্মণ বলল : ঋষিবর, ওরা অশ্বমেধের বাজী ধরে রাজদ্রোহ করেছে।

বাল্মীকির অধরে স্মিত হাসি। বলল : তাই বুঝি?

ওরা জোর করে অশ্ব আটকে রাখল। আমার কোন কথাই শুনল না। ওরা কে?

ওরা এই দেশের মানুষ। এই জঙ্গল পাহাড়ের সাধারণ মানুষ। অরণ্যের মত মুক্ত, স্বাধীন, উদার, বিশাল ওদের অন্তঃকরণ। বাইরে থেকে ওদের বোঝা যায় না। ওরা মৈত্রীর দূত, প্রেমের বাণী। আমার ব্যথার সাগরের অমৃত।

ঋষিবর!

বাল্মীকির দুই চোখে গভীর তন্ময়তা। ভাবাবেগে আবিষ্ট তার চিত্ত। দূর আকাশের দিকে চেয়ে বলল : লক্ষ্মণ, সবুজ অরণ্যানীর মাথায় থমকে দাঁড়িয়ে পড়া নরম লাল গোলার মত সূর্য একটু মুচকি হেসে পশ্চিম আকাশে নিবিড় পাড়ে হঠাৎ ডুবে গেল। এখন ঘরে ফেরার সময়। সামনে মস্ত রাত পড়ে আছে, ভাবনার অনেক সময় পাবে, আজ আশ্রমে থাক।

মাথা নিচু করে লক্ষ্মণ বলল : আমার প্রশ্নের উত্তর—

বাল্মীকি তার কথা শেষ করতে দিল না। মৃদু ভর্ৎসনা করে গাঢ় স্বরে বলল : জীবনের সব প্রশ্নের উত্তর মেলে না। প্রশ্ন হয় জীবনের টুকরো টুকরা, খণ্ডমাত্র নিয়ে। জীবন প্রশ্নের চেয়ে অনেক বড়। একজন পুরো মানুষের সবটুকু কখনই তার প্রশ্নের মধ্যে ধরে না। কি হবে প্রশ্ন করে? কুঁড়ি ধরার, ফুল ফোটার উত্তর কি প্রশ্ন করে মেলে?

লক্ষ্মণ মাথা নিচু করল। কি একটা বলতে চুপ করে গেল। বাল্মীকির কথাগুলো হঠাৎ যেন এক নতুন মানে বয়ে নিয়ে এল। স্তব্ধ হয়ে চেয়ে রইল লক্ষ্মণ পিছন ফিরে চলে যাওয়া বাল্মীকির গমনপথের দিকে। আস্তে আস্তে মাথা নাড়ল কয়েকবার। মনে মনে বলল : তা ঠিক।

কয়েকটা মুহূর্ত দ্রুত কেটে গেল। এইভাবে তাকে ফেলে বাল্মীকির চলে যাওয়াটা তার কাছে খুব কষ্টকর হল! ঋষিবর তার প্রশ্নের জন্য হয়ত রুষ্ট হয়ে তাকে না নিয়েই প্রস্থান করল। লক্ষ্মণের বুকের ভেতর মোচড় দিয়ে উঠল। বাল্মীকির কি হয়েছে, কে জানে? নিজেকে তার অপরাধী মনে হল। বিলম্ব না করে বাল্মীকির অনুগমন করল। আর তখনই টের পেল, জীবনে কত কি ঘটে যায় আশ্চর্যভাবে এক লহমায়। তার জন্যে সব সময় মানুষ প্রস্তুতও থাকে না। কিন্তু সে মন আছে অনাদরে, অবহেলায় পঙ্গু হয়ে। লক্ষ্মণের মনে হল বিমুখ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার চেয়ে সব অভিমান ঝেড়ে ফেলে তার মত মানুষের অনুগমন করার আনন্দ ও সুখ অনেক গভীর। হৃদয়টাও বড় হয়ে হঠাৎ প্রসারিত হয়ে গেল লব কুশের দিকে। বলল : চল যাই। অন্ধকারে ঢাকা পড়েছে আমাদের শত্রুতা। সাধ মিটিয়ে গল্প করতে এখন বাধা কোথায়?

বারো

সীতা জীবিত এবং বাল্মীকির আশ্রমে দুই যমজ পুত্রের সঙ্গে আছে এই কথাটা লক্ষ্মণের কাছে শোনা থেকে একটা অদ্ভুত অনুভূতি হল রামচন্দ্রের। চকিতে তার চোখের সামনের ভেসে উঠল সীতার চেনামুখ। বহুকালের হরেক রকম চেনা ছবি তার মনকে দ্রুত ছুঁয়ে গেল।

রামচন্দ্রের মস্তিষ্ক জুড়ে ছিল অন্য চিন্তা। সীতা এখন বাস্তব সত্য। এই বাস্তবতা তাকে এক অভাবিত সঙ্কটের মুখে দাঁড় করিয়ে দিল। নিজেকে তার এক অদৃশ্য বন্ধনের ক্রীড়নক মনে হল। সংবাদের আকস্মিকতায় ঘটনা বিচলিত করল। কারণ সীতার আকস্মিক আত্মপ্রকাশের ফলে উদ্ভূত সমস্যা এবং অজ্ঞাত পরিণতি তাকে উদ্বিগ্ন করল। অথচ তাতে তার নিজের কোন কার্যকরী হাত নেই। কিন্তু এই মুহূর্ত তার সবদায়িত্বই তার কাঁধে ভর করল।

সীতাকে নির্বাসন দিয়ে একদা ন্যায়বিচার এবং সত্য ও আদর্শ রক্ষার জন্য প্রজাপুঞ্জের কাছে যে মর্যাদা ও গৌরব তার বেড়েছিল, সীতা পুনর্গ্রহনের ব্যাপারে তার বিপরীত প্রতিক্রিয়া হবে। কিন্তু কি হতে পারে সে সম্পর্কে স্পষ্ট কোন ধারণা নেই তার। তবু সমস্যাটা থেকে যায় অজ্ঞাত। চিন্তার রূপ বদলায়। বুঝতে পারে না এখন কি করবে? কি করলে ভাল হয়।

রামচন্দ্র কেবল অস্বস্তি বোধ করলেন না, একটা যন্ত্রণা ও ব্যাকুলতা তাকে অস্থির করল। একটা গ্লানিবোধ তাকে পীড়া দিতে লাগল। সীতা তার জীবনে নিয়তির এক অমোঘ সংকেতের মত আবির্ভূত হয়েছে। তাকে অস্বীকার করার যেমন উপায় নেই তেমনি পুনর্গ্রহণেরও একটা সমস্যা থেকেই যাচ্ছে। কথাটা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রামচন্দ্রের প্রস্তরবৎ আচ্ছন্নতা কেঁপে উঠল। অনুভূতির ভেতর কিসের একটা তরঙ্গ ছড়িয়ে পড়ল। নিঃশ্বাসের সঙ্গে বেরিয়ে এল এক আর্তস্বর। ভুল করেছি। মহাপাপ করেছি।

তীব্র অপরাধবোধে তার হৃদয় মথিত হল। বুকের মধ্যে একটা তীক্ষ্ণ যন্ত্রণার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এল। মনে মনে যে কথাগুলো বলছিল শ্রবণে তার অতি স্তিমিত ধ্বনি বাজছিল। বৈদেহী, তুমি বেঁচে আছ? কি ভাল যে লাগছে। অভিভূত আচ্ছন্নতায় তার দুই চোখ বুজে এল। প্রাণের উদ্বেলতায় বুক ভাসিয়ে এল দুঃখ করুণা। যন্ত্রণামথিত স্বরে নিরুচ্চারে মনে মনে বলল : বৈদেহী আমি বড় একা। বিশ্বাস কর, সারাজীবন ধরে নিজেকে এই লুকিয়ে রাখা থেকে নিষ্কৃতি পেলে বেঁচে যেতাম। এভাবে আর নিজেকে লুকিয়ে রাখতে পারছি না। থাকতেও পারছি না। আমার বড় কষ্ট। বুক ভেঙে যাচ্ছে। যন্ত্রণার গভীরে ডুবে গিয়ে রামচন্দ্র নিঃশব্দ আর্তনাদে মাথা কুটতে লাগল। তবু কণ্ঠ থেকে স্বর নির্গত হল না। বহুক্ষণ আত্মসমাহিত অবস্থায় কাটার পর যন্ত্রণামথিত দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে আর্তস্বরে ভেজা গলায় উচ্চারণ করল : বৈদেহী আমার জীবনে এক পিঠে তুমি আর এক পিঠে আমার মরণ। এখন কি করব, তুমি বলে দাও? রামচন্দ্রের স্বরে কান্না নেই, কিন্তু ভেজা স্বরে লেগে থাকে আর্তির রেশ।

রামচন্দ্র এই মুহূর্তে অনুভব করল মানুষ নিজের কাছেই সবচেয়ে বেশি অনাবিষ্কৃত। এবং নিজে এক অন্ধকারে বাস করে। নিজেকে চেনা নিয়ে তার অহংকারে যে কত মূঢ়তা—একথা তার চেয়ে বেশি কে জানে? নিজের কাছেই সবচেয়ে বেশি অসহায় সে। নিজের অজ্ঞাত হৃদয় যখন নিজের কাছে আবিষ্কৃত হয়, সবচেয়ে সেই মুহূর্তের বিস্ময়, যন্ত্রণা আনন্দ অসহায়তা তাকে আর এক সংকটে ফেলে। একদা লৌকিক দাবির সমর্থনে প্রাণের প্রতিমা সীতাকে বিসর্জন দিয়েছিল। এখন সেই নির্দেশকে নিজের অনুকূলে ফিরিয়ে আনার এক গভীর সঙ্কটে ভুগছিল সে। এক যন্ত্রণাদায়ক প্রায়শ্চিত্ত মৃত্যুযন্ত্রণার অধিক তাকে কষ্ট দিতে লাগল। মানুষের এই মনটাও তার নিজের কাছে অজ্ঞাত ছিল। এটাও একটা পরম জানা। এই জানাটা সম্পূর্ণ না হলে প্রাণের সংগমে অবগাহনের তৃষ্ণা বোধ হয় জাগত না। যে তৃষ্ণা অন্ধকারের ক্ষণিক স্পর্শ, উত্তপ্ত নিঃশ্বাস, চিন্তার নিবিড় সান্নিধ্যের উষ্ণতা নিয়ে তৃপ্ত হল না; প্রাণের গভীরতর সঙ্গমে সে মিলনের প্রার্থনা করে।

জীবনের আবেগ তো আর দমিত থাকে না। সংশয়ের মধ্যেও তার তীব্রতা কমে না। হতাশার মধ্যেও হাতছানি দেয়। সব বাধা কেটে ঝরনার মত উন্মত্ত উৎসারে ধাবিত হয় মোহনার দিকে। তেমনি রামচন্দ্রের তৃষিত বুকে বহুদিন পর বর্ষা নামল। মায়া, মমতা, স্নেহ, প্রেম, ভালবাসা, করুণা,

সহানুভূতি, সমবেদনার শক্ত জমিটা যেন গলে গলে পড়তে লাগল। প্রশ্ন জাগল : দ্বিধা কেন? কিসের সংশয়? কার ভয়? কেন ভয় করব? সারাজীবন ধরে কত কি করলাম মানুষের জন্য, প্রজাদের জন্য? কিন্তু কি পেলাম? কেউ তো তার কথা শুনল না? তার কথা ভাবল না? আজ পনেরো বছর পর জানল মানুষকে বিশ্বাস করা অন্যায়, মানুষের শুভ কামনা করা পাপ। আজ তার প্রায়শ্চিত্ত করার দিন।

রামচন্দ্রের সমস্ত সত্তা একাগ্র হয়। এক গভীর সুখের অনুভূতি বেঁচে ওঠার মত মহিমান্বিত হয়ে ওঠে। মুগ্ধ আবেগে প্রাণ ব্যাকুল হয়। হাত বাড়ায়। কিন্তু সমস্তটাই শূন্যে ভরে যায়। একটা পথহারা বিভ্রান্তির মত শূন্য দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থাকে। চকিত যন্ত্রণার মত শূন্যতায় হাহাকার করে ওঠে বুক। হৃদয় মথিত করে এক গভীর নিঃশব্দ আর্তনাদ ধ্বনিত হল তার কণ্ঠে : না। পেয়ে আর হারাতে চাই না।

রামচন্দ্র সেই মুহূর্তে বশিষ্ঠকে ডেকে এনে বলল : স্বর্ণ সীতার প্রয়োজন নেই। দরকারও হবে না আর কোনোদিন। আমি নাগলোকে গিয়ে বাল্মীকির আশ্রমে আমার হৃদয় প্রতিমা বৈদেহী আর প্রাণের প্রদীপ লব-কুশকে ফিরিতে আনতে এখনি পুষ্পক রথে যাত্রা করব। আপনি তার আয়োজন করুন।

বশিষ্ঠের কোন ভাবান্তর হল না। তার শান্ত মুখে স্মিত হাসি ফুটল। কেমন করুণ হয়ে উঠল তার মুখখানা। মৃদুস্বরে বলল : নিয়তি কী নিষ্ঠুর। আর কি বিচিত্র তার লীলা!

গহন বন যতদূর চোখে দেখা যায়, শুধু বন আর বন। ঘন অরণ্যের এক শান্ত সবুজ সমুদ্র যেন নিথর হয়ে পড়ে আছে। নানারকম গাছ এর-ওর ডালপালার সঙ্গে জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে আছে। পুষ্পক রথ তাই খোলা জায়গায় নামল।

রামচন্দ্র একা এগোতে লাগল। নিঃসঙ্গ নিরস্ত্র। সঙ্গীর কোন প্রয়োজন হল না তার। ইচ্ছে করে প্রহরী ছাড়াই চলল। বড় বড় নীল দুই চোখে কৌতূহলের দীপ জ্বালিয়ে পথ হাঁটছিল। চোখ দুটো উৎসুক হয়ে কাকে খুঁজছিল যেন। চলতে চলতে নিজেকেই প্রশ্ন করল এই গহন বিজন অরণ্যে এত আকুল হয়ে কাকে খুঁজছে? কার মুখ, আগে দেখার জন্য হৃদয় অস্থির হয়েছে? কার মুখ সে সীতার, না লবকুশের? না উভয়ের।

রামচন্দ্র খুব জোরে হাঁটছিল। সমুদ্রের তরঙ্গের মত তার বুক নিঃশ্বাসের সঙ্গে ওঠানামা করছিল দ্রুত।

বাতাসে গুঁড়ো গুঁড়ো বৃষ্টির মত শালের ফুল ঝরে পড়ছিল মাটিতে, পথের পাশে, তার গায়ে। বহু বহুদূর থেকে ভেসে আসছিল চিতল হরিণের ডাক, ময়ূরের ডাক, বাঘের গর্জন। কিন্তু ওসবে তার মন কেড়ে নিল না। ভয়ও ছিল না। পিতাজী ডাকটা শুনবার জন্য উদগ্রীব হয়েছিল। উন্মুখ প্রতীক্ষা ছিল তার জন্য। প্রত্যাশায় ব্যথা লাগা চমকানো বিস্ময়ে কল্পনা করছি, লবকুশ তার দিকেই যেন ছুটে আসছে। সে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। লব কুশ-পিতাজী। পিতাজী। ডাকতে ডাকতে তার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। আর সে হাসতে হাসতে বলিষ্ঠ দুই বাহুর মধ্যে তাদের টেনে নিয়ে বুকে চেপে ধরেছে। কোলে নিয়ে দুভাই'র গালে স্নেহের চুমা এঁকে দিচ্ছে। আর সীতা একটু তফাতে দাঁড়িয়ে আড় চোখে তার দিকে তাকিয়ে মুখ টিপে হাসছে।

দর-দর করে রামচন্দ্রের ঘাম পড়ছিল কপাল থেকে। কিন্তু সে সব ভ্রূক্ষেপ নেই তার। কিসের একটা দুর্নিবার প্রেরণায় উদ্দীপ্ত হয়ে সে চলেছিল অরণ্যের অভ্যন্তরে। তপোবনের অভিমুখে।

শুকনো পাতায় খস্‌খস্‌ শব্দ হল। সঙ্গে সঙ্গে ছিন্ন হল তার চিন্তাসূত্র। আর শক্ত হয়ে দাঁড়াল সে। বলিষ্ঠ দীর্ঘ দেহের ভাঁজে ভাঁজে পেশীগুলো ফুলে ওঠল। সহসা দেখতে পেল ছায়ান্ধকার ঝোপের ফাঁকে জ্বলজ্বল করছে দুটি নয়, অনেকগুলি চোখ। রামচন্দ্র ভয় পেল না। সে ভাল করেই জানে এ বনে শূদ্রকেরা থাকে। এরা সকলে শম্বুকের অনুগামী। লব-কুশের অনুচর। সুতরাং বিপদের

কোন ঝুঁকি নেই। নির্ভয়ে বলল : এই যে ছেলেরা ঝোপ থেকে বেরিয়ে এস। আমি রামচন্দ্র। সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়ে যার শৌর্য-বীর্যের বিপুল খ্যাতি, সেই অযোধ্যাপতি রামচন্দ্র আমি।

ঝোপ থেকেই তারা প্রশ্ন করল— তুমি কি চাও এখানে?

আমি শুধু লব কুশের কাছে যেতে চাই। তোমরা আমাকে তার কাছে নিয়ে চল।

অমনি ঝোপের ভেতর একটা প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি হল। চারদিক থেকে শ্রীরামকে ঘেরাও করে ফেলল। বিশ-ত্রিশ জন সশস্ত্র বলিষ্ঠ যুবক। তাদের প্রত্যেকের হাতে তীক্ষ্ণধার বিষাক্ত তীর-ধনু আর চকচকে বল্লম। অব্যর্থ মৃত্যুর নিশানায় যখন তখন ঝলকে ওঠতে পারে তাদের হাতে।

রামচন্দ্র কৃষ্ণবর্ণ মানুষের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে কৌতুক করে বলল : তোমরা বুঝি বিদেশী অতিথিদের এইভাবে অভ্যর্থনা কর?

কৃষ্ণকায় যুবকরা কোন কথা বলল না। তাদের রক্তবর্ণ চোখে হিংস্রতা দপদপ করে জ্বলছিল। নীরবে রামচন্দ্রকে নিয়ে এক পা এক পা করে তাঁরা এগোতে লাগল।

নিয়ে এল বাল্মীকির আশ্রমে। সেখানে দেখল, সুন্দর একটা কাঠের চৌকির ওপর ধ্যাননিমীলিত চোখে বসে আছে ঋষি বাল্মীকি। আর তার চরণপ্রান্তে বিনম্র ভক্তের মত বসে আছে দুটি তরুণ। আগুনের মত তাদের গায়ের রঙ। দেখলেই মনে হয়, দেবলোক থেকে দেবদূত নেমে এসেছে যেন। কি সুন্দর, স্নিগ্ধ দেহকান্তি তাদের। দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। কেমন একটা মুগ্ধ তন্ময়তায় রামচন্দ্র আচ্ছন্ন হয়ে গেল। চাহনি কেমন গভীর আর স্নিগ্ধ হয়ে ওঠল।

কুশের দৃষ্টি হঠাৎ রামচন্দ্রের ওপর পড়ল। অকস্মাৎ বলিষ্ঠ চেহারার কন্দর্পকান্তি দেবতার মত চেহারার একজন মানুষকে দেখে বিস্ময় প্রকাশ করে বলল : মহাত্মন, আপনি কে? এখানে কেন? আগমনের কারণ জানতে পারি কি?

লব ওঠে এসে রামচন্দ্রের চওড়া বুকের খুব কাছে এসে দাঁড়াল। বিস্ময় মিশ্রিত কৌতূহল তার দুই চোখে। বলল : আপনি কি পথ ভুল করেছেন?

লব কুশের শান্ত স্নিগ্ধ মধুর কণ্ঠস্বর রামচন্দ্রের বুকের অভ্যন্তরে বীণা ধ্বনির মত বেজে যেতে লাগল। এমন অনুভূতির শিহরণ কখনও হয়নি। পায়ের নীচে ভূমিকম্প নয়, নিজের শরীরের অপ্রতিরোধ্য আন্দোলন।

বাল্মীকি দেখল রামচন্দ্র স্থবির ও প্রস্তরীভূত হয়ে গেছে। বাৎসল্যের এক রহস্যময় আকর্ষণে চির চেনা রামচন্দ্র বদলে গেছে হঠাৎ। পিপাসার্তের মত তৃষিত চোখে লবকে দেখছে, বাল্মীকি কথা বলল না। গভীর দৃষ্টিতে রামচন্দ্রের দিকে চেয়ে রইল।

রামচন্দ্র লবের দু'হাত ধরে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। হঠাৎ একটু অদ্ভুত হাসল। মাংসল গালে আঙুলের টোকা মারল। গালটা একটু টিপে দিয়ে হাসি হাসি মুখ করে বলল : পথ ভুল করে তোমাদের মধ্যে এসে পড়েছি। তোমরা আমায় পথ বলে দাও।

লব অবাক হয়ে বলল : তার মানে?

কুশের এমন একটা সহজ সরল অকপট এবং ধারালো জিব আছে যা তরোয়ালের মত লক্ষ্যবস্তুকে আঘাত করতে পারে। রামচন্দ্রের দিকে চকিতে একবার চেয়ে দেখে বলল : আপনি কে? কোথা থেকে এসেছেন? আপনার পরিচয় কি?

রামচন্দ্র গভীর এক দৃষ্টিতে নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে রইল লব কুশের দিকে। যেমন দীর্ঘ গঠন তেমনি ধারাল মুখশ্রী তীক্ষ্ণ চোখ দু'ভাইয়ের। দেখলেই বুক ভরে ওঠে গর্বে, আনন্দে উল্লাসে। রামচন্দ্রের এ অনুভূতি সম্পূর্ণ নতুন। পুত্রদ্বয়ের দিকে তাকিয়ে বারংবার মনে হতে লাগল এই দুই তরুণ তারই পুত্র। তার দেহ হতে জাত। বৈদেহীর মধ্য দিয়ে সৃষ্টি হয়েছে। সে এদের স্রষ্টা ভাবতে শরীরে কন্টকিত হল পুলকে. গৌরবে, আনন্দে। ভাল লাগার তৃপ্তিতে শূন্য কলসের মত ভরে ওঠল তার বুক।

এক মুগ্ধ তন্ময়তার মধ্যে কেটে গেল অনেকক্ষণ। রামচন্দ্র কোন কথা বলল না। তার ঠোঁট দুটি ঈষৎ ফাঁক। এক মায়াবী আলো ঘিরে আছে তার মুখমন্ডলে।

বাল্মীকি রামচন্দ্রের আত্মবিস্মৃত মুখের দিকে চেয়ে একটা সুখের অনুভূতি বোধ করল। আনন্দ-

বিষাদে বুকটা উথাল-পাথাল করল। তারপর খানিকক্ষণ দম নিয়ে নিজেকে প্রস্তুত করে নিয়ে একটু কাশল। কাঁপা গলায় বলল : এস রামচন্দ্র। এরা লব কুশ। তোমার অশ্বমেধের ঘোড়া বাজি ধরেছে। এখন আমি কি করি বলতো? উদ্বেগে আমার দিন কাটছে।

রামচন্দ্র নামটা তীরের ফলার মত লবকুশের বুকে বিঁধল। দু'জনেই একসঙ্গে চমকে উঠল। দুটি রক্তস্রোত যেন এক হয়ে মিশল। দু'জনের চোখে মুখে একটা অস্থির উত্তেজনার ভাব প্রকাশ পেল। আর কেমন উদভ্রান্ত নিষ্পলক দৃষ্টিতে রামচন্দ্রের দিকে তাকিয়ে ফ্যাকাশে হাসল লব। কাঁপা গলায় বলল : আপনি অযোধ্যাপতি শ্রীরামচন্দ্র!

রামচন্দ্র অদ্ভুত একটু হাসল। সে হাসি খুশির হাসি, বিষাদের হাসি।

কুশ বড় বড় চোখে রামচন্দ্রের দিকে চেয়ে বিনা ভূমিকায় প্রশ্ন করল : আমাদের জননী আপনার কাছে কি অপরাধ করেছিল? বিনা দোষে তার কঠিন শাস্তি হল কেন? পৃথিবী থেকে তাকে মুছে দিতে চেয়েছিলেন কেন?

রামচন্দ্রের মুখ আঁধার হল। অপরাধীর মত ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল কুশের দিকে। পুত্রের বুকে জমানো নিদারুণ অবমাননার দুঃখ, অভিমানের কি উত্তর দেবে? এরকম প্রশ্ন কেউ করতে পারে রামচন্দ্র স্বপ্নেও কল্পনা করেনি। কুশের জিজ্ঞাসায় রামচন্দ্রের হাত-পায়ে কাঁপুনি ধরল। কেমন একটা অস্থির বোধ করল। ভীষণ অসহায় লাগল। বড় দুর্বল বোধ হল। নিদারুণ একটা গ্লানির অপচ্ছায়ায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল মন। মনে হল, সে এক কঠিন বিচারকের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। চোখ বুজতেই বৈদেহীর নরুণকাটা মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে উঠল চোখের সামনে। তার শান্ত, স্নিগ্ধ চোখে মুখে কেমন অরাত্রিক পবিত্রতা। কথাটা মনে হওয়া থেকে বুকটা থর থর করে কাঁপছিল। হঠাৎ বুক কাঁপিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল রামচন্দ্রের। মনটা তখনি দীন হয়ে গেল। দীন, নম্র, হৃদয়ে ভিখিরির মত নিজের প্রিয় পুত্রের কাছে স্বীকারোক্তি করার মত অস্ফুট স্বরে বলল : কেন যে করেছি জানি না। ভুল করেছি। আজ প্রায়শ্চিত্তের দিন। তোমাদের অভিযোগ, অনুযোগের জবাব দেবার মত সম্বল তো আমার কিছু নেই। আমার মত রিক্ত, নিঃস্ব, দীন কে আছে, বল? সব থেকেও যে সব খোয়াল তার মত দুঃখী হয় না। জীবনের সব কিছুর জন্য মূল্য ধরে দিতে হয়। এক অবস্থা থেকে আর এক অবস্থায় যাওয়াও বড় যন্ত্রণার। যন্ত্রণারও যে একটা নিজস্ব মূল্য আছে নিজেকে দিয়ে জানলাম। নিজের সঙ্গে আজ আমার কোন ঝগড়া নেই। সমস্ত সম্পর্কের উষ্ণতাই ভালবাসার প্রদীপ জ্বেলে পেতে হয় পুত্র। জীবনে বোধহয় এরকম একটা যতির খুব প্রয়োজন থাকে। একটানা দীর্ঘ একা পথ চলা কত ক্লান্তিকর, একঘেয়ে, নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে, এমন করে আগে কোনদিন বুঝিনি। তোমাদের দেখে কী ভাল যে লাগছে!

রামচন্দ্রের এই 'পুত্র' সম্বোধনটা লব কুশের বুকের ভেতর কি সব অজানা অনাস্বাদিত জমে থাকা বোধগুলো হঠাৎ করে গলিয়ে দিল। ঐ একটা সম্বোধনে, আচমকা ডাকে স্নেহ বুভুক্ষু অন্তরটা হঠাৎ উৎসারিত ফোয়ারার মত ফিনকি দিয়ে ছুটল রামচন্দ্রের দিকে। সব প্রতিরোধ ভেসে গেল। কতদিন স্বপ্নে কল্পনা করেছে পিতাজী, পিতাজী বলে দৌড়তে দৌড়তে হারানো পিতাকে হঠাৎ পেয়ে তার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। কথাটা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লবের আপনা থেকেই বুকটা থর থর করে কাঁপিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল। কুশও এক দারুণ মুগ্ধ চমকে চমকে উঠে লবের দিকে তাকাল। দুটি মনের অভিব্যক্তি এক সঙ্গে মিশল। একই স্রোতে প্রবাহিত হল। রামচন্দ্র তাদের পিতা। তাদেরই পিতা শুধু। পিতাজী বলে ডাকার কেউ যে আছে তাদের এ পৃথিবীতে একথাটা একেবারে গিয়েছিল ভুলে। মনের গহনে পিতাজী বলে ডাকার একটা ইচ্ছে যে তাদের হল না তা নয়, কিন্তু সেই ইচ্ছেটা দমন করল। এই আচমকা ইচ্ছা নাড়া খেতে টের পেল পিতাজী ডাকটার মধ্যে তাদের সমস্ত আমিত্বটা ভরে আছে। বুকের ভেতর অনুচ্চারিত স্বরে পিতাজী পিতাজী করল। কিন্তু রামচন্দ্র শ্রবণেন্দ্রিয়ে কিংবা তার গভীর অনুভূতিতে সে ডাক পৌঁছল না।

রামচন্দ্রের মুখে গভীর বিষাদ ও শোক থমকে ছিল। কিছুক্ষণ বিহ্বল দৃষ্টিতে চেয়ে রইল সেইদিকে। কুশও টের পাচ্ছিল তার ভিতরে আগুন নিবে গেছে। সে আর উত্তপ্ত হতে পারছে না। বদ মেজাজী ঠোঁটকাটা বলে তার বদনাম আছে। মায়ের কাছে সেজন্য তিরস্কৃত হয়। তথাপি মুখে কিছুতে কথা

এল না তার। একটা কিছু ভিতরে স্পন্দন তুলল। প্রগাঢ় অভিমানে বুক উথলে উঠল। বলতে ইচ্ছে করল : "তুমি চলে যাও। তোমাকে আমরা বিশ্বাস করি না। তুমি আমাদের মা'কে কাঁদিয়েছ। আমাদের মা খুব ভালমানুষ বলে ঠকিয়েছ তাকে। কিন্তু আমাদের তুমি ঠকাতে পারবে না। তোমার কোন ছলনায় আমরা ভুলব না। কিন্তু রামচন্দ্রের চোখের দৃষ্টি সব গন্ডগোল করে দিল। মনে মনে বললেও মুখে বলতে পারল না। বিরক্তিতে শুধু ভুরু কুঁচকাল। মুখখানায় বিমর্ষতার ছায়াপাত ঘটল।

রামচন্দ্র কিছুক্ষণ তার বদমেজাজী ছেলেটির দিকে চেয়ে রইল। হাত বাড়িয়ে কুশের কপাল থেকে স্খলিত চূর্ণ চুলগুলি সরিয়ে বুকের কাছে টেনে নিল। একটা গভীর তৃপ্তির শ্বাস পড়ল তার। একটু ম্লান হেসে বলল : আমি খুব খারাপ লোক তাই না? আমাকে তোমাদের খুব খারাপ লাগছে বুঝতে পারি। সন্দেহ করে যাচ্ছ। ভাবছ, যা বলছি সব বানিয়ে বলছি। একটাও মনের কথা বলছি না। সত্যিই আমি ভাল লোক নই। ভাল হলে নিজের ছেলে-বৌকে বাঘ ভালুকের মুখে ছেড়ে দিতাম না। মানুষের কাজ আমি করিনি। আমাকে ঘেন্না করে তোমরা কোন অন্যায় করনি। তোমাদের ঘেন্নাটাই আমার পাওনা। বুকের ভেতর লুকনো পিপাসাটা টের পাইনি বলেই এই বিপত্তি। তোমরা আমারই দেহ মন থেকে জাত, অথচ তোমরা আমার কেউ হলে না। এ এক অদ্ভুত আশ্চর্য ঘটনা।

এতসব কথায় লব-কুশ মুগ্ধ সম্মোহিত হয়ে গেল। আচমকা একটা অনুভূতি হল তাদের। বুকের ভেতর কেমন দুরু দুরু করে উঠল। এরকম ধরনের অনুভূতি আগে হয়নি কখনও। আজ হল কেন?

রামচন্দ্র দুভাইয়ের কাঁধে মাথাটা বেখে চোখ বুজে বলল : তোমাদের দুজনকে দেখা থেকেই আমার কি একটা হয়েছে যেন? বাৎসল্যের কাছে হার মানার মত এক সুখের মর্ম তোমরা বুঝবে না পুত্র। আজ আমার কোন অহংকার নেই, লজ্জা নেই। নিজেকে সমর্পণ করার সুখে আমি বিভোর।

লব কুশ দুজনের দিকে তাকিয়ে একটু হাসল। করুণার হাসি। কুশ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল : শুধু কথা আর ভঙ্গি দিয়ে আমাদের সংকল্পকে দুর্বল করে দেবেন না রাজন। আমরা হতভাগ্য মায়ের সন্তান। সেই আমাদের গর্ব। আমাদের তো কোনদিন পিতা ছিল না। পিতার স্নেহ-মমতা ছাড়াই তো বেশ ছিলাম। পিতার কাছে ফিরে যাওয়ার মনটা আমাদের মরে গেছে কবে। নতুন করে সম্পর্ক গড়ে কি হবে?. কী লাভ তাতে? নতুন ভারতবর্ষ গড়ার স্বপ্ন আমাদের দুই চোখে।

ভারি সুন্দর দেখাচ্ছিল কুশকে। তার ছিপছিপে শরীর তারুণ্যে ঝলমল করছিল। চেহারায় এবং চোখের চাহনিতে কেমন দুষ্টুমি আর বুদ্ধির দীপ্তির ঝিলিক।

রামচন্দ্র সহসা কথা বলতে পারল না। চুপ করে রইল। তার বিচক্ষণ মুখে কোন ভাব প্রকাশ পেল না। কিন্তু বুকের ভেতর দামামার মত কি যেন বেজে যাচ্ছিল। নিজেকে তার ভীষণ অপমানিত লাগল। কুশকে বোঝবার চেষ্টা করল। কিন্তু ঠিক বোঝা গেল না। কিন্তু এই প্রত্যাখ্যান, অপমান তো লব কুশের দেয়া নয় তার নিজেরই সৃষ্টি। পুত্রদের কাছ থেকে এতো পাওনা ছিল তার। তবু পুত্ররা ঘৃণা করছে না তাকে, অপমান কিংবা প্রত্যাখ্যানও করছে না। শুধু অভিমান করে আছে। সেটাই তো স্বাভাবিক। সুতরাং তাদের কথায় ব্যথিত হলে তো তার হবে না। জীবনের গতি বড় বিচিত্র। এর বাঁকে বাঁকে কত অঘটন বিপর্যয়, রঙ্গ তামাশা। অপাপবিদ্ধ তরুণ পুত্রদের মুখের শ্রী তার বুকের ভেতর এক কোমল অনুভূতির সৃষ্টি করল, আর ওদের দেখেই প্রথম টের পেল সন্তানের অনুভূতি কেমন হয়? পুত্র স্নেহ কাকে বলে? আর সেই পুত্রদেব ভুলে, সিংহাসন সামলাতে তাদের নিয়ে ছিনিমিনি খেলল। এর মূল্য তো তাকে দিতে হবে। এখন অনুশোচনা হওয়ারই কথা। সন্তান বড় মায়ার জিনিস। মায়া-মোহবশত সে ভাবছিল রাজপ্রাসাদে মহাসুখে, নিরাপদ আশ্রয়ে আহার বিহার বিলাসিতায় যখন তার জীবন কাটছিল তখন প্রিয়তমা পত্নী ও পুত্র প্রতিমুহূর্ত বনে জঙ্গলে বিপদের ভেতর এক দুরন্ত অনিশ্চয়তা নিয়ে অভুক্ত ছিল হয়ত। আশ্রয়ের সন্ধানে একস্থান থেকে আর একস্থানে ঘুরে বেড়াত। গুপ্তচরদের সন্ধানী দৃষ্টি ফাঁকি দিয়ে কিভাবে নিজেদের নিরাপদ করা যায় তার ভাবনাতেই কাটত বৈদেহীর দিনগুলো। সুতরাং পিতার কোন অধিকারে আজ তাদের দাবি করবে? কুশের প্রশ্নের কোন জবাব খুঁজে পেল না রামচন্দ্র। নীরবতা অবলম্বন করা ছাড়া

কিছু করার ছিল না। নিজেকে তার বড় নিঃসঙ্গ মনে হচ্ছিল। অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর খুব স্তিমিত গলায় হঠাৎ প্রশ্ন করল : পুত্র তা-হলে ফিরে যাব? কিন্তু ফিরতে তো আসেনি।

লব কেমন বিভ্রান্ত হয়ে গেল। মন্ত্রমুগ্ধের মত সে চেয়ে রইল অপরূপ মানুষটির দিকে। এখনো সেই মানুষটির প্রায় সব কিছুই তাদের জানার বাইরে। তবু তার ভিতর থেকে যে আকুল আহ্বান এল তা তার পিপাসিত অনুভূতির প্রতিটি রন্ধ্র দিয়ে গ্রহণ করছিল। লব সম্মোহিত, স্তব্ধ বাক্যহারা। সে রামচন্দ্রের একটু গাঁ ঘেঁষে দাঁড়াল।

কুশ বুঝতে পারছিল একটা উন্মত্ত আবেগ তার সব প্রতিরোধকে ভেঙে দিচ্ছিল। লয় করে দিচ্ছিল সত্তার অভিমানকে। এমন কি তার অহংকে পর্যন্ত। এইরকম একটা অনুভূতি পূর্বে ছিল না। এখন তার সমস্ত সত্তাকে যেন আক্রমণ করে ছিন্নভিন্ন করে দিতে লাগল। মনে হল এক নতুন জীবনের সূচনা। মনটা সিক্ত হল। এক রহস্যের আলো এসে পড়ল তার ওপর। এক নতুন জীবন, আকাংখার ছবি মেলে ধরল।

অশ্বমেধের বাজী হঠাৎ চিঁহিঁ করে ডেকে ওঠল। অমনি সব ছবি মিলিয়ে গেল। আত্মসম্বিৎ ফিরে এল। ভিতরটা কঠিন হল। দানা বেঁধে উঠল প্রতিরোধ। এতক্ষণে এই সুচতুর কৌশলী মানুষটির প্রতি তার প্রত্যাখ্যানের ভাবটা গাঢ় হল। কুশ দুঃখিতভাবে মাথা নাড়ল। বলল : কিন্তু আপনার তো নিজের সন্তানদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক গড়ে ওঠে নি। কাঙালের মত আঁকড়ে ধরলে ভিক্ষে মেলে হয়ত কিন্তু আত্মীয়তা গড়ে ওঠে না। আপনি ভুল করছেন রাজন, আমরা আপনার কেউ নই। আমরা প্রতিপক্ষ শুধু। একটা আদর্শ নিয়ে আমরা লড়ছি। এ লড়াই খুবই সাংঘাতিক। এ যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমরা আপনার ডাকে সাড়া দিতে পারি না, পারি না বাজী ছেড়ে দিতে। পারি না এতগুলো মানুষের স্বার্থকে ডুবিয়ে স্বার্থপরের মত রাজসুখের প্রলোভনে ছুটে যেতে। ঐ অসহায় মানুষগুলোর জীবন ও স্বার্থ নিজেদের সুখের জন্যে নষ্ট করতে পারি না। এই অরণ্যের মানুষজন, মাটি, এখানকার জল হাওয়া আকাশ ধুলোর গন্ধ আমরা বড় ভালবাসি। আমাদের যা কিছু সুখ উত্তেজনা আনন্দ তা শুধু বিশাল জনস্থান মধ্যবর্তী অরণ্য অঞ্চলকে ঘিরে। এর বাইরে আমাদের কোন সাম্রাজ্য নেই।

কিছুক্ষণ অপলক চোখে চেয়ে থাকল রামচন্দ্র। কুশের কথা শুনে ভীষণ গর্ব হল। পুত্রেরা তার চেয়ে অনেক বড়, অনেক মহান আর উদার। বৈদেহীর মত। দেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে একদিন পথ দেখাবে। অথচ তাদের প্রতি কোন কর্তব্যই করা হয়নি তার। আজ আর ভুল করবে না বলে সঙ্কল্পবদ্ধ হল। যে কোন মূল্যে সুধন্য হয়ে ভরপুর হয়ে অযোধ্যায় ফিরবে। রামচন্দ্রের চোখে কাঙালের প্রার্থনা জ্বলজ্বল করতে লাগল। শান্ত গভীর গলায় বলল : বৎস লবকুশ, কিছুই হারাবে না তোমরা। এদেশ, মাটি, মানুষ প্রকৃতির মালিক তো তোমরাই। চারপাশে যারা আছে তাদের সবাইকে নিয়ে আমি তোমাদের চাই। এই চাওয়া আমার মিথ্যে নয়। এর ভেতর কোন ছলনা নেই, কোন শর্ত নেই। তোমাদের ঐ মধুর গলায় একবার পিতাজী বলে ডাক। শুধু বল : পিতাজী।

কুশ তবু নীরব। গম্ভীর স্তব্ধ। ছিলা ছেঁড়া ধনুকের মত রামচন্দ্রের সমস্ত সত্তাটা নাড়া খেল। পরাভবের বেদনায় হৃদয় মথিত হতে লাগল। আর্তস্বরে বলল : চাই না আমি অশ্বমেধের ঘোড়া। আমি শুধু তোমাদের চাই। তোমাদের থেকে বড় নয় অশ্বমেধের বাজী। কি আছে ওতে? তোমাদের জন্য আমি সব হারাতে পারি। হারানোর যে এত আনন্দ, কে জানত? না হারালে বোধ হয় কিছু পাওয়া যায় না। নতুন করে পাওয়া, পেয়ে ভরপুর হয়ে সুধন্য হওয়ার আনন্দ যে, হারার ভেতর এমন করে লুকিয়ে থাকে আগে কখনও টের পাইনি। পুত্র, ফুরিয়ে যাওয়া আমাকে নবীকৃত কর তোমাদের ক্ষমায়, ভালবাসায়। একবার শুধু পিতাজী, পিতাজী বলে ডাক।

বাইরে রোদের তেজ পড়ে এসেছিল। স্নিগ্ধ বনের ছায়া দীর্ঘতর হচ্ছিল। বুলবুলি ডাক ছিল ঝাউয়ের ডালে। গায়ে কাঁটা দিল লব কুশের। হঠাৎ একটা আবেগে ভিতরকার সব অভিমানের বিস্ফোরণ ঘটে গেল। প্রতিরোধের বেড়া ভেঙে লবের বুক থেকে হঠাৎ উৎসারিত হল : পিতাজী।

কি করবে কুশ? তারও বুকের ভেতরটা গলে যাচ্ছিল। লবের ডাকটা কুশের বুকের মধ্যে গতিময় তীরের মত এসে আমূল গেঁথে গেল। সেও অস্ফুট স্বরে ডাকল—পিতাজী।

লব কুশ একসঙ্গে রামের বুকে মুখ গুঁজল আর রামচন্দ্র দুবাহু দিয়ে তাদের বুকে টেনে নিল। সমস্ত দুঃখ অভিযোগ অনুযোগ নিজের বুকে নিঃশেষে শুষে নিতে লাগল। পিঠের ওপর হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলল : তোমাদের কোন আকাঙ্ক্ষাই অপূর্ণ থাকবে না। তোমাদের আমি সবার উচ্চাসনে দেখতে চাই। পৃথিবীর সব মানুষকে যে অধিকার মর্যাদা, সম্মান, তোমরা দেবে বলে সঙ্কল্প করেছ, তা থেকে কেউ বঞ্চিত থাকবে না আর। পাতালপুরীও না। বলতে বলতে দারুণ দীপ্তিতে রামচন্দ্রের মুখ দীপ্ত হয়ে উঠল।

রামচন্দ্র কুটিরের মধ্যে ঢুকল একা। ডান দিকে দেয়াল ঘেঁষে একটা কাঠের চৌকি। পরিপাটি করে শয্যা পাতা। চৌকির খুব কাছে সলতে উস্কানো দীপ জ্বলছে। তার ঔজ্জ্বল্যে ঘরখানা কিছুটা উদ্ভাসিত। কোণে কোণে আঁধার জমে আছে। রামচন্দ্রের দৃষ্টি বৈদেহীর দিকে। দেয়ালে তার মস্ত ছায়া।

এ সাক্ষাৎ অনিবার্য, জানত সীতা। তপোবনে রামচন্দ্রের আগমনের সময় থেকে তার কৌতূহল, জিজ্ঞাসা, একটা ভীরু বিভ্রান্তি ক্রমেই তীব্র হচ্ছিল। দরজার দিকে পিছন করে দেয়ালের দিকে মুখ করে বসেছিল সীতা। সামনে তার দীপ জ্বলছিল। দেয়ালে রামচন্দ্রর ছায়া পড়ল। বুকটা কেঁপে গেল। বড় ছায়া দীর্ঘতর হল।

রামচন্দ্র যতটা সম্ভব পায়ের শব্দ চেপে চেপে সীতার দিকে অগ্রসর হল। ছায়া ক্রমে ছোট হল। চৌকির কাছাকাছি এসে থামল। সীতা রামচন্দ্রকে নয় তার ছায়াকে দেখছিল। ছায়া স্থির। রামচন্দ্রের আচরণে কেমন একটা দ্বিধার ভাব। তাকে অনুতপ্ত ও অপরাধী মনে হল। তার সমস্ত অভিব্যক্তিটা ছায়াতেও ফুটে উঠল। সীতার বুকের ভেতরটা থর-থর করে কেঁপে গেল। হৃদয় মথিত হতে লাগল। তার ঘাড় আরো শক্ত এবং আড়ষ্ট হয়ে রইল।

রামচন্দ্র অপরাধীর মত সীতার খুব কাছে বসল। তার উষ্ণ শ্বাস সীতার গায়ে লাগছিল। কিন্তু আলাপ বিনিময়ের সাপেক্ষে সে আরো ঘন হয়ে বসল। স্বভাবসিদ্ধ সংযম রক্ষা করে কানের কাছে মুখ এনে ঠোঁট চেপে চুপিসারে ডাকল : বৈদেহী!

ওই ডাক শোনামাত্র চমকানো ব্যথায় সীতার বুকটা টন টন করে উঠল। ভেতরটা শিরশির করতে লাগল। গায়ে কাঁটা দিল। উদ্গত নিঃশ্বাস বুকের পাঁজরের খাঁচায় আটকে গিয়ে ব্যথা করতে লাগল। নিঃশব্দে কয়েকবার মাথা নাড়ল। মাথা নাড়াটা প্রত্যাখ্যানের; অপমানের; যন্ত্রণার, কে জানে? দুরন্ত আক্ষেপে সহসা সমস্ত শরীরটা পাক দিয়ে মুচড়ে ওঠল। দু'হাত দিয়ে বিছানার চাদরটাকে মুঠো করে চেপে ধরল। সমস্ত শক্তিকে একত্রিত করে সে যেন যুঝতে লাগল নিজের সঙ্গে।

রামচন্দ্র ব্যাকুলস্বরে আবার ডাকল : বৈদেহী আমি তোমাকে নিতে এসেছি।

সীতার কোন জবাব শোনা গেল না। কান্নাও না। হঠাৎ তার সমস্ত শরীরটা নাড়া খেল। রামচন্দ্রের দিকে ঘুরে দাঁড়াল। সহজে এবং অনায়াসে তার দিকে অপলক চোখে চেয়ে রইল।

রামচন্দ্র সীতার নিষ্পাপ দৃষ্টির দিকে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকতে পারল না। কেমন বিব্রতবোধ করল। মনের ভেতর কথার সাগর উথলে উঠল, কিন্তু যা উচ্চারিত হতে তার ভেতর থেকে দ্বিধা এল। লজ্জায় জড়সড় হয়ে সহসা চোখ নিচু করল। তৎক্ষণাৎ একটা অপরাধবোধের কাঁটা বিঁধে গেল বুকের মধ্যিখানে। রামচন্দ্র মাথা হেঁট করল।

সীতার কষ্ট হল। মুখে সমবেদনার ভাব ফুটল। কিন্তু আড়ষ্টতা কাটিয়ে কিছুতে সহজ স্বাভাবিক হতে পারল না। রামচন্দ্রের মুখ থেকে তার দৃষ্টি সরে এল শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গে। চেহারাটা আগের মত আঁট সাঁট নেই। চামড়া লোল হয়েছে ঈষৎ। রোগা হয়ে গেছে। চোখের কোলে কালি পড়েছে। মুখেও বিষাদের চিহ্ন প্রকট। রামচন্দ্রকে সুখী কিংবা শান্ত মনে হল না। অমনি তার রমণী হৃদয় মমতায় গলে গেল। একটু মায়া হল। ইচ্ছে হল, একটু আদর করতে। কথাটা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মুখে লাল ছটা লাগল। লজ্জা পেল। রামচন্দ্রের দিকে সীতা আর তাকাতেই পারল না। চকিত

লজ্জায় চোখ নত হল। কিন্তু রামচন্দ্রের অতি স্বাভাবিক এবং কাতর জিজ্ঞাসার কি জবাব দেবে সীতা জানে না। না জানার কাতরতা তাকে বিষণ্ণ এবং গম্ভীর করল।

রামচন্দ্রও নীরব। নিজের সত্তার সন্ধানে ডুবে গিয়ে সে গভীর অন্যমনস্কতায় তাকাল সীতার দিকে। হঠাৎ সীতার ঘুরে দাঁড়ানোর ভঙ্গিটা তাকে মুগ্ধ করল। অনুতাপিত হয়েই যেন নিজের প্রশ্নের জবাবে কৈফিয়তের সুরে বলল : আমার অনেক কাজের অর্থ বুঝি না। আমি বুঝতে পারি না এক একটা ঘটনা কেন ঘটে যায়? আমি যা অন্তর দিয়ে কখনও চাই না তাই করি। এমন অদ্ভুত অদ্ভুত সব ঘটনা ঘটে যায় যা আমি কখনো মনে ভাবি না। মনে হয় আমাকে দিয়ে কেউ করিয়ে নেয়। সব সময় মনে হয় আমার ইচ্ছেয় ঘটছে না। কিন্তু তার সব বোঝা, দায় আমার ঘাড়ে এসে পড়ে।

সীতার কৌতূহল গভীর হল। বিভ্রান্ত বিস্ময়ে রামচন্দ্রের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল কয়েক মুহূর্ত। কিন্তু তার এরকম স্বীকারোক্তির অন্তর্নিহিত অর্থ কিছুই অনুমান করতে পারল না। বরং অবাক লাগল এই ভেবেই যে নিজের কাজের জন্যে যে সব ঘটনা ঘটছে তার কিছুই জানবে না সে, এরকম কখনো হয়? না, সত্যি হওয়া সম্ভব? হলে কেউ তা বিশ্বাস করবে? রামচন্দ্রের স্বীকারোক্তি এক রহস্য। এক অদ্ভুত জটিল রহস্য। কিন্তু রামচন্দ্রের অসামান্য মুখশ্রীতে যে কষ্টের ছাপ, আত্মগ্লানির যন্ত্রণাময় ছবি ফুটে উঠেছিল সীতা তাকে অবিশ্বাস করবে কি করে? রামচন্দ্র তার কাছে চির রহস্যময় প্রশ্ন হয়ে থাকল। নিজেকেই এই মুহূর্তে প্রশ্ন করল সীতা : তবু এই ধূর্ত, খুনী, পাষন্ড, মানুষটাকে এখনও ভালবাসে সে? একটা অপমান বোধ তার মনকে উত্তেজিত ও বিষণ্ণ করে তুলল। কিন্তু মন বলছিল স্বীকারোক্তির সবটাই সত্যি নয়। প্রতিবাদ নিরর্থক বোধ হল। এসব কথার কি জবাব দেওয়া যায়? সীতা তাই চুপ করে থাকা শ্রেয় মনে করল।

কিন্তু একটা আহত বিষণ্ণতা সীতার প্রাণ জুড়ে বেজে যেতে লাগল। প্রাণহীনের মত জানলার দিকে হেঁটে গেল। রামচন্দ্রের দিকে পিছন করে এক পাল্লা খোলা জানলার গরাদ ধরে দাঁড়াল।

রামচন্দ্র আড়ষ্ট গলায় ডাকল : বৈদেহী! ভুল করেছি, অপরাধ করেছি।

সীতা মুখ ফেরাল না। ঠায় দাঁড়িয়ে রইল। রামচন্দ্রও খুব ঘন হয়ে দাঁড়াল। তার কাঁধের দিকে তাকাল। হাত দিয়ে স্পর্শ করবে কি না একবার ভাবল, কিন্তু সাহস হল না। দ্বিধা, সংশয়ে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। সেই মুহূর্তের সংশয় তাকে একরকম অসহায় করে তুলল। সেই অসহায়তাবোধ রামচন্দ্রের অনুভূতির রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছড়িয়ে গেল। নিঃশব্দ আর্তনাদ বাজল শ্রীরামের কণ্ঠস্বরে : বৈদেহী হারাতে চাই না তোমাদের। আর হারাতে চাই না। সকলের মধ্যে নতুন করে আমি বাঁচতে চাই।

সীতা তথাপি জবাব দিল না। তার দিকে ফিরেও তাকাল না। জানলার খোলা পাল্লাটা আস্তে আস্তে বন্ধ করল। বন্ধ জানলার কাঠের গরাদের মাঝখানে মুখ রেখে দাঁড়িয়ে রইল।

সীতার চুলে, ব্যবহৃত আরকের গন্ধে মাতাল হয়ে উঠল রামচন্দ্র। একবার পিছন ফিরে তাকাল, তারপর সীতার কাঁধে হাত দিল। সীতার শরীর স্থির। রামচন্দ্র দু'হাতে তাকে শক্ত করে ধরে নিজের দিকে তার মুখ ফেরাল। সীতা বাধা দিল না। রামচন্দ্রের চোখে চোখ রাখল। রাগ, ঘৃণা, বা বিদ্বেষের কোন তীব্রতা তার মুখে নেই। কোন করুণ অভিব্যক্তিও না। বরং এক আশ্চর্য অন্যমনস্কতা তার চোখে। রামচন্দ্র ব্যগ্র অস্থির স্বরে ডাকল : বৈদেহী।

সীতা চোখ না সরিয়ে উত্তর দিল : বলো। স্খলিত ভেজা তার স্বর।

চুপ করে যে থাকতে পারছি না।

সীতা একভাবে স্থির থেকে বলল : আর তো বলার কিছু নেই। কত বার তো বলেছ। আর কি বলবে? জীবনের সমাপ্তির এখনও কি বাকি আছে?

সীতার নির্দয়তায় এক নিঃশব্দ আর্তনাদ বাজল, এক ভিন্নতর গ্রহের কান্নার মত। কথাগুলো রামচন্দ্রের বুকে তীরের মত বিঁধল। হারানোর ভয়ে বুক তার অস্থির হল। আক্ষেপের গলায় বলল : চাওয়ার শেষ নেই প্রিয়তম। জীবন এখন বাকি আছে। আমরাও ফুরিয়ে যাইনি।

তুমি আর আমাকে কিছু বলো না। তোমার কোন কথাই আমি আর শুনব না। এখন থেকে তুমি-তুমি, আমি-আমি। এর মধ্যে আর কোন সম্পর্ক টেনে এনো না।

বৈদেহী! রামচন্দ্র যেন সহসা আঘাতে আর্তনাদ করে উঠল। আমি অপরাধ করেছি। আমার ভুলের অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করার একবার সুযোগ দাও। ভুল তো মানুষেই করে।

তা ঠিক। সীতা বলল। তার মুখে ঈষৎ বিতৃষ্ণার ছাপ ফুটল। ঠোঁটের কোণে চকিতে একটু হাসি ঝিলিক দিল। ব্যঙ্গের বিদ্রূপের হাসি। আর তাতেই তাকে দুর্জয় প্রতিমার মত অপরূপ দেখাল। সীতা বলল : পনের বছর পর মনে হল তোমার সব ভুল হয়েছে, তুমি অপরাধ করেছ, তুমি প্রায়শ্চিত্ত করতে চাও। এতকাল এ কথাটা মনে হল না। হঠাৎ আজ মনে পড়ল পাপ করেছ। সীতা দৃপ্তভাবে মুখ তুলে রামের দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বলল : তা ছাড়া আর কি বলবে? সত্যি করে বলতো জেনেশুনেই তো আমাকে শ্বাপদসংকুল অরণ্যে পাঠিয়েছিলে। শত্রুপক্ষের মেয়েকে জন্তু জানোয়ারই ছিঁড়েখুঁড়ে পৃথিবী থেকে মুছে দিক এটাই তো চেয়েছিলে। কিন্তু তোমার সে ইচ্ছেয় বাধ সাধল ঈশ্বর। আমি বেঁচে না থাকলে তোমার এই স্বীকারোক্তি তো তিনি শুনতে পেতেন না। ছেলেরা বাজি ধরে না রাখলে এসব কথা আসত না।

বৈদেহী তোমার নিষ্ঠুর তিরস্কার আমার পাওনা ছিল। এতো আমার অপরাধের শাস্তি। তোমার নিষ্করুণ অভিযোগ আমার হৃদয় বিদীর্ণ করছে। তবু সেটাই আমার পরম পাওয়া।

সীতা অস্থিরভাবে মাথা নাড়ল। বলল : আঠারোটা বছর নিশ্চিন্তে কাটানোর পর এ কথা তুমি বলতে পারছ? সত্যি করে বলতো বৈদেহীর কথা কোনদিন ভেবেছ? আমি আছি কি নেই, এই খবরটা পর্যন্ত জানতে চাওনি কোনদিন। চেষ্টাও করনি। শত্রুঘ্ন মধুবনে যাওয়ার পথে এই আশ্রমে রাত কাটাল। অথচ একবারও বৈদেহী সম্পর্কে কোন কৌতূহল দেখাল না। কেন বলতে পার? তোমরা জেনেই নিয়েছিলে জানকী বেঁচে নেই। অথচ আমি তোমাকে বিশ্বাস করেছিলাম। কিন্তু তুমি আমাকে মিথ্যে বলেছিলে। সহসা সীতার কণ্ঠ অশ্রুরুদ্ধ হয়ে গেল। ঠোঁট চেপে ধরল কিন্তু কান্না বারণ মানল না। রাশিকৃত কান্নায় হারিয়ে গেল তার কণ্ঠস্বর। কাঁদতে কাঁদতে বলল : তুমি মিথ্যেবাদী। তুমি ঠগ। বিশ্বাসঘাতক। একটু থেমে সীতা আবেগ সংবরণ করল। শান্ত সংযত হয়ে অবিচলিত দৃঢ়তায় বলল : তোমার এই অনুশোচনা, স্বীকারোক্তি কতখানি সত্যি আমার সন্দেহ হয়। এ যে তোমার অশ্বমেধের ঘোড়ার উদ্ধারের ছলনা নয়, বুঝব কেমন করে? অপরাধ নিও না। তোমাকে আমি আর বিশ্বাস করি না। বিশ্বাস একবার ভাঙলে তা আর জোড়া লাগে না। বিশ্বাস অপবিত্র করতে তুমি আমায় নিয়ে অনেক খেলেছ। তোমার খেলার পুতুল হতে আর ইচ্ছে নেই জীবনের আর কটা দিনই বা আছে? বাকি জীবনটা নিজের মত থাকতে দাও।

রামচন্দ্র সীতার মুখে এমন ভাষা আগে কখনো শোনেনি। তাই খুব অবাক লাগল। দেবার মত কোন জবাব ছিল না তার। বুকের গভীর থেকে একটা নিঃশ্বাস পড়ল খুব ধীরে। তৎক্ষণাৎ মুখ নামিয়ে অপরাধীর মত উচ্চারণ করল : তোমার সব অভিযোগই সত্য।

স্বীকার করছ? সীতার স্বরে বিস্মিত জিজ্ঞাসা।

রামচন্দ্রের কণ্ঠস্বরে কাতর অনুনয়। বৈদেহী! অতীতকে টেনে এনে বর্তমানের সুখটুকুকে নষ্ট করে দিও না। দুঃস্বপ্নের সেই দিনগুলোকে তুমি ভুলে যাও।

ভুলে যাব? ভুলে যাওয়া যায়!

কষ্ট হয় বৈকি। তবু ভুলতে হয়, ভুলে যেতে হয়। তা না হলে বেঁচে ওঠা যায় না। একটা মিথ্যে জীবনের অন্ধকার গুহা থেকে বেরিয়ে অন্য জীবনের আলোকিত প্রান্তরের দিকে ছুটে যাওয়ার আর এক নাম বেঁচে ওঠা। অতীতের বোঝাটাকে পিঠে বয়ে বেড়ানোর ভেতর তো কোন আনন্দ নেই। ওটা শুধু কষ্ট বাড়ায়। তুমি আর ওসব কথা বল না। আমি আর তোমাকে হারাতে চাই না। তাই তো এমন কাঙালের মত চাইছি। তোমার দিকে হাত বাড়িয়ে বলছি আমি রিক্ত, নিঃস্ব। আমাকে করুণা কর। ক্ষমা কর। আমি ভুল করেছি। আমার ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করতে দাও। বৈদেহী, আমাকে তুমি ফিরিয়ে দিও না। প্রত্যাখ্যান কর না। আমাকে তোমার সঙ্গে থাকতে দাও। তোমাকে আর আমি হারাতে চাই না। তুমি আমার পথ চলার দীপ। দীপ নিভে গেলে অন্ধকার। সেই অন্ধকার যে কি ভয়ানক আমি জানি। আমাকে আর অন্ধকারে রেখ না।

তোমার কথাগুলো শুনতে ভারি ভাল লাগছে। এই কথায় চিরকাল ভুলেছি। আজও তুমি ভিক্ষে

চাইছ। ভালবাসা ভিক্ষে করে পাওয়ার জিনিস নয়। কাঙালপনায় ভালবাসা নোংরা হয়ে যায়। দাতা গ্রহীতার সম্পর্কে বোঝা হয়ে ওঠে। তখন ভালবাসা আর সুন্দর থাকে না তাই তোমার কাছে মিনতি আমাকে কিছু বোঝাতে চেওনা। অমন ব্যাকুল করে ডেকো না।

বৈদেহী এসব কি বলছ তুমি! রামচন্দ্রের কণ্ঠস্বর সহসা রুদ্ধ হল।

সীতা ভুরু তুলে চোখ দুটি-স্থির করে রাখল রামচন্দ্রের চোখে। বলল : মহারাজ সেই এলে, বড় দেরি করে এলে। বড় অপমান করে এসেছ। তোমার অবহেলার যন্ত্রণা, অবমাননার ক্ষত নিয়ে আমি আর স্ত্রী হয়ে উঠতে পারব না। কলংক থেকে স্বাভাবিক জীবনের ফেরা বড় কষ্টের, বড় যন্ত্রণার। শ্রদ্ধা মর্যাদা হারিয়ে আমি কি নিয়ে থাকব? ভালবাসা মরে গেলে জীবনের আর কি থাকল? প্রেম তো জীবনের প্রতীক। আমার সেই জীবনটারই মৃত্যু হয়েছে। আমাকে আর ডাক কেন? তুমি আমার স্বামী এ নিয়ে গর্ব করার মত কি দিলে আমাকে? তোমাকে বিয়ে করে আমার যে কি অবমাননা হল এ জন্মে তা আমিই জানি।

বৈদেহী আমাকে ক্ষমা করে দাও। তোমাকে আমি ঠিক বোঝাতে পারব না। আমি শুধু অন্যরকম। আমার মতন আমি। তোমার কাছে আমার অনেক অপরাধ। নিজগুণে তুমি মার্জনা করে নাও। অনেকবার তো করেছ, এবারেও কর।

মহারাজ কেই বা কাকে বোঝে বল? বোঝা কি অত সহজ? বোঝাটা হয়তো বড় কথা নয়, বোঝবার চেষ্টা চালিয়ে যাওয়াটাই সবচেয়ে জরুরী। বুঝতে চাইলে একদিন নিশ্চয় বুঝবে। আঘাতের ক্ষতও একদিন শুকিয়ে যায়, তার ব্যথাও থাকে না। কিন্তু দাগটা মোছে না। আমি কেমন করে ভুলব আমার অপমান? আমার অবমাননা? কলঙ্কের লজ্জা?

রামচন্দ্রের হৃৎপিণ্ডে যেন স্পন্দন নেই। বজ্রাহত চিত্রার্পিতের মত দাঁড়িয়ে থাকল। কয়েকটা মুহূর্ত কেটে গেল। ভেজা গলায় ডাকল : বৈদেহী!

সীতা দু'হাতে কানের পাশটা চেপে ধরে রামের কাছ থেকে ছিটকে অন্য দিকে সরে দাঁড়াল। দেয়ালের ছায়া নড়ে উঠল। তীক্ষ্ণ ঝাঁঝালো গলায় হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে বলল : না শুনব না। শুনতে চাই না তোমার ডাক। তোমার কাছে ফিরে যাওয়ার মত অপমান মেয়ে মানুষের জীবনের আর কিছু নেই। আমি তোমার দয়া চাই না। তোমার করুণা না নিয়ে তো আঠারো বছর বেঁচে আছি। তোমাকে আমি যে ভালবাসা দিয়েছি, তুমি তার সম্মান দাওনি, তার কোন মূল্য দাওনি। বলতে বলতে আকুল কান্নায় ভেঙে পড়ল সীতা। গলা দিয়ে হিক্কা ওঠার মত একটা শব্দ বার হতে লাগল।

রামচন্দ্র শিশুর মত অসহায়ভাবে আর্তনাদ করে উঠল। বৈদেহী! বৈদেহী আমি তোমাকে না পেলে পাগল হয়ে যাব। পেয়ে হারানোর মত জ্বালা কিছু নেই।

সীতা দেয়ালের ছায়ার দিকে চেয়েছিল উদাস চোখে। রামচন্দ্র তাকে অনেক কিছু দেয়নি এই জীবনে। আবার দিয়েছেও অনেক কিছুই। এখনও তার ফুরিয়ে যাওয়া জীবন নবীকৃত হয়ে উঠতে পারে তার ঘন সান্নিধ্য উষ্ণ আলিঙ্গনে। কিন্তু দু'হাত ভরে সে নিতে পারছে কৈ?

রামচন্দ্রের হাতটা কাঁধ থেকে নামিয়ে দিয়ে সীতা বলল : ছাড়। আমার মন ভাল নেই। এখন তুমি যাও।

আমি তোমাকে হারাতে চাই না বৈদেহী। তোমাকে যে আমার বড় দরকার।

বলছি তো, আমার মন ভাল নেই। আমাকে একটু একা থাকতে দাও। আমাকে নিয়ে খেলার পুতুলের মত যা খুশি অনেক করেছ। আমার বিশ্বাসকে অপবিত্র করেছ। এখনও তোমার সাধ মেটেনি। —তুমি যাও। সত্যিই যাও। আমি তোমায় মিনতি করছি, তুমি যাও।

রামচন্দ্র এবার সত্যিই অবাক হয়ে চেয়ে থাকল সীতার দিকে। তারপর মাথা নীচু করে সেখান থেকে বেরিয়ে এল।

গভীর রাত্রি পর্যন্ত সীতার ঘুম হল না। গানের কলির মত মনের মধ্যে গুণগুণ করে রামচন্দ্রের

কথাগুলো। বৈদেহী আমি তোমাকে হারাতে চাই না। আমি ভুল করেছি। ক্ষমা কর। লক্ষ্মীটি আমায় ফিরিয়ে দিও না। করুণা করে ধন্য কর আমায়। আমার ওপর নিষ্ঠুর হয়ো না। আমাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে দাও।" কথাগুলো মনের ভিতর মোমের মত গলে পড়তে লাগল।

খারাপ লাগছিল সীতার। রামচন্দ্রের ব্যাকুলতার ভেতর তার বুকের ভেতরটা পরিষ্কার দেখতে পেল সীতা। তার দুঃখ, দ্বিধা, দ্বন্দ্ব, একাকীত্ব। তবু সীতা সমবেদনা জানায়নি, একটুও সমবেদনা দেখাতে ইচ্ছা করেনি। রামচন্দ্রের একটু শান্তি হওয়া দরকার। কথাটা মনে হওয়া মাত্র বুকের মধ্যে একটা চাপা কষ্ট অনুভব করল। রামচন্দ্র ফিরল, সব জেদ ছেড়েই ফিরল, কিন্তু বড় দেরি করে। সময়ের মধ্যে না ফিরলে তার কোন দাম থাকে না। ঘর আর ঘর থাকে না। সব চাওয়া তখন মিথ্যে হয়ে যায়। বড় বেদনামিশ্রিত বিস্ময়ের সঙ্গে কথাগুলো ভাবল সীতা। সেই মুহূর্তে একটা গভীর শ্বাসের সঙ্গে নিরুচ্চারে বলল, বিশ্বাস কর আজও তোমাকে সেইরকম ভালবাসি। আমার প্রেম শ্রদ্ধা একটু কমেনি। কিন্তু তুমিই সম্পর্ক তিক্ত করে তুললে। এই তিক্ততা তো চাইনি। তোমার কৃতকর্মের ফল আজ আমার জীবনকে অভিশপ্ত করে তুলেছে। অথচ কত স্বপ্ন ছিল। তার সঙ্গে স্মৃতিও। সব আমার অদৃষ্ট! মন খারাপ করে দেওয়া আপসোসের মত বিষণ্ণ একটা শ্বাস পড়ল নিঃশব্দে। গভীর বিষাদে স্তব্ধ হয়ে বসে রইল নিজের চৌকিতে।

অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইল কুটিরের জানালার দিকে চোখ রেখে। জ্যোৎস্নালোকিত পৃথিবীর অনেকখানি তার চোখের সামনে দৃশ্য হল।

প্রকৃতি বড় শান্ত, স্তব্ধ, সমাহিত ভীষণ মৌন আর নির্বিকার। প্রকৃতির কোন ক্ষোভ নেই, দুঃখ নেই। নির্মেঘ আকাশ। লক্ষ লক্ষ নক্ষত্র জ্বলছে সেখানে। সীতার মনে হল, তারারা চোখ মেলে যেন তাকে নিরীক্ষণ করছে। তার বোধ বুদ্ধি বিবেচনা সিদ্ধান্তের দিকে কৌতূহলী চোখে তাকিয়ে আছে।

সীতা উর্ধ্বমুখে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল আকাশের দিকে। তার বুক থেকে ধাবিত হল পুঞ্জীভূত অভিমান : হে ঈশ্বর! এ আমায় কোন পরীক্ষায় ফেললে? আমি করব কি এখন? আজ যখন ভিতরে ডাক পড়েছে, তখন লড়াই বেঁধেছে বাইরের আমার আমির সঙ্গে।

রামচন্দ্রের বিরুদ্ধে তার অনেক অভিযোগ, অনুযোগ ছাই চাপা আগুনের মত। সুখী দম্পতির মধ্যে থাকে তা। কিন্তু সেজন্য তাদের দাম্পত্য জীবন থেমে থাকে না। কিংবা মাঝপথে পা মিলিয়ে নতুন করে চলা শুরু করতে হয় না। সেখানে সব নারীই গৃহিণীর দায়িত্ব, কর্তব্য ভালবাসার সমুদ্রে ভেসে যায়। তারা নিজের সব নিজস্বতাকে হারিয়ে ফেলে সংসারের মধ্যে। কিন্তু সে নিজে হারাল অন্য এক নদীতে।

প্রত্যেকের জীবন নদীর মত। এক খাত থেকে অন্য খাতে বয়ে যায়। জীবনটা থেমে থাকে না। থেমে পড়া মানেই মৃত্যু। ঈশ্বর তাকে বানের স্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে সাগরে। একেবারে নতুন জীবন। নতুন প্রত্যাশা দায়িত্ব, কর্তব্য। নতুন জীবনের দিকে প্রত্যাশার সঙ্গে তাকানোর ভাল-মন্দর চিন্তাভাবনা। এ ছিল এক অন্য জীবন তার। জীবনের মধ্যেই যে অন্য জীবন সুপ্ত থাকে এই প্রথম জানল। সংসার ছাড়াও যে একজন মেয়ের অনেক কিছু থাকতে পারে কোন পুরুষই তা স্বীকার করে না। পুরুষের ব্যক্তিত্বের পাশে, নিরাপত্তার মধ্যে তাদের বিপুল কর্তৃত্বের মধ্যে সব নারীর ব্যক্তিত্ব স্বাতন্ত্র ঢাকা পড়ে যায়। অস্তিত্ব এবং সত্তা নিয়ে প্রত্যেক মেয়ে পুরুষের পাশে মিটমিট করে। মানুষী শক্তি, ক্ষমতা, ব্যক্তিত্ব থাকলেও স্বীকৃতি পায় না। সংসারে স্বামী ছাড়া নারীর কোন আলাদা সম্মান নেই, স্বীকৃতি নেই, এমন কি তার ব্যক্তিত্বও গড়ে উঠতে পারে না নিজের মত করে। স্বামীর কাছে নারীর আত্মসমর্পণ ছাড়া কিছুই থাকে না। রামচন্দ্র তাকে নির্বাসিত করে কার্যত তার মঙ্গল করেছে। সে নিজের পথে নিজের মত করে গড়ে উঠেছে। জীবনই বোধ হয় মানুষকে বদলে দেয়।

সীতার ভাবতে খারাপ লাগছিল ভীষণ। তবু অনিবার্যভাবেই মনে হল ঈশ্বর যাই করেন তার পেছনে যুক্তি থাকে। সেই যুক্তিটাকে আজ সমস্ত প্রাণ মন দিয়ে অনুভব করল প্রথম। নির্বাসনের দুঃখ, যন্ত্রণা তার কাছে বড়ই বেদনাদায়ক, তবু একটা নিজস্ব মূল্য ছিল তার। নতুন স্বাদ তো

ছিলই। আর ছিল এক চমৎকার বেঁচে ওঠার গর্ব। জীবনের তেতাল্লিশটা বছর ধরে যে জীবনটাকে নারী জীবনের একমাত্র সত্য বলে জেনেছিল সেতো একটা অভ্যাস ও সংস্কার, বিশ্বাস মাত্র। এক-ঘেয়েমিতাই মিশে আছে তাতে। সংসারে নারী গুহাবাসিনী। গুহার বাইরে জীনটাকে সে চেনে না, জানে না বলেই সে সমাজের ভয়ে জড়সড়। কিন্তু এই ভয়, তার বড় বন্ধন। সেই বিস্মৃত অতীতের কথা মনে হলে সীতার অপমানের কথা মনে পড়ে। আর তখনই সমস্ত মনটা তেতো হয়ে যায়। কিছু ভাল লাগে না। কোন মেয়ে মানুষ তার জীবনের অপবাদ, অসম্মান আর কলঙ্ককে ভুলতে পারে না। বুকে তার ক্ষতটা হয়ত একদিন শুকিয়ে যায়, কিন্তু দাগটা মোছে না। সেখানে একটু হাত লাগলেই বেদনায় টনটন করে ওঠে।

চারদিকে কলুষিত পরিবেশের ওপর সীতার ঘৃণা জন্মাল। ঘৃণা হল রামচন্দ্রের ওপরেও। বুকে তার অভিমানের সমুদ্র উথলে ওঠল। অযোধ্যার মানুষ তাকে সমাদর করেনি, সম্মান দেয়নি, তার নামে মিথ্যা কুৎসা রটনা করেছে। রামচন্দ্রের কাছে পুত্রের চেয়ে অযোধ্যার জনগণের স্বার্থ অনেকবেশি গুরুত্বপূর্ণ। রামচন্দ্র তাই স্বামীর কর্তব্য করেনি, মানবিক দায়িত্বও পালন করেনি।

অনেক অনেক দিন পর কথাটা আবার নতুন করে মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার বুকের মধ্যে একটা কষ্ট হতে লাগল। অন্ধকারের মধ্যে অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থাকল সীতা। হঠাৎ এক ঝলক হাওয়া ঢুকল ঘরে। মাথার চুলগুলো এলোমেলো হয়ে গেল। চোখ মুখ জ্বালা করতে লাগল।

প্রেম জীবনটা তার ব্যর্থ হয়ে গেল। রামচন্দ্র ব্যর্থ করে দিল। ব্যর্থ প্রেমের অভিমান তার বুক তোলপাড় করল। অভিমান রামচন্দ্রের ওপর। আর কেউ না জানলেও সে তো জানতো প্রজারা যে রটনা করেছিল তার ভেতর মিথ্যে কতখানি ছিল। কিন্তু স্বামী হয়ে স্ত্রীর নামে কুৎসা বন্ধ করতে কিংবা তার সম্মান বাঁচাতে রামচন্দ্র কিছু করল না। রটনা বন্ধ করাটা কিছু শক্তও ছিল না, অসম্ভব ছিল না। আসলে রামচন্দ্র তার প্রেমের, ভালবাসার সম্মান দেয়নি। ফিরে তাকিয়ে পর্যন্ত দেখেনি। নির্বাসনে পাঠিয়ে মানুষের মনের সন্দেহ, বিশ্বাসটাকে দৃঢ়মূল করল শুধু। রামচন্দ্রের সাধ্য নেই বাহুবলে সেই সন্দেহ, অবিশ্বাসকে উপড়ে ফেলা। এই অপযশ, অসম্মান মাথায় করে রামচন্দ্রের কথায় অযোধ্যায় ফেরে কেমন করে? তার অন্তরের তার যন্ত্রণার গভীর থেকে তার নাভিমূল থেকে উৎসারিত হল : মানুষের সমস্ত সম্পর্কই বোধ হয় স্বার্থের।

নিজের উপর খুবই ঘেন্না হল সীতার। শুধু রামচন্দ্রের হাতে ছোট এবং হেনস্তা হওয়ার জন্য নয়, নানা মিশ্র কারণেও। ঠিক সেই মুহূর্তে তার মনে হল একজন মানুষের বুকে নিজের প্রতি যতখানি ভালবাসা এবং গর্ব থাকে, বিতৃষ্ণা বোধ হয় থাকে ততখানি। নিজেকে মানুষ যত রাগ, বিদ্বেষ ভর্ৎসনা করে, অন্যাকে বোধ হয় করে না। আর তখনি অদৃশ্য অদৃষ্টের ওপরেই তার যত রোষ আক্রোশ। একমাত্র নিরাবরণ হয়ে কাঁদা যায় নিজের অদৃষ্টের কাছে।

সীতা কাঁদতে কাঁদতে একসময়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল। ঘুমের ভেতর তার বুক জুড়ে একটা রাগ আর ধিক্কারের ঝড় বয়ে যাচ্ছিল! হঠাৎ স্বপ্নের মধ্যে ক্ষমাহীন নিষ্ঠুবতা ঘৃণায় চিৎকার করে উঠল : রামচন্দ্র, তুমি আমার পেটের ছেলেকে মেরে ফেলতে চেয়েছ। আমার সঙ্গেও তাদের মুছে ফেলতে চেয়েছ অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে। একজন খুনীও এত নিষ্ঠুর হয় না। তুমি মানুষ, না পিশাচ! তোমাকে আমি বিশ্বাস করি না। এত জোরে চিৎকার করে বলেছিল যে, তার নিজেরই ঘুম ভেঙে গেল। চমকে ধড়মড়িয়ে একেবারে বিছানায় উঠে বসল।

চিৎকার শুনে বাল্মীকি ভয় পেয়ে গেল। দৌড়ে সীতার ঘরে ঢুকল। বাল্মীকিকে দেখেই সীতা লাজুক লাজুক মুখ করে মাথা হেঁট করল। লজ্জায় কুঁকড়ে গিয়ে দুই হাঁটুর ওপর মুখ গুঁজে বসে রইল। বাল্মীকি মশারিটা সরিয়ে সীতার পাশে বসল। হতবুদ্ধির মত চেয়ে রইল তার দিকে।

বাল্মীকি একটু থমকে গিয়ে স্নেহবিগলিত স্বরে উৎকর্ণ উৎকণ্ঠায় বলল : স্নায়ুর ওপর এত ধকল কখনো সহ্য হয়? শুধু শুধু নিজের সঙ্গে লুকোচুরি খেলার অর্থ বুঝি না।

সীতা বাল্মীকির মুখোমুখি বসে একটু থামল। অপ্রস্তুত হলেও ম্লান হাসিটা তার বুকের মধ্যে থেকে ওঠে এল। বলল : আমার সব রাগ তোমার ওপর। তুমি আমাকে শান্তিতে থাকতে দিতে চাও না। সব ঝঞ্ঝাট তোমার তৈরি।

বাল্মীকি হাসল। বলল : কোন চাওয়াকে যদি পাওয়াতে পর্যবসিত করতে হয় তা হলে তা বিবর্ণ হওয়ার আগেই করা ভাল।

সীতা জ্বালা ধরা চোখে বাল্মীকির দিকে তাকাল। একটু চুপ করে থেকে বলল : যার মান-সম্মান সব হারিয়ে গেছে তার তো ফিরে পাওয়ার কিছু থাকে না। বিবর্ণ হওয়ার কিছু নেই।

ওটা কোন কথা হল না।

জীবনটা আমার এমন গোলমাল হয়ে গেল যে, নিজের কাছ থেকে নিজে পালিয়ে যেতে চাই।

কেন?

তা হলে জবাবদিহি করার থাকে না কিছুই, কারো কাছে।

নিজের সঙ্গে কেন যে অমন লুকোচুরি খেলেছ তা আমি নিজেও বুঝি না। কোন চাওয়াই শেষ চাওয়া নয়। পাতালপুরীতে নতুন করে জীবন আরম্ভ করার চেষ্টা করেছিলাম। সাধ্য আমার বেশি ছিল না কিন্তু আন্তরিকতার অভাব হয়নি কখনো, তা তুমি জান। আজ স্বার্থপরের মত নিজের সুখের দিকে তো তাকাতে পারি না। স্বামীর প্রতি তোমার কর্তব্য আছে। তাকে তুমি ভালবাস না?

খুব ভালবাসি কিন্তু সে তো বহু আগের ব্যাপার হয়ে গেছে। এখন নতুন জীবন নতুন দায়িত্ব। সব মূল্যবোধই বদলে গেছে। হঠাৎ বিধুর হয়ে গেল সীতার চোখের দৃষ্টি। রাগ অভিমান জমে উঠল বুকের পাঁজরে। বলল : আমি অযোধ্যার কে? কেউ নই? অযোধ্যার রাজমহিষীর মৃত্যু হয়েছে অনেকদিন। অযোধ্যাপতিও স্বামী নয়। স্বামীর কোন কর্তব্য করেনি। একবার একজনের সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেছে বলে চিরকাল স্বামীর দাবি নিয়ে যা খুশি তাই করবে? আমি কি তার খেলনার পুতুল? আমার নিজস্বতা বলে কি কিছু থাকতে নেই? মেয়েমানুষ বলে আত্মসম্মান মর্যাদাও থাকবে না? এত অপমান অসম্মান অপযশ কলঙ্ক নিয়ে আমি অযোধ্যায় ঢুকব কোন মুখে? অন্তঃপুরের লোকেদের সামনে কি পরিচয় নিয়ে দাঁড়াব? দুদিন পরে নতুন করে আবার কোন গুঞ্জন আরম্ভ হলে আবার যে হেনস্তা করবে না আমাকে কে বলবে?

স্তম্ভিত হয়ে গেল বাল্মীকি। সীতার এরকম মূর্তি কখনও দেখেনি। তার চেনা সীতার সঙ্গে অনেক তফাৎ। সে ছিল স্নিগ্ধ, শান্ত, নম্র, ভীষণ কোমল আর মমতাময়ী। আর এ হল ব্যক্তিত্বময়ী আত্মসচেতন, মর্যাদাশালিনী এক নারী। তমসার তীরে দেখা সীতাকে বড় করুণ আর অসহায় মনে হয়েছিল। কিন্তু এ সীতার মুখে একটা নিষ্করুণ কঠিন ভাব, আত্মপ্রত্যয়ে দৃপ্ত। কখন কি অবস্থায় কেন যে নারীর মুখের ভাব এবং আচরণ বদলায় তা বিধাতাই জানে। মানুষের মনের কারবারী সে নয়। নারীর মনের তো নয়ই।

বাল্মীকির মুগ্ধ দুটি চোখ সীতার চোখের উপর স্থির। একটা গা সিরসির করা ভাললাগা বাল্মীকির মুখে মৃদু হাসি ফুটিয়ে তুলল। বাল্মীকির ভাবতে খুবই আশ্চর্য লাগছিল সেদিনের অসহায় সীতার মধ্যে থেকে যেন এক অপমানিত লাঞ্ছিত বঞ্চিত নারী বেরিয়ে এল। মনে হল রূপসী মিষ্টভাষিণী রাজমহিষী হঠাৎ এক বিষধর সাপিনী হয়ে ফণা তুলে ধরেছে। সীতাকে বাল্মীকির সত্যিই অচেনা লাগল। বেশ একটু ভাবিত হয়ে তার দিকে অপলক চেয়ে রইল কিছুক্ষণ।

কোথায় যেন ভোর হয়েছিল। গাছের পাতায় পাতায় পাখির ঝাপ্টানোর শব্দ। তুহিন শুভ্র ডানায় পূবালি আলোর প্রথম পরশ নিয়ে একদল বক কোঁয়াক কোঁয়াক করে ডাকতে ডাকতে উড়ে গেল। ভোরের স্নিগ্ধ বাতাসে, তাদের ডানার নরম গন্ধ ছড়ানো। বকের ডাকে বাল্মীকির চমক ভাঙল। একটা গভীর দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বুকের গভীর থেকে উৎসারিত হল : সত্য যা তা, এমনি অমোঘ ভাবে অকস্মাৎ প্রকাশিত হয়ে পড়ে। জীবনই বোধ হয় মানুষকে বদলে দেয়। জীবনের সব শূন্যতাকে বোধ হয় পূরণ করে নিয়েছ।

সীতা আস্তে আস্তে বলল : জানি না। নতুন জীবনের নতুনত্ব নিয়ে অভিভূত হয়ে আছি। ভাল কি মন্দ তার বিচার করার সময় এখনও হয়নি। আমি শুধু নিজেকে শম্বুকের কাছে ভাসিয়ে দিয়েছি। স্বপ্নে দেখা তার সেই মূর্তি আমি ভুলতে পারি না। আমার সম্মানের জন্য যে এত করল : তার আত্মার শান্তির জন্য, স্বপ্ন সাধ পূরণের জন্য আমি একটু নিজের সুখ বিসর্জন দিতে পারব না

পিতাজী। বাকি জীবনে আমি আর কোন ভুল করব না। কি হবে ভন্ড মিথ্যাচারী কপট নিষ্ঠুর স্বামীর সুখ আর স্বার্থের জন্য মিছিমিছি জীবনটাকে নষ্ট করে! শম্বুকের কাছে আমার ভালবাসার ঋণ অনেক। একটাই তো জীবন। একজীবনে তা শোধ হবে না। তার জন্যে নিজেকে ভাসিয়ে দেওয়ার পথে বাধা যেটুকু ছিল তা অযোধ্যাপতি এসে দূর করে দিল। ছেলেকে পিতার হাতে সঁপে দিতে পেরে আমি নিশ্চিন্ত। আমি চাই ওরা সুখী হোক। সত্যিকারের সুখী।

বাল্মীকির মুখখানা আনন্দে দীপ্ত হয়ে উঠল। বলল : কল্যাণী, তোমার জন্য আমার গর্ব হয়। আমি বিশ্বাস করি : অন্যায়ের প্রতিকার নিজের জীবন দিয়ে এই ভাবেই করতে হয়। অবিচারকে অবিচার দিয়ে মুছতে হয়। একটা চিরন্তন সংস্কার বিশ্বাসের চেয়ে তাকে ভেঙে নতুন করে গড়া অনেক ভাল। কিন্তু আমরা অভ্যাসের ঘরে বাস করি জীবনের আলোয় নয়। তাই এই অন্ধকার জমে আছে আমাদের চারপাশে। এই অন্ধকারকে তুমি জ্যোতির্ময় করলে। তুমি আমার আলোর দূতী।

বাল্মীকি একখানা হাত ধীরে ধীরে সীতার মাথায় রাখল। একটু কোলে টানল। ভারি কোমল, ভারি স্নেহের সে স্পর্শ।

এখন বিকেল।

লব কুশের মনটা ভাল নেই। চুপ করে বসে আছে কুটীরের দাওয়ায়। বিকেলের কমলারঙের রোদ পড়ে আছে তাদের পায়ের কাছে অনুগত হরিণ শিশুর মত।

পশ্চিম আকাশে লাল গোল সূর্য। বড় থালার মত। পূবের আকাশে দশমীর বিবর্ণ চাঁদ। আকাশের দু'প্রান্তে মুখোমুখি দুজন। কিন্তু কেউ সুখী নয়। বিবর্ণ বিষাদে থমথমে গম্ভীর মুখ।

কুয়াশামাথা অন্ধকার চারদিক থেকে ধীরে ধীরে গড়িয়ে আসছে। বনের গভীর থেকে বনময়ূর, কুম্ভাটুয়া পাখি আর ভয় পাওয়া চিতল হরিণ ডেকে উঠল।

লব কেমন বিহ্বল চোখে কুশের দিকে তাকাল। কেমন একটু সুনিবিড় আচ্ছন্নভাবের ভিতর থেকে বলল : অরণ্যের কান্না শুনতে পাচ্ছিস। গোটা অরণ্য যেন উতলা হয়ে উঠেছে। জীব জন্তুও বড় অসহায় বোধ করছে। এমন আকুল করা অসহায় ডাক বনময়ূর আর চিতল হরিণের আগে শুনিনি।

কুশ একথায় একটু দিশাহারা বোধ করে চুপ করে থাকল কিছুক্ষণ। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল। শান্ত গম্ভীর গলায় বলল : আমাদের গভীর অভ্যন্তরের কান্না ময়ূর, হরিণের ডাক হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে অরণ্যময়। আমার কিচ্ছু ভাল লাগছে না। ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেললে বোধ হয় একটু স্বস্তি পেতাম।

লব অভিভূত গলায় বলল : আমিও স্বস্তি পাচ্ছি না। একটা অব্যক্ত জ্বালা ধরা অনুভূতির কষ্টে বুকের ভেতরটা টনটন করছে।

বিষণ্ণ গভীর গলায় বলল : হঠাৎ সব গোলমাল হয়ে গেল। রামচন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধ করতে কত সাধ ছিল মনে। কত স্বপ্ন দেখেছি। নির্জন নদীতীরে বসে কত ছক এঁকেছি, পরিকল্পনা করেছি। সব ভেস্তে গেল। বড় অপূর্ণ মনে হচ্ছে।

কথাটা চকিতে লবকে ছুঁয়ে যায়। তাকে কেমন সংকুচিত ও বিব্রত দেখায়। রীতিমত হতাশ হয়ে বলল : আমার তো সব সময় মনে হয় হেরে গেলাম। যুদ্ধ হল না, রক্ত ঝরল না, অথচ দাসত্ব শৃঙ্খলের কোন বন্ধন থাকল না, সাদা কালো পার্থক্য গেল, সব মানুষ এক হল, কোন বৈষম্য রইল না—সব কেমন যেন স্বপ্নের মত মনে হয়। রামচন্দ্রের এক জাদুতেই যেন সত্যিকারের সাম্যের রামরাজ্য তৈরি হয়ে গেল। অথচ আগে হল না কেন? আমরা হয়ত এর নিমিত্ত হয়ে রইলাম। কিন্তু কোন খ্যাতির অধিকারী হলাম না। গৌরব বাড়ল শ্রীরামের। জয় হল তাঁর। আমরা কিছুই পেলাম না। জয়-পরাজয়ের কোন অনুভূতিই হচ্ছে না। কেমন একটা জ্বালা ধরা অনুভূতি আছে।

কুশ চুপ করে থাকে। তার দৃষ্টি শূন্য। বেশ কিছু পরে আচ্ছন্ন অভিভূত গলায় বলল : পিতার কাছে ফিরে যাওয়ার কোন আনন্দ অনুভব করছি না। কাঁটার মত কি একটা বিঁধে আছে বুকে। ভাবতে অদ্ভুত লাগে শত্রুভাবে যাকে কামনা করলাম হঠাৎ সে আমাদের পিতা হয়ে গেল। শত্রুর মুখোশ খুলে পিতা বলে ডাকার এই নিষ্ঠুর খেলাতে বিধাতার মজা থাকতে পারে, কিন্তু আমাদের আনন্দটাই মাটি হয়ে গেল। এমন করে পিতা পুত্রের দেখা সাক্ষাৎ হওয়ার ভেতর কোন আনন্দ নেই। হঠাৎ হঠাৎ এমন সব ঘটনা ঘটে জীবনে যে, তার সঙ্গে আপোষ করাও কঠিন হয়ে পড়ে। পরাজয়টা এইভাবে আসবে ভাবেনি কখনও। অশ্বমেধের বাজীর রূপ ধরে পরাজয় এল নিঃশব্দে। যুদ্ধ করে যে জয় হয় তার সাফল্য তৃপ্তি তো বাৎসল্যের উপহারে কিংবা দানে থাকে না। তাই ব্যর্থতায় হতাশায় মনটা টাটাচ্ছে।

কুশ তোর মত এমন সুন্দর করে গুছিয়ে বলতে পারি না। এখন মনে হচ্ছে রামচন্দ্রের বাৎসল্যে দানে, উপঢৌকনে বীরত্বের গর্ব নেই বীর্যাবর্তের আস্ফালন কিংবা আত্মশ্লাঘা নেই। এ যেন উত্তরধিকারী সূত্রে পাওয়া সম্পত্তির মতই নিরানন্দ স্বত্বভোগ। এর ভেতর আমাদের কোন সম্মান নেই, স্বীকৃতি নেই। রামচন্দ্রের মহত্ত্বের জ্যোতির পাশে আমাদের উদ্যোগ, উদ্যম, ক্ষমতা, প্রতিভা, ব্যক্তিত্ব মাঝরাতের আকাশের তারার মত মিটমিট করে জ্বলবে কালো মানুষদের মনে। শ্রীরামের বাৎসল্যের কাছে আত্মসমর্পণ ছাড়া আমাদের সামনে তো আর কোন পথও নেই। থাকলেও জননী তা হতে দেবে না।

রামচন্দ্র আমাদের দয়া দেখাতে গেল কেন? কি দরকার ছিল? এই অনুগ্রহটুকু করে আমাদের ওপর বড় অবিচার করল।

সীতা তুলসীমঞ্চে সন্ধ্যাদীপ জ্বালিয়ে পুত্রদের পাশে এসে দাঁড়াল। হাসি হাসি মুখে প্রশ্ন করল : হ্যাঁরে লব কুশ তোদের উপর আবার অবিচার করল কে?

কুশ সীতার সুমুখে দাঁড়িয়ে বেশ একটু উত্তেজিত এবং রাগান্বিত হয়ে বলল : আচ্ছা মা, তুমি বল, করুণা অনুগ্রহ দয়া নিয়ে কারো মন ভরে? পিতাজী আমাদের দু'ভাইকে ভিক্ষে দিলেন যেন। ভিক্ষে ছাড়া কি বলব? আমরা চেয়েছিলাম জয়, পেলাম ভিক্ষে। কে চেয়েছিল এই ভিক্ষে? মানুষের মুক্তি, স্বাধীনতা, করুণা, অনুগ্রহ করে পাওয়ার জিনিস না। এর জন্যে মূল্য দিতে হয়। বিনামূল্যে পেলে মানুষের কাছে তার কদর্য কমে যায়। স্বাধীনতার অপব্যহার হয়। দেশমাতৃকার পূজো বলি ছাড়া হয়? কথাগুলো ঝড়ের মত বলে থামল কুশ।

সীতা একটু দিশেহারা বোধ করল। কুশের মুখে অহংকার জ্বলজ্বল করছিল। তার উত্তেজিত প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে একটু ভাবতে হল। পাছে সে ব্যথা পায় তাই শ্রীরামের এই দয়াটুকু গ্রহণ করল। পুত্ররা সেজন্য একটু বিরক্ত। ক্ষমতা, ব্যক্তিত্ব বিকাশের সুযোগ পাচ্ছে না বলেই তাদের বিদ্রোহ এবং ক্ষোভ। কারণ তাদের পিতা পুত্রের সম্পর্কের ভিত এখনও পাকা হয়নি। হবে কোথা থেকে? রামচন্দ্রকে চিরকাল শত্রু বলে জেনে এসেছে। তাদের সঙ্গে শত্রুর মত আচরণ করেছে। হঠাৎ শত্রুর মুখোস খুলে পিতা রামচন্দ্র বেরিয়ে পড়ল। মনটাই তৈরি হয়নি তাদের। তাই তাদের দোষ দিতে পারল না সীতা। দোষটা পুরোপুরি তার নিজের। শত্রু রামচন্দ্রকে পিতা রামচন্দ্র রূপে মেনে নেওয়ার জন্য যে মানসিক প্রস্তুতি দরকার তার সময় পর্যন্ত পেল না। তাই সীতা নিজের কাঁধে সব দোষ নিয়ে বলল : পুত্র, দোষ তো আমারই। পুত্রকে পিতার পরিচয় না জানানোর দোষ আমার। শ্রীরাম পৃথিবীর মানুষের কাছে আমাকে অনেক ছোট আর হেয় করে দিয়েছে। তবু সে কথা বলে তাকে তোদের চোখে ছোট করে দেইনি। তার কোন সমবেদনা, অনুকম্পা নিয়ে পুত্রদের ছোট করব না পণ করেই সব লুকিয়েছি, তোমরা নিজের পরিচয় ব্যক্তিত্ব, আত্মমর্যাদা নিয়ে সকলের চোখে নমস্য হয়ে থাক এই কামনাই করেছি শুধু। নিজেও আত্মসম্মান নিয়ে মাথা উঁচু করে বাঁচতে চেয়েছি। কিন্তু কে জানত, বিধাতা এমন করে প্রতিশোধ নেবে?

তাদের কথাবার্তার মধ্যে বাল্মীকি চুপিসারে কখন এসেছিল কেউ টের পায়নি। সীতার কথার প্রত্যুত্তরে পিছন থেকে বলল : প্রতিশোধ বলছ কেন জননী; বল বিধিলিপি। মনে মনে তুমি যা চেয়েছিলে বিধাতা দুহাত ভরে তা দিয়ে জিতিয়ে দিল তোমাকে; একি কম কথা।

লব অবাক গলায় বলল : একে জেতা বল, মুনি দাদু?

বাল্মীকি মিটমিট করে হাসল। বলল : জেতার কি কোন বাঁধাধরা নিয়ম আছে ভাই? জেদ পূরণ হওয়াও জেতা।

লব বলল : যে জেতায় জয়ের আনন্দ, গৌরব বোধ হয় না, তাকে কেউ জেতা বলে? যুদ্ধে জেতার আনন্দ আলাদা।

বাল্মীকি ভুরু কুঁচকাল। বিস্ময় প্রকাশ করে বলল : ও! যুদ্ধ কি শুধু খোলামাঠে সবার দৃষ্টির সামনে মানুষে মানুষে নীতিতে নীতিতে হয়? লোকচক্ষের আড়ালে মনের অভ্যন্তরে প্রতিনিয়ত মানুষ যুদ্ধ করছে নিজের সঙ্গে তার পরিবেশের সঙ্গে তার ইচ্ছের সঙ্গে, অনিচ্ছার সঙ্গে। সেই ঠান্ডা লড়াইর গর্ভদেশে কখন যে নিঃশব্দে জয় আর পরাজয় আসে কেউ টের পায় না! জয়লাভের কৌশলটাই সব। কে, কিভাবে কতখানি জয় আদায় করে নিল সেটাই মুখ্য আলোচ্য। রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে পাশব উন্মত্ততাই প্রকাশ পায়। সে যাই হোক, আদর্শ ও নীতির লড়াইতে তোমরা জিতেছ। শ্রীরামের পরাজয়ও বড় সুন্দর। হার মানা হার পরাল তোমাদের গলায়। সেই আনন্দ নিয়ে সন্তুষ্ট থাক। গভীর করে কিছু জানতে চেও না। তাতে ভাল জিনিসটাও তেতো হয়, সুন্দর অসুন্দর হয়। একটুকরো সাদা কাপড়ের শুভ্রতা বারংবার পরখ করে দেখলে তা মলিন হয়ে যায়। তাই বলছি এটা বোঝার কথা। বোঝানো নয়। সবাইকে তো নয়ই। আমার রামায়ণ গানের শেষটা এরকমই চেয়েছিলুম। মিষ্টি মধুর জয়ের আনন্দে, মিলনের সংবাদে সকলকে সুধন্য করে ভরপুর করে দিয়ে আমার রামায়ণ গান শেষ হল, একি কম কথা! কত আনন্দ বল তো? এর মুক্তি আকাশে আকাশে, আলোয় আলোয়, বনে প্রান্তরে, সভাতে, গৃহে, পল্লীতে, নগরে।

লব কুশ অভিভূত হল। সহসা কথা বলতে পারল না।

পৃথিবীর নরম চাঁদের আলো। ফুটফুট করছে জ্যোৎস্না। বনফুলের গন্ধের সঙ্গে রাতের গন্ধ, জ্যোৎস্নার সঙ্গে, মানুষের গায়ের গন্ধ নিবিড় হয়ে মিশে গেছে।

লব কুশ সীতার গা ঘেঁষে দাঁড়াল একান্ত নির্ভরতায়। কুশ বাতাসের স্বরে ফিস ফিস করে বলল : মা তুমি খুশি হয়েছ?

সীতা কুশের দুগালে দুটি হাতের পাতা ছুঁয়ে বলল : ভীষণ সুখী হয়েছি। এত খুশি খুব কম মায়ের হয়। মনে হচ্ছে আমার খুশি আকাশের জ্যোৎস্না হয়ে ঝরে পড়ছে গাছের পাতায়, কুটীরের চালে, ঘাসের শিশিরে, তোদের শরীরে, নিঃশ্বাসে, বাতাসে সর্বত্র।

লবের বুকের ভেতর সীতার কথাগুলো নরম তুলোর মত পিঁজে পিঁজে যাচ্ছিল। কোন দুর্বোধ্য কারণে মায়ের মন ভাল নেই এটা তার কথাতেই টের পেল লব। তাই এক উচ্ছলতার মধ্যে নিজের ব্যাকুল উদ্বেগকে লুকোল। সীতা কথা বলছিল না। মুখ নামিয়ে, নিচের দাঁতে উপরের ঠোঁট কামড়ে ধরে একটা কষ্টকে সংবরণ করছিল। লবের বুকের ভেতরটা কেমন করে উঠল। মাকে জড়িয়ে ধরে বলল : তোমাকে ছাড়া আমরা কাউকে চিনি না। এই বনভূমি আমাদের জীবন। এসব ছেড়ে অযোধ্যায় যেতে ইচ্ছে নেই।

সীতা চোখের জল লুকোল। আঁচল দিয়ে মুখ মুছল। স্খলিত ভেজা গলায় বলল : তবু তোমাদের যেতে হবে। পিতা তোমাদের নিয়ে যাচ্ছে বৃহৎ কর্মের দায়-দায়িত্ব বুঝিয়ে দিতে। তোমরা ছাড়া কে আছে তার? তোমরা পাশে থাকলে তিনি ভরসা পাবেন। তাঁর অসহায়তা দূর হবে। নিজেকে আর নিঃসঙ্গ, একা মনে হবে না। তোমরা তাঁর বার্ধক্যের অবলম্বন।

লবকুশ একসঙ্গে সন্দেহের গলায় প্রশ্ন করল: মা তুমি যাবে না?

সীতা চুপ করে রইল কিছুক্ষণ। তার চোখ দুটি লব কুশের চোখের ওপর স্থির, অপলক। দুই ঠোঁটে চেপা বিষণ্ণ হাসি। খুব ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল। যার অর্থ 'না'।

বিস্ময়ে লবকুশ সমস্বরে বলল : তা-হলে আমারাও যাব না। রামচন্দ্রকে আমরা চিনি না। তুমি আমাদের অস্তিত্ব, অনস্তিত্ব সব।

হাসিমাখা মুখে সীতা তেমনিভাবে মাথা নাড়ল। দীর্ঘশ্বাস ফেলে খুব গম্ভীর গলায় দৃঢ়স্বরে বলল : তা হয় না লব কুশ। তিনি তোমাদের জন্মদাতা পিতা। সন্তানের ওপর শুধু পিতার অধিকার।

পিতার পরিচয় ছাড়া কোন মানবশিশুর সামাজিক পরিচয় নেই, অধিকার নেই। মায়েরা বড় অসহায়। তোমরা তোমাদের পিতার কাছে ফিরে যাও। তিনি তো তোমাদের নিতে এসেছেন। তাঁকেও খালি হাতে ফিরিয়ে দিতে পারি না।

কুশ মরিয়া হয়ে বলল : আমরা যাচ্ছি না, যাব না।

কুশ অবুঝ হতে নেই বাবা।

মা, তোমার অবাধ্য হইনি কখনও। কিন্তু আজ কোন কথাই শুনব না। মনে রেখ, পরশুরামের রক্তধারা বইছে আমার ধমনীতে। মায়ের স্থান যে সমাজে নেই সেই সমাজকে আমি মহাশ্মশান করে দেব। তোমার কোন কথা শুনব না। আমাকে তুমি বাধা দিও না।

সীতা কুশকে শান্ত করতে সস্নেহে বুকে টেনে নিল। চুলগুলো কপাল থেকে সরিয়ে দিল। তার মাথার ওপর মুখ রেখে বলল : পাগল ছেলে। সব কথা না বুঝে শুধু মাথা গরম করে বসবে। পৃথিবীর সব ছেলেই থাকে বাপের কাছে। এটাই নিয়ম। গচ্ছিত ধনের মত আমি এতকাল আগলে রেখেছি তোদের। যার ধন তাকে ফিরিয়ে দিয়ে আমাকে দায়িত্বমুক্ত কর বাবা? আমার নিয়মভঙ্গের কোন পাপ হলে তোদের কষ্ট হবে না? আমি তো সব সময় থাকব তোদের কল্পনায়, স্বপ্নে, নিঃশ্বাসে, ঘুমে, জাগরণে।

কুশ কেমন হয়ে যায়। কথা খুঁজে পায় না। কিন্তু তার দুচোখে বিস্ময় তত ছিল না, যতো ছিল তীক্ষ্ণ সন্দেহ।

লব শান্ত গলায় বলল : মা, তোমার হাসি দিয়ে, কথা দিয়ে বুকের ভালবাসা দিয়ে আমাদের তুমি গড়েছ, এই পৃথিবীকে চিনিয়েছ, আজ অন্যের হাতে তুলে দিতে তোমার কষ্ট হবে না?

সীতার শরীর মন সহসা আন্দোলিত হল। বুকের মধ্যে ঝড় উঠল। প্রলয় ঝড়। অপত্য স্নেহ হঠাৎ ভাসিয়ে নিয়ে গেল তাকে। কোনভাবে নিজেকে সংযত করতে পারল না। কঁকিয়ে কেঁদে উঠল। আর্তস্বরে ডাকল : লব।

এক দারুণ চমকে চমকে উঠেছিল বাল্মীকি। লবকুশের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে দেখল। সীতার মনের কথাগুলোর তাঁর অজানা নয়। কিন্তু এরকম একটা অবস্থায় কি করে কথা বলবে? তবু আরম্ভ করল। পুলকিত হয়ে বলল : বা চমৎকার ভারি সুন্দর কথা বলেছ তো দাদুভাই। যে বাবা সন্তানের কোন দায়িত্ব নেয়নি, সন্তানও যাকে পায়নি তার ওপর রক্তের টান থাকে? কিন্তু জীবনকে বাঁধাধরা নিয়মে কিংবা, ছকে ফেলা ভারি মুশকিল। এগোতে এগোতে যেমন দরকার তেমন তেমন পথ বদলাতে হয়। নইলে জীবনটা সুখের কিংবা শান্তির হয় না। মানে, অবস্থার সঙ্গে, পবিবেশের সঙ্গে সব মানিয়ে নিতে হয়। জীবনে যা ঘটছে এবং যা ঘটতে চায় না, ঘটলে জীবনটা থেমে যেত। বড় একঘেয়ে লাগত। অরণ্যের গন্ডিবদ্ধ জীবনে একদিন তোমরা হাঁফিয়ে উঠতে। তার আগে অযোধ্যায় ফিরে যাও ভাই। সেখানে তোমাদের অনেক কাজ! নতুন দায়িত্ব নতুন কর্তব্য। রক্তাক্ত সংঘর্ষের পথে নয়, ভারতবর্ষের মিলনাত্মক ঐতিহ্যের পথেই বহুকে এক করার মহান আদর্শের আলো এসে পড়ুক তোমাদের জীবনে। নিজের পথে চলার সাহস আছে তোমাদের দু'ভাইর, নিজেদের আদর্শের জন্য কষ্টে ভোগ করতেও রাজি। তাই তোমরাই পারবে ভারতবর্ষের মিলনাত্মক ঐতিহ্য গড়ে তুলতে। এক নতুন ভারতবর্ষ গড়তে। রাজদন্ড হাতে থাকলে সাফল্য সুনিশ্চিত হবে।

সীতা কাঁদছিল ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে, ফুলে ফুলে।

বাল্মীকি নির্লিপ্ত। লবকুশ হতভম্ব চিত্রাপির্তের মত দাঁড়িয়ে। এক জিজ্ঞাসার আর্তি ছিল তাদের অন্তরে। জননীর সঙ্গে তাদের সম্পর্কের পরিণতি কি? তাদের ভবিষ্যৎ কি? এই সব প্রশ্নে ও জিজ্ঞাসায় তাদের ভেতরটা অস্থির হচ্ছিল।

কুশ ভাবছিল, জীবনের বাস্তব কি আশ্চর্য অলৌকিক, স্থান কাল ও পরিস্থিতি এই মুহূর্তে রামচন্দ্রের মূর্তি ধরে যেন নিয়তি এক অমোঘ বার্তা বয়ে নিয়ে এল। রামচন্দ্র এখন দুর্লক্ষ্য নিয়তির মত বাস্তব সত্য তাদের জীবনে। বাইরের এই মানুষটাই হৃদয়ের সংকটের রূপ নিল।

সকল বন্ধন থেকে এমনভাবে জননীর মুক্তি চাওয়াটা কুশের অদ্ভুত লাগল। জননীকে তার বড় নিষ্ঠুর আর রহস্যময় মনে হল। কিন্তু স্বার্থপর কখনো ভাবতে পারল না। নিরুচ্চারে বারবার

বলল : তাদের মা'র মতন এমন ভালো মা আর হয় না। কথাটা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বুকের ভেতরটা হুহু করে উঠল। মমতায় ভরে উঠল তার চোখ। কেমন হতাশ বিষণ্ণতায় আর্তস্বরে ডাকল : মা, মাগো তুমি শান্ত হও। আমি না বুঝে তোমাকে শুধু কাঁদালাম!

সীতা হাত বাড়িয়ে কুশকে নিজের বুকে টেনে নিয়ে অপত্যস্নেহের দুরন্ত আবেগে চেপে ধরল। আর বুকভাঙা কান্নায় ভেঙে পড়ল। কান্না মথিত স্বরে বলল : ওরে কুশ, না না! তুই কাঁদাবি কেন? আমার অদৃষ্ট আমাকে কাঁদাচ্ছে। সীতার গলার স্বর আবার কান্নায় ডুবে গেল।

কুশ কোন জবাব দিল না। মায়ের চোখ মুছে দিল।

লব দু'হাত দিয়ে সীতার কাঁধ ধরে তার দিকে টানল। তার কাঁধে সীতার মাথা রেখে বলল : মা এতটা ভেঙে পড়ছ কেন? তোমার মতন মাকে ছেড়ে আমরা কোথাও যাব না।

লবের কথায় সীতা চমকাল। তৎক্ষণাৎ ঝাপসা চোখে লবের দিকে তাকাল। আঁচল দিয়ে চোখ মুছে নিল। ব্যথাহত মুখে হাসবার চেষ্টা করল। বলল : আমি আর কাঁদব না। তোদের দু'ভাইকে তার হাতে তুলে দেব বলেছি। মিথ্যেবাদী হলে তোদের অভাগিনী জননীর গৌরব কিছুমাত্র বাড়বে না। সে অপযশ আমি সইতে পারব না। তার চেয়ে আমার মরণ ভাল। সীতার স্বরে কান্না নেই। কিন্তু ভেজা স্বরে লেগে থাকে কান্নার রেশ।

লবের মন গলে গেল। ব্যথাহত গলায় ডাকল : মা তুমি রাগ কর না। তোমার অসম্মান হয় এমন কিছু করব না।

সীতা মাথা ঝাঁকিয়ে বলল : জানি।

হেমন্তের সকাল। আকাশের সূর্য টকটকে লাল। গোল। মিষ্টি রোদে ঝকমক করছে পৃথিবী। গাছের ফাঁকে ফাঁকে রোদের রেখা। মাটিতে ছায়ার আলপনা, রোদের আঁকিবুঁকি।

ভোরের আলোয় সীতাকে প্রথম দেখে হঠাৎ কেমন আবেগান্বিত হয়ে উঠল রামচন্দ্রের বুকের ভেতরটা। সীতার শরীরের মিষ্টি গন্ধ তার সমস্ত অনুভূতির ভেতর ফুর ফুরে হাওয়ার মত ছড়িয়ে পড়ল। প্রফুল্লিত করল। চমকিত বিস্ময়ে ডাকল : বৈদেহী।

সীতা মুখ ফিরিয়ে অবাক হয়ে গেল। তার আয়ত চোখের কালো তারা কয়েক পলক স্থির বিদ্ধ হয়ে থাকে রামচন্দ্রের চোখে। হঠাৎ তার চমকে ওঠার মধ্যে একটা ভয়চকিত জিজ্ঞাসা জেগে উঠল। অজ্ঞাত একটা অনুভূতি ভয়ের মত তার মস্তিষ্ক জুড়ে নেমে এল, ঘিরে ধরল। রামচন্দ্রের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তা আরো বেড়ে গেল। রামচন্দ্রের ডাকে সীতা তাই সাড়া দিল না।

রামচন্দ্রের ভুরু কুঁচকে গেল। মুখে সংশয়ের ছায়া পড়ল। ঠোঁট কামড়ে ধরল। সীতা নির্বাক। স্থির। চোখের পাতা পর্যন্ত কাঁপল না। ভীষণ নির্লিপ্ত। কেবল মৃদু ও মন্থর ঢেউয়ে বুক ওঠানামা করতে লাগল। রামচন্দ্র সীতার দিকে একটু এগিয়ে গেল। দ্বিধার ভাবটা কাটিয়ে ওঠার জন্য হঠাৎ একটু হাসল। অস্বস্তি কাটানোর হাসি। আমন্ত্রণের হাসি। বলল : তুমি! তুমি এমন করে তাকিয়ে আছ, মনে হচ্ছে আমি তোমার কেউ নই।

সীতা ভুরু টানটান করে তার দিকে চেয়ে রইল। দু'জনের মধ্যে দিয়ে কতকগুলো মুহূর্ত কেটে গেল। সীতার মুখে একটা নিবিড় মুগ্ধতার ভাব ফুটল ধীরে ধীরে। তার চোখে গভীর অনুসন্ধিৎসা ও বিস্ময়।

তৎক্ষণাৎ একটা অপরাধবোধের কাঁটা বিঁধে যায় রামচন্দ্রের বুকে। ভুরু কুঁচকে যায়। মনে নানা প্রশ্ন জাগে যা উচ্চারিত হয়ে তার ভিতর থেকেই একটা দ্বিধা এল আচম্বিতে। মাথা হেঁট করে বলল : কী হল? তুমি কি আমার কোন কথার জবাব দেবে না? এত কি ভাবছ? ভাবার কি আছে?

সীতা একটু চমকাল। একই সঙ্গে অবাক ও লজ্জিত হল। সংকোচে হাসল। বিব্রত লজ্জায় বলল : ভাবতে ভাল লাগে। অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎকে নিয়ে একটু নেড়ে চেড়ে জীবনের মানেটাকে তো খুঁজতে হবে।

রামচন্দ্র চমকানো বিস্ময়ে বলল : তুমি বলছ কি?

একদিন বিবাহিত জীবনের মধ্যে আমার সব নিজস্বতা হারিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু এখানে এসে

সব তো আবার নতুন করে শুরু করতে হয়েছে। এর সঙ্গে মিশে আছি। নতুন করে আবার শুরু করার আগে মনের সঙ্গে ভাল মন্দর আলোচনা আর কি?

বৈদেহী তুমি কত বদলে গেছ।

জীবনই মানুষকে বদলে দেয়। আমার আগের জীবন আর এ জীবনের মধ্যে মস্ত বড় ফাঁক। দুটোকে মেলানোই যায় না। দুটো ভাগই ভিন্ন। ঠিক নদীর মত। নদীর একদিকে পাড় ভাঙে অন্যদিকে চর পড়ে। এটাই নদীর গতির নিয়ম। একে বলে না নদী বদলে গেছে। বড়জোর বলা চলে, নদী নিজেকে পূর্ণ করতে নিজের পথ নিজেই খুঁজে নিয়ে চলেছে এক স্রোত থেকে অন্য স্রোতে, অনন্ত উৎসারে।

হতাশ হল রামচন্দ্র। ভাঙা গলায় বলল : বৈদেহী তুমি যাবে না?

কোথায় যাব?

রামচন্দ্রের চোখে সহসা বিস্ময় ঝিলিক দিল! বিস্ময়ে চমকে উঠল। বলল : তোমার নিজের জায়গায়। তোমাকে না পেলে আমার যজ্ঞ সম্পূর্ণ হবে না।

সীতা রামচন্দ্রের শেষের কথাটা শুনতে পেল না। নিজের চিন্তায় অন্যমনস্ক হয়ে গিয়ে স্খলিত গলায় অস্ফুট স্বরে বলল : আমার নিজের জায়গাতেই আছি। এখানে নুতন আদর, নুতন ভালবাসা, নতুন সম্মান। এটাই আমার সবচেয়ে সম্মানের আর নিজের জায়গা। এখানে আমি দেবী, জননী, রাজরানী। আমার কোন অভাব নেই, শূন্যতা নেই। আমার সব গর্ব বনের ঐ কালো মানুষদের নিয়ে। ওরা আমার লবকুশের মত। ওদের ছেড়ে আমি কোথাও যেতে পারব না। আমি ওদেরই সীতা। শুধু ওদের।

বৈদেহী আমি তোমাকে হারাতে আসিনি। ফিরিয়ে নিতে এসেছি।

স্বামী অমন করে চাইতে নেই।

কেন নেই? কোন চাওয়াই পাওয়ায় ভরে না উঠলে তার কোন মূল্য থাকে না। আমাকে তুমি শূন্য হাতে ফিরিয়ে দিও না। এ আমার মিনতি।

প্রিয়তম তুমি কাঙালের মত আমাকে চেয়ে কত না ছোট করছ আমার কাছে। আর আমি চোখের জলে ভেজা নিষ্ঠুরতা দিয়ে তোমাকে ফিরিয়ে দিচ্ছি একি কম কষ্ট! তুমি যত চাইছ, তত আমাকে নিজের সঙ্গে লড়াই করতে হচ্ছে। আমার সব বিরোধ'ত আমার নিজের সঙ্গে। যাকে মন তীব্রভাবে চায় সে যখন ভিখিরির মত ভালবাসাকে ভিক্ষে করে তখন না বলতে কষ্টে দুঃখে বুক ভেঙে যায়।

তা-হলে নিজের সঙ্গে এই লুকোচুরি খেলা করছ কেন? আমি তো ফিরে যেতে আসেনি। ধরা দিতে চেয়েছি।

মুশকিল তো সেইখানে।

আমাকে তুমি কি করুণা করতে পার না।

অমন করে আমাকে অপরাধী কর না। তুমি এক কঠিন অগ্নিপরীক্ষায় ফেলেছ আমাকে। আমি যে কি করব?

অগ্নিপরীক্ষা বলছ কেন?

আমার মনের যন্ত্রণা, কষ্ট তুমি ঠিক বুঝবে না।

আমাকে ক্ষমা করে দাও বৈদেহী।

সীতার দুচোখে জল ভরে এল। বলল : আমি দেবতা নই যে তোমাকে ক্ষমা করব। আমি একটু অন্যরকম। আমার মতন আমি। এই আমিটাই নিয়ে আমার সমস্যা। তাই তো এত যন্ত্রণা। কি বোঝাই বল তো? মাঝে মাঝে জীবনে এমন সব মুহূর্ত আসে, যার কঠিন সব প্রশ্নের উত্তর নিজেকে একা একাই দিতে হয়।

রামচন্দ্র শঙ্কিত গলায় বলল : জানি তোমার কাছে আমার অনেক অপরাধ জমে আছে। নিজগুণে তুমি মার্জনা করে নাও।

স্বামী তোমার লজ্জা পাওয়ার কোনও কারণ নেই। সব আমার অদৃষ্ট। তুমি কি করবে? যেখান

থেকে পাওয়ার ছিল সেখানে থেকেই শূন্যতা নিয়ে ফিরতে হল আর যেখানে প্রত্যাশার কিছু ছিল না সেখান থেকেই পূর্ণ হয়ে উঠলাম। সেই আমি যখন সব হারিয়ে সব ভাসিয়ে তোমাকে ফিরে পেলাম তখন মনে হল এক পিঠে তুমি, আর এক পিঠে আমার শম্বুক। ব্যর্থ প্রেমের সব অভিমান নিয়ে তোমার দিকে যখন দৌড়ে যাই তখন অতীতের একটানা দীর্ঘপথ চলার ক্লান্তিকর দিনগুলোর স্মৃতি আমার পথ আগলে দাঁড়ায়। নিজের সঙ্গে যখন এই লুকোচুরির খেলা চলে তখন কুটির দুয়ার এসে 'মা-মাগো' বলে পাহারাদারদের মত হাঁক দেয় আতংক, দুরন্ত, শম্বুকের দল। চোখের জলে বুক ভাসিয়ে আকুল হয়ে প্রশ্ন করে ওমা, মা-মাগো আমাদের ফেলে সত্যি তুমি চলে যাবে? পাতালপুরী আবার মাতৃহীন হবে? আমাদের অনাথ করে যেতে তোমার কষ্ট হবে না? শম্বুকের জন্য বুক হাহাকার করবে না? আমাদের ভাঙা ঘরের সামান্য সুখও রামচন্দ্র কেড়ে নেবে? কিন্তু আমরা তো মাকে যেতে দেব না। আমাদের বুকের রক্তে রাঙানো মাটির উপর তোমার পদচিহ্ন এঁকে যেখানে খুশি যাও, বাধা দেব না। তোমার ঐ রাঙা পায়ের চিহ্ন বুকে করে শম্বুকের অতৃপ্ত আত্মা কাঁদবে, পাতালপুরী দীর্ঘশ্বাস ফেলবে। এমন বুকভাঙা কথা শুনলে কোন মা স্থির থাকতে পারে? আমিও আর নিজেকে ঠেকিয়ে রাখতে পারছি না স্বামী। এদের মুখে আমি আমার শম্বুককে দেখি। শম্বুককের এই স্বদেশ ছেড়ে আমি কোথাও গিয়ে শান্তি পাব না। স্বামী পুত্রও আমাকে সে সুখ দেবে না। আমার দ্বারা তোমার সুখী হওয়া কোনদিন হল না। ঈশ্বরও বোধ হয় তা চায় না। লব কুশ তো তোমারই ছেলে। তাদের নিয়ে সুখী হও। বৈদেহী তো হারিয়ে গেছে। তাকে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়ে নতুন করে আবার কত সমস্যায় পড়বে, তুমিও ভাল করে জান না। মিছিমিছি বিড়ম্বনার অগ্নিপরীক্ষায় তোমাকে টেনে এনে আমার লাভ কী? তাতে আমার ও তোমার সব সুখ, আনন্দ, শান্তি ধ্বংস হবে এ আমি কখনই চাই না। লব কুশ তো থাকল। তোমার হারান বৈদেহী তাদের মধ্যেই আছে, এই সান্ত্বনা নিয়ে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দাও। রাগ নয়, অভিমান নয়, দুঃখ নয়, নিছক এক গভীর সহানুভূতি আর আত্মসম্মানবোধ থেকে এই কথাগুলো বলল সীতা।

রোদ এখন চড়েছে। শিশির ভেজা গাছের পাতাগুলো শুকিয়ে আরো বেশি সবুজ, সতেজ আর স্নিগ্ধ হয়ে উঠেছে। গোটা বনভূমিই রোদের আলোয় ঝলমল করেছে। একটা খুশি ভাব যেন ভরে আছে গোটা বনভূমিতে।

সৌন্দর্যের যেমন আকর্ষণ আছে, তেমন আছে মনের গভীরতা। সীতার কথাগুলো রামচন্দ্রের বড় ভাল লাগল। সীতারও স্থির দৃষ্টি রামচন্দ্রের ওপর। পলক পড়ে না মোটে।

পথের দুধারে রৌদ্রস্নাত শ্যামল সবুজ বনানীর দিকে চেয়ে নিজেকে রামচন্দ্রের হঠাৎ বড় বঞ্চিত, রিক্ত মনে হল। যে চরিতার্থতা জোয়ারের মত বুকের মধ্যে উথলে উঠেছিল সে যেন কোন ভাটার টানে অদৃশ্য হয়ে তাকে রিক্ত শূন্য করে দিল। তবু ঢোক গিলে বলল : বৈদেহী তোমার কী রইল? সারাজীবন ধরে আমি তোমাকে দিলাম কি?

সীতার অধরে প্রসন্ন হাসির দ্যুতি। বলল : স্বামী আমরা কেউ কাউকে কিছু দিতে পারি না। তবু দেবার দেমাক করি। যার বিশ্বাস বেঁচে থাকে তার কিছুই হারায় না। এই বন নদী আকাশের মত অধিকারহারা, মানহারা কালো কালো মানুষগুলোর মধ্যে আমি বেঁচে থাকব। আমি শুধু ওদেরই সীতা। ওদের হৃদয়ের স্বর্ণ সিংহাসনে আমার আসন। সে আসন শূন্য রেখে কোথায় যাব?

আশ্রমকন্যা শকুন্তলা

শ্রীপার্থ চট্টোপাধ্যায়
শ্রীমতী মণিকা চট্টোপাধ্যায়

দৃষ্টিকোণ

শকুন্তলার যে উপাখ্যানটির সঙ্গে আমাদের সবিশেষ পরিচয় সে হলো কালিদাসের শকুন্তলা। যদিও উপাখ্যানের উৎস মহাভারতের কাহিনী, তবু কালিদাস নিজের মত করে শকুন্তলাকে গড়েছেন। তাঁর সঙ্গে দ্বৈপায়নেব শকুন্তলার চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের মিল সামান্য। কাহিনীতেও ফারাক বিস্তর। বলাবাহুল্য, মহাভারতের শকুন্তলার সঙ্গে একালের আত্মমর্যাদাসম্পন্ন নারীব্যক্তিত্বের জটিল মানসিকতা ও আত্মপ্রত্যয়ের এতো গভীর সম্পর্ক যে এর আকর্ষণ থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে পারেনি। তাই এই গ্রন্থের পরিকল্পনা।

মহাভারতের উপাখ্যানে শকুন্তলা অনেক বেশি তেজস্বিনী, নির্ভীক। নিজের কথা বুক ফুলিয়ে বলার মত সাহস ও ব্যক্তিত্ব তার আছে। সে তুলনায় কালিদাসের শকুন্তলা অনেক নিরীহ, শান্ত, নম্র এবং ভীরু। পুরুষের অনুকম্পা, অনুগ্রহ পেলেই সে ধন্য হয়ে যায়। দুষ্মন্তের প্রত্যাখ্যানকে সে নিঃশব্দে মেনে নিয়েছে। কিন্তু আদি কবির শকুন্তলা একেবারে আলাদা। পুত্রকে বড় করে নিয়ে মহারাজ দুষ্মন্তের রাজসভায় হাজির হয়েছে সে। সেখানে অসংকোচে স্ত্রীর অধিকার ও মর্যাদা দাবি করেছে। পুত্রের পিতৃত্ব অস্বীকার করার জন্য মহারাজ দুষ্মন্তের সঙ্গে কোমর বেঁধে ঝগড়া করেছে। তথাপি করুণা কিংবা অনুগ্রহ ভিক্ষে করেনি। তাঁর প্রত্যাখ্যানকে চ্যালেঞ্জ করে পুত্রের হাত ধরে একালের আত্মমর্যাদাসম্পন্ন নারীর মত রাজসভা ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে। এমন সময় দৈববাণী হওয়ায় দুষ্মন্তও শকুন্তলাকে গ্রহণ করল। কিন্তু কালিদাসের অভিজ্ঞানম শকুন্তলায় উভয়ের মিলনটা অনেক বেশি রোমান্টিক।

আমি উভয় কবির শকুন্তলা ও দুষ্মন্ত নিয়ে এক মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস রচনা করেছি। সেকাল ও একালের সেতুবন্ধন তার ফলে সহজ হয়েছে। কিন্তু শকুন্তলা তাতে অচেনা হয়ে যায়নি। বরং আরো বেশি একালের নারী হয়ে উঠেছে। মহাভারতের কাহিনীর আড়ালে লুকিয়ে ছিল এমন এক অন্যমনস্কতা যা আমাকে এই উপন্যাস রচনায় সাহস জুগিয়েছে। আসলে, আধুনিকতা বোধহয় একটা মানসিক অবস্থা যা সর্বযুগেই থাকে। শকুন্তলার ব্যক্তিত্বের ভেতর সেই তেজ, সাহস, শক্তি ছিল, যা সেযুগের বিচারে ছিল বিদ্রোহের নামান্তর। তথাপি, সমস্ত প্রতিকূলতাকে কাটিয়ে উঠে নিজের বিবেকের কাছে খাঁটি থাকার সাহস দেখিয়েছিল শকুন্তলা। তাই বোধহয় এমন নির্ভয় হতে পেরেছিল। একটা নবযুগের হাওয়া ছড়িয়ে দিতে পেরেছিল মহাভারতীয় পরিবেশে। এই উৎসটুকু আকর্ষণীয় করে তোলার চেষ্টা করেছি উপন্যাসে। একালের মনস্তত্ত্বের

আলো পড়ে শকুন্তলা আধুনিক হয়ে উঠল। কিন্তু মহাভারতের নারীর আবেদন তাতে ক্ষুণ্ণ হলো না। এমন কি তার গৌরবও কমল না।

অনেক কুৎসা, অপবাদ, সন্দেহের ঝড়ঝাপ্টা সহ্য করে, চারপাশের মানুষের নিন্দে, তিরস্কার গায়ে না মেখে শকুন্তলা সৎ থেকেছে বিবেকের কাছে। প্রেমাস্পদের প্রত্যাখ্যান সত্ত্বেও পুত্রসন্তানকে পৃথিবীতে আনার সাহস তার ছিল। পিতৃপরিচয়হীন সেই সন্তানকে জন্মমাত্র জননী মেনকার মতো এক অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে ফেলে রেখে দায়িত্বহীনতার পরিচয় দেয়নি। বরং সমস্ত প্রতিকূলতার ভেতর দৃঢ় সংকল্প নিয়ে তাকে মানুষ করার সাহস দেখিয়ে সে একালের 'উইমেন লিব' -এ বিশ্বাসী নারীদের জীবনবোধের সঙ্গে অন্বিত হয়ে গেছে। শকুন্তলা নিজের মূল্য নিজে আদায় করে নিতে পেরেছিল বলেই দুষ্মন্ত তার প্রেমকে শ্রদ্ধা করতে বাধ্য হয়েছিল, অনেক আঘাতের তমসাকীর্ণ প্রহর ঠেলে এসে শকুন্তলা বিজয়িনী হলো। শকুন্তলা হলো সেই স্বপ্নের নারী যারা অনাবিল হাসির প্রাচুর্যে ভয়কে পরাভূত করে। ব্যক্তিত্বের ভেতর লুকনো তেজ থেকে জ্বলিয়ে তোলে দুঃসাহসের শিখা।

ডঃ দীপক চন্দ্র

শকুন্তলার কথা

আমি শকুন্তলা। বাইরে থেকে মনটাকে দেখা যায় না বলেই একটা চাপা কষ্ট বুকে করে বেড়াই। সেকথা কাউকে বোঝানোর নয় বলেই বড় একা লাগে। নিজের মনের আবরণ খুলে নিজেকে দেখি। নিজেকে দেখার কৌতুহল কোনোদিন ফুরোয় না। এক আশ্চর্য দীপ্তিতে ছেয়ে থাকে সত্তা। একথাটাও বোধহয় সেইরকমই।

মহারাজ দুষ্মন্ত আশ্রমে আছেন।

ক'দিন ধরেই শুনছি তিনি আমার প্রতীক্ষা করছেন। কেন করছেন জানি না। জানার কোনো চেষ্টাও করেনি। করে কী হবে? ভাঙা সম্পর্ক কোনোদিন জোড়া লাগে?

দুষ্মন্ত আমার স্বামী। আমার ইহকাল পরকাল। আমার ইষ্ট, পরমারাধ্য। তবু তার জন্য কোনো অভাববোধ নেই আমার। কোনো প্রতীক্ষাও নেই। তবে কি আমার অনুভূতি ভোঁতা হয়ে গেল? প্রশ্নটা করলাম নিজেকে। কিন্তু মন থেকে কোনো সাড়া পেলাম না। এমনি কি নাড়াও লাগল না।

ভাবতে ভালো লাগছিল, আমার জন্যে একটা মানুষ প্রতীক্ষা করছে। দু'চোখে প্রত্যাশার দীপ জ্বালিয়ে আমার পথের দিকে ব্যাকুল চোখ মেলে চেয়ে আছে সে। আর আমি পাষাণ প্রতিমার মত নির্বিকার করুণাহীন। জ্বল জ্বল করা রুদ্র চোখে চেয়ে আছি। স্থিতু হয়ে বসে আছি নিজের জায়গায়। প্রতিমার মত আমারও করার কিছু নেই।

আমি তাঁর প্রত্যাখ্যাত স্ত্রী। দীর্ঘকাল তাঁর সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। অপমান করে যাকে একদিন তাড়িয়ে দিয়েছিলেন তার সঙ্গে পুনরায় সম্পর্ক পাতানো মহারাজের দরকার হল কেন? তাঁর তো পত্নীর অভাব নেই। উপপত্নীও অনেক আছে। তথাপি, আমাকে তাঁর দরকার হল কেন? এও বোধহয়, প্রত্যাখ্যান করার মতো তাঁর নতুন খেয়াল। রাজার খেয়ালে আমার বড় ভয়। পাছে পুরনো কথায় মনটা ঘৃণা অবজ্ঞায় সঙ্কুচিত হয়, তাই নীরবতার পাথর চাপিয়ে স্মৃতির আলোকিত গুহার মুখ আমি নিশ্ছিদ্র করে রাখলাম। নির্বিকার ঔদাসীন্যের বাঁধ দিয়ে আটকালাম আমার ভিতরের প্রস্রবণকে।

মানুষের মন তো! মন থাকলেই তার একটা কষ্ট থাকবে। সেরকম একটা দুঃখ, কষ্টে আমার ভেতরটা অস্বস্তিতে তোলপাড় করছিল। পাহাড় ভাঙার শব্দ হচ্ছিল। কিন্তু বাইরে থেকে তা বোঝার কোনো উপায় ছিল না। মেয়েমানুষের বুক ফাটলেও মুখ খুলতে নেই। একদিন গুরুজনদের উপদেশ না শুনে ভুল করেছিলাম। সে ভুলের খেসারত সারা জীবন ধরে দিতে হবে। এক ভুলেই সারাজীবনটা এলোমেলো হয়ে গেল। সেই অতীতকে ভুলে যাওয়ার তো কারণ নেই। ভুলব কেন? আমার দুর্ভাগ্য তো তাঁর সৃষ্টি। আমার সকল দুঃখের হেতু তিনি। তাঁকে বিশ্বাস করে ঠকার চেয়ে অবিশ্বাস করে কষ্ট পাওয়া ভালো। একদিন বিশ্বাস করে তাঁকে ঠকেছি, ভালবেসে প্রতারিত হয়েছি। তাই দুর্বলতা ঠেকানোর জন্য মনের দরজায় বুদ্ধিকে পাহারাদার করে বসিয়েছি। দুষ্মন্তকে আমার কোনো প্রয়োজন নেই। তিনি আমার জীবনে ফেলে আসা পথনির্দেশক একটা খাম্বা মাত্র। ভবিষ্যত গন্তব্যপথে তার কোনো চিহ্ন নেই।

সব চিন্তা ছাপিয়ে কুটীরে ঘুমন্ত সর্বদমনের মুখখানা আমার চোখে ভেসে উঠল। বেচারা কিছুই জানে না, দুষ্মন্ত কে? যদি কোনোদিন জিগ্যেস করে তখন কী বলব? আমি আঁচলে মুখ গুঁজলাম। এসব প্রশ্নের উত্তর আমি দেব না। কিছুতে না, নয়তো মিথ্যে বলব। কিন্তু ছেলেকে মা হয়ে কেমন করে মিথ্যে বলব? একটা চাপা উত্তেজনায় আমার ভেতরটা ঠকঠক করে কাঁপছিল। সত্যের জোরেই

তো শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছি। স্বার্থের কথা ভেবে সেই সত্যকে নোংরা করে ফেলব? আমার চোখের সামনে যে পৃথিবীটা পড়ে আছে তার কোনো হারানোর ভয় নেই। সে প্রশান্ত, সুখী, সুন্দর! এর আলো-ছায়া, রোদ্দুর, পাখির ডাক, ঘাসের গন্ধ, আকাশের নীল, পাতার সবুজ সবই কী সুন্দর! সুন্দর পৃথিবীতে যা সুন্দর, সত্য তাই শুধু বেঁচে থাকে। সর্বদমন আমার জীবনের সেই সুন্দর। সে আমার প্রেমের অভিজ্ঞান। আমার অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ। আমার ইহকাল, পরকাল, আমার অস্তিত্ব, অনস্তিত্ব, জীবন-মরণ সব।

দিনগুলো গড়িয়ে চলে সকাল থেকে সন্ধে এক নিয়মে। এক এক সময়ে মনে হয় ভুল তো মানুষ করে। মানুষই তো শুধরে নেয়। স্বামী যদি ভুল শোধরাতে আসে তবে ক্ষমা করতে দোষ কী? প্রশ্নটা কিন্তু দাগ কাটে না বুকে। এক বিরক্তিকর বিতৃষ্ণায় মনটা ভরে যায়। এই চিন্তার ভেতর আমি কোনো আনন্দ পাই না এবং কী যেন একটা হরণ করে নেয় মন থেকে। সে আমার সুখ, আমার শান্তি, আমার স্বাধীনতা।

প্রশ্ন করি, এটা আমার স্বামী সম্বন্ধে বিরুদ্ধভাব নয় তো? আমার প্রতিশোধ নেওয়ার মনোবৃত্তি নয়তো? আমি ভাবছি। আমার মাথার মধ্যে ক'দিন ধরে কথাটা ঘুরপাক খাচ্ছে। দুষ্মন্ত নামক ব্যক্তিটিকে আমার ভীষণ ভয়। সে আমার অনেক ক্ষতি করেছে, অপমান করেছে। আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। ওর নামটা পর্যন্ত আমার শুনতে ইচ্ছে করে না। এরকম একটা মানসিক সংকট নিয়ে নিজেকে সুস্থ রাখাই মুশকিল—তাই ভিতরটা অধীর। পাছে লোকের কাছে ধরা পড়ে যাই তাই সকলের কাছ থেকে দূরে সরে থাকি। নির্বিকার ঔদাসীন্যের আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে রাখি।

মহারাজ দুষ্মন্তের কাছে আমার কোনো প্রত্যাশা নেই। সর্বদমন হওয়ার পর চোদ্দটা বছর কেটে গেল। তার কাছে আমার কী প্রত্যশা থাকতে পারে? আমার নিজের চোখ আমার দিকে তাকিয়ে আছে। যেখানে এক অজ্ঞাত গুহার অন্ধকার জমাট বেঁধে আছে। সেই দিকেই ফেরানো আমার চোখ। আমার সে চোখে বিরক্তি আর অনুসন্ধিৎসা।

আমি মাটিতে শুয়ে আছি। ঠান্ডা মাটিতে গড়িয়ে গড়িয়ে ভাবছি, ভুবনবিখ্যাত মহারাজা দুষ্মন্ত আমার স্বামী। কত আপন আমার। তবু তাঁর কাছে আমি পৌঁছতে পারছি কই? আমার মন শান্ত। স্বামী সম্পর্কে কোনো চিন্তাভাবনা আমার নেই। থাকবে কোথা থেকে? তাঁর ও আমার সম্পর্ক ভালো করে গড়ে ওঠার আগেই তো সব ছিঁড়ে টুকরো-টুকরো হয়ে গেল। তারপর আমরা কেউ কারো সংবাদ রাখি না, খোঁজ করি না। সুতরাং তাঁর আগমনে মনে যদি হর্ষ না জাগে, তাহলে আমার দোষ কী? তাঁকে যদি ভালো না লাগে, তাহলে অপরাধটা কোথায়? একজন মানুষকে এক সময়ে মনে ধরেছিল, ভালো লেগেছিল বলে সারাজীবন সেই ভাললাগাটা অটুট থাকবে, এরকম কোনো বাঁধাধরা নিয়ম নেই। সব কিছুরই একটা কারণ থাকে। কেন জানি না, স্বামীর কথা মনে হলে আমার গা ঘিন্ ঘিন করে। ভীষণ অশুচি লাগে। আমার সেই একান্ত স্মৃতি তো অন্যের কাছে প্রকাশ করার নয়।

আমাকে নিয়ে আশ্রমে অনেক কথা হচ্ছে। আশ্চর্য, যারা বোঝাতে চাইছে, তারাও আমার মতো আশ্রিতা এবং পালিতা। তাদের জীবনের কারো শিকড় নেই। অতীত নেই। ভবিষ্যৎ নেই। তবু আমার প্রতি তাদের দরদ ও সহনুভূতির অভাব। দু'দিন ধরে বোঝালাম, মেয়েমানুষ হয়ে জন্মানো কোনো অপরাধ নয়। অপরাধ হলো মেয়েরা নিজেদের মানুষ মনে করে না। তার নিজের দাম সে নিজেই দেয় না, নিতেও জানে না। সারা জীবন পুরুষের কৃপাপ্রার্থী হয়ে ভয়ে ভয়ে অসহায়ভাবে জীবনটা কাটিয়ে দেয়। বাঁচার গৌরব কেউ কাউকে দেয় না। নিজেকে আদায় করে নিতে হয়। মেয়েমানুষ বাঁচার অধিকারে ও জীবনের ন্যূনতম দাবির সনদটা পুরুষের হাতে সমপর্ণ করে নিজেকে তার কারাগারে বন্দী করে; তাই ভালোমন্দ বোধটুকুও তার বিচার করার শক্তি নেই।

প্রিয়ংবদা আমার কথায় অসহিষ্ণু হয়ে বলল নারী-পুরুষের ঝগড়া চিরকাল। ধরিত্রীর মত নারীকে সহিষ্ণু হতে হয়। সব কিছু মেনে নিতে হয়। ধরিত্রীর মতো নারীও অসহায়। প্রতিরোধের শক্তি তার নেই। প্রাকৃতিক শক্তির কাছে তাকে আত্মসমর্পণ করতে হয়। কারণ, তার করার কিছু নেই। এটাই তার বিধিলিপি। ধরিত্রী আর নারীতে কোন তফাত নেই।

অনুসূয়া কাঁধের উপর আলতো করে হাত রেখে বলল, তোর জন্যে ভাবনা হয়। চিরদিন একগুঁয়ে থাকলি। মহারাজ তোকে নিতে এসেছেন আর তাঁকে তুই ফিরিয়ে দিবি? আমি বলি কি, তাঁর সঙ্গে একবারটি দেখা কর।

কাঁধের ওপর থেকে অনুসূয়ার হাতটা নামিয়ে দিলাম। মুখে একটা বিরক্তিসূচক শব্দ করে বললাম, তোর মহারাজ পারবে, আমার যৌবনের ষোলোটা বসন্ত ফিরিয়ে দিতে? কী চুপ করে আছিস কেন? আমার জীবনের বৃন্ত থেকে একটা একটা করে বসন্ত শুকনো পাতার মতো খসে পড়েছে। ভালোবাসার গাছটা কঙ্কালসার হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ভালো করে তাঁর মুখখানাও মনে পড়ে না। তাঁর আগমনে হর্ষ, বিষাদের কোনো অনুভূতি হয় না। ষোলোটা বছর হয়ে গেল আর কতকাল মনে থাকবে?

প্রিয়ংবদা তাড়াতাড়ি আমার মুখ চাপা দেওয়ার জন্য বলল, এ তোর অভিমানের কথা। যেখানে ভালোবাসা থাকে, অভিমান তো সেখানেই হয়। অভিমানের দর্পণে ভালোবাসার মুখ ফুটে ওঠে।

প্রিয়ংবদা সব কথার ভালো উত্তর দিতে পারে। সামান্য একটু কথা দিয়ে হৃদয়ে সুধাসিন্ধু বইয়ে দেওয়ার এক অসাধারণ ক্ষমতা আছে তার। তাই ও যখন কথা বলে তখন চোখের ওপর চোখ রেখে কথা বলে যাতে দৃষ্টি একটু উপচে না পড়ে। ঐ দৃষ্টি দিয়ে বোধহয় মানুষের ভেতরটা দেখতে পায়। ওর কথা শুনে আমি চুপ করে আছি। আমার হেঁট মাথা ওর দু'চোখের মুগ্ধ চাহনির ওপর তুলে ধরে বলল, মহারাজ তাঁর প্রেম ও আনন্দ নিয়ে, সুখ-দুঃখ কাতরতা নিয়ে, তাঁর হৃদয়ভরা জিজ্ঞাসা নিয়ে আজ তাঁর বৌরানীর কাছে এসেছেন। আর কোনো মানুষের কাছে নয়, শুধু তার একটু ক্ষমা পাওয়া জন্য কাঙালের মতো পথে পথে ঘুরেছেন। তাতেই কি তার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত হয়নি!

প্রিয়ংবদার কথার কী জবাব দেবো? তার কথায় আমার শরীর মন জুড়িয়ে গেল। আমি চন্দনের সুবাস পাচ্ছি। আমার বুকের ভেতর সমস্ত স্ফুলিঙ্গের ওপর ঠান্ডা বাতাস লাগছে। মনে হচ্ছে আগুনটা নিবে যাবে। কিন্তু রাগটা ভেতরে গব গর করতে লাগল।

অনুসূয়া বলল, ঝগড়া করে শান্তি পাওয়া যায় না। এখন ঝগড়ার সময় নয়। সম্মান-অসম্মান, মেয়েমানুষ-পুরুষমানুষের কথা না হয় বাদই দিলাম। কিন্তু স্ত্রী হিসেবে তোর কিছু কর্তব্য আছে। অবস্থার সঙ্গে সব কিছু মানিয়ে নিতে হয়। মেনে নেওয়াটা মেয়েদের একটা বড় গুণ। শান্তির জন্যে এটুকু ত্যাগ সব মেয়েকে করতে হয়।

আমার ভেতর তেজস্বিনী সত্যবাদিনী একগুঁয়ে মেয়েটি হঠাৎ বিষধরের মতো ফোঁস করে উঠল। বললাম, এটা কোন ত্যাগের কথা নয়। একজন ব্যাক্তির সমস্যা। গোঁজামিল দিয়ে কোনো একটা সমস্যাকে চাপা দেওয়া যায়, কিন্তু তার কোনো স্থায়ী মীমাংসা হয় না। আমার সংকটটা কোথায়, ঠিক বোঝাতে পারব না। কিন্তু আমার মন দিয়ে, অভিজ্ঞতা দিয়ে বুঝেছি, যেখানে প্রেম নেই, শুধু দেহের তৃষ্ণা আছে, সেখানে শ্রদ্ধা, সম্মানবোধ কিছু থাকে না। শ্রদ্ধা, সম্মান, বিশ্বাস দিয়েই তো মানুষেব সমস্ত সম্পর্কের ভিত গড়ে ওঠে, প্রেমের, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের। এই ভিত্ নড়ে গেলে হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে সব সম্পর্ক। হৃদয় একবার ভেঙে গেলে তা আর জোড়া লাগে না। কেন বুঝিস না। সম্মান, মর্যাদা, শ্রদ্ধা, বিশ্বাস ছাড়া মানুষের কোনো সম্পর্কই স্থায়ী হয় না। নিজের মূল্য যে আদায় করতে না জানে, কেউ তাকে দাম দেয় না। শ্রদ্ধাও করে না। নিজেকে শ্রদ্ধার পাত্র করে তোলার দায় প্রত্যেকের নিজের। এর মধ্যে মেয়ে-পুরুষ বলে কিছু নেই। মান, অভিমান, অহঙ্কারের কথাও নেই। অপমান নিয়ে তাঁর কাছে আমি মাথা হেঁট করতে যাব না।

আশ্রমদিদি সেইসময় আমাদের সামনে দিয়ে হনহন করে দিঘির দিকে যাচ্ছিল। আমাদের কথা শুনে পথের মধ্যে থমকে দাঁড়াল। ঘৃণায় বিরক্তিতে মুখখানা বিকৃত করে আমার দিকে তেড়ে এলো। রাগে তার ভুরু কুঁচকে ছোট হয়ে গেল। মুখের কাছে মুখ এনে মাথা নাচিয়ে বলল মেয়েমানুষের এত দেমাক ভালো নয়। রাজার অগ্নি সাক্ষী করা বৌও তুই না। পথে ঘাটে রাজা-মহারাজারা ওরকম হাজার সুন্দরী, বিদুষী মেয়েকে নিয়ে বৌ বৌ খেলা করে। নেশা কেটে গেলে ছেড়ে চলে

যায়। কিন্তু সেখানে রাজা স্বয়ং এসেছেন রানীর সম্মানে তোকে নিয়ে যেতে। এতেই মানুষ ধন্য হয়ে যায়। বেশি বাড়াবাড়ি করলে এ আদরটুকুও অনাদরের ঢিল হয়ে গায়ে লাগবে।

অনুসূয়ার চোখেমুখে একটা ভয় ফুটে উঠেছিল। পাছে আশ্রমদিদির কথাগুলো আমাকে বিদ্ধ করে, আমি দুঃখ পাই, তাই প্রসঙ্গটা বদলে বলল, আমরা সবাই তোর ভালো চাই। তোর জীবন সুখের হোক, শান্তির হোক, সুন্দর হোক— এসব এত বেশি করে চাই বলে ভয়ে মরি। রানী হওয়ার সৌভাগ্যের ডাক এসেছে। নারীর সম্ভ্রম, স্ত্রীর সম্মান, পুত্রের পিতৃত্বের স্বীকৃতি— এসব ছেড়ে কী নিয়ে তুই থাকবি? অবহেলায় যদি বিপন্ন হয় তাহলে তোর সান্ত্বনা থাকবে কী? ছেলেকেই বা কি কৈফিয়ত দিবি?

কারো কথার জবাব না দিয়েই আমি সেখান থেকে চলে গেলাম। কারণ ওরা ওদের কথাই বলছে। আমারও যে বলার কিছু আছে সেটা মেয়ে বলে কেউ শুনতে চায় না। আমারও গরজ ছিল না। প্রত্যেকের নিজের মতো করে থাকার অধিকার আছে।

আমার কাছে ওদের অভিযোগ, তিরস্কার, সহনুভূতি কোনোটাই নতুন নয়। ওরকম কথা আগেও অনেক বলেছে, এখনও বলছে। পরেও বলবে। এসব হুল ফোটানো কথা আর ভাবাবেগ আমাকে কিছুমাত্র বিচলিত করল না।

আমি হলাম আশ্রমের সব মেয়েব কৌতুহল এবং বিরক্তির পাত্র। ওরা আমাকে অপছন্দ করতে আরম্ভ করেছে। ওদের চোখমুখ দেখে সেটা বোঝা যায়। আমার অসাক্ষাতে কী সব কথা হয় কানে না শুনলেও অনুমান করতে পারি। এরাই তো পাঁচ জন, পাঁচ মুখ। এরাই তখন সমাজ এবং শাস্ত্র। হীনম্মন্যতায় ভোগে বলেই সুস্থ সুন্দর জীবনের স্বপ্ন দেখতে জানে না। কল্পনাও করে না। ভিখারীর মতো ভিক্ষাপাত্র হাতে করে ভিখ্ মাঙছে। বেঁচে থাকার বাতাসে বিষ ছড়াচ্ছে।

পরিবেশের প্রভাব মনেতে পড়বেই। আমারও ভেতরটা অস্থির হয়ে উঠল। ঘরের মধ্যে বন্দী থাকতে ভালো লাগছিল না। তাই কুটীরের বাইরে খোলা আকাশের তলায় এসে দাঁড়ালাম। আকাশে চাঁদ ছিল না, অগণ্য তারার চুমকি দিয়ে আকাশখানা মোড়া ছিল। জোনাকিরা আলোর দীপ জ্বালিয়ে অন্ধকারে দেওদার বনে কী যেন খুঁজে বেড়াচ্ছে। মনে হচ্ছিল, এই খোঁজার যেন আদি-অন্ত নেই। এক অদ্ভুত ভাবাবেগে আমাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। কোনো কথা বলতে পারছিলাম না। আমার আত্মা প্রবেশ করছিল এক অলৌকিক প্রশান্তির মধ্যে। আমার কোনো অভাব নেই, দৈন্য নেই। আরামে আমার চোখ বুজে এলো। নিজেকেই প্রশ্ন করলাম, কী চাই আমি? উত্তরে মন বলল, কিছু চাই না, শুধু আমাকে নিয়ে চল সেই কণ্বমুনির আশ্রমে। সেখান থেকে আমি নিজেকে একবার দেখব। নিজের কাছেই মানুষ নিজের কথা মন খুলে বলতে পারে। দোষ, অপরাধ, ত্রুটি-বিচ্যুতি পাপ অনুশোচনা অকপটে নিজের কাছে স্বীকার করতে তার লজ্জা নেই।

আমার নাম শকুন্তলা। বাবা-মা'র আদর করে দেওয়া নাম নয়। পথের ধুলো থেকে কুড়নো নাম। এই নামের পেছনে ছোট্ট একটা গপ্পো আছে। কিংবদন্তীর মতো গল্প। গোড়া থেকেই বলি।

শৈশবের কোনো কথা ভালো মনে নেই। সব কিছু ভীষণ অস্পষ্ট। ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখার মত কিছু কিছু ঘটনার কথা এখনো মনে করতে পারি। আমার বয়স তখন তিন-চার বছর। আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, পিতা কণ্বমুনির গায়ে ঠেস দিয়ে দু'পা ছড়িয়ে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে হাঁ করে গল্প শুনছি। কী অপূর্ব তাঁর গল্প বলার ভঙ্গি। ভাবাবেগের সঙ্গে গল্পের স্বর প্রক্ষেপণের ওঠানামার এমন একটা পরিবেশ সৃষ্টি হতো যে গোটা গল্পের সঙ্গে মনটা অভিন্ন হয়ে যেত। প্রতিদিন তাঁর গল্প না শুনে আমি খাওয়া, ঘুম কিছুই করতাম না।

পিতা কণ্বের খুব নেওটা ছিলাম। একদন্ড তাঁকে কাছে না পেলে আমার চলতো না। ঘুমনোর সময় একটা হাত থাকতো তাঁর কোমরে, আর একটা হাত গলার কাছে হারের মত ঝুলত। তারপর নিশ্চিন্তে ঘুমোতাম। ঘুমের মধ্যেও তাঁর স্পর্শ অনুভব করতাম। টের পেতাম ওঁর মুখ আমার গালের ওপর নেমে এসেছে, আমাকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে আদর করছেন, চুমু দিচ্ছেন, কানের কাছে

মুখ নিয়ে স্বগতোক্তির মতো নিজের খেয়ালে কথা বলছেন, প্রশ্ন করছেন। আর আমি ঘুমের মধ্যে হাঁ-হুঁ না করে তার জবাব দিচ্ছি! আর তাঁর ভেতরটা এক অব্যক্ত খুশিতে ভরে যাচ্ছে। বিগলিত সন্তোষে কখনো আমার গায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন, কখনো কোলের ভেতর টেনে নিয়ে আদর করছেন। আর আমিও সরে সরে তাঁর বুকের মধ্যে জায়গা করে নিচ্ছি। তাঁর শরীরে সঙ্গে লেপ্টে থাকছি। নেশার মতো আমার শরীরে তাঁর স্নেহের স্বাদ লেগে আছে।

অনেককাল পরের কথা। আমি বড় হয়েছি। বুঝতে শিখেছি। একদিন এক দুপুরে গৌতমী পিসিকে নিয়ে এক বৃদ্ধ লোক আশ্রমে এলো। পিসির তখন ভরা যৌবন। দেখতেও খুব সুন্দর। তাঁকে দেখলে কেমন একটা শ্রদ্ধা হয়। অল্পক্ষণের মধ্যে তাঁর সঙ্গে আমার ভীষণ ভাব হয়ে গেল। আশ্রমের আরো পাঁচটা বালক-বালিকার সঙ্গে পিসি যখন মিশে গেছেন, আমাদের একজন হয়ে গেছেন তখন সেই বৃদ্ধ লোকটি পিতাকে দুম করে বলল, গৌতমী বড় ভালো মেয়ে। এখন থেকে ও আপনার আশ্রমেই থাকবে। ওর সব দায়িত্ব আপনাকে দিলাম। মেয়ের আমার ভাগ্যটাই মন্দ। আপনার সেবা করে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দেবে।

পিতা শুধু নিঃশব্দে মাথা নেড়ে সম্মতি প্রকাশ করলেন। গৌতমী পিসির দু'চোখ ভরে সহসা জল নামল। আমারও কান্না পেল। বললাম, পিসি তুমি কাঁদছ ? তোমার কান্না দেখলে আমার চোখে জল আসে।

গৌতমী পিসি তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছে বলল, পাগল মেয়ে। কাঁদব কেন? দুঃখের কপাল নিয়ে যারা জন্মায় চোখের জল তাদের সান্ত্বনা। তাই, চোখে একটু জল এসেছিল। ও কিছু না। তোমাদের পেয়ে আমার আর কোনা দুঃখ নেই। তোমরাই আমার সব।

সেই থেকে গৌতমী পিসি আশ্রমে থেকে গেল। আশ্রমের ছেলেমেয়েদের দেখাশোনার ভার পড়ল তার ওপর। গৌতমী পিসিকে সকলের খুব পছন্দ। তাঁর আগে ছিল তমসা পিসি। কারণে অকারণে শাসন, গালমন্দ করে আমাদের দাবিয়ে রাখত। কিন্তু গৌতমী পিসি একেবারে আলাদা মানুষ। আমরা যেমনটা চাই তেমন। আমাদের নিয়ে তার দিনটা কোথা দিয়ে কেটে যেত নিজেই বুঝে উঠতে পারত না।

বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে শিখলাম এটা একটা অনাথ আশ্রম। এখানে যারা থাকে তারা পিতৃমাতৃহীন। কণ্বমুনি আর গৌতমী পিসি ছাড়া এই দুনিয়ায় তাদের আপনার বলে কেউ নেই।

একদিন মাথায় একটা ঝুড়ি চাপিয়ে বাবা আশ্রমে ফিরলেন। সময়টা তখন পড়ন্ত বিকেল। শীতকাল। সন্ধে হয় হয়। শীতের মুখ। পশ্চিম আকাশ গনগনে আগুনের মতো লাল। তখনও কিছু বকের পাঁতি আকাশের বুকে নিশ্চিন্তে ডানা মেলে দিয়ে নীড়ে ফিরছে সুখের প্রত্যাশায়। কুয়াশার মতো হাল্কা অন্ধকার গড়িয়ে আসছে চারদিক থেকে। পুব আকাশে সন্ধ্যাতারা হীরের টুকরোর মতো জ্বলজ্বল করছে। দিন ও রাতের সন্ধিক্ষণেই বাবা আশ্রমের তকতকে আঙিনায় এসে দাঁড়ালেন। জ্ঞান হওয়া থেকে তাঁকে এভাবে ঝুড়ি ঘাড়ে করে আসতে দেখেনি। আশ্রমের অন্যান্য বালকেরা আছে, শিক্ষার্থীরা আছে—প্রয়োজনীয় জিনিসপত্তর তারাই বয়ে আনে। তাই বাবাকে এভাবে ফিরতে দেখে একটু অবাক হলাম। গৌতমী পিসি তো হেসেই আটখানা। বলল, আশ্রমে ছেলের তো অভাব নেই। মাথায় এভাবে ঝুড়ি বয়ে আনে কেউ? তুমি যেন কী হয়ে যাচ্ছ?

হাসতে হাসতে বাবা নিজেই হাল্কা ঝুড়িটা কাঁধ থেকে নামিয়ে মাটিতে রাখল। বলল, গৌতমী তোর জন্যে একটা ভালো জিনিস এনেছি।

তোমার মতো মানুষের ঘাড়ে করে ঝুড়ি আনাটা খুব অন্যায় হয়েছে। আমি চাই না তোমার ভালো জিনিস।

বাবা মুচকে মুচকে হাসল। বলল, এনে যখন ফেলেছি তখন তো আর ভুল শোধারানোর উপায় নেই। আমার কথা শুনে একবার ঢাকনা খুলে দ্যাখ।

গৌতমী পিসির মন গললো। উৎসাহে ঢাকনা খুলল। ভূত দেখার মতো আঁতকে ওঠল। চমকানো বিস্ময়ে বলল, মুনি-দাদা তুমি এ কী নিয়ে এসেছ? এ যে সদ্য জন্মানো একটা মেয়ে। এ কোন্ পাপ তুমি আশ্রমের ঢোকালে?

বাবা মৃদুস্বরে ভর্ৎসনা করে বলল, ছিঃ গৌতমী। যাকে করুণা করলে তোমার হৃদয় ধন্য হতো অবহেলা করে ঘৃণা করে নিজেকে নিষ্ঠুর করলে কেন?

কৌতুহলী হয়ে আমি গৌতমী পিসির সঙ্গে ঝুড়ির উপর ঝুঁকে পড়েছিলাম। কিন্তু একটা ছোট শিশুকে দেখে গৌতমী পিসির এমন চিৎকার করে ওঠার কী আছে বুঝে উঠতে পারলাম না। গৌতমী পিসির বাড়াবাড়িটা আমার ভালো লাগল না। বাবার বুকভরা দয়া, মায়া, মমতা দেখে বুক আমার গর্বে ভরে গেল। এমন একজন মহাপ্রাণ মানুষের পাশে গৌতমী পিসিকে বড় নিষ্ঠুর মনে হল।

গৌতমী পিসির কথা শুনে বাবা একটুও রাগল না। থমথমে বিষণ্ণ গলায় বলল, গৌতমী আমাদের শুধু কাজের অধিকার। পাপ-পুণ্যের বিচার করার আমরা কে? নবজাতিকাকে এনে খুব অন্যায় করলাম কি?

গৌতমী পিসির বুকের বরফ গলতে শুরু করল। অপরাধীর চোখে বাবার দিকে তাকাল। তারপরেই ঝুড়ি থেকে শিশুটিকে বুকে তুলে নিল। বলল, মুনিদাদা, তুমি কী বলো তো। বাচ্চার মুখে গোঁজা ন্যাকড়ার টুকরোটা তো আগে বের করবে। বেচারা কাঁদতে পারছে না, নিঃশ্বাস নিতে পারছে না। শরীরটা নীল হয়ে গেছে। একটা পশুর প্রাণে যে মমতা আছে, মানুষের প্রাণে সেটুকুও নেই!

গৌতমী পিসি গজর-গজর করতে করতে ন্যাকড়ার দলাটা মুখ থেকে টেনে বার করল। অমনি শিশুটি বুকভরা নিঃশ্বাস নিয়ে ককিয়ে কেঁদে উঠল। জীবনের প্রথম কান্না বোধহয়। তাই, উচ্চৈস্বরে কাঁদল। মানুষের বিরুদ্ধে দুনিয়ার কাছে নালিশ জানাল। তার কোলের ভেতর সে ছটফট করতে লাগল। মনে হলো, গৌতমী পিসির আদর নেবে না বলে শিশুটি তার কোল থেকে ওঠার চেষ্টা করছে যেন।

ওর কান্ড দেখে আমার বুক ফেটে যাচ্ছিল। বললাম, পিসি আমার কোলে একটু দাও। খুব খিদে পেয়েছে বলে অমন করছে। তুমি একটু দুধ নিয়ে এস। গৌতমী পিসির কোল থেকে নিয়ে, তার মুখে একটা আঙুল পুরে দিতে কেমন চুক চুক করে চুষতে লাগল। সেই বয়সে আমার শরীরের মধ্যে কী এক অব্যক্ত শিহরণ বয়ে গেল। আর আমি একটা গভীর সুখের আবেশে আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছিলাম। পুতুলদের মা হয়ে তো কোনোদিন এসব অনুভব করেনি। দুরন্ত ভাবাবেগে ওর গালটা টিপে ধরলাম। মুখে অজস্র চুমু দিলাম। আশ্চর্য, ও একটু কাঁদল না। সুড়সুড়ি লাগার মতো আমার কোলের ভেতর নড়েচড়ে উঠল।

বাবা আমার কান্ড দেখে হাসছিল। হাসিহাসি মুখ করে বলল, মানুষের ভালোবাসার কোল পেলে সব শিশু অমন করে। ভালোবাসা পেলে বনের পশুও হিংসা ভুলে যায়। ভালোবাসাই ঈশ্বর। ভালোবাসাই স্বর্গ। ভালোবাসার মতো পুণ্য আর কিছুতে নেই। মানুষের লোভ আর চিত্তের অসংযম হল পাপ। তাই তো জ্ঞানীরা বলেন, লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু।

বাবা কোল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে গৌতমী পিসির দুধ খাওয়ানোর দৃশ্যটা দেখছিলাম। ঝিনুকে করে শিশুর গালে দুধ ঢেলে দিচ্ছে আর সে প্রচন্ড খিদেয় তেষ্টায় ছোট্ট হাঁ-গাল করে ঢক্ ঢক্ করে খাচ্ছে। এর আগে কোনো শিশুকে দুধ খাওয়ানোর দৃশ্য আমি দেখেনি। পেট ভরে গেলে কী এক গভীর সুখ ও আনন্দে গৌতমী পিসির দিকে চেয়ে হাত-পা নেড়ে খেলতে লাগল। গৌতমী পিসিও তার খেলায যোগ দিল।

এরকম একটা স্বর্গীয় আবেগঘন মুহূর্তে সেখানে কোথা থেকে তমসা পিসি হাজির হল। অমনি বদলে গেল দৃশ্যটা। দু'চোখ তার রাগের আগুন জ্বলছে। তার উগ্রমূর্তি দেখে বাবাও কেমন সংকুচিত হল। কেউ কিছু বলার আগেই তমসা পিসি ঝংকার দিয়ে বলল, আবার তুমি তপোবনে পাপ জুটিয়েছ। পইপই করে বলি, এসব আপদ-বালাই মানুষ করে পৃথিবীটা তুমি স্বর্গ করতে পারবে না। যত তাড়াতাড়ি পার, এসব আপদ বিদেয় কর।

বাবা একটুও রাগল না। বলল, জেনেশুনে একটা জ্যান্ত শিশুকে মরতে দিলে সেটাই পাপ হত। এই শিশুর অপরাধ কী! ও তো কোনো পাপ নিয়ে আসেনি।

তমসা পিসি ঝংকার দিয়ে বলল—পাপ ছাড়া কী। নিষ্পাপ হলে কেউ ফেলে দিতে পারতো?

তমসা, যারা পৃথিবীতে ওকে আনল অথচ রক্ষার কোনো দাযিত্ব নিল না, পাপ তাদের। তাদের

পাপে ওর জীবনটা যেতে বসেছিল। কিন্তু ওর শরীরে কোন পাপ নেই বলে বিধাতা ওকে বাঁচিয়ে নিষ্পাপ বলে প্রমাণ করলেন।

তমসা পিসির মুখে সহসা কথা যোগাল না। তবু দমলো না। বলল, একে নিয়ে করবে কী?

অমৃতের পুত্র-কন্যাদের নিয়ে যা করছি, তাই করব। এই তপোবন তো ওদের কল্যাণেই করেছি। অমৃতের পুত্র-কন্যাদের সংসারে ঠাঁই দেবার শক্তি দুর্বল ভীরু মানুষের কোথায়? ঘরের চৌহদ্দিতে তাদের ধরে না বলেই বিশাল পৃথিবীর নীল আকাশের নিচে জায়গায় করে নেয়। ওদের জায়গা দিয়ে আমাদের তপোবন স্বর্গ হয়ে গেল।

গৌতম পিসি বলল, স্বর্গ বলে সত্যি কিছু আছে কি নেই, জানি না। স্বর্গ চোখে দেখা যায় না সেখানে হেঁটে পৌঁছানো যায় না। কিন্তু মুনি দাদার এই স্বর্গ চোখে দেখা যায়, হেঁটে পৌঁছানো যায়। এখানে একে অন্যাকে ছুঁতে পারি। জীবনের মাটিতে পা ফেলে একে অন্যাকে সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব করতে পারি। মানুষের প্রেম, মমতা দিয়ে গড়া এই স্বর্গের কোনো বিকল্প নেই। মানুষের হাতেই এই পৃথিবী স্বর্গ হয়, আবার মানুষই একে নরক করে।

তমসা পিসির রাগ পড়ল না। গলার স্বরে করুণার ছোঁয়া পর্যন্ত নেই। বিরক্তি প্রকাশ করে বলল, পাগলের সঙ্গে পাগলামি করার বাহাদুরি নয়। সব কিছু ভাবতে হবে। সমাজ বলে একটা জিনিস আছে। এদের ভবিষ্যৎ কী? কেউ এদের নিয়ে ঘর-সংসার করবে? ঐ বৃদ্ধ মানুষটি চোখ বুজলে এদের দায়-দায়িত্ব কে নেবে? কীভাবে চলবে? কোনদিন সে কথা ভেবেছ?

গৌতমী পিসি বলল, জীবনের ঘর-সংসারই কী সব দিদি? বেঁচে থাকা কিছু নয়! এই তো আমার তোমার স্বামী-সংসার সব আছে, তবু ঘরে আমাদের ঠাঁই হলো না। তাই বলে কি আমরা ফুরিয়ে গেছি, শেষ হয়ে গেছি? আমাদের মত আর পাঁচটা দুর্ভাগার সঙ্গে মিশে গেছি।

এসব কথা শুনতে আমার ভালো লাগছিল না। বোঝার বয়স হয়েছিল বলেই মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গেল। বিদ্যুৎ চমকের মতো একটা যন্ত্রণা বুকের ভেতর ফালা ফালা করে দিল। খুব ছেলেবেলার কথা ভাল মনে নেই। শুধু মনে আছে, একটা অব্যক্ত বেদনা নিয়ে সেখান থেকে আমি সরে গেছি। সব ফাঁকা লাগছে। বড় একা মনে হচ্ছে! ভেতরটা আমার কুঁই কুঁই করে কাঁদছে। কিন্তু সে কান্নাটা হৃদয় দিয়ে বোঝার মত সত্যি যদি কেউ না থাকে তা হলে বড় অসহায় লাগে। যন্ত্রণায় দম বন্ধ হয়ে আসে। কিন্তু এত কষ্ট কেন? কেন জানি না। বুকের মধ্যে দুঃখের মত ব্যথা বাজে এক ধরনের।

বাইরে ফুট ফুট করছে জ্যোৎস্না। তপোবনময় নরম চাঁদের আলো। শুধু আমার ঘরই অন্ধকার। কেন? এই কেনর জবাবটা আমার মনকে কুরে কুরে খাচ্ছিল! আর কেমন একটা ভয়ে শীত শীত করছিল ভেতরটা।

আমার সেই হাসিখুশি সহজ ভাবটার কোথায় যেন ছন্দপতন হলো। রাতারাতি আমি বদলে গেলাম। বালিকা থেকে এক বয়স্ক মহিলা হয়ে গেলাম। আমার কথাবার্তায়, আচরণে আর সেই ছেলেমানুষী থাকল না। আকস্মিক এই ভাবান্তর আমারও নজর এড়ালো না। কিন্তু এর উৎস কোথায়, গৌতমী পিসি, তমসা পিসি এবং আমার সখীরাও কেউ আন্দাজ করতে পারল না। আমাকে নিয়ে তাদের কৌতূহলটা বেড়েই চলল। আশ্রমের ছোট-বড় সকলের নজর আমার ওপর। আমার এই পরিবর্তনটা কারো মনঃপূত হচ্ছিল না। তারপর, আস্তে আস্তে সয়ে গেল সব। আমার জন্যে কাউকে আর উদ্বেগে দিন কাটাতে হয় না।

কেবল, আমিই পারলাম না বিব্রত ভাবটা কাটিয়ে উঠতে। কোথায় যেন আমার একটা জড়তা ও দ্বিধা ছিল। যত দিন যায় নিজেকে নিয়ে নানা প্রশ্ন মাথাচাড়া দেয়। নিজেকে প্রশ্ন করি, কে আমি? কোথা থেকে এলাম? কেমন করে এলাম? আমার আসাটা কি খুব জরুরী ছিল? আমাকে নিয়ে বিধাতা কী করতে চায়? এরকম সব অদ্ভুত প্রশ্নে মন আমার তোলপাড় করত। আমার মনে এখন কোন অবস্থা চলছে? মনের এ অবস্থাকে কী বলে? সুখ, না দুঃখ? আনন্দ, না বিষাদ? বন্ধন, না মুক্তি? বোধহয় কোনোটাই নয়! এ আমার হলো কী? আসলে একটা কিছু খুঁজছিল মন। শক্ত কোনো অবলম্বন চাইছিল। সেটা না পাওয়া অতৃপ্তিতে মন ভরপুর ছিল। দ্বিধা-জড়তার ভাবটা

কাটিয়ে উঠতে পারছিলাম না। পাছে কিছু হারাতে হয়, এই ভয়েই মনটা পালিয়ে বেড়াচ্ছিল। সাহস করে নিজের অতীতের দিকে চোখ মেলে চাইতে ভয় করছিল। একদিন সেই ভয়টাও আর থাকল না। সেই প্রথম নিজেকে জিগ্যেস করা—আমি কে? আমার পরিচয় কী? কার সন্তান আমি? কোন্ বংশে আমার জন্ম? আমার পিতা কে? মাতা কে? এই তপোবনে বা মানুষ হচ্ছি কেন? আচার্য কণ্বমুনির সঙ্গে আমার সম্পর্ক কী? তিনি কি আমার জন্মদাতা পিতা? আমি কি তাঁর বংশগতির দীপ হয়ে জ্বলছি? অন্যদের চেয়ে আমাকে একটু বেশি স্নেহ করেন বলেই খটকা লাগল মনে। পরমুহূর্তে ভীষণ সন্দেহে মনটা খারাপ হয়ে গেল। আচার্য কণ্বমুনি তো আমার অতীত নিয়ে, পিতা-মাতাকে নিয়ে কোনো গল্প বলেনি কোনোদিন। তাদের সম্পর্কে কিছু জানিও না। জানার কোনো দরকার হয়নি। কারণ আমার কোনো অভাব ছিল না।

প্রকৃতি পরিবৃত গাছপালা, অরণ্য, বনের জীবজন্তু, আশ্রমের মানুষজনের সঙ্গে আমার এমন একটা স্নেহ-প্রীতি, ভালোবাসার নিবিড় সম্পর্কে গড়ে উঠেছিল যে, আমার কিছু নেই, আমি কিছু পাইনি এই অভাববোধে কখনো আর্ত হয়নি মন। কোনো শূন্যতাজনিত বিষাদ, অবসাদও ছিল না আমার। এদের প্রেম-প্রীতির মধ্যে এমন আচ্ছন্ন ছিলাম যে, কোনোদিন মনে হয়নি তপোবনের বাইরে আমি। হঠাৎ একদিন আমার ভেতর থেকে এক আত্মসচেতন নারী তার অনন্ত কৌতূহল নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল। সেদিন নিজেকে আমি প্রথম প্রশ্ন করলাম, আমি কে? কী ভাবে তপোবনে এলাম? কেন এলাম?

এক একটা কথা এমনভাবে কানে, হৃদয়ে বসে যায় যে, সেই সব কথা জীবনের জটিল জিজ্ঞাসার এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে ওঠে। কিছু মুহূর্ত এবং কিছু সময় থাকে যখন সেই কথাগুলোর ভেতর মানুষ তার সারা জীবনের উত্তর খোঁজে। কণ্বমুনির আনীত সদ্যোজাত শিশুটিকে ঘিরে জীবননাট্যের যে অনুদঘাটিত দৃশ্যের অবতারণা হল, তারা স্মৃতিটুকু মনে গেঁথে রইল। এর সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। তবু একটা সন্দেহে মনটা খচ্ খচ্ করতে লাগল। সন্দেহ একবার হলে তার ঘোর কাটে না সহজে। ঘোলা আবর্তের মতো সে শুধু অতলের দিকে টানে। অতর্কিতে একদিন মনে উদয় হল : মহাপ্রাণ কণ্বমুনি আমাকেও কি এভাবে কুড়িয়ে পেয়েছেন? কথাটা মনে হতে বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। সারা শরীরের মধ্যে ভূমিকম্প ঘটে গেল। আমার পায়ের নীচে মাটি দুলছিল। শরীরের সেই অপ্রতিরোধ্য আন্দোলনে আমি সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছি না। আমার সব শক্তি স্তিমিত হয়ে আসছে। শয্যার ওপর স্থির হয়ে পড়ে আছি। কী একা! আত্মীয় পরিজনহীনতা মানেই কি একাকিত্ব? নিজেকে বড় অসহায় লাগছিল। আমার সত্যিকারের আপনজন বলতে কেউ নেই। এই পৃথিবীতে আমি একা, নিরাশ্রয়। মনের ভেতর আমার ঝড় উঠল। কেমন একটা দিশাহারা ভাব আমাকে অস্থির করে তুলল। মনে হলো, আমি যেন জলে পড়েছি।

কয়েকদিন ধরে একা যন্ত্রণা ভোগ করলাম। যত দিন যেতে লাগল এক অনুচ্চারিত জিজ্ঞাসা আমার সমস্ত মনটাকে অস্থির করে তুলল। একটুও স্বস্তি পেলাম না মনে। কারো সঙ্গে কথা বলতে পর্যন্ত ইচ্ছে করে না ভালো লাগে না। একা একা থাকি। তপোবনের বিশাল চত্বরে একা একা ঘুরি। নিজের মতো থাকি। চিতোল হরিণশিশুটা কাছে এলে বুকে জড়িয়ে আদর করি। চুমু দিই। দিগন্তবিস্তৃত অরণ্যের দিকে রহস্যময় চোখে চেয়ে থাকি। মনের ভেতর একটা দুঃখ ছাপিয়ে ওঠে। নিজের অজান্তে চোখ ভরে জল নামে। চিতোল হরিণ জিভ দিয়ে সে জল মুছে দেয়।

মনটা যখন বড় পাগল পাগল হয় তখন বনতোষিণী, অপরাজিতা, কামিনী, শিশুর ছায়ায় বসলে মনে একটা শান্তি পাই। স্নিগ্ধ হাওয়া, ফুলের সুগন্ধ, পাতার অব্যক্ত প্রলাপ, গাছেদের প্রশ্রয়ভরা চাহনি আমার সব দুঃখের সান্ত্বনা হয়ে ওঠে। আমাকে নবীকৃত করে।

এভাবে নিজেকে বেশিদিন লুকিয়ে রাখা গেল না। আমার চোখ-মুখই সব বলে দিচ্ছিল। একদিন কণ্বমুনির কাছে ধরা পড়ে গেলাম। বাবা উৎকর্ণ উৎকণ্ঠা নিয়ে জিগ্যেস করলেন, তোমার কী হয়েছে মা? ক'দিন ধরে দেখছি আমার পূজার সময় কাছে থাক না। একা একা থাকতে ভালোবাস। তোমার

সদাপ্রফুল্ল ভাবটাও আর নেই। দিন দিন মুখখানা শুকিয়ে যাচ্ছে। চোখে-মুখে কালি পড়েছে। চুলে জট পড়েছে। শরীরে সে লাবণ্য নেই। মনে সুখ আনন্দ না থাকলে এমন হয়। এমন কী ঘটল যে, তুমি ভেঙে পড়েছ? তোমার জীবনটা দুঃখময় হয়ে গেছে? চুপ করে আছ কেন? বলো। আমাকে তোমার লজ্জা পাওয়ার কিছু নেই। অসংকোচে তোমার মনের কথা বলো।

আমার সব তালগোল পাকিয়ে গেল। আচমকা জিজ্ঞাসার উত্তরে কী বলব? কোথা থেকে শুরু করব? আমার মনে এরকম অদ্ভুত প্রশ্নের উদয় হলো কেন, জানতে চাইলে কী বলব? যদি প্রশ্ন করেন, এ ভাবনা কেন? তাহলে তো তার জবাব দেওয়াই মুশকিল। আমি অসহায়ভাবে বড় বড় চোখ মেলে তাকালাম। তাঁর প্রশ্রয়ভরা দুচোখের ওপর আমার দৃষ্টি স্থির।

বাবার অধরে বিচিত্র হাসির বিদ্যুৎ খেলে গেল। বললেন, তুমি কিছু না বললেও আমি তোমার মনের কথাটা টের পাই। আমার মন তোমার জন্য ভাবতে বলে। আমার সমস্ত ভাবনার ভেতর তোমার মনের অশান্তি, দুঃখ, বেদনা বিন্দু বিন্দু আলো হয়ে স্পন্দিত হতে থাকে। তার মধ্যেই তোমার মনের যন্ত্রণা মূর্ত হয়ে ওঠে।

মুহূর্তে আমার ভেতরে কী যেন সব ঘটে গেল। সহানুভূতিরও যে কস্তুরীর মতো আশ্চর্য মনমাতানো গন্ধ আছে সেই প্রথম অনুভব করলাম। সেই গন্ধে আমার বুক ভরে গেল। ঘাসের বনে লালচে ফুল ফুটেছে। সেখানে প্রজাপতিদের মেলা বসেছে। ভ্রমর উড়ছে। ফড়িং উড়ছে সকালের মিষ্টি রোদ্দুর তির তির করে কাঁপছে তাদের ডানায়। রোদ ঠিক্‌রে যাচ্ছে। বনের খুশি আমার মনের খুশি হয়ে শরীর ছুঁয়ে গেল। তবু মুখে কোনো কথা যোগাল না।

বাবার সুন্দর পুরুষালি কণ্ঠস্বরে আমার ভেতরটা চমকে গেল। প্রশ্ন করলেন, কী হলো? কথা বলছ না কেন?

আমতা আমতা করে অভিমানের গলায় বললাম, কী বলব? বলে লাভ কী? এখন তো আর কিছু করার নেই। নিজেকে মিছিমিছি শুধু কষ্ট দেওয়া।

বাবা অবাক চোখে তাকালেন আমার দিকে। তাঁর ভুরুটা কেঁপে গেল। বললেন, তোমার গলায় তেমন তো খুশি দেখছি না। খুশিটা মনের ব্যাপার। খুশি তো আর মুখে, চোখে, বুকে হয় না। মনের শরীরে লুকিয়ে থাকে। মনের আলোয় আভাসিত না হলে সে আর সুন্দর হয়ে ওঠে না। সুন্দর বস্তুও কুৎসিত হয়, ভালো জিনিস নোংরা হয়ে যায়। মনটা তো শরীরের মধ্যে বাস করে। মানুষের এই শরীর নিয়ে যত জটিলতা। নিয়ম, নীতি, শাসন-দমন, বাঁধন সব শরীরের জন্য। কথাগুলো বলার সময় বাবার চোখের পাতা কেঁপে গেল। মুখের ভাব বদলে গেল। একটু থেমে পুনরায় বললেন, এখন তুমি বড় হয়েছ। ভালো-মন্দ, বৈধ-অবৈধ বোধ হয়েছে। তোমাকে সব খুলে বললেও বুঝবে। যতদিন বোঝনি কোনো সমস্যা হয়নি। বোধোদয় হয়েছে বলেই মনের বনে ঝড় উঠেছে। ঝড় একবার উঠলে তা আর থামতে চায় না। সব কিছু নাড়িয়ে মূল ধরে টান দেয়।

মাঝে মাঝে পিতার সব কথা আমি বুঝতে পারি না। বোবা দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকালাম। কিন্তু কথাগুলো বুকের মধ্যে মোচড় দিয়ে গেল। একটা লম্বা দীর্ঘশ্বাস পড়ল ধীরে ধীরে। বললাম, কিছু কিছু কথা কার মর্মে কোথায় কী ভাবে বেঁধে সে তো অন্য মানুষের জানা থাকার কথা নয়। কিন্তু যার লাগে সে গুমরে গুমরে কাঁদে। তার বোবা কান্নাটা কেউ চোখে দেখতে পায় না। কিন্তু বুকের মধ্যে তার রক্তক্ষরণ বন্ধ হয় না।

শকুন্তলা! আমি জানি, বোবা কান্না বুকে বয়ে যারা কাজ করে, কর্তব্য করে. হাসে, খেলে তাদের বড় কষ্ট। তুমিও ভেতরে ভেতরে কাঁদছ এটা বুঝতে যদি না পারলাম, তাহলে তোমার পিতা হলাম কিসে? দমবন্ধ বোবা কান্নার ভার থেকে তোমাকে মুক্ত করতে আজ তুমি যা জিগ্যেস করবে আমি তার উত্তর দেবো।

ভয়ে ভয়ে ডাকলাম, বাবা। এই তপোবনে আমার কোনো অভাব নেই। প্রকৃতির চোখ ভোলানো রূপ, রঙ, বর্ণ, মন মাতানো গন্ধ; আমার চোখ, মন ভরিয়ে রেখেছে। আশ্রমের সকলে আমাকে ভীষণ স্নেহ করে, ভালোবাসে। তবু মনটা আমার ভালো যাচ্ছে না। অর্ধরাত্রে শয্যা ছেড়ে আঙিনায়

এসে বসে থাকি। মনে মনে এই আশ্রমের সব বালক-বালিকার কথা ভাবি। ওরা প্রত্যেকে কেমন নিজের অবস্থায় সন্তুষ্ট। কিন্তু আমি নই কেন? ওদের চেয়ে আমি সব কিছুই বেশি পাই। তবু আমার মনের শূন্যতা যায় না কেন? আমি যা জানতে চাই কেন জানা গেল না? জেনেই বা কী করব? এই অতৃপ্তির তো কোনো দাম নেই। এটা বোধ হয় খুব স্বাভাবিক জিনিস নয়—এ যেন সুখে থাকতে অসুখে পড়া। তবু, এই শূন্যতার যন্ত্রণায় আমার মন ছেয়ে আছে। আমি কষ্ট পাচ্ছি। এ কষ্টে বোধহয় শূন্যতার জন্য নয়, নিজেকে জানতে না পারার বেদনা। আমার আমিকে শুধু খুঁজছি। আমার সত্তার যে অংশ নিজেকে অভিব্যাক্তি করতে পারেনি এ তো তারই বেদনা।

বাবার মুখে হাসি চোখে কৌতুক। বলল, সংশয় সন্দেহ অবিশ্বাস হলেই এরকম প্রতিক্রিয়া হয়। তোমার সংশয় দূর করার জন্য আমাকে কী করতে হবে বলো?

বাবা সেদিন যে মেয়েটি তুমি কুড়িয়ে আনলে তার মতো কি আমি তোমার কুড়িয়ে পাওয়া মেয়ে?

কী শুনলে খুশি হবে বলো?

যা সত্য—

আমার স্নেহে তোমার কি কোনো সংশয় আছে?

চমকানো বিস্ময়ে ডাকলাম—বাবা। শুধু তোমার কাছে সত্যি কথাটা শুনলে আমার জীবনটা অনেক বেশি শান্তি পেত, হয় তো সুখেরও হতো।

শুধু এটুকু শুনলে তোমার মনের ভার হাল্কা হবে? এটা কোনো জানা হলো? সমস্যার কোনো সমাধান হবে তাতে?

জানি না। ব্যাকুলতা তো যাবে।

বেশ, তা-হলে শোনো। একদিন সূর্যপ্রণাম সেরে স্নান করে নদী থেকে স্নান করে আশ্রমে ফিরছি। সূর্যটা ততক্ষণে দিগন্তজোড়া প্রাচীরের মতো পাহাড়শ্রেণীর মাথায় উঠে এসেছে লাল পাগড়ি পরা পাহারাদারের মতো।

সূর্যের দিকে মুখ করে আমি হাঁটছিলাম। গাছাগাছালির ফাঁক-ফোকর দিয়ে সূর্যের আলো মাটিতে পড়ে ছায়ার সঙ্গে মিশে আলপনা দিয়েছিল পথময়। যেতে যেতে মস্ত এক শিমূল গাছ পড়ল। সকালের সূর্যকে মুকুটের মতো মাথায় করে রাজকীয় গরিমায় দাঁড়িয়ে ছিল। ডালে ডালে পাখিরা কিচিরমিচির করে এ ডালে ও ডালে উড়ে উড়ে বসছিল। গাছের ডালের মাথায় তাদের ঝাপটা ঝাপ্টি আনন্দের ছিল না, কেমন একটা দিশেহারা ভয়ের। বিপন্নের মত পরিত্রাহি চিৎকার করছিল। কাকে ডাকছিল কে জানে? পাখিদের চিৎকার-চেঁচামেচিতে সকালের শিশিরভেজা রোদ ঝলমল জঙ্গল ঘন ঘন চমকে উঠল। উদ্বিগ্ন উৎকণ্ঠায় আমার ভেতরটা কেমন করে উঠল। একটা কিছু হয়েছে বুঝে সেই দিকে ছুটে গেলাম।

পায়ে পায়ে এগিয়ে যেতেই চমকে উঠলাম। নরম সবুজ ঘাসের ওপর বিছানা করে কে যেন ফুটফুটে একটি মেয়েকে শুইয়ে রেখে গেছে। আর সে দিব্যি নিশ্চিন্তে, পরম আনন্দে নীল আকাশের নিচে শুয়ে হাত-পা ছুঁড়ে খেলা করছে। আমি তো দেখে থ'। সূর্যের আলো পড়ে পাছে শিশুটি কষ্ট পায়, তার খেলা ভেঙে যায় তাই শিমুলগাছের ডালে ডালে পাখিরা দুপাশে ডানা মেলে দিয়ে সূর্যকে আড়াল করছে। বিস্ময়ে আমার দুচোখের তারা স্থির। আমার শিরায় শিরায়, হাত-পায়ের ধমনীতে রক্ত ছলাৎ ছলাৎ করে উঠল। এক অব্যক্ত খুশিতে আমার ভেতরটা মায়ায়, মমতায়, স্নেহে ভরে যাচ্ছিল। কী করব ভেবে স্থির করতে হলো না। দু'হাত বাড়িয়ে তাকে নিজের বুকে তুলে নিলাম। গায়ে তার মিষ্টি গন্ধ। উজ্জ্বল দুটি চোখ মেলে আমাকে দেখছিল। ছোট দুটি হাত বুলিয়ে দিল আমার চোখে-মুখে। মুহূর্তে বুকের মধ্যে কী সব জমে থাকা জিনিস হঠাৎ করে গলিয়ে দিলে। এক গভীর অনাস্বাদিত অপত্যস্নেহ ফোয়ারার মতো ফিনকি দিয়ে আমার বক্ষ প্লাবিত করে গেল। যেতে যেতে এক দারুণ মুগ্ধ চমকে বার বার তার ধবধবে ফর্সা কুসুমকোমল কচি মুখখানার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছি। আর মনে মনে বলছি, তুমি অমৃতের পুত্রী। ঈশ্বরের আশীর্বাদ। তোমাকে না পেলে আমার জীবন অপূর্ণ থেকে যেত। পিতৃত্ব কাকে বলে জানা হতো না। সেই

প্রথম অনুভব করলাম আমিও পিতা। পিতা হওয়ার জন্য সন্তানের জন্মদাতা হতে হবে এমন কথা নেই। স্নেহ-মমতা-ভালবাসা দিয়ে যে তাকে আগলায় রক্ষা করে, আশ্রয় দেয়, পালন করে, জীবনের সুস্থ ও স্বাভাবিক প্রকাশকে সুন্দর হতে সাহায্য করে সেই পিতা।

যে ভয়টা প্রথম প্রশ্ন করার সময় আমার মুখে মাখামাখি হয়েছিল তার চেয়ে অনেক বড় একটা ভয়ে আমার ভেতর কুঁকড়ে গেল। ভয়ে ভয়ে ডাকলাম, বাবা।

আচার্য কণ্বমুনির মুখে বিচিত্র হাসি। নিজের মনে বললেন, শরীরের মধ্যে, মনের মধ্যে যে এত সব গভীর আনন্দ লুকনো থাকে আগে জানা ছিল না। আনন্দে আমি পাগল হয়ে গেলাম। নিজেকে এমন করে হারিয়ে ফেলনি আগে। এই অনুভূতি শুধু মানুষের আছে। তাই তো বিধাতার হাতে গড়া শ্রেষ্ঠ জীব সে।

কেমন একটা গলে পড়া গলায় ডাকলাম, বাবা! আচার্য কণ্বের বুকে মাথা রাখলাম। জীবনের একমাত্র আশ্রয়কে মানুষ যেমন প্রাণপণে শক্ত হাতে আঁকড়ে ধরে, আমিও তেমনি তাঁকে চেপে ধরলাম। পিতাও আমার পিঠে হাত রাখলেন। বললেন, কোন্ দেবদুর্লভ সন্ধিক্ষণে তোকে ভাগ্য করে পেয়েছি মা। তুই আমার নয়নের মণি, আমার স্বপ্ন। আমার কাজের অবকাশের ফাঁকটুকু ভরে থাকে তোর ভাবনায়। তুই আমার। আমিই তোর পিতা। কেবল তোর জন্মের ব্যাপারে আমার কোন ভূমিকা নেই। সেটা তোর অজ্ঞাতকুলশীল পিতা-মাতার হাতে ছিল রে। শুধু ঐটুকুই।

পরম স্নেহে আমার গায়ে হাত বোলাতে বোলাতে বললেন, আজ আমার বুকের ওপর মাথা রেখে পরম নিশ্চিন্তে ভাবছিস তোর সংসার বিবাগী বাবা পৃথিবীর সব ঝড়-ঝঞ্ঝা থেকে তোকে বাঁচিয়েছে। সেই বিশ্বাস নিয়ে জীবনের বাকি পথটা তোকেও এগোতে হবে একা। তোর বিচার, বুদ্ধি, বিবেক, স্বাতন্ত্র্য নিয়ে তৈরি করতে হবে নিজেকে তিল তিল করে। শুধুমাত্র নিজের ভেতরের শিক্ষার জোরেই অন্যদের পিছনে ফেলে এগিয়ে যাওয়া যায়। একা একা। দৌড়ে যে প্রথম হয় সে একাই সকলের আগে থাকে। তার সামনে বা পাশে কেউই নয়। জীবন-দৌড়েও সে এক নিয়ম। পৃথিবীতে মানুষের জীবনও তাই বলে। সামান্য এইটুকুতে বিচলিত হলে চলবে? অনেক রাতজাগা আর অনেক হাঁটার জন্য তৈরি করতে হবে নিজেকে। এই আশীর্বাদই তোকে করছি।

আমি আমার জীবনের পূর্ণ চিত্র এখানে আঁকতে বসিনি। এটা আমার কোনো জীবনপঞ্জী নয়। আমার জীবনের একটা অংশমাত্র। তবে একে বাদ দিয়ে তো আমি নই। আমার নিজের অতীতকে জানার যে কৌতূহল ছিল, শোনার পর তা মামুলি হয়ে গেল। সুন্দর অনুযোগহীন অবস্থাতে, সুখ-দুঃখ, মান-অপমান কোনো বোধেরই কাতরতা থাকে না। শূন্য মনে থাকে না কোনো ভাবনা। সাত-পাঁচ ভেবে লাভই বা কি?

প্রেমহীন দেহসম্ভোগের আনন্দ নিয়ে পৃথিবীতে এরকম কত শিশু প্রতিদিন জন্মাচ্ছে। কে তা মনে রাখে? এ নিয়ে ভাবে না কেউ। কেবল কণ্বমুনির মতো দু'একজন মহাপ্রাণ পৃথিবীতে এখনও আছে বলেই পৃথিবীটা সুন্দর আছে, বেঁচে আছে। নইলে অপ্রেমে, পাপে, অবিশ্বাসে, নিষ্ঠুরতায় মরুভূমি হয়ে যেত। অথচ, এই পৃথিবীতে সবার বেঁচে থাকার অধিকার। একটা ক্ষুদ্র কীটেরও নিজের মতো স্বাধীনভাবে বাঁচার অধিকার আছে। কেবল সভ্য মানুষের দুনিয়াটা একটু আলাদা। এখানে মানুষের, সমাজের, সংসারের পছন্দ-অপছন্দ, ভালো-লাগা মন্দ লাগ, পাপ-অপরাধেরবোধ নিয়ে একটা নিষ্পাপ অসহায় মানবশিশুর বাঁচার দাবি ও অধিকার বিচার করা হয়। মানুষের সংকীর্ণ স্বার্থপরতা, বিশ্বাসঘাতকতা, অমানবিক নিষ্ঠুরতা কিন্তু অরণ্যের দুনিয়ায় নেই। অরণ্যে সকলে মিলেমিশে, প্রতি মুহূর্তে নিজেদের সঙ্গে লড়াই করে বেঁচে থাকে। সে বাঁচার ভেতর জীবন সংগ্রামের গৌরব আছে। কোনো সংকীর্ণ স্বার্থপরতা বিশ্বাসঘাতকতা কিংবা পাপবোধ নেই তার ভেতর। সে জীবন মুক্ত ও স্বাধীন। সংগ্রামের এবং দুঃসাহসের। অবাঞ্ছিত মানবশিশুদের নিজের পায়ে শক্ত করে দাঁড়ানোর মতো শক্তি ও সাহস অর্জনের জন্যই বোধহয় পিতা কণ্ব লোকালয়ের বাইরে মুক্ত অরণ্যের স্নিগ্ধ ছায়ায় গড়লেন এক নতুন শপথের আশ্রম। স্নেহ, সম্প্রীতি, সৌহার্দ্যের এক স্বর্গ। এখানে গাছেদের পরিবার পরিজনদের মতো আমরা পাশাপাশি বাস করি। গাছের মতো করেই নিজের জায়গায় শক্ত পায়ে স্থিতু হয়ে দাঁড়িয়ে আছি। নিজে নিজের মতো না থাকতে পারলে থাকার কোনো মানেই

নেই। সে থাকা না থাকা সমান। আশ্রমের অন্যদের মতো অনন্তকাল ধরে একভাবে এক জায়গায় স্থির হয়ে থাকতে ভালো লাগে না। আমি তো আর গাছ নই। রক্তমাংসের মানুষ। আমি নড়ে চড়ে, সরে সরে সবুজ সতেজ দূর্বাঘাসের মতো চারদিকে ছড়িয়ে যেতে চাই। এক জীবন থেকে অন্য জীবনে। অন্য জীবন থেকে অনন্ত জীবেন। নদীর স্রোত যেমন থেমে নেই, সময় যেমন স্তব্ধ হয়ে নেই, তেমনি আমার শরীর, মন চুপ করে নেই। হলেও সেখানেও বড় পরিবর্তন ঘটেছে প্রতি মুহূর্তে। ভীরু বৃষ্টির মতো ফিস্ ফিস্ করে আমার নারীসত্তার সার্সিতে সেই কথা চুমু খেতে থাকে অবিরত। সেই সত্তাই ফুলের মতো ফুটে উঠতে থাকে সবুজ পাতা ভরা ডালের মুখে।

আমি জানি প্রলাপের মতো এসব কথা বলার কোনে মানে নেই। কিন্তু আমার মনের প্রতিক্রিয়া কোন্ পথে কীভাবে গড়াচ্ছে বোঝাতে কথাগুলো বলা দরকার হলো। কারণ, বাবা বলতেন, কাঁটা ছাড়া গোলাপ নেই। তবে কাঁটা যেখানে আছে ফুলও সেখানে আছে। তেমনি পাপ পুণ্য, ন্যায় অন্যায় পাশাপাশি বাস করে। আমরা অন্যায় করি, পাপ করি মানুষের মত, কিন্তু তাকে শাস্তি দিই পশুর মত। নির্দয় হওয়ার আগে একবার বিচার করি না, কেন মানুষটা দোষ করল। মানুষের মধ্যে ঘুমনো পশুটা নখ-দন্ত বিস্তার করে তখন ছুটে যায় তাকে আঁচড়ে কামড়ে ছিন্নভিন্ন করতে। বিচার মানে শুধু শাস্তি দেওয়া নয়। যে বিচার মানুষের আত্মাকে, মনকে সুন্দর করে না শুধু শরীরকে ক্লেশ দেয়, মনকে পীড়ন করে তাকে মানুষের বিচার বলে না। সংবেদনশীল মন ছাড়া কোনো বিচার নির্ভুল হয় না। কোন্ প্রসঙ্গে বাবা কথাগুলো বলেছিল, কেন বলেছিল তা আজ মনে নেই। বহুকাল পরে আচমকা কথাগুলো এমনভাবে মনে এলো কেন? ভাবতে বিস্ময় লাগল। একটা নূতন কিছু যেন আমার মধ্যে জন্মেছে এই অনুভূতি নিয়ে আমি কুটিরের বাইরে গেলাম। খোলা আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে বড় করে একটা লম্বা শ্বাস নিলাম। সুগন্ধ বাতাস আমার ফুসফুসে, স্নায়ুতে ছড়িয়ে গেল। মনে হলে মুক্তির তৃপ্তি, সুখ আমার বুকের মধ্যে পরিব্যাপ্ত হয়ে গেছে। এখানে এতবড় আকাশ, এত হাওয়া এত আলো, বনে বনান্তরে উপত্যকায় এতো মুক্তির শ্বাস যে সব বিষাদ ছাপিয়ে মনটা অনেক অনেক বড় হয়ে ওঠে।

বিকেলের পড়ন্ত রোদের আলো ডানায় মেখে নিয়ে পাখিরা যে যার ঘরে ফিরছে ঝাঁকে ঝাঁকে। পিছনের সঙ্গীকে হাঁক পেড়ে ডাকে। ঐ ডাকে চমকে যায় বিকেলের স্তব্ধতা। পাখিদের ডাক আমার বুকের মধ্যে নরম সব কিছুকে তুলোর মতো পিঁজে দিয়ে উড়িয়ে দেয় আকাশময়। মনটা খারাপ লাগে ভীষণ। অপরাহ্নের দীর্ঘ ছায়া পড়েছে জীবনের আঙিনায়। এখন তো আর প্রেম নেই। আমি ও দুষ্মন্ত যে যার জীবনের ভারে চাপা পড়ে শেষ হয়ে যাওয়ার সময়ে উপস্থিত হয়েছি। এই বয়সে আমরা কেউ আর নিজের জন্য বাঁচি না। সন্তানের জন্য বাঁচি। তার জন্য যত উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা। তার অজানা ভবিষ্যতের জন্যে যত চিন্তা, দুর্ভাবনা। তার কথা ভেবেই জীবনে অনেক কিছু আপস করতে হয়। মানিয়ে নিতে হয়। ক'দিন ধরে এই অনুভূতিতে মনটা তোলপাড় করছে। সন্তান, স্নেহ, মমতা নিয়ে বাকি জীবনটা কেটে যাবে। কী হবে স্বামী সংসারেব ভেতর ফিরে গিয়ে নতুন করে পুতুলের রাজ্যে রানী হয়ে থাকা? এখন তো নতুন করে নতুনভাবে বাঁচার সময় নেই আমার।

আমার দিনে তো পশ্চিমের লাল রঙ লেগেছে। এখন আর পুবে ফিরে যাই কী করে? কিন্তু তাই কি? স্মৃতির মুকুরে যে সময় ধরা থাকে তার কোনো উদয়-অস্ত নেই। রাত্রি দিন কিছুই নেই। সেখানে সময় থেমে আছে। আমি আমাকে দেখতে পাচ্ছি। কী আশ্চর্য প্রিয়ংবদা, অনুসূয়া, পত্রলেখা, বনতোষিণী, হরিণশিশু, মহারাজ দুষ্মন্ত আমার সামনে দাঁড়িয়ে। আমি কথা বলছি। তাদের কথা পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছি। আমি আর বর্তমানের মধ্যে নেই। সুদূর অতীতের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট। আমার সামনে নেই, পিছন নেই। আর আমি একটার পর একটা ঘটনা দেখতে পাচ্ছি এবং তার মধ্যে প্রবেশ করছি। মনে মনে দ্রুত নানা কথা বলছি নিজের সঙ্গে এবং তাদের সঙ্গে। হঠাৎ দেখি দুষ্মন্ত আমার দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে আছে।

'ক্ষমা করো' বলে আমার দু'হাত ধরে করপদ্ম চুম্বন করলে। আমার সারা শরীরে মধ্যে বিদ্যুৎ শিহরণ খেলে গেল। আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে আছি। ও আমার হাত ছাড়ছে না। ওর হাতের ভেতর আমার করপদ্ম নিপীড়িত হচ্ছে। আমার হাত দুষ্মন্তের অধর ছুঁয়ে আছে। তাকে বাধা দিতে আমার

শরীরের মধ্যে ঘুঙুর বাজছে। আমার দুধারে যেন প্রজাপতি ডানা মেলে দিয়েছে। অনন্ত সময় বয়ে যাচ্ছে। আমি হাত ছাড়ানোর চেষ্টা করছি। কিন্তু পারছি না। মনে হচ্ছিল এমন করে আমার হাতটা অনন্তকাল ধরে ওর হাতের ওপর ধরা থাকুক। এক অদৃশ্য বন্ধনে আমার হাতটা যেন ওর হাতে বাঁধা আছে। এ বাঁধন কে খুলতে পারে? খুলে গেলে বোধহয় আমি বাঁচব না। এরকম একটা অনুভূতিতে আমার সমস্ত শরীর-মন আবিষ্ট হয়ে গেল হঠাৎ।

স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্ক সম্বন্ধে আমার ধারণাটা খুব স্বচ্ছ ছিল না। কুয়াশার ভেতর থেকে একটু একটু করে স্পষ্ট হয়ে উঠল আমার বোধ। ফুলের ওপর আলো পড়ে পাপড়িগুলি যখন খুলতে থাকে তখন ফুল জানতে পারে না ফল ফলাবার নির্দেশ আসছে অলক্ষ্য থেকে। তেমনি দুষ্মন্তের শরীরে উত্তপ্ত স্পর্শে আমার সমস্ত সত্তা স্পন্দিত হতে লাগল। আকাশজোড়া বিদ্যুতের মতো আমার ভেতরটা চমকিত হতে লাগল। আমি চোখ বুজে আছি। কতক্ষণ আছি জানি না।

বুকের ভেতর আমার স্মৃতির দ্বীপ জ্বলে উঠল। আমি কাশ্যপ মুনির আশ্রমে, অথচ আমি এখানে নেই। আমাকে আমি দেখতে পাচ্ছি মালিনী নদীর তীরে কণ্বমুনির আশ্রমে। আজ আমার মুখে প্রৌঢ়ত্বের ছাপ। চুলে পাক ধরেছে। তনুতে কমনীয়তার টান ধরেছে। কিন্তু আমার স্থির দৃষ্টিতে আশ্রমকন্যা শকুন্তলাকে দেখছি। কৃষ্ণচূড়ার মত স্নিগ্ধ যৌবনশ্রী জ্বলজ্বল করছে তার সারা অঙ্গে। শিলাগাত্র থেকে ঝরে পড়া ঝরনার মতো কেশরাশি অসংখ্য ধারায় গড়িয়ে পড়েছে তার পিঠময়। নীলোৎপলের মত দুটি চোখে বিভোর তন্ময়তা। মরালের মত গ্রীবা, নধর বিম্বফলের মত বুক, সমুদ্রস্রোতের মত শ্রোণী। টুকটুকে ডালিম রঙ ফুটে উঠেছে গালে আর সারা অবয়ব থেকে ঝরে পড়ছে বকুলের সুবাস। সেই সুবাসে আকুল হল যৌবন। মুখে সব সময় ঝিকমিক করছে হাসি। যেন কোন্ অন্ধকারের ভেতর থেকে আমার ষোল বছরের শরীরটা ফুটে উঠেছে। স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছি সেদিকে। কিন্তু আমি তো সেদিনের শকুন্তলা নই। আমার বুকে দুষ্মন্তের সে ব্যাকুলতা কোথায়?

মনটা সহসা প্রশ্ন করল, এ মেয়ে বলে কী? ব্যাকুলতা আছে বলে তো এতো করে ভাবা। সব সুখ দুঃখ মন্থন করে নতুন করে খোঁজা। ভাবতে গিয়ে আমার চোখে জল আসছে, বুকের ভেতর কাঁপছে। বুঝতে পারিছি না কেন এত বদলে গেলাম আমি? আমার শান্ত স্রোতহীন জীবনের মাঝখানে দুষ্মন্তের আকস্মিক উপস্থিতি একটা লোষ্ট্রপাত করে এ কোন্ তরঙ্গ বলয় সৃষ্টি করল?

মুখ তুলে দেখি পত্রলেখা আমার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। মুখে তার টেপা হাসি। বিগলিত গলায় বলল, সখী, তোমার কি কোনো কষ্ট হচ্ছে? চোখে জল টলমল করছে কেন? হঠাৎ তোমার এ ভাবান্তর কেন?

পত্রলেখার কাছে আমি ধরা পড়ে গেছি। পাছে ও আমার মনোভাব টের পায়, তাই মুখে একফালি হাসি বাঁচিয়ে রেখে ওর কথার কোনো জবাব দিলাম না। দেবো কোথা থেকে? আমার মনের ভেতর তখন অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ জুড়ে চলেছে এক জোতিবিকীর্ণ মহোৎসব। নিজেকে শান্ত রাখতে মনে মনে ডাকছি, হে ঈশ্বর। আমাকে তুমি শক্তি দাও। আমার ধ্রুবতারার জ্যোতি নিভিয়ে দিও না। আমাকে শপথভ্রষ্ট করো না। আমার প্রাপ্য মর্যাদা যে দেয়নি, যে আমাকে অপমান করেছে,তার কোনো ডাকে সাড়া দেবো না, স্বামী-স্ত্রীর সংস্কারের দুর্বলতা দমন করে নিজেকে সংযত রাখার কঠিন পণ সর্বক্ষণ স্মরণে রাখতে তো পুত্রের নাম দিয়েছি সর্বদমন।

তবু মন বর্তমানে স্থির থাকছে না। ষোলো বছর আগের কথা মনে ভিড় করছে। ষোলো বছরের শকুন্তলার জীবনের দিনগুলো আমার চোখের তারায় জ্বলজ্বল করছে। এ আমার কোনো কল্পনা কিংবা স্মৃতি নয়। বাস্তব অনুভূতি। ক্ষণে ক্ষণে আমি এর মধ্যে প্রবেশ করছি।

মালিনীর নদীর খুব কাছেই আমাদের তপোবন। গাছগাছালির সবুজ পাতা তপোবনের মাথার ওপর চাঁদোয়ার মতো ঝুলে আছে। শান্ত, স্নিগ্ধ, শীতল ঘন ছায়ায় গাছের গন্ধ, বনফুলের গন্ধ,

ধুলোর গন্ধ, বিভিন্ন ঋতুতে ফোটা ফুল এবং মঞ্জরীর মিষ্টি সুবাস মিলেমিশে কী দারুণ মুগ্ধতা বয়ে আনে। কী দারুণ সঞ্জীবিত করে মনকে। এক গভীর তীব্র ভালোলাগার সঙ্গে মিশে থাকে মালিনীর অবিরাম ঢেউ ভাঙার শব্দ। নীল নদীটির নিবিড় পাড়ে স্তব্ধ অরণ্য চেয়ে থাকে ঘুম পাওয়া অলস চোখে। সকালের রোদ, বিকেলের রোদ চমকে দিয়ে হরিণশিশুর মতো লাফিয়ে যায় ত্রস্ত পায়ে। বিকেলের পড়ন্ত আলো মুগ্ধ করা মন্ত্র নিয়ে হাতছানি দিয়ে ডাকে বিবাগী পাখিদের। স্বপ্নে দেখি নীড়ের পাখি আসছে নীড়ে। অনেক পাহাড় মাঠ পেরিয়ে ভালোবাসা ঠোঁটে করে নীড়ের পাখি নীড়ে ফিরে সমবেত উল্লাসে চিৎকার করে জানিয়ে দেয় তাদের আগমন বার্তা। তখন কী ভালো লাগে। এই পরিবেশের মধ্যে বাস করতে পারার জন্যে এক গভীর বোধ তৈরি হয়। সে বোধ সম্পূর্ণ আমার একার। অন্যকে তা বুঝিয়ে বলার নয়।

মনের চোখ দিয়ে আমি সব দেখতে পাচ্ছি। বসন্তের বেলা পড়ে আসছে। ছায়া দীর্ঘতর হচ্ছে। পাখিরা নীড়ে ফিরছে। ঝোপে ঝোপে পাখিরা সব নড়েচড়ে বসে দীর্ঘরাতের জন্য তৈরি হচ্ছে। মালিনী নদীতে স্নান করে সিক্ত বসনে আমরা তিন সখিতে আশ্রমে ফিরছি নির্ভয়ে নানারকম কথা বলতে বলতে।

হঠাৎ দেখি হরিণের দল এদিক-সেদিক দিয়ে প্রাণভয়ে দৌড়চ্ছে। আর পেছন পেছন একটা রথ তাদের তাড়া করে চলেছে। রথে রাজকীয় পোশাক পরিহিত এক তরুণ রাজপুত্র পলায়নপর হরিণদলকে লক্ষ্য করে তীর ছুড়তে উদ্যত। তপোবনের ঋষি বালকেরা উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করে বলছে, রাজন, বনের মৃগকে বাণ মেরে হত্যা করবেন না। এই অভয়ারণ্যের পরিবেশের পবিত্রতা নষ্ট করবেন না। তাদের আর্ত আকুতি রাজাকে আশ্চর্য করল। যেদিক থেকে কণ্ঠস্বর আসছিল সেদিকেই রাজা রথ চালালেন। তাঁর ছুটন্ত রথ আমাদের পথ আগলে দাঁড়াল। বসন্তের শেষে বিকেলের হলুদ আলোর সঙ্গে মাখামাখি হয়ে ধুলো উড়ল রথের চাকায় চাকায়। মিহি ধুলোয় ভরে গেল আমার মাথা-গা। ধূসর ধুলো হাওয়ায় সওয়ার হয়ে উড়ে গেল বনের দিকে। উড়ে উড়ে ছড়িয়ে যাচ্ছিল বনময়। গাছের পাতায় ঘাসের ডগায় রেণুর মতো লেগে রইল। অনসূয়া, প্রিয়ংবদা বিরক্ত হয়ে থমকানো বিস্ময়ে চেয়ে রইল রাজপুরুষের দিকে। ধুলোর ভেতর রাজপুরুষকে তখন ভালো করে দেখা যাচ্ছিল না। কষ্ট করে তাকাতে গিয়ে ধুলোর কণা পড়ে হঠাৎ আমার চোখ জ্বলতে লাগল। পাছে রাজপুরুষ আমার যন্ত্রণাকাতর বিকৃত মুখ দেখতে পায়, তাই মুখে হাত চাপা দিয়ে ধুলোর দিকে পিছন করে দাঁড়ালাম। এক চোখ চেপে ধুলোর ভেতর দিয়ে আশ্রমের দিকে দৌড়ে গেলাম। মিহি ধুলো কুয়াশার মতো আশ্রমকেও ঢেকে দিয়েছিল।

আশ্রমে ফিরে বেশ করে চোখে জলের ঝাপটা দিলাম। গৌতমী পিসি তাড়াতাড়ি দৌড়ে এল। আঁচলের খুঁট দিয়ে ধুলোর কণাটা তুলে ফেলতে স্বস্তি হল। চোখের জ্বালা জুড়োল। কিন্তু মনটা উৎসুক হয়ে পড়ে রইল পথের দিকে। অনসূয়া প্রিয়ংবদার জন্যে উন্মুখ হল মন।

ভিজে কাপড় ছেড়ে প্রসাধন করলাম। ফুলের মালা জড়ালাম চূড়া বাঁধা খোঁপায়। হাতে গলায় ফুলের সাজ পরলাম। দর্পণের সামনে বিভোর হয়ে নিজেকে দেখলাম। কেন যে দেখছি কিছু জানি না। তবু আমার চোখ দুটো শরীরের মধ্যে লুকনো কী সব খুঁজছিল।

প্রিয়ংবদার ডাকে আমার শরীর-মন চমকে ওঠল। ভালো-মন্দের উৎকণ্ঠায় আমার ভেতরটা কেঁপে গেল। বললাম, ভর সন্ধেবেলায় এমন করে ডাকে কে?

প্রিয়ংবদা খিল খিল করে হাসল। কৌতুকের হাসি। বলল, সন্ধে কোথায়? অন্ধকার তোর ঘরে, বাইরে। এখনো আলো মরে যায়নি। অন্ধকার থেকে আলোয় এসে দেখ, কাকে এনেছি?

আকাশজোড়া বিদ্যুৎলেখার মতো চমকিত হলো আমার ভেতরটা। প্রিয়ংবদা কিছু না বললেও রাজপুরুষের কথাটা সর্বাগ্রে মনে হল। কেন, তার কথা মনে হল জানি না। পুরুষ বলেই হয়তো মনের অতলে তার প্রতি একটা অজ্ঞাত আকর্ষণ ছিল। প্রিয়ংবদার চমকানো ডাকে আমি কেমন আড়ষ্ট ও সংকুচিত হয়ে পড়লাম। তারপর একটা কৌতূহল হল। কৌতূহল থেকে অদ্ভুত এক আকুলতা আর আগ্রহ আমাকে ঘর থেকে বাইরে টেনে আনল।

আমার অনুমান মিথ্যে হয়নি। রাজপুরুষকে দেখে তাই অবাক হইনি। কিন্তু তার মুখ চোখ ধুলোর ভেতর ভালো করে দেখতে পাইনি। শুধু পোশাক ছাড়া আর কিছু চোখে পড়েনি। এই প্রথম তার উৎসুক দুই চোখের দিকে অবাক মুগ্ধতা নিয়ে তাকিয়ে রইলাম। চোখের দৃষ্টি এমন করে তিনি মেলে ধরেছেন যেন একটুও উপচে পড়ে না যায় আমার চোখের বাইরে। মুগ্ধ আঁখি মেলে আমি দেখছি, বর্ণাঢ্য পোশাক আর ঝকঝকে অলঙ্কারে শোভিত রাজবেশ, মাথায় মুকুট, কোমরে তলোয়ার। হাতে ধনু, পিঠে তূণ। দিগ্বিজয় করে যেন বীর ফিরছে ঘরে। এসেছেন নারীর কাছে প্রেম পেতে। আমার গায়ে কাঁটা দিল। এরকম অদ্ভুত কথা মনে হওয়ার উৎস কোথায় আমার জানা নেই। বয়স হলেই বোধহয় মনটা জানতে পারে জীবনে জীবন যোগ করার নির্দেশ এসেছে তার। সূর্যের আলোয় যেমন উত্তপ্ত হয় দিন তেমনি উজ্জ্বল উত্তপ্ত প্রেম আমার শরীর-মনে প্রবিষ্ট হয়ে আমার সমস্ত সত্তাকে উন্মুখ করে তুলল। প্রেম কাকে বলে জানি না। তার কোনো অনুভূতিও আমার নেই। তবু বুকের গভীরে, খুব গভীরে জন্মান্তরের মতো সেই আশ্চর্য সুরটা বাজতে লাগল। আর সেই হল প্রথম আমার বুকে প্রেমের কল্লোল। তার প্রথম আলোর চরণধ্বনি। আড়চোখে আমি ওকে দেখছি। ও স্থির অপলক দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে রইল। ওর চোখের চাহনিতে কেমন একটা ঘোর লাগা আচ্ছন্ন ভাব। ওর ভেতরে কী হচ্ছে কে জানে? হাত তুলে আমি নমস্কার করতে গেলাম, কিন্তু হাত উঠল না। ওকে বসতে পর্যন্ত বলতে পারলাম না। কেন, কে জানে? আমার অনুভূতির মধ্যে ধীরে ধীরে অদৃশ্য কালিতে অব্যক্ত ভাষায়, অশ্রুত স্পন্দনেও কী যেন লেখা হয়ে গেল।

আমাকে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে মহারাজই বললেন, আমাকে বসতে বলবে না শকুন্তলা? অতিথি আপ্যায়নের ভার তোমার ওপর, অথচ তার প্রতি কোনো নজর নেই। আমায় তুমি আশ্রম থেকে ফিরিয়ে দেবে?

দুষ্মন্তের কথায় আমার ভেতরটা কেঁপে গেল। বিব্রত লজ্জায় ঝড়ের মুখে বিপন্ন পাতার মতো অসহায়ের মতো কাঁপছি লজ্জায়, জড়তায়, কুণ্ঠায়। হঠাৎ চেতনা ফিরে এল আমার। কাঁপা গলায় বললাম, আত্মবিস্মরণের জন্যে আমি লজ্জিত। আমাকে মার্জনা করবেন রাজন্। আমার অপরাধের কোনো কৈফিয়ত হয় না। তবু সব মানুষের নিজের কথা তো থাকে। কেন জানি না, আপনাকে দেখে লজ্জায় আমি পাথর হয়ে গেছিলাম। আশ্রমের বাইরে কোনো পুরুষের সামনে দাঁড়াইনি কখনো। আচমকা লজ্জা, সংকোচ, কুণ্ঠা, জড়তার ঝাপ্টায় আমি বোধহয় মূর্ছা গিয়েছিলাম। মানুষের ভেতর এতো বড় যে একটা ঝড় লুকনো থাকে, জানব কেমন করে? আপনাকে না পেলে মনের এ রহস্য অজানা থেকে যেত। আপনার ভেতর দিয়ে আমার আত্মাকে দেখার সৌভাগ্য হল।

দুষ্মন্তের মুখে যেন এক অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটল। কেমন একটা মায়াবী চোখে আমার দিকে চেয়ে রইল। বলল, শকুন্তলা, আমি কিছুই মনে করিনি। তোমার বাইরেটা তো আমি দেখিনি। তোমার আত্মাকে দেখেছি। একজন মেয়ে অজানা, অচেনা একজন পুরুষের সামনে কথা হারিয়ে ফেলতেই পারে। একজন পুরুষ তেমনি একজন মেয়ের সামনে বোবা হয়ে যেতে পারে। মানুষের মন তো। মনের ভেতর যে কত অনাবিষ্কৃত জগৎ আছে তা মানুষ নিজেও জানে না। যেমন, এক আকাশে কখনো মেঘ হয়, বিদ্যুৎ চমকায়, রোদ হয়, তা বলে কি আকাশ শুধু মেঘ, বিদ্যুৎ আর রোদের? সে কি নীল নয়? তার গায়ে হাল্কা সুন্দর তুলোয় পেঁজা সাদা মেঘ কি ভেসে বেড়ায় না? তার কালো আকাশে কত তারা, কত জোৎস্না, পূর্ণিমার চাঁদ। এসব নিয়েই যেমন ভোরের আকাশ, দুপুরের আকাশ, বিকেলের আকাশ, ভিন্ন তার রূপ রঙ, আকৃতি তেমনি মানুষের মনেরও বিভিন্ন রকম অবস্থা হয়। মানুষ তো শুধু ক্ষুধা আর ইন্দ্রিয়বৃত্তি নিয়ে থাকে না। থাকলে সে আর মানুষ থাকত না। সংসারটাও জঙ্গল হয়ে উঠত। প্রেম, ভালোবাসা, মমতা, আবেগ, সহমর্মিতা, সুখবোধ, প্রশান্তি, কষ্ট, যন্ত্রণা অনুতাপ এসব নিয়ে তো একটা মানুষের পরিপূর্ণতা।

কথাগুলো শুনতে ভীষণ ভালো লাগছিল। কী আশ্চর্য সুখ ও তৃপ্তিতে আমার মন আচ্ছন্ন হয়ে গেল। সারা শরীর যেন গান গেয়ে উঠল। এতো সুন্দর কথা কেমন করে বলে রাজা? কথা যে মানুষের হৃদয়ে এমন করে সুধাসিন্ধু বইয়ে দিতে পারে, জানা ছিল না। আমি অভিভূত হয়ে

পড়ছি! ধীরে ধীরে আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছি, আমি জানি না, এ অনুভূতির উৎস কোথায়? শরীরে, না মনে? আমার মাথার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে কথাগুলো। আমি স্থির থাকতে পারছি না। মনে হচ্ছে, শঙ্খের মতো ওর সাদা চরণের ওপর হাত রেখে বলি, প্রিয় আমার, সুন্দর আমার,—শকুন্তলা তোমার পায়ে হাত রাখল। থেঁতলে দিয়ে তুমি চলে যেও না। সখা আমার, প্রিয় আমার, আমি তোমার। কথাগুলো মুখে বলতে পারছি না, কিন্তু মনে মনে তো বলছি—ত্বমসি মম জীবনং, ত্বমসি মম ভূষণং, ত্বমসি মম ভবজলধিরত্নং।

আমি দেখছি প্রিয়ংবদার মুখে সন্দেহ। চোখে ভ্রূকুটি। মাঝে মাঝে ঈষৎ মাথা নেড়ে আমাকে সাবধান করছে। পাছে দুষ্মন্ত দেখে ফেলে তাই মুখ টিপে হাসছিল। আমাদের দু'জনকে নিয়ে মজা করার জন্য ভুরু নাচিয়ে, দু চোখে বিদ্যুৎ হেনে, হাত ঘুরিয়ে নাচের ভঙ্গি করে সুরেলা গলায় বলল, তুমি মধু, তুমি মধুর নিঝর, মধুর সায়র আমার পরাণ বঁধু। সখী যাকে দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়, যাকে দেখলে বাতাস মধুর হয়, সে এতো কাছে থেকেও আমার হচ্ছে না কেন? সখা যাকে পেলে আপনার জীবন ধন্য হয়, মন আনন্দে ভরে যায়, আত্মা শান্ত হয়—সে কেন নিঠুরের মতো দূরে সবে আছে?

প্রিয়ংবদার কথায় আমি রাগ করলাম না। বরং মনে হল আমি যা বলতে চাইছি অথচ বলতে পারছি না, সেই কথাটাই ও নিজের মুখে বলল! কী ভাল লাগল যে, চোখ বুজে এল। লজ্জায় আমি লাল হয়ে গেলাম।

দুষ্মন্ত বলল, সখি প্রিংয়বদা সার্থক তোমার নাম। এমন মানুষের মন কেড়ে নেওয়া কথা তোমার মতো কেউ বলতে পারে না। তোমার সখীকে আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। অথচ ওকে দেখা থেকে হৃদয়ে আমার বশে নেই। সেকথা বোঝার ক্ষমতা হয় তো থাকে না সকলের। অবশ্য বাইরে থেকে একজনের মনের কথা বোঝা যায়ও না।

প্রিয়ংবদা মুখ টিপে হাসছিল। চোখের চাহনিতে বিদ্যুৎ খেলে গেল। দুষ্মন্তের কথা শুনে আমার সারা শরীর গান গেয়ে উঠল। লজ্জায় রাঙা হয়ে গেলাম। তবু বলতে কী পেরেছি—রাজা আমার হৃদয় বশে নেই। মৌনী পাথরের বুকে লুকনো প্রেমের কল্লোল নিয়ে দৌড়ে গিয়ে আছড়ে পড়তে ইচ্ছে করছে তোমার হৃদয়তটে। কিন্তু এই না পারার বেদনা যে কী কষ্টকর, তা তো বলে বোঝানো যাবে না। জীবনে এরকম নীরবতার বোধহয় খুবই প্রয়োজন। তোমার মতো আমারও বুকে বড় কষ্ট গো। নিজের সঙ্গে এত কথা বললাম, তবু মুখ ফুটে একটা কথা বেরলো না। অপলক মুগ্ধ দুটি চোখ পেতে রাখলাম তাঁর চোখের ওপর। আমার ব্যথাহত দুই চোখের দৃষ্টি প্রেমের নির্ঝরিণী হয়ে ঝরে পড়তে লাগল দুষ্মন্তের চোখের ওপর। হঠাৎ একটা লম্বা দীর্ঘশ্বাসে বেরিয়ে গেল ভেতরের সব দ্বিধা এবং আড়ষ্টতা। লাজুক হেসে বললাম, সবাই মনের কথা গুছিয়ে বলতে পারে না। মন যা চায়, আচরণে তার উল্টোটা করে। তারা আমার মতোই দুর্ভাগা। শুধু শুধু বদনাম কুড়োয়।

দুষ্মন্ত দুষ্টু-দুষ্টু চোখে আমার দিকে চেয়ে বলল, বাইরে বসে থাকলে ভেতরের ডাক শোনা যায় না। বেশির ভাগ মানুষ বাইরের জানালায় বসে কুঁড়েমি করে কাটিয়ে দেয় শ্রেষ্ঠ মুহূর্তটা। ভেতরের ডাকটা কোনোদিনই পৌঁছয় না তাদের কানে। এই ব্যাপারটাও যে সে রকম নয় বুঝব কী করে?

আমার হৃদয় ব্যথা ব্যথা করতে লাগল। অন্তরের সব যন্ত্রণার গভীর থেকে, নাভিমূল থেকে সহসা স্বতঃস্ফূর্তভাবে একটা প্রতিবাদ উঠে এল। না বাইরের ডাকে ভেতরের বন্ধ দরজা খুলে তৈরী হয়ে বেরোতে তো একটু সময় লাগেই। সেই সময় পর্যন্ত তাকে তো অপেক্ষা করতে হবে।

প্রিয়ংবদা হাসিহাসি মুখ করে চেয়ে আছে দুষ্মন্তের দিকে। বসন্তের পড়ন্ত বিকেলবেলা। বাতাসে শিউলির গন্ধ। পাখিরা ডালে বসে মনের সুখে ডাকছে। শকুন্তলার কথায় প্রিয়ংবদা চমৎকৃত হলো। বঙ্কিম হল ভুরুযুগল। দু'চোখের তারায় বিদ্যুৎ খেলে গেল। কৌতুক করে বলল, মিষ্টি মেয়ের মিঠে জবাবটা কেমন লাগল রাজন্? সারারাত ধরে ভেবে কাল জবাবটা দিতে যেন ভুলে যাবেন না। এখন দয়া করে আপনার কক্ষে বিশ্রাম করতে চলুন। একটু পরে আরতি ঘণ্টা বাজবে, সখীকে

মন্দিরে যেতে হবে। প্রিয়ংবদা হাসল খিলখিল করে। কেবল তার মুখ চোখ নয় মাথা থেকে পা পর্যন্ত সমস্ত দেহ হাসছিল তার সঙ্গে। দুষ্মন্তের আগে আগে চলল সে।

আমি সত্যি কথাই বলব। প্রিয়ংবদার ওপর সেদিন আমার খুব রাগ হয়েছিল। চলে যাওয়ার সময় এমন অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল যে আমি তার মানেটা ঠিক বুঝলুম না। কিন্তু ভেতরে হঠাৎ একটু কেমন লজ্জাবোধ হল। কিন্তু সে খুব অল্পক্ষণের জন্য। চলে যাওয়ার পরেই হুঁশ হল আমি সামান্য মেয়ে। কিন্তু মন মানতে চাইল না। পঞ্চেন্দ্রিয় রাশ টেনে ধরার ক্ষমতা ছিল না আমার। চোখের নেশায় মন আমার মাতাল তখন।

সে রাতে ঘুম এল না। চোখ বন্ধ করলে দেখতে পাচ্ছি তাঁর যৌবনদীপ্ত, স্বাস্থ্যোজ্জ্বল চেহারা, পদ্মকলির মতো মুখ, স্বপ্নালু আঁখি। সারা অঙ্গে তাঁর ঐশ্বর্যের দীপ্তি। সারা রাত ধরে শুধু রাজাকেই দেখেছি। মনে মনে বলছি, আমি তো একটা মেয়ে। স্বামী, সন্তান, সংসারের স্বপ্ন আছে আমার। তার জন্য লোভ থাকা আমার কিছু অন্যায় নয়। যোগিনী সেজে সারাজীবনটা বৃথা কাটিয়ে দিতে পারব না। ওর ভেতর কিছু নেই। আমি রক্তমাংসের মানুষ চাই। সে হবে সম্পূর্ণ আমার। তার ওপর আমি রাগ করব, অভিমান করব, ঝগড়া করব, দয়া করব, আবার বুকের ওপর হেসে, কেঁদে, সোহাগে লুটিয়ে পড়ব, ক্ষমা চাইব, করুণা ভিক্ষা করব। আমার মতো করেই তাকে ব্যবহার করব, কাটব, কুটব; যা ইচ্ছে তাই করব। আমার মোহ আছে, লোভ আছে, প্রেম আছে—আমি সেইসব নিয়ে মানুষের মধ্যে এক অনাবিষ্কৃত দেশ আবিষ্কার করব। হৃদয়ের মতো এত বড় অনাবিষ্কৃত দেশ আর নেই। এখানে কোনো জিনিস একদিনে জানা শেষ হয় না। প্রতিটি মুহূর্ত এখানে নতুন। আমার জীবনের আচমকা অপ্রত্যাশিত ঘটনা থেকে এই সত্য জেনেছি। আমার হৃদয়ের এমন একটা প্রত্যক্ষ রূপ চাই, যাকে আমি প্রভু বলব, স্বামী বলব, পুত্র বলব, নিজেকে ভাবব গৃহিণী, জননী, রাজমহিষী, রাজমাতা, লোকমাতা আরো কতো কী। আমি মেয়ে, দেবী নই, দেবী হয়ে থাকতেও চাই না। দেবী হওয়ার ভেতরে কোনো প্রাণ নেই, রস নেই, সত্যের রঙ নেই। শুধু আছে কল্পনা, মিথ্যে আবেগ। নিজেকে মিথ্যে দিয়ে কল্পনা দিয়ে ভুলিয়ে রাখতে চাই না। আমি রক্তমাংসের মানবী। আমি ভুল করব, আবার সেই ভুল শুধরে নিয়ে নিজেকে নবীকৃত করব। আমার সমস্ত হৃদয় আনন্দে ভরে গেছে—যা দেখার নয়, ভাবার নয়, তাও বসে বসে দেখছি। তপোবনের সাদামাঠা জীবনের ভেতর, ছোট কর্তব্যের কতকগুলো বাঁধা নিয়মের ভেতর এত কাঙালি হয়ে আমি বসেছিলুম সেকথা হঠাৎ আজ জানতে পারলাম।

তবু একটা সন্দেহে মনটা ভারাক্রান্ত হল। নিজেকেই প্রশ্ন করি, যে দুর্ভাগ্য নিয়ে জন্মেছি, মানুষের বঞ্চনা পেয়েছি, তার কপালে এত সুখ কি সইবে? কেবল এই কথাটা মনের ভেতর কোন্ জায়গায় একটা কাঁটার মতো বিঁধে থাকল। যখন একা থাকি, নিজের সঙ্গে কথা বলি তখন ঘুনপোকার মতো সন্দেহটা পাঁজর কাটতে থাকে।

দুষ্মন্তকে দেখার পর আমার লজ্জা যে কোথায় গেল তাই ভাবি! তাঁকে দেখার আগে নিজেকে আমার ভালো করে জানা হয়নি। পরের দিন সকালে অনসূয়া বলল, সখি, মহারাজের তো আশ্রম ছেড়ে যাওয়ার কথা আজ। তিনি যাত্রার জন্যে প্রস্তুতও হয়েছেন। তোমার অনুমতির অপেক্ষা করছেন।

বুকের ভেতরটা আমার ছ্যাঁৎ করে উঠল। চমকে তাকালাম অনসূয়ার দিকে। ভুরু বিস্ময়ে কুঁচকে গেল। তাঁকে নিয়ে এক অনাস্বাদিত বোধ যে আমার বুকের গভীরে বিশ্বাসঘাতকের মতো লুকিয়ে ছিল তা কখনো জানা ছিল না। আচমকা দুষ্মন্তের চলে যাওয়ার সংবাদটা হঠাৎ করে আমার বুকে ঢেউ দিয়ে গেল। সেই ঢেউ-এর অর্থটা ঠিক বুঝতে পারলাম না। ঢেউ-এর দোলায় দুলতে দুলতে মনটা আমার কোথায় যেন ভাসিয়ে নিয়ে গেল। দুষ্মন্তের স্বপ্নালু দুই চোখের শান্ত সুনিবিড় চাহনি যেন পূজার প্রদীপের মতো জ্বলতে লাগল। আমার বুকের ভেতর হঠাৎ করে কী সব যেন ঘটে গেল। আমার ভেতরটা আর্তনাদ করে উঠল। দুষ্মন্তকে ছেড়ে আমি থাকব কেমন করে? দুষ্মন্ত নেই ভাবতেই মনটা কেমন যেন শূন্য মনে হতে লাগল। হতাশ গলায় বললাম, চলে যাবে? তাঁর কোনো অসুবিধা হচ্ছে কী?

অনসূয়া আমার মুখের দিকে অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, তা তো জানি না। প্রিয়ংবদার সঙ্গে রাতটুকু আশ্রমে থাকার কথা হয়েছিল।

পিতা সোমতীর্থে যাত্রার আগে অতিথিদের দেখাশোনা, যত্ন, আপ্যায়নের সব দায়িত্ব আমাকে দিয়ে গেছেন। অথচ, তাঁর কোনো কর্তব্যই করেনি। এভাবে গেলে পিতার নিন্দে হবে, কর্তব্যে অবহেলা করার অপযশ হবে। এভাবে তো তাঁর চলে যাওয়া চলবে না। মহারাজের চলে যাওয়া কি খুব জরুরী।

তা-তো জানি না।

আর কটা দিন এই আশ্রমে আমাদের সঙ্গে কাটিয়ে গেলে খুব অসুবিধে হবে কি?

সে কি সম্ভব হবে? তাঁকে ধরে রাখতে চাও কেন বলো তো?

খুব ইচ্ছে ছিল, তাঁকে পরিচর্যা করে নিজে উপস্থিত হয়ে খাওয়াবো। অনসূয়া আমার দিকে চেয়ে অর্থপূর্ণ হাসল। ওর হাসি দেখে রাগে গা আমার রি-রি করে জ্বলতে লাগল। বললাম, হাসির কি আছে? পিতার অবর্তমানে একজন পুরুষ অভিভাবক থাকলে আশ্রমেরই মঙ্গল।

প্রশ্রয় ভরা উজ্জ্বল দুটি চোখে তড়িৎ খেলে গেল অনসূয়ার। মুখ, টিপে হাসল। বলল, পুরুষ অভিভাবকের প্রয়োজন আশ্রমের, না তোর নিজের? অনসূয়া খিল খিল করে হাসল। বলল, তুই মজেছিস্। প্রথম দর্শনে প্রেম! আমার কেমন সন্দেহ হচ্ছে। এ তোর চোখের নেশা। হারানোর ভয়ে তাই চোখের পাতা কাঁপছে। মুখের ভাব পাল্টে গেছে। তোর সাজসজ্জায়, চেহারায়, আচরণের ভেতরেও কেমন একটা পরিবর্তন এসেছে। বিধাতা হঠাৎ তোকে যেন নতুন করে গড়ল।

রাগ করে ভেঙ্চি কাটলাম। বললাম, শকুনের নজর।

অনসূয়া হাসতে হাসতে চলে গেল। যাওয়ার সময় বলল শকুন উঁচু আকাশে ওড়ে। মনের বনে কোথায় আগে ফুল ফোটে সে তো তারই দেখতে পাওয়ার কথা।

যাই হোক, শেষ অবধি দুষ্মন্ত আশ্রমে থেকে গেল।

অতিথির দেখাশোনা করা এবং পরিচর্যার সূত্র ধরে তার সঙ্গে প্রতিদিন দেখাসাক্ষাৎ হতে লাগল। ধীরে ধীরে আমার লজ্জা কাটল, জড়তা ভাঙল। আমার মধ্যে কোনো লুকোচুরি ছিল না। অরণ্যের মতোই খোলামেলা ছিল আমাদের মেলামেশা।

তার সঙ্গে আমার হৃদয়ের মিলন বোধ হয় বিধাতাও চেয়েছিল। তাই, আমার ভেতর এক নতুন শকুন্তলাকে সৃষ্টি করলেন। আমার সাজ-সজ্জায় পরিবর্তন এল। নারী রূপ-লাবণ্য সৌন্দর্যচর্চায় আমি মগ্ন। দুষ্মন্তের মুখে রূপের প্রশংসা শোনার লোভেই আমি সাজি। প্রতিদিন নতুন হয়ে উঠি। নিজের সৌন্দর্যের দিকে যে কোনোদিন ফিরে তাকায়নি হঠাৎ তার ভেতর এক রূপ-সচেতন নারীর জন্ম হল। নিজের রূপকে এতদিন অনাদর করার জন্য লজ্জা হল। আমার রূপের যে এমন দাম আছে, চুম্বক আকর্ষণ আছে, দিব্যশক্তি আছে আগে অনুভব করিনি। এই যে একটা বিপুল আবেগ এল, এতো দুষ্মন্তের সংস্পর্শে পাওয়া। সেই কথা ভাবলে কৃতজ্ঞতায় ভরে যেত চিত্ত। আশ্চর্য লাগত, যে শকুন্তলা ছিল দীঘির মতো শান্ত, স্রোতহীন, হঠাৎ তার ওপর দুষ্মন্তের অফুরন্ত যৌবনের ঢেউ এসে পড়ল। সাগরে যাওয়া নদীর চলকানো জলের মতোই উন্মত্ত উৎসারে আমি দৌড়ে গেলাম শূন্য জীবনের বুক থেকে অন্য এক জীবনের আলোকিত প্রান্তরের দিকে। উদ্দাম যৌবনের কলরোল বেজে উঠল আমার রক্তের ছন্দে ও ভাষায়। রক্তের ভিতরকার ধ্বনি অর্থটা ঠিক বুঝতে পারলমা না। মুক্তির উল্লাস তখন অবাধ, ছুটে চলার আনন্দ নূপুর হয়ে বাজছে বুকে। আমিও কম আশ্চর্য হইনি! কিন্তু এ ঢেউ কোথা থেকে এমন ফেনিয়ে এলো? আমার এ হলো কী?

দুষ্মন্ত আমার দিকে তাকিয়ে কী যেন দেখে? কিসের সন্ধানে কার অপেক্ষায় অতলস্পর্শী চাহনি মেলে চুপ করে বসে থাকে। আমার হাতখানা তার হাতের মুঠোয় ধরা থাকে। প্রকৃতির হৃদয়ের মাঝখানে বসে এক মুগ্ধ চমকে চোখে চোখে চেয়ে নিঃশব্দে সময়টা কোথা দিয়ে কেটে যেত টের পেতাম না। দেখার ভেতরেও যে এত আনন্দ লুকানো আছে, জানা ছিল না। দুষ্মন্ত আমার কোলের ওপর মাথা রেখে টানটান হয়ে শুলো। আমার শরীরের ভেতর কেঁপে গেল। ওর একটা হাত

আমার গাল স্পর্শ করে আছে। লুকনো নিঃশ্বাস ফেলে ফিস ফিস করে বলল, দুটি মন যখন চোখে চোখে নিঃশব্দে কথা বলে তখন মুখের ছুটি। আমি কাঁপছি। একটা লুকনো ভয়ে আমার গলা দিয়ে স্বর বেরোচ্ছে না। কিন্তু একটা তীব্র সুখের উল্লাসে শরীরটা শিথিল হয়ে এলো। আমার কিচ্ছু করার ছিল না। ওর চুলের সুগন্ধে আমার নিঃশ্বাস ভরে ছিল। ওর হাতখানা মুখ থেকে আমার কাঁচুলি পরা বুকের উপর ছুঁয়ে ছিল। ওই হাত সরিয়ে দেবার শক্তি আমার নেই। আবার ওকে বাধাও দিতে পারছি না। আমাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরেছে। ওর বাহুবন্ধনে আমি বন্দী। আমার মুখের উপর মুখ ঘসছে। আমি নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে চেষ্টা করছি। নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করছি। সে যুদ্ধ পরাজিত হওয়ায় জন্য ছিল, না নিজেকে ভরিয়ে তোলবার জন্য ছিল জানি না। সব নারীই বোধ হয় পুরুষের কাছে নিজেকে সঁপে দিয়ে ওভাবেই মথিত হতে ভালোবাসে। তবু বলছি, "আমাকে ছেড়ে দাও"। শুচিতা রক্ষার কোনো চেষ্টা নেই আমার। মুখে শুধু মৃদু আপত্তি ছিল। কিন্তু ওকে সামলানো শক্তি আমার ছিল না। শক্ত দু হাতের মধ্যে বন্দী করে আমার ঠোঁটের ওপর মুখ নামিয়ে আনল। ওর আগ্রাসী উষ্ণ ঠোঁট দিয়ে শুষে নিতে লাগল আমার ঠোঁটের সমস্ত স্নিগ্ধ সিক্ততা। এই প্রথম একজন পুরুষের দেহের সঙ্গে লীন হয়ে গেল আমার শরীর। মুখে বলছি, আঃ কী করছ? ছাড়! লাগে.... অসভ্য। কিন্তু মন কানায় কানায় ভরে যাচ্ছে। একটু পাপবোধ নেই। বরং এক ভরন্ত কলসের মতো আমার ভেতরটা ভরে উঠতে লাগল।

সেই প্রথম শরীরে মধ্যে লুকনো আনন্দকে টের পেলাম। রাতে শুয়ে শুয়ে দুষ্মন্ত এবং আমাকে দেখছি। আর আমার সমস্ত শরীরে একটা অদ্ভুত অনুভূতির ঢেউ খেলে গেল! এক ধরনের অপ্রকাশ্য নিষিদ্ধ আতঙ্ক মেশানো আনন্দের সঙ্গে তীব্র উত্তেজনা মিশে ছিল। সে সব অনুভূতি আমার নতুন। এই তীব্র উত্তেজক আনন্দে আমার কেমন জ্বর জ্বর লাগল। এই অদ্ভুত অনুভূতিটা আমাকে প্রশ্নে প্রশ্নে ভরিয়ে ফেলল। এটা হলো কি? এটা হলোই বা কী করে? এমন হয় কেন? এটা কি শুধুই শরীরের ব্যাপার? মনের কিছু নয়? কাউকে তো এ কথা জিজ্ঞাসা করার নয়, তাই নিজের মনের ভেতর চিরে চিরে তার বিচার-বিশ্লেষণ চললো। অনসূয়া, প্রিয়ংবদার আলিঙ্গনে কিংবা তাদের শরীরের ছোঁয়ায় তো তীব্র জ্বালাধরা উষ্ণতায় শরীরের ভেতর এভাবে পোড়ে না। কানের লতি তেতে ওঠে না। দুষ্মন্তকে দেখলে, তার শরীর স্পর্শিত হলে এরকম লাগে কেন? তাকে চোখে দেখার জন্য ভেতরটা কেন ব্যাকুল হয়? বুকটা উথাল পাথাল করে কেন? নিজের অজান্তেই ওকে ভীষণ আপনজন মনে হয়। এত আপন হয়ে গেছে যে ওকে ছাড়া আমার কোনো অস্তিত্বই কল্পনা করতে পারি না।

রোদ পড়ে গেলে দুষ্মন্তের সঙ্গে রোজ আমি বেড়াই। মালিনী নদীর ধার ধরে যেতে যেতে মনটা খুশিতে ভরে যায়। কে জানে? কী আছে দুষ্মন্তের ভেতর! ভালো লেগে গেলে মন বোধ হয় কোনো নিয়ম, বাঁধন, শাসন মানতে চায় না। কোথায় কে কী ভাবছে, বলছে, আমি গ্রাহ্যই করতাম না। নির্জন পথে একা থাকলে দুষ্মন্তের হাতখানা লতার মতো জড়িয়ে ধরে বোকার মতন বলতাম, কী ভালো লাগে!

কোনটা ভালো? আমার হাত, না আমাকে?

জানি না।

আমার কিন্তু ভালো লাগে না।

মিথ্যে কথা।

কেমন করে জানলে?

বসন্ত এলে গাছ যেমন করে জানতে পারে, তেমন করে টের পাই। সত্যি, তোমার সঙ্গে কথা বলতে ভাল লাগে, দেখা হলে ভাল লাগে। অন্য কিছু ভাল লাগে না। সারাদিন এই বিকালটার প্রতীক্ষায় থাকি। আর তুমি?

অভিমানের গলায় বললাম, আমাকে তুমি একটুও বোঝ না। তাই, প্রশ্ন করে জানতে হয়। তোমাকে যে আমার অদেয় কিছু নেই, এ কথাটা মুখে বলে বোঝাতে হবে!

দুষ্মন্ত পাছে কথায় হেরে যায় তাই হাল্কা গলায় বলল একটা মেয়ে এবং ছেলের কথার কাটাকাটির খেলার এই তো বিশেষ আনন্দ। মানুষ ছাড়া আর কোন্ প্রাণী এমন করে মন জানজানির খেলা খেলতে জানে, বলো? কী, কথা বলছ না যে—

কী বলব বলো? তোমার মতো বহু মানুষের সংস্পর্শে তো আমি পাইনি। মন জানাজানির খেলাও কখনো করেনি। গভীর জীবন রহস্যের কথাগুলো কেমন করে বুঝব?

আশ্রমে ফিরতে সেদিন অন্ধকার হয়ে এলো। আকাশের তারাগুলো একে একে ফুটে উঠল। তুলোয় পেঁজা সাদা মেঘ বলাকার মতো নীল আকাশে গা ভাসিয়ে উড়ে বেড়াচ্ছিল। ঝিরঝিরে ঠাণ্ডা বাতাস বনের ভেতর থেকে ফুলের মিষ্ট গন্ধ বয়ে আনল। জঙ্গলে পাখিরা পাগলের মতো সঙ্গীদের ডাকছিল। সপ্তমীর চাঁদের আলোর সঙ্গে প্রথম বসন্তের শিশির কুয়াশা মিলে এক স্বপ্নরাজ্য তৈরি করল। রূপসী সন্ধ্যা যেন রাতের সাজে সাজল। এ রকম একটা পরিবেশের মধ্যে নিঃশব্দে আমি পথ হাঁটছিলাম।

হঠাৎ-ই দুষ্মন্ত বলল, তপোবনের জীবন তোমার ভালোলাগে?

দুষ্মন্তের মুখের দিকে আড়চোখে তাকালাম। কিন্তু আবছা অন্ধকারে ওর মুখ ভাল করে দেখা গেল না। বললাম, বুঝতে পারলাম না।

দুষ্মন্ত বলল, এখানে সবই কেমন যেন প্রাণহীন। প্রাণের স্পন্দন যেন থেমে গেছে। জীবনের কোনো গতি নেই। ব্রহ্মচর্যের ভেতর জীবনটা কাটিয়ে দিয়ে কোন্ ইষ্ট লাভ হবে? জীবনকে ফাঁকি দিয়ে, নিজেকে সকল সুখ, আনন্দ থেকে বঞ্চিত রাখার ভেতর সত্যি কিছু আছে? প্রাণ বিনা দেহের যেমন কোনো দাম নেই, তেমনি নারী এবং পুরুষকে বাদ দিয়ে জীবনের কোনো অর্থ নেই। তোমরা বালক-বালিকারা পাশাপাশি বাস কর গাছের মতো। কারো ভেতর কোনো প্রাণের স্পন্দন দেখতে পাই না। তোমাদের চলাফেরাও যন্ত্রের মতো। নিরুৎসুক মানুষ তো মৃত মানুষই। তোমাদের জন্যে আমার বড় কষ্ট হয়। এর ভেতরে সত্যি হাঁফিয়ে উঠেছি। তুমি না থাকলে কবে পালিয়ে যেতাম। আমার সব বন্ধন তো তুমি। তোমার জন্যে পড়ে আছি।

কথার সুগন্ধে বুক ভরে গেল আমার। মনে হলে শরীরে দাপাদাপিতে যে আনন্দ লুকানো আছে, জীবনের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার মধ্যে সে আনন্দ কোথায়? তবু দুষ্মন্তকে চটানোর জন্য বললাম, তপোবনের ছেলেমেয়েরা তাদের প্রাণের স্পন্দন, খুশির ছটফটানি তোমাকে দেখাতে যাবে কেন? তুমি তো ব্রহ্মচর্য করনি কোনোদিন, কেমন করে তার সুখ আনন্দকে জানবে? যে পরিবেশে যে বাস করে সেই পরিবেশের বাইরে অন্য জীবনে তাকে মানায় না। তপোবনের সংযত জীবনযাপনের তৃপ্তি একটু আলাদা। সুখ ঐশ্বর্য, বিলাসের ভেতর থেকে তুমি তার মাধুর্যকে ঠিক বুঝবে না।

আমার কথায় দুষ্মন্ত হাসল। সপ্তমীর চাঁদের আলো পড়েছে ওর মুখের ওপর। ভারি সুন্দর দেখাচ্ছিল। চোখের ওপর চোখ রেখে বললাম, হাসছ যে! হাসির কী আছে? আমার মুখের দিকে ওভাবে তাকিয়ে থাকার কোনো মানে হয় না।

তবুও হাসল মুখ টিপে! আমার ভীষণ রাগ হল।

হঠাৎ-ই ও থমকে দাঁড়িয়ে আমার বাহু ধরল। বলল, সুন্দরী তুমি সব জান। জান না শুধু শরীর কী জীবন্ত! ব্রহ্মচর্যের ভেতর একটা চাপা নিষ্ঠুরতা আছে। আমার সংস্পর্শে থেকে তুমি কি টের পাওনি নিজেকে নিবৃত্ত করে রাখার ভেতর কোনো সুখ নেই। নরনারীর স্বাভাবিক আকর্ষণের ভাবাবেগের গলা টিপে ধরার আর এক নাম সংযম। বোকারা সংযমের নামে নিজেকে ফাঁকি দেয়! এই যে তুমি রোজ আমার সঙ্গে বেড়াতে যাও কেন? ভালোলাগা তোমার মনে এক নতুন মানে বয়ে নিয়ে আসে বলেই তো সারাদিন এই মুহূর্তটার প্রতীক্ষা করি।

আমি স্তব্ধ হয়ে চেয়ে আছি দুষ্মন্তের দিকে! পিছন থেকে আসা চাঁদের আলোয় ওর কানের দুপাশের চুলে রূপোলি রেখার আভাস লেগেছে। ওর মুগ্ধ দুটি চোখের নিবিড় চাহনি, আমার শরীর ভেদ করে বাইরের চন্দ্রালোকিত বনাঞ্চলের গাছ-গাছালি ভেদ করে উজ্জ্বল নীলাভ দ্যুতির তারাদের দিকে প্রসারিত হয়ে গেছে।

দুষ্মন্ত দুহাতে আমাকে তার বুকের মধ্যে টেনে নিল। কিছু বোঝার আগে আমার মুখের ওপর উষ্ণ চাপ অনুভব করলাম, তীক্ষ্ম এবং মধুর। ওর দু'হাতের মধ্যে বন্দী শরীরটা কেমন যেন শিথিল হয়ে এলো। ঝুঁকে পড়া মুখের খুব কাছে মুখ এনে বলল, এই হলো ভালোলাগা। তা হলে ভালোবাসা মানে শরীর। যাকে ভালবাসি সে যদি শরীর না দিল তা হলে কী দিয়ে প্রেমকে বোঝাব? সংযম, ব্রহ্মচর্যা মিথ্যে কথা। ছেলেভুলনো কথা। ব্রহ্মচারী মুনি-ঋষিরাও ব্রহ্মচর্য বিসর্জন দিয়েছেন। তবু সেই মিথ্যে শিক্ষাটাই তাদের দিচ্ছে। তোমাদের তো দেবী করে রাখার জন্য দুবেলা ধূপ-ধুনো-ফুল-এর গন্ধে ভরা চাঁদমালা দিয়ে পুজো মন্ডপে বসিয়ে রেখে একটা মিথ্যের সঙ্গে আপস করতে শেখানো হচ্ছে। ও সব অভ্যাস, সংস্কার ছিঁড়ে তুমি বেরিয়ে এস!

মালিনীর জলে চাঁদের আলো যেমন কাঁপে আমার ভেতর তেমনি কাঁপছিল, আন্দোলিত হচ্ছিল। আমার মুখে কথা নেই। ওর বুকের ভেতর কী হচ্ছিল জানি না। আমার ভেতর উষ্ণ তরল লাভাস্রোতের মতো কী যেন বয়ে যাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, ওর বাহুবন্ধনের মধ্যে আমি স্থবির হয়ে গেছি।

দুষ্মন্তের মুখ আমার মুখের খুব কাছাকাছি স্থির হয়ে আছে। গরম নিঃশ্বাস পড়ছে আমার মুখের ওপর। বলল, এখন কোন্‌টা বেশি ভালো লাগছে বলো তো। ব্রহ্মচর্যের মধ্যে কী আছে? একটা অভ্যেস ছাড়া কিছু নয়।

ওর বুকের ওপর মাথা রেখে বললাম, ভগবান পুরুষদের কেন ভিখিরি করে গড়েছেন তিনিই জানেন। সংযম হল মেয়েদের শ্রী।

ভিখিরি বলেই পুরুষের ভদ্রতাবোধ নেই। নির্লজ্জের মতো চাওয়াই তার স্বভাব। অভ্যেসও বলতে পার। মেয়েদের শরীর মনের বাধাটা সংযম নয়, ওটা এক বিশেষ আনন্দকে মধুর ও সুন্দর করার জন্য। তোমাদের কাছ থেকে পুরুষ বাধা পায় বলেই তো দুর্বৃত্ত হয়ে জয় করতে তার এত আনন্দ লাগে। মেয়েমানুষ ছাড়া পৃথিবীর আর কোন্ প্রাণী, এত খেলতে জানে বলো? পুরুষের কাছ থেকে মেয়েমানুষের লুকনোর এই অভ্যেসটা ভগবানের এক আশ্চর্য সৃষ্টি। এটা না থাকলে পাওয়াটা দামী হত না।

আমি চুপ করে আছি। এমন অদ্ভুত কথা তো আগে শুনিনি। মুহূর্তগুলো কোথা দিয়ে কেটে যাচ্ছিল হুঁশ ছিল না। ওর বাহুবন্ধন ছেড়ে আমি উঠতে পারছি না। আমার শরীর অবশ হয়ে গেছে। ওর মুখের ওপর চাঁদের আলো পড়েছে। প্রসন্ন পরিতৃপ্ত দুটি চোখ মেলে আমার দিকে চেয়ে আছে। গাঢ় স্বরে বলল, তুমি কথা বলছ না কেন শকুন্তলা? সত্যি বলো, তোমার কী হয়েছে? চোখের কোণ দিয়ে তোমার এ কোন্ অশ্রু গড়াচ্ছে? আনন্দের না বিষাদের?

কথা বলতে বলতে কারা যেন এগিয়ে আসছিল। গলার স্বরগুলো খুব চেনা। তপোবনের লোকেরা যে আমার সন্ধানে বেরিয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। স্বপ্ন থেকে জেগে উঠলাম বাস্তবে। এতক্ষণ শরীরের দাপাদাপিতে যে আনন্দ সুগন্ধি ফুলের মতো মনের বনে ছড়িয়ে পড়ছিল হঠাৎ একটা নিষিদ্ধ আতঙ্ক মেশানো ভয় ও লজ্জায় আমার মুখ কালো করে দিল। চাপা আর্তনাদ করে বললাম, সর্বনাশ! কী হবে? ভয়ে আমার সমস্ত মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

দুষ্মন্ত কিন্তু একটুও বিব্রত বোধ করল না। ভয়ও পেল না বরং ওদের দেখানোর জন্যই আমার দু'গালে দুটি হাতের পাতা ছুঁয়ে তার তৃষ্ণার্ত দুই চোখের সামনে মুখখানা তুলে ধরে বলল, শকুন্তলা, তোমাকে না হলে আমি বাঁচব না। তুমি আমার জীবন সর্বস্ব। আমার সুখ আনন্দ তো তুমি।

ওর কথা শুনে লজ্জা নয় আনন্দে বুকের ভেতর কাঁপতে শুরু করল। ঝড়ের মুখে বিপন্ন কচি কিশলয়ের মতো কাঁপছি। কিন্তু আমি টের পাচ্ছি, ভয়ের বিষ প্রেমের অমৃত হয়ে আমার সারা শরীর ছড়িয়ে যাচ্ছে। চাঁদের আলো মাখানো আকাশ গাছের পাতায় পাতায় স্বপ্নের জাল বুনছে। আমরা তার ফাঁদে যেন আটকে আছি। শুভ্র চাঁদের আলোতে আমাদের যুগল ছায়া পড়েছে তপোবনের মানুষজনের ওপর। আমি তাড়াতাড়ি দুষ্মন্তের কাছ থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে দৌড়ে গৌতমী

পিসির বুকে মুখ লুকোলাম। কিন্তু গৌতমী পিসি আমাকে কোনো তিরস্কার কিংবা ভর্ৎসনা করল না। স্নেহ-মমতা দিয়েই কোলে টেনে নিল। কাঁধের ওপর হাত রেখে হাসল। অর্থপূর্ণ হাসি। সেই আশ্চর্য হাসিতে কৌতুক এবং অশেষ ক্ষমা মাখোনা ছিল।

আমার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বেশ ভীত হয়ে পড়েছিল গৌতমী পিসি। এক বুক উদ্বিগ্ন উৎকণ্ঠা নিয়ে কথাগুলো বলল, তোমার অবাধ মেলামেশা আমাকে ভাবিয়ে তুলেছে। মুনিদাদাকে কৈফিয়ত দেওয়ার বোধহয় আমার কিছু রইল না। তোমাদের মেলামেশা কোথায় গিয়ে শেষ হবে কে জানে? পুরুষমানুষ বড় বেপরোয়া। আত্মসম্মান জ্ঞান সামান্য, ভদ্রতাবোধ অনেক ক্ষেত্রে তাদের থাকে না। গায়ের জোর খাটিয়ে আদায় করে নেওয়াটা তাদের অভ্যেস। রাবণের মতো ভিখিরি সেজে আসে। ভিক্ষের হাত বাড়িয়ে দেয়। তারপরেই তার ভেতর থেকে রাক্ষসটা বেরিয়ে এসে হরণ করে নেয় সব। বিশ্বাস করে সীতা ঠকেছিল। সারা জীবন ধরে তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়েছিল। সব পুরুষের ভেতর রাবণের মত একটা রাক্ষস আছে। তার চতুর ছলনায় যে মেয়ে ভোলে জীবনভর তাকে পস্তাতে হয়। এর বেশি তোমাকে কী বলব? এখন অদৃষ্ট তোমাকে কোথায় নিয়ে যাবে, কে জানে?

গৌতমী পিসির কথা শুনে কেমন ভয় হল। প্রেম, বিবাহ, ভালোবাসা সম্পর্কে আমার কোনো স্বচ্ছ ধারণা ছিল না। দুষ্মন্তের সঙ্গে বেড়াতে, কথা বলতে, কিংবা ওর শরীররের ছোঁয়া লেগে এসব কিছুই মনে হয়নি আমার। সব কিছুর ভেতর কোথায় যেন একটা মোহ ছিল। যার দুর্বার আকর্ষণ আমি কিছুতেই কাটিয়ে উঠতে পারতাম না। শরীর যখন শরীরের ওপর অধিপত্য নেয় তখন বিচার-বিবেচনা ছুটি নেয়। গৌতমী পিসির উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় আমার সেই প্রথম প্রেমের অনুভূতি জাগল। সারা শরীর কন্টকিত হলো। দুষ্মন্ত সম্পর্কে আমার ভাবনাগুলো এলোমেলো হয়ে গেল। নিজের ওপর বিরক্তি জন্মাল। কিন্তু সন্দেহ এমন জিনিস একবার মনে উদয় হলে শিকড় সমেত উপড়ে ফেলা কঠিন হয়। একা থাকলে গৌতমী পিসির আশঙ্কা সত্যি বলে বোধ হয়। দুষ্মন্ত আমার অকপট আত্মনিবেদন, সরল বিশ্বাস নিয়ে ভালোবাসার খেলা করছে। তখন আমি বিচার না করে তাতে মোহগ্রস্ত হয়ে পড়ছি। কিন্তু ঘটনা কি সত্যি তাই? দুষ্মন্ত তো নিজেকে কখনো আড়াল করেনি। অসংকোচে হৃদয়ের কথা বলেছে; শকুন্তলা তোমায় আমি ভালোবাসি। তুমি আমার জীবন-মরণ, ইহকাল-পরকাল। গৌতমী পিসি তার মুখে একথা শুনলে অবিশ্বাস করতে পারত কি?

তপোবনের চারিদিকে কী নীরব প্রগাঢ় প্রশান্তি। কোথাও কোনো অশান্তি নেই, বিক্ষোভ নেই। কেবল আমার মনই অশান্ত। পিতা সোমতীর্থ থেকে ফিরে এসে যখন সব শুনবে, কী বলবেন তখন? তাঁর অনুপস্থিতিতে দুষ্মন্তকে তপোবনে আশ্রয় দেওয়া হল কেন? দুষ্মন্ত রাজকার্য ফেলে আশ্রমে অবস্থান করল কেন? এই প্রশ্নের কী কৈফিয়ত দেব আমি? দুষ্মন্তের অন্তঃপুরে আরো সব স্ত্রী আছেন। তাঁরা আমাকে স্বীকার করবেন কি? রাজ্যে ফিরে দুষ্মন্ত রাজকার্যে ব্যস্ত হয়ে পড়লে, এমন করে কি চাইবে আমায়? সে সব কথা ভেবে বুক কেঁপে উঠল। গৌতমী পিসি এই অনাদরের আশঙ্কা করেই হয়তো আমাকে সতর্ক হতে বলেছে। অন্য সব কারণ ছাপিয়ে এই জিজ্ঞাসাটা আমার মনটাকে অশান্ত করে তুলল।

প্রিয়বংদা কখন যে আমার পাশে বসে চুলের ভেতর আঙুল দিয়ে একটা একটা করে জট খুলছিল টের পাইনি। আমার উদাসী দুচোখের দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে গাঢ় গলায় বলল, তোর কষ্ট দেখলে আমাদের কান্না পায়। ক'দিন ধরে একা বসে আছিস। তরুমূলে জলসেচন করতেও আজকাল পাই না তোকে। দিন দিন কেমন হয়ে যাচ্ছিস। আমি বলি কি, মনের কষ্ট দূর করতে ভগবানকে ডাক। তাঁর ওপর বিশ্বাস রাখ। তিনিই তোর সব কষ্ট, সমস্যা সমাধান করে দেবেন। শান্ত করে দেবেন। সমস্যায় পড়লে তবেই তো মানুষ তাঁর শরণাপন্ন হয়। অমনি তো আর কেউ স্মরণ করে না তাঁকে।

কথাগুলো আমার কানে ঢুকল। চোখ তুলে প্রিয়ংবদার চোখের দিকে চেয়ে রইলাম। আমার

আচ্ছন্ন মন অদ্ভুত তন্দ্রায় জড়িয়ে আসছে। কারো কথায় কোনো জবাব দিচ্ছি না। কিন্তু আমার মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গেল। আর কারো ওপরে নয়, দুষ্মন্তের ওপরেই প্রবল রাগ আর তীব্র অভিমান হলো।

নিজের মূল্য যদি নিজের মধ্যে একান্ত সত্য করে না জানি, স্বীকার করি তাহলে এই অবাধ মেলামেলার পরিণতি একদিন চরম অপমান হয়েই আমার বুকে ফিরে আসবে। সেদিন আর লোকসমাজে মুখ দেখানোর জো থাকবে না। আবর্জনার মতো সংসার, সমাজের আঁস্তকুড়ে গিয়ে মরব। আমাকে দিয়ে তখন আর কোনো পুজো হবে না। হৃদয়ের সব নৈবেদ্য সাজিয়ে যার পুজো করলাম, সেই প্রেমদেবতাকে ভোগ দিয়েছি নিজের দেহ। আমার জীবনে যে এমন কিছু ঘটতে পারে ভাবতেই পারেনি। মনেতে কোনো পাপবোধ ছিল না, কোনো অনুশোচনাও না। নিজেকে কখনো অশুচিও মনে হয়নি। বরং, এক অনাস্বাদিত পবিত্রতায় ভরে ছিল আমার মন। কিন্তু আজ সংশয়,ভয়, এলোমেলো করে দিল আমার ভাবনার জগৎ। আমার শিরার প্রত্যেক কম্পন, আমার রক্তের প্রত্যেক ঢেউ যেন আমাকে শুধতে লাগল, নারীর ঐশ্বর্যের দেমাক যার নেই, সে তো স্রোতের শ্যাওলা। তার কোনো সমাদর নেই। সংসার সমুদ্রে এক ঘাট থেকে আর এক ঘাটে তাকে ভেসে বেড়াতে হয়।

সত্যি আমার মনের কতকগুলো ভালোলাগা দিয়ে দুষ্মন্তকে সাজিয়েছিলুম। আমাদের সম্পর্কটা কতটা পোক্ত যাচাই করে দেখা হয়নি। গৌতমী পিসির কথায় প্রথম মনে হল দুষ্মন্ত আমাকে নিয়ে খেলছে না তো? এই কথাটা বেশি করে ভাবার দিন এসেছে। আমার স্বপ্নের রাজপুত্রের সঙ্গে সমাজ সংসার বাস্তবের রাজকুমারের মিল কতখানি না জেনেই পুজো করেছি তাকে। তার অনন্ত তৃষ্ণার কাছে নিজেকে মেলে ধরে উন্মোচিত করে অনাবৃত করে নিজেকে আবিষ্কার করেছি। মায়ার রঙে রাঙানো পৃথিবীর অনেক কিছুই আমি দেখেও দেখেনি। আমার খোঁটায় বাঁধা জীবনের দড়িটা দুষ্মন্ত এসে খুলে দিল আর আমি ছাড়া পেয়ে হঠাৎ মুক্তির উল্লাসে দৌড়ে গেছি কঠিন অনুশাসনের বাঁধা নিয়মের মিথ্যে জীবন থেকে আপাত আলোকিত জীবনের অন্য এক গহ্বরের দিকে। এই সব ভাবতে ভাবতে মনটা সত্যি খারাপ হয়ে গেল। বাইরে তাকিয়ে দেখি আমার জানলার সামনে আকাশের শুভ্র মেঘের পাহাড়ের এক জায়গায় দু'ফাঁক হয়ে গেল। আর তার ভেতর থেকে জ্বলজ্বল করে বেরিয়ে এল ধ্রুবতারা। হঠাৎই মনে হলো ঐ মেঘ যেন বলছে, জীবনের আকাশেও এমন মেঘ জমে, ঝড় ওঠে, বিদ্যুৎ চমকায়, তেমনি কত সংকটের মধ্য দিয়ে যেতে হয় জীবনকে। কিন্তু তাতে কি মন মরে যায়? মনটা আকাশের মতো নির্মল, ঝকঝকে। সেখানে অনেক দাগ পড়ে, কিন্তু প্রেমের দীপ ঠিক জ্বালা থাকে। সংকট, সমস্যা দূর হলে তারার মতো জেগে ওঠে প্রেম। ধ্রুবতারা মতো পথহারা পথিককে পথ দেখায়।

অমনি বুকের গভীর থেকে স্বস্তির শ্বাস পড়ল। বুকটা আনন্দে ভরে গেল। মনে হলো, এই বিশ্বাসের আড়ালে আমার ভেতর অনন্তকালের প্রেয়সী যেন স্থির হয়ে বসে আছে। সত্যিকারে প্রেম ধ্রুবতারার মতো পথ দেখায়। বিভ্রান্ত করা তার ধর্ম নয়। এই বিশ্বাস না থাকলে মানুষ কী নিয়ে বাঁচবে? বেঁচে থাকতে হলে জীবনকে অনেক মূল্য দিতে হয়। ভুলের মধ্য দিয়ে, দুঃখ, কষ্ট, যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে তাকে জানতে হয় পরম সত্যকে। সব কিছুর মধ্য দিয়ে না গেলে জীবন পূর্ণ হয় না। জীবনের বোধ হয় অনেকগুলো টুকরো আছে। আলাদা আলাদা করে ভাগ করা আছে। এই সমস্ত ভাগই ভিন্ন। দুষ্মন্তের সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ার আগের জীবন আর তার সঙ্গে মধুর প্রণয়ের পরের জীবন এবং তারও পরের দিনগুলো নিয়ে যে উৎকর্ণ উৎকণ্ঠা সবই সেই ভাগের আলাদা আলাদা অংশ। কিন্তু কোনোটাই বিচ্ছিন্ন নয়। মালার মতো করে একটার সঙ্গে একটা গাঁথা হয়ে আছে। একটা পূর্ণতার দিকে পৌঁছতে প্রত্যেক মানুষকেই বোধহয় এমন অনেক বাধা, সংকটা পেরিয়ে, অনেক হাসি, কান্না, দুঃখ,যন্ত্রণা ভয়, উৎকণ্ঠা, সংশয়ের উপত্যকা পেরিয়ে, সহিষ্ণুতার পাহাড় এবং অনেক অগ্নিপরীক্ষার আগ্নেয়গিরির গা ঘেঁসে বয়ে এসে তবে মানসগঙ্গায় পৌঁছতে হয়। জীবনের বৃহত্তর প্রয়োজনে এসবেরও হয়তো কোনো মানে আছে। আসলে, এই মানেটাকে চোখ খোলা রেখে বুঝতে

তো আমরা চাই না। মনের চোখকে ঢেকে রেখে কলুর বলদের মতো ঘুরপাক খাই। অথচ, ভগবান সবাইকে দেখার আলাদা আলাদা চোখ দিয়েছেন। জীবনের ষোলো বছর পরে যে চোখ দিয়ে, মন দিয়ে আমার অতীতকে দেখছি, ভাবছি, বিচার করছি, সেদিন দেখার এই চোখ আমার ছিল না।

ষোলো বছর পরে যখন স্মৃতিচারণা করছি তখন আমার বুকে দুষ্মন্তের যে পদচিহ্ন পড়েছে, ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের মধ্যে তার যে গায়ের মিষ্টি গন্ধ লেগে আছে, কস্তুরীর গন্ধের মতো আমার সমস্ত চেতনার ভেতর ছড়িয়ে পড়েছে। আমার বুক উথাল-পাথাল করছে। সেদিনও এরকম একটা অনুভূতি হয়েছিল। যে মানুষের যৌবন সহস্র শিখায় জ্বলছে, দুর্দান্ত ইচ্ছের জোরে যে আমাকে চুম্বকের মতো টানে, যার স্পর্শ সারা শরীরে সুরের তরঙ্গ হয়ে ছড়িয়ে পড়ে, মনটা গান গেয়ে ওঠে, যার নাম শোনার জন্য মন আমার কান পেতে থাকে তাকে ছেড়ে, তার কথা ভুলে আমি কী নিয়ে বাঁচব? সে বেঁচে থাকার সুখ কী?

আশ্চর্য মানুষের মন। এক মুহূর্তের মধ্যে তার পালে এমন উল্টো হাওয়া লাগল যে লজ্জার গাত্রাবাস উড়ে গেল, ভয়ের ঘোমটা খুলে পড়ল। দুষ্মন্তের অসংকোচ অহংকার, তার যৌবনের দীপ্তি, হীরের মতো প্রাণ-প্রাচুর্যের ঝকঝকানি আমাকে দুরন্ত বেগে তার দিকে টানতে লাগল। লজ্জা তাকে আটকালো না। নারীমনের সংস্কার, তপোবনের নিয়মকানুন তার পথ আগলে ধরল না। তার ভেতরের শক্তিটা কারো কাছে হেরে যেতে চাইল না। বরং সকলের নীরব নিষেধ আর সতর্কতা তার স্পর্ধাকে আরো বাড়িয়ে তুলল। আশ্রমে নিজেকে আমার সৃষ্টিছাড়া মনে হলো। আমি নিজের ইচ্ছেয়, নিজের মতো করেই বাঁচব বলে রাতের অন্ধকারে দুষ্মন্তের কুটিরে গেলুম।

উত্তেজনায় ওর কুটির পর্যন্ত এসে থমকে দাঁড়ালাম। নিজের মধ্যে হঠাৎ এক লজ্জা এল। মাথা হেঁট করে নিজের ঘরে ফিরে এলাম। এই প্রথম অনুভব করলাম, চারদিকের নানা ঘটনার সঙ্গে মিশে জীবনটা সহজ হওয়ায় বদলে শুধু জটিল হয়ে ওঠে। সারা রাত ঘুম এল না চোখে। নিজেকে প্রশ্ন করি, ভালোবাসা কি পাপ? তা হলে লোকে ভালোবাসে কেন? আমার মনে তো কোনো অনুশোচনা নেই। এ যন্ত্রণার উৎস কোথায়? এর শেষ কোনখানে?

দুষ্মন্তের সঙ্গে মেলামেশা এবং গোপন মিলনকে আর সরলভাবে নিতে পারলাম না। বিছানায় শুয়ে শুয়ে মনে হল এই শোবার ঘর, ঘরের চাল, দেয়াল, মেজে সব যেন অবাক হয়ে চেয়ে আছে। বাইরে আবছা অন্ধকারে ভূতুড়ে ছায়ার মতো দাঁড়িয়ে থাকা গাছগুলো নিঃশ্বাস বন্ধ করে থমকে দাঁড়িয়ে আমার শ্বাসপতনের শব্দ শুনছে। তপোবনের মাথার ওপর নীল আকাশভরা নক্ষত্র যেন দেবতার লক্ষ লক্ষ চোখ হয়ে জ্বলছে। অনন্ত কৌতূহল নিয়ে অপলক বিস্ময়ে জ্বলজ্বলে চোখে যেন আমাকে দেখছে। জালে জড়িয়ে পড়া হরিণীর মতো আমি কেন যে ছটফট করছি নিজেও জানি না। তবু একটা নিষিদ্ধ ভয়, আতঙ্কে আমার সর্বশরীর কন্টকিত হতে লাগল। আমার চিত্তে শান্তি নেই, মনে সুখ নেই। আমার ভয় করছে। দুষ্মন্তের শরীরের স্পর্শটা এখনো আমার সমস্ত অনুভূতিতে শীতের কুয়াশার মতো লেগে আছে। আমাব নিজের চোখ নিজের দিকে তাকিয়ে আছে। আমার অনাবৃত শরীরের উপর দুষ্মন্তের নিরাবরণ শরীর স্থির হয়ে পড়ে আছে। গাছের ডালে বুলবুলি শিস দিচ্ছে। কৃষ্ণচূড়ার ডালে ডালে লাল ফুলের মঞ্জরী মন্থর বাতাসে ধীরে ধীরে আন্দোলিত হচ্ছে। আর আমি আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছি। ডুবে যাচ্ছি গভীর এক অনাস্বাদিত সুখের সমুদ্রে। তাই কি ভেতরে এত অধীরতা? অজ্ঞাত অন্ধকারের দিকে ফেরানো দুই চোখে এ আমার কোন্ সঙ্কট?

ইচ্ছে করেই দুষ্মন্তের সঙ্গে ক'দিন দেখা করিনি। খুব কষ্ট হচ্ছে। কতবার মনে হলো দৌড়ে গিয়ে গলা জড়িয়ে আদর করি, গায়ের ঘ্রাণ নিই। রোমশ বুকের মধ্যে মুখ ডুবিয়ে একটু কাঁদি। বাইরের কান্নাটা তো চোখেই কাঁদে। ভেতরের কান্নাটা বাইরে থেকে কেউ দেখতে পায় না। বুকের ভেতর নিঃশব্দে তার রক্তক্ষরণ হয়। এ বোবা কান্না বুকে করে যারা কাজ করে, কর্তব্য করে, হাসে তাদের বড়ই কষ্ট। দমবন্ধ এই বোবা কান্নার পাষাণভার থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারছি কই?

আমার প্রিয় বনতোষিণীর ঝুলে পড়া ডাল পাতার ওপর গাল রেখে আদর করছিলাম না, নিঃশব্দে আমার জমানোর ব্যথা সঁপে দিচ্ছিলাম তার পাতায় পাতায়। শ্যামল সবুজ পাতার স্নিগ্ধ পরশ পেয়ে ভরে যাচ্ছিল আমার অন্তঃকরণ। হরিণশিশুটি কালো কাজল চোখ মেলে আমার কোলের কাছে চুপ করে বসেছিল। তারপর কী ভেবে আমার বুকের ওপর মুখ রেখে জিভ দিয়ে ত্বক থেকে নিঃশেষে শুষে নিতে লাগল আমার হৃদয়ের অব্যক্ত জ্বালা,যন্ত্রণা। আর তাতেই আমি নবীকৃত হয়ে উঠলাম।

সেই সময় কোথা থেকে দুষ্মন্ত এলো পা টিপে টিপে। আমাকে অবাক করে দেবে বলে বনতোষিণীর গুঁড়ির আড়ালে দাঁড়াল। হরিণশিশুর দু'নয়নের তারায় আমি ওকে স্পষ্ট দেখলাম। কিন্তু ওর আগমন যে টের পেয়েছি জানতে দিইনি। সমস্ত শরীর ওর একটু ছোঁয়া পাওয়ার লোভে আকুল হয়ে উঠল ভেতরে ভেতরে। বনতোষিণীর ডালে জোড়া চড়াই পাখি ভালোবাসার ঝাপ্টাঝাপ্টি করছিল। ঘুঘু দম্পতি ডাকছিল সপ্রেমে, গভীর স্বরে। সম্মুখের পেয়ারাগাছের মোটা গুঁড়ির গায়ে কাঠঠোকরা নিবিষ্ট মনে ঠুকরে যাচ্ছিল। বুলবুলি পেয়ারা ঠুকরে ফেলে দিচ্ছিল নিচে। বনতোষিণীর ডাল থেকে একটা কাঠবেড়ালী তরতর করে নেমে এসে পেয়ারা নিয়ে দৌড়ে পালাল। এ সবেতে আমার মন ছিল না। আমার সমস্ত ইন্দ্রিয় উন্মুখ হয়েছিল। দুষ্মন্ত কখন জোর করে বুকে টেনে নেবে, একটু আদর করবে। আমি চাইছিলাম সে আমায় লুণ্ঠন করুক, আমায় নিয়ে যেমন খুশি খেলুক। তার নিজের মতো করে আনন্দ করুক। তাতে আমার ভেতরটা যদি ভরে ওঠে তাহলে দোষ হবে কেন? হলে, আমার করার কিছু নেই। আমি তো কোনো পাপ করিনি। দোষ করিনি, অন্যায় করিনি, মিছিমিছি তাহলে ভয় পাব কেন? আমরা দু'জন দু'জনকে ভালোবাসি। প্রাণ মন দিয়ে দুজন দু'জনকে চাই। এই চাওয়া জীবনের ধর্ম। সেই চাওয়ার ভেতর কোনো ফাঁক নেই, মিথ্যে নেই। একটু হাতে হাত রাখলে গালে গাল রাখলে, চুমু খেলে, কিংবা বুকে টেনে নিয়ে একটু আদর করলে দোষ কী? আমার মন যৌবন, সব তো আমার একান্ত ভালোবাসার মানুষকেই দিচ্ছি। বিয়ের আগে করলে মহাভারত কি অশুদ্ধ হবে? কেন হবে? এই প্রশ্নে আমার বুক যখন হাহাকার করে উঠল, ঠিক তখনই পেছন থেকে একজোড়া কোমল হাত আমার চোখ চেপে ধরলো। মিলনের গভীর আনন্দে তার হাত দুটি মুঠো করে ধরলাম। তার অস্তিত্বের সব খবর আমার রক্তের কল্লোলে কল্লোলিত হলো। দুষ্মন্ত যেন প্রাণের বেগে একেবারে ভরা। তাই তার ছোঁয়া ভেতরে ঢেউ দিয়ে গেল। অস্তিত্বের শেকড় ধরে যেন নাড়া দিল।

এমন সময় একটা বৌ-কথা কও পাখি এসে সামনের গাছের ডালে বসল। বৌ-কথা কও বলে কী করুণ কণ্ঠে বারবার মিনতি করতে লাগল। আমার চোখের ওপর থেকে দুষ্মন্ত তার হাত সরিয়ে নিল। বলল, পাখিটা আমার মনের কথাই বলেছে। দু'চোখের তারায় খুশির ঢেউ বয়ে গেল। ভুরু নাচিয়ে হাসলাম। প্রণয় মাখানো হাসি। আমার কিছু বলাব আগে দুষ্মন্ত বলল, আমার বুকের আর্তি পাখির বুলি হয়ে যেন ছড়িয়ে পড়ছে বনময়। আর তুমি নির্বিকারভাবে হাসছ। আমায় দেখে তোমার একটু কষ্ট হয় না? নিজেকে এভাবে লুকিয়ে রেখে তুমি কী সুখ পাও?

দুষ্মন্তের কথার জবাবে গম্ভীর গলায় বললাম, আমিও যে সুখে নেই এই কথা মুখে বলে বোঝাতে হবে। তোমার হৃদয়, মন বলে কিছু নেই? সকাল বেলায় নীল আকাশের ভালোবাসায় রোদ যে এত খুশি হয়ে উঠল সে কি ভোরের পাখিকে বলে বোঝাতে হয়? সকালের দীপক রাগিণীর সুর ভ্রমরের কণ্ঠে গান হয়ে ওঠে কেন, সে কি ফুল জানে? জীবনেরও সব আচরণের কোনো মানে হয় না, তবু সব ঘটনাই এক নতুন অর্থ বয়ে আনে। ক'দিন দেখা-সাক্ষাৎ না হওয়ায় আমাদের জীবনেব যে অমূল্য মুহূর্তগুলো নষ্ট হয়ে গেল তাতেই তো প্রথম টের পেলাম; মন খারাপ হলে, মনের মন কী করবে তা না জানলে মনে ঝড় ওঠে। দেখাশোনাতেও যে ঝড় থামে না এই অনুভূতিটা আমরা পেতাম কোথায়?

হাসি হাসি মুখ করে ওর চোখের দিকে তাকিয়ে আছি। ওর একখানা হাত আমার কাঁধে রেখেছে। দুষ্মন্তের ঠোঁটের কোণেও হাসি ফুটল। বলল, জানার জগৎটা যে প্রতিদিন এমন করে বদলে যায়,

এত বড় সত্যটা কেবল জানা ছিল না। আমার এই জানা কোনোদিন ফুরোবে না। ফুরোবে না সেই জানার সঙ্গে তোমাকে চেনা।

মেয়োমানুষের মরণ তো—প্রশংসায় গলে যায়। পুরুষের খোশামুদি কথায় মনটা ভরে থাকে। ইচ্ছে করে না চিরে চিরে তাকে যাচাই করতে। তাতে সুন্দরটাকেই শ্রীহীন করা হয়। মনের খুশি তো আর বুদ্ধি-বিবেচনার আলোয় আভাসিত হয় না, মুখে চোখে বুকে তার চিহ্ন ফুটে ওঠে। আমিও কেমন একটা মুগ্ধতা নিয়ে চেয়ে আছি। দুষ্মন্ত আমার চোখে কী দেখল সেই জানে। হঠাৎ আমার ডান হাতটা তার হাতের মুঠোর মধ্যে ধরে তার ইচ্ছুক মুখখানি চেপে ধরল হাতের পাতায়। ভিজে ঠোঁট দিয়ে নিঃশেষে শুষে নিতে লাগল কোমল ত্বকের সব স্নিগ্ধতা। সেই স্পর্শের বিদ্যুৎ মুহূর্তে ছড়িয়ে গেল আমার শরীরের আনাচে-কানাচে। শরীরের ভেতর ঘুমিয়ে থাকা ইচ্ছেগুলো জেগে উঠে যেন দৌড়োদৌড়ি, হুড়োহুড়ি লাগিয়ে দিল। খুব ভালো লাগল ওর চুম্বন। শরীরের অসংখ্য ধমনীতে ওর রক্তের দপদপানি অনুভব করলাম। আশ্চর্য হয়ে ভাবতে লাগলাম মানুষটা কী যে দেখেছে আর পেয়েছে এই অভাগী মেয়েটার ভেতর, সেই জানে। কে যে কী দেখে কার মধ্যে কখন সে নিজেও বোধহয় সব ভালো বোঝে না। হৃদয়ের সব জিজ্ঞাসার উত্তর মস্তিষ্কও কি দিতে পারে? দুষ্মন্তের দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে থেকে বললাম কী যে পাগলের মতো কর তার ঠিক নেই। সত্যি বলছি, তোমার ওপর আমার কোনো রাগ নেই। কোনদিন ছিলও না। আগের জন্মের অনেক পুণ্য না করে এলে মানুষের এত সুখ হয় না এক জীবনে। তাই বড় ভয় করে। এত সুখ সইবে তো? বলতে গিয়ে চোখের পাতা কেঁপে গেল।

দুষ্মন্তের ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটল। বলল, এ তোমাদের পুরনো খেলা। সব মেয়ে এই এক কথা বলে পুরুষের মনের কথাটা বুঝে নেয়। নিজের সঙ্গে আমি কখনো অভিনয় করিনি।

একটু ক্ষুণ্ণ হয়ে বললাম, সব মেয়ের কথা জানি না। কিন্তু মিথ্যাচার ব্যাপারটা যে আমার মধ্যে একটুও নেই দিনের মতো সত্য। অভিনয় করতে জানি না বলেই রাজাদের কোন্‌টা মিথ্যে, আর কোনটা ভণ্ডামি চিনি না। ভয় করে সেজন্য। সত্যি বলতে কি এসব ছেড়ে তোমার হাতে হাত রেখে যখন এক অচেনা পৃথিবীতে পা রাখব, তখন আমার চেনা জগতের এই একান্ত নিবিড় করে পাওয়ার সুখ, পাছে তোমার অন্য রানীদের কাছে হেনস্তা হয় সেই ভেবে শঙ্কিত হই। হারানোর এই সুপ্ত ভয় মনে নিয়েই সব নারী জীবন কাটায়। মেয়েমানুষের ভালোবাসা বড় ভয়ের। এ সব ভাবনা-চিন্তা তো আগে ছিল না। নিজের মনের আবরণ খুলে এখন নিজেকে শুধু দেখি। এই দেখা বোধহয় কোনোদিন শেষ হবে না আমার। নিজের মনের মধ্যে যে কত রকমের ভয়, সংশয়, অবিশ্বাস, উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা, দুর্ভাবনা বাস করে তা তো আগে জানা ছিল না। নিজেকে পাহারা দেওয়া যে কত কঠিন কাজ তোমাকে না পেলে আমার কোনো কালে জানা হত না। জীবন থেকে যে কত শেখার আছে—

দুষ্মন্ত আমার কথা শুনে হাসল। বলল, মেয়েরা সংশয়বিলাসী। নিজেব চারপাশে অবিশ্বাস, অনিশ্চয়তা, অসহায়তার একটা মনগড়া জগৎ সৃষ্টি করে দুঃখে কাল কাটাতে ভালোবাসে। এই দুঃখটাকে ভালোবাসা বলে ভুল করে। এর ভেতর সত্যি কোনো আনন্দ নেই। মিছিমিছি নিজেকে কষ্ট দেওয়া। সুখ, দুঃখ মনের ব্যাপার। দোষ মেয়েমানুষের ভালোবাসার নয়, তার মনের।

দুষ্মন্ত কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, তোমাকে যা বললাম, তা কিন্তু আমি বানিয়ে বলিনি। সবই আমার মনের কথা। আমাকে নিয়ে তোমার যে উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা, কষ্ট—সেও তোমার মনের।

জবাব দেবার মতো কোনো কথা আমি খুঁজে পেলাম না। বুকের গভীর থেকে দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে উচ্চারিত হল, মহারাজ, তোমার ভালোবাসায় আমি শুধু ধন্য হয়ে যাইনি, মনের আবরণ খুলে নিজেকে দেখতে শিখেছি। আমাদের দুটি হৃদয়ের তীব্র ভালোলাগা কিন্তু সকলের ভালোলাগার কথা নয়। সে দাবিও আমি করি না। তপোবনে আমাদের মেলামেশা নিয়ে তাই কথা হয়। খোলা আকাশের নীচে, প্রকৃতির মধ্যে নাক ডুবিয়ে জীবনকে ভালোবাসার এই তীব্র তাগিদ যত গভীর হোক লোকের কাছে তার কানাকড়ি মূল্য নেই। মেয়েমানুষের ভালোবাসা অনেক নিয়ম কানুনে বাঁধা। সমাজ

অনুমোদিত অনুশাসনের খোলা পথে হাতে হাত রেখে তাকে হাঁটতে হয়। আড়ালে-আবডালে লুকিয়ে চুরিয়ে যে প্রেম সে অবৈধ স্বেচ্ছাচার। আমার জনক-জননীর স্বেচ্ছাচার-ব্যাভিচারের মূল্য আমাকেই দিতে হয়েছে। জননীও ব্যর্থ প্রেমের জ্বালা নিয়ে দৌড়ে গিয়ে আছড়ে পড়তে পারে না ভালোবাসার মানুষের বুকে। মনের ভালোবাসার কোনো দাম নেই এই সংসারে।

দুষ্মন্তের মুখে বিস্ময়ের ভাবটা কাটেনি। আস্তে আস্তে বলল—প্রত্যেক মানুষের সব বিরোধ তো, হয় তার নিজের সঙ্গে, না হলে তার চারপাশের পরিবেশের সঙ্গে। এ ঝগড়া থামানোর জন্য আমাকে তুমি যা করতে বলো তাই করব।

সব কথা মুখে বলতে নেই। বললে, তার কোনো দাম থাকে না। তোমার তো সুন্দরী, বিদুষী, সমাজে প্রশংসিত স্ত্রী আছে। তুমি রাজা। সব কিছু তোমার শোভা পায়। প্রেম প্রেম খেলার বিলাস তোমাকেই মানায়। আমার মতে মন্দ ভাগ্য মেয়েরা চিরদিন তোমাদের খেলার সাথী। পিতা কণ্বের কাছে শুনেছি আমার জনকও একজন বিখ্যাত রাজা। তিনিও আমার অভাগিনী জননীর সঙ্গে প্রেম প্রেম খেলা করেছেন। তার ভালোবাসা কোন মূল্য পায়নি। ভালোবাসর স্মৃতি নিয়ে একটানা দীর্ঘ পথ চলা কষ্টকর বলেই পিতার মতো জননীও আমকে পথে ফেলে রেখে চলে গেল নিজের গন্তব্য পথে।

আমার মনের কথা বুঝতে দুষ্মন্তের কষ্ট হয়নি। মুহূর্ত দেরি না করে নামাঙ্কিত অঙ্গুরীয়টি হাত থেকে খুলে আমার আঙুলে পরিয়ে দিল।

বলল, সূর্য ওঠা নীল আকাশ, সবুজ বনানী, চিরপ্রবাহিনী মালিনীকে সাক্ষী রেখে নামাঙ্কিত এই অঙ্গুরীয় তোমার হাতে পরিয়ে দিলাম। এই মুহূর্ত থেকে আমরা আর প্রেমিক-প্রেমিকা নই, স্বামী-স্ত্রী। এই অঙ্গুরীয় আমাদের প্রেমের, বিশ্বাসের অভিজ্ঞান হয়ে থাকবে তোমার হাতে। ঐ আংটিই বলবে; রাজা দুষ্মন্ত খল নয়, ভন্ড নয়। তার প্রেমে কোনো মেকী ব্যাপার নেই। মিথ্যে নেই। গন্ধর্ব মতে বিবাহ তো সমাজ অনুমোদিত। প্রেমিক-প্রেমিকার বিশ্বাসের অভিজ্ঞানের জোরেই এই বিয়ে লোকে মেনে নেয়। আমার প্রেমের প্রতি তোমার শ্রদ্ধা ও পবিত্র বিশ্বাসের এই অভিজ্ঞান ধ্রুবতারার মতো চিরদিন আমাদের নিটোল প্রেমের পথনির্দেশক হয়ে থাকবে।

দুষ্মন্তের কথাগুলো সানাইয়ের মতো খুশির তরঙ্গ হয়ে আমার বুকের ভেতর বেজে গেল অনেকক্ষণ। আনন্দে বুকটা যখন দুষ্মন্তকে আঁকড়ে ধরতে যাচ্ছিল ঠিক তখনই দুষ্মন্ত বলল, রানী, এবার আমার বিদায় নেওয়ার পালা। রাজধানী থেকে ডাক এসেছে। আর তো থাকা সম্ভব হচ্ছে না। এবার আমাকে ছুটি দিতে হবে। মহামাত্য লোকজন রথ নিয়ে আমার কুটিরে অবস্থান করছে। তোমার অনুমতি না নিয়ে যাই কেমন করে? প্রিয়ে আমার, প্রিয়তমা আমার—যাওয়ার অনুমতি দিয়ে ধন্য কর।

বুকটা আমার ধক্ করে উঠল। থমথমে করুণ চোখ মেলে অবিশ্বাসের চোখে চেয়ে আছি। নিজেকে ভীষণ শূন্য এবং অসহায় লাগছে। ঠোঁট চেপে ধরে আমার ভেতরের অসহ্য কষ্টকে সংবরণ করছি। মনে হচ্ছিল, আমার পায়ের তলায় মাটি নেই, মাথার ওপর ছাদ নেই। আমি নিরাশ্রয়, অনাথা অবলম্বনহীন। চোখ ছাপিয়ে জল এল। ভিজে গলায় বললাম, তুমি চলে যাবে? তুমি গেলে আমি কী নিয়ে থাকব? আমাকে তোমার সঙ্গে নেবে না?

দুষ্মন্ত বলল, তুমি আমার রানী। চিরদিন আমার থাকবে। তোমাকে না হলে আমি বাঁচব কেমন করে? তুমি আমার জীবন মরণ। আমার সম্মান মর্যাদা। তোমাকে নিয়ে যাওয়ার তাই কিছু অসুবিধা আছে। পরে তোমাকে সসম্মানে নিয়ে যাব। আমার ওপর ভরসা রাখ। বিশ্বাস হারিয়ো না। আমি ফিরে আসবই।

দুষ্মন্ত সেই গেল, আর ফিরল না। প্রতিদিন প্রতীক্ষা করে থাকি। আর ভাবি, কাল নিশ্চয়ই আসবে। কিন্তু সে কাল আর এল না। সোমতীর্থ থেকে পিতা কণ্বমুনি ফিরলেন। তপোবনে না

থাকলেও সব খবরই রাখতেন। তপোবনে পা দিয়ে আমাকে ডেকে পাঠালেন। ভয়ে বুক শুকিয়ে গেল। দুরু দুরু বুকে তাঁর সামনে দাঁড়ালাম। প্রতি মুহূর্ত মনে হতে লাগল আশ্রমের পবিত্রতা রক্ষা করতে পিতা হয়তো তাড়িয়ে দেবেন। কার্যত কিছুই হল না! কেবল সময়টা ভারী পাথরের মতো আমার উৎকণ্ঠা, ভয়, দুর্ভাবনার সঙ্গে ঝুলে রইল। সেই ভয়ঙ্কর নৈঃশব্দে আমার বুকের মধ্যে হৃৎপিন্ডের ধ্বক ধ্বক শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম। যত দেরি হচ্ছিল, ততই শঙ্কা বাড়তে লাগল। বেশি করে মনে হতে লাগল, শীঘ্র ভয়ঙ্কর একটা কিছু ঘটবে। প্রতীক্ষার সময় পেরিয়ে গেলে ভীরু চোখ মেলে পিতার দিকে তাকালাম। এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখলাম। হাসি হাসি মুখ করে পিতা আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। বিভোর হয়ে আমার মধ্যে কী যে দেখছেন, তিনিই জানেন। কিন্তু তাঁর ঐ মুগ্ধ দৃষ্টির সামনে দাঁড়াতে আমার কেমন সংকোচ হল। লজ্জাও হল খুব। কোথা থেকে হঠাৎ এত লজ্জা এল। আমি নিজেও ভালো করে জানি না। নিজের অজান্তে পেটের ওপর কাপড় টেনে দিলাম। আর তাতেই আমাকে কান লাল হয়ে গরম হয়ে উঠল। মুঠো মুঠো আবির কে যেন মাখিয়ে দিল আমার মুখ। নিজেকে প্রশ্ন করি, পিতাকে লজ্জা পাওয়ার মতো কী এমন হল? মনের কথা মনই জানে।

একখানা হাত আমার কাঁধের ওপর রেখে পিতা বললেন, দুষ্মন্তের মতো মানুষকে স্বামী পাওয়া ভাগ্যের কথা। এমন সোনার টুকরো মানুষ হয় না। তোর পছন্দে যে কী খুশি হয়েছি মনই জানে। আমি চেষ্টা করে এত ভালো পাত্রের সঙ্গে বিয়ে দিতে পারতাম না। নিজের কাছের মানুষটাকে বেছে নেওয়া সবচেয়ে কঠিন কাজ। সেই কাজটা যখন সুসম্পন্ন করতে পেরেছ, তখন যে কোনো অবস্থার সঙ্গেই খাপ খাইয়ে নিতে পারবে। নিজেকে রক্ষা করার মতো শক্তি তোমার ভেতরে আছে। তোমার জীবনে আমার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে।

আর্ত স্বরে ডাকলাম, বাবা। তুমি কোনোদিন আমার জীবনে ফুরিয়ে যাবে না। যেতে পার না। তোমাকে না পেলে এ জীবনকে দেখতে চিনতে শেখাত কে? তুমি তো প্রকৃতির মধ্যে তোমাকে টেনে এনে জীবনকে চিনিয়েছ। আমার যা কিছু সব তো তোমার কাছ থেকে পাওয়া।

পাগলী মেয়ে। আমি তোকে কি-বা দিতে পেরেছি? দেবার মতো আমার আছেই বা কী? দুষ্মন্ত তোকে সব দিয়ে ভরিয়ে দেবে। অমন খাঁটি মানুষ হয় না।

বাবা, মানুষের জীবনে প্রত্যেকটি সম্পর্কই বোধহয় আলাদা। কেউ কারোরটা পূরণ করতে পারে না। কোনো সম্পর্কই সম্পূর্ণ নয়। সব সম্পর্কের অনুভূতির মধ্যে দিয়ে না গেলে জীবন পূর্ণ হয় না। পৃথক পৃথক মানুষের সংস্পর্শে এসেই তো নিজের মনের আর শরীরের ভেতর নব নব জগতকে আবিষ্কার করতে পারার ভেতর, বেঁচে থাকার ভেতর যে একটা অসীম আনন্দ আছে তাকে জানতে তাই কোনো পাওয়াই জীবনে শেষ হয় না।

দীর্ঘশ্বাস পড়ল পিতার। বিষণ্ণ বেদনায় কণ্ঠস্বর গাঢ় হলো। বললেন, তা ঠিক। বিয়ে হয়ে গেলে মেয়েকে স্বামীর ঘরে যেতে হয়। তখন তার ওপর পিতার কোনো অধিকার চলে না। বিয়ের পরে মেয়েরা পর হয়ে যায়। বাকি জীবনটায় সে শুধু সুখস্মৃতি হয়ে থাকে। তখন বড় ফাঁকা লাগে। যে মেয়েকে কেন্দ্র করে প্রতিদিনের জীবনটা ঘুরতো দিন রাতের চাকায় সে জীবনটা ঠিকই এগিয়ে চলে কিন্তু মনের টান, রক্তের সম্পর্ক একটু একটু করে মনের অগোচরে আলগা হয়ে আসে। একদিন পর হয়ে যায় সে। আমার সেই সুখের দিনটা হঠাৎ শেষ হয়ে গেল। এই তপোবন ছেড়ে যাওয়ার পর তোর জীবন থেকে আমরাও মুছে যাব। সাগরে যাওয়া নদী যে তুষারশুভ্র পাহাড়ের বিগলিত স্নেহধারা; সে কথা কি কেউ মনে রাখে?

বাবার কথাগুলো হৃদয়ের এত গভীর থেকে মমতায় উৎসারিত যে তাকে সান্ত্বনা দেবার ভাষা ছিল না আমার। এই অবস্থায় সব মেয়ের মতো আমিও বুকের মাঝখানে পরমযত্নে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলাম। বাবা দু চোখ বুজে আমার আলতো হাতখানা তাঁর বুকে চেপে ধরে আমার হৃদয়ের সব উত্তাপ, সব মমতাটুকু যেন নিঃশেষে শুষে নিয়ে ভরে উঠতে লাগল।

জীবন সম্পর্কে অদ্ভুত অদ্ভুত প্রশ্ন আমার মনকে প্রতিদিন ভাবাক্রান্ত করে তুলল। শৈশবে, বাল্যে

কোনো বাসনা ছিল না, স্বপ্ন ছিল না। প্রথমে তারুণ্যে মনে হল এ জীবন কত সম্ভাবনাময়। জীবনের বাঁকে বাঁকে কত বিস্ময়, কত প্রশ্ন,কত অভিজ্ঞতা, কত অনাবিষ্কৃত পৃথিবী যে আছে, তার খোঁজ তো কখনো পাইনি। তাই হয়তো আমার মনের রাজ্যে প্রতিদিন নতুন হয়ে ফুটে উঠতে লাগলাম। এই দুনিয়ার সব কিছুতে আমার বিস্ময়! আমার অচেনা, আমার কাছে নতুন।

দুষ্মন্তের সঙ্গে প্রণয়ের পর, তাকে ছাড়া আর কারো কথা মনে পড়ে না। মাত্র ক'দিনের সম্পর্ক তার সঙ্গে। এই ক'দিনেই তপোবনের যারা আমার খুব কাছের মানুষ, তাদের সঙ্গে নিজের অগোচরে বেশ খানিকটা দূরত্ব গড়ে ওঠেছে। মনের টানও যেন একটু আলগা হয়ে গেছে। এজন্য মনে মনে আমি নিজেকে প্রস্তুত করিনি। এই তপোবন ছেড়ে যাবার পর নতুন পরিবেশে, নতুন জায়গায়, অচেনা সব মানুষদের সঙ্গে আমার জীবনটা কী করে কাটবে, সেটাও আগে থেকে ঠিক করে রাখিনি। দুষ্মন্ত ঝড়ের মতো প্রবেশ করে আমার জীবনটা ওলোট-পালোট করে দিল। ভাবার অবসর দিল না। ঝড়ের বেগে আমাকে উড়িয়ে নিয়ে গেল।

এখন আমি দুষ্মন্তের স্ত্রী। একজন বিখ্যাত মানুষের সহধর্মিনী। এক বিশাল রাজ্যের রানী। আমার সেবা করার জন্য, আদেশ শোনার জন্য দাস-দাসী সব সময় প্রস্তুত। প্রজারা আমার দর্শন লাভের জন্য ব্যগ্র। রাজ্যের সকলে আমার কৃপায় ধন্য হতে চায়। এসব কথা মনে করতে বুক আমার গর্বে ফুলে উঠত।

এক ঋতু গিয়ে আর এক ঋতু আসে। তবু দুষ্মন্ত রাজধানী থেকে আমায় নিতে এল না। কাজের ব্যস্ততার ভেতর এত তাড়াতাড়ি ভুলে গেল? তার ঔদাসীন্যে আমি অপমান বোধ করলাম। আমার চেয়ে তার রাজকার্য বড় হল? প্রথম প্রথম ভীষণ অভিমান হত, কষ্ট লাগত। তারপর সন্দেহ হত। নিজেকেই প্রশ্ন করি তবে কি আমার সঙ্গে প্রেম প্রেম খেলা করে আমার বিশ্বাসকে ঠকাল? তখন আর কারো ওপরে নয়, নিজের ওপরে রাগ হত। মনে একটা সন্দেহের কাঁটা বিঁধে ছিল। সব সময় মনে হতো দুষ্মন্ত না এলে সত্যি আমার কী হবে? বনতোষিণীর গুঁড়িতে মাথা রেখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে একা অনেকক্ষণ ধরে কাঁদতাম। বৃষ্টির মত বড় বড় ফোঁটা গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ল। এক সময় কান্না থেমে গেল। নিজেকেই জিগ্যেস করি গন্ডগোলটা কোথায় হলো? কিসে ভুল হলো? জীবনে যেভাবে চলা উচিত ছিল তার চেয়ে বেশি নিজেকে দাবি করে ভুল করেছি। নিজের সে ভুলের দাম এখন আমাকেই দিতে হবে।

যতদিন যায় ভাবনা হয়। অনুশোচনা হয়। এখন আমি একা নই। আমার সমস্ত শরীরে এক অনাগত শিশুর আগমনের সব লক্ষণ ফুটে উঠেছে। উদ্বেগে দুর্ভাবনায় দিন কাটছে। দুষ্মন্তের প্রত্যাবর্তনের আশা আমি ছেড়ে দিয়েছি। সন্তানের ভবিষ্যৎ চিন্তা আমার কাছে বড় হল। কারণ, মায়েরা শুধু সন্তানের জন্যে বেঁচে থাকে।

পিতাও দিন দিন অসহিষ্ণু হয়ে পড়েছেন। তপোবান আমি এক নতুন সমস্যা। উদ্ভূত সংকটের স্রষ্টা আমি নিজে। তাই একটা অপরাধবোধ আমাকে অনুক্ষণ পীড়া দেয়। নিজেকে কিছুতে ক্ষমা করতে পারি না।

আমার ধারণা মুখে কেউ কিছু বলছে না, কিন্তু সকলে যেন আমাকে করুণা করছে। তাদের দু'চোখে বিরক্তি, ঘৃণা, অশ্রদ্ধা ফুটে বেরোচ্ছে। আমার দুর্ভাগ্যের জন্য আমি দায়ী। জেনে ভুল করার জন্য সহানুভূতির অযোগ্য হয়ে গেছি। অপরাধবোধ থেকেই হয় তো এরকম একটা মনগড়া ধারণা আমাকে কুরে কুরে খাচ্ছে। নিজের ওপর বিরক্তি জন্মে। মাঝে মাঝে মনে হয় মালিনীর জলে ঝাঁপ দিয়ে জীবনের জ্বালা জুড়োই। কী হবে এই ঘেন্নার জীবন? অপমান নিয়ে বেঁচে থেকে লাভ কী? পরক্ষণেই মনের পাল্টা প্রশ্ন, মরে কী সুখ? এরকম একটা অদ্ভুত ইচ্ছার কোনো মানে নেই। দুষ্মন্ত ফিরবে না বলেনি। কিন্তু এই মুহূর্তে এসে পৌঁছয়নি। ভবিষ্যতে, আসবে না, এরকম অনুমান করা ঠিক নয়। রাজ্যে কতরকমের কাজ। তার কত সমস্যা। একা রাজাকেই তা মেটাতে হয়। রাজকার্যে ব্যস্ত থাকার জন্য হয়তো ফুরসত হচ্ছে না। জীবন মানে তো বেঁচে থাকা। মানুষ বাঁচে শুধু নিজের জন্য নয়। পরের জন্য তার প্রেমের জন্য এবং সন্তানের জন্য। আমার গর্ভে

যে এসেছে সে আমার প্রেমের শতদল। তাকে তো অকালে নষ্ট করতে পারি না? কার ওপর রাগ করে আমার এত বড় সর্বনাশ করব? কেন করব? শুধু শুধু মরতে যাব কেন? অসময়ে মৃত্যু মানেই তো জীবনের অপচয়। এমনিতে বাজে খরচ যা হওয়ার তা তো হয়েই গেছে। অপচয় করে শুধু নিজেই নিঃশেষ হয়েছি। লাভ কিছুই হয়নি।

দিনদিন রাত আমার কাছে বিভীষিকা হয়ে উঠল। রাত মানেই একাকিত্ব। নিশ্ছিদ্র নিঃসঙ্গতা। রাতের অন্ধকার গুহা থেকে টুকরো টুকরো কথা, স্মৃতি, দুঃখ যন্ত্রণা, অভিমানের কীটগুলো বেরিয়ে এসে মস্তিষ্কের কোষে কোষে ছড়িয়ে পড়ে; ভুতুড়ে চোখ মেলে নিঃশব্দে চেয়ে থাকে। ছায়াছায়া ছবিগুলো চোখের ওপর ভাসে।

দুষ্মন্ত আমার স্বামী। কখনো কোনো খারাপ ব্যবহার করেনি আমার সঙ্গে। কিন্তু তপোবন থেকে চলে গিয়ে আমার সঙ্গে আর কোন সম্পর্ক রাখেনি। দূত পাঠিয়ে কোনোদিন খোঁজও করেনি আমার। এত অনাদর নিয়ে তার কাছে যেচে যাওয়া মন থেকে মেনে নিতে পারিনি। এভাবে গেলে আমার গৌরব বাড়বে না। রানীর মর্যাদা ভিক্ষে করে পাওয়ার জিনিস নয়। জোর করে স্বীকার করে নেওয়ার ব্যাপারও নয়। তাতে রানীর সম্ভ্রম শুধু ক্ষুণ্ণ হয়। রাজকীয় জাঁকজমকপূর্ণ শোভাযাত্রা বাদ দিয়ে রানীর আগমন রাজ্যের লোক ভাবতেই পারে না। রানী হলো রাজা ও রাজ্যের রাজমর্যাদার প্রতীক! সমাদর করে ঘরে না আনলে আদর থাকে না তার। ভালো করে রানীগিরিও করতে পার না। এরকম আশঙ্কা করে দুষ্মন্ত তপোবন থেকে রাজ্যে ফেরার সময় আমায় সঙ্গে নেয়নি। তার নির্দেশ ছাড়া সেখানে যাই কেমন করে? তাতে আমার কোনো সম্মান থাকবে না। রাজারও মানহানি হতে পারে। তাকে অপদস্থ করে কিছু পাওয়ার চেষ্টা করাও বিড়ম্বনা। আমাকে স্বীকার করা না করা তার মর্জি। পুরুষের মর্জির ওপরেই নারীদের ইজ্জত বাঁচে। সে মর্জি যদি দুষ্মন্তের না হয় তা হলে আমি কী করতে পারি? আংটি দেখিয়ে তাকে অপদস্থ করতে পারি কিন্তু তাতে স্ত্রী অধিকার তো পাব না। মাঝখান থেকে তার সহানুভূতি হারাব। জোর করে কোনো সম্পর্কই তৈরি হয় না।

একদিন পিতা কণ্বমুনি কিছু না ভেবেই বললেন, স্বামীর ঘর হলো মেয়েদের নিজের জায়গা। নিজের অধিকারে স্বামীর ঘরে ফেরা লজ্জার হলেও অপমানের নয়।

পিতার কথা শুনে রাগে-অভিমানে আমার বুক তোলপাড় করে ওঠল। ক্ষিপ্ত আক্রোশে বললাম, আমি তোমার তো একটা বোঝা। এই বোঝা বইবার মতো তোমার চওড়া কাঁধ আছে বলেই একদিন ঘাড়ে করে ঘরে তুলেছিলে। আজ আপদ ভেবে কাঁধ থেকে ঝেড়ে ফেলে মুক্ত হতে চাইছ কেন? আমি চলে গেলে তুমি বাঁচ। মুক্ত হলে তুমি আরো ভালভাবে নিজের কাজে মন দিতে পারে। রাগে-অভিমানে আমার কণ্ঠস্বর প্রায় বুজে গিয়েছিল।

অবাক বিস্ময়ে বাবা আমার দিকে স্তব্ধ হয়ে চেয়ে রইলেন বেশ কিছুক্ষণ। তারপর ধরা গলায় বললেন, আমার জীবনে তুই বোঝা, এ কথা বলতে পারলি? কোনো দিন আমার কাছে, কিংবা তপোবনের কারো কাছে সেরকম ইঙ্গিত কখনও পেয়েছিস? আশ্রমের সবাই তোর প্রতি সহানুভূতিশীল। তোর মন খারাপ দেখে তারা কষ্ট পায়। সব কথা তোকে বলে না—

দুঃখে, যন্ত্রণায়, অভিমানে, আত্মগ্লানিতে আমি প্রবলভাবে দুদিকে মাথা নাড়তে নাড়তে বললাম, না। তোমরা কেউ আমার সঙ্গে কখনো খারাপ ব্যবহার করনি। সব আমার মনগড়া। নিজের মনের কাছে আমি অপরাধী। আমার সব ঝগড়া তার সঙ্গে। এই তপোবনের সকলের সঙ্গে আমি বিশ্বাসঘাতকতা করেছি। আমি নীতি মেনে চলেনি। নিজের ইচ্ছেয় চলেছি। আজ আমি একা হয়ে গেছি। এই তপোবনের কোনো কাজে লাগলাম না। শুধু শুধু তপোবনের সংকট বাড়িয়ে তুলেছি। আমার জীবন থেকে তপোবনের সব প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে।

পিতা ভুরু কুঁচকে বলল, এসব উল্টোপাল্টা যুক্তিহীন কথার কোনো মূল্য নেই। প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে, এটা তুই কী বলছিস? এটা একটা বিশ্রী শব্দ। প্রয়োজনের বাইরে স্নেহ ভালোবাসা মায়া-মমতা নামে একটা ব্যাপার আছে। আমি মনে করি কারো জীবন থেকে এটা ফুরিয়ে যায় না কোনো দিন।

তা হলে আমি দুষ্মন্তের জীবনে ফুরিয়ে গেলাম কেন? বিশ্রামের প্রয়োজন মেটাতে আমার সঙ্গে ভালোবাসার অভিনয় করল কেন? আমার সরল বিশ্বাসকে সে ঠকাল কেন? একে প্রয়োজন ছাড়া কী বলব?

বাবা আমাকে ধমক দিয়ে বললেন তোমার মাথায় এসব কে ঢুকিয়েছে? তুমি আগে কখনো যুক্তিহীন ছিলে না। আমি বুঝতে পারছি, তোমার মনটা ভালো যাচ্ছে না। দুষ্মন্তের রাজ্যে তোমাকে পাঠানোর—

বাবা, ওর কাছে আমাকে তুমি ফিরে যেতে বলো না। আমি যাব না। ওর কাছে যেচে যাওয়াটা অপমানকর। আত্মসম্মান গেলে জীবনের আর কী থাকল? মাথা হেঁট করে গেলে তার কাছে কোনো সমাদর থাকবে না। এর চেয়ে মৃত্যু ভালো।

এ কথা বলা তোমার মানায় না। স্ত্রীর সম্মান থেকে তোমায় সে বঞ্চিত করেনি। তার অভিজ্ঞান এখনও তোমার হাতে। ওটাই তোমার পরিচয়, তোমার অধিকারের পাঞ্জা।

বাবা, রাজাদের যেখানে সেখানে এমন আসুরিক বিবাহ করতে বাধা নেই। একটা সঙ্গিনী পাওয়ার জন্য তারা বিয়ে করে। সম্মান বাঁচানোর জন্য একটা অভিজ্ঞান দিয়ে যায়। ওর কোনো মূল্যই নেই। কিছুদিন পরে চিরকালের জন্য ভুলে যাওয়া নতুন ঘটনা নয়। নামহীন, গোত্রহীন, অখ্যাত বনবালার প্রেমের মূল্য দিতে, তাকে ধন্য করতে; নিজের খ্যাতি, প্রতিষ্ঠা, সম্মান তুচ্ছ করে সারা জীবন তার সঙ্গে নিজেকে জড়াবে কেন? মেয়েদেব দুঃখ দুর্ভাগ্যের কথা কে কবে ভেবেছে? মেয়েদের মনের মূল্য কোন্ পুরুষ কবে দিয়েছে? মেয়েরা তাদের দুর্দিনের সঙ্গিনী বই তো কিছু নয়। এখন যেমন করে জীবনটাকে বুঝি এরকম করে আগে বুঝতে শিখলে আপসোস করতে হত না।

বাবা আমার মুখের দিকে অবাক বিস্ময়ে চেয়ে রইলেন। মুখে তাঁর কথা ছিল না। তাঁকে চুপ করে থাকতে দেখে বললাম, বাবা, তুমি অমন করে আমার চোখের মণিতে কী দেখছ? আমি তো কোনো অন্যায় করিনি। প্রেম করাকে কেউ পাপ বলে? দুষ্মন্তর আংটির স্মৃতি বুকে নিয়ে আমি তার প্রতীক্ষায় থাকব। এই আংটি দুষ্মন্তের প্রেম। আমার ওপর তার গভীর বিশ্বাস। এই আংটির প্রতি বিশ্বাস, শ্রদ্ধা এবং আস্থা পরীক্ষা করতেই হয়তো বিধাতা আমার জীবনে এই সংকট ডেকে এনেছেন। আমার চারপাশের সুহৃৎজনের সংশয়, অবিশ্বাসে আমার মন দুর্বল হয়ে পড়ছে। মনের ভেতর ঝড়ের তান্ডব চলেছে। বাইরে খেকে পাছে কেউ টের পায় তাই বড় গলা করে প্রেমের বড়াই করি, বিশ্বাসের জোর দেখিয়ে নিজেকে সান্ত্বনা দিই। অশান্ত মনকে শান্ত করি। একজন মেয়ে হয়ে এ ছাড়া আমি কী বা করতে পারি? দুর্ভাগ্য, মেয়েমানুষ আজও মানুষ হয়ে উঠল না। পুরুষের অনুগ্রহ, কৃপা পাওয়ার জন্য ধৈর্য ধরে সারাজীবন তাদের অপেক্ষা করতে হয়। বাবা, মেয়েমানুষেরও মন বলে যে জিনিস আছে, কেউ চেয়ে দেখল না। সৎ এবং শক্ত থাকার জন্য পরিবেশের সঙ্গে নিজের সঙ্গে তাকে অহরহ লড়াই করতে হয়। তার বাঁচার গৌরব, পুরুষের কৃপা ও অনুগ্রহে ধন্য হওয়ায় মহিমার তলায় চাপা পড়ে যায়। ব্যাক্তিত্বের জোরে, মনের সাহসে, সংগ্রামের শক্তিতে, প্রবল আত্মবিশ্বাসে একজন মেয়েমানুষও যে পুরুষের সমান হতে পারে সে মর্যাদা কোনোদিন পেল না সে। ফলে মেয়েমানুষ থেকে মানুষ হয়ে ওঠা হলো না তার। দুষ্মন্ত যতদিন না প্রাপ্য মর্যাদা দিয়ে আমাকে ঘরে নিয়ে যাচ্ছে ততদিন তোমাদের কারো কথা শুনে সেখানে যাব না।

তারপরেই হাউ হাউ করে কেঁদে ফেললাম। অপমানটা এতো গভীরভাবে মনে বেজেছিল যে একটা চকিত বিদ্ধ ব্যথা আর শূন্যতাবোধ হঠাৎ কান্না হয়ে বেরিয়ে এল। এই কান্না মেয়োমানুষের অক্ষমতাজনিত অসহায়তা বোধ থেকে উদ্গত। কান্নায় গলার স্বর আটকে গেল। ফুঁপিয়ে ওঠা কান্নার আক্ষেপে শরীরটা আবর্তিত হলো। কান্নাজড়ানো অস্ফুট স্বরে বললাম, আমি, একেবারে একা হয়ে গেলাম। গর্ব করে বলার কিছু থাকল না আমার। অথচ আমি রাজার গৃহিণী, কিন্তু রানীর অধিকার, মর্যাদা আমার নেই। আমি রাজার সন্তানের গর্ভধারিণী, তবু আমার সন্তান কোনো দিন ওর দাবিদার হবে না। স্বামীর সম্মান, যশ, মর্যাদা, খ্যাতিতে আমারও কোনো অংশ নেই। আমার প্রয়োজনটাই

ফুরিয়ে গেছে দুষ্মন্তের কাছে। আমার বেঁচে থাকা, না থাকারও কোনো মানে নেই। আমি একেবারেই একা।

আচার্য কণ্বমুনি সহানুভূতি দেখাতে আমাকে বুকে টেনে নিলেন না। অন্য সময়ের মতো প্রাণ তাঁর মমতায় বিগলিত হল না। অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে চুপ করে আছেন। হাতের শিরাগুলো তাঁর ফুলে উঠেছিল। তীব্র উত্তেজনায় পেশী শক্ত ও কঠিন হল। তারপর ভারাক্রান্ত গম্ভীর গলায় বলল, এটাই যদি তোমার মর্যাদা প্রাপ্তির দাবি হয়, তা হলে আমার কিছু বলার নেই। তোমার মন যা চায়, তাই কর। আমি তোব করব না। আত্মসম্মান জ্ঞান আর ভিক্ষে চাওয়া দুটো এক জিনিস নয়। ভিক্ষে চেয়ে করুণা পাওয়া যায়, কিন্তু সম্মান মেলে না। আমিও চাই নিজেকে তুমি সসম্মানে প্রতিষ্ঠা কর। কে কি বলল; সেই ভয়ে তোমার জীবন নষ্ট কর না। তোমার জীবনটা তোমার কাছে তো দামী। নিজেকে ঠকাবে কেন? ভগবান তোমার সহায় হোন্।

বাবা কথাগুলো আমাকে ছুঁয়ে গেল। আমার যে কী আনন্দ হলো তা ভাষায় বর্ণনা করতে পারব না। পিতার ওপর আমার শ্রদ্ধা বেড়ে গেল।

বাবার ঘরে একা এসেছিলাম। নির্জনতা মানেই একাকিত্ব। একা থাকলেই অদ্ভুত চিন্তাগুলো অন্ধকারের জরায়ু থেকে বেরিয়ে এসে ভুতুড়ে চোখে ভয়.লাগানো চমক নিয়ে চেয়ে থাকে অনিমেষ। মনের মধ্যে প্রিয়ংবদার তিরস্কার ঝংকার বাজতে থাকে। কল্পনায় ওকে আমি দেখছিলাম। বাজে কথা বলবি না। নারী পুরুষের চোখের দেখায় একটু ভালো লাগলে কিংবা দু'চারটের কথায় ভাব জমলে তাকে প্রেম বলে না। চোখের নেশা আর মনের মোহকে প্রেম বলে না। ওটা শরীরের খিদে। কত বলেছি, পুরুষেরা সুস্থভাবে কোনো সুন্দর কিছুই পেতে শেখেনি জীবনে। শরীরের মধ্যে টেনে না এনে তার প্রেম, ভালোবাসা ভালোলাগা কিছুই বোঝাতে পারে না। ওদের মন ভোলোনো কথায় গলে গিয়ে যে মেয়ে উজাড় করে সঁপে দেয় নিজেকে, তার দাম পুরুষের কাছে তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে যায়। ভীষণ সস্তা হয়ে যায় সে। দুষ্মন্তের খিদের পাতে নিজের সব দিয়ে কোন্ রাজ-ঐশ্বর্য তুই পেয়েছিস? তোর নিজের জীবনের দামই বা কী রইল? এখন বাকি জীবনটা নিয়ে তুই কী করবি?

প্রিয়ংবদার কথার মধ্যে তিক্ততা ছিল, কিন্তু মিথ্যে ছিল না। তার কথার উত্তরে কী বলেছিলাম মনে নেই। দুষ্মন্ত আমাকে যথাযথ মর্যাদা দেয়নি বলেই ওর ওপর প্রিয়ংবদার রাগ। রাগে গরগর করতে করতে বলল, দুষ্মন্ত পুরুষ। তার কোনো হারানোর ভয় নেই। বাঘের মতো আশ মিটিয়ে পেট পুরে খেয়ে তৃপ্ত হয়ে চলে যাওয়া হল তার ধর্ম। ভুলেও পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখে না। দুষ্মন্তের তাই প্রতীক্ষার কোনো জ্বালা ভোগ করতে হচ্ছে না। নির্বিকার চিত্তে নিজের রাজ্যে গিয়ে সব ভুলে নিশ্চিন্তে রাজকার্য করছে। সেখানে তার কোনো একাকিত্ব নেই। জীবনটাকেও বোঝা মনে হয় না। দিব্যি আছে। আর তুই?

প্রিয়ংবদার অভিযোগ কানে আর শুনতে পাচ্ছিলাম না। দু'কানে আঙুলে চাপা দিয়ে আর্ত যন্ত্রণায় মাথা নাড়তে লাগলাম। কাঁদ কাঁদ গলায় বললাম, চুপ কর। আমি দিন রাত তোর অভিযোগ আর সহ্য করতে পারছি না।

প্রিয়ংবদা আমার কোনো আপত্তিই গ্রাহ্য করল না। আমার মনকে আর্ত করে তোলার জন্য বলল, তুই তো তাকে ভালোবেসেছিলি। কোনো ক্ষতি করিসনি তার। দেশে, সমাজে সে গণমান্য ব্যাক্তি। স্ত্রী বলে তোর সঙ্গে যদি একটা আলাদা সম্পর্ক রাখতো তাতে কী ক্ষতি ছিল হত তার? কিন্তু সে তা করল না। সে তোকে বিয়ে করেছিল ভালাবেসে নয়. একজন নারী হিসাবে। বিনোদনের সাথী হিসেবে।

কাতর গলায় বললাম, প্রিয়ংবদা এসব কথা বলে লাভ নেই। ঢিল একবার ছোঁড়া হলে তাকে ফিরিয়ে নেওয়া যায় না। অঘটন যা ঘটার ঘটেছে। আমিও বুঝি আমার ইচ্ছে, আকাঙ্খার সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে শুধু আপস করছি একটা অঙ্গুরীয় দিয়ে। কিন্তু অঙ্গুরীয়ের মর্যাদা রাখতে কোনো দায়িত্ব নিল না সে! স্বামীর কোনো কর্তব্য করল না। সত্যি তো. তার সঙ্গে আমার সম্পর্ক কী?

মনটাকে আস্তে আস্তে শক্ত করে আশ্রমেই থেকে গেলাম।

কয়েকমাস পরে আমার সর্বদমন হল। ছেলেটার চেহারা বটে একখানা। আগুনের মতো রঙ। দেহের গড়ন, চোখ, নাক, কান, চিবুক, ভুরু সব দুষ্মন্তের মতো। তার ভেতর আমি দুষ্মন্তকে দেখি। সদ্যোজাত সর্বদমনকে কোলে নিতে হঠাৎই কেমন একটা নতুন অনুভূতি হল। আমার পঞ্চেন্দ্রিয়ের ঘরে ঘরে আলো জ্বলে উঠল। পুজোর ঘন্টা বেজে উঠল। বাঁশি বাজতে লাগল মন যমুনায়।

বড় আশ্চর্য লাগে; যে দুষ্মন্ত ছিল আমার দেবতা, আমার ধ্রুবতারা, আমার জীবনসর্বস্ব, আমার সবচেয়ে কাছের মানুষ বিদায় নিয়ে চলে যাওয়ার পরেও তার নামটি অবচেতনের গভীর থেকে মন্ত্রোচ্চারণের মতো করে গভীর এক ভালোলাগার আবেশে উচ্চারণ করেছি বারবার। সেই মানুষটির অভাব সর্বদমনকে পেয়ে ভরে গেল। নিজের অজান্তে কোথায় যেন হারিয়ে গেল সে। ভুলেও মনে পড়ে না তার নাম। আশ্চর্য মানুষের মন!

সর্বদমনের দুরন্তপনা সব কিছু ছাপিয়ে গেল। তার মধ্যে আমি হারিয়ে গেলাম। আমার আর কোনো শূন্যতা নেই। আমি একাও নই। আমার মনের ভেতর যে বরফাবৃত একটা মহাদেশ আছে তা আমি জানতাম না। সর্বদমন হওয়ার পরে বাৎসল্যের তাপে তা একটু একটু করে গলতে লাগল। সেই বরফগলা জল রোদভরা পাহাড়ের গা ঘেঁষে নদী হয়ে বেরিয়ে পড়ল সাগরের খোঁজে। কী দারুণ সে মুক্তির উল্লাস। নিজের মনের ভেতর স্নায়ুর ভেতরে রোজই নবনব জগৎকে আবিষ্কার করা যে কী অসীম আনন্দের ব্যাপার সে শুধু নতুন মায়েরাই জানে। মনের সেই আনন্দনিকেতনে শরীরের গন্ধলোভী দুষ্মন্তেরা কোনোদিন যেতে পারবে না। দুষ্মন্তের জন্য তাই খুব দুঃখ হয়। মন খারাপ করে দেওয়া কান্নার শব্দের মতো বিষণ্ণ আপসোস আর হতাশার দীর্ঘশ্বাস মর্মরিত হয় আমার বুকের ভেতর। সর্বদমন আমার স্নেহচ্ছায়ায়, শশীকলার মতো বেড়ে উঠতে লাগল। শৈশব থেকে বাল্যে, কৈশোর, তারুণ্যে পদার্পণ করল। সে যে দুষ্মন্তের শরীর ও সত্তার অনেকখানি একথা কোনোদিন বুঝতে দেইনি তাকে।

মনের ভেতর তাকে হারানোর একটা ভয় সব সময় ছিল। দুষ্মন্তের নাম পর্যন্ত আর সামনে উচ্চারণ করতাম না। সর্বদমনের সঙ্গে দুষ্মন্তের সম্পর্কটা পাছে জানাজানি হয়, ছেলে বাপের কাছে যেতে চায় তাই সব সময় সতর্ক থাকতে হত। অনাথ ছেলেদের ভেতরে সে আছে বলেই পিতা সম্পর্কে কোনো কৌতূহল নেই। মা ছাড়া কাউকে জানে না সে। মা তার জীবনের সব। কিন্তু চিরকাল তো সে ছোট থাকবে না। রাজার ছেলের মতোই তাকে মানুষ করতে হবে। সব বিদ্যায় পারদর্শী করে তোলার জন্য গুরুগৃহে পাঠাতে হবে। তখন পাঁচটা ছেলের সঙ্গে মিশলে কী হবে ভেবে দিশাহারা হয়ে যাই। কেন যে নিজের সঙ্গে এমন লুকোচুরি খেলি নিজেও জানি না। প্রবোধ দেওয়ার জন্য নিজেকে বোঝাই; চোর যদি ইচ্ছে করে ধরা দেয় তাহলে মজা থাকে না। ইচ্ছে করলেই যখন ধরা দিতে পারি, এভাবে যতদিন চলে চলুক। ধরা পড়ে গেলে তো দোষ নেই।

কষ্টের জীবনে নিত্য সঙ্গী শুধু ভয়। ভয় দুষ্মন্তকে। আমার পর্ণকুটিরের দুয়ারে এসে হঠাৎ ছেলেকে দাবি করলে কী বলে ফেরাব তাকে? পিতার কাছে পুত্রের যাওয়াকে ঠেকিয়ে রাখব কিসের জোরে? সন্তানের ওপর মায়ের জোর কতটুকু? তাই, সর্বদমনকে হারানোর ভয়ে মরে থাকি অনুক্ষণ। দুষ্মন্তের কানে খবর গেলে সর্বদমনকে আমার কাছে ধরে রাখার কোনো উপায় থাকবে না। এই উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা নিয়ে সর্বদমনের সঙ্গে আমার দিন কাটে। আমি চাই, দুষ্মন্ত আমাকে সত্যি ভুলে যাক। চিরকালের জন্যে ভুলে গিয়ে রাজকার্য নিয়ে থাকুক। কোনোদিন আমার কথা তার মনে না পড়ে যেন। সেই হবে, আমার প্রতি ঈশ্বরের করুণার সবচেয়ে বড় প্রমাণ।

ঈশ্বর আমার সে আশায় বাদ সাধল। ষোলো বছর পরে দুষ্মন্তের হঠাৎ আমাকে মনে পড়ল। রাজকার্য ফেলে আমার অন্বেষণে তাকে তো এ আশ্রমে আসতে বলিনি? তবু সে এলো কেন? কে চেয়েছিল তার এই অযাচিত করুণা? বেশ তো ছিলাম হঠাৎ এসে সে আমার সব গন্ডগোল করে দিল। কী করব এখন? কতদিন আর লুকিয়ে বেড়াব? দেখা না করে ক'দিন ঠেকিয়ে রাখব তাকে? সর্বদমনের সঙ্গে নাকি তার মান-অভিমানের খেলা চলছে। বহুকাল পরে ছেলে বাবাকে

পেয়েছে—এ তো হবেই। দুষ্মন্তে এখন যে কোনো দিনই সর্বদমনকে নিয়ে যেতে পারে। তখন আমার কী করা উচিত? কার কাছে যাব?

পিতা কণ্বমুনিও চাইবেন না দুষ্মন্তকে ফিরিয়ে দিতে। অনেকদিন ধরে বলেছেন, সর্বদমনকে পিতার কাছে পাঠাতে। স্বার্থপরের মতো নিজের কাছে রাখার কোনো অধিকার নাকি আমার নেই। ছেলেকে লালন-পালন করা মায়ের কর্তব্য। সেই কর্তব্যের জোর খাটিয়ে স্বামীর ওপর অভিমান করে পুত্রকে পিতার কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া পাপ। কিন্তু পিতা হয়ে সে সন্তান পালনের দায়িত্বের কিছুমাত্র ভাগ নিল না, সন্তানের খোঁজ-খবর করল না, তার প্রতি কোনো টান অনুভব করল না, তার বিবেকহীনতাকে, কাণ্ডজ্ঞানহীনতাকে কেউ নিন্দাও করল না। আশ্চর্য মানুষের নৈতিক বিচারবোধ? সর্বদমন পিতাকে কোনো দিন কাছে পায়নি, তার সঙ্গে কোনো সম্পর্কও গড়ে ওঠেনি। তবু নিষ্ঠুর দৈত্যের মতো মার বুক থেকে সন্তানকে কেড়ে নিতে দুষ্মন্ত আমার পর্ণকুটিরের সামনে ভিখিরির মত দাঁড়াল। মুখের ওপর তাকে 'না' বলার জোর আমার নেই। কিন্তু সর্বদমনকে তার হাতে তুলে দিতে বুকে ভেঙে যাবে। সমাজ, অনুশাসন কোনোদিন মায়েদের মনের কথা শোনেনি। তাদের মন বলে যে একটা জিনিস আছে কেউ চেয়ে দেখল না কোনকালে। পেটের সন্তানও না। কিন্তু সর্বদমন কি তাদের মতো হবে? হতভাগিনী মাকে নিঃস্ব রিক্ত করে কি চিরকালের জন্য এ আশ্রম ছেড়ে চলে যাবে? একবারও কি আমার কথা ভাববে না? গভীর বিষণ্ণতায় স্তব্ধ হয়ে শুয়ে রইলাম নিজের শয্যায়।

ষোলো বছর পরে দুষ্মন্ত তপোবনে আবার ফিরল। তার প্রত্যাবর্তনের সংবাদ অনসূয়ার মুখে শুনে মনে হলো, আমি ভুল শুনছি। বিশ্বাস করতে পারছিলাম না বাস্তব সত্যকে। ষোলো বছরের ভেতর যার একবারও সন্ধান নেওয়ার সময় হয়নি হঠাৎ সে তার সন্ধান নিতে এল কোন্ খেয়াল? একে তার মনের পরিবর্তন বলে ভাবার কোনো কারণ নেই। তবে মনের অয়নপথ বড় বিচিত্র। কোন্ পরিবর্তন কখন হঠাৎ হয়ে যায় মনও জানে না। আমার প্রতি ভালোবাসার টানে ফিরছে একথা বিশ্বাস করি না। তার অন্য স্ত্রীদের সঙ্গে সমঝোতা করে আমাকে নিয়ে যেতে কি তার ষোলো বছর সময় লাগল?

সময় বড় সাংঘাতিক! সে আস্তে চলে না, থেমেও থাকে না। সময়ে সময় না রাখলে, সময় পায়ে দলে চলে যায়। সময়ের মধ্যে না ফিরলে সে ফেরা অর্থহীন হয়ে যায়। এই যে আমার জীবনের ষোলোটা বসন্ত ব্যর্থ হয়ে গেল, তাকে দুষ্মন্ত কোনো দিন ফিরিয়ে দিতে পারবে কি?

সময় বড় সাংঘাতিক! সে আস্তে চলে না, থেমেও থাকে না। সময় না রাখলে, সময় পায়ে দলে চলে যায়। সময়ের মধ্যে না ফিরলে সে ফেরা অর্থহীন হয়ে যায়। এই যে আমার জীবনের ষোলোটা বসন্ত ব্যর্থ হয়ে গেল, তাকে দুষ্মন্ত কোনো দিন ফিরিয়ে দিতে পারবে কি?

আমার জীবনে প্রতিটি প্রাপ্তির জন্য অনেক মূল্য দিতে হয়েছে। অবশ্য বিনামুল্যে ধুলোকণা পর্যন্ত পাওয়া যায় না। প্রেম, ভালোবাসা, মান, সম্মান তো দূরের কথা। অযাচিতভাবে দুষ্মন্তকে আমি পেয়েছি! তাকে পাওয়ার জন্য আমাকে কিছু করতে হয়নি। তাই বোধহয় একটা বিরাট জীবন হাতের আঁজলা গলে গড়িয়ে গেল। সেই জন্য দুষ্মন্তকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। আমার কৃতকর্মের ফল তো আমাকেই ভোগ করতে হবে। মন খারাপ করে দেওয়া কান্নার শব্দের মতো বিষণ্ণ আপসোসে আমার দম বন্ধ হয়ে এল।

সর্বদমনের কথা :

মা, আমি তোমার সর্বদমন। ক'দিন ধরে দেখছি তুমি ভীষণ উদাসীন। কোনো কিছুতে তোমার মন নেই। বেশ বোঝা যায়, তুমি শান্তিতে নেই। তোমার মনে সুখ নেই। তুমি বড় বিব্রত। বিপন্ন। হঠাৎ তোমার কী হলো মা?

আমার প্রতি তোমার একটুও লক্ষ্য নেই। আমি কী করছি, কোথায় আছি, কখন খাচ্ছি, কী খাচ্ছি, কীভাবে আমার দিন-রাত কাটছে তার কোনো খোঁজ তুমি কর না, প্রশ্ন করে জানতে চাও না। কেন? আমি কী করেছি তোমার? তুমি তো এতো নিষ্ঠুর ছিলে না। হঠাৎ, তোমার পরিবর্তন হলো কেন?

আমার ষোলো বছরের জীবনে কোনো কিছুর অভাব নেই। তোমার বুকভরা আদর, স্নেহ, ভালোবাসা আমি পেয়েছি। যখন যা আব্দার করেছি, তুমি দিয়েছ। আজ, তুমি এমন করে মুখ ফিরিয়ে আছ কেন? তোমার কী হয়েছে মা? আমি তোমার ছেলে। ছেলের কাছে মায়ের কোন লজ্জা থাকে না। একথা তুমি কতবার বলেছ। এমন কী হলো যে, আমাকে বলতে লজ্জা পাচ্ছ? লজ্জা পাওয়ার মতো কোনো কাজ তুমি করতে পার না। তাহলে, তোমার কিসের ভয়? আমার কাছে তোমার লজ্জা বা ভয় পাওয়ার কোনো কারণ ঘটেনি। মিছিমিছি তুমি আমার কাছ থেকে নিজেকে লুকোচ্ছ। কী দরকার এভাবে তোমার কষ্ট পাওয়ার?

আমাকে তুমি একটুও ভালোবাস না। ক'দিন হলো আমার নাম পর্যন্ত তুমি উচ্চারণ করনি। ভুলেও, তোমার মুখে আমার নাম শুনিনি। অথচ তোমার মুখে এ ডাকটা শোনার জন্যে কী অনন্ত তৃষ্ণা নিয়ে আকুল হয়ে থাকি। তবু, তোমার ডাক এসে পৌঁছোল না। আমার প্রতীক্ষা ব্যর্থ হয়, প্রত্যাশা মিথ্যে হয়ে যায়। বুকটা আমার হাহাকার করে। অভিমান চোখ ভরে জল আসে। আমার মনের কথা যদি শুনতে না পাও তা-হলে তুমি কেমন মা? অথচ, একটি মুহূর্ত তুমি আমাকে চোখের আড়াল করতে পার না। রাতারাতি এত বদলে গেলে কী করে?

তোমার মন খারাপ করা বিষণ্ণ স্তব্ধতা আমি চোখে দেখতে পারি না। আমারও যে ভীষণ কষ্ট হয়, এটা বোঝার অনুভূতি তোমার কোথায় গেল? পৃথিবীতে তুমি ছাড়া আমার কেউ নেই। জ্ঞান হওয়া থেকে তোমাকে ছাড়া কাউকে জানি না। চিনি না। তুমি আমার ধ্যান, জ্ঞান। আমার দেবী, আমার আত্মা। তুমি ছাড়া আমার কোনো অস্তিত্বই নেই। তুমিও সে কথা জান। তবু, আমার মন, ইচ্ছে, আকাঙ্ক্ষাকে একটু বোঝ না। তোমার বুকে এই ঝড় উঠল কেন?

আমি আর ছোট নেই। ষোলো বছর বয়সে তোমার মনকে বোঝার বোধ হয়েছে আমার। মহারাজ দুষ্মন্ত এ আশ্রমে পা দেওয়া থেকে তুমি বদলে গেছ। তার উপস্থিতি তোমার স্বস্তি কেড়ে নিয়েছে। একজন মানুষের আগমনে তুমি এত বদলে গেলে কেন? ঐ মানুষটাকে তোমার এত ভয় কেন? ওঁর সঙ্গে তোমার সম্পর্ক কী? তুমি কি ওঁকে চেন? ওঁর সঙ্গে তোমার কোনো পূর্ব-পরিচয় আছে? সে জন্যেই কি ওঁকে দেখা থেকে ভয়ে সিঁটিয়ে আছ? একটা কিছু হারানোর ভয়ে বিব্রত। মা-গো তোমার হারানোর কোনো ভয় নেই। তোমাকে ছেড়ে কোথাও গিয়ে আমি শান্তি পাব না।

আমার শ্বাস-প্রশ্বাসের ভেতর, তোমার বুকের লুকনো ব্যথা আমি টের পাই। সে কথা জানার ইচ্ছে আর ঔৎসুক্য কতবার আকুল করেছে আমাকে। তোমার মতো নরম মনের মানুষের পাছে ব্যথা লাগে কোথাও, তাই কোনোদিন জানতে চাইনি কে আমার বাবা? কোথায় থাকেন তিনি? তোমার মনে কষ্ট দিয়ে তাঁর সুখ কী? তাঁর কাছে আমার অপরাধ কী? আমাকে পিতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত করলেন কেন? তোমাকেই বা প্রাপ্য মর্যাদা কেন দিলেন না? শুধু তোমার কথা ভেবেই মুখ ফুটে কোনো কথা জিগ্যেস করা হলনা। মনের কথা মনেই রয়ে গেল। তোমার জীবনস্রোতের সঙ্গে নিজেকে ভাসিয়ে দিয়ে নির্ভয়ে চলেছি। প্রত্যেক মানুষ পিতৃপরিচয়, বংশপরিচয় নিয়ে সমাজে বেঁচে থাকে। কিন্তু তুমি আমাকে অন্য কথা শিখিয়েছে। প্রত্যেক মানুষকে মানুষ হয়ে উঠতে হলে তার নিজস্ব পরিচয় তৈরি করে নিতে হয়। সেটাই তার প্রকৃত পরিচয়। সেই পরিচয়টাই বেঁচে থাকে। নিজের পরিচয় নিয়ে বেঁচে থাকার মতো গর্ব-সুখ আর কিছুতেই নেই। মা তোমার কথাগুলো

আমার কানের পর্দায় অহরহ ঝঙ্কৃত হয়। পৃথিবীর কোনো শক্তিই একজনের সত্যকারের প্রকাশকে দমন করতে পারে না, যদি সে নিজে নষ্ট না করে। ভেতরের শক্তির জোরেই ঝরনা কত পাহাড় ভেঙে নদী হয়ে সাগের মিশছে। শক্ত মাটির আবরণ ভেঙে বীজ অঙ্কুরিত হচ্ছে। কচি কচি দূর্বাঘাস হরিণ শিশুতে মুড়িয়ে দিচ্ছে, কিন্তু আবার নবীন হয়ে উঠছে। কোনো প্রকাশকেই দমিয়ে রাখতে পারে না বাইরের বাধা। তেমনি আমাকে কোনো কিছুতে দমিয়ে রাখুক তুমি চাও নি বলে সর্বদমন নাম দিয়েছ। মা গো, তোমার সে আকাঙ্খার কথা ভুলিনি।

প্রত্যেক মানুষ স্বয়ংসম্পূর্ণ। এই পৃথিবীতে সব মানুষ নিজের মধ্যে একা এবং পূর্ণ। সেই পূর্ণতার সন্ধান করে বেড়াচ্ছে সে। মুনি দাদুর ভাষায় জীবনটা নদীর মোহনার মতো। চারদিক্ থেকে নানা ঘটনার স্রোত এসে মিশছে। সকলকে নদী বুকে করে যেমন উন্মত্ত উৎসারে ছুটে চলে সাগরের দিকে তেমনি সব কিছুর মধ্যে দিয়ে নিজেকে না নিয়ে গেলে জীবন পূর্ণ হয় না। বাধা-বিপত্তি কাটিয়ে সবাই চায় নিজেকে মেলে ধরতে। বিস্তৃত করতে। উদার আকাশ সেও সীমানা হারিয়ে ফেলেই যেন সুখী, সমুদ্রও বিপুল হর্ষে, উন্মত্ত উচ্ছ্বাসে যতদূর খুশি চলে যায়, বনস্পতিও এককালে বাইরের উপদ্রব এবং বাধা কাটিয়ে নিজের প্রাণশক্তি জোরে সগর্বে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে শুধু নয়, অন্যদেরও আশ্রয় দিচ্ছে। মানুষ হয়ে উঠতে হলে এই পরিচয়টাই বড়। পাখি পড়ানোর মতো তোমার শেখানোর সে বুলি আমি ভুলিনি। তবু কী দুরন্ত তৃষ্ণা একটু পিতৃস্নেহ পাওয়ার। তাই, কি যেন না পাওয়ার ব্যথায় বুকটা চিন্‌চিন করে।

মহারাজ দুষ্মন্ত আমার কে হয় মা? তাঁর কথা তো কোনোদিন শুনিনি তোমার মুখে। প্রথম সাক্ষাতে মনে হলো, তিনি আমার বড় আপনজন। একটা অদৃশ্য সূত্রে আমাদের সম্পর্কটা কোথায় যেন বাঁধা। আশ্রমে কত অসাধারণ মানুষ তো মাঝে মধ্যে আসে। তাদের দেখে তো কখনও এরকম অনুভূতি হয় না। মনও এমন করে টানে না। দু'একজন মানুষের ব্যাক্তিত্বের মধ্যে মৃগনাভির মতো মন আকুল করা গন্ধ থাকে। কেন থাকে? তার কোনো কারণ খুঁজে পায় না। মহারাজ দুষ্মন্তের শরীর ও সান্নিধ্যের ভেতর তেমনি একটা গন্ধ আছে। আমাকে তাঁর নিবিড় করে ভালোবাসার সঙ্গে কোথায় যেন একটা হৃদয়ের যোগসূত্র ছিল। তাই, আমাদের ভাবটা হয়ে গেল সহজে এবং দ্রুত।

সেও একটা গল্পের মতো। সেই সময় মহারাজ দুষ্মন্ত ঘোড়ায় করে ঐ পথে যাচ্ছিলেন। আমি আপন মনে সিংহের সঙ্গে খেলছিলাম। একটা হিংস্র পশুর সঙ্গে আমাকে ক্রীড়ারত দেখে রাজা দুষ্মন্ত থমকে দাঁড়ালেন। কৌতূহলী চোখ মেলে আমার দিকে চেয়ে আছেন। সিংহকে জড়িয়ে মাটিতে গড়াগড়ি করতে করতে তাঁকে দেখলাম। অবিকল আমার মতো তাঁর মুখ, নাক, চোখ, গায়ের রঙ। বেশ একটু আশ্চর্য হয়ে গেলাম। এরকম অদ্ভুত মিল একজন মানুষের সঙ্গে আর একজন মানুষের হয় কেমন করে? রাজাও আমার মতো অবাক হয়েছিলেন। বন্য সিংহ কর্তৃক আক্রান্ত হয়েছি ভেবেই তিনি ঘোড়া থেকে দ্রুত নেমে কোষমুক্ত তরোয়াল এবং বর্শা উঁচিয়ে সাবধানে সিংহের উপর দৃষ্টি রেখে পা টিপে টিপে এগোচ্ছেন। তাঁর দু'চোখ হিংসায় জ্বলছে। পাছে সিংহের আক্রমণে জীবন বিপন্ন হয় তাই আমাকে সাহায্য করতে এলেন। তাঁর উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে বললাম, মহারাজ বর্শা ছুঁড়ে সিংহকে হত্যা করবেন না। এ অভয়ারণ্যে বনের পশুরা নির্ভয়ে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করে। মানুষের সঙ্গে খেলা করে। আমরা কেউ কারো শত্রু নই। এই সিংহ আমার খেলার সঙ্গী। ওকে অস্ত্রাঘাত করা থেকে ক্ষান্ত হোন।

রাজন্ দারুণ মুগ্ধ চমকে চমকে আমার দিকে তাকালেন। মুখে—চোখে তাঁর উচ্ছল খুশির দীপ্তি ফুটে বেরোল। সেই খুশির সঙ্গে একটা মুক্তির সুখ মিশে ছিল। করুণাঘন দৃষ্টি মেলে তিনি আমার মুখ ও চোখের দিকে চেয়ে বোধ হয় নিজেকেই দেখছিলেন। দর্পণের সামনে দাঁড়িয়ে মানুষ যেমন তন্ময় হয়ে নিজেকে তন্ন তন্ন করে খোঁজে তেমন বিভোর হয়ে আমার দিকে চেয়ে রইলেন।

গা ভর্তি ধুলো নিয়ে আমি রাজার সামনে দাঁড়িয়ে আছি। আর কী এক অপত্যস্নেহে আমার গা থেকে ধুলো ঝেড়ে দিচ্ছেন তিনি। তাঁর হাতের স্পর্শে আমার শরীরের ভেতর এক অজানা শিহরণ বয়ে গেল। একটা অদ্ভুত নতুন অনুভূতি হল। অপরিচিত ভিনদেশী এই মানুষটি আমার

কেউ নয় তবু কী অসীম মমতায় হাত দিয়ে এবং বস্ত্র দিয়ে গা থেকে ধুলো ঝেড়ে পরিষ্কার করে দিতে লাগলেন। আর কী এক গভীর সুখে আমার ভেতরটা ভরে ওঠতে লাগল। তাঁরও মুখ-চোখে একটা রূপান্তর হল। মৃদু হেসে বললেন, সাহস তো খুব তোমার। সিংহের সঙ্গে খেলতে ভয় করে না? আচমকা কিছু হতেও তো পারে।

বিজ্ঞের মত হেসে বললাম, আদর ভালবাসার মতো শক্ত বাঁধন আর কী আছে? ভালবাসায় বনের পশু বশ করা কোনো নতুন ঘটনা নয়। এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই।

উদ্বেগ প্রকাশ করে রাজা বললেন, তবু, এরকম বিপজ্জনক খেলা ভালো নয়।

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাঁর দিকে চেয়ে বললুম, এ খেলা কি আপনার খুব অপছন্দ?

মহারাজ বললেন, বৎস, পছন্দ-অপছন্দের প্রশ্ন নয়। নিজের আনন্দের জন্য তোমার বাবা-মা'কে নিরানন্দ করতে পার না। তুমি তাঁদের প্রত্যাশার দীপ। এরকম অদ্ভুত খেলায় তাঁদের সম্মতি নিয়েছ? জননী তোমার এরকম বিপজ্জনক খেলায় নিরুৎসাহ করেন না কেন? গর্বের সঙ্গে বললাম, মা সর্বদমন নাম রেখেছেন আমার। নামের অর্থ গৌরব তো আমাকে রাখতে হবে। মার ছোট্ট প্রত্যাশাটুকু পূরণ করতে যদি না পারি তাহলে সন্তান হয়েছি কেন? আমার ভাল কাজে মা কখনো বাধা দেন না। বরং বলেন, বিক্রমের দ্বারা দমন করবে হৃদয় দিয়ে বশ করবে, বিশ্বাস আর শ্রদ্ধা দিয়ে ভালবাসার ভিত পাকা করবে। তা হলে বনের পশুও বিশ্বাসঘাতকা করে না। প্রত্যেকের বাঁচার অধিকার মর্যাদা পেলে তবেই নিজের বাঁচার ভিত, সুদৃঢ় হয়। বিশ্বাসের অমর্যাদা হলে সব সম্পর্ক তাসের ঘরের মতো ভেঙে যায়। একবার বিশ্বাস ভাঙলে সম্পর্ককে আর জোড়া দেওয়া যায় না। বিশ্বাস কাচপাত্রের মতো। সাবধানে এবং যত্নে রক্ষা করতে হয়।

আমার মুখে এরকম একটা অদ্ভুত জ্ঞানের কথা শুনে রাজা স্তম্ভিত হয়ে আমার মুখপানে চেয়ে রইলেন। বললেন, আশ্চর্য তোমার মাতৃভক্তি। এমন মহিয়সী মহিলার সন্তান হওয়া ভাগ্যের কথা। তোমার এমন মায়ের জন্যে আমিও গর্ব অনুভব করছি। বৎস, এই জনারণ্যের নাম জানতে ইচ্ছে করছে। এটি কার আশ্রম? এই আশ্রমের তুমি কতদিন আছ? তোমার পিতা কে? তোমার জননী কোথায় থাকেন?

মহারাজের কৌতূহলের আন্তরিকতা সন্দেহ করার কোনো কারণ ছিল না। উচ্ছ্বাসের একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গেছিল। মনেতে তাই প্রশ্ন জাগল, রাজার এরকম অদ্ভুত ইচ্ছে হলো কেন? এক নগণ্য আশ্রম বালক আমি। কারো আগ্রহ, কৌতূহলের যে পাত্র হতে পারি একথা ভাবিনি কোনোদিন। রাজার প্রশ্ন আন্তরিক, না নিছকই একটা জিজ্ঞাসা জানার জন্য অদ্ভুত ঠান্ডা গলায় বললাম, আমরা বনবাসী। আমাদের নিয়ে আপনার কৌতূহল শোভা পায় না। আমাদের খোঁজখবর নিয়ে আপনি কী করবেন? আমরা সত্যি আপনার কোনো কাজে লাগব না। মিছিমিছি কতকগুলো মন খারাপ করা কথা বলে আমাকে কষ্ট দিয়ে আপনার কী সুখ হবে?

মহারাজ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। আক্ষেপ করে বললেন, তোমার মতো সাহসী, বীর ছেলের মুখে এরকম কথা মানায় না। বীরের খ্যাতি, জয়, নরম মানুষের জন্য নয়। সর্বদমনকারী তরুণের তো একেবারেই নয়।

অভিযোগটা একেবারে আমার বুকের ভেতর গিয়ে ধাক্কা মারল। এরকম কথা বলে আগে আমাকে কেউ আঘাত করেনি। অভিমানে ভীষণ লাগল। হঠাৎ একটু অপ্রস্তুত বোধ করলাম। মুহূর্তে প্রলয় ঘটে গেল বুকের গভীরে। মনের ভাব মহারাজকে গোপন করার জন্য চটপট বললাম, এই আশ্রম মহাতাপস কণ্বমুনির। তিনি আমাদের আশ্রম পিতা। সর্বজীবের প্রতি তাঁর অসীম মমতা এবং দরদ। অনাথ, আতুর, দুঃখী, নিরাশ্রয়, সহায়হীন, সম্বলহীন মানুষের সেবার জন্য এই আশ্রম। এখানে পশু-রক্তপিপাসু শিকারীর প্রবেশ নিষেধ।

মহারাজ হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন। মনে হলো তিনি আর বর্তমানের মধ্যে নেই। মুখটা উর্ধ্বমুখ করে তাঁর স্থির অপলক দুটি চোখ যেন কী খুঁজছিল শূন্যে। সুদূর অতীতলোকে থেকে কথাগুলো আহরণ করে সম্মোহিতের মতো স্বপ্নাচ্ছন্ন অবস্থায় বললেন, সর্বদমন! জীবন কী অসম্ভবের

সম্ভাবনায় পূর্ণ। কত দিন-মাস ধরে পাগলের মতো অনেক জনপদ, অরণ্য, ঋষির আশ্রম খুঁজে বেড়িয়েছি, কিন্তু মহাতাপস কণ্বমুনির নামটা কিছুতে স্মরণ করতে পারিনি। তুমি বলামাত্র পুরনো কথা এমন করে সব মনে পড়েছে যে আমি কান পেতে আছি। আমর বুকের স্পন্দনে অতীতের চরণধ্বনি। আমার সমস্ত শরীর যেন গান গেয়ে উঠছে। কিন্তু এত বেদনা নিয়ে যে, রক্তক্ষরণ হয় সেটাই জানা ছিল না। একটা হারিয়ে যাওয়া অতীতকে বড় বেশি করে মনে পড়ছে। একটা মুখ মনে করার চেষ্টা করছি। সেই চেনা মুখ হয়তো অনেক বদলে গেছে। অনেক দিন হয়ে গেল চিনতে পারব তো? বৎস, তুমি কে, তোমার পরিচয় কি—জানি না। তবু দেখা থেকে তোমার সঙ্গে কথা বলতে ভীষণ ভালো লাগছে। তোমার কথাগুলো আমার বুকের বীণায় ঝংকার তোলে। তুমি আমার কে হও?

মহারাজের মুখে-চোখে একটা উচ্ছলতা ফুটে ওঠলেও ভেতরে যে তাঁর একটা গভীর ক্ষত আছে সেটা অনুভব করতে আমার কষ্ট হয়নি। আমাকে তাঁর ভালো লাগছে, আমার সম্পর্কে তাঁর আগ্রহ দেখে বেশ খানিকটা বিচলিত হয়ে পড়লাম। কিন্তু দ্বিধার ভাবটা কাটিয়ে উঠতে পারছিলাম না। তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের ভেতর থেকে গোপন অতীতটা কথায় কথায় পাছে উঁকি দেয় এই আশঙ্কায় চুপ করে ছিলাম। ওঁর অতীত সম্পর্কে যে কথাই থাক না কেন, তা নিয়ে আমি কৌতূহল দেখাব কেন?

হঠাৎ একেবারে বুকের ভেতর থেকে খুব কাতর গলায় মহারাজ বললেন, সর্বদমন, তুমি আমার কে? মনে হচ্ছে তুমি আমার পর নও। তোমার সঙ্গে আমার কোথায় যেন একটা মিল আছে। এই মিল শুধু বাইরের নয়। সব কিছুতেই অবাক করা সাদৃশ্য আছে একটা।

কথাটা প্রবলতর হয়ে বাজল বুকে। রূঢ়স্বরে বললাম, মহারাজ, আমার মতো এক অনাথ বালককে নিয়ে এই পরিহাস করছেন কেন?

বৎস, তুমি রাগ কর না। আমার মন বুঝতে পেরেছে—তুমি কে? আমি শুধু একবার তোমার মাকে দেখতে চাই। তাঁর কাছে একবার নিয়ে যাবে? অনেক অপরাধ করেছি তাঁর কাছে। কোন্ মুখে তাঁর কাছে ক্ষমা চাইব? তবু প্রত্যেকের নিজের কিছু কিছু কথা থাকে। শুধু আমার অপরাধ স্বীকার করার সুযোগটুকু দাও। তাঁর কাছে আমার হয়তো কোনো দাম নেই। কিন্তু আমার কাছে তাঁর মূল্য ফুরিয়ে যায়নি।

মহারাজের দু'চোখ ভরে জল নামল। কণ্ঠস্বর সহসা রুদ্ধ হলো। হতভম্ব হয়ে আমি চেয়ে আছি। আমার ভেতরটা অবিশ্রান্তভাবে তোলপাড় করে চলল। কয়েকটা মুহূর্ত একটা ঘোরের মধ্যে কেটে গেল। নিজের অপ্রস্তুত ভাবটা কাটিয়ে ওঠার জন্য অতিরিক্ত রাগ দেখিয়ে গলা চড়িয়ে বললাম, আপনি কি পাগল হয়েছেন মহারাজ? প্রলাপের মতো কী যা তা বকছেন। আপনার কথার মাথামুন্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না আমি। মিছিমিছি আমাকে নিয়ে এ কৌতুক কেন?

আমার মুখের দিকে চেয়ে মহারাজ মৃদু মৃদু হাসছেন। সকৌতুকে বললেন, বৎস, এককালের সুখস্মৃতিটা তোমাকে দেখে উথলে ওঠেছে। আরো কিছুক্ষণ না হয় ঢাকা থাকুক। তুমি আমাকে মহাতাপস আচার্য কণ্বমুনির কাছে নিয়ে চলো। তাঁর মুখেই সব জানতে পারবে তুমি।

এরকমন অদ্ভুত কথায় আমি অবাক হয়ে যাই। নিজের অজান্তে একটা ভয় গ্রাস করল আমাকে। মানুষের মন তো। মনই শুধু জানতে পায় তার দুর্বলতা কোথায়? শূন্যতা কোথায়? ব্যথা কোথায়? চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে মনে হল অত্যন্ত শুভ্র ভোরের পদ্মফুলে শিশির টুপিয়ে নেমে যাচ্ছে দীঘির অতলে। মন ডুবুরি তলিয়ে যাচ্ছে বুকের অতলে ব্যথার মুক্তো তুলে আনবে বলে।

মাঝে মাঝে যে শূন্যতায় বুক আমার খাঁ-খাঁ করে। যে অভাবে নিজেকে বড় বঞ্চিত এবং হতভাগ্য মনে হয়; সেই বোধটাই হঠাৎ তীব্র হলো। মনেতে প্রশ্ন জাগল, আমার পিতা কে? তিনি কোথায়? তাঁকে দেখতে কেমন? আমার মা আছেন, কিন্তু বাবা নেই। জন্মের ইতিহাস রহস্যে ঢাকা। কিংবদন্তির গল্পের মতো। অথচ, সত্য হল, মানব-মানবীর প্রেম; মিলন হলো মানুষ জন্মের উৎস। মহারাজের কথার তাহলে কোনো মানে আছে কি?

মুখ বুজে মহারাজার সঙ্গে আমি ঘাড় নিচু করে হেঁটে যাচ্ছি মুনিদাদুর আশ্রমে। বুকের ভেতর উদ্দাম ঝড়ের কলরব শুনতে পাচ্ছি। চলতে চলতে মহারাজা আশ্রমের গল্প বলছেন। তাঁর মুখে গল্পের কামাই নেই। সব গল্প মুনিদাদুর কাছে শুনেছি। কিন্তু এ সব গল্প মহারাজ কোথা থেকে জানলেন?

বনতোষিণীর তলায় এসে থমকে দাঁড়ালেন। সহসা গল্প থেমে গেল। কেমন উদাস হয়ে গেল তাঁর দৃষ্টি। বুকের গভীর থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল। বললেন, এই আশ্রমের অনেক কিছু বদলে গেছে। বদলে যাওয়াটা জীবনের ধর্ম। ষোলো বছর আগে এই বনতোষিণী কিন্তু এত বড় ছিল না। একদিন এর মূলে শকুন্তলা ও আমি মিলে জল সেচন করেছি। আমাদের জীবনের অনেক ঘটনার সাক্ষী।

মহারাজ দুষ্মন্তের মুখে তোমার নাম শুনে আমি চমকে যাই। মহারাজের তো তোমার নাম জানার কথা নয়। অথচ তোমার নাম উচ্চারণের সময় কী এক দারুণ দীপ্তিতে দীপ্ত হয়ে উঠল তাঁর মুখ। মা, মহারাজ দুষ্মন্ত তোমার কে হন? তোমার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক কী? তুমি তো কোনোদিন তাঁর কথা বলনি? এই আশ্রমের কারো মুখে তাঁর নাম পর্যন্ত শুনিনি। মুনিদাদুও তাঁর সম্পর্কে নীরব। এর অর্থ কী? আমার সব কৌতূহল এখন তাঁকে নিয়ে। আমার ষোলো বছর আগের অতীতের সঙ্গে কোথায় যেন একটা নিবিড় মিল আছে। কেবল মনে হতে লগাল ষোলো বছর পরেও এই মানুষটি তোমার কথা কেন মনে রাখলেন? আমার ও তাঁর চেহারার মধ্যে এত সাদৃশ্য হয় কেন? প্রশ্নগুলো আমার মনের মধ্যে ঝড় তুলল। কেমন একটা ঘোরের ভেতর মহারাজকে অনুসরণ করে কণ্বমুনির আশ্রমে গেলাম।

মুনিদাদু তো মহারাজকে দেখে চমকে উঠল। কেমন একটা বিবর্ণ ভয়ে তাঁর মুখ আঁধার হলো। পক্ক ভুরু যুগলের নিচে ঘোলা ঘোলা দুটি চোখ মহারাজের মধ্যে একটা চেনা মুখকে খুঁজছিল। মুনি দাদু কোনো প্রশ্ন করার আগেই মহারাজ বললেন, মুনিবর, আমি ব্রহ্মাবর্তের রাজা দুষ্মন্ত। আপনার কাছে আমার অনেক অপরাধ জমা হয়ে আছে। আমার সব কথা শুনলে আপনারও দয়া হবে। সপ্ততীর্থ থেকে আপনার প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে আমি পারিনি। আমার কোনো উপায় ছিল না। যদিও মনেতে ইচ্ছে ছিল সব ঘটনা স্বীকার করে আপনার আশীর্বাদ নেব। কিন্তু অদৃষ্ট আমাকে সে সময় দিল না। রাজ্যে আমার অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে অসুরেরা উৎপাত শুরু করে। তাদের উপদ্রব, অত্যাচার দমন করতে বহুকাল লেগে গেল। প্রতিটি মুহূর্ত আমার উৎকণ্ঠায় উদ্বেগে কেটেছে। এর ভেতর শকুন্তলার কথা ভাবার সময় কোথায়? অনেক বছর ধরে যুদ্ধ চলার ফলে রাজকোষ শূন্য হয়ে যায়। রাজ্যের হাল ফেরাতে আরো কয়েকটা বছর কেটে গেল। সত্যি কথা বলব, ব্যস্ততার ভেতর শকুন্তলার কথাটা ভুলে গেছিলাম।

বিস্ময়ে মুনিবর উচ্চারণ করলেন, ভুলে গেলে? মনের পটে যে সম্পর্ক দাগ কাটে না, তাকে ভুলে যাওয়ার ভেতর আশ্চর্য কিছু নেই।

মুনিবর। আপনি অবুঝ হলে আমি দাঁড়াই কোথায়?

মুনিদাদু আমাকে কুটিরের বাইরে রেখে মহারাজকে ভেতরে নিয়ে গেলেন। ওদের কথাবার্তা স্পষ্ট না হলেও আমি শুনতে পাচ্ছিলাম। মুনিদাদুর স্বরে এক আশ্চর্য ব্যাকুলতা। বললেন, মহারাজ, কী আর বলব, ষোলো বছর পরে হঠাৎ তার কথা মনে পড়ল কেন? কী এমন হলো যে, করুণা করতে একেবারে তপোবন পর্যন্ত ছুটে আসতে হলো? মহারাজ, এই বালকের অপরাধ কী? ষোলো বছর কার দোষে তাকে বনবাসীর মতো জীবন কাটাতে হল? রাজসুখ, ঐশ্বর্য, বিলাস, পিতার স্নেহ থেকে বঞ্চিত হল কেন? শৈশবে, বাল্যে যে পিতৃস্নেহ জীবনকে ধন্য করে দেয়, তার অনন্ত শূন্যতা কী দিয়ে ভরে দেবেন? বালক পারবে কি আপনাকে ক্ষমা করতে? নিজের জীবনের সঙ্গে মানিয়ে নিতে? যদি প্রশ্ন করে, আমার দুঃখিনী জননীকে করুণা করার কী দরকার? কে চেয়েছে আপনার করুণা? কে দিয়েছে আপনাকে এ অধিকার? মায়ের বাকি জীবনটা আপনার সাহায্য ছাড়াই চলে যাবে? মহারাজ, কী জবাব দেবেন তাকে?

উত্তরে মহারাজ বললেন, একটা ভুল একবার হয়ে গেছে বলে সারাজীবন ধরে তার জের টেনে চলব কেন? ভুলটাকে আঁকড়ে থাকা মানে থেমে যাওয়া। জীবনটা বেঁচে থাকার জন্য, ভুল নিয়ে পস্তানোর জন্য নয়। কী লাভ আছে হা-হুতাশ করে জীবন কাটানোর? অভিমান নিয়ে মুখ ফিরিয়ে থাকার মধ্যে কোনো কৃতিত্ব কিংবা গৌরব নেই।

মাগো, সেই প্রথম জানলাম, আমি অজ্ঞাতকুলশীল নই, রাজার সন্তান। তুমিও রাজরানী, রাজমাতা! বুকের মধ্যে ভূমিকম্প হয়ে গেল। রক্ত দপ্‌দপ্‌ করছিল। বহুকালের একটা দ্বন্দ্বের নিরসন হলো। আনন্দও হলো খুব। তবু এক গভীর যন্ত্রণা আর অভিমানবোধ ফেনিল সমুদ্রের মত তেড়ে এসে ছিন্নভিন্ন করে দিয়ে গেল আমার অন্তরটা। হঠাৎ-ই মনে হল মানুষের জীবনে অনেক কিছু ঘটতে পারে তা যত আনন্দ এবং দুঃখের হোক। পিতার সামনে দাঁড়াতে পুত্র সর্বদমনের সে কী লজ্জা! মহারাজের সঙ্গে দেখা হওয়ার আশঙ্কায় নিজের কুটিরে দিকে দৌড়ে গেলাম।

ঘরে একা আমি। দরজায় অর্গল দিয়ে ভাবছি। কিন্তু ভালো করে ভাবার মতো ছিল না। রগের দু'পাশ টনটন করছিল। দু'হাতে চেপে ধরে অস্বস্তিতে মাথা নাড়তে লাগলাম। মনে মনে বললাম, আমার এক সুন্দর মাকে যে কষ্ট দিয়েছে, দুঃখ দিয়েছে, ভুলে গেছে—তার সঙ্গে আমার কিসের সম্পর্ক? বাবা হলেও তাকে আমি ক্ষমা করব না। ডাকলেও না। পিতা-পুত্রের মধ্যে ভাঙা সাঁকো সত্যি কি পারাপারের সেতু হয়ে উঠতে পারে? প্রশ্ন মনে যাই হোক, সব উত্তর কেমন গুলিয়ে যাচ্ছিল।

মনে মনে 'বাবা' উচ্চারণ করলে বুকের ভেতর যে এমন একটা অদ্ভুত অনুভূতির ঢেউ খেলে যায় আগে কখনো জানতাম না। কী এক অদ্ভুত সুখে ও তৃপ্তিতে আমার ভেতরটা ভরে উঠল। অভিমান রাগ, ক্ষোভ, বিদ্বেষ সব বরফের মতো গলে যেতে লাগল। তাপদগ্ধ মরুভূমিতে হঠাৎ বৃষ্টি নামল। গলার দ্রবীভূত স্বরে নির্জনে একা 'বাবা, 'বাবা' বলে ডাকলাম। ডানা ঝাপ্টা-ঝাপ্টি করে এক ঝাঁক টিয়া নির্জন বনের নিস্তব্দ্ধতা বিদীর্ণ করে নীল আকাশ বরাবর উড়ে গেল। মনে হল আমার বুক ভরা ব্যাকুলতাকে ওরা ডানায় করে আকাশময় ছড়িয়ে দিল।

নিজের মনের এই সুখের স্বপ্ন দেখতে কোনো মাটি দরকার হয় না, দরজা বন্ধ করতে হয় না, কারো কাছে ধরা পড়ারও ভয় নেই। তবু কোথা থেকে এক গভীর বিষাদে মনটা আচ্ছন্ন হয়ে গেল। মহারাজ দুষ্মন্তের কোনো কৈফিয়তেই তোমার কষ্ট লাঘব হয়ে যাবে না। নিজের সুখ আনন্দ নিয়েই বেঁচে আছেন তিনি। তাই পিতার চিন্তাটা মনে ঠাঁই দিতে ইচ্ছে করে না। তাঁর আদর, স্নেহ, সান্নিধ্য ছাড়াই তো বড় হয়েছি। বাকি জীবনটাও তাঁকে আমার দরকার নেই। তুমি তো আমাব কোনো অভাব রাখনি। আমি শুধু তোমার সর্বদমন হয়ে থাকতে চাই। নামী দামী প্রভাবশালী বিখ্যাত ব্যাক্তির পুত্র হলে তো আমার ব্যাক্তিত্বের দীপ্তি, তাঁর জ্যোতির পাশে মিটমিট করে জ্বলত। সর্বদমনের পরিচয় পিতার পরিচয়ের তলায় ঢাকা পড়ে যেত। পিতৃপরিচয় ছাড়াই জীবনের ষোলোটা বছর তো কেটে গেল? ঐ পোশাকী পরিচয়ের আমার আর কোনো দরকার নেই। আমি চিরদিন তোমার পুত্র হয়ে থাকতে চাই। স্বামীব পরিচয় ছাড়াও জননীর একটা পরিচয় তো পুত্রের জীবনে থাকে। সে পরিচয়টা পিতৃপরিচয়ের চেয়ে কোনো অংশে ছোটো নয়। বরং অনেক বড় হয়ে ওঠে সন্তানের জীবনে। তুমি তো আমাকে দিয়ে তাই প্রমাণ করেছ। তুমি আর পাঁচজন জননীর মতো নও। তুমি সম্পূর্ণ আলাদা। তোমার ব্যাক্তিত্বের একটা আলাদা গন্ধ আছে তার সৌরভে আমার মন ভরে আছে। বিধাতা তোমাকে একটা আলাদা শক্তি দিয়েছেন। তোমার মর্যাদাবোধ দিয়ে তার ভিত তুমি শক্ত করেছ। তাই সমাজের কাছে কিংবা নিজের কাছে হেরে যাওনি। হেরে যাওয়ার আত্মগ্লানিতে পুড়ে পুড়ে নিঃশেষ হয়ে যাওনি। তুমি একজন মানুষের মতো মানুষ। তোমার এই মন ও সত্তার কিছুটা আমার ভেতরে আছে বলেই তো আমি সর্বদমন হতে পেরেছি। তুমি আমার মা বলে যে, কী গভীর গর্ব আমার বুকে লুকনো ছিল মহারাজ দুষ্মন্তের আগমনে তা টের পেলাম। জীবনে কত প্রতিকূলতা কাটিয়ে, বাধা পেরিয়ে নিজের বিবেকের কাছে, আদর্শেব কাছে খাঁটি থাকার, যে সাহস তুমি দেখিয়েছ তা পৃথিবীর কটা মা পারে? তুমি একজন মায়ের মতো মা। সন্তানের

পিতৃত্ব স্বীকার করল না বলে, জননীত্বের লোকলজ্জায় আশ্রমের আর পাঁচজন সতীর্থের মায়েদের মতো আমাকে পরিত্যাগ করে চলে যাওনি। পিতার পরিচয়ে নয়, জননীর পরিচয়ে আগামী প্রজন্মের কাছে নিজের স্বাধীনতা, মর্যাদাবোধ, কর্তব্যবোধ, দায়িত্বজ্ঞান নিয়ে কী করে মাথা উঁচু করে বাঁচতে হয় তা নিজের জীবনে বেঁচে প্রমাণ করেছে। সেজন্যে তুমি শ্রদ্ধার পাত্রী হয়ে উঠেছ। তোমায় নিয়ে মুনিদাদুর কী গর্ব! মহারাজকে তাই অনুযোগ করে বললেন, কৈফিয়ত দিলে কিন্তু দোষ হাল্কা হয়ে যায় না। আপনি ভীষণ খারাপ। একটা নিষ্পাপ সরল মেয়ের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেললেন কেন? কী করেছিল আমার শকুন্তলা। তার মতো মেয়ে হয় না। এমন মেয়ের বাপ হওয়া গর্ব! শকুন্তলা যে মহারাজ দুষ্মন্তের স্ত্রী সে কথা মনে রেখে সন্তানকে পিতার মত তৈরি করেছে সে। এমন মহত্ত্ববোধ ক'জন নারীর ভেতর আছে? পাছে, আমি শাপমন্ত্র করি এই ভয়ে আমাকে বলত, বাবা তুমি ভাবো কেন? ছোটবেলা পুতুলের মা হয়ে সংসার করেছি, সেদিন মনে মনে যা করতে চেয়েছি কল্পনায়, আজ না হয় এই জীবনে তাই করে দেখালাম। শুধু তুমি মাথা হেঁট করতে বলো না, পরাধীন করো না, অনুগ্রহ ভিক্ষে করতে বলো না। দয়া, করুণা পেলে জীবনটা নোংরা হয়ে যায়। বাবা, তোমার শিক্ষায় আমি এক অন্য রমণী। তুমি শুধু আমাকে আমার মতো বাঁচতে দাও— আমার শর্তে, আমার খুশিতে। আমার স্বাধীনতা নিয়ে আমার মতো করে বাঁচতে দাও। মেয়েরাও যে, মানুষ, পুরুষের মত সত্যিকারের মর্যাদা নিয়ে, সম্মান নিয়ে গৌরাবের সঙ্গে বাঁচতে পারে, এটা প্রমাণ করতে দাও। আজ, আমার বড় আনন্দের দিন রাজা। শকুন্তলার জয় হলো। তোমাকেই তার কাছে আসতে হলো কৃপা ও করুণা চাইতে। ক্ষমা ভিক্ষা করতে। শকুন্তলার মতো যেদিন মেয়েরা নিজের তেজে, সাহসে বিশ্বাসে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারবে সেদিনই পুরুষরা তাকে সত্যিকারের মর্যাদা ও সমানত্ব দেবে। কিন্তু কজন আর আমার শকুন্তলা হতে পারে? শকুন্তলার মতো আরো একটা মেয়েমানুষ কি এই আশ্রমে আমি তৈরি করতে পেরেছি?

মাগো, মুনিদাদুর কথাগুলো কী দারুণ মুগ্ধতা বয়ে আনল আমার প্রাণে, কী দারুণ সঞ্জীবিত করল আমাকে তা বুঝিয়ে বলার নয়। ভাগ্য করে তোমার মতো মা পেয়েছি! তোমার ছেলে হতে পারাব গর্বের অনুভূতি আমার কোনোদিন ফুরোবে না।

সত্যি কথা বলতে কি, আমি নিজেকেই ভাল করে জানি না। মুনিদাদু মুখে যখন জানলাম মহারাজের সঙ্গে আমার পিতাপুত্রের সম্পর্ক। তখন থেকেই মনে হচ্ছে, আমার অনেক থেকেও যেন কি একটা নেই। কোথায় যেন কি একটা অভাব রয়ে গেছে। সব মানুষের জীবনে এরকম দুর্দৈব মুহূর্ত আসে কি না জানি না, যদি আসে সেই মুহূর্তে তাকে তার আসল আমি, একা আমির সর্বস্ব সম্বল করেই দাঁড়াতে হয় তার মুখোমুখি। জীবনের কিছু মূল প্রশ্নের উত্তর তাকে একা একাই দিতে হয় নিজেকে। সেই সব মুহূর্ত বড় কঠিন পরীক্ষায় মুহূর্ত। আমি কী করব জানি না। তুমি আমার বক্তব্য বুঝতে পারছ কী?

মহারাজ দুষ্মন্তের সঙ্গে ক'দিন পাশাপাশি থাকতে থাকতে এক ধরনের টান জন্মাচ্ছে। বড় আপনার লোক মনে হচ্ছে। আমার প্রতিও মহারাজের এক ধরনের গভীর মমত্ববোধ জন্মাচ্ছে। রক্তমাংসের সম্পর্ক তো! তবু মনে গভীর এক সন্দেহ জাগছে, পিতা-পুত্রের সম্পর্ক কী নিছক সংস্কারগত একটা ধারণা? কী জানি?

তোমার সঙ্গে আমার চিরজীবনের সম্পর্ক। তুমিই আমার সব। তোমাকে ব্যথা দিয়ে, দুঃখ দিয়ে অসুখী করে কিছু চাই না আমি। তবু মন থেকে মুছে ফেলতে পারছি না মহারাজকে। তাঁর অপরাধের কোনো ক্ষমা নেই। আমি নিজেও ক্ষমা করতে পারছি না তাঁকে। তথাপি, মনটা তাঁর দিকে ধেয়ে চলেছে। আমার বুকের ভেতরও তাঁর জন্যে ব্যাকুলতা টের পাচ্ছি। কী করা উচিত তুমি আমাকে বলে দাও মা।

দুষ্মন্তের কথা :

শকুন্তলা আমি তোমার দুষ্মন্ত। তুমি আমাকে চিনতে পারছ না কেন? তোমার কাছে আমার অনেক অপরাধ জমা হয়ে আছে। অনিচ্ছাকৃত আমার অপরাধের শাস্তি যেভাবে খুশি দিতে পার তুমি। কিন্তু আমার তো নিজের কিছু বক্তব্য থাকতে পারে। ঘৃণায় মুখ ঘুরিয়ে থাকলে বলব কেমন করে? সব কথা তো সকলের সামনে বলা যায় না। মনের সব কথা হয়তো অন্যকে বলেও বোঝানো যায় না।

ভুল করেছি আমি। আবার, সে ভুল শোধরাতে নিজে থেকে তোমার কাছে এসেছি। বিশ্বাস কর আমি অনুতপ্ত। আমার আন্তরিক উদ্যোগকে সন্দেহ করার কিছু আছে কি? আমাকে বোধহয় বিশ্বাস করতে পারছ না। বিশ্বাসের ভিত একবার নড়ে গেলে সন্দেহটা হুড়মুড়িয়ে তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ে মনের ওপর। তোমার মনের কোনো দোষ নেই। দোষ আমার ভাগ্যের। ভাগ্য নির্দয়, ক্ষমা জানে না। কিন্তু মানুষ তো ভাগ্যের মতো নিষ্ঠুর নয়। তার হৃদয়ে দয়া আছে। মানুষই পারে ক্ষমা করে বুকে টেনে নিতে।

শকুন্তলা, তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও। ক্ষমা মানুষকে সুন্দর করে। ক্ষমা করে মানুষ অনেক বড় হয়ে যায়। তোমার ক্ষমা পেলে যার হৃদয় ধন্য হয়ে যেতে পারে, তার প্রতি অকারণ বিরূপ হয়ে নিষ্ঠুর করো না নিজেকে। আমার ওপর নির্দয় হয়ে তুমি কী সুখ পাবে? তোমার কষ্ট হবে না? তোমার অন্তঃকরণ তো আমি জানি। তুমি যে খুব সুখে নেই সে তো আমি জানি। নিজেকে এভাবে কষ্ট দেওয়ার ভেতর একধরনের নিষ্ঠুরতা আছে। রাগ করে, অভিমান করে নিজের ওপর নির্যাতন চালানো সহজ, মনের সুখ, শান্তি নষ্ট করে অন্যের দৃষ্টি কাড়া যায় কিন্তু সমস্যার সমাধান হয় না। কেবল যাদের বিবেক বেঁচে থাকে তার কাছেই এই কষ্টের কিছু দাম পাওয়া যায়। বিবেকহীন মানুষ হলে তোমার কাছে এভাবে এক বুক বিবেকের জ্বালা নিয়ে কখনো ছুটে আসতাম না। তোমার একটু করুণা পাওয়ার জন্য দিনের পর দিন আশ্রমে পড়ে থাকতাম না। অতীতের গন্ধ মাখানো দিনের স্মৃতিগুলো যতদিন প্রাণে থাকবে ভুলবো কেমন করে? আগের মতোই আমি তোমাকে ভালোবাসি। ভালোবাসার সেই আলো পথ দেখিয়ে এনেছে তোমার কাছে। কিন্তু আমার ওপর অভিমান করে নিজের ওপর প্রতিশোধ নিচ্ছ তুমি। শুধু শুধু আমাকে অপরাধী করে রাখছ তোমার কাছে, আমার নিজের কাছে এবং অন্যের চোখে। আমাকেই ছাড়াই যে খুব সহজে বাঁচা যায় তা ছেলেকে নিয়ে একা একা নিজের জীবনে বেঁচে তুমি দেখিয়েছ। কারো ওপর যে তুমি নির্ভরশীল নও এটা প্রমাণ করেছ। তাতেই আমার শ্রদ্ধা তোমার ওপর বেড়ে গেছে। কিন্তু এই সাফল্য জীবনের শেষ নয়। প্রত্যেক মানুষই একটা প্রত্যাশা নিয়ে পথ চলে। তুমিও সেইভাবে এগিয়ে গেছ নিজের গন্তব্য পথে। কিন্তু প্রত্যাশা পূরণ হলেও প্রচন্ড সফল মানুষও ব্যর্থ হয়ে যায়। অন্তত মনের কাছে সাফল্যের মধ্যেই এক গভীর ব্যর্থতা নিহিত থাকে। যখন নিজের কাছে চাওয়ার কিছু থাকে না তখন প্রাপ্তির ঘর ভরে থাকে অশেষ শূন্যময়তায়।

আমি এখন তোমার স্বপ্নের। তোমার অতীতের সুখস্মৃতি বর্তমানের যন্ত্রণা, ভবিষ্যতের বিপদ। আমাকে পাওয়ার জন্য তোমার সেই ব্যাকুলতা আর নেই। ঘৃণায়, বিতৃষ্ণায় মন থেকে তুমি আমাকে মুছে ফেলেছে। কিন্তু সত্যি কি মোছা যায়? হয়তো আমারও ভুল হতে পারে। কিন্তু আমার নিজের বিশ্বাস, আমার নিজের কাছে তো দামী।

পড়ন্ত বিকেলের হলুদ আলো পড়েছে কৃষ্ণচূড়ার ডালে। পাখি ফিরছে কুলায়। গাছ-গাছালির ফাঁক দিয়ে দূর থেকে তোমাকে দেখতে পাচ্ছি। শুকনো পাতা মড়মড় করছে তোমার পায়ের তলায়। ভিজে পায়ে জড়িয়ে যাচ্ছে। বনভূমি জুড়ে কান্নার মতো বাজতে লাগল সেই শব্দ। তবু ভ্রূক্ষেপ নেই তোমার। নরম স্নিগ্ধ বিকেলের মরা আলো গায়ে মেখে তুমি মুক্তির স্বাদ নিয়ে ফিরছ ঘরে। কেবল আমার মনেই বিষণ্ন সুর। ইচ্ছে করছিল দৌড়ে এসে তোমার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ি। কিন্তু সাহসে কুলোল না। তীব্র গভীর অপরাধবোধের কীলক দিয়ে আমার চরণদ্বয় মাটির সঙ্গে কে যেন গেঁথে দিয়েছে। অতীত থেকে বর্তমানে ফেরা বড়ই কষ্টের। বোধহয়, অতীতের মিষ্টি প্রেমের সম্পর্ক

এখন শেষ বিকেলের রোদের মতোই উষ্ণতাহীন। প্রাণের উত্তাপে ভরিয়ে দেওয়ার জোর তাতে নেই তবু সেই বিকেলের মরা আলো থেকে সন্ধ্যাতারাগুলো লাফ দিয়ে আকাশে একে একে জ্বলে ওঠে। তার স্নিগ্ধ দ্যুতিতে মন ভরে যায়। মরা আলো তখন দামী হয়ে ওঠে। আর তখন নিজের সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে নিঃশেষে নিঙড়ে নেওয়া অনুভূতিটা তোমার কাছে পৌঁছে দেওয়ার যে ভাষা দরকার তা আমার কতখানি আছে জানি না।

দিনের আলো আস্তে আস্তে নিভে আসছে। তবু সব স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। একটা থম ধরা বিষণ্ণ স্তব্ধতায় বন রহস্যময় হয়ে উঠেছে। তুমি যেতে যেতে চমকে চোখ তুলে তাকালে। আমার ব্যাকুল দুটি চোখ তোমার চোখে নিবদ্ধ ছিল। মনে হল, আমাকে দেখতে পেয়ে তুমি চোখ ঘুরিয়ে নিলে। তোমার দু চোখ থেকে আগুনের ফুলকি যেন ছুটে বেরোল। ঘৃণা, বিতৃষ্ণা, বিদ্রোহ যেন দাউ দাউ করে জ্বলছিল। ঐ জ্বালাভরা দু'চোখের দিকে তাকিয়ে আমার সাহস হয়নি তোমার সামনে দাঁড়ানোর। ঐ দৃষ্টির দহনে মানুষ পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়ার পক্ষে যথেষ্ট।

তোমার হদিস পাওয়া থেকে ঘুম আসে না চোখে। এপাশ-ওপাশ করি। অবশেষে, বিছানা ছেড়ে উঠে আসি তপোবনের আঙিনায়। নিশুতি রাত। কোথাও কোনো শব্দ নেই। কেবল বনের নানারকম শব্দ শোনা যাচ্ছে। কত সব বিচিত্র গন্ধ নেয় নাক। আকাশে মেঘ ভাসে। কৃষ্ণপক্ষের নরম চাঁদের আলোর সঙ্গে বনের মধ্যেকার শিশির আর কুয়াশা মিশে এক স্বপ্নরাজ্য তৈরি হয়।

সপ্তমীর বাঁকা চাঁদ আমার মুখের দিকে অনন্ত জিজ্ঞাসা নিয়ে চেয়ে আছে। প্রশ্ন, প্রশ্ন, প্রশ্ন। কত যুগ পার হয়ে আমার মনে এল তোমার কথা। কেন, আমার জীবনে এরকম অদ্ভুত ঘটনা ঘটল? এর কি কোনো প্রয়োজন ছিল? আমি বর্তমানেও নেই, অতীতেও নেই। মাত্র কয়েকদিনের আগের একটা ঘটনা। রাজসভায় বসে আছি। নগরপাল এক ধীবরকে বেঁধে আনল আমার কাছে। তার কাছে আমার নামাঙ্কিত অঙ্গুরীয়টি দেখে ভীষণ চমকে যাই। সারা শরীরে মধ্যে বিদ্যুৎ খেলে গেল। মনের ভেতর হঠাৎ এক হারানো অতীত দপ্ করে স্মৃতির দীপ জ্বেলে দিল। সেই সময়ে মনের অবস্থা ঠিকমত বর্ণনা করতে পারব না। আমার দু'চোখের সামনে দেবীমূর্তির মতো তুমি দাঁড়িয়ে আছ।

শূন্যের ভেতর থেকে তোমার অবয়ব ফুটে বেরোল। আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, তোমার পেলব নগ্ন পা, বাহু, ঢলঢলে মুখের শান্ত স্নিগ্ধ অপরূপ শ্রী। আংটির ওপর থেকে আমার চোখ ফেরাতে পারছি না। আমার বিস্ময়দীপ্ত দুই চোখের তারায় তুমি তখন বাস্তব। আংটিতে আমার নাম দেখছি না, তোমাকেই দেখছি। তোমার নীবিবন্ধে বাসন্তী রঙের কুঁচি দেওয়া অলঙ্কৃত ঘাঘরা, পীনোন্নত বুকে রেশমী সুতোর কাজ করা কাঁচুলি, কুঞ্চিত কালো কেশে শ্বেত করবীগুচ্ছ। গভীর কালো চোখে দীঘির অতলতা, তাম্বুলরঞ্জিত পাতলা ঠোঁট দুটিতে লজ্জাজড়িত ভয়মিশ্রিত মৃদু হাসি, সারা শরীরে বাঁধভাঙা যৌবনের উচ্ছলতা। কী আশ্চর্য আমার সে অনুভূতি। বুকের ভেতর সুরের মূর্ছনা। অজান্তে আমার নামাঙ্কিত অঙ্গুরীয়টি চুম্বন করলাম আর তখনই একটা তীব্র তীক্ষ্ণ অনুভূতি আমার শরীরের ঢেউ দিয়ে গেল। এই আংটি আমার অনেক আনন্দ, সুখ, অপরাধ, যন্ত্রণার সাক্ষী। আংটিকে কেন্দ্র করে ঘুরতে লাগল আমার ভাবনার পৃথিবী।

নগরপালের ডাকে চমকে তাকালাম। মনে হলো, একটা স্বপ্ন থেকে বাস্তবে জেগে উঠলাম যেন। অনন্ত বিস্ময় নিয়ে চেয়ে আছি ধীবরের দিকে। ভয়ে, বেচারা কাঁপছে। দু'হাত কচলাতে কচলাতে লোকটা বলল, মহারাজ, আমি গরিব ধীবর। বিশ্বাস করুণ আংটি আমি চুরি করেনি। ঈশ্বর আমাকে দিয়েছেন।

নগরপাল তাকে ধমকাল। তার কথাগুলো পুনরাবৃত্তি করে বিকৃত স্বরে উচ্চারণ করল, চুরি করেনি। ঈশ্বর দিয়েছেন। নগরপাল গলার স্বর পাল্টে বলল, ঈশ্বর লোক খুঁজে পেল না, তোর মতো চোরের ওপর তাঁর দয়া হলো। ব্যাটা মিথ্যেবাদী। চোর।

নগরপালের কথাগুলো কানে গেল, কিন্তু মন মানল না। অনন্ত বিস্ময় নিয়ে আংটিটা আমি ঘুরিয়ে দেখছিলাম, দুচোখে কৌতূহল নিয়ে ধীবরকে জিগ্যেস করলাম। ধীবর, সত্য করে বলল,

এ আংটি কোথায় পেলে? কে দিয়েছে তোমায়? কোনো কিছু লুকিও না। তোমার কোনো শাস্তি হবে না।

মহারাজ কী আর বলব? গরিব মানুষ হওয়া পাপ। জীবনের অভিশাপ। কেউ তাকে বিশ্বাস করে না। তার সত্যি কথাটাও মিথ্যে হয়, গরিবের অভাবটাই তার সবচেয়ে বড় শত্রু। অপরাধ না করলেও লেকে সন্দেহ করে তাকে। সন্দেহের জন্যে তো আর বিচার করতে হয় না। তাই একটা সৎ ভালো মানুষও গরিব বলেই চোর। চুরি না করেও আমার সাজা হবে। গরিব কোনো দিন সুবিচার পায় না মহারাজ।

ধীবর তুমি নিঃসংকোচে সত্য বলো। আমি জানি এ আংটি তুমি চুরি করনি। কেউ তোমাকে দিয়েছে। কে দিয়েছে? কেন দিয়েছে? তাকে তুমি চেনো কি?

করজোড়ে ধীবর বলল, মহারাজ, আপনি ধর্মাবতার। এ আংটি আমাকে কেউ দেয়নি। ঈশ্বর দিয়েছেন।

নগরপাল বাজখাঁই গলায় তাকে ধমকে বলল, মহারাজের সঙ্গে মিথ্যে কথা? তোর জিভ আমি উপড়ে নেব।

নগরপাল আমার চোখের দিকে তাকিয়ে থমকে গেল। ভৎর্সনা করে বললাম : নগরপাল।

নগরপাল একটু থতমত খেয়ে বলল, মহারাজ, এ লোকটা আপনার সহানুভূতির সুযোগ নিচ্ছে। অনবরত মিথ্যে কথা বলছে। শয়তান লোকেরা মুখে ঈশ্বর আর ধর্মের কথা বলে নিজের দোষ ঢাকে। পাপ চাপা দেওয়ার এমন বুলি আর নেই।

ধীবর আমার পায়ের কাছে আছড়ে পড়ে মাথা ঠুকতে লাগল। মহারাজ আমি মিথ্যেবাদী নই। চোরও নই। নদীর এক মাছের পেটের ভেতর পেয়েছি। কার আংটি কিছুই জানি না। নদীর মাছের পেটে ঐ আংটি কিভাবে গেল তা তো বলতে পারব না। আংটিটা যে মহারাজের তাও জানি না। সত্যি বলছি, আংটি কেউ আমাকে দেয়নি।

ধীবরের কথা শুনে আমি চমকে উঠলাম। দুর্ভাবনায় মনটা ছেয়ে রইল। অমঙ্গল চিন্তায় কদিন ধরে ঘুমোতে পারেনি। ভেতরের উকণ্ঠায়, সারা রাত এপাশ-ওপাশ করেছি। কেমন একটা শঙ্কায় বুক কাঁপছিল। পাপবোধ ছিঁড়ে খাচ্ছিল। শারীরিক ও মানসিক শক্তিতে টান ধরল। বড় অবসন্ন লাগল। এরকম অনুভূতি আগে কখনো হয়নি। বিস্মৃতির জন্য অনুশোচনা হল। নিজেকে বহুবার ধিক্কার দিলাম। দেবতার পায়ে মনে মনে মাথা কুটতে কুটতে কত বলেছি, শকুন্তলাকে রক্ষা কর। তাকে ভালো রেখ। তার কোনো বিপদ না হয় যেন।

মনকে যে প্রবোধই দিই না কেন, বুকটা অজানা একটা ভয়ে দুর্ দুর্ করছিল। মনে হচ্ছিল তোমার সন্ধানে বেরিয়ে আমি খারাপ কিছু শুনব। এরকম একটা আশঙ্কা নিয়ে মনে একটু দ্বন্দ্বও এল। সেই সঙ্গে নানা প্রশ্ন জাগল। নিজেকেই আচমকা প্রশ্নটা করেছি, আংটিটা মাছের পেটে থাকতেই পারে, কিন্তু তার সঙ্গে তোমার জলে ডুবে মারা যাওয়ার সম্পর্ক কী? নদীতে স্নানের সময় আংটি তো আঙুল থেকে খুলে যেতে পারে। খাদ্য ভেবে মাছে তা খেতেও পারে। আংটিটা মাছের পেটে পাওয়া গেল বলে তুমি জলে আত্মবির্জন করেছ, এরকম মনে করার কোনো কারণ নেই। থাকতেও পারে না। কথাটা মনে ধরল। অমনি অন্যসব ভাবনা মন থেকে ঝেড়ে ফেললাম। মন বলল তুমি, বেঁচে আছ। তোমার আত্মবিসর্জনের কোনো কথাই কল্পনা করা যায় না। আমার এক বুক উদ্বেগ, উৎকণ্ঠার ভার বুক থেকে নেমে গেল। মন হাল্কা হলো। বড় আরাম লাগল। যে সন্দেহে কদিন ধরে কষ্ট ভোগ করেছি, তাব কোনো কিছু আর মনে নেই।

তবু পুনর্মিলনের সম্ভাবনা সম্পর্কে আমার মনে যথেষ্ট সংশয় ছিল। কারণ, জায়গাটার নাম কিছুতে স্মরণ করতে পারছিলাম না। কোথায় খুঁজব তোমাকে? সত্যি বলছি, তোমার ছবিটাও বড় ঝাপ্সা। তোমার মুখ, অবয়ব চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে না। কানে, তোমার ষোলো বছর আগের গলার স্বর শুনতে পাচ্ছি। বহু যুগের ওপার থেকে সে স্বর ভেসে আসছে। এ তো কোনো জন্মান্তরের কথা নয়, জীবনের স্মৃতি। একটু একটু করে সব মনে হতে লাগল। কুয়াশার ঘোর

কেটে গেল। তোমার অবয়ব, মুখ স্পষ্ট হল। আংটি তোমার অদৃশ্য উপস্থিতি নিয়ে আমার সামনে হাজির হলো। কল্পনায় নিজের সঙ্গে তার এক কাল্পনিক সংলাপ শুরু করল। আংটি সহসা যেন তোমার গলায় কথা বলে উঠল, মহারাজ, প্রেম কি একটি আংটি দিয়ে বোঝানো যায়? আংটিতে বিশ্বস্ততা কী আছে? বিশ্বাস করলেই তার মূল্য আছে, নইলে এর দাম কী? ও আংটি আমার চাই না। আমি চাই তোমাকে।

প্রিয়ে, এই আংটি সতত আমার কথা তোমাকে মনে করিয়ে দেবে। আমার অনুপস্থিতিকে স্মৃতি দিয়ে ভরিয়ে রাখবে। কখনো মনে হবে না তোমার কাছ থেকে আমি দূরে আছি।

তোমার অধরে সেই অদ্ভুত হাসিটি আমি দেখতে পাচ্ছি। মৃদু কণ্ঠে বললে, রাজা, আমি বনবালা। প্রেম ছাড়া আমার দেবার মতো কোনো ঐশ্বর্যই নেই। আমার কথা তুমি মনে করবে কী করে? আমার অনুপস্থিতি তোমার শূন্য মনকে কী দিয়ে ভরিয়ে রাখবে? স্মৃতিচিহ্ন ছাড়া একজন মানুষকে যদি মনে না পড়ে, তা-হলে তো ছাড়াছাড়ি হওয়ার পরেই মুছে যাব তোমার মন থেকে। রাজা যে প্রেম আংটি দেখে চিনতে হয়, মনে রাখতে হয়, সেই আংটির ওপর আমার কোনো বিশ্বাস নেই। আংটিকে আমি বিশ্বাস করি না। প্রেমের গৌরবেই তুমি আমার মনে অধিষ্ঠিত থাকবে। আংটিতে আমার কাজ নেই।

তবু এ আংটি তোমার আঙুলে শোভা পাক। আমার তৃপ্তি ও সুখের জন্যই তুমি এই আংটি সর্বদা আঙুলে রাখবে।

একটা ছোট্ট বিদ্যুৎ শিহরণ হয়ে আমার শরীর মন ছুঁয়ে গেল। আংটি চুম্বন করে বললাম, তুমি আমার শকুন্তলার আংটি। তোমাকে মনে পড়ল। তোমাকে চিনলাম। সেদিন আংটিটা তোমাকে না দিলে তো চিনতে পারতাম না। আংটিই আমার বুকে স্মৃতির অসংখ্য দীপ জ্বেলে দিল।

বহুকাল পেরিয়ে আমি এক সুদূর অতীতকে দেখছি। যে কাল পেছনে ছিল সে কাল সামনে এসে দাঁড়াল। আমার সামনে আর পেছন নেই। আমি বর্তমানের মধ্যেও নেই। কায়াহীন, অস্তিত্বহীন এক শূন্যে ভাসছি। কী অদ্ভুত আমার এই অনুভূতি।

তোমার চিন্তা আমাকে আচ্ছন্ন করল। আমার বিবেক তোমার জন্য ভাবতে বলল। আর আমি ষোলোটা বসন্ত ঋতু পার করে ফিরে যাচ্ছি আমার অতীতে। কখনো দিনে, কখনো রাতে। কতকাল আগের ঘটনা তবু কী আশ্চর্যভাবে সব মনে এলো। দীর্ঘকালের পুঞ্জীভূত অন্ধকার ভেদ করে তখন সূর্যোদয় হচ্ছে আমার মনের মধ্যে। সেদিকেই মুখ করে দাঁড়িয়ে ছিলাম। আমি আর বর্তমানের মধ্যে স্থিতু হয়ে থাকতে পারছি না। আমার বিবেক, আমার প্রেম তোমার সন্ধানে ঘর থেকে বাইরে বার করে আনল।

তুমি আছ। জীবনভর আমার অপেক্ষা করবে। এই পৃথিবীতে কোথাও না কোথাও আছ। পৃথিবী ঘুরে একদিন তোমাকে খুঁজে বার করবই। সারা জীবনটা যদি খুঁজতে কেটে যায়, তবু আমি থামব না। এরকম একটা সংকল্প নিয়ে আমি খুঁজেছি। যত দিন যেতে লাগল ব্যর্থতায় হতাশায় মনটা ভেঙে গেল। ঠিকানা ছাড়া বোধহয় কোনো গন্তব্যে পৌঁছনো যায় না। তবু একজন মানুষ সারা জীবন পথ চলে তো কোনো কিছুর প্রত্যাশা নিয়েই। সব মানুষ-ই তাই চলে। পাহাড়ে ওঠে সে চূড়োর দিকে চোখ রাখে, সাগরে ভাসে তীরের প্রত্যাশায়। তেমনি তোমাকে ফিরে পাবো মনে করেই তো পথে পথে ঘুরছি। একদিন ঠিক তোমার আমার দেখা হবে এই প্রত্যাশা নিয়ে আমি দৌড়ে গেছি যেদিকে মন চায়। কত দেশ, নগর, জনপদ, অরণ্য পাহাড় যে পার হয়েছি নিজেও ভালো করে তাদের নাম জানি না।

ক্লান্ত হয়ে গাছের ছায়াতে বসি। চোখের সামনে ধূ-ধূ করে ভরা দুপুর। ভারি নির্জন। নিরিবিলি ছায়ায় ঢাকা। তবু রোদ ঝলমলে আলোয় উজ্জ্বল। বহুদূর পর্যন্ত দেখা যায়। মনের ওপারে কুয়াশায় ঢাকা অতিকায় পাহাড়। খুব কাছ দিয়ে নাম না জানা নদী বয়ে যাচ্ছে। দুপুরের রোদ গলন্ত রূপোর মতো স্রোতে এসে মেশে। ঝির ঝির বাতাসে পাতারা অস্ফুট স্বরে অবিরল কথা বলে। গাছের ডালে ঘুঘু দম্পতি গদগদ স্বরে একে অপরকে ডাকে। আদর করে। চুমু খায়। এক অদ্ভুত স্বপ্নের

মায়া তৈরি হয়। এক মাকড়সা গাছের ডালে অদ্ভুত দ্রুততায় জাল বুনে চলেছে। বোনা শেষ হলে জালের কেন্দ্রে লুকোল। একভাবে সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মনে হলো অনুরূপ কোনো একটা জালের মধ্যে তুমিও নিজেকে লুকিয়ে রেখেছ। এরকম চিন্তার বাস্তবিক কোনো মূল্য নেই, তবু মনের ভেতর এরা রূপ পায়।

এক গভীর হতাশার সঙ্গে মিশে গেল এক তীব্র অন্বেষণের নেশা। লম্বা লম্বা পা ফেলে তুফান আমায় নিয়ে একের পর এক বনভূমি পেরিয়ে চললো। এত জোরে দৌড়তো যে, মনে হতো মাটিতে পা পড়ছে না তার। হাওয়ায় গা ভাসিয়ে যেন উড়ে যাচ্ছে। তার ক্ষুরের একটানা খট্-খট্ শব্দ প্রতিধ্বনিত হয়ে বনভূমিতে শত শত অশ্বের পদধ্বনি হয়ে বাজত। বনের পশুরা সন্ত্রস্ত হয়ে উঠতো। মাঝে মাঝে দিশেহারা হরিণদের দিকে ধেয়ে যেত তুফান। দৌড়ে যাওয়ার সময় কত হরিণ তুফানের সামনে দিয়ে ছিটকে বেরিয়ে যেত। আমার তীরের নিশানার মুখে পড়ে কেউ কেউ থমকে দাঁড়িয়ে বিপন্ন চোখ মেলে তাকিয়ে থাকত। ইচ্ছে করলেই তীর মেরে বধ করতে পারতাম তাকে। কিন্তু ভুল করেও একটা তীর ছুড়ে প্রাণীহত্যা করিনি। শিকার করার নাম করে আমি তোমাকেই খুঁজতাম। কণ্বমুনির নাম, মালিনী নদী, মুক্ত অরণ্যের অবস্থান কিছুই স্মরণে ছিল না। শিকারের খেলা করে আমার স্বপ্নের মুক্ত অরণ্যকেই খুঁজছিলাম। ব্যর্থ হয়নি আমার প্রয়াস।

মাত্র কদিন আগের কথা। শরতের সবুজ গাছের ছায়ায় চাপ চাপ বৃষ্টি ভেজা ঘাসে মুখ ডুবিয়ে চিতল হরিণের দল নিশ্চিন্তে ঘাস খাচ্ছিল। লম্বা লম্বা পা ফেলে তুফান নিঃশব্দে সেখানে এসে দাঁড়াল। শরনিক্ষেপের সেই পুরনো খেলা করতে আমি ধনুক উত্তোলন করেছি, অমনি বন থেকে একসাথে অনেকগুলি বালক বলে উঠল, 'রাজন্ সংবরণ করুণ আপনার শর। মহাত্মা কণ্বের অভয়ারণ্যে প্রাণীহত্যা নিষেধ। নিরীহ হরিণদের প্রাণে বধ করতে আপনার কি করুণা হয় না? ওরা তো আপনার কোনো ক্ষতি করেনি। তাহলে ওদের হত্যা করে নিজেকে নিষ্ঠুর করবেন কেন?'

ষোলো বছর আগে ঠিক এমনি করে পাহারাদার ঋষি বালকেরা আমাকে নিবৃত্ত করেছিল। আচমকা ঐ দৃশ্য দেখে দৌড়ে গেলাম সেই দিকে। ভাববার সময় নেই তখন। ক্ষিপ্র হাতে ধনুতে শর যোজনা করলাম। সিংহশিশুকে লক্ষ্য করে শরনিক্ষেপ করতে উদ্যত হয়েছি, তখনি কিশোর আমাকে নিবৃত্ত করার জন্য বলল, মহারাজ, আপনার সাহায্যের দরকার নেই। এই সিংহশিশু আমার খেলার সঙ্গী। ওকে ভয় করার কিছু নেই। বনের পশুরা বিশ্বাসঘাতক নয়।—কথাগুলোর ভেতর কী ছিল, কে জানে? থমকে দাঁড়িয়ে গেলাম।

কিশোরের দু'চোখ আমার চোখের ওপর স্থির। আমিও অপলক চেয়ে আছি তার দিকে। কিশোরের চোখ, মুখ, নাক, কান, চিবুক, শরীবের গড়ন সব আমার মতো। ওর মধ্যে আমি নিজেকে দেখছি। মানুষে মানুষে এত মিল হয় কেমন করে? এক দারুণ মুগ্ধ চমকে চমকে উঠল আমার ভেতরটা। আমি স্বপ্ন দেখছি? সব কেমন গোলমাল হয়ে গেল। নিজেকেই জিগ্যেস করি, এ আমি কাকে দেখছি? এর সঙ্গে আমার সম্পর্ক কী? ও আমার কে? ওকে কেন এত ভাল লাগছে? কিছু বুঝতে না পেবে পায়ে পায়ে ওর দিকে এগিয়ে যাই। এগোতে এগোতে মনে হলো ও আমার ছেলে। আমারই ছেলে। একেবারে আমার মতো দেখতে হয়েছে। ও যদি আমার ছেলে না হয়, তা হলে এসব অনুভূতি বুকের মধ্যে জমে থাকা কীসব জিনিস টিনিসকে হঠাৎ করে গলিয়ে দিল কেন, আমার কোন সন্তান হয়নি। বাৎসল্যের স্বাদ আমি পাইনি কখনো। ঐ কিশোরকে দেখে গভীর অনাস্বাদিত অপত্য স্নেহ আচমকা বুক থেকে উৎসারিত হয়ে ফোয়ারার মতো ফিনকি দিয়ে ছুটল তার দিকে। এই প্রথম মনে হল, এই সংসারে আমাকে 'বাবা' বলে ডাকার কেউ আছে। এই মুহূর্তে নিজেকে বড় ভগ্যবান মনে হলো। কতদিন কল্পনা করছি, একদিন আমার সন্তান দৌড়ে আসবেই আমার বুকে। বিশ্বাস কর, এই মুহূর্তে তুমিও যদি আমার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়তে তাহলে অন্যরকম লাগত। তা যে রকম ভালোই লাগুক না কেন, সর্বদমনকে বুকে পাওয়ার মতো ভালো লাগত না কখনো। সব ভালোলাগা কখনো একরকম নয়। প্রত্যেক ভালোলাগাই আলাদা। এক একজনেব সংস্পর্শ, সান্নিধ্য এক একরকম। কোনোটাই ছোট নয়।

শকুন্তলা, বিশ্বাস কর এসব বানানো গল্প নয়। নিজেকে নিয়ে আমি গল্প করতে বসেনি। জমিয়ে গল্প করার মতো মনের অবস্থা আমার নয়। এখন হল আমাদের পরস্পরকে চেনার সময়। হৃদয় দিয়ে বোঝার মুহূর্ত। মনের তো কোনো দর্পণ নেই, যা দিয়ে আমার ভেতরটা তোমাকে দেখাতে পারি। তাই তো জীবনের সংকট সময় মনকে, আত্মাকে মেলে ধরা সবচেয়ে জরুরী।

শকুন্তলা! ও শকুন্তলা! তুমি কি ক্ষমা করবে আমায়? আমাকে ক্ষমা না করে থাকতে পারবে? আমি তোমার ক্ষমার জন্য অনন্তকাল অপেক্ষা করব। আমার আমিময় জীবনে কেবল নিজেকে নিয়েই ব্যতিব্যস্ত ছিলাম সারাক্ষণ। তুমি যে আছ, এমন করে ভরে আছ আমার সমস্ত আমিত্ব; ধীবরের কাছ থেকে আংটি পাওয়ার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত মনে হয়নি আমার। ছিঃ আমি কী খারাপ! ভীষণ স্বার্থপর।

আমি সত্যিই কি খুব বাজে লোক? তা যদি হয় তা হলে দমবন্ধ বোবা কষ্টের পাষাণভার বয়ে নিয়ে তোমার কাছে ছুটে এলাম কেন? কী দরকার ছিল আমার? নারী-পুরুষকে নিয়ে পৃথিবীতে এরকম অজস্র ঘটনা ঘটছে অহরহ। এসব নতুন কিছু নয়। আমারও অনেক রানী আছে, নারী আছে। তবু তোমার কথা মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তুচ্ছ হয়ে গেল তারা। কেন? বোধহয় ওদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক দেহের! চোখের ভালোবাসা। শুধু ওইটুকু ভালোবাসা নিয়ে একজন অভাবী পুরুষ বাঁচতে পারে না। মনের ভালোবাসা না দিলে মনটা শুধু খাঁ খাঁ করে। ভেতরে ভেতরে সে কাঁদে। প্রেম, মমতা, সহানুভূতি দিয়ে যদি মনের মানুষটা কাঁদার আগেই নাই-ই বুঝতে পারল তাহলে তোমার কাছে পাগলের মতো ছুটে এসে নিজেকে ছোট করলাম কেন? আমাকে তুমি ক্ষমা করতে যদি না পার, তাহলে নিজেকে দীনহীনের মতো ছোট করতে যাব কোন্ দুঃখে? মন থেকে তোমাকে এতো বেশি করে চাই বলে তো নিজের অপরাধের জন্য ভুলের জন্য এমন করে ক্ষমা চাইছি? শকুন্তলা! বাইরের কান্না তো চোখে দেখা যায়। আমার কান্না সে কান্না নয় প্রিয়তমা। এ যে বুকের মধ্যে রক্তক্ষরণ!

আমার দুর্ভাগ্য যে তুমি আমাকে বুঝতে চাইছ না। অথচ, তোমার একটু ক্ষমা পেলে আমার জীবনটা অন্যরকম হতে পারতো। মনের মানুষ বলতে যা বোঝায়, যাকে জীবনের সব কথা অকপটে বলা যায়, তেমন মানুষ তুমি ছাড়া আর একজনও নেই। একথাটা এখন যেমন করে জেনেছি তেমন করে আগে না বোঝার দোষ আমারই। সেজন্য আমি নিজেকে ছোট করতে পারি, কিন্তু তোমাকে ছোট করব কী করে? তুমি যে সব দিক দিয়েই আমার চেয়ে ভালো। ভীষণ ভালো। তোমার আসল তুমিকে জানলে কখনো রাগ করে থাকতে না আমার ওপর। আসল আমি, কেই বা চেনে জানে? তাই তো মানুষ এত ভুল করে। ভুলের মাশুল দেয় সারা জীবন ধরে।

তীব্র অভিমানে যারা ভালোবাসার ওপর প্রতিশোধ নিতে যায় এসব কষ্ট তাদের একার নয় অন্যকেও ভোগ করতে হয়। দুর্ভাগ্যের কাছে কিংবা মনগড়া একটা রাগ অভিমানের কাছে হার মানতে আমি আসেনি। আবার ফিরে যাব বলেও আসেনি। নিজেকে ভারশূন্য করতেই এসেছি। তোমার আমার, সর্বদমনের জীবনকে নষ্ট করার কোনো অধিকার তোমার নেই। জীবনটাও শেষ হয়ে যায়নি। এখনও অনেক কিছু করা বাকি। কত সুন্দর কিছু করা হলো না। সর্বদমনের সঙ্গে পিতার কোনো সম্পর্ক গড়ে উঠল না। রাজসিংহাসনে তার অভিষেক হল না, তোমার আমার প্রেমের গান গাওয়া হলো না, মন খুলে দু'জনে একটু ঝগড়াও করা হলো না—এরই মধ্যে জীবনটা অর্থহীন হয়ে যাবে? না, না, কখনও না। ফুরিয়ে যাওয়া, হারিয়ে যাওয়া জীবনকে আমার নতুন করে ভরে নেব প্রেমের স্নিগ্ধ পরশে। বাঁচতে তারাই পারে যারা তীব্রভাবে বাঁচতে জানে।

শকুন্তলা, তুমি একটা জালের মধ্যে বাস করছ। ঐ জাল ছিঁড়ে বেরিয়ে এলেই টের পাবে হৃদয়টা হচ্ছে নীল আকাশের মতো অনন্ত। চারদিক গিয়ে মিশেছে দিগন্তে। মধ্যে কোথাও একটু ফাঁক নেই। সবটাই অনন্ত নীলিমায় নীল, আকাশের মতো যারা মুক্ত, উদার, বিশাল তারাই কেবল উছলে উছলে দৌড়ে যেতে পারে এই জীবনের পথ বেয়ে। তুমি কেন পারছ না? তোমার বাধা কোথায়? মনের মধ্যেই মুক্তি নিহিত। নিজে থেকে মুক্তি না চাইলে, বাইরে থেকে কেউ মুক্তি দিতে পারে

না। অথচ, তুমি একটু চাইলেই জীবনটা জীবনটা অন্যরকম হতে পারে। কেন, বোঝ না, —জীবনের যুদ্ধ প্রতিদিনের। প্রতি প্রহরে প্রত্যেক পুরুষ ও নারীকে অগণ্য পরীক্ষা দিয়েই হাতে হাত রেখে মৃত্যুর মুহূর্ত অবধি হাঁটতে হয়। এটাই ঘটনা। তোমার কি ধারণা, আমরা আর প্রেমের সম্পর্ক পাতাতে পারব না। একজনের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক রাখা গেল না বলে বৈরিতার সম্পর্ক রাখতে হবে এটাই বা কেমন কথা। মনের তটে সম্পর্কটা নোঙর করে রাখলে জোয়ারের জলে দোল খেতে তো পারে। সেও তা একরকম পাওয়া। তার ভেতরও একরকম গভীর সুখ বোধ আছে। তার কারণ ভালবাসা কোনো লিপ্ততা নয়, কোনো বিলাসও নয়—ভালোবাসা একটা প্রয়োজন। তোমার নিজের জন্য না হলেও সর্বদমনের কথা তো ভাবতে হবে। আমরা এখন নিজের জন্য বাঁচি না, সন্তানের ভেতরে বাঁচি। সর্বদমনের বাবা হিসেবে তোমার সঙ্গে আমার একটা সম্পর্ক থাকবেই বাকি জীবন। তুমি চাইলেও মুছে ফেলতে পারবে না। যা হবার হয়ে গেছে বাকি জীবনটা আমরা আবার নতুন করে বাঁচতে পারি। নিজেকে যে অবস্থার সঙ্গে বদলাতে না পারে, নবীকৃত করতে না পারে প্রতি মুহূর্ত, সে তো থেমেই আছে। তাকে সারা জীবন শুধু পস্তাতে হয়। তার থাকা না থাকা সমান। পথ বদল করে চলার আর এক নাম জীবন। জীবনের ডাকে সাড়া না দিয়ে তুমি একা থাকতে পারবে? একা থাকা বড় কষ্টের বড় যন্ত্রণার। আমাকে দুঃখ দিয়ে তুমি কি আনন্দিত হবে?

শকুন্তলার কথা :

স্বামী, সর্বদমনের পিতৃপরিচয় থেকে বঞ্চিত করার কোনো ইচ্ছে আমার নেই। তোমার ছেলেকে তুমি সঙ্গে করে নিয়ে গেলেও কিছু মনে করব না। সমাজে, সংসারে সন্তানের ওপর মায়ের কোনো দাবি নেই। মা শুধু সন্তানেব ভারবাহী। কিসের জোরে, কোন্ অধিকারে আমি তাকে নিজের কাছে রাখব?

সমাজের মানুষের কাছে ওর পিতৃত্ব নিয়ে একটা প্রশ্ন ছিল। তোমার পরিচয় দিয়ে লোকসমাজে পরিচিত করলে ওর আত্মাকেই অপমান করা হতো। পিতার পরিচয় ছাড়াই যে ওর চলে যাবে এটাই বিশ্বাস করতে শিখিয়েছিলাম। কোনো মায়ের পরিচয় অগৌরবের নয়, বেঁচে থাকার পক্ষে কোনো অসম্মানজনকও নয়; এই বোধটা সর্বদমনের ভেতর গেঁথে গিয়েছিল।

চিরদিন একটা নিয়ম চলে আসছে বলে অন্ধের মতো তাকে মেনে চলার কোনো সার্থকতা নেই। সবর্মদমন আমার দিনবদলের পতাকা বহন করে পিতৃপরিচয়হীন শিশুদের এবং তার মায়েদের সম্মান দেবার লড়াইয়ের পুরোভাগে থাকবে। পিতার পরিচয় ছাড়াই যে সন্তান মায়ের পরিচয় নিয়ে আত্মশ্লাঘা করতে পারে সর্বদমন সেই সংগ্রামের এক নয়া ইতিহাস সৃষ্টি করবে। যে মা সন্তানকে পেটে ধরে প্রসবের যন্ত্রণা ভোগ করে, পালনের কষ্ট ভোগ করে, তার সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য আনন্দ বিসর্জন দিয়ে তিল তিল করে বড় করে তোলে, যার ত্যাগে সন্তান জীবনের আলো দেখে, বেঁচে থাকে, সেই মা সমাজের বিচারে যে অপরাধই করুক সন্তানের ওপর তার দাবি, অধিকার থাকবে না কেন? অথচ একজন সন্তানের জীবনে পিতার চেয়ে মায়ের ভূমিকা অনেক বড়। তবু পুরুষশাসিত সমাজে সেই মাকে কোনো সম্মান দেওয়া হলো না। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের কষ্টিপাথরে নীতিকে যাচাই করে মায়ের অধিকার-অনধিকার বিচার করতে গেলে কতকগুলো নিষ্পাপ শিশুর জীবন যে বিষময় হয়ে ওঠে, সে কথাটা সমাজের মানুষ ভাবল না। পুরুষশাসিত সমাজের এই বিচার, অবজ্ঞা, অপমান, ক্ষমার অভাবকে আমি মন থেকে মেনে নিতে পারেনি। তাই মানবিক কারণে তোমার করুণা কিংবা দয়া চাইনি। সর্বদমনের কথা ভেবেও মাথা হেঁট করেনি। অবৈধ সন্তানও মানুষের সন্তান, মানুষের মর্যাদা যেন পায়। আমার এই দাবি আদায়ের অস্ত্র সর্বদমন।

তুমি আমার সে অস্ত্র কেড়ে নিতে এলে আজ?

রাজা, তুমি আমার টানে আসনি। সন্তানের খোঁজে এসেছ। তোমার সিংহাসনের উত্তরাধিকারীর সন্ধানে বেরিয়েছ। তাও ষোলো বছর পরে। অন্য রানীদের গর্ভে সন্তানের প্রতীক্ষা করছিলে। কিন্তু ঈশ্বর তোমাকে নিরাশ করেছেন। তুমি স্বীকার না করলেও আমি জানি, ধীবরের আংটি তোমার একটা অজুহাত মাত্র।

স্বামী, আমার খোঁজ তুমি না রাখলেও তোমার অনেক খবর আমি রাখতাম। সন্তান না হওয়ার মনোবেদনা আমাকে কষ্ট দিত। কারণ, তোমাব পুত্র আছে, কিন্তু তুমি তা জান না। জানার কোনো চেষ্টা করনি। তোমার ছেলেকে কেড়ে নেওয়ার কোনো মতলব আমার ছিল না। কিন্তু তাকে তোমার কাছে ফিরিয়ে দেওয়া ছিল এক সমস্যা। কথা নেই, বার্তা নেই হঠাৎ পিতার দাবি নিয়ে পুত্র যদি হাজির হত তোমার কাছে তাহলে ব্যাপারটা অন্যরকম হতো। সে মিলন দুজনের কাছে সম্মানজনক হতো না। সাবধানী মনটা আমাকে নিবৃত্ত করেছিল। সত্যি বলতে কি সর্বদমনের সামনে আমি অপমানিত হওয়ার আশঙ্কা করেছি। পরিস্থিতি বিশেষে মর্যাদা রক্ষার জন্য মানুষের নির্দয় হওয়াটা কোনো আশ্চর্যকর কিছু নয়। সম্ভ্রম এমন জিনিস যে তাকে আড়াল করার জন্য মানুষ নিজের সঙ্গে কত অভিনয়, কত ছলনা করে, কত মিথ্যে বলে। রূঢ় ব্যবহার করে। কুৎসিত বাক্য বলে। বিবেকহীন অমার্জিত আচরণ করতেও বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করে না। পাত্র-অপাত্র বিচার করে দেখার বুদ্ধিও তার লোপ পায়। পুত্র সর্বদমনকে নিয়ে রাজসভায় গিয়ে দাঁড়ালে আমাকে মুখ বুজে অপমান সহ্য করতে হত। সেই লজ্জা এবং বিড়ম্বনা থেকে দূরে থাকতে পুত্রকে কাছছাড়া করনি। সেও বড় হচ্ছে, মিছিমিছি তার আত্মসম্ভ্রমবোধকে বিপন্ন করার কোনো মানে হয় না। পুত্রের অভিষেকের বয়স হয়েছে। তাকে রাজসিংহাসন থেকে দূরে রাখা আমার ভীষণ অন্যায় হচ্ছে। প্রতি মুহূর্ত সেজন্য একটা যন্ত্রণা ছিল, অনুশোচনা ছিল, তবু তোমাদের মিলন ঘটানোর জন্য আমি কিছু করতে পারিনি।

একদিন আশ্চর্য একটা স্বপ্ন দেখলাম। সর্বদমনকে নিয়ে তোমার রাজসভায় গেছি। ঘোমটায় মুখ আমার ঢাকা। আমার মুখ দেখতে পাচ্ছ না তুমি। একজন সামান্য দীন প্রার্থী ভেবেই, পুত্রের দিকে চেয়ে বললে, বৎস, এই রমণী তোমার জননী হবে। তোমাদের প্রার্থনা কী বল?

মাথার ঘোমটা ফেলে দিয়ে আমি অনাবৃত করলাম মুখ। আমাকে দেখে তুমি কেমন চমকে গেলে। কিন্তু আমার আঁখি থেকে তুমি চোখ সরিয়ে নিতে পারলে না। তোমার ভুরু কুঁচকে গেছিল। মুখে সেই দীপ্তি আর নেই। চোখেমুখে একটা অস্বস্তির ভাব ফুটে উঠল তুমি বিব্রত। সংকোচে সিঁটিয়ে গেলে। প্রত্যাশায় ব্যথা লাগা চমকানো বিস্ময়ে আমি তোমার দিকে চেয়ে ছিলাম। স্বপ্নে তোমাকে ঘামতে দেখলাম। আমাকে চিনেও তুমি না চেনার ভান করলে। কপট বিস্ময় প্রকাশ করে জিগ্যেস করলে, তুমি কী চাও? রাজসভায় এসেছ কেন? এখানে তোমাকে আসতে দিলো কে?

প্রহরী! প্রহরী! বলে, এমন ডাকাডাকি শুরু কবলে, যেন একটা বিরাট অন্যায় করে ফেলেছি তাই, তাড়াতাড়ি বিতাড়িত করতে চাও। আমি কিন্তু অবিচলিতভাবে দাঁড়িয়ে রইলাম। এমন করে তোমার কাছে অবাঞ্ছিত হয়ে যাব ভাবিনি। স্বপ্ন দর্শনেও নয়। বড় দুঃখ হলো। ভীষণ অপমানিত বোধ করলাম। স্বপ্নেই দু'কানের তীব্র জ্বালা অনুভব করলাম। প্রহরী এসে পৌঁছানোর আগেই বললাম, মহারাজ, বিচলিত হওয়ার কিছু নেই। কোনো প্রার্থনা নিয়ে আসনি। নিজের অধিকারে এসেছি। আমাকে কি চিনতে পারছেন মহারাজ? আমি শকুন্তলা। না-চেনার ভাণ করে আমাদের সম্পর্ককে অস্বীকার করতে পারেন, কিন্তু আপনার নামাঙ্কিত এই অঙ্গুরীয় মিথ্যে নয়। এই কিশোর আপনার পুত্র। সেটা মিথ্যে নয়। বাস্তব সত্য।

স্বপ্নে তোমাকে অট্টহাসি করতে দেখলাম। তোমার সঙ্গে গোটা রাজসভা অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল। হাসতে হাসতে অম্লান বদনে কেমন বললে, আমার তো কোনো পুত্র নেই। আমি অপুত্রক। তুমি দুষ্টচরিত্রের রমণী। আমাকে বিভ্রান্ত করে ফাঁদে ফেলার জন্য নামাঙ্কিত ঐ অঙ্গুরী তুমি তৈরি করেছ। আমার সম্ভ্রম, মর্যাদা নিয়ে তুমি খেলা করছ। তোমার সঙ্গে ঐ কিশোরের মিথ্যে পিতৃপরিচয় দিতে তোমার বুক কাঁপল না। স্বর্গের বেশ্যারাও রাজরোষের ভয় করে। তোমার প্রাণে সে ভয়টুকুও নেই। আশ্চর্য তোমার সাহস।

আমি সাহস হারালাম না। তীব্র অপমানের সঙ্গে নিরুপায় অসহায়তা মিশে গিয়ে আমার কণ্ঠস্বরকে আর্ত করে তুলল। বললাম; মহারাজ, আমি শকুন্তলা। মহাতাপস কণ্বমুনির আশ্রমে আপনি গান্ধর্ব মতে আমাকে বিবাহ করেছিলেন। এই পুত্র আমাদের প্রণয়কুসুম। নিজ পুত্রকে গ্রহণ করে আমাকে শুধু ভারমুক্ত করুন।

তোমার চোখে-মুখে কৌতুক। বললে, চমৎকার একটা গল্প ফেঁদেছে যা হোক। একজন অজ্ঞাতকুলশীল কিশোরকে আমার পুত্র বলে চালানো অপরাধের শাস্তি কী জানো?

মহারাজ, এ পুত্র অজ্ঞাতকুলশীল নয়। আপনার নিজের জন্মই রহস্যে ঢাকা বলে এমন হীন সন্দেহ করতে পারলেন।

ক্রোধে তোমার দু'চোখ জ্বলে উঠল রাজা। বললে, তোমার স্পর্ধা আমার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটাচ্ছে।

মহারাজ যা সত্য তাকে মানতে এতো ভয় কেন? আপনার রক্তচক্ষু, ক্রোধের আস্ফালন আমাকে একটুও বিচলিত করল না। ভয় পাওয়ার কোনো কাজ আমি করিনি। বরং আপনি ঠুন্‌কো মর্যাদার ভয়ে একটা সত্যকে মিথ্যে দিয়ে ঢাকতে চাইছেন। কী লাভ? আপনার দাদামশাই মরুত্ত* আপনার অবৈধ জন্মকে কিন্তু মেনে নিয়েছিলেন। কিশোরের বৈধ পিতা হয়েও আপনি নিজের সন্তানকে স্বীকার করতে লজ্জা পাচ্ছেন। ধিক আপনার আত্মসম্মানজ্ঞান।

অবলীলায় তুমি বললে, চমৎকার গল্প ফেঁদেছ বিদ্যেধরী। তোমাকে আমি চিনি না। আগে কখনো দেখেনি। তোমার মতো একজন কুলটার সঙ্গে আমার মতো কুলশীল রাজার কোনো সম্পর্ক থাকতে পারে না। বারাঙ্গনারাই নির্লজ্জের মতো জনসমক্ষে এভাবে নিজের দুষ্কৃতি, অন্যায়, অপরাধ অন্যের ওপর চাপিয়ে দেওয়ায় দুঃসাহস করে। সতী-সাধ্বী রমণী এরকম সম্ভ্রহানিকর কোনো দাবিই করে না।

স্বপ্নের মধ্যে আমি আশ্চর্য হয়ে তোমার মুখের দিকে চেয়ে রইলাম। আমার দু'চোখ দিয়ে জলের ধারা গড়িয়ে পড়েছিল। ইচ্ছে করল, ঐখানেই আত্মহত্যা করে তোমার অপমানের প্রতিশোধ নেই। কিন্তু সর্বদমনের মুখের দিকে চেয়ে থাকতে পারলাম না। ভীষণ অপমানিত হলে মানুষ যেমন অসহায় অভিমান বুকে করে স্থান ত্যাগ করে, আমিও তেমনি দুঃখ, রাগ, অভিমান নিয়ে তোমার রাজসভা ছেড়ে চলে যেতে উদ্যত হলাম। বললাম, আপনার ছেলেকে ছেলে বলে মেনে নিলে কোনো অসম্মান হতো না। এ ছেলে জারজ নয়। আপনার ঔরসে এর জন্ম। আমিও চরিত্রহীন নই। মহারাজ এত কথার পরেও যদি আপনার মনে দ্বিধা থাকে, তাহলে আমি নিজেই এখন থেকে চলে যাচ্ছি। আপনার মতো একজন প্রবঞ্চক লম্পটের সঙ্গে কোনো সম্বন্ধই রাখতে চাই না। আপনি ছাড়াও আমার চলে যাবে, যেমন এতকাল চলে এসেছে। কপালে থাকলে এই ছেলে রাজা হয়ে আপনার অপমানের প্রতিশোধ নেবে একদিন।

সেই মুহূর্তে আমার ঘুম ভেঙে গেল। চোখ খুলে দেখি স্বপ্নের সেই রাজসভাও নেই, তুমিও না। আমি সর্বদমনের পাশে শুয়ে আছি। তার গায়ের ওপর আমার একখানা হাত শিথিল ভাবে লেগে আছে।

মনটা খারাপ হয়ে গেল। তোমার কাছে স্বেচ্ছায় ফেরার ইচ্ছেটা আমার মরে গেল। অপমান এবং আত্মসম্ভ্রম হারানোর ভয়ে আমি তোমার ছায়া পর্যন্ত মাড়াতে যাইনি। তুমি তপোবনে এসেছ জেনেও লজ্জায় তোমার সঙ্গে দেখা পর্যন্ত করতে যাইনি। সর্বদমনের ওপর তুমি যে অবিচার করেছে, তার প্রতিবাদ করতেই নিজেকে লুকিয়ে রেখেছি। আমার ভেতর মিথ্যাচার ব্যাপারটা নেই বলেই এই মিথ্যাচারী ভণ্ড পৃথিবীতে আমার এত হেনস্তা।

নিজেকে দিয়েই বুঝেছি, কোনো জিনিস জোর করে আদায় করা যায় না। অধিকারের দাবিতে জোর করে কিছু পেতে গেলে পরিণামে কী ঘটে, কী হতে পারে আমার সাবধানী মনটা স্বপ্নবৃত্তান্ত থেকে তার পাঠ নিয়েছে। স্বামী, কোনো মানুষই অনুকম্পা চায় না, কারো করুণা, সহানুভূতিও সে চায় না, সে চায় মর্যাদা, সম্মান। আত্মমর্যাদা প্রত্যাশা করা আমার কি খুব অন্যায় হয়েছে? একজন মানুষ জীবনে যা কিছু পায়, অথবা পায় না, সে তার নিজের কৃতিত্বে এবং দোষে। কাঙালের

* সংবর্ত ঋষির ঔরসে তুর্বসুবংশীয় মরুত্ত রাজার কন্যা সম্মতার গর্ভে এঁর জন্ম।

মতো, লোভীর মতো তোমাকে চেয়ে পেয়েছি কী? মন খারাপ করা বিষণ্ণতা, অপমান, লজ্জা নিয়ে আমি সবার চোখে অপরাধী হয়ে দীন হীন জীবন যাপন করছি। আমার মতো দুঃখী কেউ ছিল না স্বামী। আমার চারধারে শূন্যতা শুধু শূন্যতা। জোর করে জীবনে লজ্জা পাওয়া যায়, গ্লানি পাওয়া যায় কিন্তু কোনো আনন্দই যে জোর করে পাওয়া যায় না, সেদিন বুঝিনি। নিজে থেকে স্বেচ্ছায় কেউ কিছু না দিলে, তাতে পাওয়ার আনন্দ থাকে না। জোর করে নিতে গেল শুধু বিড়ম্বনাই জোটে। একপক্ষের দয়ায়, কিংবা অন্যপক্ষের ঘৃণায় নয়, উভয়পক্ষের উদাসীনতাতেও নয়, দুপক্ষের গভীর শ্রদ্ধা, অনুরাগ, ভালোবাসা মর্যাদা ছাড়া একে অন্যাকে সম্পূর্ণ করে না পেলে আনন্দও পরিপূর্ণ হয় না। মন যা চায়, তাই যে সব সময় বাস্তবে পাওয়ার ঘর ভরে দেবে এমনও নয়। চাওয়া ও পাওয়াকে সবসময় আলাদা করে যে না ভাবে, তাকে আমার মতো সারা জীবন পস্তাতে হয়।

তোমার ওপর আমার অনেক রাগ, অভিমান জমা হয়ে আছে। মন থেকে যে তোমাকে চাই না, এ কথা জোর দিয়ে বলতে পারব না। হয়তো আগের চেয়েও বেশি করে চাই। সেই চাওয়াটা প্রেমের, না প্রয়োজনের তা জানি না। মনকে খুঁচিয়ে সে কথা জেনেই বা কী হবে? নিজের জন্য ভাবি না, নিজেকে নিয়ে আমি যা খুশি করতে পারি। নিজেকে নিয়ে যা খুশি করা প্রত্যেকের ব্যাক্তিগত স্বাধীনতার ব্যাপার। কিন্তু নিজের জেদে নিজের ওপর প্রতিশোধ নিতে গিয়ে সর্বদমনের জীবনকে তো আর নষ্ট করতে পারি না। সে তার পিতার সঙ্গে তীব্রভাবে বাঁচতে চায়। এই চাওয়াটা কোনো অন্যায় নয়। আজ আমার যা কিছু চাওয়া, পাওয়া তা শুধু সর্বদমনকে ঘিরে। আমি তো মা। সন্তানের সুখের জন্য, মঙ্গলের জন্য তোমার কাছে হেরে যেতে আমার কোনো লজ্জা নেই। কে জানে, হয়তো এই হেরে যাওয়াটাই আমার সবচেয়ে বড় জেতা।

স্বামী, মানুষের জীবনটা বড় বিচিত্র। মনটাও অদ্ভুত। হঠাৎ করে যোলো বছর আগের কথাটা পুনরুচ্চারিত হয়ে আমাকে চমকে দিল। শকুন্তলা তুমি আমার সর্বস্ব। তুমি আমার সুখ আমার দুখ। তুমি আমার জীবন, মরণ আমার অস্তিত্ব, অনস্বিত্ব। দারুণ অভিমান হলো। মনে মনে বললাম, মিথ্যোবাদী। প্রতারক, লম্পট। কথাগুলো উচ্চারণ করতে বুকটা ভেঙে গেল। অনুশোচনা হলো। নিজেকে বড় নিষ্ঠুর মনে হলো। ষোলো বছর আগের ঐ কথাগুলো বুকের ভেতর নরম সব কিছুকে কার্পাস তুলোর মতো পিঁজে দিয়ে টংকারে আর উৎসারে উড়িয়ে দিচ্ছিল আকাশময়। ভীষণ অবসাদ লাগছিল। বড় একা মনে হচ্ছিল।

জানালার কাছে শিক ধরে দাঁড়িয়ে রইলাম। জানলা দিয়ে চাঁদের আলো মুখে এসে পড়ল। মনে হলো, চাঁদের স্নিগ্ধ আলো আমার ভেতরের সব ব্যথা, তাপকে নিঃশেষে শুষে নিল। এক গভীর ভালোবাসার অনুভূতি সমর্পণের সুখে আমার ভেতর ভরে দিল। গুনিগুনিয়ে উঠল ভেতরটা। মুগ্ধ কণ্ঠে নিজের মনে গাইছিলাম 'তুমি আমায় ডেকেছিলে ছুটির নিমন্ত্রণে, অমাার ছুটি ফুরিয়ে গেছে কখন অন্যমনে— হঠাৎ আমার কণ্ঠস্বর থেমে গেল। এই গান আমার চেতনার ভেতর এক নতুন মানে বয়ে নিয়ে এল। স্তব্ধ হয়ে বাইরের চন্দ্রালোকিত বন, পাহাড়, জঙ্গলের দিকে চেয়ে রইলাম। আমার গন্তব্যপথ কুটির থেকে সুদূরের দিকে চলে গেছে। বন্ধন নয়, বন্দীত্ব ছিন্ন করার জন্যই আকাশের নক্ষত্রেরা হাতছানি দিয়ে ডাকছে। নিজের মনে মনে বলছি, কত কী বাকি এখন। কত সুন্দর কিছু হলো না। জীবনকে ভালো করে দেখা হলো না। জানা হল না। স্বামীর প্রেম, আদর ভালো করে পাওয়া হল না। পুত্রকে তার যোগ্য আসনে বসানো হল না। তার অভিষেক করা হল না, আমারও সকলকে নিয়ে সংসার করা হলো না—এসব বাদ দিয়ে, অচরিতার্থ রেখে, নিজেকে এমন করে বঞ্চিত করে, নিজের কাছে হেরে গিয়ে কী সুখ আমি পাব? আমার কোন্ স্বর্গলাভ হবে? এ জীবনে তার মূল্য কী? শূন্যতা নিয়ে বাঁচতে পারে কেউ? ক্ষোভে নয়, অভিমানে নয়, রাগে নয়, নিছক এক গভীর শূন্যতাবোধ থেকে অনুশোচনা থেকে কথাগুলো নিরুচ্চারে বললাম। আমার খেয়াল, খুশি, মান, অভিমানের মূল্যে দুষ্মন্ত বা তার ছেলের জীবনকে নষ্ট করার কোনো অধিকার আমার নেই। এদের ভেতরে সুখে-শান্তিতে বেঁচে থাকাই নারীজীবনের সার্থকতা। মনটা হঠাৎ-ই বদলে গেল। নিজেও কম অবাক হলাম না।

এক গভীর সুখের শান্ত স্নিগ্ধ ছায়ায় শুয়ে লম্বা ঘুম দিতে বড় ইচ্ছে করছে। মনে হলো ,

যুদ্ধ শেষ। এবার ঘরের ফেরার পালা। সংবেদনশীল একজন উপযুক্ত পুরুষের কাছে আমার প্রতিষ্ঠা ও মর্যাদা চেয়েছিলাম। সে আকাঙ্খা পূরণ হয়ে যাওয়ার আনন্দে আমি আত্মহারা। আমার বুকে জমানো ব্যর্থ প্রেমের কান্না, অভিমান নিয়ে দৌড়ে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে ইচ্ছে হচ্ছে দুষ্মন্তের বুকে। এক পরিপূর্ণ আনন্দে, বেদনায় তার হৃদয়কে মথিত করে একটা অন্য আনন্দে ভরে ওঠার জন্য মনটা আকুল হয়ে উঠেছিল। এখন পৃথিবীর আর কোনো জটিলতাকে নয়, শুধু দুষ্মন্তকেই বেশি করে চাই। আমার মতো একথা বোধহয় বেশি করে জানে না কেউ। মেয়েদের ভালোবাসার সঙ্গে নির্ভরতা আর আত্মবিসর্জনের মোহময় মাদকতা এমনভাবে মিশে থাকে যে তার থেকে মুক্তি নেই তাদের। আর সেই কারণেই স্বামীদের মধ্যে তারা বেঁচে থাকতে চায়। জীবনের সুদীর্ঘ পথের ঘনিষ্ঠতম এই সঙ্গীটি ছাড়া জীবনের একাকীত্ব, নিঃসঙ্গতার শূন্যতা আর কোনো সম্পর্কে দিয়ে পূরণ হয় না। এ এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা।

নির্জনতায় দাঁড়িয়ে এ রকম একটা অনুভূতি ক্ষণে ক্ষণে আমাকে চমকে দিয়ে গেল। আমার গায়ে কাঁটা দিল। ভেতরে ভেতরে এক অদ্ভুত অকারণ আনন্দ ঢেউ দিয়ে গেল। চুপচাপ একা ঘরের ভেতর বসে থাকতে থাকতে বারংবার মনে হলো, জীবনে এই রকম কোনো যতির প্রয়োজন আছে। নইলে নিজেকে সম্পূর্ণ করে চেনা হয় না। একা একা দীর্ঘ পথ চলা বড় ক্লান্তিকর এবং একঘেয়ে। দুষ্মন্ত তপোবনে প্রত্যাগমন করা থেকে তীব্রভাবে তা অনুভব করলাম। বিদ্যুৎচমকের মতো এক গভীর শূন্যতার সঙ্গে মিশে গেল এক তীব্র ভালোবাসা। যে ভালোবাসা শুধু আমার একার। যার ভাগ আর কাউকে দেওয়া যায় না। এমন কি সর্বদমনকেও নয়। এখনও আমার জীবনের কেন্দ্রবিন্দুতে দাঁড়িয়ে আছে দুষ্মন্ত। আমার প্রাণে তার জন্যে এখনও অনেক ভালোবাসা আছে। ভালোবাসায় প্রাণ আমার ভর পুর। প্রেমের পিপাসা তো মেটেনি। সেই আকণ্ঠ পিপাসা নিয়ে যৌবনের উদ্দাম দিনগুলোর ভেতর, বার বার ফিরে গেলাম।

পুবের আকাশ সবে লাল হচ্ছে। মালিনী ঘাটের দিক থেকে ভোরের সূর্যবন্দনার সুর ভেসে আসছে। গাছের ডালে সবুজ পাতার আড়ালে পাখিরা নড়ে-চড়ে বসতে শুরু করেছে। একসঙ্গে কিচির-মিচির করে শোরগোল করছে। কুঁজো বক দেবদারু গাছের মাথায় বসে মাথা ঝুঁকিয়ে আর একবার মাথা উঁচিয়ে সদ্য ঘুমভাঙা চোখে সূর্যের দিকে চেয়ে দেখল। তারপর কোয়াক্ কোয়াক্ করে ডাল থেকে লাফিয়ে শূন্যে ঝাঁপ দিল। নীল আকাশের বুকে ডানা মেলে দিয়ে উড়ে গেল অনন্তের অভিমুখে।

বন্ধ দরজার কপাটে টোকা দেওয়ার শব্দ হলো কয়েকবার। ঘরের ভেতর থেকে জিগ্যেস করলাম, কে?

বাইরে থেকে কোনো জবাব এল না। মনে ভাবলাম, ভুল শুনেছি তাহলে। সদ্য ঘুম ভাঙার থমথমে স্তব্ধতার মধ্যে এক তীব্র উৎকর্ণতা নিয়ে চেয়ে থাকি দরজার দিকে। কিছুক্ষণ পর দরজায় টোকা পড়ল আবার।

অনসূয়া প্রিয়ংবদা এতো সাবধানে দরজার কপাটে শব্দ করে না; নাম ধরে ডাকে আর দুম্-দুম্ করে দরজা ধাক্কা দেয়। এ শব্দ একটু অন্যরকম। সম্পূর্ণ আলাদা। এত ভোরে তাহলে কে এল?

ভোরের মৃদু আলোয় ঝলমল করছে চারদিক। কপাটের ফাঁক দিয়ে বাইরে দরজার কাছেই একজনকে দাঁড়ানো অবস্থায় দেখা যাচ্ছে। আশ্রমের পরিচ্ছদ তার গায়ে নেই। স্পষ্ট বোঝা না গেলেও অপেক্ষামান মানুষটি যে পুরুষ তাতে সন্দেহ ছিল না। সর্বাগ্রে দুষ্মন্তের কথাটাই মনে পড়ল। বুকের ভেতরটা ধড়াস করে উঠল। সারা শরীর বিদ্যুৎ খেলে গেল। দুষ্মন্ত তাহলে এল শেষ পর্যন্ত। এক দারুণ মুগ্ধ চমকে চমকে গেল আমার ভেতরটা। তীব্র উত্তেজনা ও আনন্দে আমার হৃদয় স্পন্দিত হতে লাগল।

দরজা খুলতেই তার উষ্ণ নিশ্বাস আমার গায়ে পড়ল। কপাট ধরে স্থির হয়ে সামনে দাঁড়িয়ে

আছি। ওর চোখের মধ্যে আমার চোখের দৃষ্টি হঠাৎ এমন করে ফেলল যেন আমি একটু নড়াচড়া করতে না পারি। আমার শরীর সিরসির করে ওঠল। চোখের পাতায় পাতায়, নিঃশ্বাসের উষ্ণতায় মিলন হলো। সেই প্রথম টের পেলাম, স্বামীদের অনেক কিছু স্ত্রীদের শরীরে, মনে ঘুমিয়ে থাকে। তাই তাকে দেখামাত্র আমার ভেতরটা জমাট বাঁধা কঠিন বরফের মতো রাগ, অভিমান হঠাৎ গলে যেতে লাগল দীর্ঘ বিরহের তীব্র জ্বালা ধরা উষ্ণতায়। মনে হচ্ছিল, সমস্ত শরীরটাই হিমবাহের মতো নিঃশব্দে দুষ্মন্তের সমুদ্রের দিকে বয়ে চলেছে।

আমার কথা বলার শক্তি ছিল না। এক মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকে দেখছিলাম, মুখে বার্ধক্যের ছাপ পড়েছে। চুলে পাক ধরেছে। কিন্তু ঠোঁটে সেই অনাবিল হাসিটি এখনও অটুট আছে। হাসি হাসি মুখ করে সে শুধু আমার ডাকের অপেক্ষা করছে। আমার স্নিগ্ধ ক্ষমায় ধন্য হওয়ার জন্যেই দ্বারে দাঁড়িয়ে যেন কৃপা ভিক্ষা করছে।

কিছুক্ষণ অপলক আমার মুখের দিকে চেয়ে থেকে নিচু স্বরে বলল, আমার ওপর তোমার অনেক রাগ, অভিমান, অশ্রদ্ধা, ঘৃণা, বিদ্বেষ জমে আছে, তোমার কাছে ক্ষমা চাওয়ার মুখ আমার নেই। তবু বলব আমার সব দোষ তুমি ক্ষমা করে দাও। রাজ্যের নানারকম সংকটের ভেতর, অসুরদের সঙ্গে নিত্য বিরোধ এবং সংঘর্ষ একদিনও আমাকে শান্তিতে থাকতে দেয়নি। অকপটে স্বীকার করছি, আমার বিপন্ন বিব্রত অবস্থার ভেতর তোমার কথা ভাবার অবসর পাইনি। কর্মব্যস্ততার মধ্যে সত্যিই তোমার কথা বিস্মৃত হয়েছিলাম।

দুষ্মন্তের কথা শুনে আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। তার ঔদাসীন্যে মনটা খারাপ হয়ে গেল। অনাদরের আত্মগ্লানিতে বুকটা টনটন করতে লাগল। দুষ্মন্ত আমার মনের অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করে বলল—পুরুষেরা স্তুতি করে মেয়েদের বোকা বানায়। মন গলানো কথা বলে, তাদের দুর্বলতার দুর্গে হানা দেয়। কিন্তু আমি তোমার আত্মাকে দেখেছি। তোমার ভেতর একটা শক্ত মনের মেয়ে আছে। যে পুরুষের স্তুতি দিয়ে গড়া দুর্গ ভেঙে ফেলে যে কোনো সময় ভয়ঙ্করী হতে পারে। বিপদের কথা বুঝেই আমি ফাঁকি দিয়ে তোমার হৃদয় জয় করতে চাইনি। যা সত্যি, পাঁচটা মিথ্যে দিয়ে ঢেকে, বিকৃত করে আমার প্রেমকে অসম্মান করেনি। যাকে সত্যিকারের ভালোবাসি, শ্রদ্ধা করি, অকপটে তার কাছে নিজের দোষ-ত্রুটি, অপরাধ স্বীকার করার ভেতর কোনো লজ্জা নেই। জীবনটাকে লজ্জা করে, কেঁদে ভাসিয়ে দেওয়ার চেয়ে ক্ষমা চেয়ে, আপস করে সহজ করে নেওয়াই ভালো। নিজের দুঃখ, যন্ত্রণাকে বুকের ভারি বোঝা করে কী লাভ? তাতে পথ চলাই হয় কষ্টকর। রানীর কাছে তো আমার লজ্জা শরম, অপমানের কিছু নেই। তাই, আমার সব অপরাধ, ত্রুটি স্বীকার করে আমার রানীকে নিতে এসেছি।

বুকের গভীর থেকে উৎসারিত অভিমানের সঙ্গে বেরিয়ে এল আর্ত জিজ্ঞাসা।—কেন এলে? বড় দেরি করে ফিরলে রাজা। আমার জীবনের ষোলটা বসন্ত ব্যর্থ হয়ে কেঁদে ফিরে গেল। পারবে কি সেই ব্যর্থ বসন্তের দিনগুলো ফেরাতে?

রানী, বসন্তের কোনো শেষ নেই। শীতের স্থবিরতা ভাঙতে বসন্ত প্রাণের লাবণ্যে ভরপুর হয়ে ওঠে। জীবনেও বসন্তের কোনো আদি-অন্ত নেই। বার বার আসে। বসন্ত কোন দিন দেউলে হয়ে যায় না। বাইরে বসন্ত সকলের চোখ পড়ে, কিন্তু মনের বসন্তের ঐশ্বর্য চোখে দেখা যায় না। মনের বসন্তের কোনো রাত নেই, দিন নেই, তার আদি নেই অন্ত নেই। সে চিরন্তন।

ওর কথা শুনে বুক আমার থরথর করে কাঁপতে লাগল। রাগে নয়, দুঃখে নয়—আনন্দে। স্তম্ভিত বিস্ময়ে আমি চেয়ে আছি ওর দিকে। ভোরের শুভ্র আলো পড়েছে ওর অনিন্দিত সুন্দর মুখের উপর। আমার সমস্ত ইন্দ্রিয় কান পেতে আছে ওর কথা শোনার জন্য। তবু বিশ্বাস-অবিশ্বাসের আর্তিতে আমার মুখে-চোখে কেমন একটা বিবর্ণ মলিন ভাব ফুটে ওঠল। কাঁপা গলায় আস্তে আস্তে বললাম, ষোলে বছর পরে বিস্মৃত শকুন্তলাকে হঠাৎ দরকার হল কেন রাজন্? কী দরকার ছিল এই দয়া দেখানোর! আমি তো দয়া চাইনি। দয়া, অনুকম্পা, অনুগ্রহে প্রেম নোংরা হয়ে যায়। শ্রদ্ধা-বিশ্বাসের ভিতের ওপর প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। স্ত্রীর দাবি ছাড়া আর কোনো দাম রাজনের কাছে পাইনি।

দুষ্মন্ত একটু থতমত খেয়ে গেল। নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। হাওয়ায় তার লম্বা চুল উড়ছিল। কিন্তু তার দুটি চোখ আমার চোখের ওপর স্থির। আমাকে পর্যবেক্ষণ করতে করতে ওর ভুরু দুটি কুঁচকে গেল। আমার কেমন অস্বস্তি লাগল। দুষ্মন্তের চোখের দৃষ্টি নিরীহ। মুখে মৃদু হাসি, বলল, রানী, তোমার হাতে আমার পরানোর অঙ্গুরীয়টি কোথায়?

ওর অবাক করা প্রশ্নে আমি একটুও সংকোচ বোধ করলাম না। কেমন একটা জ্বালা ধরা অনুভূতিতে আমার ভেতরটা শক্ত হল। তাচ্ছিল্য করে বললাম, সর্বদমনের জ্ঞানবুদ্ধি হলে ঐ আংটি মালিনীর জলে ছুঁড়ে ফেলেছি। ওই আংটির কোন মূল্য নেই আমার কাছে। বিশ্বাসঘাতক প্রেমিকের অবিশ্বাসের আংটি বয়ে বেড়ানোর সার্থকতা কী? অপমানের অভিজ্ঞান প্রতিদিন অনুশোচনায় পাগল করে দেয়। তাই যন্ত্রণা থেকে অপমান থেকে নিজেকে মুক্ত করতে ঐ আংটি মালিনীর জলে রাগ করে ছুঁড়ে ফেলেছিলাম।

ছুঁড়ে ফেলতে তোমার কষ্ট হলো না? একবারও আমার কথা মনে হয়নি! অপমানে বিবর্ণ হয়ে দুষ্মন্ত কথাগুলো কষ্টের সঙ্গে উচ্চারণ করল।

আমারও বুক থেকে লম্বা একটা দীর্ঘশ্বাস উঠে এল। বেশ একটু অপ্রস্তুত হয়ে বললাম, কিছু কিছু কষ্ট থাকে একান্ত একার। অন্যাকে তা বুঝিয়ে বলা যায় না। তোমার নীরবতা আমাকে নিষ্ঠুর করেছিল। রাজা, হাতের একটা আঙুল স্বেচ্ছায় আহূতি দিতে কার না কষ্ট হয়? কিন্তু তাই বলে কি আহূতি দেয়া বন্ধ থাকে। বিশ্বাস, শ্রদ্ধা, ভক্তি, সংস্কার আহূতির সঙ্গে এত গভীর করে মিশে থাকে যে ওটাকে দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করার কোনো কষ্ট মনে থাকে না। বরং আত্মাহূতির আলো পড়ে প্রেম, ভক্তি, শ্রদ্ধা আরো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তোমার দেওয়া আংটি আমার প্রেমের অসম্মান করেছিল। অপমানের আত্মগ্লানিতে তোমার গৌরবই দিন দিন মলিন হয়ে পড়ছিল! বার বার মনে হচ্ছিল, তোমার হৃদয়ে আমি যখন গৌরবে অধিষ্ঠিত নই তখন ঐ আংটি আমার হাতে থাকা না থাকার মূল্য একই। তাই ও আংটি মালিনীর জলে নিক্ষেপ করে আমার প্রেমের দীপকে বুকে জ্বালিয়ে রাখি। বাইরের ঝড় তুফানে নেভার ভয় থাকল না আর। শুধু আমার করেই পাব এখন।

রানী, তোমার সুধাভরা কথার সুগন্ধে বুক ভরে যায়। কথা হারিয়ে যায়। তবু কী আশ্চর্য, অভিজ্ঞান হারিয়েও তুমি কিছু হারাওনি। আংটিটা সত্যিই একটা বাইরে ব্যাপার। তবু ওর একটা মূল্য আছে। এই আংটিই কিন্তু আমাকে তোমার কাছে টেনে আনল। অবজ্ঞা করে একে ফেলে দেওয়া সহজ, কিন্তু তাতে আংটির মূল্য কিংবা গৌরব কমে না। বরং আরো বেশি তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে।

কথাগুলো বলে দুষ্মন্ত তার হাতখানা আমার দিকে মেলে ধরল। কনিষ্ঠ অঙ্গুলির আংটিটার দিকে চোখ রেখে বলল, দ্যাখ তো এটাই সেই অঙ্গুরীয় কি না?

বিস্ময়টাকে চট করে লুকিয়ে বললাম—সে রকম দেখতে। আসল নকল জানি না। আমার মন গলানোর কোনো নতুন কৌশলও হতে পারে এ আংটি।

মাথা নাড়ল দুষ্মন্ত। নিরীহভাবে বলল, ঠিক কথা। কিন্তু তোমার আংটি নিক্ষেপের সংবাদ তো আমার জানার কথা নয়। হঠাৎ এক ধীবরের কাছে আংটিটা পাওয়া গেল। মাছের পেটে সে পেয়েছে। এই আংটি হাতে করতে তোমার স্মৃতি চোখের ওপর জ্বল জ্বল করে উঠল। বুকে আমার অনুশোচনা জাগল। রানী আমার বিস্মৃতির কোনো ক্ষমা হয় না। অনুতপ্তচিত্তে আমি তোমার করুণা ভিক্ষা করছি। সর্বদমন আর তোমাকে নিয়ে নতুন করে জীবন শুরু করার সুযোগ দাও আমাকে। ভুল শোধরানোর সময়টুকু দিয়ে আমাকে ধন্য করে দাও।

এক আশ্চর্য বিস্ময়ে আমি স্তব্ধ। বুকের ভেতর আমার তোলপাড় করছে। কোনো যুক্তিই বাধ মানছে না। মনে হলো দুষ্মন্তের ডাক শোনার জন্যই আমার মাথার চুল থেকে নখ পর্যন্ত অধীর উৎকণ্ঠায় অপেক্ষা করছিল। আমার সমস্ত গায়ের রক্ত নদী হয়ে যেন দুষ্মন্তের সমুদ্রে মিশে যেতে চাইছিল। সেই চাওয়ার কাছে কোনো ভালো-মন্দ, কোনো সম্ভব-অসম্ভবের তর্ক বিতর্ক টিকতে পারল না। তার কেবল একটাই কথা, আমি চাই। আমি চাই, সম্পূর্ণ করে চাই, পূর্ণ হওয়ার জন্যই চাই—এই বাণীই হচ্ছে সৃষ্টির মূল বাণী। আমার বুকের মধ্যে তার ডমরু বাজতে লাগল।

কী যে ঘটে যায় কখন কার মনে মানুষ জানে না। হঠাৎ অবিশ্বাস্য ব্যাপার সব ঘটে যায়। মন একবার সরে এলে পুরনো পথে আর ফেরে না—এটাই জানতাম। কিন্তু সে জানাটাও যে কত ভুল ছিল দুষ্মন্তের আহ্বানে নতুন করে তা জানা হলো। ষোলো বছর সম্পর্কহীনতার ভেতর কতখানি শূন্যতা ছিল, শূন্যতা পূরণ হলেই জানা যায় সেই চাওয়াটা কত গভীর।

নাভি থেকে টেনে খুব জোরে শ্বাস নিলাম। নিঃশ্বাস ফেলতেই বুকের মধ্যে হঠাৎ এক শূন্যতার, হাহাকার বোধ হল। মনে হল কত দীন, কত একা আমি। দুষ্মন্ত কাছে দাঁড়িয়েছে তাতেই ভীষণ সুখী মনে হচ্ছে নিজেকে। আমার ভেতরটা কী এক অনাবিল তৃপ্তিতে ভরে যাচ্ছে। স্বামীদের অনেক কিছুই স্ত্রী অন্তরে অনুভূতিতে লুকিয়ে থাকে। দীর্ঘকাল পরে হলেও তার গলায় স্বর চোখের চাউনি, হাতের ছোঁয়ায় কিংবা একটু সান্নিধ্যেই শরীর, মন যেন গলে যেতে চায়। আমার ভেতরে তেমন কিছু একটা হচ্ছিল। প্রেম, ভালোবাসা বোধ হয় একেই বলে।

আমাকে নীরব দেখে দুষ্মন্ত বলল, শকুন্তলা! তোমার আংটিটা না হারালে তোমার আমার এই মিলন হতো না। অকপটে সত্য স্বীকারে আজ আমার ভয় নেই। বিশ্বাস কর, আমি নিজের সঙ্গে কোনো ছলনা করিনি। আমার ভেতর কোনো মিথ্যাচার নেই। ঠকিয়ে তোমাকে বিয়েও করিনি। আমার প্রেমকে অসম্মানও করেনি। তোমার জীবনকে ব্যর্থ বা হতাশ করে দেওয়ার কোনো ইচ্ছাও আমার নেই। তবু সেটাই তো হলো। তোমার ভুল বোঝাও কিছু অন্যায় নয়। আমার ভুলেই তো সব ওলোট-পালোট হয়েছে। তাই অনুতাপে, অনুশোচনায় নিজেকে আমি কম শাস্তি দিইনি। আমারও একটা প্রায়শ্চিত্ত দরকার ছিল। সত্যি বলছি, আমার সব দোষ, অপরাধ স্বীকার করে তোমার কাছে মার্জনা চাওয়াটাই আমার প্রেমের সবচেয়ে বড় প্রমাণ। আমার এই ক্ষমা চাওয়া, করুণা চাওয়ার আন্তরিকতা এবং সততাকে সন্দেহ করার কোনো কারণ নেই। তবু যদি প্রত্যয় না হয়, তা হলে আমাকে সত্য যাচাই করার সুযোগ একবার দাও। দোষ আমার বলেই, ক্ষমাও আমি চাইছি। শকুন্তলা তোমাকে ছলনা করছি না, মিথ্যেও বলছি না। আমার মনের কথাটা বলছি। কোনো আত্মমর্যাদাসম্পন্ন মানুষ ইচ্ছে করলেই ক্ষমা চাইতে পারে না। ক্ষমাটা আত্মগ্লানি থেকে চাওয়া হয়ে যায় কখনও নিজের কাছে, কখনও বা অন্যের কাছে। তখন দোষ, ত্রুটি ধরার ব্যাপার আর থাকে না।

তারপর কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল। হয়তো ইচ্ছে করেই থামল ও; আমি কী করি দেখার জন্য। মুখ নামিয়ে আমি ওর হাতখানা রেখে আকুল কণ্ঠে বলল, তুমি কি আমার কষ্ট দেখতে পাওনা? নিজেকে আমার কাছ থেকে লুকিয়ে রাখলে তোমার কি খুব সুখ হয়? এতে তোমার যে মজাই থাকুক আমি কিন্তু খুব কষ্টে আছি। তুমি মন থেকে আমাকে ক্ষমা করতে পারছ না, কেন? ঘৃণা করে মুখ ফিরিয়ে নিলে আমি কোথায় দাঁড়াই বলো তো? হতাশায়, ব্যর্থতায়, দুঃখে আমার প্রেমের রাঙা রঙের জেল্লা যদি কমে যায় তা হলে মানুষের প্রত্যাশার দাম কী রইল?

মহারাজের কথাগুলো শুনে আমার বুকের ভেতর কী সব যেন গলে যেতে লাগল। নিজেকে আর সামাল দিতে পারি না। অভিমানের বাঁধ ভেঙে গেল। ধরা গলায় বললাম, অমন করে বলো না প্রিয়তম। বড় ভয়ে আছি। মনের সংকোচ কাটিয়ে উঠতে পারছি না। আমিও বুঝি, কোনো একান্ত করে চাওয়া যদি পাওয়াতে না মিলল তার কিছুমাত্র মূল্য থাকে না। আমিও তো হেরে যেতে চাই, হারিয়ে যেতে চাই। কিন্তু পারছি কই? কেন যে পারছি না নিজেও জানি না। আজ কাঙালের মতো আমাকে চেয়ে তুমি নিজেকে কত ছোট করেছ আমার কাছে। একটা সামান্য মেয়ে আমি। গর্ব করে বলার মতো কী আছে আমার? বেশ্যা মায়ের গর্ভে আমি হয়েছি। এই পরিচয় নিয়ে ভারত নরপতির রানী হওয়ার স্পর্ধা আমি করি না। তোমার মতো নামী দামী মানুষের সম্মান, মর্যাদা পাছে আমার মতো নগণ্য মেয়ের প্রেমে নষ্ট হয় তাই নিজেকে লুকিয়ে রাখি। দিনের পর দিন চোখের জলে ভেজা নিষ্ঠুরতা দিয়ে তোমাকে ফিরিয়ে দিই। এভাবে তোমাকে নিরাশ করতে আমার বুক ফেটে যায়। সত্যি বলতে কি, যাকে মন তীব্রভাবে চায় সে যখন ভিখিরীর মতো এই সামান্য মেয়েটার কাছ ভিক্ষে চায় তখন ভীষণ লজ্জা করে। ঘৃণা হয় নিজের ওপর। নিজের বলে তোমাকে দাবি করতে লজ্জা হয়। আমার অতীতটা আড়াল করে দাঁড়ায়। আমার মনের এই যন্ত্রণাটা তুমি কোনোদিন বুঝবে না। মনের সব কথা অন্যকে সব সময় বুঝিয়ে বলাও যায় না।

দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে একা পেয়ে একেবারে বুকের ভেতর টেনে নিয়ে মুখে মুখ ঘষল। বুকে বুক ঠেকাল। বলল, তুমি আমার প্রিয়তম রানী। এটা তোমার পরিচয়। চোখের চাওয়া দিয়ে নয়, মনের চাওয়া দিয়েই আমি তোমাকে চেয়েছি। আজ আমি তোমার প্রেম পেতে এসেছি, তোমাকে প্রেম দিতে এসেছি। মনটাই সব। এত ভিড়ের মধ্যে মনের মানুষ ক'জন জোটে? সত্যিকারের মনের মানুষ পায় ক'জনে? চোখে তো কত মেয়েকে দেখেছি, তাদের কাউকে তো তোমার মতো মনে ধরল না শকুন্তলা। দুষ্মন্তের অধরে প্রেমের মধুর হাসি ছড়িয়ে পড়ল।

ওর রোমশ বুকের মধ্যে মুখ ডুবিয়ে বলি, প্রিয়তম তোমার মহত্ত্ব, উদারতা দিয়ে আজ আমাকে হারিয়ে দিলে। আমি যদি তুমি হতাম তা হলে বোধ হয় এত উদার হতে পারতাম না। এতো সাহসও আমার নেই।

মনের কথা মনে রয়ে গেল। গুছিয়ে সব বলা হলো না। হঠাৎ ওর দু'গালের ওপর হাত রাখি। সারা গায়ের ভেতরটা সিরসিরানি উঠল। ফিস ফিস করে বলি, রাতে বোধহয় ঘুম হয় না ভালো। চোখের কোণে কালি পড়েছে। রোগাও হয়ে গেছ খুব। আয়নাতে নিজেকে দেখেছ কোনোদিন। ষোলো বছরে তুমি কত বদলে গেল। চুলে, ভুরুতে পাক ধরেছে। কেমন যেন বুড়ো হয়ে গেছ। কথাগুলো বলে ফিক্ করে হাসলাম।

দুষ্মন্তও হাসল আমার সঙ্গে। মধুর পবিত্র হাসি। কৌতুকস্নিগ্ধ প্রশান্ত হাসি। তারপর হঠাৎ ওর ভেতর কী যে ঘটে গেল কে জানে? এক ঝটকাতে দু'হাত দিয়ে আমাকে নিজের দিকে টেনে নিয়ে ইচ্ছুক মুখখানিকে আমার মুখের ওপর চেপে ধরল। আগ্রাসী চুম্বনে নিঃশেষে ভিজে ঠোঁট দুটিকে শুষে নিতে লাগল নিজের ঠোঁটে। এক হঠাৎ আলোড়নে আমার শরীর কেমন অবসন্ন আর শ্রান্ত হয়ে এল। মনে হলো, এক গভীর সুখের বাহুবন্ধনে ঘুমিয়ে পড়ব আরামে।

কিছুক্ষণ পরে আমাকে ছেড়ে দিয়ে কামরাঙা লাল চোখে চেয়ে রইল। দৃষ্টি এমন করে ফেলল যেন একটুও চোখ উপচিয়ে বাইরে না যায়। কিছুক্ষণ পরে ওর দৃষ্টি পড়ল আমার আঙুলের ওপর। চট করে ডান হাতটা টেনে নিয়ে অনামিকা আঙুলে স্বনামাঙ্কিত আংটিটা পরিয়ে দিতে গেলে হাতটা টেনে নিলাম। বললাম, ও আংটি আমি পরব না। একদিন ওই আংটি পরে সব হারিয়েছি। ওর ওপর আমার বিশ্বাস নেই। সেদিন তোমার ইচ্ছেতে ঐ আংটি পরেছিলাম সেই তুমিই আমাকে ষোলো বছর ভুলে থাকলে। ও আংটিতে আমার দরকার নেই। কী দেবে ওই আংটি। আমার কুমারী জীবনের নিটোল বিশ্বাসের মূল্য যে আংটি দেয়নি তাকে বিশ্বাস করে তোমায় পুনর্বার হারাতে পারব না। আমি আংটি চাই না ; তোমাকে চাই। তোমাকে আমি বিশ্বাস করি, কিন্তু তোমার আংটিকে নয়। আংটি দিয়ে কারো অন্তরে প্রেমের গৌরবে অধিষ্ঠিত হওয়া যায় না। একবার আংটি হারাল তো বিশ্বাসও গেল। বিশ্বাস একবার হারালে সে বিশ্বাস আর ফিরে আসে না। ও আংটি তোমরা হাতেই শোভা পাক। আমি ও আংটি স্পর্শ করব না।

দুষ্মন্তের অবাক হয়ে আমার দিকে চেয়ে রইল। কী যে দেখছিল ও এই অভাগী মেয়েটার মধ্যে ওই জানে? মুগ্ধ গলায় বলল, তোমার লীলা বোঝা ভার। কোনো যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্য হয় না এসবের। তবে হৃদয়ের সব প্রশ্নের উত্তর তো মস্তিষ্কের কাছে মেলে না। মিলবেও না কোনো দিন।

দুষ্মন্তের বুকে মাথা রেখে বললাম, এসব বাইরের ব্যাপার। এসবের হিসাব-নিকেশ না করে হৃদয় নিংড়ে দিলেই বেশি ভরে ওঠে হৃদয়। ফুলের গন্ধের মতোই প্রেমের গন্ধ আপনিই ছড়িয়ে যায় বুকময়। অন্যের অন্তরেও। আমার জীবনের সব কিছু যে তোমার জন্যে গর্বিত হয়ে এবং তোমাকে নিয়েই ছিল, সেটুকু বোঝার মতো সময় বা বুদ্ধি তোমার কোনোদিনও হলো না বলেই হেনস্তা হতে হলো আমায়।

অজান্তে দুষ্মন্তের দু'চোখ ভিজে উঠল। বিস্ময়ে চেয়ে রইল আমার দিকে। রাত জাগা দুষ্মন্তের মুখে ভোরের নরম আলো এসে পড়ল।

উর্বশী জননী

শ্রীধ্রুবজ্যোতি গাঙ্গুলী
শ্রী তিমিরকান্তি নায়ক
প্রীতিভাজনেষু।

দৃষ্টিকোণ

এ কালের নারী সম্পর্কিত কতকগুলো জিজ্ঞাসা এবং ভাবনা পুরাণের উর্বশী চরিত্র ও ঘটনার মাপকাঠিতে যাচাই করে সেকাল ও একালের মধ্যে একটা সেতুবন্ধন ঘটানোর প্রয়াস করেছি। নারী-সম্পর্কিত সমস্যাগুলো সব যুগে, সব সমাজে একরকম মনে হয়েছে। সেকাল ও একালের কালগত দূরত্ব যাই থাকুক, সমস্যার তফাত নেই। পার্থক্য যা আছে তা চরিত্রগত, গুণগত কখনই নয়। মেয়েদের পরিবর্তনটা বাইরে, ভেতরে নয়। এর কারণ মেয়েরা নিজে। 'উর্বশী জননী' সেরকম একটি সমস্যামূলক উপন্যাস।

উর্বশীর পৌরাণিক উপাখ্যানে তিনটি ভিন্ন ভিন্ন কাহিনী আছে। অসামঞ্জস্য এবং অসংগতির ফলে উপাখ্যানটি দুর্বল এবং শ্লথ। তবু এর ভেতরে একটা ক্ষীণ যোগসূত্র আছে: সেই যোগসূত্রটি এই উপন্যাসের হৃৎস্পন্দন। জীবনের সংঘাত ও সমস্যার কেন্দ্রবিন্দু। উর্বশীকে নিয়ে কিংবদন্তির পাহাড় সৃষ্টি হয়েছে। রূপক বিশ্লেষণেরও অন্ত নেই। উর্বশী অসাধারণ বলেই তাকে নিয়ে এত গবেষণা। এর ভেতরে লুকিয়ে আছে উর্বশীর মন ও তার ব্যক্তিসত্তা। এ সবের সমন্বয় হয়েছে "উর্বশী জননী"তে।

উর্বশী এক বিচিত্র রমণী। কেউ বলে ছলনাময়ী, কেউ বলে মূর্তিমতী প্রেম। কেউ বলে জীবনের পরম অনুভূতি। প্রেমই তার জীবন, প্রেমই তার কলঙ্ক। সারাজীবন এক বিচিত্র খেয়ালে ছুটে চলেছে। অনন্ত চলাই তার ধর্ম। এক জীবনের মৃত্যু ঘটিয়ে আর এক জীবনের দিকে যাত্রা করেছে। এক দিগন্ত থেকে আর এক দিগন্ত পর্যন্ত কোন অমরার সন্ধান করেছে সে? পেয়েছে কি তার অমৃত জীবন, অনন্ত প্রেম?

নন্দনবাসিনী রূপসী অপ্সরা উর্বশীর নৃত্যের তালভঙ্গ করেছিল পুরুরবা, আর অর্জুন করল তার মোহভঙ্গ। একজন মহান প্রেমে নন্দিত করল, অন্যজন বাৎসল্যের দীপ জ্বালিয়ে নারীর অনন্তকালের আকাঙ্ক্ষার আরতি করল। অপ্সরাকে মা বলে ডাকার যে সত্যি কেউ আছে এ সংসারে ভুলেই গিয়েছিল উর্বশী। অর্জুনের আচমকা জননী সম্বোধন সহস্র হস্তে তার বাসনার বুকে ছুরি মারল ঠিকই, কিন্তু ঐ ডাকটাই এলোমেলো করে দিল তার ভেতরটা। অপত্য স্নেহের ফল্গুধারা থেকে হঠাৎ উৎসারিত ফোয়ারার মত ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে এল তার মাতৃহৃদয়ের মমতা, স্নেহ, ভালবাসা। বিস্ময়ের অন্ত নেই উর্বশীর। যতদিন মনের ঘরের দরজা রুদ্ধ ছিল একবারও বুঝতে পারেনি যে থাকাকে সে না-থাকা বলেই জানত তাই-ই ছিল তার বড় থাকা। এর ফলে গল্পের রূপ, রঙ, গন্ধ, স্বাদ কিছুটা বদলে গেল। কিন্তু তাতে পৌরাণিক উপাখ্যানের কোন ক্ষতি হল না। বরং পরিধিটা বেড়ে গেল। জীবন হল মহিমান্বিত। ঘটনা ও সমস্যা হল প্রত্যক্ষ ও বাস্তব।

উর্বশীর জীবনের বিভিন্ন সময়ের ঘটনার সামনে দাঁড়িয়ে সর্বকালের অসহায়া, পতিতা, নির্যাতিতা, লাঞ্ছিতা, চিরবঞ্চিতা, অধিকারহীনা গোটা নারীজাতিকে দেখতে পাই। পুরাণ কাহিনী জীবনের কাহিনী, পুরাণের প্রতিটি চরিত্রের সামনে দাঁড়িয়ে তাদের আয়নায় এ কালের জীবনকে দেখতে এবং দেখাতে আমার খুব মজা লাগে। এতে আমাদের অগ্রগতির পরিমাপটা সহজ হয়ে পড়ে। আসলে যুগের পরিবর্তনটা যতটা বাইরে, ততটা ভেতরে নয়। উর্বশীর চরিত্রের মাপকাঠিতে আমি যাচাই করেছি একালের নারী মুক্তি আন্দোলন ও তার স্বাধীনতাকে। উর্বশীর সামনে দাঁড়িয়ে নিজের জীবনের বিবিধ উত্তর খুঁজে পাবে আধুনিক নারী। তার নিজের একান্ত সমস্যাগুলির রূপ ও পরিণামের হদিশ পাবে। 'উর্বশী জননী' আধুনিক নারীর জীবন ও মননের দর্পণ, তার আত্মসমীক্ষার উপন্যাস।

ড. দীপক চন্দ্র

স্বপ্নে দেখা পরীর মতন এক আশ্চর্য রমণী উর্বশী। সৌন্দর্যের তিলোত্তমা। তাকে নিয়ে অনন্ত কৌতূহল। নারী-পুরুষের জল্পনা-কল্পনার অন্ত নেই। সে পুরুষের কামনার ধন। নারীর ঈর্ষার পাত্রী।

সে নিজেই এক গল্পের ভাণ্ডারী। কিংবদন্তির নায়িকা। প্রকৃত অর্থেই সুন্দরী সে। তার যৌবনপুষ্ট শরীরের প্রতিটি সুঠাম ভঙ্গিতে ফুটে আছে রূপের মাধুরী। ডালিমের মত তার গায়ের রঙ। রাত্রির অন্ধকারের মত গভীর কৃষ্ণময় তার দীর্ঘচুলের রাশ। বেলাভূমির মত মসৃণ কোমল ত্বক। একফালি চাঁদের মত ছোট্ট কপাল। টিকল নাক। পানের মত মুখ। ডাগর দুই চোখের তারায় মায়ার যাদু লুকিয়ে আছে। সমুদ্রের মত চঞ্চল, আকাশের মত গভীর আর বনানীর মত রহস্যময় দুই চোখের তারায় অহরহ খেলা করে গল্প। অনেক গল্প। চারপাশের মানুষ তার স্রষ্টা। কবে কেমন করে সে গল্পের নায়িকা হল জানে না কেউ।

সত্যিই জানে না।

কবি শুধু কল্পনা করতে পারে। কিসের জন্যে পারে? জীবনের জন্যে। একটা অপূর্ণ জীবনকে সম্পূর্ণ করে পাবার জন্যে। কারণ সে'ত মোমের পুতুল নয় আর, রক্তমাংসের মানবী। নর-নারীর অনন্ত বাসনা-কামনা, প্রেমের বুকে তারও জন্ম হয়েছিল একদিন। কিন্তু জন্ম থেকে সে মাতৃ-পিতৃহীন অজ্ঞাতকুলশীল। দোষ তার ভাগ্যের আর দেবতার ভ্রুকুটির।

দেশ-দেশান্তর ঘুরে বণিক ধনকুবের কোল আলো করা একরত্তি মেয়ে নিয়ে দেশে ফিরল। ধনকুবেরের সন্তান ছিল না। তাই সন্তানের জনক হওয়ার গল্পটা কেউ বিশ্বাস করল না। লোকের মনে কতরকম কৌতূহল, কত অদ্ভুত অদ্ভুত প্রশ্ন। ধনকুবের সব শোনে আর হাসে। এসব প্রশ্নের আর কৌতূহলের জবাব দিতে হলে, নিষ্পাপ শিশুর ফুলের মত জীবনটা অভিশপ্ত হয়ে উঠে। প্রাণ থাকতে ধনকুবের সে নিষ্ঠুর কাজ করতে পারবে না।

শিশুবালিকার মুমূর্ষু জননীর বেদনাক্লিষ্ট মুখখানি মনে পড়ে যায়। তার কাছে সে প্রতিশ্রুত। কোনদিন কোন অবস্থাতেই এই শিশুর জন্মকথা ফাঁস করবে না। এই কন্যা সুলক্ষণা। অগত্যা, ধনকুবের মানুষের কৌতূহল নিবৃত্ত করতে ঈশ্বরের কৃপা ও করুণার কথা বলল। সন্তান ছিল না বলে সে হিমালয়ে গিয়ে সন্তানের জন্য তপস্যা করেছিল। ঈশ্বরের করুণায় তারা পিতা-মাতা হয়েছে।

অলৌকিকতার কী আশ্চর্য ক্ষমতা। সকলে বিশ্বাস করল।

চতুর ধনপতি জানত, ঈশ্বরের নাম করলে এই সব সংকটে সহজে পার পাওয়া যায়। কারণ, ঈশ্বর সর্বশক্তিমান। অনেক অদ্ভুত, অসম্ভব ঘটনা তাঁর করুণায় হয়। ঈশ্বরের সব কাজ সংশয়ের অতীত। মানুষের বিচার-বুদ্ধি-বিশ্লেষণ কাজ করে না। ভক্তির আতিশয্যে, অবিশ্বাস, সংশয় চাপা পড়ে যায়। প্রত্যয় দৃঢ় হয়।

ধনপতির কথায় লোকে আশ্বস্ত হল। উর্বশী সম্পর্কে সব কৌতূহল ইতি হল।

শশীকলার মত উর্বশী বড় হতে লাগল।

উর্বশী রূপসী। সুন্দরী। গুণবতী।

নৃত্যগীতেও অসাধারণ হয়ে উঠল সে।

কুঁড়ি থেকে ফুল যেমন একটু একটু করে অলক্ষ্যে ফোটে তেমনি ছোট্ট উর্বশীর ভেতর থেকে সুন্দর প্রতিমার মত একটা রমণী বেরিয়ে এল। অঙ্গে অঙ্গে তার নবীন বসন্তের উচ্ছ্বাস। টুকটুকে ডালিম রঙ ফুটে বেরোচ্ছে গালে আর সারা অবয়বে। কুহেলিবিহীন নীল আকাশে শান্ত স্নিগ্ধ ধ্রুবতারার মত উজ্জ্বল দুটি চোখের মণি। বক্ষ পিঞ্জরে একজোড়া সোনালি নধর আপেলের বাসা। আর কৃষ্ণবর্ণ কেশরাশিতে বাঁধা পড়েছে উত্তাল সমুদ্রের হাজার হাজার ঢেউ। যে দেখে সেই অবাক হয়।

উর্বশীর রূপ, সৌরভ বাতাসে ছড়িয়ে পড়ল। সবাই জেনে গেল উর্বশী সুন্দরী শ্রেষ্ঠা। এক দুর্লভ রমণী। তাকে বধূরূপে পাওয়ার জন্যে পাগল হল বিভিন্ন দেশের রাজা, রাজপুত্র, ধনবান শ্রেষ্ঠী এবং সমাজে গণ্য-মান্য অভিজাত ব্যক্তিরা।

ধনকুবেরের খাতিরটা বেড়ে গেল দেশে দেশে।

সবাইয়ের প্রার্থনা উর্বশী।

তার মন ভেজানোর জন্যে সেরা উপঢৌকন পাঠাতে লাগল প্রার্থীর দল। চোখে না দেখলেও শুধু জনশ্রুতি শুনে উর্বশীর জন্যে উন্মাদ হল তারা।

উর্বশীকে নিয়ে সংকট সৃষ্টি হল। যত দিন যেতে লাগল ততই অবস্থা ঘোরাল আর জটিল হয়ে উঠল। নিজেকে ধনকুবেরের বড় বিপন্ন আর অসহায় বোধ হতে লাগল। অসহিষ্ণু বরমাল্য লোভী রাজা ও রাজপুত্রদের আস্ফালন আর তর্জন-গর্জন দেখে ধনকুবেরের বুক শুকিয়ে গেল। স্বয়ম্বর সভা করে কন্যাকে বীর্যশুল্ক করে বিবাহ দেবে ভাবল। কিন্তু সেও খুব সুখকর কিংবা নিশ্চিন্ত একটা অনুষ্ঠান নয়। তাতে আমন্ত্রণের বাঁশি হয়তো অস্ত্রের ঝনঝনি হয়ে একটা বড় বিপদ ডেকে অনবে। কারণ ব্যর্থ এবং বিফল পাণিপ্রার্থীদের কেউ খাপের তরোয়াল খাপে রেখে হাত গুটিয়ে বসে বসে অন্যের সঙ্গে উর্বশীর বিয়েটা দেখবে বলে মনে হল না ধনকুবেরের। বরং তাতে আরো একটা দক্ষযজ্ঞই তৈরি হবে।

ধনকুবেরের উৎকণ্ঠা দেবকীকে ভাবিয়ে তুলল। সে নারী। জীবনের জটিলতা বোঝে না। কিন্তু স্বামীর দুশ্চিন্তা, উৎকণ্ঠা দেখলে তার কষ্ট হয়। বুকটা ফেটে যায়। সহানুভূতি হয়। বুদ্ধি দিয়ে তাকে সাহায্য করতে পারলে হয়ত তার এই একাকীত্ব ভাবটা থাকত না। কিন্তু ধনকুবের তার কথা শুনবে কিনা ভেবে সংশয় হল। মেয়েদেব কোন যুক্তি-পরামর্শই পুরুষমানুষ নেয় না। তবু তার জন্যে বুকটা টনটন করে। নারীর গহন অন্তরে তার প্রতিক্রিয়ার খোঁজ কোন পুরুষ নেয় না, রাখেও না। তাই'তো সব নারীর মতই দেবকীরও ভীষণ অভিমান হয়। এক বুক অপমানের জ্বালা নিয়ে বলল : তুমি'তো আমার কোন কথাই শোন না। আজও শুনবে না জানি। তবু মন মানে না। তোমার কষ্ট দেখলে স্থির থাকতে পারি না। তোমার দুশ্চিন্তা সংকটের ভাগ দিলে আমি ধন্য হয়ে যাই, নিজেকে তখন বৌ মনে হয়। অন্যথায় বড় অপমান লাগে।

দেবকীর প্রশান্ত স্থির দুটি নয়নের দিকে সবিস্ময়ে তাকিয়ে রইল ধনকুবের। অধরে স্মিত হাসি। মুগ্ধ কণ্ঠে বলল : দেবকী, আমার উদভ্রান্ত মনে তোমার কথাগুলো দক্ষিণা বাতাসের মত লাগল। তুমি মিছিমিছি আমাকে অনেকগুলো অভিযোগ করলে। শুনতে ভাল লাগল। বল, কি বলতে চাও?

তুমি ভাব, আমি কিছু জানি না, বুঝি না। তোমার শুকনো মুখ, উদ্বিগ্ন অশান্ত দুটি চোখ, বলিরেখাঙ্কিত কপাল, দেখলে আমি সব টের পাই। তোমার বিপুল দুশ্চিন্তার কথা জানি।

জানো?

জানি। তুমি ভাবছ, উর্বশীকে বীর্যশুল্কা করলে স্বয়ম্বর সভায় আগুন জ্বলবে। তা ঠিক নয়। এই সমস্যার সমাধান আমার মেয়েলী বুদ্ধি দিয়ে সহজে করে দিতে পারি।

পার? ভেবে ভেবে আমি মরে যাচ্ছি, আর তুমি এক কথায় এতবড় একটা সংকটের সমাধান করে দিতে পার? এই জন্যেই স্ত্রীবুদ্ধি বলে।

তোমরা কোনদিন মেয়েদের বুদ্ধিকে দাম দিলে না বলে শান্তি পাও না মনে। মেয়েদের মানুষ ভাব না। তারা যে চিন্তা করতে পারে, বিচার করতে পারে এসব বিশ্বাস করতে চাও না। তোমরা আমাদের ভাব কি বলত? আমরা কি রক্তমাংসের তৈরি একটা সজীব পুতুল? আমাদের মন, বুদ্ধি বলে কি কিছু নেই? মেয়েমানুষ হয়ে জন্মেছি বলেই কি দেহসর্বস্ব জীব? শরীরের ক্ষুধা মেটানোর যন্ত্র? আমাদের বিচার বিশ্লেষণ থাকতে নেই।

দেবকী, তুমি অকারণ রাগ করছ।

রাগ করারই কথা। মেয়েমানুষ সম্পর্কে পুরুষমানুষের এই অশ্রদ্ধা, অপমান আমি সহ্য করতে পারি না। আমার বুকের ভেতরটা রি রি করে জ্বলে। সব পুরুষ সুযোগ পেলেই মেয়েমানুষকে তাচ্ছিল্য

করে, অপমান করে। ভাব না, তোমাদের ঐ কথাগুলো তাদের কোথায় গিয়ে লাগে। মেয়েমানুষ হলে বুঝতে।

-আমার ঘাট হয়েছে বাবা।

দেবকী তখনও রাগে উত্তেজনায় গজরাতে লাগল। বলল : তোমার সংসারে আমি উড়ে আসিনি। আমাকে এনে বসানো হয়েছে। আমারও যে একটা অধিকার আছে, এ'টা ভুলে যাও কেন?

ক্রুদ্ধ দেবকীকে শান্ত করতে ধনকুবের বিষণ্ণ গলায় বলল ঃ ভুলিনি। তুমিই ভুল বুঝেছ। মুখফস্কে কথাটা বেরিয়ে গেছে। আবার বলছি ঘাট হয়েছে।

প্রকৃতিস্থ হতে দেবকী কয়েকটা মুহূর্ত সময় নিল। তারপর বলল ঃ আগে কথা দাও আমার কথা রাখবে।

ধনকুবের অসহায়ভাবে একটু উসখুস করল। দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে বলল ঃ বেশ বল।

তুমি স্বয়ম্বর সভা ডাক। সভার মাঝখানে যজ্ঞ কর। যজ্ঞের হোমাগ্নির সামনে বরমাল্য লোভী রাজা, রাজপুত্র অতিথিদের দাঁড় করিয়ে অগ্নির নামে শপথ করতে বল, যে তারা কেউ উর্বশীর রূপে উন্মাদ হয়ে বিয়ে করছে না। তার রূপ ও নারীত্বকে সম্মান করবে বলে বধূরূপে প্রার্থনা করছে। তারপর, উর্বশীর জন্মের সব কথা জেনেও যদি ভার্যা বলে গ্রহণ করে তা হলে তার রক্ষার জন্য কে কতদূর কী করতে পারে তার শপথ করে নাও। এই জবাবটা যে আস্ফালন নয় প্রমাণ দিতে একদিন ইন্দ্রের সঙ্গে তার যুদ্ধও হতে পারে। ওই অঙ্গীকারের পর উর্বশীকে সভায় হাজির কর। উর্বশীর সামনে অঙ্গীকারবদ্ধ মানুষটিকে বল ঃ উর্বশীর জীবনটা বিধাতাপুরুষ ভিন্ন রঙে, ভিন্ন তুলিতে এঁকেছেন। জীবনসমুদ্রের ঘূর্ণাবর্তে হারিয়ে যাওয়া একটি মানব শিশুকে আমরা কুড়িয়ে মানুষ করছি। সে আমাদের কেউ নয়। আমরা শুধু তাকে পালন করেছি। তার মাতা দেবরাজ ইন্দ্রের প্রমোদ কাননের এক বারাঙ্গনা। ইন্দ্র তাকে পাঠিয়েছিল এক মহামানবের তপোভঙ্গ করতে। এই মানুষটি ইন্দ্রের স্বৈরাচারী শাসনের অবসান চেয়েছিল। নির্যাতিত মানবকুলের দুর্ভাগ্যের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল বন্ধুর মতন। দুর্গত দুঃখী মানুষের পরম আশ্রয় সেই মহামানবের নাম হল : নারায়ণ।* ইন্দ্র তার জনপ্রিয়তায় ভীত হল। পাছে তার ইন্দ্রত্ব হারাতে হয় সেই ভয়ে মহাপুরুষকে বিপথগামী করার জন্যে যে বারাঙ্গনাকে পাঠানো হল সে হল উর্বশী জননী। ইন্দ্রের বিলাস ভবনে রূপসী মনোহরণকারীদের একজন। নারায়ণ মহামানব হলেও মানুষ। ছলনাময়ী নারী তাকে রূপে, ছলনায়, প্রণয়ে প্রলুব্ধ করে একদিন গর্ভবতী হল। উর্বশী মহাপুরুষ নারায়ণের ঔরসজাত সন্তান।

হঠাৎ সরু সুরে কেঁদে ওঠে উর্বশী অলিন্দের দিকে ছুটে গেল। দেবকী ধনকুবের দু'জনেই একসাথে চমকে উঠল। দু'জনে দুজনের দিকে জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল। উর্বশী যে কখন নিঃশব্দে তাদের পেছনে দাঁড়িয়েছিল টের পায়নি। উর্বশীর ওভাবে চলে যাওয়ার জন্য বুকটা কেমন করে উঠল। উদ্বিগ্ন উৎকণ্ঠা নিয়ে তারাও ওর পিছন পিছন দৌড়ে গেল ঘরের দিকে।

হঠাৎ একটা ঝড়ে উর্বশীর জীবনটা ওলোট-পালোট হয়ে গেল। সেকথা মনে হলে নিজের উপর ঘেন্না হয় উর্বশীর। নিরবচ্ছিন্ন সুখ-শান্তির মধ্যে একটা গ্লানিবোধ তার মনে লেগে রইল। ভাবতে বড় কষ্ট হয়, যাদের গৃহে বড় হল, যাদের নিঃশ্বাস প্রশ্বাস গায়ে লেগে রইল, যাদের মায়ায়, মমতায়, ভালবাসায় এ জীবন ভরে গেল, তারা কেউ আপনজন নয় তার। সে তাদের কুড়িয়ে পাওয়া মেয়ে। চোখ খুলে সে পৃথিবীর আলো দেখল, মানুষের আদর ভালবাসা পেল, কিন্তু দেখতে পেল না মা-বাপের মুখ। মাতৃ-পিতৃহীন এক অনাথিনী। এই কথাটা জানার পর থেকে পৃথিবীটা তার কাছে মিথ্যে হয়ে গেল। জীবনটা বড় বিস্বাদ লাগল। সব বন্ধনটা কেমন আলগা হয়ে গেল। প্রতিমুহূর্ত মনে হয়, তার বেঁচে থাকার ভেতর কোন গৌরব নেই। পঞ্চদশী উর্বশী নিজেকে প্রশ্ন করল, তাহলে স্নেহ-মমতা-ভালবাসার কোন মূল্য নেই? জন্ম-পরিচয়টাই মানুষের জীবনের সব! মানবসন্তানের সব গৌরব-পরিচয় তার পিতাকে নিয়ে। পিতা হল একটা শিশুর পরিচয়-পত্র। জীবনের ছাড়পত্র। এই

* ইনি হলেন ঋষি। বদ্রীনাথের নর-নারায়ণ পর্বতের নারায়ণ।

স্বীকৃতি ছাড়া জীবনের দাম নেই, গৌরব নেই। পরিচয়হীনতা যে মানবজীবনে কত বড় অভিশাপ, এই প্রথম জানল।

জন্ম সম্পর্কে মানুষের বিশ্বাসটা বোধ হয় কাচ দিয়ে তৈরি। একটুতে ভেঙে যায়। এই বিশ্বাস একবার ভাঙলে দাঁড়ানোর মত আর মাটি থাকে না। তখন বড় অসহায় আর একা লাগে। বিশ্বাস ছাড়াও যে একজন মানুষের অনেক কিছু আছে সেটা মিথ্যে হয়ে যায়। তখন চাওয়া কিংবা পাওয়ার জোর থাকে না। জন্ম-পরিচয়ের সূত্রটা যেই ছিঁড়ে যায় অমনি জীবনের সব কিছু খুলে খুলে ঝরা ফুলের পাপড়ির মত ঝরে পড়ে। অমনি সেই মানুষের ভেতরটা এক লহমায় কেঁই কেঁই করে কেঁদে ওঠে। কিন্তু সে বোবা কান্নাটা বাইরে থেকে কেউ চোখে দেখতে পায় না। তখন নিজ জন্মের পরিচয়হীনতার জন্য বড় অপমান লাগে। দমবন্ধ এই বোবা যন্ত্রণার ভার পাথরের মত ঝুলে রইল উর্বশীর হৃৎপিণ্ডের সঙ্গে।

বহু ধাক্কাধাক্কির পর দরজা খুলল উর্বশী। চোখে তার জল টলটল করছিল। তাকে দেখে দেবকীর বুকটা মোচড় দিয়ে উঠল। অমনি বুকে চেপে ধরল তাকে। আকুল কান্নার শব্দটা তাদের উভয়ের গলায় হাহাকারের মত বাজতে লাগল। কাঁদতে কাঁদতে দেবকী বলল : পেটে ধরিনি বলে কি তোর মা নই আমি? তুই আমার আত্মার সাথে যে এক হয়ে আছিস। তুই আমারই মেয়ে। তোর চোখে জল দেখলে সহ্য করতে পারি না মা। জীবনে যাদের চোখে দেখলি না, তাদের নাম শুনেই তোর বুকের ভেতরটা মায়ায় গলে গেল। আর আমরা ভেসে গেলাম। আমরা কি তোর কেউ নই? আমাদের জন্যে একটু প্রাণ কাঁদল না। একবারও আমাদের কষ্টের কথাটা মনে হল না।

উর্বশীর মাথার ভেতরটা ঝিমঝিম করছিল। ভয় হল, এবার বুঝি সত্যিই মূর্ছা যাবে। প্রতিটি স্নায়ু শুকনো পাতার মত কাঁপতে লাগল থর থর করে। সে আর সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছিল না। দেবকীর কাঁধের উপর মাথা রেখে বলল : তোমরাই আমার বাবা-মা ছিলে। কিন্তু আজ হঠাৎ তোমরাই আমাকে আলাদা করে দেখলে। তোমার মুখে অন্য কথা না শুনলে, এমন গণ্ডগোল হয়ে যেত না। মা-গো আমার যে আর কিছুই থাকল না। আমি এক বিশাল সাম্রাজ্য হারিয়ে বসলাম।

দেবকী ব্যাকুল গলায় আর্তস্বরে বলল : ওরে না, না। তুই কিছুই হারাবি না। আমরা হারাতে দেব না তোকে।

মা—গো সব হারানো একরকম নয়। বিশ্বাস একবার হারালে তা আর ফিরে পাওয়া যায় না। পেলেও তার পবিত্রতা থাকে না। আমার সব ছিল, এখন আর কিছু নেই। আমি একেবারে নিঃস্ব হয়ে গেলাম!

দেবকীর বুকে গভীর স্নেহের হাজার স্মৃতি জেগে উঠল। মনের যন্ত্রণা আরও তীব্র হল। অনুতাপে সহানুভূতিতে ব্যাকুল হল তার অন্তঃকরণ। আর্তস্বরে বলল : না, না। ও কথা বলিস না। বলতে নেই। আমার বুক ফেটে যাচ্ছে। ওগো, তুমি কিছু বল।

ধনকুবের জলভরা করুণ চোখে অপরাধীর মত তাকিয়েছিল। কিছুক্ষণের জন্য সে হারিয়ে ফেলেছিল নিজের অস্তিত্ব। এই সময়টা কি ভাবছিল সে নিজেও জানে না। দেবকীর ডাকে হঠাৎ তার ভেতরটা চমকাল। স্তম্ভিত হৃদয় আবার দ্রুত স্পন্দিত হতে লাগল। তার বুকের ভেতরটা একটা অপরাধবোধে সমানে টাটাচ্ছিল। অথচ যা তার অনুভূতিতে গভীরভাবে স্পর্শ করে গেল সেই কথাটাই বলল দেবকী : মা-রে এই বুকটার মধ্যে কি যে তোলপাড় হচ্ছে তা যদি জানতিস তাহলে এমন অভিমান করে থাকতে পারতিস না। তোর ব্যথায় আমাদের বুকের ভেতর গলে গলে যাচ্ছে। অব্যক্ত ব্যথায় তার গলার স্বর অবরুদ্ধ হয়ে গেল। চোখ দুটো জলে ভরে গেল।

ধনকুবের হৃদয়াবেগ সামলাতে কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইল। তারপর ধরা গলায় বলল : সব বাবা-মা কন্যাকে সুখী দেখতে চায়। আমাদেরও চোখ ছিল তোর সুখের দিকে। কিন্তু আজ আমরা এক সংকটে পড়েছি। সবাই তোকে বিয়ে করতে চায়। তাই, এমন ব্যবস্থা করতে চাই যাতে আমাদের উর্বশীকে নতুন করে আর কিছু হারাতে না হয়। সেইজন্য অনির্বাণ করে তোর জীবনদীপ জ্বালাতে চেয়েছি। এ কি আমাদের খুব অন্যায় হল মা? বরমাল্য লোভী তরুণেরা কামনার বশে আমার উর্বশীকে

অপমান করবে, এতো চোখে দেখতে পারব না, প্রাণ থাকতে সইতে পারব না। তাই সত্যিকারের প্রেমিকের হাতে তোকে দিতে চাই। যে তোর জন্যে ভাববে, জীবনটা দিতে পারবে, পৃথিবী ত্যাগ করতে পারবে, প্রেম যার সাধনা; সেই মহান প্রেমিককে তোর জন্যে খুঁজছি একি অপরাধ!

কথাগুলো উর্বশীর মনে দাগ কেটে গেল। সহসা কোন কথা বলতে পারল না। একটা অব্যক্ত যন্ত্রণায় ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল। যন্ত্রণায় যেন বিকল হয়ে গিয়েছিল তার ভেতরটা।

দেবকী তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে কান্নাটা কষ্ট করে দাঁতে দাঁত চেপে রুখছিল। ধনকুবেরের চোখে এক গভীর শূন্যতার চাউনি। এক বিপুল ভাঙচুরের কাল্পনিক ছবি দেখতে পাচ্ছিল।

উর্বশী কথা বলার জন্য মুখ তুলল। কেঁদে কেঁদে মুখখানাকে ফুলিয়ে ফেলেছিল। কেমন একটা থমথমে বিষণ্ণতায় চোখের দু'কোণ ভারী। চোখ দু'টো একটু রক্তাভ উজ্জ্বলতায় রাঙা। বলল : বাবা, আমার জন্যে তোমরা খুব ভাব। আর ভেব না। ভেবে কোন কূল-কিনারা হয় না। কপালে যা লেখা আছে তা হবেই। এত চেষ্টা করেও গোপন রাখতে পারলে না আমার জন্ম-রহস্য। সুতরাং ভেবে কি করবে? ভেবে কিছু হয় না। আমার ভাগ্যলিপিকে তোমার হাজার চেষ্টাতেও মুছে ফেলতে পারবে না। আমি ভাগ্যের খেয়ালী পুতুল। অদৃষ্টের সেই খেয়ালকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা কারো নেই। তুমি চাইলেও আমার ভাগ্যকে ফেরাতে পারবে না। কেবল যন্ত্রণা আর দুঃখ পাবে। মহতের সন্ধানে যে জীবন মহান, প্রেমের আবাহনে যে জীবন সার্থক, —সে জীবন চাইলে মেলে না। শেষ পর্যন্ত নিয়তির অন্ধকারে ডুবতেই হবে।

সহসা বুকভাঙা এক আর্তনাদ করে উঠল ধনকুবের। ওরে অবোধ মেয়ে, ও কথা বলে না। বলতে নেই। ভাগ্য মানুষের তৈরি। মানুষের অসংখ্য ভুল-ভ্রান্তি দোষের রন্ধ্র পথ ধরে যে সর্বনাশ নিঃশব্দে অলক্ষ্যে ঢুকে পড়ে জীবনের বিপর্যয় ঘটায় তাকেই মানুষ দুর্ভাগ্য বলে বিলাপ করে। কিন্তু জীবনযুদ্ধে জয়ী মানুষ কোন সাফল্য এবং জয়কে ভাগ্যের দান মনে করে না। এটা তার পাওয়া উচিত ছিল বলেই মনে করে। ভাগ্য কেবল জীবনযুদ্ধে হেরে যাওয়া মানুষের জন্য।

উর্বশী ম্লান হাসল। অবসন্ন গলায় বলল ঃ জন্মের প্রথম দিনেই যে হেরে বসে আছে তাকে শোনাচ্ছ পিতা ভাগ্য জয়ের মন্ত্র।

জীবনের প্রথম দিন থেকে তুমি জয় করেছ আপন ভাগ্যের নিষ্ঠুরতাকে।

এই জয়ের গর্ব কেউ করে? তোমার অনুকম্পা, দয়া না পেলে উর্বশী বাঁচত না। তোমরা আমার জীবনরক্ষক।

মানুষের ভালবাসা, স্নেহ-মমতাকে অনুকম্পা, দয়া বলে না। অনুকম্পায় ভালবাসা ছোট হয়ে যায়। ভালবাসা-মমতার মত পবিত্র জিনিস পৃথিবীতে কিছু নেই। মাটির রস শোষণ করে গাছ যেমন বেঁচে থাকে, তেমনি স্নেহ-ভালবাসায় প্রেমের রসটুকু না পেলে জীবন শুকিয়ে যায়। মরুভূমির শূন্যতা হাহাকার নিয়ে মরুভূমিও থাকতে পারে না, তাই তার বুকে মরূদ্যান সৃষ্টি করেছে প্রকৃতি। তেমনি প্রেম-প্রীতি ভালবাসাই জীবন। পৃথিবী তোমাকে সেই ভালবাসা দিয়ে বরণ করে নিয়েছে। তোমার প্রেমার্থী হওয়ার জন্যে তরুণদের মধ্যে প্রতিযোগিতা পড়ে গেছে। এটা কি কম বড় জয়?

উর্বশী ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল। থমথমে দুই চোখে গভীর বিষণ্ণতা। কেমন একটা উদাস অন্যমনস্কতা। বহুদূর পর্যন্ত অবারিত মুক্ত-প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে থাকল। বাতায়ন থেকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল পাল তোলা নৌকো রূপালি জল কেটে মন্থর গতিতে চলেছে। নীল আকাশে পুঞ্জ পুঞ্জ তুলোর মত সাদা মেঘ ভাসছে ভেলার মত। দলছুট একটা পাখি ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে একা একা উড়ছে অনন্ত আকাশে। আর দিশেহারা হয়ে ডাকছে তার সঙ্গিনীকে। উর্বশীর বুকের ভেতর অনুরূপ এক অজানা শূন্যতায় চিন্‌চিন্ করে। কেমন একটা অদ্ভুত শিরশিরে ভাব। সেই ভাবটা আস্তে আস্তে তার ভেতরকার আড়ষ্টতা এবং দুঃখবোধটা কাটিয়ে দিচ্ছিল। অল্পক্ষণ পরেই স্বাভাবিক গলায় বলল : বাবা, আমার এই ছোট্ট জীবনে অনেক কিছু পেয়েছি। পাওয়ার ঘর ভরে গেছে। আমার আর কোন দুঃখ নেই। অতীতটাকে মনে রাখার ইচ্ছে পর্যন্ত মরে গেছে।

ধনকুবের উর্বশীকে সস্নেহে বুকে টেনে নিয়ে বলল : নিজের উপর অভিমান করে প্রতিশোধ

নেয় বোকারা। নিজেকে শাস্তি দিয়ে মুক্তি মেলে না কোনদিন। জীবনটা বাঁচবার জন্য, মরবার জন্য কিংবা পস্তাবার জন্য নয়। কত বড় জীবন পড়ে আছে সামনে। একটা সুস্থ শরীর সুস্থ মন নিয়ে কী দারুণভাবে বাঁচা যায় এই এক জীবনেই। কোন অবস্থাতেই সেকথা ভুলে যাস না। জীবনের সুখ-দুঃখ, প্রেম-বিরহ, মান-অভিমান, ব্যর্থতা-সার্থকতা, লাভ-লোকসান নিয়ে কখনও বেশি ভাববি না। খেলার মত করে দেখলে জয়-পরাজয়ের কোন বেদনা থাকে না। একটাই'তো জীবন। ইচ্ছে করলেই ঐ একমাত্র জীবনেও দারুণ বাঁচা যায়। অনন্ত জীবন বাঁচার গুণেই অমৃত জীবন হয়। তুই আমার অমৃতের পুত্রী।

কথাগুলো উর্বশীর গায়ে কাঁটা দিল। তার মন কেমন করছিল। তবু এর ভেতরেই যেন পৃথিবীটা তার কাছে বদলে গেল। জীবনে যে তার এমন আশ্চর্য ঘটনা ঘটতে পারে তা ভাবতেই পারছিল না। তার আর কোন অনুশোচনা নেই, যন্ত্রণা নেই। আস্তে আস্তে মৃদু কণ্ঠে বলল : বাবা, আমার আর কোন দুঃখ নেই। তোমাদের ভালবাসায় আমার অন্তর ভরে গেছে। তোমাদের স্নেহ-মমতার স্পর্শে আমি আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছি, —আমি জানি না এই অনুভূতির উৎস কোথায়?

উর্বশীর কপালটা একটু অন্যরকম ছিল। তাই কেমন যেন ওলোট-পালট হয়ে গেল সব। হঠাৎই জীবনে এমন সব আশ্চর্য ঘটনা ঘটে যায় যে, মানুষ নিজেও জানে না কেমন করে সেসব ঘটল। আসলে, জীবনের কোন জানাটাই বোধ হয় মানুষের অভ্রান্ত নয়। একটা ঘটনার মধ্যে থমকে থাকে না মানুষ। জানার জগৎ প্রতিদিনই তার বদলে যায়। আজ যেটাকে অভ্রান্ত, নিশ্চিত সত্য বলে জানে কালই সেটাকে পরম ভ্রান্তি বলে মেনে নিতে হয়। সব মানুষের জীবনে এমনটা হয়ত ঘটে না, কিন্তু কারো কারো হয়। অন্তত উর্বশীর হয়েছিল।

ইন্দ্রের দূত এল কিন্নর দেশে ধনকুবেরের গৃহে। তার আগমনে ধনকুবেরের ভিতরটা এক অজ্ঞাত আশঙ্কায় থর থর করে কেঁপে উঠল। উর্বশী যে তার ও দেবকীর প্রাণ। তাদের দ্বিতীয় সত্তা। তাদের রক্তবীজ দিয়ে তৈরি নয়, কিন্তু সে'তো তাদের সন্তান। বুকের ভালবাসা আর স্নেহ-মমতা দিয়ে উর্বশীকে তারা ভরিয়ে রেখেছে। যে উর্বশী তাদের পরিপূর্ণতার, তাদের আনন্দের, ইন্দ্র তাকে কেড়ে নেয়ার জন্য হাত বাড়িয়েছে। একজন কামতাড়িত পশুর মতই সে তাকে দাবি করেছে।

সে-দিনটা গভীর রাত্রি পর্যন্ত ধনকুবের ঘুমোতে পারল না। মাথার ভেতর ধিকি ধিকি অঙ্গার জ্বলছিল। চারদিককার কলুষিত পরিবেশের উপর মানুষের লোভ-লালসা, দুর্বার কামনা-বাসনার উপর ঘৃণা তাকে আজ পাগলের মত করে তুলল। ইন্দ্রের প্রেরিত বার্তাটি তার হাতে ধরা অবস্থাতেই ছিল।

ঘরসংলগ্ন ছোট্ট বারান্দায় এসে দাঁড়াল ধনকুবের। প্রকৃতি শান্ত, নিরুদ্বিগ্ন, সীমাহীন। নির্মেঘ আকাশে কেবল লক্ষ লক্ষ নক্ষত্র নিরীহ শান্তিপ্রিয় মানুষগুলোর মতই অসহায়ভাবে তাকিয়ে আছে। প্রকৃতির মতই দুর্ভাগ্যের চিন্তা নিয়ে তারা মগ্ন। ভীষণ একা এবং অসহায়। আশাহত ধনকুবের ঊর্ধ্বমুখে কিছুক্ষণ আকাশের দিকে চেয়ে রইল। তার বুক থেকে ঊর্ধ্বে ধাবিত হল নিরুপায় অসহায়তা। নিয়তিকে উদ্দেশ করে বলল, কী করেছে আমার উর্বশী? তাকে এত অপমান করছ কেন? রূপ তো তোমারই দেওয়া, সে কি অনাদরের জন্যে?

কথাগুলো বলার পর অনেকক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে থাকল বাইরে। মাথার চুলে এলোমেলো হাওয়া এসে লাগল। তার ভিতরটা কেমন পাগল পাগল লাগছিল। উদভ্রান্তের মত ঘরে ঢুকল। দীপের সামনে মেলে ধরল ইন্দ্রের পত্রখানি। কোন সম্ভাষণ নয়, আবেদন নয়, অনুরোধ নয়, কেশর ফোলানো সিংহনাদ : "সওদাগর, তোমার রূপসী কন্যাকে আমি চাই, অমন রূপসী কন্যা শুধু ইন্দ্রের নন্দন কাননে মানায়। ইন্দ্রের কণ্ঠলগ্না হওয়ার জন্যে সুন্দরীরা জন্মায়। নন্দন কানন তোমার কন্যার অপেক্ষায় আছে। ইন্দ্র যা চায়, তা হয় সে জয় করবে, না হয় কেড়ে নেবে। ইন্দ্র আপোষ জানে না, করুণাও চায় না!" —পত্রখানা হাতে নিয়ে বসে রইল ধনকুবের। ইন্দ্রের দাবির অমর্যাদা এ পর্যন্ত করেনি

কোন পুরুষ। এ দাবি বীর্যবান পুরুষের। বীর্যের গর্বে পুরুষ নারীকে চায়, পাশব পৌরুষ বলে তাকে অধিকার করতে চায়। তার বীর্যের কাছে নত করা এবং তার বাসনা কামনার কাছে আত্মসমর্পণ করার এ এক অভিনব হুঙ্কার ইন্দ্রের। ঘৃণায় ধিক্কারে ধনকুবেরের মনটা রি রি করে উঠল। কিন্তু এই আত্মাবমাননা থেকে নিষ্কৃতির কোন পথ দেখতে পেল না। একখানা মুখও মনে পড়ল না, যে উর্বশীর সম্মান বাঁচাতে ইন্দ্রের সঙ্গে লড়বে।

ধনকুবেরের মাথা আর বুক জুড়ে ঘৃণা রাগ আর ধিক্কারের ঝড় বয়ে গেল। সে কিছুই সঠিকভাবে চিন্তা করতে পারছিল না। উচিত-অনুচিতের বোধ লুপ্ত হয়ে গেল।

কয়েকদিন সে প্রায় নির্বাক রইল। কারও প্রশ্নের কোন জবাব দিল না। কারও দিকে তাকাল না পর্যন্ত। থেকে থেকে গভীর দীর্ঘশ্বাসে বুকেব ভিতরটা কেঁপে কেঁপে উঠল। মানুষ এত নিষ্ঠুরভাবে আর একজন মানুষের জীবনের স্বপ্ন-সাধ-আহ্লাদ কেড়ে নেওয়ার প্রস্তাব দেয় কী করে? এদের হৃদয় বলে কি কিছু নেই? নিজের সন্তানের মুখখানাও মনে পড়ে না?

ধনকুবেরের অস্বাভাবিক শ্বাসের শব্দে ঘরখানি ভরে থাকল। এত বিষণ্ণ ও করুণ যে উর্বশী আগে কখনো শোনেনি। ধনকুবেরকে দেখে উর্বশীর ভীষণ কষ্ট হল। বিশাল একটা আরাম কেদারায় দেহটা এলিয়ে দিয়ে জানলা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে ছিল। অনেকদূর পর্যন্ত বিস্তৃত পাহাড়, বনভূমি, নীল আকাশ দেখা যাচ্ছিল। সকালের কবোষ্ণ রোদ মেঝেয় পড়ে আছে। ধনকুবেরের ভুরুকুঞ্চিত মুখে উদ্বেগের চিহ্ন ফুটেছিল। জিজ্ঞাসু চোখে পিতার দিকে তাকিয়েছিল উর্বশী। হঠাৎ তার সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে যাওয়ায় ধনকুবের সংকুচিত হল। পাছে উর্বশীর কাছে উদ্বিগ্ন অসহায়তা ধরা পড়ে যায়, তাই বেশ একটু খুশির ভাণ করেই তাকে কাছে ডাকলঃ এস মা-মণি। মুখটা অমন শুকনো কেন মা? চোখের চাউনিটা যেন কেমন কেমন? কী হয়েছে? শরীর ভাল আছে তো? আমার কাছে একটু বস্।

উর্বশী ধনকুবেরের খুব কাছে বসল। ছলছলে গভীর চোখে তার দিকে তাকিয়ে বলল ঃ কয়েকদিন ধরে খুব চিন্তা করছ তুমি। এত ভাব কি?

ধনকুবের এবার উর্বশীর চোখের দিকে তাকিয়ে ফিক করে হাসল। তারপর সটান উঠে দাঁড়াল। জানলার দিকে যেতে যেতে বলল : ভাবনার কি শেষ আছে মা। ভাবতে বেশ ভালই লাগে। সময়টা যে কোথা দিয়ে কী ভাবে কেটে যায় টের পাওয়া যায় না। তাই ভাবি।

উর্বশী পিতার গা-ঘেঁসে দাঁড়াল। ডান বাহুর উপর মাথা রেখে বলল ঃ তুমি আমার কথার উত্তর দিলে না তো।

দারুণ মুগ্ধ চমকে ধনকুবেরের বুকের ভেতরটা কেমন উথলে ওঠার ভাব হল। চুপ করে থাকল।

সেই সময়টা উর্বশী ধনকুবেরের চুলের ভেতর আঙুল দিয়ে বিলি কাটতে লাগল। কখনও বা পিঠের উপর তার সুকোমল হাতটা বুলিয়ে দিল। ধনকুবেরের শরীর ও হৃদয় জুড়ে বেজে যাচ্ছিল দামামা। ভেতরটা থর থর করে কেঁপে গেল। সম্মোহিতের মত চেয়ে রইল উর্বশীর চোখের উপর। কী গভীর মায়া আর কত ছলছলে চোখ।

অজান্তেই ধনকুবেরের দু'চোখ ভরে জল নামল। ফোঁটা ফোঁটা হয়ে গড়িয়ে পড়ার আগেই কাপড় দিয়ে মুছে নিল। স্নিগ্ধ মুখে ক্ষীণ হাসির রেখা ফুটিয়ে বলল : পাগল মেয়ে। সব কথা জানতে নেই। জানার কতটুকু কাজে লাগে। আঘাত পাওয়ার জন্য মনে মনে প্রস্তুত করতে হয় নিজেকে।

আমি প্রস্তুত হয়েই এসেছি। কোন দুঃসংবাদে আর ভয় পাই না। কেবল তোমার চিন্তাক্লিষ্ট মুখের দিকে তাকাতে পারি না। আমি তো রোজই দেখি কী অস্থির উদ্বিগ্নতার মধ্যে তোমার দিনগুলো কাটে। অথচ, তুমি একটুও বুঝতে দিতে চাও না, কী হয়েছে তোমার? তুমি না বললেও আমি টের পাই। তোমার শান্তি বলে কিছু নেই। আগুনের মত আমার এই রূপটাই অভিশাপের। একে নিয়ে কোনকালে শান্তিতে থাকতে পারব না। তুমিও শান্তি পাবে না। এর চেয়ে আমার মরণ ছিল ভাল। বলতে বলতে তার গলার স্বর কেমন কেঁপে গেল, মুখের ভাব পাল্টে গেল। ঠোঁট দাঁত কামড়ে কান্না সামলানোর চেষ্টা করল। তবু ফোঁপানির শব্দ হল। বুকের ভেতর এই উথাল পাথাল ভাবটা

সে আর বইতে পারছিল না। একটা ভীষণ অস্থিরতা নিয়ে সে দৌড়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

ধনকুবের সম্মোহিতের মত চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। ভিতরটা দুশ্চিন্তায় কেমন বোবা হয়ে গিয়েছিল। গভীর বিষাদে মনটা অবসন্ন হয়ে রইল।

ঝড়ে মাথার উপর ঘরের চাল উড়ে গেলে মানুষ যেমন বিপন্ন নিরাশ্রয় নিরালম্ব বোধ করে, ইন্দ্রের বার্তাটি উর্বশীর মনে তেমনি একটা বিপন্ন অসহায়তার অনুভূতিতে তীব্র প্রতিক্রিয়াশীল। রাগ হল নিজের ভাগ্যের উপর আর রূপের উপর। ঘৃণা জন্মাল ইন্দ্রের উপর। জমা খরচের হিসাব মিলিয়ে দেখল বিধাতা তাকে কিছুই দেয়নি। তাঁর মত নির্মম রসিক আর কে আছে? এক হাতে দিয়ে অন্য হাতে নিয়ে নেন। জীবন-নদী বইতে বইতে এক ঘাটে পূর্ণ হয়, অন্য ঘাটে একেবারে শূন্য থাকে। মানবভাগ্যে দোদুল্যমান নিমজ্জিত তরীটিকে কখনও সে উদ্দাম তরঙ্গবক্ষ থেকে পরম যত্নে স্নেহশীলা জননীর মত সকল বিপদ থেকে আগলে রাখে আবার কখনো ক্ষমাহীন আক্রোশে ভেঙে দেয় তার সুখের নীড়, তছনছ করে দেয় স্বপ্ন, কামনা-বাসনা। উর্বশীর মনে হয় তার জীবনটা বোধ হয় এই রকমই। ভাঙা-গড়ার ইতিহাস। সুতরাং এ তার ভাগ্যের ফল। এ নিয়ে মনস্তাপ করাও বৃথা।

তা-হলে কী করবে উর্বশী? প্রশ্নটা নিজেকে করল। ভাগ্যের কাছে হেরে গিয়ে নয়, আত্মসমর্পণ করেও নয়, একেবারে সামনা-সামনি লড়াই করে ভাগ্যফলটাকে বাজিয়ে দেখতে বড় ইচ্ছে করল। ভাগ্যের মানেটা এবং বিধাতার ইচ্ছাটা কি; নিজেকে বাজি রেখে আঁতি-পাঁতি করে খুঁজে দেখতে বড় সাধ হল। ভাল-মন্দ যাই হোক, নতুনত্বের স্বাদ আছে এতে। একটা বড় সত্যকে জানা যায়, রহস্যকে আবিষ্কার করা হয়। এও একরকম নতুন করে বাঁচা। চমৎকার করে বেঁচে থাকা। বুকের ভেতর কেমন একটা সিরসিরে ভাব হয়।

উর্বশীর মনে হল, বিধাতা তার ভাগ্যটা একটু অন্যরকম তৈরি করেছে। তার আপাত সকল সৌভাগ্যের মধ্যেই হয়ত অন্য দুর্ভাগ্য সুপ্ত আছে। যেমন ফুলের মধ্যে থাকে রেণু, ফলের মধ্যে থাকে বীজ। সেই সুপ্ততা থেকে প্রকাশিত হয় নতুন কচি শ্যামলরঙা জীবন। সেই কথাই মনে হতে লাগল। এতদিন ধরে যাকে জীবন বলে জেনে এসেছে সেটা একটা অভ্যাস। তার ভিতর ধরা বাঁধা একঘেয়েমিতা আছে। এ যেন তোমার সুখে সুখী, তোমার দুঃখে দুঃখী কিংবা তোমার ভাল হলে দুঃখ হয়, মন্দ হলে আনন্দ হয়। নিজের গণ্ডির মধ্যে একঘেয়েমির শিকার হয়ে বেঁচে থাকা। ভাগ্যের হাতে মার খেয়ে ডানা ভাঙা পাখির মতন নিজস্বতা হারিয়ে ফেলে ভূপতিত হয়ে বেঁচে থাকার কষ্ট যন্ত্রণা ভোগ করার মত বিড়ম্বনা খুব কম আছে। এইভাবে বেঁচে থাকার প্রয়োজন কতটুকু? ভিখারীর মত জীবনের বোঝাটাকে ককিয়ে কেঁদে বয়ে বেড়ানোর ভেতর কোন গৌরব নেই। উর্বশীর ভেতরটা কেমন ছটফটিয়ে উঠল। এখনি তার উন্মত্ত উৎসারে দৌড়ে যেতে ইচ্ছে হল এক অজানা, অচেনা জীবনের দিকে; জীবনের মানেটা আঁতি-পাঁতি করে খুঁজতে, নিজের ভাগ্যকে নতুন করে আবিষ্কার করতে।

উর্বশীর ঘরে আর মন বসল না। ধনকুবেরের চিন্তাক্লিষ্ট অসহায় মুখখানাই যেন তাকে এক জীবন থেকে আর এক জীবনের দিকে, ভাগ্যের গভীর গন্তব্যের দিকে, নিজের এক অজ্ঞাত ভবিষ্যতের দিকে, নিজের প্রকৃত সুখ কিংবা দুর্ভাগ্যের দিকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করতে লাগল। শুধুমাত্র নিজের অজানিত এক উদ্দাম আনন্দের খোঁজে বেরিয়ে পড়ার জন্যে সে ঘরের বাইরে পা বাড়াল।

তখন সবে ভোরের আলো ফুটেছে। আঁধার কাটেনি। তবু পাখিরা নীড়ে চঞ্চল হল। অসীম উৎসাহে নীল আকাশের দিকে উড়ে গিয়ে হারিয়ে গেল নীলের মধ্যে। কুয়াশার মায়াবী আবরণ ভেদ করে একরাশ আলোর উষ্ণতা বয়ে আনল ভোরের নবীন সূর্য। অমনি পাখিদের উল্লাসে সমবেত চিৎকারে শিহরিত হল বন। পাখির ডানার গন্ধ মিশে রইল বাতাসে। শিশির ভেজা সকাল কী দারুণ মুগ্ধতা বয়ে নিয়ে এল উর্বশীর প্রাণে।

খুব সাবধানে চারদিকে চোখ রেখে সে পাহাড়তলীর রৌদ্রকরোজ্জ্বল পথ ধরে হাঁটছিল। কোন

পথ কোন দিকে গেছে কিছুই জানে না। পাহাড়ের গা বেয়ে আঁকা বাঁকা পথ গিয়েছে কোনোটা উপরের দিকে কোনোটা নীচের দিকে। ঢালে ঢালে দু'চার ঘর মানুষের বসতি গম এবং শস্যের ক্ষেত।

উর্বশী উঁচু নীচু পথে বারংবার হোঁচট খাচ্ছিল। পড়তে পড়তে নিজেকে সামলে নিচ্ছিল। কি করবে বেচারী। চিরদিন রথ কিংবা ঘোড়ায় টানা গাড়ি চাপা অভ্যেস। এইসব অসমতল, উঁচু-নীচু পথ ভেঙে যেতে তার সত্যিই কষ্ট হচ্ছিল। তবু পায়ে পায়ে শুকনো পাতার মড়্মড়্ আওয়াজ তুলে সে দৃপ্তপদে এগোচ্ছিল। কিন্তু তার কোন গন্তব্য ছিল না। কোথায় যাচ্ছিল তার কোন স্পষ্ট ছবি ছিল না। ভাগ্যচালিত হয়েই যাচ্ছিল। তাই, এক অচেনা ভয়ে অজানা আশঙ্কায় তার ভিতরটা দপদপ করছিল। থেকে থেকে মনে হচ্ছিল, এখন ভাগ্য তাকে একেবারেই একা করে দিল। একা হলেই মনটা তার বড় টাটায়। ধনকুবেরের এবং দেবকীর মুখখানা তার খুব মনে পড়ছিল। আর গভীর এক অপরাধবোধে বুকের ভেতর থেকে একটা প্রবল কান্না যেন ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইল। আশ্চর্য অবুঝ মায়ায় সারা মনটা কেমন যেন করে উঠল। গভীর আবেগে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে কেঁদে নিজের অনুতাপিত মনে বিড় বিড় করে বলল :

একা থাকা বড় কষ্টের—
একা হলেই নিজের কাছে নতজানু মানুষ
বরফের মতো ঘাসের মতো
মোমের মতো গলতে গলতে বলে
ক্ষমা কর।

হঠাৎ দেবকীর জন্যে তার বুকটা হু হু করে উঠল। আর্ত গলায় নিরুচ্চারে উচ্চারণ করল :

মাগো,
আমি পারিনি
ভাগ্যের দরজা খুলতে।
সিঁড়ি খুঁজে পাইনি,
অন্ধকার গুহা থেকে বাইরে বেরোনোর।
দুর্ভাবনায় মরেছি, তোমাদেরও মেরেছি,
এলোমেলো হয়ে গেছে
একটা নিশ্চিন্ত আশ্রয়।
ছিটকে পড়েছি
খাদে
ফাঁদে
জঙ্গলে।
দরজা খুলতে পারিনি ভাগ্যের।
আমি পারিনি
ইন্দ্রের নির্লজ্জতাকে ক্ষমা করতে।
খোলা আকাশের তলায় দাঁড়িয়ে
তাই, খুঁজছি
জীবনকে।
ভাগ্যকে।

অনেকক্ষণ পর তার চোখ থেকে দুফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল ধনকুবেরের জন্য। এমন মহান মানুষের স্নেহনীড় ছেড়ে চলে যেতে তার বুকের আধখানা ভেঙে যেতে লাগল। সকাল হলে যখন জানবে উর্বশী নেই, তার ঘর শূন্য, কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, তখন অবস্থাটা কী হবে তার ভাবতে গা শিউরে উঠল। উর্বশীর বুকের ভেতর যে কষ্ট সেই কষ্টে তার চোখ ছলছল করে উঠল।

সত্যি বুকে তার গভীর নিষ্ঠুরতা লুকোনো আছে। তাই ধনকুবেরকে এমন কষ্ট দিতে পারল। অনুশোচনায় হাহাকার করে উঠল। মনে মনে বলল উর্বশী :

বাবা ক্ষমা করো।
আমি পারিনি অদৃষ্টের কাছে হার মানতে।
তোমাকে অসম্মানিত করতে পারি না।
দুঃখ যা পাবার—
একাই নিজেকে দেব।
আমার ভয় পাবার কিছু নেই
অমৃতের পুত্রী আমি।

উর্বশীর বুকের ভেতর কোথায় যেন মোচড় দিয়ে উঠল। অব্যক্ত কান্নায় তার হৃদয় কান্নার সমুদ্র হয়ে যেতে চাইছিল।

উর্বশী নিজের মনোবেদনায় আনমনা হয়ে পড়েছিল। তা যদি না হত তাহলে দেখতে পেত অতি সন্তর্পণে তার দিকে শিকারী নেকড়ের মত সাক্ষাৎ যমদূত সদৃশ এক অস্ত্রধারী পুরুষ নিঃশব্দে এগিয়ে আসছে। উর্বশী নিজের চিন্তায় এত বিভোর ও অন্যমনস্ক ছিল যে আগন্তুকের আগমন পর্যন্ত টের পেল না।

আচম্বিতে সেই কালান্তক সদৃশ মানুষটি মুখ চেপে ধরে তাকে বুকে তুলে নিল। প্রচণ্ড জোরে বুকের মধ্যে আশ মিটিয়ে নিষ্পেষণ করতে লাগল। উর্বশী প্রতিরোধের সুযোগ পর্যন্ত পেল না। চিৎকার করে কাউকে ডাকতে পর্যন্ত পারল না। পারল না তাকে নখ কিংবা দাঁত দিয়ে আঁচড়ে কামড়ে ক্ষতবিক্ষত করে দিতে। অসহায় কান্নায় ভাঙা ভাঙা গলায় অস্ফুট স্বরে বলল : আমাকে ছেড়ে দাও। তোমার পায়ে পড়ি, ছেড়ে দাও।

উর্বশীর আকুতি মিনতিতে লোকটা খুব মজা পেল। বিজয়োল্লাসে হাসল অনেকক্ষণ। তারপর বলল : ছেড়ে দেবে বলে কেশী দৈত্য তো তোমাকে ধরেনি। দৈত্যরাজ কেশী চায় তোমাকে। তোমার রূপ, যৌবন, স্বাস্থ্য, মন সব চায় কেশী। তোমাকে পেয়ে ধন্য হবে কেশী।

উর্বশী চমকাল। কিন্তু কোন কথা বলতে পারল না। কি করে বলবে? দৈত্যরাজ কেশী তখন তার পাতলা ঠোঁট দুটোকে গ্রাস করেছে। তার নিবিড় আলিঙ্গনের বন্ধনে একটু একটু করে সে ক্লান্ত ও হতচেতন হয়ে পড়ল।

বাহুবন্ধন যখন শিথিল হল বুক উজাড় করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল উর্বশী। আর নিজের মনেই সবিস্ময়ে উচ্চারণ করল; একেই বলে অদৃষ্টের পরিহাস। পালিয়ে অদৃষ্টকে হারিয়ে দিতে চেয়েছিলাম। কিন্তু পারলাম না তার ফাঁদ থেকে বেরিয়ে আসতে। নিয়তি বড় নির্মম রসিক। সে নিজে না চাইলে, মানুষের ইচ্ছেয় কিছু দেয় না।

উর্বশী কিছু বোঝার আগে কেশী দু হাতে তুলে নিল তাকে। তার শক্ত দুটি হাতের বন্ধন চেপে বসল তার নরম শরীরের ওপর। কিছু করার শক্তি পর্যন্ত ছিল না উর্বশীর।

তা-হলে ভাগ্যের কাছে অসহায়ের মত আত্মসমর্পণ করে হেরে যাবে? কান্না পেল উর্বশীর। হেরে যাওয়ার ভেতর কোন গৌরব নেই। হেরে যাওয়ার গ্লানিতে দাহ্যবস্তুর মত নিজেকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাই করার ভেতরও নেই কোন মহিমা। কোন মানুষই হারতে চায় না। তবু হারটা হয়ে যায়, ঘটে যায়। যখন তা ঘটে তখন দুর্ভাগ্য কিংবা দুর্ঘটনার কোন প্রশ্ন থাকে না। যা অবধারিত তাই হয়। তবু হার ঠেকানোর জন্য প্রতিরোধ তাকে করতে হয়। কথাগুলো উর্বশীর হঠাৎ-ই মনে এল। মুক্তি কেউ দেয় না, মুক্ত নিজেকে করতে হয়। যে না পারে সারাজীবন তাকে পস্তাতে হয়। বাঁচার মত বাঁচতে না পারলে সে বেঁচে থাকার কোন মানে হয় না। নিজের মত বাঁচবে বলেই তো নতুন জীবন অন্বেষণে বেরিয়েছিল? কিন্তু অদৃষ্ট তাকে নিয়ে এ কোন রসিকতা করল?

অনেকটা পথ উর্বশীকে কাঁধে করে বয়ে এনে রথে তুলল কেশী। উর্বশী কোন বাঁধা দিল না। কাঁদল না। অপ্রতিভ ভাবটা তাড়াতাড়ি কাটিয়ে উঠে দৈত্যের উপর চোখ পেতে রাখল। মুখে ও শরীরে তার কোন ভয়ের চিহ্ন নেই। ঠোঁটে পাতলা হাসি।

সাঁ সাঁ করে বাতাস কেটে একরাশ ধুলো উড়িয়ে রথ ছুটছিল। অশ্ব-খুরের শব্দে দু'পাশের জঙ্গল ভরে গেল।

মনের ভেতর একটা চাপা উত্তেজনা উর্বশীর। ভয়টা বাড়তে লাগল। কিন্তু কোন প্রকাশ নেই তার। অসহায়ের মত চারদিক তাকিয়ে তাকিয়ে সে যেন কিছু একটা সন্ধান করছিল।

কোথায় কে যেন সূর্য-স্তব করছিল। উদাত্ত কণ্ঠে উচ্চৈঃস্বরে পাহাড়, বন, প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে সে সূর্যের অর্চনা করছিল। দিগন্ত পরিব্যাপ্ত হয়ে সেই স্বর বহুদূর ছড়িয়ে পড়ল। প্রাণের গভীর থেকে উৎসারিত হচ্ছিল সেই শান্তি প্রার্থনা। আর প্রকৃতি যেন সে আরাধনায় তন্ময় হয়ে পড়েছিল।

উর্বশীর ভেতরটাও চঞ্চল হল। কান খাড়া করে সে স্তব শুনছিল। কিন্তু কাউকে দেখতে পেল না। ক্রমেই ঐ স্বর ক্ষীণ হয়ে এল। উর্বশী ভিতরে ভিতরে ছটফটিয়ে উঠল। পরিত্রাণের ক্ষীণ আশাটুকুও বোধ হয় আর থাকল না। একটা তীব্র অসহায়তাবোধে বুকটা চিন চিন করতে লাগল। দ্রুত সবদিক চিন্তা করে উর্বশী স্থির করল, মন্ত্রধ্বনির রেশটুকু মিলিয়ে যাওয়ার আগে সে একবার দৈত্যের হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করার শেষ চেষ্টা করবে। বুকের ভেতর উত্তেজনার তরঙ্গ বয়ে গেল। হঠাৎ-ই উন্মাদের মত দু হাত শূন্যে ছুঁড়ে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করতে লাগল—বাঁচাও, বাঁচাও।

দৈত্য ক্রুদ্ধ হয়ে চলন্ত রথেই পদাঘাত করল তাকে। তীব্র ব্যথায় তার গলার স্বর আরো ভয়ঙ্কর এবং তীক্ষ্ণ হল।

বাঁ-চা-ও দুর্ভাগিনী নারীর অসহায় আর্ত-চিৎকারটা ঝোড়ো বাতাসে কাঁপতে কাঁপতে দূরের পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হয়ে প্রকৃতিকেও যেন চঞ্চল অস্থির করে তুলল।

পুরুরবার ধ্যান ভঙ্গ হল। উৎকর্ণ উৎকণ্ঠায় তার সমস্ত ইন্দ্রিয় সজাগ হয়ে উঠল। কান খাড়া করে শুনল। একটা তীক্ষ্ণ আর্তনাদ মুহূর্তে তার কানে এসে বিঁধল। পরক্ষণে আহত বেদনার চাপা কান্নার আওয়াজ বাতাসে আকুতি ছড়াতে ছড়াতে বনময় ছড়িয়ে পড়ল। সেই আর্তি পুরুরবার রক্তের কলধ্বনিতে ঝঙ্কার তুলল। পুরুরবা চঞ্চল হল। বেশ বুঝতে পারল, অসহায় নারী বীর্যবান পুরুষের সাহায্য চাইছে।

পুরুরবা কয়েক মুহূর্ত ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে রইল। শব্দের দিক নির্ণয় করে রথে উঠল। নদীর তীর ধরে রথ ছুটল পূর্বদিকে। চাকা দুটি তার মাটিতে ছিল না শূন্যে ঘুরছিল।

॥ দুই ॥

ভাগ্যের টানাপোড়েনে দুর্বৃত্তের হাত থেকে ছিটকে এসে পড়ল সহৃদয় এক মহারাজার জীবন নাট্যে। এখানেই উর্বশীর জীবন নাট্যের রঙ একেবারে বদলে গেল। এক নতুন উর্বশীর জন্ম হল।

পুরুরবা উর্বশীকে শুধু উদ্ধার করল না, তাকে মহিষী করল। উর্বশীর রাজকীয় আত্মপ্রকাশ ঘটল। নারীর পূর্ণতা পেল। সে বধূ, রাজমহিষী, প্রেমময়ী রমণী। উর্বশীর নিজেকে বড় ধন্য আর সার্থক মনে হল। সুখে, আনন্দে, প্রেমে জীবনটা ভরপুর হয়ে উঠল। এ সবের জন্যে পুরুরবার কাছে সে ভীষণ ঋণী। পুরুরবা তাকে নবজীবন দিয়েছে। পুরুরবা তার ঈশ্বর, তার অদৃষ্ট, তার সব। ঈশ্বরের রূপ ধরে পুরুরবা তাকে কুৎসিত-দর্শন কেশী দৈত্যের হাত থেকে শুধু উদ্ধার করল না, ইন্দ্রের হাত থেকেও বাঁচাল। সসাগরা ভারত অধিপতি পুরুরবাকে দেবরাজ ইন্দ্রও সমীহ করে। পুরুরবা তার ভাগ্যজয়ের সেনাপতি। এমন মানুষকে স্বামী পাওয়ার মত পরম সুখ আর কিছু নেই।

জীবনের এক দুঃসময়ে ঈশ্বর তাকে মিলিয়ে দিল। ঈশ্বরের অসীম অনুগ্রহ কৃপা না পেলে এ জীবনটার অন্য গতি হত। সে কথা ভাবলে তার লোমকূপ খাড়া হয়ে ওঠে।

পুরুরবার কাছে তার কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই। তাকে অদেয় কিছু ছিল না। পুরুরবাকে নিবৃত্ত করার শক্তিও ছিল না। পুরুরবার অনন্ত কামনা-বাসনার অমৃত প্রেমশিখা সে।

উর্বশীর রূপ দেখে পুরুরবা মুগ্ধ হয়ে গেছে, তার নৃত্য গীতে মন ভরে আছে। উর্বশী হাসলে, তার হাসিতে মুক্ত ঝরে, ঝর্নার মত উচ্ছল মন ভরানো সে হাসি। পুরুরবা উর্বশীকে যত দেখে তত অবাক হয়ে যায়। উর্বশী তার কাছে শুধু নারী শুধু প্রেমিকা। তার সেই অনন্ত প্রেমের আকর্ষণ

থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখার সাধ্য ছিল না পুরুরবার। উর্বশীকে পেয়ে তার ঘরে ফেরার কথা মনে হয়নি। একবারের জন্যে পিছন ফিরে তাকানোরও সময় হয়নি। উর্বশীকে পেয়ে ভরপুর হয়ে ওঠাই ছিল তার একমাত্র পাওয়া। নিজেকে চরিতার্থ করার সুখে ডুবে রইল পুরুরবা। ভুলে গেল তার রাজকার্য। উর্বশীর হাত ধরে সে আর এক অমরায় যাত্রা করল।

দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর নির্জন দ্বীপে স্বপ্ন মদির অনুরাগরঞ্জিত রতি-রভস-তৃপ্ত মিলনের দিনগুলির মাদকতা নেশার মত, হাওয়ার মত শরীরে মনে লেগে রইল। কিছুতে সে মায়াবী মোহ কাটতে চায় না। সেই দিনগুলির কোন প্রভাত নেই, রজনী নেই, সেই কামনার কোন ক্লান্তি নেই, বাসনার শেষ নেই। কেবল কোন কোন রাতে আশ্লেষ ক্লান্ত চোখে তন্দ্রা নেমে আসে। তন্দ্রাজড়িত কণ্ঠে শুনতে পায় পুরুরবা উর্বশীর কণ্ঠস্বর : প্রিয়তম, তুমি সুখী তো? তৃপ্ত তো? মন ভরেছে তো?

পরম প্রার্থিত বস্তুর মত উর্বশীকে বুকের ভেতর নিয়ে মুখে মুখ রেখে নিবিড় আসঙ্গসুখে ডুবে গিয়ে স্তিমিত গলায় অস্ফুট স্বরে পুরুরবা বলে : জানি না'ত?

পুরুরবার বুকের ভেতর লুকোনো ভালবাসার অনুভূতি উর্বশীর বুঝতে অসুবিধা হল না। পরম নিশ্চিন্তে স্বামীর চওড়া বুকের উপর মাথা রেখে উর্বশী বলল: স্বামী, সকলকে ছেড়ে তুমি আমাকে নিয়ে এমন মেতে রইলে কেন? তুমি একাজ করলে কেন?

এ প্রশ্নের কোন উত্তর দিল না পুরুরবা। কোন মিথ্যে কথাও জোগাল না তার মুখে। তাকে চুপ করে থাকতে দেখে উর্বশী বলল : প্রিয়তম চুপ করে আছ যে?

জানি না।

সত্যি জানো না।

না। জীবনের সব প্রশ্নের উত্তর দেয়া যায় না। তবে মূল প্রশ্নের উত্তর প্রত্যেক মানুষকে একা একাই দিতে হয়।

কি উত্তর দেব? বলো। কিসের জন্যে—

জ্যোৎস্নার মত উর্বশী পুরুরবার সুন্দর দেহের উপর উবুড় হয়ে পড়ে রইল। উর্বশীর অনাবৃত সুডৌল বুক পুরুরবার বুকের উপর। অনাবৃত এক যৌবনবতী অপরূপা সুন্দরী রমণীর অপূর্ব দেহ সম্ভার বুকে নিয়ে পুরুরবা এক অন্য সুখে বিভোর হয়েছিল। মানুষ-মানুষীর যা কিছু সুন্দর অনুভূতি পাওয়া, যা কিছু আশ্লেষে চাওয়া সব তো দুটি দেহের মিলন সাগরে! অনুভূতির মধ্যে জোনাকির মত বিন্দু বিন্দু আলো হয়ে স্পন্দিত হতে থাকে শরীরের মিষ্টি গন্ধ। কেমন একটা অদ্ভুত আবেশের ভেতর ডুবে গিয়ে পুরুরবা বলল : এ একরকম অনুভূতি। ভালবাসার রকমটা ঠিক কি, তা ব্যাখ্যা করা যায় না। নিজে বোঝা যায়, কিন্তু অন্যকে বোঝানো যায় না।

তোমার বোঝাটা দিয়েই বল।

কেন যে এমন ভাল লেগে যায় একটা মানুষকে এ জীবনে, মানুষই জানে না। তবে, নিশ্চয়ই কোন এক জায়গায় শূন্যতা থাকে। সেই শূন্যতা যখন প্রাপ্তিতে ভরে ওঠে তখন বোধ হয় একজনকে তার ভাল লাগে, ভালবাসে। সব কিছু দিয়ে সে তার শূন্যতাকে ভরিয়ে তোলে। আমিও বোধ হয় এক অচরিতার্থ জীবনকে পরিহার করে নতুন জীবনকে পাবার জন্য এমন করে মেতে উঠেছি।

সত্যি এ এক নতুন অনুভূতি।

উর্বশীর স্তন সন্ধিতে মুখ রেখে পুরুরবা জিজ্ঞেস করল : আচ্ছা উর্বশী, তুমি কেমন জীবন পেলে?

পুরুরবার গলার স্বর কানে এলে উর্বশী কেমন খুশি হয়ে উঠে। ভীষণ ভাল লাগে। কেন যে এমন ভাল লাগে—কে জানে? কী জাদু আছে ঐ গলার স্বরে! তীব্র আনন্দে উর্বশীর দু'চোখ বুজে যায়। হয়ত কোন কুসুমগন্ধী সুখ আছে, যা পরম প্রার্থনায় এমন বিভোর, এমন আবিষ্ট করে দেয়।

পুরুরবার প্রশ্নে ঠোঁটের কোণে এক চিলতে হাসি ফুটে উঠল উর্বশীর। চোখ বুজে একটা লম্বা শ্বাস নিল। স্বপ্নাচ্ছন্নের মত বলল : অমৃত জীবন, অনন্ত জীবন।

স্বপ্নাচ্ছন্ন চোখে পুরুরবা নিষ্পলক কিছুক্ষণ চেয়ে রইল উর্বশীর মুখের দিকে। তার চোখ বোজা।

ঠোঁট দুটি ঈষৎ ফাঁক। এক মায়াবী আলো ঘিরে আছে যেন তার মুখমণ্ডলে। পুরুরবার বুকের মধ্যে সামান্য তরঙ্গ বয়ে গেল। অবাক গলায় প্রশ্ন করল : কোন মন্ত্র পেলে প্রিয়তমা?

পুরুরবার চোখে চোখ রেখে রুদ্ধ গলায় আবেগমথিত স্বরে উচ্চারণ করল : নরপতি, প্রেমের মন্ত্র, বাসনার মন্ত্র।

তোমার কথা ঠিক বুঝলাম না।

মনের সব কথা তো বোঝানো যায় না, বুঝে নিতে হয়। প্রদীপের বুকে যেমন শিখা, বাসনার বুকে তেমনি প্রেমের প্রতিষ্ঠা। যেখানে অনন্ত বাসনা, সেখানে অমর প্রেম। আমি তোমার অনন্ত বাসনার অমৃত প্রেমশিখা। উর্বশী শুধু একটা রমণী নয়, সে প্রেমিকা, বধূ, তোমার সন্তানের জননীও হবে। তুমি তার কিছুই কেড়ে নাও নি, তার নারীত্বকে ধন্য করেছ, সার্থক করেছ। উর্বশী জন্মেই তার পিতা মাতাকে ফেলে এসে কিছু হারায়নি। ধনকুবের তাকে দিল কন্যার স্নেহ, তুমি দিলে বধূর সম্মান, রাজমহিষীর গৌরব, মাতৃত্বের স্বাদ! আর আমি, পূর্ণ হতে, ধন্য হতে আমার প্রেমের দেবতার জন্যে জ্বালালাম আমার দেহপ্রদীপ, কিন্তু অন্তর ভরে রইল প্রেমের আলোয়।

জীবন বড় জটিল। সংসার আরো বিচিত্র এবং অদ্ভুত। এখানে কোন অসম্ভব বলে কিছু নেই। জীবনের কোন গতি কিংবা ছেদ নেই। জীবন মানে ভরপুর হয়ে সকলকে সুধন্য করে অনন্তের পানে চলে যাওয়া। জীবন হল বহমান সমুদ্র। নিরন্তর তরঙ্গের দোলায় দুলছে। তরঙ্গহীন সমুদ্র যেমন হয় না, দ্বন্দ্বহীন জীবনও হয় না তেমন। জীবন মানে চলা। এক স্রোত থেকে আর এক স্রোতে গিয়ে পড়া। কোন স্রোতই থেমে নেই। উর্বশীর জীবনও এগিয়ে চলল আরো দ্বন্দ্বে আরো কোলাহলে।

ভাগ্যচক্র উর্বশীর কপালে লিখে রেখেছে অন্য এক জীবন। অসাধারণ কিছু ঘটনাবলী। কিছু দ্বন্দ্বময় অন্তর্দ্বন্দ্ব। সুতরাং নিরুদ্বিগ্ন জীবন আশা করবে কেমন করে? ভাগ্যের গতিচক্র তাকে স্থির থাকতে দিল না। মহা পৃথিবীর দিকে যে অবারিত পথ চলে গেছে সেই দিকে নিঃশব্দে সবেগে তাকে টেনে নিয়ে গেল অদৃষ্ট। উর্বশীও জানতে পারল না।

অসাধারণ হওয়ার জন্য যার জন্ম, ক্ষুদ্র রাজগৃহে কিংবা রাজকীয় সুখ সমারোহ, আনন্দ, ঐশ্বর্যের মধ্যে তাকে কি ধরে? একজন সাধারণ রাজমহিষীর মত তার জীবনটা কাটে কখনও?

অতর্কিতে অদৃষ্ট হানা দিল তার সুখের নীড়ে অন্য এক জীবনের পরোয়ানা নিয়ে।

অনেকগুলো বছর পুরুরবা-উর্বশীর কোথা দিয়ে যে কেটে গেল টের পেল না। এই বছরগুলো পুরুরবা রাজধানীতে ছিল না। রাজ্যপ্রশাসন থেকে ছিল দূরে। তাই রাজ্যের কোথায় কি হচ্ছিল কিছুই জানত না পুরুরবা। হৃদয়ের গভীরে অনুভূতি দিয়ে প্রেমের অর্ঘ্য সাজিয়ে নিজেকে প্রতিদিন তুলে ধরছিল উর্বশীর কাছে। এ যেন সুখের পাখি, মুক্ত পক্ষ বিস্তার করে প্রেমের নীল আকাশে অনন্ত মধুরিমা পানে মত্ত। ভুলে গিয়েছিল রাজ্যের কথা, সিংহাসনের কথা, শত্রুতার কথা।

বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত রাজধানী থেকে খবর এল প্রতিবেশী গন্ধর্ব রাজ্যের বিশ্বাবসু ইন্দ্রের সাহায্য নিয়ে কুমার বনে সৈন্য সমাবেশ করেছে। ইন্দ্র গন্ধর্ব দেশের রক্ষাকর্তার ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার সংবাদ পুরুরবাকে একটু উদ্বিগ্ন করল। বিপুল উৎকণ্ঠা নিয়ে অচিরেই রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করল।

রাজধানীতে পুরুরবার দীর্ঘকাল অনুপস্থিতি সামরিক শক্তিকে দুর্বল করে ফেলেছিল। এজন্য দায়ী সে। রাজস্বের একটা বিরাট অংশ উর্বশীর সঙ্গে তার মধুচন্দ্রিমা যাপনের ব্যয় হিসেবে রাজধানী থেকে নিয়মিত পাঠানো হত। ফলে, রাজকোষে বিপুল অর্থাভাব দেখা দিল। তাই, সামরিক খাতে ব্যয় সংকোচন করল মন্ত্রীরা। নতুন সৈন্য নিয়োগ বন্ধ হল। ব্যয়ভার হ্রাস করার জন্য সৈন্য ছাঁটাই করা হল বহু। সামরিক শক্তি হ্রাসের এই সুযোগ নিয়ে বিশ্বাবসু কি তার রাজ্য আক্রমণের সিদ্ধান্ত নিল? বিশ্বাবসুর সঙ্গে তার কোন রাজনৈতিক বিরোধ নেই। স্বার্থের সংঘাত নেই। তার সামরিক শক্তিও নগণ্য। মিছেমিছি তার সঙ্গে সংঘাতে যাবে কেন? সাম্রাজ্য বাসনা থাকলেও বিশ্বাবসুর সাধ্য

কিংবা সাহস নেই তার বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর। ইন্দ্রের প্ররোচনাতে সে নিশ্চয়ই সীমান্তে সৈন্য সমাবেশ করেছে। আসলে তার গোটা আয়োজনটার সঙ্গে ইন্দ্রের নাম জড়িয়ে আছে। পুরুরবার সব সন্দেহ তাই ইন্দ্রকে ঘিরে।

ইন্দ্র বিশ্বাবসুর পক্ষ নিল কেন? ইন্দ্রের সঙ্গে তার শান্তি চুক্তি ছিল কেউ কাউকে আক্রমণ করবে না। ইন্দ্র কৌশলে চুক্তি লঙ্ঘন করল। বিশ্বাবসুর সমর্থনে দেবসেনাপতি কার্তিকের নেতৃত্বে ইন্দ্র বিশাল সৈন্যবাহিনী পাঠাল কেন? কার স্বার্থে? এর তাৎপর্যই বা কি? বিশ্বাবসু তার রাজ্য আক্রমণ না করে রাজ্য সীমার কাছে ছাউনি গেড়ে বসে রইল কোন উদ্দেশ্যে? ইন্দ্র কী চায়? চাতুরী করে তার কাছ থেকে অন্য কোন একটা জয় আদায় করতে চায়। অথচ এরকম কোন বিশ্বাসভঙ্গ ইন্দ্রের কাছে পুরুরবা প্রত্যাশা করেনি। এই প্রথম পুরুরবা উপলব্ধি করল রাজনীতিতে চিরন্তন মিত্রতা বলে কিছু নেই। বন্ধুও শত্রু হয়। আজ যে লক্ষ্মণ, কাল সে বিভীষণ। যুদ্ধ যদি সত্যিই হয়, তাহলে সে যুদ্ধ হবে তার সঙ্গে বিশ্বাবসুর নয়, ইন্দ্রের। কিন্তু যুদ্ধ করে ইন্দ্র পেতে চায় কি?

ইন্দ্রের লক্ষ্য পুরুরবার পরাজয় নয়, তার সাম্রাজ্য জয়ও নয়। অন্য কিছু। ইন্দ্র মুখে কিছু না বললেও পুরুরবা তার উদ্দেশ্য জানে। ইন্দ্র চায় উর্বশীকে। তার প্রতি ইন্দ্রের দুর্বলতা পুরুরবার অজানা নয়। উর্বশীর দীপ্ত যৌবনের প্রাণবন্ত উচ্ছল দেহলালিমা, তার পীনোন্নত বক্ষের দুর্বার আকর্ষণ, তন্দ্রালস দুই চোখের গভীর মায়ার হাতছানি একদিন ইন্দ্রের বুকে ঝড় তুলেছিল। সে ঝড় উর্বশীকে উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল নিরাপদ গৃহ থেকে এক অনিশ্চিত আশ্রয়ের দিকে। বিধি বাম হওয়ায় ইন্দ্র আশাহত হল। কিন্তু উর্বশীর আশা ছাড়ল না। তাকে পাওয়ার ছকটা একটু অন্যভাবে সাজাল কেবল। প্রকৃতপক্ষে উর্বশীর জন্যই রাজ্যের সীমান্তে রণদামামা বেজে উঠল। শুধু তাকে লাভ করার জন্যে রাজ্যে-রক্তের বন্যা বইয়ে দিতে পারে।

পুরুরবা খুব বিপন্ন এবং অসহায় বোধ করল। নিজের মনেই নিরুচ্চারে উচ্চারণ করল ঃ হায় উর্বশী! তোমার বিধিলিপি বড় বিচিত্র। বিধাতা তোমার কপালে সুখ লেখেনি। আমি চাইলেও বিধাতা তোমাকে শান্তিতে, নিশ্চিন্তে থাকতে দেবে না। তবু তুমি আমার। তোমাকে পেতে চাই আমার সব সম্পদের বিনিময়ে।

বিধাতা বড় রসিক। জীবন বড় জটিল। মানুষ আরো বিচিত্র। বিধাতা মাঝে মাঝে অদ্ভুত উপায়ে তার পরীক্ষা নেয়। বাস্তবের কষ্টিপাথরে যাচাই হয় জীবন কতখানি মেকী। রাজধানীতে প্রত্যাবর্তনের পক্ষকালের মধ্যে উর্বশীর প্রণয়ের পরীক্ষা দিতে হল তার নিজের ভাগ্যের কাছে। বড় অদ্ভুত সে পরীক্ষা।

শুধু একটা রমণীর জন্যে ইন্দ্র যুদ্ধ চায় এ কথাটা পুরুরবার মুখে শোনা থেকে উর্বশীর ভেতরটা অশান্ত অস্থিরতায় ছটফট করছিল। অপমানে তার ভেতরটা পুড়ে যাচ্ছিল। নিজেকে শান্ত করতে পারছিল না। রমণীর রূপে মোহে উন্মত্ত হয়ে রাজায় রাজায় যুদ্ধ পৃথিবীতে নতুন নয়। রমণীকে পুরুষ পাশব শক্তিবলে বন্দী করার জন্যে পৃথিবীতে অনেক মহাযুদ্ধ করেছে। অনেক জীবন ও রক্তের মূল্যে নারীকে জয় করেছে পুরুষ। কিন্তু তাকে নিয়ে অনুরূপ কোন ঘটনার পুনরাবৃত্তি উর্বশী চাইল না। কিন্তু সে না চাইলেও এই যুদ্ধ হবে। কারণ পুরুরবা তার স্ত্রীর সম্মান ও মর্যাদার জন্যে লড়বে। নারীকে নিয়ে পুরুষের যত বিরোধ আর লড়াই হয়েছে, আর কিছু নিয়ে এত যুদ্ধ পুরুষ করেনি। তাই, এই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ বন্ধ করতে তাকে কিছু করতে হবে। কিন্তু নারী হয়ে কি করতে পারে সে?

বেশ কিছুদিন ধরে ভেবে স্থির করল গোপনে ইন্দ্রের সঙ্গে কুমার বনে সাক্ষাৎ করবে। পুরুরবাকে কিছু জানাবে না। সাক্ষাতে ইন্দ্রের ক্রোধ কমতে পারে তার মনও বদলাতে পারে। ইন্দ্র তার কল্পনার মানুষ। দীর্ঘকাল ধরে শুনে আসছে দেবরাজ ইন্দ্রের বীরত্ব খ্যাতি সৌন্দর্যপ্রীতি রসবোধ-এর কথা। তিনি রূপবান, সুদর্শন। আবার সেই মানুষটাই তার রূপের, গুণের, নৃত্যের-সঙ্গীতের একজন অনুরাগী। তার ভক্তও। সুতরাং যে মানুষটা তাকে পুজো করে সে কখনও নর্ম সহচরী করে তাকে পেতে চায় না। একজন রসিক পুরুষের জীবনে তার পরিচিতি একটু অন্যরকমের। সামান্যতায়, সীমাবদ্ধতায় ইন্দ্রকে চিহ্নিত করা তারও ভুল হতে পারে। সেই ভুলের মাশুল হয়ত একদিন তাকে দিতে হবে

এ জীবনে। প্রত্যেক মানুষের ব্যক্তিসত্তা পৃথক। আলাদা আলাদা তাদের দ্যুতি। হয়ত তার সম্পর্কে ইন্দ্রের কৌতূহল একটু বেশি। যে পুরুষ একটি নারীকে মনে মনে পূজা করে, সম্মান করে, শরীর পাওয়ার জন্যে তার কখনও কাঙালপনা থাকে? যে শরীর অবহেলায় ঘৃণায় বিরক্তিতে বাধ্য হয়ে শুধু অন্যকে দিতে হয় সে শরীরের দখল নিতে ইন্দ্রের মত সুরুচিসম্পন্ন মানুষ কখনও চাইতে পারে না। শরীরের মধ্যে কিছু নেই। শরীরের ভাবনাটা ইন্দ্রের চিন্তার মধ্যে টেনে এনে সে শুধু ইন্দ্রের উপর অবিচার করছে। ইন্দ্র সম্পর্কে তার ভীতিটা হয়ত একটা কাল্পনিক কিছু। সত্যি তাকে ভয় পাওয়ার হয়ত কিছু নেই। অসুন্দর মনটা মস্তিষ্কের মধ্যে অনেকখানি জায়গা জুড়ে থাকে। সুন্দর মনটা সব সময় হাত বাড়িয়েও নাগাল পায় না তার। তাই ভয়-মিশ্রিত উত্তেজনা জনিত এত ভীষণ কষ্ট মনের ভেতর পুষে রেখেছে।

উর্বশীর মনের অভ্যন্তরে ইন্দ্র সম্পর্কে কৌতূহল দুর্বার হল। স্বপ্নের মানুষটিকে কেমন দেখতে, তার সান্নিধ্য কত মধুর তাকে নিয়ে ইন্দ্রের কৌতূহলই বা কি ধরনের জানতে ভীষণ ইচ্ছে করল। ভুবন জোড়া যে মানুষটার খ্যাতি, সেই অসাধারণ মানুষটি একজন সাধারণ রমণীর জন্যে এমন উন্মাদ হল কেন? কৌতূহল এমন এক জিনিস, একবার মনে জাগলে তা নিবৃত্ত না হওয়া পর্যন্ত থামে না। অতৃপ্তিটা থেকে যায়।

উর্বশীর মনে হল, কৌতূহলের একটা আলাদা মিষ্টি গন্ধ আছে। সেই গন্ধটা বুক ভরে নিতে খুব মজা লাগে। এমন একটা অনন্ত ভাললাগার সুবাস মাখানো থাকে যে তার নেশাটা কিছুতে কাটতে চায় না। কৌতূহলের শিহরন বুকে নিয়ে অবশেষে উর্বশী এল কুমার বনে। পুরুরবাকে না জানিয়ে ইন্দ্রের সঙ্গে গোপনে সাক্ষাৎ করল।

দর্শন অভিলাষী ইন্দ্র দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর যার সাক্ষাৎ পেল সে একজন দর্শনীয় পুরুষ। নজর কেড়ে নেয়ার মত তার রূপ ও গড়ন। পরিধানে তার সাধারণ রাজকর্মচারীর আলখাল্লা পোশাক। ইন্দ্রের গরিমায় আঘাত লাগল।

ক্রোধে অপমানে ইন্দ্রের ফর্সা মুখ রাঙা হল। কান গরম হয়ে উঠল। চোখ দুটো অস্বাভাবিক গোলাকৃতি হল। ভুরু কুঁচকে গেল। বেশ একটু রুষ্টস্বরে প্রশ্ন করল : তোমার স্পর্ধা তো কম নয়। তোমাদের রানী কোথায়? তাকে কোথায় লুকিয়ে রেখেছ? এখানে তাকে না নিয়ে আসার অর্থ কি? ইন্দ্র কি উর্বশীর পরিহাসের পাত্র? পরিহাস করার পরিণাম কি জান?

পুরুষ-বেশী উর্বশী অবাক মুগ্ধ চোখে ইন্দ্রের দিকে তাকিয়ে মিট-মিট করে হাসছিল। ইন্দ্র কিছু বুঝবার আগেই সে একটানে পুরুষের বেশ এবং সাজসজ্জা খুলে ফেলল। আর তার অন্তরাল থেকে বেরিয়ে এল সেই অনিন্দ্যসুন্দর স্বপ্নলোকের মানবী; ভুবন মনমোহিনীমূর্তি। মেঘের মত চুল, তারার মত উজ্জ্বল এবং স্নিগ্ধ দুই চোখ, লতার মত বাহু, গিরিচূড়ার মত স্তন; ঊষার মত বর্ণ, শষ্যক্ষেতের মত ভরা অফুরন্ত যৌবন।

মুহূর্তে ইন্দ্র কেমন হয়ে গেল। তার পায়ের নীচে মাটি কেঁপে গেল। মনে হল, এক লহমায় সে রূপকথার রাজ্যে এসে পড়েছে। আর তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে স্বপ্নলোকের সেই রূপবতী। চোখে যে লাবণ্যকে দেখেনি, ত্বক যে তনুকে স্পর্শ করেনি, আঘ্রাণ কখনো জানে নি যে সুরভির মদিরতা, কায়াবিহীন, ছায়াবিলীন যে মায়া রূপকথার রাজকন্যা তাই উর্বশী। উর্বশীর রূপের তাই কোন উপমা নেই, আকৃতির কোন রেখাও হয় না। তবু সেই কল্পলোকের মানবী নেমে এসেছে ধরায়, রক্ত মাংসের শরীরে রূঢ় বাস্তবে। মানুষের প্রেমে ধন্য হতে যেন এসেছে মানুষের পৃথিবীতে।

উর্বশীর দিকে তাকিয়ে ইন্দ্র আর চোখ ফেরাতে পারল না। মনে হল, বিধাতার এই অপূর্ব রমণী রত্নটিকে না পেলে জীবন বৃথা, ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব মিথ্যে। নিমেষে ইন্দ্র হারিয়ে গেল ভুবনমনমোহিনী রূপের অধিশ্বরী এক অসাধারণ রমণীর মোহারণ্যে। ভুলে গেল সে বিশ্ববন্দিত বহু রণজয়ী দেবরাজ ইন্দ্র। মনের ভেতর এক অব্যক্ত তীব্র আকাঙ্ক্ষার উন্মাদনা তাকে আকুল করল। ইন্দ্রত্ব তার ধন্য হতে পারে অমন রমণীর উষ্ণ সান্নিধ্য পেলে। প্রবল আসঙ্গ বাসনা জাগল অন্তঃকরণে। মনে হচ্ছিল উর্বশীর চোখে চোখ রাখার এই অনন্ত তৃষ্ণার কোন শেষ নেই।

অভিভূতের মত ইন্দ্র তার গলা ভর্তি মণিরত্নের সবচেয়ে মূল্যবান হারটি খুলে নিজের অজান্তেই উর্বশীকে পরাতে গেল। উর্বশী বাধা দিল। কিন্তু ইন্দ্র মরিয়া। কোন বাধা মানল না। স্থান কাল পাত্র ভুলে উর্বশীকে পরিয়ে দিল তার মালাখানি, মুখে তার বিজয়ীর হাসি।

উর্বশী লজ্জায় রাঙা হয়ে গেল। মালাটিকে টেনে ছিঁড়বার চেষ্টা করতে ব্যর্থ হল। ইন্দ্র তার ছেলেমানুষী দেখে হাসল। বিন্দুমাত্র অপ্রতিভ না হয়ে বলল : প্রেমে আর যুদ্ধে লজ্জার কোন স্থান নেই। রমণীর প্রণয় কামনা পুরুষকে নির্লজ্জ আর দুঃসাহসী করে।

ঘৃণায় বিরক্তিতে উর্বশীর ভেতরটা রি-রি করে উঠল। মুখ কান জ্বালা করতে লাগল। কিন্তু কণ্ঠ থেকে তার কোন স্বর বেরোল না। ভীরু চোখে ইন্দ্রের দিকে অসহায়ভাবে তাকাল। আহত অপমানে স্খলিত ভাঙা গলায় বলল : সুরুচিসম্পন্ন কলারসিক যে দেবরাজ ইন্দ্রের কথা শুনেছি, আপনি কি সেই ইন্দ্র?

ইন্দ্রের ওষ্ঠাধরে গর্বিত হাসি। চোখে প্রণয়ের দ্যুতি। বলল : ইন্দ্র একটাই হয় সুন্দরী। এক আকাশে একই সময়ে চন্দ্র সূর্যকে যেমন ধরে না, তেমনি এক পৃথিবীতে দুই ইন্দ্রের স্থান হয় না।

বিকেলে পড়ন্ত রোদে পুরুষ্ণি নদীর জল কালো হয়ে গেল। সেই দিকে একদৃষ্টিতে অসহায়ভাবে তাকিয়ে ছিল উর্বশী। আর ভিতরে ভিতরে এক গভীর অপমানে, লজ্জায় ক্ষতবিক্ষত হচ্ছিল। অসম্মানের তীক্ষ্ণ শরটি বুকে বিঁধে রইল। সেজন্যে অনুশোচনার অন্ত ছিল না তার। প্রতিমুহূর্তে মনে হচ্ছিল, এইভাবে পুরুরবাকে না জানিয়ে আসা ঠিক হয়নি। ইন্দ্রের মত দাম্ভিক, বিবেকহীন, নির্লজ্জ, পাষণ্ড বর্বর পুরুষকে বিশ্বাস করে ভুল করেছে। আর সেই ভুলে তার সম্মানের গায়ে কলঙ্কের দাগ লাগল। বড় দুর্বিষহ মনে হল। অসম্মানের কণ্টক গায়ে বিঁধে কোন নারী নির্লিপ্ত থাকতে পারে না। ঘৃণায়, রাগে, বিরক্তিতে তার ভেতরটা ফুঁসছিল। কিন্তু সে একা। একেবারেই অসহায়। তাই শাণিত দৃষ্টির ছুরিতে মায়াপরশ মাখিয়ে মোহকণ্ঠে উর্বশী বলল : নারীর রূপের অহংকার এবং পুরুষের বীর্যের অহংকার দুই সুন্দর। এখন এত অহংকার বিধাতা সইলে হয়?

ইন্দ্রের মুখে গর্বের হাসি। বিগলিত কণ্ঠে বলল : একথা বলছ কেন সুন্দরী?

উর্বশী আঁচলের প্রান্ত নিয়ে অস্থিরভাবে আঙ্গুলে জড়াছিল। কৌতুকে দুই আঁখি টানটান করে বলল : এমনি। মনে হল তাই বললাম। কত কথাই মনে হচ্ছে। মানুষের সব দিন সমান যায় না। একদিন প্রবল প্রতাপান্বিত পুরুরবার জয়ধ্বনিতে সমগ্র আর্যাবর্তের আকাশ বাতাস মুখরিত হয়ে থাকত। সেদিন দেবরাজ ইন্দ্রও তার বন্ধুত্বে সম্মানিত বোধ করতেন। কিন্তু মানুষ বড় অকৃতজ্ঞ। বড় তাড়াতাড়ি সব ভুলে যায়। মানুষ বড় সুযোগ সন্ধানী। বড় ক্ষমতাপ্রিয়। ভীষণ লোভী আর স্বার্থপর। স্বার্থের জন্যে মানুষ করতে পারে না এমন কাজ নেই। বন্ধুও শত্রু হয়। অবশ্য ক্ষমতাশালী প্রবল প্রতাপান্বিত রাজার জানা উচিত পৃথিবীতে তার বন্ধু কেউ নেই। সবাই তার শত্রু। গোপনে মাথা চাড়া দেয়ার সুযোগ খুঁজছে। ষড়যন্ত্র করে রাজার শক্তি খর্ব করা রাজতন্ত্রের নিয়ম। সেটা যে পুরুরবার বেলাতেও আলাদা হয় না এটা তার বেশি করে জানা উচিত ছিল। যে রাজার সে জ্ঞানের অভাব তাকে প্রায়শ্চিত্ত তো করতে হবে।

উর্বশীর কথাগুলো ইন্দ্রকে সূচের মত বিঁধল। একটা তীব্র জ্বালা তার মাথা থেকে, বুক বেয়ে পেট অবধি নেমে দিব্যি হজম হয়ে গেল। হাসি হাসি মুখে উর্বশীর দিকে তাকাল। তারপর গর্বে হো হো করে হেসে উঠল। সাগর খোঁজা নির্ঝরের হাসি সে। হাসতে হাসতে বলল : তুমি খুব রেগে গেছ না? শীগ্‌গির পৃথিবীতে অনেক কিছু ঘটবে। জরাসন্ধ আর হস্তিনাপুর মিলে যা করছে তাতে অনেক কাজ খুব তাড়াতাড়ি করতে হবে। আমার ইচ্ছে, তুমি আমাকে সাহায্য কর। তোমার মধ্যে আগুন আছে।

উর্বশীর ভেতরটা চমকে উঠেছিল। তার লজ্জাহীন প্রগলভতায় সে একবার মরিয়ার হাসি হাসল। হঠাৎ-ই খিলখিল করে হেসে উঠল। তাচ্ছিল্য আর অবজ্ঞা মেশানো সে হাসিতে প্রাণের হাহাকার ছড়িয়ে পড়ল।

ইন্দ্র তার হাসিতে যোগ দিয়ে বলল : তুমি খুশি হয়েছ দেখতে পাচ্ছি। তোমার মোহিনী হাসিটি

বড় সুন্দর। তোমার ঐ হাসির তরঙ্গে আমারও ভীষণ ভেসে যেতে ইচ্ছে হচ্ছিল, কিন্তু হাসিটা তেমন করে কিছুতে এল না আমার মুখে।

উর্বশীর অবাক লাগল। ইন্দ্রের মধ্যে এমন প্রাণোচ্ছল সহজ সরলতা আছে, প্রগলভ আনন্দ উদ্দীপন উল্লাস আছে, দাবি করার এমন একটা প্রত্যয় আছে যে, সহজে মুগ্ধ হয়ে যেতে হয়। অনুরূপ এক মুগ্ধতার আবেশে উর্বশীর ভেতরটা দুর্বল হয়ে যাচ্ছিল। ভীষণ ভয় করছিল তার। বুক কাঁপছিল। অথচ ইন্দ্রের ভেতর এতটুকু সংকোচ ভয় কিংবা জড়তা ছিল না। প্রাণোচ্ছল ঝরণার মত সে উচ্ছল। কথার প্লাবন যেন তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। একবারও জানতে চাইল না তার আগমনের কারণ কি? কি তার প্রয়োজন? উর্বশী নিজেকে একটু সামলে নিয়ে বলল : দেবরাজ, আপনি আমাকে নিয়ে কি ভাবছেন জানি না, কিন্তু আপনার কথা শুনে বুঝেছি আপনার মন, চোখ, বিচার বলে কিছু নেই, আছে শুধু আত্মশ্লাঘা, আর মিথ্যা আস্ফালন।

ইন্দ্র হাসতে হাসতে বলল : তুমি ঠিক বলেছ সুন্দরী। আমি চাই অনন্ত ক্ষমতা। তা-হলেই আমার চারদিকে ভীড় করবে স্তাবকের দল, তাদের মুখে আমি কেবল স্তুতি শুনব, কেবল পূজার কথা শুনব। শুনে শুনে মনে হবে আমি এক অতি-মানুষ হয়ে গেছি। ভগবান হয়ে গেছি।

তা-হলে আপনার ধ্বংসের আর দেরি নেই।

ইন্দ্র ভুরু কুঁচকে বলল : তোমার কথার অর্থ বুঝলাম না।

স্তুতি আর স্তাবকতায় রাজাদের সর্বনাশ ঘটে, এ কথাটা না বোঝার মত কিছু নয়। দেবরাজ, শ্রদ্ধা-ভালবাসা ছাড়া অতি-মানুষ কিংবা ভগবান হওয়া যায় না।

এবার বুঝতে পেরেছ, কেন আমি তোমার সাহায্য চাই?

উর্বশী স্তম্ভিত। সহসা তার মুখে কথা জোগাল না। মনে হল, এক ক্ষমাহীন বিধিলিপির সামনে বসে আছে সে। সে তার কঠিন বিচারক। কী কৌশলে অদৃষ্ট তাকে টেনে এনেছে কুমার বনে। অদৃষ্টের আজ্ঞাবহ দাস সে। তাকে নিয়ে বিধাতার এখনও অনেক খেলা বাকি।

মনের অভ্যন্তরে তার যে প্রতিক্রিয়াই হোক, বাইরে তাকে বেশ প্রশান্ত এবং নিরুদ্বিগ্ন দেখাচ্ছিল। উর্বশী বেশ একটু বিরক্তির ভাব প্রকাশ করে ভুরু কুঁচকে বলল : তা-হলে দেবরাজ ইন্দ্র একজন রমণীকে পাওয়ার জন্যে এই সেনা সমাবেশ করেছে। যুদ্ধটা গন্ধর্বরাজ বিশ্বাবসু করছে না, তাকে সামনে রেখে দেবরাজ করছে উর্বশীর জন্যে। ধিক, ইন্দ্রের ইন্দ্রত্বকে। এতে দেবরাজ ইন্দ্রের গৌরব কি বাড়বে?

ইন্দ্র খুব গর্বিতভাবেই উর্বশীর কথার তারিফ করে বলল : বাড়বে সুন্দরী। ইন্দ্র কিছু হারাবে না। আমি জয় করব এমন এক নারীকে যাকে কেউ চোখে দেখেনি। স্বপ্নেও পায়নি তার স্পর্শ। অসহায় বিস্ময়ে নিন্দুকেরা তোমার দিকে চেয়ে আমার স্তুতি করবে। বিজয়ের আনন্দে প্রতি রক্তকণা একসঙ্গে আমার শরীরে ঝংকার দিয়ে উঠবে। সে কি কম পাওয়া! পুরুষ হলে, এই পাওয়ার সুখ অনুভব করতে পারতে। জয় করার মধ্যে পুরুষের এক বিপুল আনন্দ আর একটা আলাদা গৌরব লুকিয়ে আছে। সে কেবল পুরুষই জানে।

উর্বশীর বুকের গভীর থেকে একটা শ্বাস পড়ল। বিষণ্ণ গলায় খুব কষ্টে বলল : আমার পাওয়ার ঘর শূন্য করে আপনার লাভ কি? এতে কি রমণীর মন পাওয়া যায়? মনটা তো আমার শরীরের উপর দখল নেয়ার মত কোন বস্তু নয়।

ইন্দ্র হাসি হাসি মুখ করে বলল : কোন পাওয়া শূন্য থাকে না সুন্দরী। সমুদ্রের এক তরঙ্গ আর এক তরঙ্গের শূন্যতাকে ভরে দেয়, তেমনি মানুষের এক পাওয়াকে আর এক পাওয়া ভরে দেয়। এক চাওয়া আর এক চাওয়ার পথ করে দেয়। এর নাম জীবনধর্ম।

উর্বশীর মুখখানা ভয়ে শুকিয়ে গেল। থমথমিয়ে উঠল কান্না। কথা বলতে গিয়ে কেঁদে ফেলল। বলল : আমার স্বপ্নের দেবতা যে একটা দৈত্য জানতাম না। আমি ভুল করেছি।

তুমি কিছুই ভুল করনি সুন্দরী। আমি কেশী দৈত্যের মত তোমাকে হরণ করব না। বীর্যবলে তোমাকে জয় করব। বীর্যের দাবিতে নারীকে পাওয়া অশাস্ত্রীয় নয়।

উর্বশীর লম্বা দীর্ঘশ্বাস পড়ল। অধরে বাঁকা হাসির বিদ্যুৎ খেলে গেল। কথা বলার সময় গলার স্বর কেঁপে গেল। স্তম্ভিত গম্ভীর গলায় বলল : উর্বশীর জন্যে তা-হলে যুদ্ধটা হবে দেবরাজ। হতভাগিনী উর্বশী আপনার কোন অনিষ্ট করেনি। তবু আপনার দর্পে, গর্বে চূর্ণ-চূর্ণ হবে উর্বশীর জীবনটা। এ কেমন খেলা দেবরাজ? উর্বশী কী আপনার খেলার পুতুল? তার জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেললে কি আপনার খুব সুখ হয়? কিন্তু উর্বশী কী করেছে আপনার? বলুন, কী করেছি আমি? কেন আমার সুখ কেড়ে নিতে এলেন দেবরাজ?

ইন্দ্র তার আকুল করা জিজ্ঞাসায় কিছুমাত্র বিচলিত না হয়ে বলল : সুন্দরী সুখের কপাল করে এসেছ তুমি। তোমার বিধিলিপি এক সুখের জীবন থেকে আর এক সুখের আলোকিত প্রান্তরের দিকে তোমাকে টানছে।

কান্না জড়ানো আর্ত-গলায় উর্বশী বলল : মিছে কথা।

না সুন্দরী। কূপের ব্যাঙ যেমন সাগরের খবর রাখে না, তেমনি ইন্দ্রের নন্দন কাননের অফুরন্ত জীবন আর সুখের স্বাদ সমতলের মানুষ রাখে না। সেখানে চিরবসন্ত। দুঃখ বলে কিছু নেই। অনন্ত সুখ।

নন্দন কাননের সুখ আমি চাই না। আমার এই ছোট্ট পৃথিবী, স্বামী, সংসার সন্তান নিয়ে একজন সাধারণ মহিষীর মত বাঁচতে চাই। আমার সেই ছোট্ট সুখটুকু কেড়ে নিয়ে দেবরাজ আমাকে ভিখেরী করবেন না। আমার এই বিশাল সাম্রাজ্য হারানোর গ্লানি সইতে পারব না। ভাগ্য যদি সত্যি বিরূপ হয় তাহলে কোনদিনই আমাকে পাবেন না আপনি। আমার নিষ্প্রাণ শবের দিকে তাকিয়ে অসহায় বিস্ময় নিয়ে আপনাকে অশ্রু বর্ষণ করতে হবে। দর্প করে গর্ব করে বলার মত ইন্দ্রের কিছু থাকবে না। কথাগুলো বলতে বলতে উর্বশী বিবশ হয়ে থেমে গেল। আর চোখ থেকে ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগল।

ইন্দ্র সবিস্ময়ে চেয়ে রইল উর্বশীর দিকে। মনটা তার কিছু সিক্ত, কিছু বিষণ্ন হল। বলল : চল সুন্দরী, তোমাকে বজরায় তুলে দিয়ে আসি।

॥ তিন ॥

শরতের আকাশের মত নির্মল উর্বশীর মনেও কার ছবি আঁকা হল? এই মুখ, চোখ হাসি কার? কোথাও কোন কামনার রঙ লাগেনি। তবু এই চিত্তচাঞ্চল্য কার জন্য? সে কে?

ইন্দ্রের মুখ, চোখ, ভাব-ভাষা, তার মুগ্ধতা, আবেশ, অনুরাগের ছন্দ, ভাললাগার আবেশ, তার তীব্র আকাঙ্ক্ষা, উদ্দাম বাসনা তার চেতনাকে একটু একটু করে আচ্ছন্ন করে দিল। ইন্দ্রের চিন্তায় বিভোর হয়ে রইল সর্বক্ষণ। এ তার আতঙ্ক, না অনুরাগ নির্ণয় করতে অক্ষম হল উর্বশী। নিজেকে প্রশ্ন করল : এ কোন পাপ প্রবেশ কবল তার মনে? এর স্রষ্টা কে? সে নিজে, না ইন্দ্র? না নিয়তি?

উর্বশী এই প্রথম অনুভব করল, মানুষ সবচেয়ে কম জানে নিজেকে। কোথায় তার কিসের অভাব যেন। সেটা যে কি তা ভেবে পেল না। সে পুরুরবার মহিষী, রাজার ঘরণী, আয়ুর জননী। কোন কিছুর অভাব তার নেই, —না অর্থ, না প্রতিপত্তি, না যশ। এ ছাড়া আর কি-ইবা চাওয়ার থাকতে পারে একজন মহিষীর জীবনে। তার দু'চোখে সংসারের স্বপ্ন। বুকে সন্তানের প্রতি অপার মমতা। তবু মনে হল, এ চাওয়া বড় গতানুগতিক। বড় বৈচিত্র্যহীন। একঘেয়ে। এর ভেতর নতুন কিছু নেই। এর বাইরেও যে, মানুষের কিছু চাওয়ার আছে বা থাকতে পারে তা তার জানা ছিল না। কিন্তু সেই চাওয়ার কোন রূপ নেই, কোন রঙ নেই। কেবল বুকের মধ্যে একটা হু হু করা শূন্যতার অনুভূতি। দাবানলের মতই জ্বলতে থাকে।

নিজেকে বড় অসহায় লাগে উর্বশীর। ঘুমের মধ্যে সে প্রায় স্বপ্ন দেখে, একটা বিরাট অজগর হাঁ করে তার সমস্ত কিছু গ্রাস করছে। ঘুমের মধ্যে বালিশ আঁকড়ে ধরে প্রাণপণে সেই গ্রাস থেকে নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা করছে। কিন্তু অজগরের সম্মোহনে বন্দী। তার কিছু করার নেই।

দিন যায় রাত আসে। উর্বশীর মনে সুখ নেই। বিপুল ভয় তাব বুকে শিকড় গেড়ে বসল। পুরুরবাকে

ভুলবে কেমন করে? তাকে ছাড়া এ জীবনের দাম কি? নারীর সবচেয়ে যে বড় চাওয়া, সেই মাতৃত্বের সাধ পূর্ণ করেছে সে। তাকে কি ভুলে থাকা যায়? পুরুরবা তার সত্তা। তার কামনা, বাসনা, স্বপ্ন, আকাঙ্ক্ষা। তাকে ছাড়া বাঁচবে কেমন করে? শুধু সেই কথাটা বোঝাতে পাগলের মত ইন্দ্রর কাছে ছুটে গিয়েছিল। একান্ত প্রার্থনা ছিল নিজেকে মুক্ত করার। কিন্তু ফিরে এল উদ্বেগ আর আকাঙ্ক্ষার দ্বন্দ্ব নিয়ে। অসহ্য হল প্রতিটি মুহূর্ত। একটা মুহূর্ত সে শান্তিতে নেই। অহেতু সন্দেহ জাগল নিজের উপর।

পুরুরবা চুপ করেই থাকল। ভিতরে একটা আগ্নেয়গিরির স্রোত বয়ে যাচ্ছিল। বিহ্বল হতভম্ব চোখে সে উর্বশীর মুখের দিকে কিছুক্ষণ বাক্যহারা হয়ে চেয়ে রইল।

উর্বশীও নীরব। জানলার ধারে চুপ করে পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে ছিল। পুরুরবা যে তাকে কিছু বলতে এসেছে উর্বশী তার গনগনে মুখ আর দু'চোখের করুণ চাহনির দিকে তাকিয়ে আঁচ করতে পারল। কিন্তু কিছুতেই তার মনের এই বিষণ্ণতার কারণ জিজ্ঞেস করতে পারল না। ইন্দ্রের সঙ্গে নিভৃতে সাক্ষাৎ করার চিন্তাটাই তার কাছে অস্পৃশ্য মনে হচ্ছিল। ইন্দ্রের নির্লজ্জ আকাঙ্ক্ষা তাকে উত্তেজিত করল। ভিতরটা কেমন পাগল পাগল লাগছিল। কী করবে ভেবে অস্থির হল। অপরাধবোধে তার ভিতরটা টাটাতে লাগল।

পুরুরবার বড় বড় চোখে নিষ্পলক দৃষ্টি। বিস্ময়ে বিস্ফারিত নয়। কেমন শূন্য। পুরুরবাকে দেখে উর্বশীর অন্তরে কেন যেন একটু ভয়ের সঞ্চার হল। ঝড়ের মুখে বিপন্ন পাতার মত তার বুকের ভেতরটা কাঁপছিল। বেশ বুঝতে পারছিল একটা কিছু হবে।

পুরুরবা উর্বশীর মুখের দিকে চেয়ে বলল : আমি এলে তুমি কত খুশি হতে, কিন্তু আজ তোমার সে খুশি কোথায় হারিয়ে গেল প্রেয়সী? তুমি কিন্তু আর আগের মত নেই, ভীষণ বদলে গেছ।

থতমত খেয়ে গেল উর্বশী। পুরুরবার জিজ্ঞাসার ভেতর এমন কিছু ছিল যে উর্বশী ভীষণ ভয় পেয়ে আস্তে আস্তে চোখ রাখল পুরুরবার চোখে। যে ভয়ে সে এতক্ষণ মাথা হেঁট করে ছিল, মুখ তোলার সময় তার চেয়ে বড় ভয়ে সমস্ত মুখখানা ফ্যাকাশে হয়ে গেল। বুক শুকিয়ে যাওয়া ভয়ে কাঠ কাঠ হয়ে বলল : কি, কি বলছ তুমি? আর যে বলে বলুক, তুমি শুধু বলবে না। আমার যে তুমি ছাড়া আর কেউ নেই।

কথাগুলো পুরুরবার বুকে ঢেউ দিয়ে গেল। ভিতরে এক শিহরিত আনন্দের উজ্জীবক স্পর্শ তার চোখ মুখকে উজ্জ্বল করে তুলল। ক্ষণকাল নীরব থেকে বলল : দেবরাজ ইন্দ্র'র দূত তোমার পত্র বহন করে এনেছে।

একটা গভীর অপমান বাজল উর্বশীর বুকে। রাগত স্বরে বলল : তা আমি কি করতে পারি? এর জবাবদিহি আমাকে করতে হবে নাকি?

না। প্রসঙ্গটা তোমাকে নিয়ে। আমার এবং গন্ধর্বরাজ বিশ্বাবসুর অঘোষিত যুদ্ধের মধ্যে তুমি এসে পড়েছ। এতদিন যে উদ্দেশ্যটা গোপন ছিল তা এই পত্রের পর আর গোপন থাকল না। ইন্দ্র বিনা ভূমিকায় তোমাকে নির্লজ্জভাবে প্রার্থনা করেছে। লিখেছে : সুন্দরী উর্বশী, অশান্ত মনকে শান্ত করতে পার তুমি। বিনিময়ে পুরুরবাও শান্তিতে থাকতে পারবে। আমি চাই তোমাকে।

বিদ্যুৎ চমকের মত চমকে উঠল উর্বশী। ভেতরটা তাব থর থর করে কেঁপে উঠল। দিশেহারা চোখে পুরুরবার দিকে এক পলক চেয়ে চোখ নামিয়ে নিল উর্বশী। থমথমে গম্ভীর মুখে ভয়ার্ত গলায় জোর প্রতিবাদ করে বলল : না—। এ হতে পারে না। হতে দিও না রাজা। ইন্দ্রের অভদ্র, অশালীন আচরণের ক্ষমা হয় না। ইন্দ্রের হুংকারে কর্তব্য ভুলে আমাকে ত্যাগ কর না। এই মিনতি শুধু।

পুরুরবার পুরুষপ্রাণে দুর্বলতা জাগল। ইন্দ্রের নির্লজ্জপনায় তার ভেতরটা এমনি তেতে ছিল। উর্বশীর কথায় তা দপ করে জ্বলে উঠল। সব মিলিয়ে তার ভিতরেও একটা রাগ ঝাঁ ঝাঁ করছিল। কিন্তু রাজনীতিতে রাগের বশে হঠাৎ কিছু করা হঠকারিতা। তাই রাগে অপমানে তার ফর্সা মুখ আগুনের মত গনগন করতে লাগল।

উর্বশীর আকুল করা কথার প্রত্যুত্তরে কোন কিছু বলল না। চুপ করে রইল। তার কারণ একটাই।

প্রতিক্রিয়ার বদলে তার ভিতরে শুরু হয় বিচার-বিশ্লেষণ এবং সমাধানের চেষ্টা। কিন্তু চারদিককার কঠিন বাস্তবতা তাকে সতর্ক, সজাগ এবং সচেতন করল। নিরুচ্চারে নিজেকে প্রশ্ন করল, এত অপমান সয়ে একজন সাধারণ মানুষকে বেঁচে থাকতে হয়, কিন্তু একজন রাজা এত অপমান সয়ে রাজত্ব করবে কি করে? এত অপমান একজন রাজাকে আর একজন রাজা করে কি করে? বুকের মধ্যে পুরুরবার কেমন এক অচেনা ব্যথা চিন চিন করতে লাগল।

কয়েকটা মুহূর্ত কেটে গেল দ্রুত। কম্পিত বুক ও উদ্দীপ্ত এক আনন্দ নিয়ে সে উর্বশীর সুন্দর টুলটুলে মুখখানা দু'হাতে করে নিজের আগ্রাসী মুখের কাছে মেলে ধরল। উর্বশীর দুই চোখে জল টলটল করছিল। ঠোঁট দুটো কিছু বলার জন্যে থির থির করে কাঁপছিল। আত্মসমর্পণের আবেগে উর্বশী পুরুরবার বুকের উপর মাথা রাখল। লোমশ বুকে মুখ ডুবিয়ে শরীরের ঘ্রাণ নিল প্রাণভরে। নিজের মনেই বলল : আমি তোমার মনের কথা জানি। তোমার উর্বশীর মন থেকে কেউ কোনদিন তোমায় মুছে ফেলতে পারবে না। আমার সারা মন জুড়ে তুমি আছ। সেখানে আর কাউকে বসাতে পারব না। পত্রবাহককে বলে দাও, দেবরাজের চিঠির উত্তর দেবার কিছুই নেই। চিঠি লেখার তাই প্রশ্ন আসে না।

উর্বশীর প্রত্যাখ্যানে ইন্দ্র কোনরকম লজ্জা বা অপমান বোধ করল না। কেবল আশাহত হওয়ার যন্ত্রণা কাঁটার মত খচ খচ করছিল বুকের গভীরে। তথাপি, নানারকম মিশ্র প্রতিক্রিয়ার মধ্যে একটা সুখের অনুভূতি সব সময় ছিল তার। কারণ উর্বশী এমন এক নারী যার আকাঙ্ক্ষায় ধমনীতে তার তরল আগুনের স্রোত বয়ে যায়। এক নিবিড় সান্নিধ্যলাভের উন্মাদনায় ইন্দ্র মরিয়া হয়ে উঠল। উর্বশীকে না পেলে ইন্দ্রের ইন্দ্রত্বের গৌরব কমে যায়। তার নিজের আকাঙ্ক্ষাও অপূর্ণ থাকে। পুরুরবার বুকে উর্বশী সুখের ঘুম ঘুমুবে এ কথা মনে হলে বুকের ভেতরটা কেমন পাগল পাগল লাগে। তখন যুদ্ধ করে উর্বশীকে ছিনিয়ে নেয়ার কথা মনে হয়। কিন্তু সেই দুর্বার ইচ্ছেটা সাহসের জমি পায় না। উর্বশীর রূপের আগুন পতঙ্গবৎ যেমন আকর্ষণ করে, তেমনি প্রত্যাখ্যানের সাহস তার মন ছেয়ে থাকে। একটা ভয়ংকর কিছু করতে গেলে উর্বশীর বিষণ্ণ মুখ করুণ চাহনি মনে পড়ে। কানের পর্দায় ঝংকারে বাজে কথাগুলো। দেবরাজ, যুদ্ধ করে উর্বশীকে পাওয়া যায় না। বীর্যের দম্ভে, যুদ্ধের তাণ্ডবে, নিশ্চিত মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে অসংখ্য মানুষের প্রাণের বিনিময়ে, পশুবলে, কিংবা গায়ের জোরে উর্বশীকে দখল করা যায়, কিন্তু তাতে ইন্দ্রের দর্প করে কিংবা গর্ব করে বলার মত কিছু থাকবে না। উর্বশীর নিষ্প্রাণ শবের দিকে একবুক হতাশা আর আশাহত হওয়ার ব্যর্থ-যন্ত্রণা নিয়ে তাকিয়ে থাকতে হবে। হৃদয়ের ঔদার্যে ও দাক্ষিণ্যে যে জীবন মহান, সুন্দর, আকাশের তারার মত ফুটে থাকে উর্বশীর সেই প্রিয় জীবনের মৃত্যু ঘটলে বাঁচা-মরার আর কোন তফাত থাকে না। মৃত উর্বশীর দেহটা পেয়ে দেবরাজ পশুর মত আশ মিটিয়ে ক্ষিদে মেটাতে পারবে, সেটাও একটা তৃপ্তি। সে তৃপ্তি তো সব নারীর শরীরে লুকিয়ে আছে।

ইন্দ্রের কর্তব্য নির্ণয় করতে কেবলই দেরি হতে লাগল। পুরুরবার রাজ্য জয় করে সাম্রাজ্য বিস্তারের কোন অভিলাষ তার নেই। সে শুধু চায় উর্বশীকে। স্বর্গভূমিতে দেব-নৃপতিদেব কৌলীন্য বিচার হয় প্রমোদ কাননে কার কত সুন্দরী, রূপসী চৌষট্টি কলায় পারদর্শিনী অপ্সরা থাকে তাই দিয়ে। উর্বশীর মত চৌষট্টিকলায় পারদর্শিনী রমণী মেলে কদাচিৎ। উর্বশী তার গৌরব, মর্যাদা এবং শ্রেষ্ঠত্বকে শতগুণ বাড়িয়ে দেবে। উর্বশীর ব্যক্তিত্ব, চরিত্র মাধুর্য, নান্দনিক রুচি একটু অন্যরকম। অন্য রূপসী অপ্সরাদের মত সে লালসার বস্তু নয়, আকাঙ্ক্ষার অমৃত। পূর্ণতার প্রতীক। আনন্দস্বরূপিনী। উর্বশীকে না নিয়ে দেবভূমিতে ফেরার তার উপায় নেই। অপমানের কালি মেখে দেবরাজ্যে ফিরে যেতে পারবে না। উর্বশীর অটল সংকল্পকে যে করে হোক তার বদল করতে হবে। এজন্য যতদিন লাগে লাগুক। যদি তার জীবন কেটে যায় তো যাক। উর্বশীকে না নিয়ে সে ফিরবে না ইন্দ্রলোক। ফিরলে সম্মান থাকবে না তার।

অথচ, কতদিন হয়ে গেল পুরুরবার রাজ্য ঘিরে রেখেছে দেববাহিনী এবং গন্ধর্ববাহিনী। উত্তর এবং দক্ষিণ ঘেরা নদী ক্রমশ পশ্চিমমুখী হয়ে সমুদ্রে মিশেছে। এর মাঝখানে পুরুরবার রাজ্য। পূর্বদিকে বিশাল অরণ্য। বড় বড় গাছের গুঁড়ি দিয়ে নির্মিত সুরক্ষিত প্রাকার ভেদ করে শত্রুর প্রবেশের সাধ্য

ছিল না। নদীর খোলা তিনদিকে ইন্দ্র তার বাহিনী সজ্জিত করল। এর ফলে বাইরের দেশের সঙ্গে পুরুরবার রাজ্যের কোন সম্পর্ক রইল না। টহলদারী প্রহরীর সতর্ক দৃষ্টি এড়িয়ে বাইরের রাজ্য থেকে লেনদেনের সরবরাহের সব পথ বন্ধ হয়ে গেল। কিন্তু তাতেও যখন পুরুরবার রাজ্যের গায়ে আঁচটি লাগল না, স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় এক মুহূর্ত ছেদ পড়ল না তখন ইন্দ্র সত্যই দুর্ভাবনায় পড়ল। বরং এই অবরুদ্ধ অবস্থায় পুরুরবা একটু একটু করে তার সৈন্যবাহিনী গুছিয়ে নিতে লাগল। পুরুরবাকে জব্দ করা যে সহজ কাজ নয় এ কথাটা ইন্দ্রের বুঝতে একটু দেরি হল। বাইরের এই অবরোধে তার কোন ক্ষতি হবেনা এ বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে ইন্দ্র তার রণকৌশল পাল্টাল।

রাজধানীর বাইরে সীমান্ত পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলিতে গন্ধর্ব সৈন্য হামলা করতে লাগল। শস্যের খেত পুড়িয়ে দিল, খামার জ্বালিয়ে দিল, গ্রামে গ্রামে আগুন লাগিয়ে উৎপাত সুরু করল। পুরুরবার বিরুদ্ধে নিরীহ জনসাধারণকে ক্ষেপিয়ে তোলাই হল এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য। পুরুরবার ভাবমূর্তি একটু একটু করে নিঃশব্দে নষ্ট হতে লাগল।

একটা নারীর জন্যে এত কিছু ঘটছে, এতগুলো মানুষ বিপন্ন হচ্ছে এ কথা ভেবেই উর্বশীর হৃৎপিণ্ডের মধ্যে প্রলয় ঘটে গেল। সে কিছুটা বিভ্রান্ত এবং দিকভ্রষ্ট হয়ে কিছু না বুঝে, পূর্বাপর চিন্তা না করে অসহায় প্রজাকুলের পরিত্রাণের প্রত্যাশায় একদিন ইন্দ্রের কাছে এল। পুরুরবার অগোচরেই এল।

উর্বশীর অপ্রত্যাশিত আগমনের হেতুটি ইন্দ্র আঁচ করতে পারল। উর্বশী আশা করেছিল তার মুখোমুখি হলেই সব গোল মিটে যাবে, একটা শান্তি ফিরবে। ইন্দ্রের মনে হারজিতের বহুকালের দ্বন্দ্বের উপশম হবে। কিন্তু উর্বশীর দর্শন পেয়ে ইন্দ্রের বুকে কামনার আগুন দপ করে জ্বলে উঠল। মনে হল, এখনও অনেক কিছু তার অপূর্ণ রয়ে গেছে। উর্বশী তার পরিপূর্ণতার স্বপ্ন।

ইন্দ্র মরিয়া হয়ে উঠল। উর্বশীর নীরবতা কিংবা তার প্রত্যাখ্যানে সে ক্রুদ্ধ হল না। বরং উৎসাহ বেড়ে গেল তার। যা দুর্লভ, অলভ্য, যাকে পাওয়া যায় না, তাকে পাওয়া, লাভ করা কিংবা জয় করার এক চিরন্তন উন্মাদনা আছে প্রত্যেক মানুষের রক্তে। এই পাওয়ার ভেতর আছে জয়ের আনন্দ, পাওয়ার নেশা। সব মিলিয়ে একটা গভীর এবং বিরাট কিছু। সেরকম একটা সুখের অনুভূতিতে আবিষ্ট হয়ে গেল ইন্দ্রর চেতনা। মনে হল, মাটি, সময় আর শরীরের সীমানা পেরিয়ে হঠাৎ তার আকাঙ্ক্ষা, কামনা বাসনা নদী হয়ে গেল, বন্যার প্লাবনে বিস্তৃত সমুদ্রের মত বিশাল হয়ে গেল। সমুদ্র ও আকাশ মিলে তাকে ডাকছিল নিরন্তর। ভেতরটা তার পাগল হয়ে উঠল উর্বশীর জন্যে। বিবেক নামক বস্তুটি হঠাৎ সজাগ হয়ে তার সমস্ত চিন্তার ভেতর ঝনঝনিয়ে উঠল। উর্বশী পরস্ত্রী, তার স্বামী, সন্তান আছে। সেই মুহূর্তে ইন্দ্রের সমস্ত সত্তার মধ্যে এক বিরাট বিস্ফোরণ ঘটে গেল। পাশব আক্রোশে তার ভেতরটা চিৎকার করে উঠল : না-আ-আ। হাঁফাতে হাঁফাতে দাঁতে দাঁত টিপে বলল : উর্বশী শুধু ইন্দ্রের।

উর্বশীকে প্রচণ্ডভাবে পাওয়ার বাসনা হল ইন্দ্রের মনে। উর্বশীর চিন্তা তাকে আচ্ছন্ন করল। তার চোখের ভাষার গভীরে অনুরাগের ফল্গুধারা সে দেখেছে। তার মুক্ত দীপ্ত দুই নয়নের দর্পণে দেখেছে সে নিজের মুখ। প্রথম দর্শনে, তার দৃষ্টির মুগ্ধতা স্বপ্নের মত মনে হয়। ডাগর দুই চোখ মেলে উর্বশী যেন চেয়ে আছে তার দিকে। বঙ্কিম অধরে রহস্যময় লাজুক অপ্রতিভ হাসির দ্যুতি। ইন্দ্রের কানে রিন-রিন করে বাজছিল উর্বশীর মধুর কণ্ঠধ্বনি। দেবরাজের জয় হল। এত কাণ্ডের পর উর্বশী না এসে পারে? আপনি ভাল করেই জানতেন নিরীহ প্রজাদের নিপীড়ন করলে আমি আসব। একটা মেয়ের জন্যে ভুলে গেলেন আপনি কে? আপনার মান-মর্যাদা? কোথায় পাতা আছে আপনার সম্মানের আসনটি?

আজ পর্যন্ত কোন নারী ইন্দ্রকে এরকম অদ্ভুত প্রশ্ন করেনি। এমন কি রাজমহিষী শচীও কোনদিন তকে কোন ব্যাপারে সতর্ক করেনি । প্রশ্ন করেনি। তার কাজ নিয়ে কোন নারী সমালোচনা করতে পারে স্বপ্নে কল্পনাও করিনি। ইন্দ্রের বিস্ময়ের সাগরে ঢেউ তুলল প্রথম উর্বশী। সে ঢেউয়ে প্লাবিত হল বক্ষদেশ। ইন্দ্রের বক্ষজুড়ে এখন উন্মাদ সমুদ্রের দৌরাত্ম্য। ইন্দ্রের ভেতর অস্থিরতা প্রবল হল।

উর্বশীর কথা গান হয়ে, ফুল হয়ে ছড়িয়ে পড়ল তার হৃদয়ারণ্যে। ইন্দ্রের হৃদয়ে সেই বাসনা প্রজ্বলিত বহ্নির মত তার ভেতরটা ছারখার করে দিল।

ইন্দ্রের ধৈর্য ধরল না। ক্ষতবিক্ষত হৃদয়ে উপলব্ধি করল উর্বশীর মত নারীরত্ন পাওয়া ভাগ্য। উর্বশী বিনা জীবন বৃথা। যে কোন উপায়ে উর্বশীকে তার চাই। আশ্রয় নিল কূটনীতির।

রাজনীতির পাশা খেলা ইন্দ্র ভালই জানে। রাজনীতিতে বিবেক নীতির স্থান নেই। লক্ষ্যে পৌছনোই রাজনীতির বড় কথা। সেজন্য যে কোন উপায় আশ্রয় করা যেতে পারে। লক্ষ্যে পৌছনোর পথ সব সময় সাধু উপায়ে তৈরি থাকে না, থাকতে পারে না। সাধুর ছদ্মবেশে সীতা হরণ করতে রাবণ কোন নৈতিক গ্লানি অনুভব করেনি। উপায় নির্ধারণ নিয়ে রাজর্ষি রাবণের কোন শুচিবাই ছিল না। লক্ষ্য জয় ও মহাবিজয়। তার লক্ষ্য এমন এক সাম্রাজ্য নির্মাণ করা যা ইন্দ্রের চরিত্রের কলংক না হয়ে অলংকার হয়ে থাকবে। নিজের মনেই ইন্দ্র বিড়বিড় করে উচ্চারণ করল:

নারীদের কাছে আমি পশুর মতন গন্ধ শুঁকে,
তাদের ওষ্ঠ, বুক
ও নাভি লেহন করি, মনে হয়, এ নয়, এ নয়
আমি যাকে চেয়েছিলাম, সে রয়ে গেছে বড় উঁচুতে
যেন অন্য এক পৃথিবীতে
যেখানে যাওয়া হলো না।*

গোপনে ইন্দ্রের পত্র এসে পৌছল উর্বশীর হাতে। এক অজানা স্পন্দনে তার হৃদয় আলোড়িত হল। কিছু ভয়, কিছু চোরা আনন্দ, কিছু শিহরন যা স্বাভাবিক নয়, দৈনন্দিনও নয়। নিষিদ্ধ বস্তুর প্রতি লোভ, কৌতূহলের প্রকৃতিও বোধহয় এরকম।

পত্রটা হাতে নিয়ে অনেকক্ষণ বসে রইল উর্বশী। খুলতে গিয়ে বুকের ভেতরটা ধক্ করে উঠল। হৃৎপিণ্ডের ভেতর ধুক পুক, ধুক পুক শব্দটা আরো দ্রুত এবং তীব্র হল। খুব মন দিয়ে চিঠিটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল। কিছুক্ষণ যেন স্পর্শের একটা আনন্দ অনুভব করল। তারপর কুণ্ঠিত হাতে খুলল।

প্রিয়তমাসু,—

জীবনের কিছু মুহূর্ত আসে যা মানুষের একান্ত একার। একেবারে নিজের। মুহূর্তটা কিন্তু মানুষের তৈরি নয়। সময় আর নিয়তি হাত ধরাধরি করে মানুষের জীবন নিয়ে খুশিমত খেলে। আমার এ অশান্ত হৃদয় তার খেলনা ঘরের খেলনা।

অথচ কী আশ্চর্য দেখ, এই খেলাটুকুর জন্যে বিধাতা ডুবুরীর মত মহাসমুদ্রের গভীরে ডুব দিয়ে শুক্তির বুকে দুর্লভ নীলাভ মুক্তোর মত তোমাকে তুলে নিয়ে এল পৃথিবীর রঙ্গশালায়। সেখানে আমাদের সাক্ষাৎ নাটকের মত।

কত পাহাড় পর্বত ভেঙে, অনেক কাঁটায় ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত পায়ে জমাট তুষারের দেশ পেরিয়ে তোমাকে নিতে এসেছি। তোমার শিশির ভেজা নরম চোখের দিকে চেয়ে আমি ধন্য হব, পূর্ণ হব। বিনিময়ে সমস্ত পৃথিবী জয় করে এনে তোমার পায়ের কাছে উপহার দেব।

কিন্তু তোমার বিহনে আমি স্তব্ধ হয়ে গেছি। পাথর চাপা ঘাসের মত বিবর্ণ হয়ে আছি। তোমার সোহাগ ভরা দৃষ্টি দিয়ে আমাকে ভরিয়ে দাও। আমাকে গড়ে তোল। আমাকে ছুঁড়ে ফেলে দিও না কঠিন পাষাণের বুকে।

সুন্দরী আমার বুকে ঝরনার তৃষ্ণা। সাগরে যাওয়ার জন্য ঝরনা যেমন পাগল হয়, তেমনি এক পরিব্যাপ্ত তৃষ্ণা আমাকে শুধু হাতছানি দিয়ে ডাকে তোমার শরীরে। আমার একান্ত নিজস্ব আলোকিত মায়ালোকে। আমার প্রতি রক্তকণা একসঙ্গে ঝংকার দিয়ে উঠে সাগরে যাব, সাগরে—। যেখানে সব কামনার সমাপ্তি।

* সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। কেবল 'শতাব্দী'র স্থানে পৃথিবী করেছি।

পত্রের মধ্যে ইন্দ্রের সহজ সরল অকপট স্বীকৃতি উর্বশীকে মুগ্ধ করল। শিহরিত আনন্দের উজ্জীবক স্পর্শে তার ভেতরটা থরথরিয়ে কেঁপে গেল কয়েকবার। মুখ লাল হল। কানের দু'পাশ জ্বালা করতে লাগল। এ এক অদ্ভুত অন্যরকম অনুভূতি। আগে কখনও হয়নি।

ইন্দ্রকে উর্বশীর নির্লজ্জ মনে হল না। তার এই সত্যভাষণে নির্লজ্জতার কোন চিহ্ন পেল না। পত্রতে আদৌ লজ্জাজনক কিছু আছে বলে মনে হল না তার। উদাস চোখে বারান্দার বাইরে দিগন্তের দিকে চেয়ে রইল। পুরুষ্ণিং নদী থেকে ফুরফুরে হাওয়া এসে তার বসন এলোমেলো করে দিল। বিস্রস্ত কেশদাম হাওয়ায় উড়তে লাগল। মাঝে মাঝে কিছু কিছু কেশ চোখে মুখে উড়ে এসে পড়ল। আর উর্বশী মাথা নেড়ে আলতো হাতে চুলগুলো সরিয়ে দিতে লাগল।

মন থেকে ইন্দ্রের চিন্তাটা কিছুতে গেল না। ইন্দ্রের শরীরের গন্ধ বহন করে এক অলৌকিক বাতাস পুরুষ্ণিং নদীর বুক থেকে উঠে এল। উর্বশীর সমস্ত প্রাণ মন কেমন আচ্ছন্ন হয়ে গেল। ধীর পায়ে দুরু দুরু বুকে সে কুঞ্জবনে এসে বসল।

পালতোলা নৌকা উদ্যানের খুব কাছ দিয়ে পুরুষ্ণিং নদীর রূপালি জল কেটে মন্থর গতিতে চলেছে। ঝকঝকে নীল আকাশে ছিন্ন মেঘ একা একা ঘুরছে। কী যেন খুঁজছে অবিরাম। চোখের সামনে দিগন্ত পর্যন্ত অবারিত মুক্ত আকাশ, কিন্তু চারধার গাছপালা অরণ্য পাহাড়ের পাঁচিল। দেখতে দেখতে কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে গেল। উদাস শূন্য দুই চোখে তার গভীর ব্যথা থমথম করতে লাগল। নীল আকাশের দিকে তাকিয়ে নিজের মনেই বলল : ইন্দ্র আমি তো তোমার প্রেমে পড়িনি, তবু তুমি এত পাগল হলে কেন? তোমার অকপট মনোভাব জানিয়ে আমার কাছে কী চাও? আমি তো তোমার কোন ক্ষতি করিনি।

হঠাৎ-ই হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগল উর্বশী।

বিশাল উন্মুক্ত বারান্দার একপ্রান্তে উর্বশী চুপ করে বসেছিল। ক'দিন ধরেই তার মনটা খারাপ যাচ্ছিল। ঘরের মধ্যে থাকলে বড় অবরুদ্ধ লাগে। কেমন দমবন্ধ হয়ে আসে। তাই খোলা ছাদের নিচে দাঁড়াল। শূন্য দৃষ্টি মেলে দিগন্তের দিকে চেয়ে রইল।

হঠাৎ চোখে পড়ল লম্বা ঝাউ-গাছটা। বিকেলের সূর্যকে মুকুটের মত করে মাথায় করে দাঁড়িয়ে আছে। দুপাশে টান টান করে ডালপালা ছড়িয়ে দিয়েছে। পর পর সিঁড়ির মত ধাপে ধাপে একটা সামঞ্জস্য রেখে মন্দিরের চূড়ার মত উপরের দিকে উঠে গেছে। গাছটার মগডালে একটা জঙ্গুলে শকুন বসে আছে। কাছে তার গলার রঙ। একবার ডানা মেলে একটু নড়ে চড়ে আরাম করে বসল ডানা বন্ধ করে। সামনের দিকে একটু ঝুঁকে গলা লম্বা করে ফাঁশফেঁশে গলায় ডাকল। অনেকক্ষণ গাছটার মাথার দিকে এবং শকুনের দিকে চেয়ে রইল উর্বশী। পড়ন্ত আলোর মত উর্বশীর মুখখানা ধীরে ধীরে অন্ধকার হয়ে এল। নিজের অজান্তে দুচোখ বেয়ে অঝোরে জল ঝরতে লাগল। উপরের দাঁত দিয়ে নিচের ঠোঁটটা কামড়ে ধরে সে ভেতরের কষ্টটা রুখতে লাগল। বড় যন্ত্রণা উর্বশীর মাথার মধ্যে ; দু'কানের পাশে। নানারকম রটনা শুনতে শুনতে একদিন সে পাগল হয়ে যাবে।

আকাশে মেঘের উপর মেঘ জমেছে। একটা মেয়ে পাখি ঠোঁটে করে লতাপাতা নিয়ে বাসা বাঁধার জন্যে অনবরত গাছের ডালে যাচ্ছে আবার মাটিতে ফিরে আসছে। সারাক্ষণ ধরে নীড় রচনা করতে করতে বেচারা এখন শ্রান্ত হয়ে ঝিমুচ্ছে গাছের ডালে। তাকে দেখে উর্বশীর বুকে করুণা জাগল। মমতা হল। নিজের মনেই নিরুচ্চারে বলল : এত ভালবাসা শুধু মেয়েদের বুকেই থাকে। নিজেকে উজাড় করে তাদের ঘর বাঁধার এই স্বপ্নের কোন খোঁজ রাখে না পুরুষ। পুরুষেরা শুধু রমণ করে। পাখির বেলায় যেমন সত্য মানুষের বেলাতেও তেমনি। এটাই বোধ হয় জীবের ধর্ম।

একটা ঘোরের মধ্যে কতক্ষণ কাটল উর্বশী জানে না। পুরুরবার ডাকে তার মগ্নতা ভাঙল। চমকে তাকাল তার দিকে। কিন্তু পুরুরবা তার দিকে ভাল করে চাইতেও পর্যন্ত পারছিল না। কেমন একটা অপরাধবোধে আড়ষ্ট। তার দৃষ্টি ছিল মাটির দিকে। নিজের কাছে একটা কৈফিয়ত দেয়ার মত করে

বলল : ঈশ্বর যা করেন তার পেছনে যুক্তি নিশ্চয়ই থাকে। সেই যুক্তি, আমাদের ঘোলা অ-দূরদৃষ্টি দিয়ে বুঝতে পারি না। তাই ঈশ্বরকে বড় নিষ্ঠুর মনে হয়।

উর্বশী চুপ করে রইল। কোন জবাব দিল না। পুরুরবা একটু চুপ করে থেকে পুনরায় বলল : এমন কিছুই কোন মানুষের জীবনে ঘটতে পারে না, যা তার আগে অন্য মানুষের জীবনে ঘটেনি। দুঃখ, যন্ত্রণা, আনন্দ, বেদনা, বিরহ—জীবনের এসব অভিজ্ঞতা এবং ঘটনা আগেও অন্য কোন না কোন মানুষেরও হয়েছে। আমাদের জীবনে যা ঘটছে তাও কোন নতুন কিছু নয়।

উর্বশীর বুকের ভেতর থেকে একটা তীব্র জ্বালা প্রতিবাদে ঝলকে উঠল। বলল : আমাকে নিয়ে দিনরাত কত কথা শুনতে পাই। আমার আর সহ্য হয় না এসব। তুমিও সেই কথার পুনরাবৃত্তি করছ। তোমার সাধ মেটাতে যদি কোন অপরাধ হয়ে থাকে তা হলে আমি দোষী। তুমি বল, সত্যি আমি অপরাধী কি?

পুরুরবা নির্দ্বিধায় বলল : না প্রিয়তমা। না। অপরাধ পাপ যাই হোক আমি করেছি। এর শাস্তি এবং প্রায়শ্চিত্ত আমাকেই করতে হবে। কিন্তু তুমি আমার জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে আছ বলেই তার আঁচ তোমার গায়ে লাগছে। আমি কী করব? আমিও তোমার ভাল চেয়েছিলাম। তোমার কোন অনিষ্ট করিনি। তবু আমার ভালবাসাটা কী পাপে যে অন্যের চোখে দোষের হয়ে গেল, জানি না। আসলে আমরা কেউ দায়ী নই, সব আমাদের কর্মফল। আমাদের নিয়তি। পুরুরবার বুকের গভীরে একটা দীর্ঘশ্বাস মর্মরিয়ে উঠল।

উর্বশী কোন কথাই শুনছিল না। তার কানে শুধু ঝড়ের শব্দ। বুকের অভ্যন্তরে যে ঝড় বইছিল তাতে এলোমেলো হয়ে গেল তার জীবন। দৃষ্টিতে তার কেমন একটা অশান্ত অস্থিরভাব। বিরস মুখে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বলল : তোমার রকম-সকম দেখে আমি ভয়ে সিঁটিয়ে আছি। মনের সঙ্গে লড়াই করে আমি ক্লান্ত। আমাকে তোমার সব উৎকণ্ঠা দুর্ভাবনা থেকে রেহাই দাও। সত্যিই আমি আর পারছি না। আমাদের এমন সুন্দর মিষ্টি প্রণয়ের সম্পর্কটাই মরে গেছে। পরস্পরকে আমরা আর শ্রদ্ধা করি না, ঘৃণা করি, ভয় পাই। প্রণয়ে আমাদের সন্দেহ, বিশ্বাসে অবিশ্বাস। অথচ তুমি একটু ইচ্ছে করলেই আমরা নতুন করে আরো ভাল করে বাঁচতে পারি। একদিন কেশীর হাত থেকে উদ্ধার করে তুমি আমাকে পত্নীর মর্যাদা দিয়েছিলে। আজ সব কিছু তোমার হেরে যাওয়ার ভয়ে হারানোর ভয়ে সংকুচিত। তুমি আর পুরুষ-মানুষ নেই। কাপুরুষ। নিজের ভেতর ভয়টাকে জ্বালিয়ে রেখে তুমি পুড়ে পুড়ে নিঃশেষ হচ্ছ। আর আমাকেও দগ্ধ করছ। প্রিয়তম ভয়ের ভূত মন থেকে তাড়ানোর ওঝা নেই। ভয়ের ভূত একজন মানুষকে ভেঙে ভেঙে টুকরো টুকরো করে তাকে শেষ করে দেয়। কিন্তু তুমি সে কথাটা ভুলে গেছ। বীর কখনও যুদ্ধে ভয় পায় না। হেরে গিয়ে হারাতেও ভয় পায় না।

পুরুরবার চোখে এক গভীর শূন্যতার চাউনি। লম্বা একটা শ্বাস ফেলে বলল ঃ কী করব? নির্বোধের মত পণ করে হরিশচন্দ্র হওয়ার মত মনের জোর আমার নেই। উর্বশী যে অপরাধ আমার একার, তার দায় প্রজারা বহন করবে কেন? আমার শাস্তি আমাকে বইতে দাও। তোমার আমার প্রেমের জন্য এ রাজ্যের প্রজাগণের জীবন মরণের প্রশ্ন জড়িত। তাদের কথাটা আমাকে তো ভাবতে হবে। প্রজারা চায় রাজার পাপের শাস্তি রাজাই ভোগ করুক। মন্ত্রীদের বক্তব্য একজনের জন্যে একটা বড় যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার মত রাজ্যের অস্ত্রবল, সৈন্যবল, অর্থবল নেই। এরকম ক্ষেত্রে ইন্দ্রের প্রার্থনা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়াটা রাজার একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার। রাজাই স্থির করবেন তাঁর কর্তব্য। বন্থুর কল্যাণে আমার কী করণীয় তুমি বলে দাও? একদিন প্রজার কল্যাণার্থে শ্রীরামচন্দ্রও প্রিয়তম মহিষীকে নির্বাসনে পাঠিয়েছিলেন।

উর্বশীর বুকের ভেতরটা ঝাঁৎ করে উঠল। বোবা বিস্ময়ে চেয়ে রইল পুরুরবার দিকে। অপমানিত হওয়ার গ্লানিতে তার বুকের ভেতরটা পুড়ে যাচ্ছিল। মুখখানা কেমন ফ্যাকাশে সাদা হয়ে গেল। ঠোঁট দুটি বজ্রের মত এঁটে ধরে ভিতরকার সব যন্ত্রণার শব্দকে প্রাণপণে আটকে রাখল। তীব্র অপমানে জ্বালা করতে লাগল তার চোখ মুখ। বেশ কিছুক্ষণ ধরে একটা লম্বা শ্বাস ফেলে অবরুদ্ধ গলায়

অস্ফুট-স্বরে উচ্চারণ করল : জন্ম থেকে ক্রমাগতই যার সব কিছু হারিয়ে যাচ্ছে তার হারানোর ভয় তো আর থাকে না। মান-সম্মান, তাও হারিয়ে গেল। হেরেও গেলাম বড় লজ্জাকরভাবে। অপমান নিয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে মরণ ভাল। আমার সব শান্তি এখন মরণে।

পুরুরবা খুব মলিন একটু হেসে নীচু ও অদ্ভুত করুণ গলায় বলল : মরে যাচ্ছি আমিও। কতরকম মরণ আছে সংসারে। তোমার আমার মরণ সে রকম কিছু। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সব মানুষকে পরিস্থিতির সঙ্গে মিলে যেতে হয়, মিলিয়ে নিতে হয়। নইলে অস্তিত্ব থাকে না। ইন্দ্রের তোমার প্রতি বিশেষ দুর্বলতা আছে। প্রজারাও তোমার করুণাপ্রার্থী। এখন—

পুরুরবার ইঙ্গিতটা বুঝতে কষ্ট হল না উর্বশীর। দুঃখে ঘৃণায় অপমানে তার কান্না পেল। দু'চোখ রাঙা জবা করে ধরা গলায় বলল : তুমি কথাটা এত নগ্ন করে আমাকে বলতে পারলে? তোমার সরমে লাগল না। পুরুষ মানুষের আত্মসম্ভ্রম বোধটা তোমার মধ্যে বড় কম? তুমি কি জড়? তোমার হৃদয় বলে কিছু কি নেই? জেনে শুনে আমাকে তুমি ইন্দ্রের কাছে পাঠাচ্ছ। তার লালসাগ্নিতে ঝাঁপ দিতে প্ররোচিত করছ। নিজের স্বার্থে। অথচ তুমি আমার স্বামী। নিরাপত্তার রক্ষাকবচ। কিন্তু স্বামীর কোন কর্তব্য তুমি করছ না? কি দোষ করেছি আমি?

পুরুরবার ভুরু কুঁচকে দু'চোখ ছোট হয়ে গেল। বলল : কোন দোষ তুমি করনি। সব ভুল আমার। সহধর্মিনী বলেই তোমাকে আমার ভুলের ফলভোগ করতে হচ্ছে। এ আমাদের অদৃষ্ট। আমাদের নিয়তি। স্বামীর কর্তব্য করতে না পারার দুঃখ, লজ্জায় আমার বুক ফেটে যাচ্ছে।

উর্বশীর অধরে একফালি বিষণ্ণ হাসি। বলল : আমার প্রেমকে খুন করে তার রক্তে স্নান করে শুচিশুদ্ধ হয়ে অপত্যস্নেহে প্রজাপালনের পুতুল খেলা করে তুমি নৃপতির কর্তব্য করছ।

পরিতাপিত অন্তরে পুরুরবা দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে উচ্চারণ করুণ রাজারা বোধ হয় কেউ মানুষ নয় উর্বশী। তারা শুধু প্রশ্বাস নেয় আর নিঃশ্বাস ফেলে বেঁচে থাকে। অত বড় প্রেমিক রাজা রামচন্দ্র শুধু প্রজাদের মুখের দিকে তাকিয়ে তাদের কল্যাণে আর রাজ্যরক্ষার স্বার্থে জনক নন্দিনী পতিব্রতা স্ত্রী-সীতাকে নির্বাসন দিলেন। ইচ্ছে থাকলেও সিংহাসনে বসে স্বামীর কর্তব্য করতে পারেননি। রামচন্দ্রের মত আমিও সর্বাগ্রে রাজা, তারপর একজন রমণীর স্বামী।

ভীষণ অপমানে উর্বশীর শরীরের ভেতর লু বয়ে গেল। দুটো বড় চোখে নিষ্পলক দৃষ্টি। কিন্তু বিস্ময় নয়, কেমন শূন্য। কাঁপা গলায় ভাঙা স্বরে বলল : রামচন্দ্র তোমার মত স্ত্রীকে অসম্মান করেনি। তুমি আমাকে অপমান করলে। তোমার প্রস্তাবের অর্থ বাকি জীবনটা আমাকে ইন্দ্রের রক্ষিতা হয়ে কাটাতে হবে। আমাকে কখনো ভালবাসনি বলে একথা বলতে পারলে। আমি অন্য এক পুরুষের সঙ্গে জীবন কাটাব জেনেও তোমার ভেতর কোন প্রতিক্রিয়া নেই। অথচ মেয়ে মানুষেরা পুরুষের ছায়ায় নিরাপত্তা খোঁজে। সেই নিরাপত্তা দেবার ক্ষমতা যার নেই সে চাইলেই তার কথা আমাকে শুনতে হবে কেন? সম্মান নিয়ে বেঁচে থাকার আমারও অধিকার আছে। প্রত্যেকের ইচ্ছে এবং ব্যক্তি সত্তাটা তার নিজের। নিজেরই একার। সেখানে আমার স্বামী, সন্তানের কোন প্রবেশাধিকার নেই। তোমার ব্যক্তিসত্তা যেমন তোমার, আমারটাও আমার। আমার ব্যক্তিগত জীবনের আঙিনায় তোমার প্রবেশাধিকার নেই।

পুরুরবা একটু চমকাল। তার মুখ চোখের মধ্যে কি যেন ঘটে গেল। বোধ হয় একটা ভয় খেলা করে গেল। ক্লান্ত বোধ করল। তারপরেই কেমন যেন দিশাহারা হয়ে বলল : আমি রাজা। দেশের জন্য, স্বাধীনতার জন্য সকল নাগরিককে আত্মবিসর্জনের আদেশ দিতে পারি। রাজাদেশে নিরীহ সৈনিককে রাজার মর্যাদার জন্য দেশের জন্য অকাতরে প্রাণ দিতে হয়। রাজাকেও যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করতে হয়। তেমনি রানীর আত্মবলি দেয়া নতুন কোন ঘটনা নয়। জনগণের জীবন মরণের প্রশ্নে ইন্দ্রের মনোবাঞ্ছা পূরণ করলে কোন কলঙ্ক তোমাকে স্পর্শ করবে না। এক মহান আত্মোৎসর্গের গৌরব তোমার কুলটা নামের সব অপযশ ঢেকে দেবে। তুমি এত বোঝ, এটুকু বোঝ না কেন, দেশরক্ষার কারণে নারীদেরও অন্যভাবে নৈবেদ্য সাজাতে হয়। তবু যদি তোমার সংস্কার না কাটে, প্রত্যয় যদি না হয়, তা হলে শুনে রাখ এটাই তোমার প্রতি রাজাদেশ।

উর্বশীর জবাব দেওয়ার মত মনের অবস্থা ছিল না। রাজাদেশ শুনে নিশ্চল পাথর প্রতিমার মত স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। ঘৃণায়, ধিক্কারে তার দুই চোখ জ্বল জ্বল করে জ্বলতে লাগল। আর এক দুরন্ত অসহায় আক্রোশে তার বুক ঘন ঘন ওঠানামা করতে লাগল। ক্ষণকাল পুরুরবার দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আবেগমথিত গলায় বলল : আমার প্রেমের কোন মূল্য তোমার কাছে নেই। আমার দেহের ভোগস্বত্ব ইন্দ্রকে দিয়ে তুমি সিংহাসন কিনছ। মনে রেখ ঐ সিংহাসনে আমার করুণা, আর দয়া নিয়ে তোমাকে চিরকাল থাকতে হবে। আমি না চাইলে তুমিও সিংহাসনে আর বসতে পারবে না।

পুরুরবার মুখখানা মুহূর্তে কেমন রক্তশূন্য আর ফ্যাকাশে হয়ে গেল। চমকানো ভয়ে অস্ফুটভাবে উচ্চারণ করল : উর্বশী!

উর্বশীর দুই চোখে কৌতুক, মুখে যন্ত্রণাবিদ্ধ হাসি। বলল : কেন? ভয় পেলে? নিজের স্ত্রীকে ভেট দিয়ে যে সিংহাসন নামক বস্তুটি তুমি লাভ করলে, তার জন্য আমাকে সারাজীবন অনেক মূল্য দিতে হবে। অথচ আমার প্রেম কোন মূল্য পেল না। তোমার সিংহাসনের জন্য আমি মূল্য দেব কেন? জীবন যখন দেয়া-নেয়া আর হিসাব-নিকাশের তখন জমা খরচের শূন্যখাতায় পাওনা কিংবা দাবির কিছু থাকে না।

উর্বশীর কথা শুনে পুরুরবা থ হয়ে গেল। বিস্ময়ে দু'চোখ বিস্ফারিত হল। ভিতরে তার শীত ধরে গেল। উর্বশীর যে আবেগ আগে পুরুরবা নামে এক সীমানায় গদগদ হয়ে উঠত তা আর নেই। উর্বশী যেন এখন আর তার নেই। তারা সত্যই এখন আর পরস্পরের নয়। কোথায় কী করে যেন তার দাবিটা হারিয়ে বসল। পুরুরবার রাগ হল না, অভিমানও হল না। শুধু অসহায় এক কান্না ভিতর থেকে উঠে এসে তার ভেতরই ওলোট-পালোট করে দিচ্ছিল। সত্যিই একটা কান্না তার গলার কাছে আটকে ছিল। খুব কষ্টে উদাস গলায় বলল : উর্বশী। তোমার বিপদে আমি এগিয়ে এসেছি। কিন্তু আমার দুঃসময়ে তোমাকে পাচ্ছি না। তোমার মধ্যে এতটুকু কৃতজ্ঞতাবোধ—

উর্বশী একটু ম্লান হাসল। কিন্তু ভেতরটা তার দপ্ করে জ্বলে উঠল। বলল : রাজা আমার এই সুন্দর নারী দেহটা আশ মিটিয়ে ভোগ করেছ, আমার কৃতজ্ঞতার ঋণ তাতেই শোধ হয়ে গেছে। আমাদের কারো কাছে আর পাওনা নেই।

তারপর পুরুরবার দিকে অপলক চোখে চেয়ে থেকে কিছুক্ষণ ভাবল। দীর্ঘশ্বাস ফেলে ক্লান্ত স্বরে বলল : তোমরা পুরুষেরা মেয়েদের কী চোখে দেখ জানি না। শরীর ছাড়াও মেয়েমানুষের মন বলে একটা জিনিস আছে। সে মনটা অন্যরকম। তুমি আমার মনটাকে জানতে চেষ্টা করনি। তোমার খেলার পুতুল হয়ে খেলেছি। তোমাকে প্রফুল্লিত দেখে সুখী হয়েছি। কিন্তু সে সম্পর্ক যখন আর আমাদের নেই, তখন তোমার আদেশ পালনেরও কোন গরজ আমার নেই। ইন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাতের পরিণাম কী আমি জানি। তুমি বললেই আমি যেতে পারি না। আমারও একটা ইচ্ছে-অনিচ্ছে আছে। আমি নিজের ইচ্ছেয় চলব। ইন্দ্রের কাছে যাওয়াও যখন একধরনের মরণ, তখন মরেই প্রমাণ করব কারো খেলার পুতুল নই আমি। মৃত্যুর পর তোমরা এই দেহটা নিয়ে যা খুশি কর—তাতে কিছু যায় আসে না। তোমাদের দু'জনকে হতাশ করে আমি এক অনন্ত শান্তি নিয়ে চলে যাব। আমার আর চিন্তা করার কিছু রইল না। তোমাব সিংহাসনের কি হবে জানি না, তবে তোমার রাজ্যের জনগণের জীবন-মরণের সঙ্গে আমার জড়িয়ে পড়ার আর কোন সম্পর্ক থাকল না। তোমার প্রজারা অন্তত হাঁফ ছেড়ে বাঁচবে। তুমিও রেহাই পাবে।

পুরুরবা কিছু বলার আগেই উর্বশী চলে গেল। নিজের ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করল। বিমর্ষ বিস্ময়ে পুরুরবা তার যাত্রাপথের দিকে চেয়ে রইল। বুকটা দুরু দুরু করে উঠল। কেমন একটা অচেনা ব্যথা চিনচিন করতে লাগল। আর একটা তিক্ত হতাশায় খাঁ খাঁ করতে থাকে চারধার। নিজেকে বড় শূন্য লাগল।

দুঃসহ একাকীত্বের মধ্যে পুরুরবার একটা কথা মনকে ভীষণভাবে আলোড়িত করল। সমস্ত চেতনার মধ্যে কথাগুলো তার ঝংকারে বাজতে লাগল। নিরুচ্চারে বলল : প্রিয়তমা, সত্যি বলতে কি তোমার প্রেমে ডুবে গিয়ে আমি কোনদিকে ফিরে তাকায়নি। রাজ্যের নিরাপত্তার সংকট তো

আমার তৈরি। এ জন্যই অনুশোচনা হয়। বিশ্বাস কর ; আমি তোমাকে ভীষণ ভালবাসি। কিন্তু সবার থেকে ভালবাসি আমার স্বদেশকে, মাতৃভূমিকে। তার কোন ক্ষতি চিন্তা করতে পারি না। আমার সম্মানের বিনিময়েও না। এমন কি তোমার জন্যেও নয়।

সময় যত যায় উর্বশীর রাগ অভিমানের তাপ কমে আসে। ক্রমেই শান্ত প্রকৃতিস্থ হয়। প্রতিক্রিয়ার বদলে তার ভিতরে শুরু হয় বিচার বিশ্লেষণ এবং সমাধানের চেষ্টা। একটা কিছু ভিতরে স্পন্দন তোলে। ভেতরে আর উত্তেজনা নেই। পুরুরবার প্রতি তার মনোভাব আরো বিরূপ, আরো বিরাগপূর্ণ হল। পুরুরবার বুকে প্রেম নেই। পুরুরবার কাছে তার কোন দাম নেই। রাজ্য, প্রজা, সিংহাসনের সঙ্গে তাকে বিনিময় করে নিল। একজন রমণীর কাছে এর চেয়ে অপমান আর অসম্মান কিছু নেই। তার এই অবমাননার ভেতর একরকমের চাপা নিষ্ঠুরতা আছে।

একা একা বসে নিজের মনের সঙ্গে কথা বলতে বলতে উর্বশীর হঠাৎ মনে হল স্বামী-স্ত্রীর সুন্দর সম্পর্কটা একটা মেনে নেয়া অভ্যাস। স্বামী-স্ত্রী কিংবা দাম্পত্য জীবন কথাটার মধ্যে কী যেন একটা মোহ আছে; যে একটুতেই পবিত্রতায় এবং অনাবিলতার সৌন্দর্যে মন ভরে যায়। কী আছে ঐ কথাটার ভেতর? কেন এমন বিপজ্জনকভাবে প্রত্যেক মেয়ের ভাল লাগে! এই ভাল লাগার ভেতর কোন অর্থ কিংবা শাসন নেই, তবু এই কথাটার মোহ কাটাতে এক একজন রমণীর একটা জীবন কেটে যায়। ভগবান মেয়েদের যে কেন এত দুর্বল করে গড়লেন তা তিনিই জানেন। পুরুষেরা মেয়েমানুষের কথা একটুও বোঝে না। আসলে প্রত্যেক নারীর কাছে যা সবচেয়ে বেশি মূল্যবান কোন পুরুষ তার মূল্য না দিয়ে যা সস্তা তাকেই মহামূল্য মনে করে। মেয়েমানুষের শরীর ও দেহের প্রতি পুরুষের এই দুর্বলতার কোনও মানে নেই। তবু সব বুদ্ধিমান পুরুষ জেনে শুনে এই ভুল করে। বোধ হয় এই ভুলে পুরুষের আনন্দ আছে। পুরুষরা কত সহজে বিনা আয়াসে একটা নারীর সঙ্গে স্ত্রী সম্পর্কটা ছিঁড়ে ফেলে। তার জন্যে একটুও মায়া মমতা থাকে না তাদের প্রাণে। থাকলে ছেড়ে দেয়া, ফেলে দেয়া মেয়েদের জন্য তাদের হৃদয় এত কঠিন হত না। পুরুষ মানুষ যা সহজে পারে, মেয়ে মানুষ তা পারে না বলেই বোধ হয় কেঁদে কেঁদে সারা হয়। নারীকে বিধাতা তাই অল্পেই কাঁদার একটা সহজাত ক্ষমতা দিয়েছে! কেঁদে সে হাল্কা হয়, মুক্ত হয়, মুক্তি পায়। একঘেয়ে ক্লান্তিকর বিষণ্ন দমবন্ধ অবস্থা থেকে কান্না আলো-হাওয়া ভরা মুগ্ধ পৃথিবীর দিকেই তাকে নিয়ে যায়।

পুরুরবার কথা মনে করতে ইচ্ছে হয় না উর্বশীর। কারণ তার এখন পুরুরবার জন্যে বেঁচে থাকার প্রয়োজন নেই। পুত্র আয়ু, রজির জন্যেই তার এখন বেঁচে থাকার দরকার। কিন্তু সন্তানের জন্য জননীর প্রাণের এত উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা তার অজানা ভবিষ্যতের জল্পনা কল্পনায় তার ভেতরটা উথাল পাথাল করছিল। কিন্তু সম্পর্কহীন বন্ধনের কথা ভাবাই মিছে। শুধু শুধু নিজেকে কষ্ট দেওয়া! যে মানুষটি তার জীবন কেন্দ্র, সমস্ত কাজের উদ্দেশ্য, চিন্তার কারণ, যাকে ঘিরে তার সব পরিচয় তার জীবনে সেই অস্তিত্বটাই যখন থাকল না তখন প্রতিনিয়ত নারীত্বের অপমান, লজ্জা সহ্য করে একটা সম্পর্ককে টিকিয়ে রাখাটা অসহনীয়। এই বন্ধন সে টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করলেও হয়তো আয়ু, রজি একদিন বড় হয়ে মা বলে পরিচয় দিতে তাকে লজ্জা পাবে। কারণ তার তো কোন সামাজিক পরিচয় তখন থাকবে না। সেরকম কিছু হওয়ার আগে মরণ ঢের ভাল।

পুরুরবাকে ত্যাগ করা আপাতভাবে যত কঠিন হোক, একদিন তার ভালবাসার স্মৃতি ঘৃণায় ও বিরাগে ঝাপ্সা হয়ে যাবে। কিন্তু পুত্র আয়ু, রজি যে প্রেমের সাগর থেকে তুলে আনা শুক্তি। তার সত্তা থেকে তারা জাত। তার আত্মার স্ফুলিঙ্গ। নিজের শরীর থেকে আত্মাকে ছিন্ন করলে কেউ বাঁচে কখনও? আয়ুকে, রজিকে উর্বশীর কাছ থেকে পৃথক করা তেমনি এক যন্ত্রণাদায়ক অনুভূতি। তবু প্রত্যেক মাকে এই উপেক্ষা, অবহেলা এবং নিষ্ঠুরতা সইতে হয়। পুত্রদের সঙ্গে আসন্ন বিচ্ছেদের সম্পর্ক চিন্তা করে তার মুখটা একটু বিবর্ণ হল। কেমন একটা হতাশার ভাব গভীরভাবে তাকে আচ্ছন্ন করল। বুকের ভেতরটা গুঁড়িয়ে যাচ্ছিল পাষাণ ভারে। পুত্রের সঙ্গে এই বিচ্ছেদটা সহ্য করতে পারবে তো? নিজের মনেই নিরুচ্চারে বলল ঃ হায়রে রক্তের সংস্কার। কিছুতেই নিজের সংস্কারকে ছাপিয়ে উঠতে পারছে না। তা-হলে কিসের মাতৃত্বের গর্ব? মায়ের রক্তের এবং মনের সূক্ষ্ম ব্যাপারগুলি

এবং তার স্নেহ-মমতা-ভালবাসা সব চাপা পড়ে যায় সন্তানের পিতার রক্তের স্থূল দুর্মর ব্যাপারগুলোতে। জননীর জন্যে থাকে শুধু নিষ্ঠুরতা, ঔদাসীন্য, উপেক্ষা। উর্বশীর হঠাৎই দুঃখ হল ভীষণ। সন্তানের সঙ্গে জননীর সম্পর্ক থাকল, অথচ বুক ভরে আদর করা কিংবা ভালবাসা জানানোর অধিকার থাকল না; এ কেমন সম্পর্ক? এই নিদারুণ প্রশ্নটা নিয়ে হতবুদ্ধির মত দাঁড়িয়ে রইল। শরীরের ভেতর যন্ত্রণার মত একটা কিছু ছড়িয়ে পড়ছিল। বুকটা দুঃখে, বিষাদে, অপমানে, অবহেলায় উথাল পাথাল করছিল, আর চোখ ভরে জল নামল।

অশ্রুর স্বাদ বড় নোন্তা। আর মানুষের সম্পর্কটা যেন কাচ দিয়ে তৈরি। নিজের অসাবধানেই সে শুধু ভাঙে। টুকরো টুকরো হয়ে ভাঙে। একবার ভাঙলে আর জোড়া লাগানো যায় না। সে নিজেই এখন ভেঙে টুকরো টুকরো হয়েছে। এটাকেই সম্পর্কহীনতা বলে ভ্রম হয়। যেদিন দাবি করার জোর থাকে না, দেখলেই লজ্জা হয়, কেমন একটা সংকোচ হয়, সত্যিই সেদিন সম্পর্ক বলে আর কিছুই বাকি থাকে না। এ কথাটা আজকের মত আগে কখনও ভাবনি উর্বশী। এখন বুঝতে পারল যা আজ অবধি ও জানত, তা ঠিক নয়। কারো কোন জানাই অভ্রান্ত নয়। জানার জগৎ প্রতিদিনই বদলে যায়। আজ যেটাকে অভ্রান্ত সত্য বলে মনে হয়, দু'দিন বাদে সেটাকে চরম ভ্রান্তি বলে মেনে নিতে হয়। হয়ত এমন না হলে মানুষের জীবন একটা নিশ্চল বিন্দুতে স্থির হয়ে থাকত।

ইন্দ্রের কথাটা হঠাৎ মনে পড়ল। "তোমাকে এই জানা আমার ফুরাবে না, ফুরাবে না সেই জানার সঙ্গে সঙ্গে তোমার চেনা।" কথাটা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরের ভেতর শিহরন খেলে গেল। ইন্দ্রের মুখ, অবয়ব সব সে কল্পনায় দেখতে পাচ্ছিল। ইন্দ্র তাকে এমন করে কামনা করে, এত পাগলের মত চায়, যে ভাবলেই শিউরে ওঠে গা।

উর্বশী দাঁতে ঠোঁট কামড়াল। নিজের মনে ভাবল, কী হবে মরে? কেন মরবে? কার জন্যে মরবে? মরে তার লাভ কি? সে মরলে কারো কোন ক্ষতি হবে না। একজন সতী-সাধ্বী পতিব্রতা রমণীর মৃত্যু হল বলে থেমেও থাকবে না পৃথিবীর কোন কিছুই। পুরুরবাও রাজ্য সিংহাসন ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হবে না। রজি, আয়ুও খিদে পেলে ঠিক কাঁদবে। ইন্দ্রের রতি বাসনারও যতি পড়বে না, অন্য কোন উর্বশীকে খুঁজবে। কেবল তার বাঁচাটাই হবে না। জীবনের সব কিছু দেখা হবে না। সব অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে যাওয়া হবে না। জীবনটা তো প্রকৃত অর্থে বেঁচে থাকার জন্য। মরার জন্যও নয়, পস্তাবার জন্যও নয়। বেঁচে থাকার তৃষ্ণা সব জীবের রক্তের মধ্যে ঘুমিয়ে আছে। বেঁচে থাকার জন্য ভিতরে ভিতরে এক অদৃশ্য প্রতিযোগিতা লেগেই আছে। বাইরে থেকে তা সব সময় বোঝাও যায় না। কিন্তু বাইরে যে লড়াই হয় সকলের চোখের সামনে সেখানে প্রত্যেককে প্রতিমুহূর্ত বিরুদ্ধ অবস্থার সঙ্গে লড়ে বাঁচতে হচ্ছে তাকে। এর নাম জীবন সংগ্রাম। প্রতিক্ষণ এখানে যুদ্ধ চলছে। এর বিরাম নেই, যতি নেই। এই লড়াই তার নিজের সঙ্গে, তার পরিবার ও পরিবেশের সঙ্গে , স্বামী-সন্তানের সঙ্গে কামনা-বাসনা, মায়া-মমতার সঙ্গে। নীরব অদৃশ্য এক লড়াই সর্বক্ষণ লেগে আছে। প্রতি মুহূর্তেই হার জিত তার জীবনে। কেউ ইচ্ছে করে হারতে চায় না। যেমন তেমন করে জেতাকেও লোকে বলে জিতল। পুরুরবাও সেইভাবে জিতছে নিজের কাছে এবং রাজ্যের প্রজাকুলের কাছে। তা হলে, নির্বোধের মত মরে সে অকারণ হার স্বীকার করবে কেন? এভাবে জীবন নষ্ট করার ভেতর কোন মহত্ত্ব নেই। গৌরবও নেই। সুতরাং সে মরতে যাবে কোন দুঃখে? পুরুরবার কথাগুলো হঠাৎ মনে হল : তোমার জীবনটা কি তোমার কাছে দামী নয়। নিজেকে এমন করে ঠকিয়ে কী পাবে তুমি? বোকারাই নিজেকে বঞ্চিত করে। বড় বেশি ঠকায়। তোমার জীবনে এমন কিছু হয়নি যে মরতে হবে? বরং তেতো বাঁধন থেকে এক মিষ্টি প্রীতির বাঁধনে বাঁধা পড়লে তুমি সুখী হবে। সত্যি বলতে কি তোমার কোন পিছুটান নেই। আয়ু, রজি তারা ধাত্রীর কাছেই মানুষ। তুমি শুধু তাদের পেটে ধরেছ এবং বুকের দুধ খাইয়েছ। সন্তান পরিচর্যা তোমায় করতে হয়নি। ধাত্রীর কাছে তারা ভালই থাকবে। আমাকে খুব স্বার্থপর মনে হচ্ছে। আমার সমস্ত খারাপকে আমি স্বীকার করি। তাই তোমাকে বেঁধে রাখতে চাই না। তোমার মত সুন্দরীকে সত্যি একজন পুরুষ মানুষের মধ্যে ধরে না। তোমার সৌন্দর্যের আকর্ষণ, তোমার চিত্তের গতি তুমি না চাইলেও তোমার

অজান্তে উপচে যাবে অন্য পুরুষের দিকে। তাতেই তোমার জীবনপাত্র ভরে উঠবে। অনেক ভেবেই আমি তোমাকে সম্পূর্ণ মুক্ত করে দিলাম। জীবনের যা কিছু গেছে তা গেছেই, তার হিসেব করে কষ্ট পাওয়া মিছে। এখনও পড়ে আছে অনন্ত যৌবন, অমৃত জীবন।

আর কান্না পেল না উর্বশীর। বরং মনে হল, বিয়েটা মেয়ে মানুষের একটা সংস্কার। বিয়ের মন্ত্রে প্রেম নেই। আছে শুধু বন্ধন। অকুণ্ঠ শরীর দানের এবং সহবাসের গভীর একতরফা অন্ধ সংস্কারের একটা অভ্যেস গড়ে তোলা। একে সকলে ভালবাসা বলে জানে। অন্য মেয়ের মত সেই অভ্যেসটাকেই ভালবাসা এবং প্রেম বলে শ্রদ্ধা করে এসেছে। সত্যিকারের এর ভেতর কোন প্রেম আছে কিনা যাচাই করে দেখার অবকাশ বোধ হয় খুব কম জীবনে আসে। আজ যখন সংকটে পড়ল তখন প্রথম মনে হল অভ্যেসটাকেই সে ভালবাসা বলে ভুল করে এসেছে। আসলে, এ সব জটিল জীবন রহস্য বোঝার অবকাশ যত কম হয় জীবনে ততই মঙ্গল। বিশ্বাস ভাঙার কষ্ট বড় নিদারুণ।

প্রত্যেক মানুষের জীবনে এমন এমন দুর্দৈব মুহূর্ত আসে যখন তার ভাবনা-চিন্তার মধ্যে বিস্ফোরণ ঘটে যায়। পুরনো ধারণা মূল্যবোধের ভিত ভেঙে পড়ে। নিজেকে তখন বড় একা আর শূন্য লাগে। বিবাহ মানে বন্দীজীবন। বিবাহ মানে স্বার্থপরতা। বিবাহ হল শরীর উপভোগের অধিকার। এ সব কথায় উর্বশীর মন কেন ভারাক্রান্ত হল কিছুই জানে না। বোধ হয় প্রত্যাশার যেখানে কিছুই থাকে না, প্রশ্নগুলো সেখান থেকেই উঠে আসে। সময়, অবস্থা এই ভাবে মানুষকে বদলে দেয়। সেই সময় তাকে তার আসল আমি, একা আমিকে সম্বল করে দাঁড়াতে হয়। জীবনের কিছু মূল প্রশ্নের উত্তর তখন তাকে একা-একাই দিতে হয়। সেই কঠিন পরীক্ষার মুহূর্ত শুরু হল।

উর্বশীর অজান্তে বুকের গভীর থেকে একটা লম্বা শ্বাস পড়ল। আর শ্বাসের সঙ্গে নিরুচ্চারে বলল : বেঁচে থাকার মত আমার অনেক কিছু আছে। তাকে নষ্ট করার কোন অধিকার নেই আমার। কত সুন্দর কিছু করা হল না। কত কী করার বাকি রয়ে গেল। সুতরাং হেরে যাওয়া নয়, কখনও নয়—

॥ চার ॥

সুন্দর সুদৃশ্য পুষ্পসজ্জিত রথ সাঁ সাঁ করে বাতাস কেটে ছুটে যাচ্ছিল। কোথায় কোনদিকে যাচ্ছিল তার কোন খোঁজ উর্বশীর.জানা ছিল না। তবে মন তার ঠিকই টের পেয়েছিল এ রথ চলেছে আমরাবতীর দিকে। হাতের তালুর উপর থুতনীর ভর দিয়ে শূন্য চোখে মাটির দিকে চেয়েছিল। সব কিছুকে পিছনে ফলে, সব দৃশ্যপথ ঘনঘন মুছে দিয়ে রথটা ক্রমাগত সামনের দিকে এগোতে লাগল। পশ্চাতের সব কিছু ধুলোয় ঝাপ্সা হয়ে গেল।

উর্বশীর কিছুই মনে হচ্ছিল না। বুকের ভেতরটা তার ভীষণ ফাঁকা এবং শূন্য। বসে বসে শুধু নিজের বুকের ধক্ ধক্ শব্দ শুনছিল। যত সময় যাচ্ছিল ততই বুকে হৃৎস্পন্দনের শব্দ বেড়ে যাচ্ছিল। দ্রুত হচ্ছিল; একটা পরিণামের কথা চিন্তা করে সে ভীষণ শঙ্কিত হচ্ছিল। উর্বশীর দুই চোখে এক গভীর বিষণ্নতা নেমে এসেছিল। অজ্ঞাত কিছু কল্পনা করে একটু চমকে উঠেছিল। কিন্তু চোখ বুজতেই ইন্দ্রের মুখ দেখল। তার দিকে চেয়ে আছে ইন্দ্র। কি সুন্দর সে চাহনি। সে শুধু চোখের চাওয়া নয়, মনের চাওয়া। উর্বশীর দৃষ্টি কেমন যেন রহস্যময় হয়ে ওঠে। ভেতরটা কেমন উৎকর্ণ উন্মুখ হয়ে ওঠে।

ইন্দ্রের নামটা তার কাছে নতুন নয়। কৈশোর থেকে তার মনে গেঁথে আছে, আর নিঃশব্দে জীবনের গভীরে বটের মত শিকড় ছড়িয়ে দিয়েছে এই প্রথম অনুভব করল। ইন্দ্র এখন তার জীবনে বাস্তব সত্য। তার কথা চিন্তা করতে বুকের ভেতর যে এত প্রফুল্লতা লুকিয়ে ছিল আগে কখনও জানা হয়নি। বোধ হয় এই কারণে মৃত্যুর সংকল্প করেও তার মরা হয়ে উঠেনি। সে কি ইন্দ্রের জন্যে? যে মুক্তির জন্যে একদিন ধনকুবেরের গৃহ থেকে নিঃশব্দে বিদায় নিয়েছিল সেই মুক্তির দরজা বন্ধ করে দিয়ে পুরুরবা তার সঙ্গে পুতুল খেলা করল। অথচ কোনদিন সে চায়নি তাকে নিয়ে কেউ পুতুল খেলা করুক। ইন্দ্র এসে তার কাছে মুক্তির দরজাটা হাট করে দিল। এই মানুষটাকে না জেনে,

না বুঝে ঘেন্না করেছিল। ভীষণ ঘেন্না করেছিল। কিন্তু সেই ঘেন্নার কোরকে লুকনো ছিল তীব্রভাবে ভাল লাগা। নিজের মনে নিরুচ্চারে উচ্চারণ করল : দেবরাজ ক্ষমা কর।

তবু উর্বশীর বড় ভয় করছিল। যে মানুষ নিজের কাছ থেকে নিজে পালিয়ে যেতে চায় চেনা আলো থেকে অচেনা অন্ধকারে তার জবাবদিহি করার বড় কিছু থাকে না কারো কাছে। ভুল যা করেছে সে নিজেই করেছে। ধনকুবেরের নিশ্চিত আশ্রয় ছাড়া থেকেই অনিশ্চয়তা গভীরতর হল। এখনও জীবনে কত দুর্ভোগ বাকি আছে কে জানে?

রথ ছুটেছে অমরাবতীর দিকে লাল ধুলো আর নুড়িভরা পথে। রথের চাকার অবিরাম শব্দে নিস্তব্ধতা ভেঙে খান খান হল।

ছবির মত অলংকৃত, সজ্জিত ও অনুপম ভাস্কর্যে খোদিত শ্বেতমর্মরের প্রাসাদের ফটকদ্বারে এসে যখন রথ থামল উর্বশীর বুকটা ছাঁৎ করে উঠল। গলাটা শুকিয়ে গেল। সেই মুহূর্তে কি যেন একটা গলার কাছে আঁটকে রইল। তেষ্টা পেল খুব। বুকের মধ্যে অব্যক্ত চাপা একটা কষ্ট। এমন কষ্ট আগে কখনো পায়নি উর্বশী। একটু আগে যা ছিল মুক্তির উল্লাস, এখন তা হঠাৎ বিপদে ভরে গেল কেন? মন খারাপ করে দেওয়ার বিষণ্ণ আপশোষ আর হতাশায় তার বুক ভরে উঠল। সে নিজেও কম আশ্চর্য হল না। মানুষের মনের মধ্যে যে কত নতুন নতুন অজানা মহাদেশ আছে মানুষ নিজেও জানে না। শরীরের ভেতর লুকোনো মনের সেই জঙ্গলে বরফ ঢাকা পাহাড়ে যখন পৌঁছে যায় তখন যুগপৎ বিস্ময় ও আনন্দে, ভাল-মন্দ বোধে; সে কেমন একটু দিশাহারা হয়ে পড়ে। কারণ মন তো অনেক বড় ব্যাপার। ক'জন মানুষ আর মনের কথা বোঝে? উর্বশীও বোঝেনি বলে স্তব্ধ হয়ে রইল। নিজের অজান্তে মুখ বিকৃত করল। তার অন্তরের, তার সব যন্ত্রণার গভীর থেকে নাভিমূল থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে উৎসারিত হল; তাহলে দেবরাজের রক্ষিতা আমি। সত্য যা, তা এমনি অমোঘভাবেই হঠাৎ প্রকাশ পায়। নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ হারাল উর্বশী। আবার বলল : আমি আর প্রেয়সী নই, বধূ নই, মাতা নই, বনিতাও নই, শুধু নন্দনবাসিনী সুন্দরী রূপসী উর্বশী। নন্দনকাননের নিভৃত বিশাল কক্ষে হেমনির্মিত পালঙ্কে উৎকর্ণ উৎকণ্ঠা নিয়ে উর্বশী একাকী বসেছিল। বুকের ভেতর তার ঝড়, তুফানের মত কোন বিপর্যয়কারী প্রতিক্রিয়া ছিল না। শুধু একটা প্রশ্নে তার মন তোলপাড় করছিল।

নন্দনকাননে রথ পৌঁছলে দেবরাজ ইন্দ্র স্বয়ং তাকে অভ্যর্থনা করে কক্ষ পর্যন্ত বেশ সমারোহেই পৌঁছে দেবে এরকম একটা প্রত্যাশা ছিল তার মনে। কিন্তু ইন্দ্রের উপস্থিত থাকাতো দূরের কথা, একজন রাজকর্মচারী পর্যন্ত ছিল না। প্রত্যাশায় ব্যথা লাগা চমকানো বিস্ময়ে উর্বশী নিজেই ক্ষতবিক্ষত হতে লাগল। সে যে এখানে আর পাঁচটা সাধারণ রমণীর মত শুধু সুন্দরী এ কথাটা ইন্দ্র আগে ভাগে তাকে বুঝিয়ে দিল। ইন্দ্র জেনে শুনে তার রাজমহিষীব অহঙ্কারকে চূর্ণ করল আগে। নিজের ভুলে গৌরব হারানোর অপমানে উর্বশীর বুক টনটন করছিল। অনুক্ষণ বুকের ভেতর সেই ব্যথাটা বাজছিল।

কিছু ভাল লাগছিল না উর্বশীর। কারণ ইন্দ্রের মনোভাব তার অজানা নেই। একদিন পুরুরবার প্রেমে অন্ধ হয়ে ইন্দ্রকে সে তাচ্ছিল্য করেছিল। পত্রোত্তর দেয়ার সামান্য সৌজন্যটুকুও দেখায়নি। হাতের মুঠোয় পেয়ে ইন্দ্র যদি তার অপমানের প্রতিশোধ নেয় তাহলে তাকে দোষ দেবে না উর্বশী। কারণ এ হল তার পবিত্র প্রেমের প্রতি একজন মানুষের বিশ্বাসঘাতকতার মূল্য। প্রেমে বিশ্বস্ততা এবং আনুগত্যের যে কোন মূল্য নেই এই সত্যটা তার জানা ছিল না। পুরুষমানুষ বড় স্বার্থপর। তার বুকে প্রেম নেই। আছে শুধু লোভ। আগুনের শিখার মত শুধু লক লক করে। সেই লোভের কাছে মেয়েরা নিজেদের সর্বস্ব উজাড় করে দিয়ে শুধু ঠকে আর আঘাত পায়। পুরুষের কাছে নারীদের প্রয়োজন শুধু দৈহিক আর ব্যবহারিক। পুরুষের প্রেম বড় শরীর নির্ভর। কিন্তু দেহটাই যে নারীর সব নয় সেটা প্রত্যেক নারী তার আনুগত্য, বিশ্বস্ততা, নির্ভরশীলতা দিয়ে প্রতিমুহূর্তে বুঝিয়ে দেয়। তবু পুরুষ তার প্রেমের সমাদর করে না, কেন? এই 'কেন' প্রশ্নে তার বুক হাহাকার করে উঠল। বড় শূন্য আর একা লাগল। পরক্ষণেই মনে হল, এই পরিতাপের কোন অর্থ নেই। পরিতাপ করে সমস্যার সমাধান হয় না। তবু একটা শঙ্কা তাকে ম্রিয়মাণ করে রাখল।

কয়েকটা দিন উৎকণ্ঠা নিয়ে কাটল। ধীরে ধীরে ভয় দুর্ভাবনা ফিকে হয়ে এল। একটু একটু করে তার মনটাও বদলে যেতে লাগল। তবু এর ভেতর একবারও ইন্দ্র এল না। ইন্দ্রের ঔদাসীন্যে সে অশান্ত এবং অস্থির হয়ে পড়ল। নিজের রূপের গর্বের উপর তার আঘাত লাগল। মদালস চোখের বঙ্কিম কটাক্ষ, দীপ্ত যৌবনের প্রাণবন্ত উজ্জ্বল দেহলালিমা আর তীব্র যৌবনের আকর্ষণ যে, কোন পুরুষ ভুলে থাকতে পারে, কিংবা উপেক্ষা করতে পারে উর্বশী স্বপ্নেও কল্পনা করেনি। রমণীর শরীরকে নিয়ে যার সব চাওয়া-পাওয়া, সঙ্গ-বাসনা তার প্রতি ইন্দ্রের এই বিতৃষ্ণা তাকে তীরবিদ্ধ পাখির মত যন্ত্রণাক্লিষ্ট করে তুলল। কেমন একটা শ্রান্তিতে দেহ নুয়ে এল। মন যখন বড় বিকল হয় গবাক্ষের ধারে বসে চেয়ে থাকে পিঞ্জরাবদ্ধ পাখির মত অনন্ত নীল আকাশ আর দিগন্তলীন প্রকৃতির দিকে।

উর্বশীর সময় যেন কাটতে চায় না। বড় মন্থর আর বিরক্তিকর প্রহরগুলো আনল না কোন রঙীন মুহূর্তের প্রতিশ্রুতি। নিঃসঙ্গ মুহূর্তগুলি জানলায় দাঁড়িয়ে নিঃশব্দে কাটে। ছন্দহীন দিন, ক্লান্ত বিধুর প্রহরগুলো অসহ্য হয়ে উঠল তার কাছে। প্রশ্নহীন নীরব নিঃশব্দতা তার চারপাশে। এর ভেতর উর্বশী নিজেকে দেখতে পায়। নন্দনকাননের অপ্সরাদের সীমাবদ্ধতা তার মধ্যে নেই। তাদের মধ্যে সে শুধু স্বতন্ত্র নয় এক অন্য উর্বশী। এ উর্বশী কিছুটা ইন্দ্রের তৈরি, আর কিছুটা তার নিজের। ঈশ্বর অবশ্য তাকে রূপ-যৌবন এবং শরীর দিয়েছে। কিন্তু সে তার অভিশাপ না আশীর্বাদ এই প্রশ্নের উত্তর উর্বশীকেই দিতে হবে। তাই সূক্ষ্ম কারুকার্য করা দুঃখ থেকে, মীনা করা সুখ থেকে, খোদাই করা অস্তিত্ব থেকে পালিয়ে এসে দর্পণের সামনে নিরাবরণ হয়ে দাঁড়িয়ে নিজেকে তন্ন তন্ন করে অন্বেষণ করে এবং দেখে কিসে সে আলাদা আর সকল রমণী থেকে, অন্তত নন্দনবাসিনী অপ্সরাদের থেকে।

দর্পণের সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে প্রশ্ন করে কে তুমি? তোমাকে কেন সৃষ্টি করেছে বিধাতা? কার জন্যে তুমি সৃষ্টি হয়েছ? কেন হয়েছ? কত বসন্ত পার হয়ে গেল, জীবনে তবু কার প্রতীক্ষায় আছে এ শরীর? কিসের প্রতীক্ষায়? না, কোন ঘটনার? না-কি কোন পুরুষের? সে পুরুষ কে? পুরুরবা! ইন্দ্র? না অন্য কেউ?

একা থাকলে অনেক কথা মনে হয় উর্বশীর। মনে হল কোনও এক মহান মানুষের প্রতীক্ষা করছে এ যৌবন। যে যৌবন অবগাহনে তিনি দীপ্ত হবেন, দ্যোতিত হবেন, যাঁর দীপ্তি ও দ্যোতনা তাকে বলে দেবে, জানিয়ে দেবে, সে কে, সে কেন? তিনি যেখানেই লুকিয়ে থাকুন দ্যুলোকে অথবা ভূলোকে উর্বশী তার এই ভরা যৌবন দিয়ে ঠিক তাকে চিনে নেবে অন্ধকারে অথবা আলোকে। উর্বশীর মনে হল, সেই মানুষ ইন্দ্র। অমনি সারা শরীরে তার বিদ্যুৎ খেলে গেল। তার চেতনার ভেতর মধুর একটা আবেশ ছড়িয়ে পড়ল। আর সে দু'চোখ বুজে তার এক স্পর্শ সুখ অনুভব করল। মনে হল ইন্দ্র তার হাত স্পর্শ করেছে। তার নরম ঠোঁটে ঠোঁট রেখে সমস্ত স্নিগ্ধ সিক্ততাকে শুষে নিচ্ছে। আর সে ভাল লাগার ভরন্ত কলসের মত ভরে উঠেছে। এই কল্পনাটা তার রক্তের মধ্যে ছলাৎ করে উঠল। কল্পনায় দেখতে লাগল ইন্দ্র তার দেহ সৌরভে, মাধুর্যে, বীর্যে, গৌরবে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। তার নিজের রক্তের মধ্যেও তার কলধ্বনি শুনতে পেল। যার নাম বাসনা। কামনা।

উর্বশীর মনটা এমনিতে ভীষণ অশান্ত এবং অস্থির। কিছুই ভাল লাগছিল না। ইন্দ্রের সঙ্গে তার প্রথম সাক্ষাৎ কেমন হবে এই উৎকণ্ঠায় সে পাগল প্রায় হয়েছিল। কারণ প্রথম সাক্ষাতে নারী পুরুষের জীবনে অনেক কিছু ঘটে যায়। একটা চিরস্থায়ী সম্পর্কর রূপরেখা প্রথম আলাপেই হয়ে যায়। কিন্তু ইন্দ্রের সঙ্গে তার দেখা সাক্ষাৎ, আলাপ-পরিচয় আগেই হয়ে গেছে। সম্পর্ক তিক্ত হওয়ার মতই কোন কথা তাদের হয়নি। তবু একটা দুশ্চিন্তায় তার মন ছেয়ে আছে। নিজেকে দিয়ে তাই নিরন্তর বিশ্লেষণ তার।

ইন্দ্রের চাওয়ার জগৎ কি, —গভীর করে উপলব্ধি করতে চাইল উর্বশী। ইন্দ্রের একাধিক পত্নী, উপপত্নী, বহু সুন্দরী রূপসী নৃত্যগীত পটীয়সী অপ্সরারা আছে। তবু ইন্দ্র তৃপ্ত নয়। তার চাওয়া যেমন অনন্ত, বাসনারও তেমন নিবৃত্তি নেই। অসংখ্য নারীর সংস্পর্শে এসেও ইন্দ্র অতৃপ্ত। এই অতৃপ্তির সন্ধান কোন নারী করেনি। তার মনটাকে আকাঙ্ক্ষাকে কেউ বুঝতে চেষ্টা করেনি। বোধ হয় ইন্দ্রের

ইন্দ্রাণীও করেনি। ইন্দ্রের সেই শূন্যস্থানটি যে পর্যাপ্ত প্রাপ্তিতে ভরিয়ে তুলতে পারবে ইন্দ্র তার গোলাম হয়ে থাকবে। কিন্তু সেই শূন্যতা কি? তার উৎসই বা কোথায়?

ইন্দ্রের সামান্য সান্নিধ্য লাভ করেই উর্বশী টের পেয়েছিল, ইন্দ্র বীর্যের গর্বে, শ্রেষ্ঠত্বের দম্ভে তাকে দাবি করেছিল। তার বীর্যের বাসনার কাছে আত্মসমর্পণ করতে বলেছিল। কিন্তু এ দাবিকে প্রত্যাখান করল উর্বশী। ধিক্কার দিল তার কেশর ফোলানো সিংহনাদ। বিদ্রূপ করল তার পত্রকে। প্রত্যাখ্যান করল তার প্রার্থনা। তবু ইন্দ্র রাগল না, বিরূপ হল না। কেন? এই কেন প্রশ্নের মধ্যেই খুঁজে পেল ইন্দ্রের অন্তরের শূন্যতার রহস্য।

ইন্দ্রের প্রয়োজন ছিল না চঞ্চল বন্যায় টলমলে যৌবনের ঐশ্বর্যভরা শয্যা-সঙ্গিনীর। অন্তত ইন্দ্রের সঙ্গে তার গোপন সাক্ষাতের সময় এই অনুভূতি হয়েছিল। ইন্দ্র চেয়েছিল তেজস্বিনী, ব্যক্তিত্বময়ী রমণী যে ইন্দ্রকে শাসন করবে, হুকুম করবে, মুখের উপর প্রতিবাদ করবে, ভয়ে থেমে যাবে না, মুখরা হবে, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করতে পারে এমন এক রমণীকে খুঁজছিল। তার চোখে উর্বশী ছিল সেই রমণী। সুতরাং তাকে জয় করাই ছিল তার বাসনা।

আসলে ইন্দ্র চায় জয়। জয়ে তার আনন্দ। তাই যা কিছু দুর্লভ, অপ্রাপ্য তাকে তার চাই। সব প্রতিরোধ ভেঙে, বাধা অপসারণ করে সাম্রাজ্য বিজয়ের মত নারীকেও সে জয় করতে চায়। প্রতিবাদ, বাধা, বিরোধিতার দুর্গগুলো জয় করে, ভেঙে, ধুলোয় গুঁড়িয়ে দিয়ে তার বিজয়রথ ধাবিত হয়। প্রতিরোধ যত দুর্জয় সেই খেলাতে তত আনন্দ তার। অন্তত উর্বশীর জীবনে ইন্দ্র তাই করেছে। সে কারণে, ইন্দ্র তার চোখে শুধু বীর্যবান পুরুষ নয়, সে সুন্দরের পিয়াসী। সুন্দরের পূজা, দুর্গমকে জয় করার অনন্ত পিপাসা তার পৌরুষের প্রান্তিক পরিচয়।

পরিচারিকার ডাকে তার ভাবনায় ছেদ পড়ল। দ্বারের বাইরে থেকে পরিচারিকা উৎফুল্ল হয়ে বলল : রানী মা, দেবরাজ আসবেন একটু পরেই।

রানী-মা ডাক শুনে উর্বশীর বুকটা ধক্ করে উঠল। শরীরের মধ্যে একটা কিসের তরঙ্গ বয়ে গেল। কিসের—কে জানে? তারপরেই কান দুটো তেতে উঠল। মনে হল, শরীরের মধ্যে লু বয়ে যাচ্ছে। ভয়মিশ্রিত উত্তেজনায় বুকের ভেতরটা টাটাতে লাগল। জীবনের একটা সুন্দর অনুভূতির মৃত্যুর জন্য আজ তাকে সান্ত্বনা দেবার কেউ নেই। তার পাশে দাঁড়ানোর মত মানুষ নেই। বড় একা লাগল। নিজেকে তার বড় বিপন্ন আর অসহায় মনে হল। অথচ এর জন্য এতটুকু দায়ী নয় সে। পুরুরবার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হচ্ছে তাকে। রাগ হল পুরুরবার উপর। ভীষণ ঘৃণা হল। এই মানুষটা তার জীবনটা নষ্ট করে দিল। একেবারে নষ্ট করে দিল। তীব্র জ্বালার উষ্ণ লু'তে কান্নাটা তার শুকিয়ে গেল। স্বপ্নের কুঠুরী থেকে কে যেন তাকে বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিল। কিন্তু সে কে? নিয়তি?

না মেনে উপায় নেই। নিয়তির কাছে আজ সে হেরে গেল। উর্বশী হেরে গেল তার ভাগ্যের কাছে। যে পাপ-পুণ্যের উপর তার বিন্দুমাত্র হাত নেই, সেই পাপ পুণ্যের কথা ভেবে মনকে কষ্ট দেয়ার কোন মানে হয় না। বরং যা সত্য, বাস্তব এবং নিয়তি নির্ধারিত তাকে মেনে নিয়ে সুখী হওয়া এবং আনন্দ পাওয়ার দাম অনেক।

এই মুহূর্তে পালক পিতা ধনকুবেরের কথা মনে হল : অনেক কিছুর মধ্যে দিয়ে না গেলে পাপ-পুণ্যের অভিজ্ঞতা হয় না। একটা গভীর কষ্টের মধ্যে অনুভব করল শরীর দানের মধ্যে কোন পাপ নেই। পাপ হয় মনে। ভাবলেই পাপ। শরীরে কোন পাপ লাগে না। মনটা স্বচ্ছ থাকলে শরীরের নোংরা ধুয়ে যায় জলের মত। সুতরাং তার এই মনটাকে শরীর থেকে আলাদা করে রাখলে আর কোন যন্ত্রণাই থাকবে না। কী আছে দেহে? দেহ ছাড়া প্রেম কোথায়? দেহ ভোগের একটা মার্জিত, সভ্য-সংস্কৃতি সম্পন্ন নাম প্রেম। দেহদান যদি পতিতাবৃত্তি হয় তা-হলে তো সব জননীই পুরুষের রক্ষিতা। আদিম মায়েরা সবাই পতিতা। আসলে এ-সবই একটা নামের ব্যাপার। মনের ব্যাপার। মন যদি হীরের টুকরো হয় লোকের বলায় তা কাচ হয়ে যায় না।

এই চিন্তাটা খুব বেশিক্ষণ স্থায়ী হল না। তার একমাত্র চিন্তা এখন ইন্দ্র। আজকে কিছু একটা

ঘটাবে সে। অনেক প্রত্যাশা নিয়ে আসছে। তার বুকের ভেতর আকঙ্ক্ষার মেঘ আজ বৃষ্টি নামাবে।

পুরুরবার সঙ্গে তার প্রথম রাত্রি যাপনের স্মৃতি ভেসে উঠল। পুরুষমানুষের ভেতর একটা পাগলামি আছে বাইরে থেকে তা কিছুমাত্র বোঝার উপায় নেই। নারীর শরীরের গন্ধ পেলে তার ভেতরটা মাতাল হয়ে উঠে। কতরকমের পাগলামি যে তখন করে, পরে মনে করতেও ভীষণ লজ্জা হয়। প্রথম রাতে পুরুরবাও তাকে নিয়ে সেইরকম পাগলামি শুরু করেছিল, সেসব স্মৃতি স্বামী-স্ত্রীর কিংবা মৈথুনরত নারী-পুরুষের একান্ত সব নিজের স্মৃতি, প্রকাশ করার নয়। তবু পুরুষের সে পাগলামিতে দলিত-মথিত হতে ভাল লাগে সব মেয়ের। আকুল প্রত্যাশা নিয়ে প্রতিমুহূর্ত প্রতীক্ষা করে সেই ডাক কখন আসবে? নদী হয়ে কখন মিশবে সাগরে? এর ভেতর একটা দারুণ উন্মাদনা আছে। অফুরন্ত প্রাণোল্লাসে ভরা এক দৃপ্ত জীবন। এই পাগলামিতে দুটি হৃদয় পূর্ণ হয়, সুন্দর হয়। এর ভেতর সার্থক হয়ে উঠার একটা সুখ লুকনো আছে। সে সুখের স্মৃতি বিস্মৃত হওয়ার নয়। ভাববারই শুধু।

উর্বশী ভাবছিল নীরবে। এত সব গভীর করে আগে ভাবার সময় হয়নি কোনদিন। আজ মনে হচ্ছে, পুরুষের রক্তে ঘুমিয়ে আছে দুর্বার জয় আকাঙ্ক্ষা। অথচ বাস্তবে প্রতিদিন কতভাবে তাকে নিজের কাছে এবং অন্যের কাছে হেরে যেতে হয়। সেই পরাজয়ের বেদনা, গ্লানি, যন্ত্রণা ভুলতে সে অবৈধভাবে নারীর শরীরে ঢুকে পড়ে। নারীর রক্তমাংসের শরীরটাকে দখল করে সে তার জয়ের গৌরব নতুন করে অনুভব করতে চায় শিরায় শিরায়। তাদের নিজের নিজের হেরে যাওয়ার গোপন লজ্জা থেকে এইভাবে বোধ হয় মুক্ত হতে চায়।

ইন্দ্র কি তাই চাইছে? তা-হলে ইন্দ্রকে শান্ত করবে কি করে?

হঠাৎই পায়ের খস খস শব্দে উর্বশীর বুকের ভেতরটা থর থর করে কেঁপে উঠল। মুখের ভাবও বদলে গেল। এক জ্বালাধরা অনুভূতির তীব্র যন্ত্রণায় শরীরটা শক্ত কাঠ কাঠ হয়ে গেল।

ইন্দ্র আস্তে আস্তে উর্বশীর সামনে এসে দাঁড়াল। তার হেঁট মাথাটা দু'হাত দিয়ে উঁচু করে ধরল চোখের সামনে। উর্বশীর দু'চোখের কোণ ভিজে। জল চিক্‌চিক্‌ করছে। নিজের দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে আছে। ইন্দ্র তাকে খুব কাছে টেনে নিয়ে দু'হাতে তার চোখের জল মুছে দিল। মৃদু হেসে বলল : কান্না উর্বশীকে মানায় না। উর্বশী সৌন্দর্যের প্রতিমা। রূপের শোভা। জীবনের আনন্দ। উর্বশী মানে অনন্ত বাসনার অমৃত প্রেমশিখা।

ইন্দ্রের কথাগুলো ভীষণ ভাল লাগল উর্বশীর। ইন্দ্রের মুখের দিকে তাকাল। ধরা পড়ে যাওয়া চোরের মত বলল : সৌন্দর্য তো শুধু রূপ নয়। অঙ্গের লাবণ্য ছাড়া আরো একটা সৌন্দর্য আছে উর্বশীর। তাকে চোখে দেখা যায় না। হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করা যায়। মনের আলোয় তাকে আভাসিত না করলে সে সৌন্দর্য সুপ্ত থাকে। ফুল হয়ে ফোটে না।

ইন্দ্রের অধরে অনির্বচনীয় হাসি। বলল : অপূর্ব তোমার বিশ্লেষণ!

উর্বশীর চোখের উপর চোখ রেখে মৃদু মৃদু হাসতে লাগল ইন্দ্র। তারপর দু'গালে দুটি হাতের পাতা ছুঁয়ে তাকে স্পর্শ করল। বলল : তুমি আমার উর্বশী। আমার গর্ব, সম্মান, সুখ, অস্তিত্ব, অনস্তিত্ব সব।

উর্বশী দু'হাত দিয়ে ইন্দ্রের হাতটা ছাড়িয়ে নিল। একটু ঠেলে ইন্দ্রকে সরিয়ে দিল। বলল : মেয়েদের নিয়ে পুরুষরা এরকম মন গলানো কথা আবহমান কাল ধরে বলে এসেছে। কোন তফাৎ নেই। সব পুরুষই জংলী। কেশী দৈত্যের সঙ্গে কারো পার্থক্য চোখে পড়ল না। তফাত এই যে, সে আমার অনিচ্ছায় জোর করে হরণ করেছিল, যা সুন্দর তাকে কদর্য করেছিল। স্বেচ্ছায় যাদের কাছে জীবন কাটিয়ে দেব বলে এলাম, ভালত্বের তকমা তাদেরও দেওয়া যায় না।

ইন্দ্র বেশ জোর দিয়ে প্রতিবাদ করল : কক্ষনো না।

উর্বশী ঠোঁট উল্টিয়ে হাসল। তারপর দু'পা এগিয়ে এসে ইন্দ্রের লোমশ বুকের উপর ছোট্ট করে আঙুলের টোকা দিয়ে বলল : খাঁচার পাখি যখন নিজেই ছিন্ন ভিন্ন হতে ইচ্ছে করে তখন বিড়ালের সঙ্গে তার খুব ভাব জমে যায়।

কথাটা ছুঁচের মত বিঁধল। ইন্দ্র বলল : কী বলছ, তুমি নিজেই জান না। বিশ্বাস কর, তোমাকে ভীষণ ভালবাসি। বহু ধৈর্যের পরীক্ষা দিয়ে তোমাকে পেয়েছি। ভালবেসে তোমার কাছে কিছু চাওয়া, পাওয়াকে তুমি কি ডাকাতি বল?

উহুঁ। কালাকে কালা বললে চটে যায়। এটাই নিয়ম। আমার চোখে পুরুষমাত্র জন্ম-ভিখারী। কাঙালের মত হাত পাততে, ভিক্ষে করতে, তাদের কোন লজ্জা ও সংকোচ নেই। মেয়েমানুষ দেখলেই দু'চোখ খিদেয় জ্বল জ্বল করে ওঠে।

ইন্দ্র আশাভঙ্গতায় ছাই হয়ে গিয়ে বলল : আজ তোমার কী হয়েছে বলত?

উর্বশী কথার জবাবে বলল না কিছুই। অবাক হয়ে চেয়ে রইল তার চোখের তারায়। একটুক্ষণ চেয়ে হাত ধরে পালঙ্কে নিয়ে বসাল। যেতে যেতে বলল : দেবরাজ আমার অপরাধ রাখার আর জায়গা নেই। আমার কাছে একটু বসুন। ভাল করে চেয়ে চেয়ে অনেকক্ষণ ধরে আশ মিটিয়ে আপনাকে দেখব।

ইন্দ্র কেমন যেন হয়ে গেল। বোবা স্বরে বলল : আমি কি দেখার মত!

তা জানি না। তবে ভীষণ দেখতে ইচ্ছে করছে।

তারপর অন্যদিকে চেয়ে নিচের ঠোঁট দাঁতে টিপে ধরে বিষণ্ণ গলায় বলল : দেবরাজ, আপনি আমার সব কেড়ে নিয়ে একেবারে নিঃস্ব করে দিলেন। আপনি ছাড়া আমার সত্যিই আর কেউ রইল না। অথচ আপনি আমার কেউ নন। স্বামী বলে দাবি করব সে জোর নেই। আপনার কাছে না হলেও অন্যের চোখে আমি শুধু আপনার রক্ষিতা। কিন্তু এজীবন চাইব বলে তো গোপনে আমি আপনার কাছে আসিনি। অন্ধকার ভাঙতে চেয়েছিলাম। ভুলবশে আপনি দীপটাই নিভিয়ে দিলেন।

কী বলছ তুমি?

কেন, আপনি জানেন না? বাইরে তাকিয়ে দেখুন, এক আকাশ আলোর মধ্যে গাছগুলো সব কেমন মৌন, শান্ত। পৃথিবীটা কী সুন্দর। কোথাও কোন বিক্ষোভ নেই। কিন্তু রাতজাগা পাখির কান্না থেমে নেই। রাতজাগা পাখির মত কেউ কেউ দুর্ভাগ্য নিয়ে আসে। সৌন্দর্যের একেবারে বুকের মধ্যে বাস করেও সেই সৌন্দর্যের কোন দাবীই করে না তারা।

সৌন্দর্যবোধ তো সকলের সমান নয়। তা-ছাড়া একজনের কাছে যা অসুন্দর, অন্যের কাছে তাই সুন্দর। সৌন্দর্যবোধের ধরাবাঁধা কোন সংজ্ঞা নেই। মানুষের যা কিছু সুন্দর অনুভূতি পাওয়া তা নর-নারীর মিলন মধুর নিবিড় সান্নিধ্যে পাওয়া যায়।

কে জানে? ছোট্ট একটা জীবনে অনেক কিছুই অজানা থেকে যায়। সব কিছু জানতে নেই। মেয়েমানুষ বহু পুরুষের সঙ্গে না মিশে একজনের মনের গভীরে যেতে চায়। এই ভঙ্গুর, টসটসে জীবনটাকে নিয়ে সে পুতুল খেলা করতে চায় না।

আমার কথাটা তুমি ঠিক বোঝনি বলেই একথা বলছ।

আপনিও আমাকে বোঝার চেষ্টা করেন নি। তাই যা সস্তা তাকেই মহামূল্য মনে করলেন। পুরুষেরা বড় বোকা। শরীরের গন্ধ পেয়ে তারা বুনো হয়ে ওঠে। সব কিছু শরীরের মধ্যে টেনে এনে সুন্দর সম্পর্কটাকে নষ্ট করে দেয়।

গা-শিরশির করা ভাললাগাময় একটা সুন্দর অনুভূতি হল ইন্দ্রর। তার অধরে স্মিত হাসি। বলল : নারীর সব সৌন্দর্য বিধাতা তার চোখ, মুখ, বুক আর জঙ্ঘায় সৃষ্টি করেছেন। এসব ছেড়ে কোথায় যাবে পুরুষ?

দেহ ছাড়া নারীর আর কি কিছুই নেই! নারীর বুকে পৃথিবীর মমতা, সবুজ শ্যামল বনানীর মত নিবিড় প্রেম। অধরে কথার সুধা। এই মনটাকে জয় করার চেয়ে কি শরীরের আনন্দ বেশি। শরীরের মধ্যে কি আছে? সত্যি কিছু নেই! কিন্তু পুরুষমানুষ নারীর এই মনটাকে বোঝে না, জানতেও চেষ্টা করে না। মুখের সামনে রাখা জাবনাতে গরু যেমন মুখ ডুবিয়ে জাবনা খায়, তেমনি নারীর শরীরে মুখ ডুবিয়ে পুরুষজাতটা একটা মাপা আনন্দ আর সুখ পেয়ে খুশি থাকে।

ইন্দ্র হাসল : তোমার ঐ সুন্দর মনটা কিন্তু শরীরেব মধ্যে বাস করে। শরীর না থাকলে ঐ মনটা থাকত কোথায়?

জানি না।

শরীরের ভালবাসার মধ্য দিয়ে মনটাকে জানতে পেলে এই ভাব-বিলাসিতার ঘোর কেটে যেত। নিজেকে জানা হয় শরীরের মধ্য দিয়ে।

এক ধরনের অপ্রকাশ্য নিষিদ্ধ আতঙ্ক মেশানো অনুভূতির সঙ্গে কি যেন একটা লেগে ছিল। এই অনুভূতির নাম জানে না উর্বশী। এ এক সম্পূর্ণ নতুন অনুভূতি।

ইন্দ্রের শরীর অনেকক্ষণ ধরে ঝড়ে আন্দোলিত হচ্ছিল। বুকটা শরীরের গন্ধে উথাল- পাথাল করছিল। নিঃশ্বাসে আটকে থাকা এক নিষিদ্ধ অথচ তীব্র আনন্দের ভয়ার্ত আভাসে তার ভেতরটা তেতে উঠছিল। কানের পাতা জ্বালা করছিল। সারা শরীরে কেমন একটা জ্বর জ্বর ভাব। বলল : উর্বশী আমার বুকের মধ্যে কি সব জমে থাকা জিনিস মোমের মত রক্তের মধ্যে গলে পড়ছে। তোমার পড়ছে না? একদিন স্বপ্ন দেখতাম, কল্পনা করতাম তুমি দৌড়ে এসে আমার বুকে আছড়ে পড়েছ। আমার বুকের মধ্যে মুখ লুকিয়ে বলছ, চল ইন্দ্র, আমরা পালিয়ে যাই। এই মিথ্যে জীবনের বুকের শূন্য অন্ধকার গহ্বর থেকে অন্য জীবনে আলোকিত প্রান্তরের দিকে। কিন্তু সেই উর্বশী পাষাণ প্রতিমার মত নীরব। কল্পনা আর বাস্তবতার মধ্যে কত তফাৎ। আমার হৃদয় জুড়ে যে ব্যথার ঝংকার উঠছে তা কি তুমি শুনতে পাও না?

উর্বশীর বুক উথাল-পাথাল করে উঠল। একধরনের নিষিদ্ধ আতঙ্ক মেশানো উত্তেজনায় তার হৃৎপিণ্ডের ধক্‌ধক্‌ শব্দটা আরো দ্রুত হল। দুরন্ত উত্তাপে তার শরীরের কোষে জ্বালা ধরে গেল। লজ্জায় সমস্ত মুখখানা রাঙা হয়ে উঠল। কানের লতি গরম হল। ভীষণ আশ্চর্য লাগল উর্বশীর। এরকম কেন হল? কী করে হল? সে তো পুরুষের সংসর্গ পেয়েছে! তবু ইন্দ্রের একটা কথায় দেহটা এত উত্তপ্ত হল কেন? এ তাপ তার কোথায় জমা ছিল যে আগে জানা হয়নি। পুরুরবার ছোঁয়ায় যে শরীর একঘেয়েমিতায় শীতল, নিথর থাকে, সেই শরীর ইন্দ্রের অকপট ভাষণে বরফের মত গলে যাচ্ছে। এমন হয় কি করে?

ইন্দ্র যে কখন জড়িয়ে ধরে তাকে চুমু খেল তার উষ্ণ ঠোঁট দিয়ে শুষে নিতে লাগল তার নরম ঠোঁটের সমস্ত স্নিগ্ধতা সে নিজেও জানতে পারল না। ভাললাগার এক অদ্ভুত অনুভূতিতে ভরে উঠতে লাগল সে। হিমবাহের মত গলে গিয়ে নিঃশব্দে কখন ইন্দ্রের দেহের সমুদ্রে এক হয়ে হারিয়ে গেল টের পেল না।

শুধু মুখে বলল : আঃ কী করছেন। বড্ড লাগছে। ছেড়ে দিন আমায়।

॥ পাঁচ ॥

নন্দনকাননে কতজন অপ্সরা আছে তাদের প্রত্যেকের নাম কি ইন্দ্র জানে না ভাল করে। প্রত্যেক রমণীর ফুটফুটে দুধ সাদা রঙ জ্যোৎস্নার মত মনোরম আর মিষ্টি। দেহত্বক কোমল, মসৃণ এবং লাবণ্যময়। প্রত্যেকের মধ্যে এমন একটা অনাবিল সৌন্দর্য, মাধুর্য এবং বৈশিষ্ট্য আছে যে বার বার দেখেও চোখের মনের কোন ক্লান্তি আসে না। তবু এদের মায়া, মোহ কিংবা রূপের আকর্ষণে ইন্দ্র বাঁধা পড়ল না। অনন্ত কামনা-বাসনা নিয়ে এক রমণী থেকে আর এক রমণীর টলটলে যৌবনের দিকে চলকানো ঝরনার মত উন্মত্ত উৎসারে ধেয়ে গেছে লালসাপ্রিয় ইন্দ্র।

ইন্দ্র তথাপি তৃপ্ত নয়, সুখী নয়। বোধ হয়, সব সুন্দরই শেষ সুন্দর নয়। সব পাওয়া শেষ পাওয়া নয়। এই পাওয়ার ভেতর ছিল না কোন পরিতৃপ্তি। একটা নিয়মমাফিক একঘেয়েমিতে ইন্দ্র কেমন যেন ক্লান্ত এবং বিষণ্ণ। হৃদয়ের সঙ্গে ঝুলে থাকে অপ্রাপ্তিজনিত এক শূন্যতার বেদনা। আর তার জন্যে মন এমন আকুলি বিকুলি করে যে কিছু ভালো লাগে না।

ইন্দ্রের মনে হয় নন্দনকাননের অপ্সরারা বড় সহজলভ্য। বড় কৃত্রিম। জাবনার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা খোঁটায় বাঁধা অসহায় মূক পশুর মত নিয়মবদ্ধ। তাদের কোন ইচ্ছে-অনিচ্ছে, বাধা, আপত্তি, বিরক্তি, প্রতিবাদ বলে কিছু নেই। কেন নেই? এ প্রশ্ন ইন্দ্র করেনি কোনদিন? করলে জানতে পারত দাসীর কোন অধিকার থাকে না। তাকে শুধু প্রভুর মনোরঞ্জন করতে হয়। প্রভুর আদেশ শোনা এবং নির্দেশ পালন করা তার কাজ। অমান্য করা মানে অবাধ্যতা। তাই তাদের শরীরের মন্দিরে ঘণ্টা

বাজে না, শুধু দেহদানই হয়। এ জন্যেই বোধ হয় ইন্দ্রের অগভীর অতৃপ্তির সঙ্গে মিশে থাকে তার নির্লজ্জ পৌরুষের ব্যর্থতার এক হু-হু করা শূন্যতা। আর তখনই গভীর ঘুমে তার চোখ বুজে আসে।

কেন যে আসে ইন্দ্রও জানে। নন্দনকাননের অপ্সরাদের কাউকে বীর্যবলে জয় করেনি। অনুগত রাজা, অনুরাগী বান্ধব এবং পরাভূত নৃপতি নিজ নিজ রাজ্যের সেরা সুন্দরীদের তার মনস্তুষ্টির জন্যে উপঢৌকন দিয়েছে। সুরা আর নারীতে ইন্দ্রের কোন অরুচি নেই। কিন্তু এ সব নারীর উষ্ণ সংস্পর্শ এত উত্তেজনাহীন, আবেগহীন, দ্বিধাহীন এবং শীতল যে রমণে কোন সুখ কিংবা আনন্দ পায় না ইন্দ্র। এই রমণীরা যন্ত্রের মত ইচ্ছে পূরণ করে। মুখে তাদের বিরক্তি কিংবা বিতৃষ্ণা কখনও ফুটে উঠে না। খুশি করার জন্যে মুখ ভরা হাসি সব সময়। ফলে, একটা রমণীকে পাওয়া আর তাকে জয় করাটা এত সহজ হয় যে তাতে আর কোন আনন্দ থাকে না। বিষাদটা তাই অনেক গভীর।

এমন হয় কেন? প্রশ্নটা করবে ভেবেই রম্ভার ঘরে ঢুকেছিল ইন্দ্র। ঘরে পা রাখতে সুগন্ধ নিঃশ্বাসে চোখ বুজে এল ইন্দ্রর। মনে হল পথ ভুল করে কনকচাঁপার বনে ঢুকে পড়েছে। বুক ভরে শ্বাস নিল সুগন্ধের। চোখ খুলে দেখল, দর্পণের সামনে সুন্দরী রূপসী রম্ভা একা প্রসাধনে নিমগ্ন। পরনে তার বস্ত্র ছিল না। স্বচ্ছ মসলিনের ঘাঘরা ফুটে তার কমলা রঙের শরীর দেখা যাচ্ছিল। উর্ধ্বাঙ্গে বসন ছিল না সম্পূর্ণ আদুল গা। ডালিমের মত গোলাকৃতি নরম কোমল বুকের দিকে অপলক চেয়ে রইল। কোষে কোষে তার রক্ত দপদপিয়ে উঠেছিল। এক মুহূর্তে শরীরের মধ্যে কত কি ঘটে গেল। ইন্দ্র নিজেকে সংযত করতে পারল না আর। তার হাঁটু থর থর করে কেঁপে উঠল। কান ঝাঁ-ঝাঁ করতে লাগল। ঝটিতে এত তাপ শরীরের ভেতর জমা হতে পারে যে, জানা ছিল না ইন্দ্রের। ভীষণ আদর করতে ইচ্ছে হল রম্ভাকে।

দর্পণে ইন্দ্রের প্রতিবিম্ব দেখতে পেল রম্ভা। একটুও নড়ল না। নগ্ন বুকে সগন্ধ রেণুর প্রলেপ বোলাতে লাগল নিজের মনে।

ইন্দ্র দর্পণের গায়ে দেখতে পেল রম্ভার ঠোঁটের কোণে টেপা এক রহস্যময় হাসি। যে হাসি শুধু মেয়েরাই সকৌতুকে এবং প্রণয়াবেশে হাসতে পারে। ইন্দ্রের ভেতরটা প্রচণ্ডভাবে এলোমেলো করে দিল। বুকের মধ্যে কেমন একটা ভূমিকম্প ঘটে গেল। কিন্তু সে সব বলার কথা নয়। শরীর দিয়ে শুধু শরীরের ভাষা বোঝাতে হয়। ইন্দ্র আবেগতাড়িত হয়ে রম্ভাকে জড়িয়ে ধরে আদর করল। চুমু খেল মুখে, গণ্ডে, বুকে স্তনের বৃন্তে। বুক উথাল পাথাল করার ভাললাগার উন্মাদনার বিস্ফোরণ ঘটে গেল হঠাৎ-ই। তারপরেই ভেতরের তাপটা একটু কমলে টের পেল, রম্ভা তার বুকের মধ্যে ভয় পাওয়া কপোতের মত কুঁকড়ে গিয়ে কাঠ কাঠ হয়ে আছে। তার শরীরটা বরফের মত ঠাণ্ডা। ইন্দ্রের মনে হল, তার লম্বা চওড়া রোমশ বুকে মুখ ডুবিয়ে বুকের উপর দু'হাত রেখে ঠাণ্ডা শ্বেতপাথরের একটি ফলক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে রম্ভা। অমনি এক ব্যর্থতাবোধের গভীর যন্ত্রণায় আর অনুশোচনায় ছিন্নভিন্ন হতে লাগল তার ভেতরটা। তবু তার যৌন নির্লিপ্ততার মধ্যে এমন একটা পূর্ণতা ছিল যা তাকে আরো অন্য কিছুর সন্ধানে লুব্ধ করে তুলল। নিজেকে আবিষ্কার করার তাগিদে, জানার আকাঙ্ক্ষা বড় তীব্র হয়ে উঠল। সব ভাবাবেগ থেকে এক ঝটকায় নিজেকে মুক্ত করে গোপনতম কথার মত ফিসফিস করে বলল : নিজেকে নিয়ে আমার কৌতূহলের শেষ নেই। তোমার কাছে আমাব কিছু প্রশ্ন আছে রম্ভা।

রম্ভা নিজের এলোমেলো বসনটা গুছিয়ে নিতে নিতে ইন্দ্রের মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকাল। চোখের চাউনিতে বিষাদ ফুটে উঠল।

ইন্দ্র বলল : কোন ইচ্ছে পূরণ হওয়ার মধ্যে যে তীব্র সুখ থাকে, সেই সুখ নিবৃত্ত হওয়ার পর কিছুই পেলাম না মনে হয়। কেমন একটা শূন্য লাগে। কোথায় যেন হেরে যাওয়া পৌরুষের গ্লানি লেগে থাকে। এরকমটা কেন হয় বলতে পার?

ইন্দ্রের মুখে এরকম একটা অদ্ভুত প্রশ্ন শুনে রম্ভা স্তব্ধ হয়ে চেয়ে রইল অনেকক্ষণ। তারপর বেশ চিন্তা করে ঢোঁক গিলে বলল : দেবরাজ, বড় কঠিন প্রশ্ন। জীবন থেকে নেয়া সব প্রশ্নের

জবাব দেয়া যায় না। প্রত্যেক মানুষের জীবনে এমন অনেক প্রশ্ন থাকে যার উত্তর তাকে একা একা দিতে হয়।

তুমি বুদ্ধিমতী। কৌশলে আমার প্রশ্নের জবাব এড়িয়ে গেলে।

দাসীর অপরাধ মার্জনা করবেন। দেবরাজকে সেবা ও পরিতুষ্ট করাই আমার কাজ। আপনার আদেশ মান্য করা কর্তব্য। অবাধ্য হওয়া অধর্ম। বিশ্বাস করুন স্বামী আমি কোন অধর্ম করিনি।

মানুষের মুখ : চোখ দেখলেই তার ইচ্ছে-অনিচ্ছে টের পাওয়া যায়। এটা লুকনোর নয়। তারপর অধৈর্য গলায় বলল : তোমাকে বুকের ভেতর টেনে নিয়ে একটু আদর করলাম আর তুমি ভীরু কপোতের মত ভয়ে কাঠ হয়ে গেলে, তোমার সমস্ত শরীরটা মুক্তির জন্যে ছটফট করে উঠল। আমার আলিঙ্গন তোমার কাছে মধুর লাগল না কেন?

রম্ভার অধরে একটু হাসি ফুটল। বলল : আমি দেবরাজের সামান্যা অনুগ্রহধন্যা। এতবড় জটিল জীবন রহস্যের প্রশ্ন আমার ছোট মুখে মানায় না। দেবরাজের সন্দেহ দূর করার জন্যেই বলতে হচ্ছে, নারীর নিজস্ব কতকগুলো স্বভাব, ধর্ম আচরণ আছে। বিধাতাও তার গতি-প্রকৃতি বোঝেন না। দেবরাজ নিজের স্ত্রীকে যদি বুকে করে রাখেন তা-হলে স্বামীর মনোগত ইচ্ছে জেনেও সে পরম মুহূর্তটির ডাক আসার আগে পর্যন্ত ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করে থাকবে। ভাল যদি বাসেন তা-হলে তাকে নিজের করে পেতে দোষ কোথায়? মনগড়া একটা অপরাধবোধ আর গ্লানি দিয়ে কি প্রত্যাশার নিবৃত্তি হয়?

একমুখ হাসিতে ইন্দ্রের মুখমণ্ডল ভরে উঠল। প্রফুল্ল হয়ে বলল : এর মানে কী?

মানে একটা আছে বৈকি? কিন্তু সে কথা জেনে আপনার লাভ কী?

বলতে তো কোন লোকসান নেই।

কী হবে জেনে?

আমার কৌতূহলে বাধা দিচ্ছ কেন?

দেবরাজ, সে এক লজ্জার কথা। সব নারীর কাছে পুরুষ শুধু শরীরের দাবি করে। যদিও শরীরকে বাদ দিয়ে ভালবাসা নয়। তবু ভালবাসা আর শরীরের মধ্যে বৈরিতার অনেকগুলো স্তর আছে। কিন্তু নারীর সান্নিধ্যে এলেই পুরুষের চোখ থাকে তার শরীরের দিকে। শরীরের দরজা খোলা পাওয়ার জন্য তার ভালবাসা ভালবাসা খেলা। তাই সব নারী একটা ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে থাকে। দুর্গের দরজা শক্ত করে কুলুপ এঁটে দিয়ে সে প্রতীক্ষা করে দ্বার ভেঙে পুরুষ কখন তাকে ছিন্নভিন্ন করবে। পুরুষের শরীরী ভালবাসার যে সচেতন নিষ্ঠুরতা নারী মনের মধ্যে তিল তিল করে পাহাড়ের মত জমিয়ে তুলেছিল, সেই পাহাড়ের মধ্যে পুরুষ প্রবেশ করলে তার ঘুমন্ত কামের আগ্নেয়গিরিতে হঠাৎই অগ্ন্যুৎপাত ঘটে যায়। নারীর জীবনে বিধাতার এ এক কঠিন পরিহাস। বাইরে দেখে তার ভিতরের এই অদ্ভুত পরিবর্তনটা বোঝা যায় না বলে, সব পুরুষ নারীকে ভুল বোঝে। এটাই নারী জীবনের দুর্ভাগ্য।

ইন্দ্রকে একটু চঞ্চল দেখাল। হঠাৎ বলল : আচ্ছা রম্ভা, ইন্দ্রের আলিঙ্গন ভাললাগা এসব কি মিথ্যে?

দেবরাজ এ সব বিচারের অধিকার মনোরঞ্জনকারিণী একজন বারাঙ্গনার থাকে না।

নিজেকে তুমি এত হীন ভাব কেন?

এটাই তো আমার সত্যকার পরিচয়?

রম্ভা আমি তোমাকে ভালবাসি।

দেবরাজের অসীম অনুগ্রহ। তবু সামান্যা অপ্সরার দেবরাজের প্রণয়িণী হওয়ার স্বপ্ন দেখতে নেই। দেখা পাপ নয়, বিড়ম্বনা। তার নিজের জীবনটাই তাতে নষ্ট হয়ে যায়।

তুমি আমাকে বিশ্বাস কর না?

আমার বিশ্বাসের মূল্য কতটুকু দেবরাজ? আপনার অনুগ্রহ গলায় হার করে পরতে পারলেই আমি ধন্য হয়ে যাব। বিনিসুতোর মালার প্রণয়, অনুরাগ কণ্ঠ দিয়ে গলায় না।

রম্ভা আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বলল : আমাকে তুমি ভালবাস?

ভালবাসা কি মুখে বলার জিনিস। ভালবাসা বুকে লেখা হয়। মুখে বললে ভালবাসার গৌরব

ক্ষয়ে যায়। ভালবাসা বলে বোঝানোর জিনিস নয় দেবরাজ।

কোন কথা কি তুমি স্পষ্ট করে বলতে পার না?

কোন অধিকারে বলব? আমার দাবি করারও কিছু নেই। যে প্রেম পরিচয়হীন, গৌরবহীন, দীপ্তিহীন, এই কক্ষেই কেবল থাকে, বের করা যায় না, দিনের আলোয় যাকে প্রকাশ করতে লজ্জা হয়, সেই অন্ধকারের প্রণয় ভালবাসা নিয়ে গর্ব করে বলার কি আছে? তার চেয়ে বরং অন্ধকারে স্বপ্নের জাল বোনা অনেক সুখের। সুখের স্বপ্নে মানুষের কামনা-বাসনা প্রেম যখন ঘুমিয়ে থাকে তখন তার শিবত্ব হয়। অন্ধকারের স্বপ্ন, প্রেম মানুষকে শিব করে দেয়—এই বা কম কী? বলুন?

ইন্দ্র একটু অবাক হয়েছিল। কী যেন ঘটে গেল তার মনের ভেতর। এক দুর্জ্ঞেয় হাসি ফুটেছিল তার মুখে। ছলনা ধরা পড়ে যাওয়ার লজ্জায় অপরাধীর মত মুখ নামিয়ে বলল : তাই-ই? তবে কি জান? যে নিজের দাম জানে না, কিংবা দামটা বাড়াতে পারে না, সে কোনদিনই তার পুরো মূল্য পায় না। নিজের মূল্য এবং মর্যাদা প্রত্যেক মানুষকে নিজের নিজের আদায় করে নিতে হয়। যে তা পারে না তাকে অন্যের অনুগ্রহ, কৃপা নিয়ে বাকি জীবনটা কাটাতে হয়। শুধু সহানুভূতি আর করুণা নিয়ে যে মেয়েরা বাঁচে তাদের মধ্যে গর্বিত হওয়ার মত পুরুষের কোন সুখ লুকিয়ে থাকে না।

দেবরাজ! রম্ভার ভেতরটা আর্তনাদ করে উঠল। ইন্দ্রকে হারাবার ভয়ে বুকের ভেতর মোচড় দিল। চোখের পাতা সহসা ভিজে গেল। একটা লম্বা শ্বাস পড়ল হাহাকারের শব্দ নিয়ে।

মনের অয়নপথ বড় বিচিত্র। মন একবার সরে এলে পুরনো পথে আর ফেরে না। রম্ভা সম্পর্কে ইন্দ্রের কৌতূহল শিথিল হল। জীবনের অনেক সুখ-দুঃখের পথে সে আজও পরনির্ভরশীল। রম্ভা জানে না ভালবাসা কোন লিপ্ততা নয়। ভালবাসাটা প্রয়োজন। ভালবাসা এমন এক আঙ্গিক যা পূরণ না হলে দেহের দিকেই তাকে প্রবলবেগে আকর্ষণ করে। কারণ মনের চাওয়াটা কিছুতে তার নিজস্ব জায়গায় পৌঁছে দিতে পারছে না বলেই প্রতিনিয়ত নিঃশব্দে পৌঁছনোর চেষ্টা করছে এক ভরন্ত উচ্ছল অভিজ্ঞতায়। তবু পাওয়ায় ভরে উঠল না জীবন। কোথায় যেন একটা শূন্যতা ছিল ইন্দ্রের। এই শূন্যতা, অতৃপ্তি বোধ হয় সব পুরুষের জীবনে আছে। কিন্তু কেউ কেউ তা অনুভব করে। আপনাকে আবিষ্কার করার এক তীব্র তাগিদ থেকে ইন্দ্রের মনে হয়েছে সব পুরুষ রক্তে দুর্বার জয়াকাংখা এবং গর্বের উন্মাদনা নিয়ে জন্মায়। এই দুটোর অভাবে জীবনটা বড় ব্যর্থ আর অর্থহীন মনে হয়। এই শূন্যতা পুরুষকে এক নারীতে কখনও সন্তুষ্ট রাখে না। মনের মত নারী পেতে তার জীবন কেটে যায়।

এরকম একটা আকাঙ্ক্ষা নিয়ে জীবনের পথে বেরিয়ে পড়েছিল ইন্দ্র। একদিন তার হদিশ পেয়েও গেল অতর্কিতে। উর্বশী হল সেই নারী যাকে পেয়ে সে অনুভব করল, তার মধ্যে কি ধরনের শূন্যতা ছিল। সেই প্রথম জানল, এতকাল মরুভূমির মত উষর রুক্ষ শীর্ণ কাঁটাগাছের জীবন বুকে করে সে বেঁচে ছিল।

উর্বশী ইন্দ্রের সেই স্বপ্নের নারী। যার মধ্যে একটা অদ্ভুত পরস্পরবিরোধী মন আছে। যে মোটেই সহজলভ্য নয়। কিছু কিছু এরকম নারী থাকে যাদের কোন পুরুষ পুরোপুরি পায় না। উর্বশী সেইরকম এক রমণী। তার ষোল আনা কোন একজন পুরুষের জন্যে নয়। এজন্যে বোধ হয় তার আকর্ষণটা ফুরিয়ে যায় না। তাকে জয় করার উন্মাদনাও শেষ হয় না। উর্বশীর ছিটেফোঁটা সান্নিধ্য, প্রেম নিয়ে যারা খুশি হতে পারল, তারা হল। আর যারা পারল না, তারা তৃষ্ণার জ্বালা নিয়ে নিজের মধ্যে শুধু ছটফট করে। এর ভেতর এক গভীর রোমহর্ষ ভাললাগা আছে। পুরুষের সব উন্মাদনা ওই রহস্যকে ঘিরে। কারণ সে জয় চায়। একজনকে সম্পূর্ণ নিজের করে পেতে চায়।

এই চাওয়ার সংবাদটা গোপন রইল না। নন্দনকাননবাসিনী অন্য অপ্সরাদের চোখে পড়ল। অনেক দিনের অনেক দৃশ্যই অপ্সরাদের অনেকেই লুকিয়ে দেখল। ইন্দ্র ও উর্বশীর প্রথম দিনের সাক্ষাতের দৃশ্যটি একটি ছবির মত মনে আঁকা হয়ে আছে রম্ভার।

অনেকক্ষণ আগে ভোর হয়েছে। জানলার দিকে মাথা করে উর্বশী অঘোরে ঘুমুচ্ছে। প্রভাতের এক আকাশ আলো এসে পড়েছে উর্বশীর অনিন্দ্যসুন্দর মুখের উপর। ইন্দ্র পায়ের কাছে বসে কাঙাল নয়নে তার মুখের দিকে চেয়ে আছে। সে মুখকে ভালবাসা যায় সেই মুখের দিকে অমনভাবে চুপ করে চেয়ে চেয়ে দেখতে বোধ হয় এক ধরনের ভাল লাগে। রম্ভা দেখল, কেমন একটা প্রসন্নতায় ভরে উঠেছে ইন্দ্রের মুখখানি। ইন্দ্রের চোখের চাহনিতে যেন ভোরের স্নিগ্ধতা, কমনীয়তা, পবিত্রতা ফুটে উঠেছে। কী ভাল যে লাগছিল ইন্দ্রকে! ভালবাসা বোধ হয় একেই বলে।

রম্ভা তার ঘর থেকে স্পষ্ট দেখল; ইন্দ্র উর্বশীর পায়ে হাত রাখল। হাত বুলোল। তার হাতের ছোঁয়ায় বোধ হয় গা শির শির করে উঠেছিল উর্বশীর। তাতেই হয়ত তার ঘুম ভেঙে ছিল। চোখ মেলতেই উর্বশী ইন্দ্রকে দেখল। সবিস্ময়ে বলল : দেবরাজ! আমি কি স্বপ্ন দেখছি?

ইন্দ্র বিমর্ষ ভয়ে মুখ আঁধার করে আস্তে আস্তে বলল : সুন্দরী তোমাকে জাগাবো বলে গায়ে হাত রাখিনি। তোমার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে বুকের ভেতরটা ছটফট করে উঠল ভাল লাগায়। বড় ছুঁতে ইচ্ছে করল।

উর্বশী ভুরু কুঁচকে বলল : এ কিন্তু আপনাব ভারি অন্যায়। এরকম চুরি করে একটি ঘুমন্ত মেয়েকে দেখা দেবরাজ ইন্দ্রের মানায় না। এরকম ঘটনা পুনরাবৃত্তি হোক, আমি চাই না। চিরদিনের করে নেবার এক গভীর প্রবণতা নিয়েই প্রত্যেক নারী-পুরুষ একে অন্যের কাছে বড় হয়ে উঠে। সেই সম্পর্কটা বেঁচে থাকে। আপনাকে এর বেশি আর বলতে পারছি না।

লজ্জায় ইন্দ্র রাঙা হয়ে উঠল।

উর্বশীর সঙ্গে ইন্দ্র রোজ একসঙ্গে কাটায়। পাশাপাশি দুটো পালঙ্কে শোয়। তবু উর্বশী মাঝে মাঝে এমন এমন অদ্ভুত আচরণ করে যে তাকে বোঝা কঠিন হয়ে পড়ে ইন্দ্রের। কোন্ সম্পর্কটা সে দারুণভাবে বাঁচিয়ে রাখবে, আর কোন সম্পর্কটাকে কাদার মত পায়ে মাড়িয়ে যাবে আগে থেকে তা বলা যায় না। এরকম একটা দৃশ্য বিদ্যুৎপর্ণাও দেখেছিল।

ইন্দ্র উর্বশীর হাতখানা নিয়ে একটা আলতো চুমু খেল। গা শিরশির করে উঠলে যেমন হাসি পায় সেরকম হাসল উর্বশী। বেশ একটা প্রসন্ন খুশি খুশি ভাবের ছোঁয়া লাগল তার মুখে। ইন্দ্র তাতেই উদ্দীপিত হয়ে ধরা হাতটা নিজের বুকের ওপর চেপে ধরে আদর করল। ইচ্ছে পূরণের তীব্র আনন্দে তার গালে চুমু দিতে ইন্দ্রের মুখ নেমে গেল তার মুখের উপবে। কিন্তু উর্বশী তার মনের ইচ্ছে বুঝেই নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে জানলার ধারে গিয়ে দাঁড়াল। এক আকাশ আলো এসে পড়ল তার মুখের উপর।

ইন্দ্র তার পিছনে এসে দাঁড়াল। কেমন একটা দ্বিধায় আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। হাতটা তার নিশপিশ করছিল একটু ছোঁয়ার জন্যে, কিন্তু সাহসে কুলোচ্ছিল না ইন্দ্রের। মরিয়া হয়ে উর্বশীর কাঁধের উপর মুখ রাখল। দু'হাতে তাকে পিছন দিক থেকে জড়িয়ে ধরল। তারপর এক ঝটকায় তার নিজের দিকে উর্বশীর মুখ ফিরিয়ে নিয়ে অপলক চেয়ে রইল। ইন্দ্রের অধরে বিজয়ের হাসি।

আদরিণী প্রণয়িনীর মত লজ্জায়, ভাললাগায় উর্বশী ইন্দ্রের বুকে মুখ রাখল। তাকে জড়িয়ে ধরে মিশে গেল বুকের সঙ্গে। ইন্দ্র আদরে দু'হাত দিয়ে ওর মুখটা নিজের তৃষিত অধরের সামনে তুলে ধরল; মুখের উপর মুখ নেমে এল ইন্দ্রের। উর্বশী তাকে ঠেলে সরিয়ে দিল। মুহূর্তে তার চাহনি বদলে গেল। নীরব ভর্ৎসনায় জ্বল জ্বল করতে লাগল দুই চোখ।

দারুণ দেখাচ্ছিল উর্বশীকে। ঠোঁটের কোণে তার দুর্জ্ঞেয় হাসি। সে হাসিতে এমন একটা প্রতিবাদ আর নিষেধ ছিল যে ইন্দ্রের ইচ্ছেটা দপ্ করে নিভে গেল। আলিঙ্গন শিথিল হল, হাত স্খলিত হল। উর্বশীর মধ্যে এমন কিছু একটা ছিল যা তার নিজের একান্ত একার।

প্রত্যাশায় ব্যথা লাগা চমকানো বিস্ময়ে ইন্দ্র বলল : প্রিয়তমা তোমার করুণা পেলে যার হৃদয় ভরে উঠত, তাকে অবহেলা করে নিষ্ঠুর হলে কেন?

উর্বশীর অধরে হাসি ফুটল। বলল : ভাললাগা ছাড়া কোন বন্ধন থাকবে না দু'জনের মধ্যে। সম্পর্ক শরীরের টেনে আনলে এই মিষ্টি প্রীতির সম্পর্কটা নষ্ট হয়ে যাবে। শরীরের মধ্যে সত্যি

কিছু নেই। মানুষের যা কিছু সুন্দর, মধুর তা প্রেম-প্রীতির ভালবাসার কোরকে জন্মে। নারী-পুরুষের শরীর একটা জৈব ব্যাপার। প্রয়োজনের ব্যাপার। এর সঙ্গে স্বার্থহীন প্রেমের এক বৈরীতার সম্পর্ক আছে। শরীরকে জড়িয়ে আমাদের সম্পর্কটা অনর্থক জটিল করে লাভ কী? এতে আমাদের সম্পর্কটা টেকসই হবে, এমন মনে হয় না। রম্ভা, বিদ্যুৎপর্ণা সব উজাড় করে দিয়েও দেবরাজের অনুগ্রহধন্যা হল না। মরসুমী ফুলের মতই এল আর গেল। এ সংসারে কেউ কাউকে মূল্য দেয় না। প্রত্যেক মানুষের নিজের মূল্য নিজেকে আদায় করে নিতে হয়। যে তা পারে না তাকে পস্তাতে হয়। পুরুষের বেহিসেবী হতে বাধা নেই, কিন্তু অপব্যয়ের মূল্য নারীকে সারাজীবন ধরে দিতে হয়। শুধু একটা তাৎক্ষণিক সুখ লাভের ইচ্ছেয় নগ্ন হওয়া বড় নোংরা ব্যাপার। সম্পর্কটা একবার নোংরা হয়ে গেলে আর তার দিকে ফিরে তাকানোরও ইচ্ছে থাকে না। রম্ভা, বিদ্যুৎপর্ণা, চিত্রলেখার জীবনে এরকম ঘটনা ঘটেছে। উর্বশী না হয় দেবরাজের জীবনে একটু অন্যরকম হয়ে থাকল।

ইন্দ্র গম্ভীর গলায় বলল : তোমার এই কটু মন্তব্য আমার প্রাপ্য। আমার কোন অভিযোগ নেই। তুমি শুধু আমাকে একটু ভালবাস, একটু বিশ্বাস করে তোমার পাশে স্থান দাও। ইন্দ্র কারো কাছে কখনো ভিক্ষে করেনি, কেবল তোমার কাছেই তার যেটুকু কাঙালপনা।

দেবরাজ আপনি দুর্বল করে দেবেন না আমায়।

আমাকে একটু অন্তর দিয়ে বুঝতে চেষ্টা কর।

আপনিও আমার কথাগুলো একটু হৃদয় দিয়ে অনুভব করলেই টের পাবেন শারীরিক, মানবিক এবং সামাজিক কারণে নারী ও পুরুষ একে অপরের প্রয়োজন। এই প্রয়োজনকে স্থূল সম্পর্ক থেকে আলাদা করে শিল্পিত করে তুলতে হয়। ফুলের তোড়া বাঁধতে গেলে শুধু ফুল হলেই চলে না, তার সঙ্গে মালাকারের রুচিবোধ সৃজনশীলতা এবং কিছু বাহারী পাতা উপকরণরূপে প্রয়োজন হয়। সব মিলিয়ে সেই ফুলের তোড়া হয়ে ওঠে রমণীয়। জীবনের বেলাতেও একই নিয়ম। শরীরের কামনার মত একটা স্থূল চিন্তাকে মালিন্যমুক্ত করে তাকে নান্দনিক লাবণ্যরূপ দেয় মানুষই। দেবরাজ ইন্দ্রকে সে কথা কি মনে করে দিতে হবে?

ইন্দ্র কথা বলতে পারল না। কেমন একটা গ্লানিবোধে তার মাথা নত হয়ে গেল। তার দিকে অপলক তাকিয়ে থাকতে থাকতে উর্বশীর অন্তরটা একটা সুখে ভরে উঠল।

বিদ্যুৎপর্ণার বিস্ময়ের অন্ত নেই। অবাক হয়ে দেখল উর্বশী ইন্দ্রকে সব সময় দূরে দূরে রাখছে, কিছুতে কাছে আসতে দিচ্ছে না, অথচ ইন্দ্র একটুও রাগছে না। কিংবা বিরক্তও হচ্ছে না। পুরুষমানুষকে বেশি কাছে যেতে দেয়ার বিপদ উর্বশী জানে। ইন্দ্রের প্রেম, ভাললাগা যে একধরনের খেলা এটা জেনেই বোধ হয় উর্বশী তার কাঙালপনায় ভুলল না। খেলার জয়টা নিজের অনুকূলে ধরে রাখার যার ক্ষমতা আছে ইন্দ্রের সাধ্য কি তাকে হারানোর?

এরকম একটা চিন্তায় যখন তাকে বেশ প্রফুল্লিত দেখাচ্ছিল ঠিক তখনই ঘটল এক অদ্ভুত ঘটনা।

ইন্দ্রের ভাললাগার নরম মনটা হঠাৎই প্রচণ্ড ফুঁসে উঠল মনের মধ্যে। আর সে তীরবিদ্ধ চিতার মত দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে উর্বশীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। আচমকা ধাক্কাটা সামলাতে না পেরে উর্বশী পালঙ্কের উপর আছড়ে পড়ল। আর ইন্দ্র এক লহমায় তার উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল। শিকারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়া চিতার মত ইন্দ্র বুকের নীচে উর্বশীকে চেপে ধরে শরীরের সঙ্গে লেপ্টে যেতে লাগল। আত্মরক্ষার্থে উর্বশীর হাত সবেগে উঠে আসে ইন্দ্রের মাথায়। চুলের মুঠি ধরে প্রাণপণ শক্তিতে মাথাটা টানা-হেঁচড়া করতে লাগল। ইন্দ্রের বর্বর আক্রমণ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে রীতিমত একটা যুদ্ধ করছিল। তার শক্ত কঠিন মুঠিতে ইন্দ্রের চুল ছিঁড়ে এল। তবু ইন্দ্র ছাড়ল না।

ইন্দ্রের মাথা নুইয়ে এসেছিল উর্বশীর মুখের উপর। উর্বশীর ঠোঁটের উপর মুখ রেখে চুমুতে চুমুতে তাকে কামড়ে ছিঁড়ে ফেলতে লাগল। রক্তের স্বাদে ইন্দ্রের মুখ ভরে গেল। উর্বশীর গলায় আর্তনাদ ফুটল। কঠিন দংশনের মুহূর্তে তার হাতের মুঠি শিথিল হয়ে ইন্দ্রের মাথা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নরম বিছানায় ঝুলে পড়ল। সেই মুহূর্তে ইন্দ্রের আলিঙ্গন আরো কঠিন হল। ধমনীতে তখন তার তরল আগুনের স্রোত। প্রতি অঙ্গে দুরন্ত উত্তাপ দপদপিয়ে উঠছিল আবেগের তীব্রতায়। আর

উর্বশীর সারা শরীর ছটফটিয়ে উঠল। রাগ বিরক্তি-বিতৃষ্ণা সব স্তিমিত হয়ে গেল। খারাপ লাগাটা কখন যে ভাললাগার গোঙানিতে পর্যবসিত হল নিজেও জানতে পারল না উর্বশী।

কতক্ষণ সময় কেটে গেল খেয়াল নেই। আলিঙ্গনের মধ্যে যুগল শরীর সরোবরের মত স্থির। কেমন গভীর টলটলে সুখে ভরন্ত।

হঠাৎ 'খুট' শব্দে ওরা চমকে উঠল। ধড়মড় করে উঠে বসল। দেখল তারা নগ্ন এবং খোলা দরজায় দাঁড়িয়ে আছে বিদ্যুৎলতা। হাতে তার সরবতের গ্লাস এবং বৈকালিক খাদ্য-বস্তু। বিদ্যুৎলতা এ রকম একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখে বিমুগ্ধ হয়ে থমকে দাঁড়িয়েছিল অনেকক্ষণ। হঠাৎ-ই তার শরীরটার মধ্যে কি যেন ঘটে গেল। আর তাতেই হাতটা নড়ে গিয়ে গ্লাসে বাসনে ঠোকাঠুকি হয়ে শব্দ হল। তারপরেই সে নিঃশব্দে ছায়ার মত সরে গেল।

উর্বশীর কোন রাগ নেই। তার চোখের চাহনিতে স্নিগ্ধ লজ্জার সঙ্গে কি যেন একটা নিবিড় হয়ে মিশেছিল। নিজেকে আবিষ্কার করার বিস্ময়ে উর্বশী কেমন যেন উদাস অন্যমনস্ক। সে কোন কথা বলল না। নিঃশব্দে পাশের ঘরে এসে ঢুকল। সেখান থেকেই বলল : বিদ্যুৎলতা আমাদের দু'জনের জন্যে সরবত আর ফলমূল রেখে গেছে।

ইন্দ্র আশ্চর্য বিস্ময়ে উর্বশীর দিকে চেয়ে রইল।

ইন্দ্রর চোখে মুখে গলায় তার নখের চিহ্ন লেগে আছে। ইন্দ্রকে সরবতের গ্লাসটা এগিয়ে দিতে দিতে বলল : ছিঃ কি লজ্জা! বিদ্যুৎলতার কাছে মুখ দেখাব কী করে বলুন তো?

ইন্দ্র অপরাধীর মত বলল : সত্যি কী যে হল আমার! দরজাটা বন্ধ করতেও ভুলে গেলাম। এতে আমার দোষ কী হল? একটু আদর করতে চাওয়া কী অন্যায়।

উর্বশী লাজুক অপ্রতিভতায় বলল : ছিঃ ভারি অদ্ভুত বাজে লোক আপনি। একটুও লজ্জা নেই। যা হওয়ার হয়েছে। এখন ও সব কথা ভাবতেও লজ্জা করে।

ইন্দ্র উর্বশীর হাতের উপর হাত রেখে বলল : বেশ কথা। তুমি সব গোলমাল করে দিলে। আমার রক্তে আগুন জ্বালল কে?

উর্বশী তৎক্ষণাৎ জবাব দিল। আপনি।

ইন্দ্র প্রতিবাদ করল—না, তুমি।

উর্বশী না থেমে বলল : আপনি, আপনি, আপনি। ঈশ্বর জানেন আমার কোন দোষ নেই।

ইন্দ্র হাসতে হাসতে বলল : দোষের কপাল করে এসেছে পুরুষরা। সব অভিযোগ তিরস্কার তাদের একার প্রাপ্য। আর তোমরা নির্দোষ। বেশ আমি দোষী। হয়েছে তো।

কিছুক্ষণ চুপ করে কাটল। তারপর চাদরের উপর আঙুল ঘষতে ঘষতে উর্বশী বলল : মানুষ বোধ হয় নিজেকে সব চেয়ে কম জানে। কার যে কখন কি ঘটে যায় সেও জানতে পারে না। নিজের মনের সঙ্গে একান্তে কথা বলেও বোধ হয় সব উত্তর সব সময় পাওয়া যায় না।

ইন্দ্র বলল : এত জানো, তা-হলে এটুকু বোঝ না কেন যা পেয়ে ধন্য হওয়ার কথা ছিল, তাই পেয়ে তুমি এত বিরক্ত হলে কেন? আচ্ছা, উর্বশী, আমি সত্যি কি অপরাধ করেছি? তোমাকে অপমান করেছি?

উর্বশীর চোখ হঠাৎ ছলছলিয়ে উঠল। ফোঁটা ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল দু'চোখের কোণ বেয়ে।

ইন্দ্র উর্বশীর খুব কাছে সরে এল। তার পিঠে হাত রাখল। দু'হাত দিয়ে চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে টেনে নিয়ে তাকে আদর করল। বলল : লক্ষ্মীটি ভুল বুঝ না আমায়। নিজের আনন্দের একজন নিঃসঙ্গ অভিযাত্রী আমি। নিজের ভেতর নিজেকে পুরোপুরি এই জানার খোঁজ যেদিন আমার থেমে যাবে সেদিন আমি নিঃসঙ্গ হয়ে যাব। হারিয়ে যাব। আমাকে বাঁচতে দাও লক্ষ্মীটি। বড় স্বার্থপরের মত নিজের সুখ চাইছি। বিশ্বাস কর, তুমিও অনন্ত রহস্যময়ী। তোমাকে জানা আমার কোনদিন শেষ হবে না। তোমাকে আমার অনেক স্বপ্ন আর কল্পনার-নারী করে রাখতে চাই উর্বশী।

ইন্দ্রের হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে উর্বশী একা দাঁড়াল। তার ভেতব থেকে বেরিয়ে এল এক ব্যক্তিত্বসম্পন্না আত্মজ্ঞানসম্পন্না এক রমণী। কথা বলার সময় ভুরু কুঁচকে গেল উর্বশীর। বলল

: কারো খেলাঘরের পুতুল আমি নই। নিজের মত করে থাকতে চাই। সেটুকু পেলেই যথেষ্ট।

জানলার সামনে দাঁড়িয়ে বাইরের দিকে চেয়ে হঠাৎ উর্বশীর মন ঘেন্নায় ভরে গেল। বলল : ছিঃ! এই কি প্রেম! বড় বেশি নির্লজ্জ! এত শরীরী কুস্তি? এমন প্রেম তো চাইনি।

কি তুমি চেয়েছিলে? অবাক গলায় প্রশ্ন করল ইন্দ্র।

উর্বশীর মন, মেজাজ, রুচির কথা কি একবারও আপনার মনে হয়নি? প্রেমের মানুষটাকে'ত আগে জানতে হয়। উর্বশী চিরদিন বড় রুচিশীলা, বড় নরম মনের মেয়ে, বড় লাজুক। কিন্তু আপনার দস্যুর মত শক্ত শরীরের নীচে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গেল আমার নরম মন, সরল বিশ্বাস, বহুকালের সংস্কার আর আপনার প্রেমের ভণ্ডামি।

ইন্দ্রের মনে কোন অপরাধবোধ ছিল না। কোন অভিযোগও না। তবে উর্বশীর মনে অনেক গ্লানি জমা হয়ে ছিল। তার দাগ মুছে না গেলে তার মনের চাওয়া বুঝবে না উর্বশী। তাই ভাবল, কথা বলে এই সুন্দর মুহূর্তটাকে নষ্ট করবে না। তবু মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল কথাটা। বলল মনে মনে যাকে গভীর করে ভালবাসা যায় তাকে এমন নিঃস্ব করে পাওয়ার ভেতর যে কি আনন্দ লুকনো আছে তা তুমি জানবে কেমন করে? তুমি তো আর আমাকে ভালবাসনি। মন ছাড়া যেমন ভালবাসা হয় না, তেমনি মনকে বাদ দিয়ে শরীরের দাম নেই কানাকড়ি। শরীর, মন প্রেম একটার সঙ্গে একটা এমনভাবে জড়াজড়ি করে আছে যে এদের আলাদা আলাদা করে দেখা যায় না। এটা একটা অনুভূতি। ঠিক বোঝানো যায় না।

উর্বশী চুপ করে রইল। ইন্দ্রের কথাগুলো তার ভেতরটা গলিয়ে দিল। মনে হল বেঁচে থাকা কী সুন্দর এক অভিজ্ঞতা। সত্যিই শরীরের আনন্দের মধ্যে কোন পাপ নেই; পাপ মনে করলেই পাপ, নইলে কিছুই নয়, বরং আত্মদানের মধ্যে একধরনের পূণ্য আছে। এক অন্যরকম মুক্তি আছে। একঘেয়েমি সব অভ্যাস সংস্কারের হাত থেকে মুক্ত হওয়ার কী অপরিসীম আনন্দ যে বিপজ্জনকভাবে মানুষের প্রকৃতির গভীরে সুপ্ত থাকে তা উর্বশী প্রথম জানল। এই ভাবে জানা তার কল্পনার বাইরে ছিল। মুগ্ধ উর্বশী ইন্দ্রের দিকে অপলক চেয়ে রইল। মনে মনে নিরুচ্চারে বলল : ইন্দ্র জীবনে বাঁচার মানে তুমি নিজে যেমন আবিষ্কার করেছ সাহসের সঙ্গে তেমনি আমার মনেও সাহস এনে দিচ্ছে। তুমি ঠিক বলেছ, শরীরের সাহসটা দস্যুর মত, মনের সাহসটাই সাহস। সেই সাহসের জন্যেই মানুষ গর্বিত বোধ করে। উত্তেজনাহীন অনুতাপহীন অনুযোগহীন পঙ্গু জীবনের ভেতর বেঁচে থাকার কোন আনন্দ নেই। অনুক্ষণ হারানোর ভয় না থাকলে, পাওয়াতে বোধ হয় কোন মজাই থাকে না।

উর্বশীর মনের ঘরে ঘরে আলো জ্বলতে শুরু করল। আস্তে আস্তে সে নিজের জায়গায় এসে বসল। ইন্দ্রের দু'চোখের গভীরে নিজের দুটি চোখ ডুবিয়ে দিয়ে উর্বশী স্থির শান্ত হয়ে রইল। তার চাহনি স্নিগ্ধ এবং কোমল হল। উর্বশীর নাকের নিঃশ্বাস ইন্দ্রের গায়ে লাগল।

ইন্দ্রের দু'চোখে বিস্ময়। অবাক স্বরে জিজ্ঞেস করল কী ভাবছ উর্বশী?

উর্বশীর কোন ভাবান্তর নেই। নিরুত্তাপ গলায় বলল : মনের কথা মনই জানে। মনকে দেখার চোখ ক'জনের আছে? ক্ষিদের মুখে জাবনার মত শরীরটা পেলেই তো আপনার খুশি হবার কথা।

ইন্দ্র মৃদু হাসল। বলল : এ তোমার মনের কথা নয়।

কেমন করে জানলেন?

আমার সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে টের পাই. নারীর অন্তরের কথা।

উর্বশী ঠোঁট উল্টিয়ে হাসল! বলল : নারী নিজের কাছে নিজে সব চেয়ে অনাবিষ্কৃত।

তাই তো তাকে আবিষ্কারের নেশা পুরুষের। পুরুষ নারীকে মন দিয়ে আবিষ্কার করে। হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করে। শরীর দিয়ে জানে।

এত সহজ!

সব নারী নিজেকে যে এত ছোট করে দেখে কেন, জানি না?

নারীর মনের দাম এ সংসারে কতটুকু?

দাম তো নিজেকে নিজে দিতে হয়। নিজের দাম যে নিজে দিতে পারল না, অন্যে তাকে দাম

দেবে কেমন করে? সত্যি বলত : ক'জন মেয়ে নিজেকে দেখতে চেষ্টা করছে? সংসারে নিজেকে তারা বড় অসহায় আর বিপন্ন ভাবে। বড় বেশি পুরুষের মুখাপেক্ষী, তার দয়া করুণা চায়। শুধু এত দুর্বল বলেই এত অবহেলা তার। নারীর এই দুর্ভাগ্যর স্রষ্টা সে নিজে। অথচ ঈশ্বর নারীকে সর্বৈশ্বর্যময়ী করে শক্তিরূপিণী করে সৃষ্টি করল। তবু জন্মভিখারী পুরুষ তার সব লুটেপুটে নিয়ে তাকেই ভিখারী বানাল। জীবনযুদ্ধে শক্তিমানেরই বাঁচার অধিকার। কিন্তু নারীর ক্ষেত্রে তা উল্টো হল। এটাই আশ্চর্য! যে নিজেকে বাঁচাতে শেখেনি অন্যে তাকে মুক্ত করবে কোন উপায়ে?

নিবিষ্ট হয়ে শুনল উর্বশী। এক মুহূর্ত বোবা হয়ে গেল। এত গভীর কথা কারোকে বলতে শোনেনি কোনদিন। মনে হচ্ছিল ইন্দ্রের বুকের উপর মাথা রেখে দু'হাতে তার গলা জড়িয়ে ঠোঁটে ঠোঁট রেখে বলে : ইন্দ্র আমি তোমাকে চাই। আমার সব সম্মান তো তোমার প্রেম। তোমার প্রেমে আমাকে ভরপুর করে তোল। কিন্তু কিছুই বলতে পারল না। কারণ তার নিজস্ব একটা ভাবনাচিন্তার ধরন ছিল, নিজস্ব সিদ্ধান্ত ছিল, একটা মনোভঙ্গিও ছিল। তাই হঠাৎ-ই বিদ্যুৎ চমকের মত তার ভেতরটা উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

ইন্দ্রের মুখের দিকে প্রেমমুগ্ধ নয়নে তাকিয়ে থেকে বলল : ভুল ইন্দ্র, ভুল। নারীর প্রেমের সততা একনিষ্ঠতা এবং আন্তরিকতার অপব্যবহার করেছে পুরুষ। প্রগাঢ় স্নেহ প্রেম মমতায় ভুলে নারী পুরুষকে বিশ্বাস করে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করে ঠকেছে। পুরুষের কাছে বিশ্বস্ততার আনুগত্যের কোন মূল্য পায়নি। প্রেম, মায়া, মমতা, স্নেহ সংসারে বড় করে তুলতে গিয়ে সে নিজের কাছে নিজে হেরেছে। সে হারার ভেতর তার আনন্দ ছিল। কারণ প্রেম মানেই দিয়ে খুশি হওয়া। নারীরা প্রেম দেয় নির্বিচারে, নেবার হিসাব কষে না। তাই একদিন নিজের অগোচরে বিধাতার দেয়া শক্তি হারিয়ে বসল। সেজন্য তাদের পরিতাপ নেই। কিন্তু পুরুষ নারীর প্রণয়ের মূল্য দিল না। নারীহৃদয়ের সূক্ষ্ম স্পর্শকাতর প্রণয়ের কিছু বুঝল না স্থূল আত্মসর্বস্ব দেহসর্বস্ব পুরুষ জাতটা। এটাই হল নারীর বিড়ম্বনা। তার দুর্ভাগ্যের কারণ। যেদিন পুরুষ নারীজাতকে শ্রদ্ধা করতে শিখবে, সেদিন নারীর যথার্থ মুক্তি। কিন্তু সে মুক্তি আসবে না কোনকালে। সম্পর্কটা যে খাদ্য-খাদকের মত।

ইন্দ্র হাসল। বলল : এ হল চিরন্তন নারী পুরুষের ঝগড়া। একে অন্যের উপর দোষারোপ করে আমরা একধরনের তৃপ্তি ও সুখ অনুভব করি। এও এক ধরনের প্রণয়সুখ। আসলে দুটি সৃষ্টিশীল মন সুন্দরকে অন্বেষণ করছে। প্রকৃতপক্ষে তাদের মনটা চাইছে সুন্দরকে লাভ করতে, সুন্দরকে জন্ম দিতে। কারণ তাদের প্রেমে সৌন্দর্যের অভাব আছে। সম্ভোগের পরিতৃপ্তিতে সন্তুষ্ট হওয়া নয় অনন্ত ঐশ্বর্যে দুটি সত্তা ভরে ওঠা। প্রেমের দৃষ্টিতে দেখতে চায় অন্তরাত্মার গোপন সৌন্দর্য ভাণ্ডার, যা জন্ম দেবে এক নতুন সত্যের। নতুন অনুভবের সেই কেন্দ্রবিন্দুটি হল : যদি কাউকে ভালবাস আর সেই দামী ভালবাসাটাকে বাঁচিয়ে রাখতে চাও তা-হলে বিয়ে কর না। বিয়ে করলে প্রেমের ব্যাপ্তি যায় কমে। প্রেম হল সাগরের মত। তার কোন শেষ নেই। দাম্পত্য প্রেমে সাগরের উচ্ছ্বাস কোথায়? উন্মত্ততা কোথায়? বিস্মৃতি কোথায়? প্রেমের কিছু না পাওয়া থাকলে, পেতে চাওয়ার ইচ্ছেটা আসবে কোথা থেকে? ভালবাসার পুকুর শুকিয়ে যাবে। তাই দাম্পত্য জীবনে এক ধরনের ক্লান্তি আছে। রাধাকৃষ্ণের প্রেমে কিন্তু কোন ক্লান্তি নেই। সে প্রেম চিরন্তন। অবিনশ্বর। বুকের মধ্যে যদি হেথা নয় অন্য কোথার নিশির ডাক নেশার মত এক স্থান থেকে আর এক স্থানে প্রেমিক-প্রেমিকাকে তাড়িয়ে নিয়ে না বেড়ায় তা-হলে সে প্রেমের উন্মাদনার রহস্য, উত্তেজনার আনন্দ, আকুলতা কোথায় থাকল? প্রেমের আকুলতাই হল প্রেমের সৌন্দর্য। এই আকুল করা, পাগল করা প্রেমের ডাক যে রাধার মত একবার কানে শুনেছে তার কাছে ঘর বর মিথ্যে হয়ে যায়। এমন মধুর দুঃসহ, সুন্দর, দুরন্ত, দুঃসাহসিক প্রেমের ভাগ্য নিয়ে পৃথিবীতে খুব কম নারী-পুরুষ জন্মে। সেই দুর্লভ নারী-পুরুষ হতে আমাদেরও কোন বাধা নেই উর্বশী।

উর্বশীর কথা বলার মত শক্তি ছিল না। মুগ্ধ দুটি চোখ ইন্দ্রের চোখের উপর পেতে রাখল। জীবনে এমন কূলভাসানো প্রেমের ডাক আসনি কখনো। প্রেমের কোন অভিজ্ঞতা তার ছিল না। বিয়েটা অল্প বয়সে হঠাৎ ঘটে যাওয়া একটা ঘটনা। কিন্তু আজ তার সব ধ্যান-ধারণা ইন্দ্র গণ্ডগোল করে দিল।

প্রেম কখনো অলস, ভীরু কাপুরুষদের জন্য নয়। অসাফল্যের ভয়, অপমানের ভয় থাকলে প্রেম হয় না। দুঃসাহস এবং নির্লজ্জ না হলে আদর্শ প্রেমিক-প্রেমিকা হওয়া যায় না। প্রেমের সৌন্দর্য উপভোগ করতে হলে মুক্ত হওয়া বড় দরকার। বিবাহিত প্রেমের নিরাপত্তা নিশ্চয়তার মধ্যে সত্যিকার প্রেমের কোন গভীর সৌন্দর্য নেই। প্রেমে ধন্য হতে চাই ইন্দ্রের মত কৃষ্ণের মত পুরুষকে। পুরোপুরি চাই।

দুরন্ত আবেগে উর্বশীর বুকের ভেতরটা ভরে উঠল। দু'হাতের পাতা দিয়ে ইন্দ্রের মুখখানা তার চোখের সামনে তুলে ধরল। তারপর দুহাতে জড়িয়ে ধরে তার বুখে মাথা রাখল উর্বশী। বুকের উপর মুখ ঘষল। অনেকক্ষণ ধরে।

একা থাকলেই চিন্তা হয়। মনের জানলায় বসে নিজের সঙ্গে নিজে কথা বলা খুব গভীর এবং সংগোপন কথা। সে শুধু নিজেকে নিজে বলা যায়। এ বলার কোন শেষ নেই যেন। তবু মানুষ নির্জনে নিজের আত্মার মুখোমুখি হয় কখনও কখনও। এ যেন দর্পণের সামনে বসে নিজেকে দেখা। আর নিরুচ্চারে নিজেকে সান্ত্বনা দেওয়া। এটা ভাগ্য। কিছু করাব নেই। ঈশ্বরের হাতেগড়া ভাগ্যের গড়নটাই এরকম। ইন্দ্র তার ভাগ্যের প্রতীক। ঈশ্বর হয়ত ইন্দ্রর জন্যই তাকে সৃষ্টি করেছেন। তাঁর ইচ্ছে ফাঁকি দিয়ে সে পালাবে কোথায়? পালিয়ে বাঁচতে তো চেয়েছিল। কিন্তু পারল কি? ভাগ্য তাকে ফিরিয়ে আনল ইন্দ্রের কাছে। ভাগ্যকে ফাঁকি দেবে কার সাধ্য? ভাগ্যফল ফলবেই। সুতরাং তাকে মেনে নেওয়া এবং মানিয়ে নেওয়া ভাল। তাতে অন্তত দুঃখ পাবার কিছু থাকে না।

মানব ভাগ্য বড় দুর্জ্ঞেয়। তাকে চোখে দেখা যায় না, তার সঙ্গে সংগ্রামও করা যায় না। তবু তার অদৃশ্য প্রভাবে মানুষের জীবনে কত কি ঘটে যাচ্ছে। সামান্য রমণীকে সে রানী করে আবার রানীকে ভিখারী করে দেয়। সুস্থ প্রাণোচ্ছল মানব মনটাকে হঠাৎ পঙ্গু করে দেয়। এই তো ঈশ্বরের হাতে গড়া মানুষের জীবন! এই জীবন নিয়ে মানুষ আত্মসম্মানের বড়াই করে স্বপ্ন দেখে। উর্বশীর অধরে বাঁকা হাসির ঝিলিক খেলে গেল। নিজের মনে উচ্চারণ করল : হায় রে মানুষের ভাগ্য!

একা থাকলেই মনটা অশান্ত হয়ে পড়ে। ক'দিনেই তার জীবনের কেন্দ্রবিন্দুটা বড় বেশি নাড়া খেল। কোন মানুষের কত দুঃসাহস, আত্মবিশ্বাস নিজের উপর আস্থাবান তাই দিয়ে তার শক্তি, সামর্থ্য কিংবা দৃঢ়তার বিচার হয় না। কারণ মানুষ নিজেকে ভাল করে বোঝে না। নিজের মনকেও তার ভাল করে চেনা হয়নি। সত্যি মানুষের মনটা বড় বিচিত্র।

এই মনের ভেতর যে কত অনাবিষ্কৃত জগৎ আছে মানুষ নিজেও তার খোঁজ রাখে না। প্রথায় বাঁধা সংস্কারে বাঁধা জীবনের বাইরেও যে বড় জীবন আছে তা পুরুরবার ঘর ছেড়ে না বেরোলে অনাবিষ্কৃত থেকে যেত। নিজের মন ও দেহের সুখ আনন্দ আবিষ্কার করাটা যে কী অসীম আনন্দের ব্যাপার নন্দন কাননে না এলে বোধ হয় তার জানা হত না। মনের জগতের অজানা মেরুকে প্রত্যেক মানুষকে একা একাই আবিষ্কার করতে হয়। মনের জগতের সব আবিষ্কারই একজন মানুষের চোখের চাওয়ায় আর মনের দোলায় হয়ে যায়।

নাভি থেকে একটা শ্বাস উঠে এল। খুব জোরেই পড়ল। নিঃশ্বাসটা বেরিয়ে যেতেই বুকের মধ্যে হঠাৎ একটা শূন্যতা হাহাকার করে উঠল। নিজের অজান্তেই উর্বশী একবার চমকে উঠল। বিদ্যুৎচমকের মত পুরুরবা ও পুত্র আয়ুর, রজির মুখটি চোখে ভেসে উঠল। খুব অল্পক্ষণের জন্যে। এক গভীর ভাললাগার সঙ্গে মিশে গেল এক গভীর অতৃপ্তি। যে অতৃপ্তি তার একার। যার ভাগ আর কাউকেই দেওয়া যায় না। পুত্র দুটির জন্যে বড় কষ্ট হয়।

মনের ভেতর পুরুরবার কণ্ঠস্বর শুনতে পেল। উর্বশী! প্রিয়তমা কী করছ এখন? আমার কথা মনে পড়ে তোমার? এখনও? সরোবরের স্বচ্ছ সলিলে গা ভাসিয়ে দিয়ে যখন সখীদের সঙ্গে জলক্রীড়া কর কিংবা ইন্দ্রের সঙ্গে একান্তে কাটাও তখন আমার আদর, ভালবাসার স্মৃতি তোমার মনে পড়ে? কষ্টে বুকটা খামচে ধরল। তারপরেই ধিক্কারে ঘৃণায় ভরে উঠল তার মন। নিজেকে ধিক্কার দিল উর্বশী! যে লোকটা কাপুরুষের মত স্বার্থপরের মত নিজের সুখ দেখল, তার কথা মনে করাও পাপ।

ছিঃ ছিঃ, আজ তো এই হেনস্থা তার জন্য। তার কেউ নেই সে একা। তার স্মৃতি, তার স্বপ্ন নিয়ে থাকবে কেন? কী আছে ওর? কিছু নেই। মনে মনে সংকল্প করল, পুরুরবার কথা আর কখনও মনে আনবে না। একদম না।

তাম্বুল আর একমুঠো সুগন্ধী মশলা মুখে ফেলে দিয়ে উর্বশী চর্বণ করতে করতে ভাবল : অতীতের কথা মনে করার কোন মানে নেই। এখনও তার অনেক বড় জীবন পড়ে আছে। তার প্রাণে অনেক ভালবাসা আছে। সুতরাং অন্যের কথা ভেবে নিজেকে নিঃশেষ করবে কেন? যে ভাবে ভাবুক, সে অন্তত ভাববে না কোনদিন। যার ইন্দ্র আছে তার কিসের দুঃখ? ইন্দ্রের প্রাণ ও ভালবাসায় ভরপুর। তাম্বুলের পিক গিলতেই কানের লতি গরম হয়ে গেল! নিজেকে খুব সুখী মনে হল। আরো কয়েকবার পিক গিলল। মনে মনে বলল : কোন জোড়া-তালি দিয়ে জীবনটাকে মিথ্যে, নিরর্থক করে তুলবে না। এখন ইন্দ্র তার জীবনে বাস্তব সত্য। ইন্দ্র তার জীবনের কেন্দ্রবিন্দুতে দাঁড়িয়ে আছে একেবারে জন্মলগ্ন থেকে। এইটেই সরল সত্য তার ভাগ্যে।

নন্দনকাননে নিজেকে তার ভীষণ সুখী মনে হল। এখানে সে মুক্ত। কারো কাছে কোন দায় নেই। এমন কি প্রিয়তম ইন্দ্রের কাছেও না। এখন সে পরী হয়ে গেছে। ইচ্ছে করলেই এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় উড়ে যেতে বাধা নেই। নিজেকে তার ভীষণ সুখী মনে হল। কী পায়নি জীবন থেকে? স্বামী, পুত্র, সংসার, প্রেমিক অন্য পুরুষ সব পেয়েছে। পাওয়ার ঘর তার ভরে গেছে। কিন্তু তবু কোথায় যেন একটা শূন্যতা হু হু করে ছুটে এসে তার নির্জন ঘরটাকে ভরিয়ে দেয়। তখন মনে হয় নারীর শরীরে পুরুষের অনেক কিছুই ঘুমিয়ে থাকে ; তার গলার স্বর, সোহাগের বিদ্যুৎ শিহরন, চোখের চাউনি, শরীরের গন্ধ হাতের উপর হাতের পরশে, গলে যাওয়া শরীরের আবেশ।

শীতের যাযাবর পাখিরা দল বেঁধে অন্য কোথায় নীড় বাঁধার জন্যে উড়ে যাচ্ছিল আকাশ জুড়ে। কতদূর থেকে কোন অজানা দেশ থেকে যে এই সব পাখি উড়ে আসে কে জানে? তবু এরা পথ চিনে চিনে ঠিক আসে এবং চলে যায় । এক জায়গায় পড়ে থাকা এদের জীবন নয়। এরা বাঁচতে জানে। ওদের দিকে তাকিয়ে উর্বশীর মনটা ব্যাকুল হয়ে উঠল। আরো ভাল করে ওদের দেখবে বলে জানলার দিকে উঠে গেল। উঠতে গিয়ে দেখল ইন্দ্র তার পিছনে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। তার দুটি চোখ তার চোখের উপর স্থির। দু'জনে দু'জনের দিকে এমন করে চেয়ে রইল যেন একটুও চোখ উপচে বাইরে পড়ে নষ্ট না হয় সেই সুখ। উর্বশী এই চাউনির অর্থ জানে।

কিছুক্ষণ অপলক চেয়ে থেকে চোখ ফেরাল। বলল : একি? আপনি! কখন এলেন? সত্যিই আপনাকে নিয়ে আর পারি না। আসার একটা সময় থাকা দবকার। এটা বোঝেন না? কী লজ্জা বলুন তো?

লজ্জা? লজ্জা কিসের?

ও আপনি বুঝবেন না। একজন মেয়ে হলে বুঝতেন।

ওঃ। অমন তন্ময় হয়ে কী ভাবছিলে?

কত কী ভাবার আছে? সব কথা কি সকলকে বলা যায়? বলতে নেই।

উর্বশী আমাকে বোধ হয় তুমি মানিয়ে নিতে পারনি?

এখন ও সব কথা বলার মানে হয় না।

তা-হলে কিসের লজ্জা?

এই নন্দন কাননে কত অপ্সরা তো আছে। তাদের সকলের সঙ্গে দেবরাজের একটা সম্পর্ক ছিল এবং আছে। তাদের না খুঁজে প্রকাশ্য দিবালোকে দেবরাজ যদি রোজ তাদের চোখের উপর দিয়ে আমার গৃহে আসেন তবে সেই আসাটা অন্যদের চোখে বড় লজ্জার ব্যাপার হয়ে ওঠে।

এ লজ্জার অর্থ বুঝি না। তোমার ঘরে আসতে আমার এত ভাল লাগে কেন?

কী জানি? এই কথাটা সেদিন রম্ভাকে জিজ্ঞেস করলাম।

বললে কী?

বলল, এটা সব পুরুষের ভাললাগা ভাললাগা খেলা। ইন্দ্রকে ভালবাসা বড় ভয়ের উর্বশী।

তোমার কি মনে হয় ভাললাগা ভাললাগা খেলার নেশায় তোমার কাছে আসি? ললনা প্রিয় আমি সত্যিই। কিন্তু তোমার কাছে সব ফেলে পাগলের মত ছুটে যে কেন আসি, নিজেও জানি না।

হাসি হাসি মুখে উর্বশীর একটা সপ্রতিভ ভাব। বলল : আমিও ভাবি, কেন যে এমন করে আসেন! এত কষ্ট করে। কী যে আপনি দেখলেন আমার মত একজন সাধারণ মেয়ের ভেতর সে আপনিই জানেন।

ইন্দ্রের মুখ একেবারে কালো হয়ে গেল। অন্য কেউ হলে বলত : সে আপনার অনুগ্রহ। কিন্তু উর্বশী বলল সম্পূর্ণ অন্য কথা। এ রকম কথা উর্বশী বলতে পারে আশা করিনি ইন্দ্র। প্রত্যাশায় ব্যথা লাগা চমকানো বিস্ময়ে উর্বশীর মুখের দিকে চেয়ে রইল। উর্বশীর পাশে বসল। তার হাতটা নিজের হাতে নিয়ে নাড়া-চাড়া করল। উল্টে-পাল্টে দেখল। কী নরম আর কোমল হাত। বুকের উপর চেপে ধরে চোখ বুজল আরামে। বলল : তোমার হাতে জাদু আছে। বুকে যত জ্বালা ছিল সব নিভে গেল এই স্পর্শেই।

উর্বশীর অধরে টেপা হাসি। কৌতুক করে বলল ঃ এরকম করে কত মেয়ের কত হাত বুকে রেখে বলেছেন হৃদয় জুড়িয়ে গেল। তবু পোড়া বুকের আগুন নিভল না। নতুন মেয়ের সংস্পর্শে এলে বুকের আগুন দপ করে জ্বলে উঠে। এর কোন সময় অসময় বলেও কিছু নেই।

ইন্দ্র চমকে তাকলে উর্বশীর দিকে। কিন্তু সে রাগল না। ভুরু কুঁচকে ভাবল কিছুক্ষণ। এক ধরনের তীব্র ও গভীর বিষণ্ণতাবোধে তার কণ্ঠস্বর ভারি হয়ে গেল। বলল : আমাকে আঘাত করে কথা বললে তোমার খুব আনন্দ হয়, তাই না? আচ্ছা উর্বশী তোমার মন বলে কি কিছু নেই? কেন আমি পাগলের মত তোমার কাছে আসি? কি চাই, কেন চাই এ সব তুমি বোঝ না? তোমার প্রতি আমার ভাল লাগাটা, ভালবাসাটা একটু অন্যরকম। ভালবাসার অনেক দাবির মধ্যে একটা ছোট্ট দাবি যে আমার হৃদয়ে লুকনো ছিল, জানা ছিল না। আমিত্ব প্রকাশটা এক একজনের এক এক রকম। আমার আমিটা নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে গিয়ে অনেক মেয়ের জীবন নষ্ট করে দিয়ে এই প্রথম জানলাম কেউ আমাকে জোর করুক, আমাকে জ্বালাক, আমার সব অহংকার ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো করে দিক, আমাকে পরাধীন করে রাখুক তা-হলেই আমার মুক্তি।

ইন্দ্র উর্বশীর দু'গালে দুটি হাতের পাতা ছুঁইয়ে মুগ্ধ চোখে চেয়ে বলল ঃ উর্বশী বিশ্বাস কর তুমি আমার সব। তুমি আমার সুখ, দুঃখ, আনন্দ, বেদনা, আমার জীবন, মরণ, অস্তিত্ব, অনস্তিত্ব।

উর্বশীর দু'চোখে বিস্ময়। আঙুলের ছোঁয়ায় তার শরীর সির সির করে উঠল। বুকের ভেতর কি যেন তার গলে গলে পড়তে লাগল। বলল : ছিঃ ছিঃ একি কথা বলছেন আপনি? নিজেই বোধ হয় জানেন না।

ঠিকই বলছি। আমার শূন্য বুকের জ্বালাটা যে কি তা আমি নিজেও বোধ হয় ভাল করে বুঝি না। অথচ একটা দাহ আছে তার। আত্মশ্লাঘায় বেঁচে থাকা নয়, হেরে যাওয়ার সুখে সুখী হওয়ারও একটা অর্থ আছে। একজনের কাছে পরাধীন হয়ে থাকার মধ্যে একধরনের আনন্দ আছে।

উর্বশীর ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটল। বলল : আপনি আমার কেউ নন। আপনাকে কোনদিন নিজের বলে দাবিও করতে পারব না। তবু আপনি ছাড়া আমার সত্যিই কেউ নেই। সত্যি কেউ নেই। গলাটা তার কান্নায় বুজে এল।

হারিয়ে গেল উর্বশী নীল চোখেব গভীরে। মনে হল কি যেন এক অনির্বচনীয় আনন্দ সলিলে ডুবে রইল সর্বক্ষণ। নদী যেমন সাগরের বুকে মিশে গিয়ে পূর্ণ হয়, তেমনি ইন্দ্রের বিশাল পুরুষবক্ষে নিজেকে নিষ্পেষিত করার প্রবল উল্লাসে উত্তেজনায় সে যেন কেমন হয়ে গেল। মনে হল এরকম একটি পুরুষকে সে অন্তরে ভীষণভাবে চাইছিল। যে তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারবে, কেড়ে নিতে পারবে এবং তার সব আকাংখাকে ভরে দিতে পারবে অনন্ত প্রত্যাশায়। ইন্দ্র তার সেই স্বপ্নের মানুষ।

শুরু হল উর্বশীর নতুন জীবন। মনের সব কামনা উজাড় করে ইন্দ্রের প্রেম সরোবরে ডুবে থাকল।

ভুলে গেল একদিন এই মানুষটিকে মনে মনে বরণ করে নেওয়ার চিন্তায় কত প্রহর তার যন্ত্রণায় কেটেছে। নন্দনকাননকে মনে হয়েছে একটা কয়েদখানা। একবার এই কুটীরে ঢুকলে জীবনের সব

কিছু নিঃশেষে দিয়ে-ফেলে একেবারে নিঃস্ব হয়ে যেতে হয়। উদ্বৃত্ত বলে কিছু থাকে না কোন মেয়ের জীবনে। তাই সব নারীই ঘেন্না করে এই জীবনকে। রম্ভা, বিদ্যুৎলতা, সুকেশী, বিদ্যুৎপর্ণা নন্দনকাননে দিব্যি বেঁচে আছে, খাচ্ছে-দাচ্ছে কাজ করছে, হাসছে, ফূর্তি করছে, কিন্তু সব কিছুর মধ্যে একটা লুকনো ব্যথা, কুরে কুরে খেয়ে যাচ্ছে তাদের ভেতরটা। ঐভাবে আত্মসম্মান হারিয়ে বাঁচাকে বাঁচা বলে না। শুধু নিঃশ্বাস প্রাশ্বাস ফেলে বেঁচে থাকলে কি বেঁচে থাকা বলে? ইন্দ্রের রক্ষিতা হয়ে বাঁচাও এক ধরনের মৃত্যু। এই মৃত্যু দৈহিক ও মানসিক। প্রতিদিন আত্মিক যন্ত্রণায়, তুলোপেঁজা হয়ে তিল তিল করে মরার চেয়ে আত্মহনন করে মরা অনেক সুখের। দৈহিক কষ্ট যা পাওয়ার তা একেবারেই ভোগ করতে হবে তাকে। তারপরে চিরশান্তি।

উর্বশীর বাঁচার বড় সাধ ছিল। কিন্তু সেই প্রত্যাশা ইন্দ্র এমন করে ভরিয়ে দিল যে আত্মহননের ইচ্ছেটাই মরে গেল। কারণ, মানুষ জীবনযুদ্ধে জিততে চায়। যে কোনভাবে জেতাও জেতা। অভিশপ্ত ভাগ্যকে শত দুঃখের ভেতর পায়ে পায়ে মাড়িয়ে এগিয়ে যাওয়ার মধ্যে একধরনের জয়ের আনন্দ আছে। এই আনন্দের আকর্ষণে সে ভুলল আত্মহননের ইচ্ছে। মন খুব খারাপ করলে নিজেকে সান্ত্বনা দিতে নিরুচ্চারে বলত : সব কিছুর মধ্যে দিয়ে না গেলে জীবনের পরিপূর্ণতা আসে না। একটাই জীবন! এক জীবনে একজন মানুষের কাছে সব চাওয়া পূর্ণ হয় না। অথচ মনের কোণে, শরীরের ভেতর কতরকম চাওয়া লুকিয়ে থাকে। সব চাওয়াকে জানার দরকার আছে। প্রত্যেকটি চাওয়ার স্বাদ, গন্ধ আলাদা আলাদা। সেজন্যেই বোধহয় মানুষ বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে দিয়ে যেতে চায়। এক জীবনে অনেক কিছু অভিজ্ঞতা নিয়ে সুধন্য হয়ে ভরপুর হয়ে চলে যাওয়ার মত আনন্দ আর কিছুতে নেই? তাই বেঁচে থাকার এত তৃষ্ণা!

এখন আর কোন সংকোচ নেই উর্বশীর। নিজের কাছে তার কোন কৈফিয়তও নেই। শরীর যখন শরীরের সঙ্গে উন্মাদনার কথা বলে তখন সব লোকভয় সংস্কারের ছুটি। শরীরের মধ্যে যে কতরকম আনন্দ, সুখ, উল্লাস, উত্তেজনা, অস্থিরতা লুকনো ছিল তা পুরুরবার সঙ্গে অনেক বছর ঘর করেও সে জানে নি কখনও। পরিতৃপ্তির সুখে স্বামী ছাড়া অন্য একজন পুরুষের কাছে নিজেকে এমন করে আগে হারিয়ে ফেলেনি কখনও। ইন্দ্রের চাওয়া পাওয়া আকাঙ্ক্ষা সব কেমন অন্যরকম।

উর্বশীর জীবনটাই উল্টোপাল্টা। নিজের চাওয়া পাওয়াটাও বোধহয় সে ভাল করে জানে না। নিজের ভাগ্যের কাছে কোনদিন সে হারতে চায়নি। ভেবেছিল, নিজে হেরে না গিয়ে ইন্দ্রকে হারানো সহজ হবে। কিন্তু ইন্দ্রও হারতে চায় না। অথচ দু'জনে দুজনকে মনে মনে হারিয়ে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু কে জিতল, কে হারল তার হিসাব করতে গিয়ে উর্বশী সব গুলিয়ে ফেলল। এখন মনে হয়, ইন্দ্রের কাছেই সে হেরে বসে আছে। হয়ত এই হেরে যাওয়াটা তার সবচেয়ে বড় জেতা। কে জানে? মানুষের জানার জগৎটা প্রতিদিন বদলে যায়। একদিন যা অভ্রান্ত, নিশ্চিত এবং সত্য বলে মনে হয়েছিল পরে তাকেই ভ্রান্তি বলে মনে হল। তবু এই হারার ভেতর কোথায় যেন একটা সুখ লুকনো ছিল উর্বশীর। এ যেন দুটি হৃদয়ের বন্ধন। উদ্দাম বাসনা কামনার কাছে সমস্ত ডানা মেলে ওড়ার আকাশ যেমন পেল, তেমনি প্রেমের ঘরে ডানা গুটিয়ে বসতে পারল।

॥ ছয় ॥

বরুণের সঙ্গে ইন্দ্রের সম্পর্ক প্রীতির নয়, আনুগত্যের। স্বার্থের সম্পর্ক যতদিন থাকবে ততদিন এই আনুগত্য থাকবে। প্রবল অসুর ভীতিই খণ্ড খণ্ড দেবরাজ্যগুলিকে রাজ্য ও সিংহাসনের অস্তিত্ব রক্ষার্থে ঐক্যবদ্ধ করেছিল। প্রবল পরাক্রান্ত অসুর শক্তিকে প্রতিহত করতে তারা যৌথ সামরিক শক্তির মধ্যে একটা সমন্বয় ঘটিয়েছিল। যার যা শ্রেষ্ঠ বল তার সেই বল বা শক্তি দিয়ে দেববাহিনী গঠন করা হল। অধিনায়কত্ব করার ভার দেওয়া হল ইন্দ্রকে। কিন্তু ইন্দ্রের মতন একজন উচ্ছৃঙ্খল ইন্দ্রিয়পরায়ণ, সোম-রসপায়ী রাজাকে এরকম গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব অর্পণের বিপক্ষে ছিল মিত্র ও বরুণ। কিন্তু বিষ্ণু ও আদিত্যের প্রবল সমর্থনে ইন্দ্রের তত্ত্বাবধানে এবং কার্তিকের সেনাপতিত্বে অসুর বিরোধী দেববাহিনী গঠিত হল। তবে প্রত্যেকেই স্ব-স্ব রাজ্যের নিরাপত্তার স্বার্থে সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করতে

পারবে। মিত্র ও বরুণের এই শর্তটি ইন্দ্রের দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে থাকল। মিত্র ও বরুণের উপর সেই থেকে ইন্দ্রের সন্দেহ প্রবল হল। প্রাধান্য ও নেতৃত্ব হারানোর একটা ভয়ও তার মনে ছিল। তাই এদের দু'জনকে সন্তুষ্ট রাখাই ছিল তার নীতি।

ইন্দ্রের নিজস্ব গুপ্তচর বাহিনী ছিল। তাদের কাজ ছিল গোপনে সংবাদ সরবরাহ করা। কে, কোথায় কীভাবে শক্তিশালী হয়ে উঠছে সেই খবর ইন্দ্রকে তৎক্ষণাৎ দেওয়া। সম্প্রতি মিত্র ও বরুণের গভীর মিত্রতা এবং পুরুরবার সঙ্গে ইন্দ্রিয়ত্রাস দৈত্য বংশের প্রহ্লাদের ঘনিষ্ঠতা ও মাখামাখি ইন্দ্রকে শান্তিতে থাকতে দিল না। এরা একত্রিত হয়ে ইন্দ্রের উপর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য যে তৈরি হচ্ছে না, কে জানে? কারণ প্রতিশোধ নেওয়ার প্রবণতা মানুষের রক্তে আছে। এক সত্তার সঙ্গে আর এক সত্তার কিংবা পছন্দ-অপছন্দ, ইচ্ছা-অনিচ্ছার দ্বন্দ্ব বাধে তখন মানুষ নিজের উপরেই প্রতিশোধ নেয়। এ তো ক্ষমতার দ্বন্দ্ব। কর্তৃত্ব ও প্রাধান্য নিয়ে সংঘাত। সুতরাং এই বিরোধ, বিদ্বেষ, প্রকাশ্য শত্রুতায় পরিণত হওয়ার আগেই কিছু করার আছে। শত্রুকে তার নিজের অস্ত্রে অকেজো করে রাখাই হল শ্রেষ্ঠ কূটনীতি।

সেই কূট রাজনীতির খেলা শুরু হল ইন্দ্রের খুব গোপনে, সতর্কতায় এবং মন্থর চক্রান্তে। একার্যে নিশ্চিত সাফল্যের লাভের উপায় হল উর্বশী। কারণ, মিত্র ও বরুণ উভয়েই উর্বশীকে মনে মনে কামনা করে। পুরুরবা এখনও তার স্ত্রীকে ভুলতে পারেনি। সুতরাং উর্বশীকে দিয়ে এক ঢিলে দুই পাখি বধ করা কোন অসম্ভব কাজ নয়। সবচেয়ে যা শক্ত তা হল উর্বশীকে রাজি করা।

উর্বশীকে অন্যের উপগত হতে বলার কোন মুখ নেই তার। কোন মুখে এসব কথা উচ্চারণ করবে? কেমন করে করবে? তার সম্পর্কে উর্বশীর নরম মনে যে অনেক শ্রদ্ধা, মহৎবোধ ও বন্ধুত্ব জমা হয়ে আছে, তাকে নোংরা স্বার্থে ব্যবহার করলে সে আর কখনও তার মুখদর্শন করবে না। উর্বশীর নিজস্ব বিশ্বাস এবং ধারণার ভিত নড়ে গেলে হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়বে তাদের সম্পর্কও।

মুশকিল হল উর্বশী আর পাঁচজন অপ্সরার মত নয়। একটু আলাদা। ভারি অদ্ভুত এক নারী। ইন্দ্রর এখনও সম্পূর্ণ করে বোঝা হয়নি তাকে। সে সত্যিই তার বিস্ময়! কখন কী ভাল লাগে— আর কখন কী করে ফেলে তার ইঙ্গিত আগে থেকে বোঝার কোন উপায় নেই। অত্যন্ত খামখেয়ালীপনা আর আবেগে সে চালিত। আবেগ ছাড়া উর্বশীর কাছে জীবন অর্থহীন। জীবনের সব সুর লুকিয়ে আছে ঐ আবেগের ভেতর। আবেগের পুকুর শুকিয়ে গেলে বেঁচে থাকার কিছু থাকে না। বেঁচে থাকার জন্য এই আবেগটুকু যে বুকের মধ্যে বাঁচিয়ে রাখতে চায়, তাই বোধ হয় প্রচণ্ড অনীহা নিয়ে যে মেয়ে একদিন রথে করে নন্দনকাননে এসে উঠল, ইন্দ্রকে যে সারা অন্তর দিয়ে ঘৃণা করল, প্রত্যাখ্যান করল, নন্দনকাননে পৌঁছে সে ভুলে গেল তার বিরক্তি, বিতৃষ্ণা, ক্রোধ। ইন্দ্রের সঙ্গে ভোগ-বিলাসের সমুদ্রে গা ভাসিয়ে দিল, সে শুধু সুন্দর আবেগ-সর্বস্ব মনটাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য। আর কেউ না জানলেও ইন্দ্র জানে, উর্বশী তাকে সত্যি এখন ভীষণ ভালবাসে। তার ভালবাসায় কোন খাদ ছিল না। সেই অগাধ ভালবাসার স্রোতে ভাসতে ভাসতে প্রায়ই একই কথা বলত। বলে গর্ব অনুভব করত। এই গর্বটুকুই বোধ হয় উর্বশীকে বাঁচিয়ে রেখেছিল।

ইন্দ্রের কানে মধুর স্বরে সেই কথাগুলো ঝংকৃত হয়। —জানেন দেবরাজ নিজেকে আমার খুব ভাগ্যবান মনে হয়; যখন ভাবি একটা দেশের মানুষের মঙ্গলের জন্য, কল্যাণের জন্য আমি নিজেকে উৎসর্গ করিছি। তাদের মুখে সেই পরিতৃপ্তি ছবি আমার চোখের সামনে যখন ভেসে ওঠে, পুলকে আমার সর্বাঙ্গ শিহরিত হয়। দেখুন আমার ত্বকে কেমন কাঁটা দিয়েছে। জানেন নিজেকে উৎসর্গ করতে পারার একটা আলাদা সুখ আছে। আমার বোধ হয় আহুতি দেওয়ার জন্য জন্ম। সেই জন্ম আমার সার্থক হয়েছে। এখন আমার কোন অভাব নেই, দুঃখ নেই। একটা ছোট চারাগাছের মত আপনার মত একটা মহীরুহের ছায়াতলে আশ্রয় নিয়ে বেঁচে আছি যখন ভাবি, এক অন্যতর পুলক তখন আমাকে আবিষ্ট করে। মনে হয় আমি রম্ভা, বিদ্যুৎপর্ণার চেয়ে কত সার্থক, কত ধন্য আমার জীবন। তবু মাঝে মাঝে কেমন ভয় করে। সত্যি যদি আমাদের প্রেম-সাগরে রাজনীতির তুফান ওঠে তাহলে কী করে ঠেকাবেন আপনি?

ইন্দ্র হঠাৎ খুশির মধ্যে ভয়ে কেমন যেন বিবর্ণ হয়ে যেত। বলত : এরকম উদ্ভট কথা তোমার মনে হয় কেন? আমাকে তুমি বিশ্বাস করতে পারছ না?

না, তা নয়। একদিন আমাদের দুজনের সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল রাজনৈতিক কারণে। রাজনীতির হলাহলকে প্রেমের অমৃত করতে আপনার অবদানও কম নয়। তবু বলতে ইচ্ছে করে একদিন আপনার সব আবেগ-উচ্ছাস শেষ হবে, হয়ত ভালবাসাও নিঃশেষিত হবে। অধিকাংশ পুরুষেরই তাই হয়।

না, সুন্দরী, এ তোমার অমূলক ধারণা। আমৃত্যু তোমাকে আমি ভালবাসব এই অঙ্গীকার তোমার কাছে করছি।

উর্বশী অপূর্ব হাসল। কৌতুকের হাসি। বলল, কোনদিন যদি অঙ্গীকার ভঙ্গ হয় তা হলেও আমার ঝগড়া করার কিছু থাকবে না। কোন পরিচয়ে দাবি করব? আমি তো আর বিয়ে করা বউ নই। যা পেলাম সে তো ঢের। ভালবাসা তো আর সীমিত নয় যে, একজনকে নিয়েই নিঃস্ব হয়ে যাবে জীবন? এক জীবনে বোধ হয় একাধিক মানুষকে ভালবাসা যায়। একাধিক মানুষকে ভালবাসার ক্ষমতা প্রত্যেক নারী-পুরুষের আছে, সেটা বোধ হয় বিশেষ অবস্থায় না পড়লে কারো জানা হয় না। মানুষ নিজে সব চেয়ে অনাবিষ্কৃত। জীবনকে জানার জন্যে আপনার ও আমার মত ক'জন ভাগ্যবান জন্মে।

এভাবে বলছ কেন? তুমি তো আমারই। তুমি কি আমার নও? তোমার সমস্ত তুমি আমাকে উজাড় করে দিয়েছ। দাওনি?

জানি না।

মাঝে মাঝে তোমার অদ্ভুত ভাবান্তর ঘটে। এর অর্থও বুঝি না।

আমিও বুঝি না। আপনাকে যত দেখি তত বিস্ময়ে প্রশ্ন করি, যে আপনি ইন্দ্রানীর, সে আপনি কি রম্ভার, বিদ্যুৎপর্ণার, তিলোত্তমার? আবার যে আপনি এদের সকলের সে আপনি কি আমার?

অদ্ভুত তোমার প্রশ্ন!

না, জীবনের সঙ্গে জীবনের সম্পর্কটা কোথায় কীভাবে যেন জট পাকিয়ে আছে। সেই জট খুলবার জন্য নিজেকে প্রশ্ন করি, যে আমি পুরুরবার, আমার পুত্র আয়ু এবং রজির, সে আমি কি আপনার? অথচ কী ভীষণ লেপ্টে আছি আপনার সঙ্গে। আপনি আমার সব অতীতটাকে ভুলিয়ে দিলেন তবু সে আমি আর এ আমি কি এক?

এসব কী বলছ পাগলের মত? তোমার মনে আজ সন্দেহের ঝড় উঠেছে।

দেবরাজ, আমরা বোধ হয় কেউ আমাদের সব কিছুকে দিই না। আমরা প্রত্যেকেই নিজেকে ভেঙে টুকরো টুকরো করে রেখেছি। অথবা অনেকগুলো টুকরো দিয়ে সাজানো সত্তা। এক টুকরো দিয়ে আর এক টুকরো পাই। যতটুকু দিতে পারি ততটুকু দিয়ে ভাবি সব দিলাম। আসলে অনেক টুকরো আছে প্রত্যেক ভালবাসার মধ্যে। তাই ভালবাসা দিয়ে রিক্ত হয় না। ভালবাসা অনন্ত। ভালবাসা যে জীবন, জীবনের সুস্থ স্বাভাবিক প্রকাশ আপনাকে দেখে জেনেছি। আমার পাওয়ায় ঘর ভরে গেছে। আপনাকে সব দিয়েও মনে হচ্ছে আমার প্রাণে অনেক ভালবাসা আছে। ভালবাসায় আমার প্রাণ ভরপুর। তবু বড় কষ্ট ভালবাসায়।

ইন্দ্রের মন খারাপ হয়ে গেল। ভেতরটা ছটফটিয়ে উঠল। এসব কথা হওয়ার পর আর কি উর্বশীকে কোন কথা বলা যায়? বলাটা বড় নিষ্ঠুর হবে। বড় স্বার্থপর মনে হবে নিজেকে। উর্বশীর কাছে এত ছোট হতে পারবে না। কিন্তু উর্বশী ছাড়া এই সংকট থেকে কোন পরিত্রাণও সে দেখতে পেল না।

বেশ কিছুক্ষণ একটা অস্থির উত্তেজনা নিয়ে ইন্দ্র নিজের প্রাসাদে ঘর-বার করল। কিছুতে মনস্থির করতে পারছিল না! উর্বশীকে হারানোর ভয় তাকে শঙ্কিত করল। উর্বশী ছাঁড়া বাঁচবে কী করে? একদিন রম্ভা সম্পর্কে এমন এমন অনুভূতি হত। কিন্তু তাকে তো ছেড়ে বেশ আছে। আজও। এই মুহূর্তে। আসলে যে কোন মানুষেরই বেঁচে থাকার জন্যে সবচেয়ে বেশি যা প্রয়োজন তা তার নিজের স্বার্থের এবং নিজের। চারধার ঘিরে মানুষের আরো অনেক সম্পর্ক নিত্য গড়ে এবং ভাঙে। সেই

সব সম্পর্ক না থাকলেও বা চুকে বুকে গেলেও একজন মানুষ দিব্যি সুখে বেঁচে থাকতে পারে। তার বাঁচার খুব একটা হেরফের হয় না। এই অনুভূতিটা তার সমস্ত স্নায়ুর ভেতর সুখের বাতাস ছড়িয়ে দিল।

চারিদিক থেকে ঘন অন্ধকার নেমে আসছে। বকের শ্রেণী গোধূলি আকাশে জুঁইফুলের মালা তৈরি করে যেন হাওয়ার মত ধেয়ে গেল অন্য আকাশে। ইন্দ্রের মনে হল উর্বশীও তার মনের সব সংশয় ভীরুতাকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে উড়িয়ে নিয়ে যাবে প্রত্যাশা পূরণের আকাশে।

একটা ঘোরের মধ্যে ইন্দ্র উর্বশীর ঘরে এল।

ইন্দ্রকে দেখলেই উর্বশীর চোখমুখে আনন্দের উজ্জ্বলতা নামে। এমন করে তার প্রতীক্ষায় থাকে যে তাকে দেখলে বুকের মধ্যে কি যেন ঘটে যায়। কী যেন ঘটে যাওয়া নয়, পুরো বুকটাই যেন গলে গলে পড়ে। সেই মুহূর্তে উর্বশীকে একেবারে বুকের মধ্যে টেনে নেয়। তারপর নিজের অজান্তে ঠোঁট দুটি নেমে আসে তার ঠোঁটের উপর। উর্বশীর সব দুঃখ অভিমান শুষে নিয়ে ওর ঠোঁট রাঙিয়ে দেয়। ভালবাসার পদ্ম ফুটিয়ে তোলে। কিন্তু আজ হাত বাড়াতে গিয়ে থমকে গেল ইন্দ্র। মাঝে মাঝে সামান্য দূরত্ব অতিক্রম করাও কঠিন হয়। কেন যে এত অসম্ভব হয় ইন্দ্র ভেবে পেল না।

ইন্দ্র চুপ করে ছিল। উর্বশী চেয়েছিল তার দিকে।

প্রদীপেব উজ্জ্বল আলো পড়েছিল উর্বশীর মুখের উপর। কী অপরূপ সুন্দর দেখাচ্ছিল তাকে। চোখ দুটি উজ্জ্বলতর হয়ে ছিল তার চোখের উপর। গলায় সরু সোনার একটা হার। দু'হাতে মকরমুখী বালা। খোঁপাতে হলুদ কৃষ্ণচূড়ার ফুলের একটি গুচ্ছ।

ইন্দ্র চেয়ে চেয়ে দেখছিল।

উর্বশীকে সত্যি সে তীব্রভাবে ভালবাসে। রম্ভার সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক আর উর্বশীর সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক এক নয়। কোথায় যেন একটা দারুণ অমিল আছে। এর সঙ্গে একটা মনের ভূমিকা আছে। সেই মন প্রেম। উর্বশীকে ঠকালে তার প্রেমকে অপমান করা হবে।

অনেকক্ষণ পর্যন্ত কেউ কোন কথা বলল না। চোখের মধ্যে দুই চোখের দৃষ্টি এমন করে ধরা ছিল যেন একটুও দৃষ্টি উপচে না যায়।

অন্ধকারে গভীর থেকে ভয় পাওয়া ময়ূরের কর্কশ ডাক ভেসে এল। আর তাতেই তারা চমকে উঠেছিল। সেই সময় ঠিক তক্ষক ডাকল। সম্বিৎ ফিরে এল দু'জনের। উর্বশী বলল : অমন করে তাকিয়ে কাঙালের মত কি দেখেন বলুন তো?

ইন্দ্রর প্রেমমুগ্ধ দৃষ্টি আরো নিবিড় এবং গভীর হল। অস্ফুট স্বরে বলল : তোমাকে। এ দেখা যেন ফুরোতে চায় না। তোমার চোখে কী আছে?

উর্বশী হেসে বলল : অনন্ত চাওয়া। অমৃত প্রেম।

তোমাব সেই অনন্ত চাওয়া, আমার একাব মধ্যে আঁটবে কি উর্বশী! তোমার অনন্ত চাওয়া দাবির মধ্যে আমি একটা ছোট্ট দাবি মাত্র। আমাকে চাওয়ার ছোট্ট গণ্ডির মধ্যে রেখে তোমার জীবনটা এভাবে নষ্ট করা বোধ হয় উচিত কাজ হচ্ছে না। আকাশের পাখিকে আকাশে মুক্ত করে দেওয়াই ভাল। অনন্ত নীল আকাশেই যাকে মানায় তাকে খাঁচায় ভরলে সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে যায়। এতদিন যা করেছি, ভুল করেছি আর স্বার্থপরের মত আমি তোমাকে আটকে রাখব না। তোমার দাম আমার কাছে যতই থাকুক, তোমার জীবনটা তোমার কাছে কম দামী নয়। তুমি ইন্দ্রের একার নও, বিশ্বের সকলের।

উর্বশীর বিস্মিত দুই চোখের দৃষ্টি ইন্দ্রের দুই চোখের উপর স্থির করে রাখল। পলক পড়ল না অনেকক্ষণ। ইন্দ্রের মনের গভীরে অবতরণ করে সন্ধানী দৃষ্টি দিয়ে সে তাকে পরিমাপ করতে লাগল। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল : আপনি কী বলতে চাইছেন?

আমি কিছুই বলতে চাইছি না। তুমি তো বলেছ, তুমি আমি কেউ পরিপূর্ণ মানুষ নই। কোন মানুষই একা একজন নয়। অনেকগুলো মানুষের সমষ্টি। তাই ভালবাসা, প্রেম একজন মানুষের মধ্যে আঁটে না। নদীর স্রোতের মত সে চলকে চলকে চলে। এক মানুষের দিক থেকে আর এক মানুষের দিকে

তার নিত্য উপচে যাওয়া। উদাহরণ দিয়ে বলেছ, তিলোত্তমা, বিদ্যুৎপর্ণা, আম্রপালী, রম্ভাকে পূর্ণ করে আমি উপচে গেছি তোমার দিকে। তেমনি তুমি পুরুরবাকে পূর্ণ করে, কিংবা অপূর্ণ রেখে আবার আমার দিকে বয়ে গেছ। এই উপচে চলা কোনদিন ফুরোবে না। শেষ হবে না মানুষের জীবনে।

আপনি কিছু বলতে চান। বোধ হয় এ তার ভূমিকা। যা বলায় স্পষ্ট করে বলুন।

তোমার চোখে সন্দেহ, মনে অবিশ্বাস। কথায় সতর্কতা। আমাকে তুমি ভুল বুঝ না। তোমাকে ভীষণ ভালবাসি। তোমাকে জানা আমার কোনদিন ফুরোবে না, সেই সঙ্গে চেনা। তোমার মত নারী পাওয়া ভাগ্যের। তাই তোমাকে এত ভাল লাগে। এই ভালবাসাটা আমি যক্ষের ধনের মত আগলে রেখেছি। শুধু নিজের কাছে লুকিয়ে রেখেছি। অথচ, বিশ্ব-শুদ্ধ মানুষ আজ তোমার দর্শন অভিলাষী। তাদের বিমুখ করব কোন মুখে? তাতে আমার উর্বশীর অপমান হবে। আমি তোমাকে কি ছোট করতে পারি? আমার গর্ব তুমি। আমার সে গর্বকে অনন্ত সম্ভাবনায় ভরিয়ে দাও। তোমার কাছে এ আমার মিনতি। তোমার অনন্ত চাওয়ার অমৃত পরশ নিয়ে কেউ যদি ধন্য হয়ে যায় সেতো আমাদের দু'জনের পরম সুখ। তুমি অনুমতি করলে দেবসভায় দেব-নরপতিদের নিয়ে একটা নৃত্য-গীতের আয়োজন করতে পারি। আমারও নতুন করে গর্বিত হওয়ার সুযোগ হবে। তুমিও উৎসুক দর্শকের মাঝখানে নিজেকে নতুন করে অনুভব করবে। একঘেয়ে বন্দীজীবন থেকে একমুঠো মুক্তির স্বাদ নিয়ে ফিরবে। প্রমাণ করবে তুমি প্রাণের এবং জীবনের প্রতীক। তুমি অনন্ত বাসনার অমৃত প্রেমশিখা। পুরনো জীবনকে ফেলে এসে তুমি কিছুই হারাও নি। এখনও তোমার অন্তর ভরে আছে প্রেমের আলোয়। প্রেমিককে কৃপা করার পাত্র এখনও শূন্য হয়নি। তুমি কারো বন্দিনী নও। তুমি আকাঙ্ক্ষার অমৃত। পূর্ণতার শিখা। এক আনন্দরূপিণী মানস-প্রতিমা।

ইন্দ্রের কথাগুলো উর্বশীকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখেছিল। প্রস্তরীভূত প্রায় তার অবস্থা। আশ্চর্য এক গভীর কৃতজ্ঞতার চোখে চেয়ে রইল ইন্দ্রের দিকে। ঘোরলাগা আচ্ছন্নতার ভেতর বহুকাল পর পিতা ধনকুবেরের মুখখানা নতুন করে মনে পড়ল। আর তার কথাগুলো যে বুকের গভীরে কোথায় লুকনো ছিল জানত না উর্বশী। হঠাৎ মন তোলপাড় করে সেই কথাগুলো হৃদয়ের গভীরে নির্দেশের মত শুনল। বাবা, মা, বংশ পরিচয় এসব কিছুই নয় মা। প্রত্যেক মানুষকে, মানুষ হয়ে উঠতে হলে, তার নিজস্ব পরিচয় তৈরি করে নিতে হয়। তার জন্য দাম যা লাগুক। বিনামূল্যে এ জীবনে কি মেলে বল? দাম দিতে ভয় পাস না। তবে ইচ্ছের বাইরে কখনও কাজ করতে নেই। কোন মানুষকেই নষ্ট করে দিতে পারে না অন্য কেউ, যদি সে নিজে নষ্ট না হয়। নিজের বিশ্বাস আর বুদ্ধি নিয়ে বুক ফুলিয়ে কাজ করার মধ্যে কোন ভয় নেই জানবি।

বুকের গভীর থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস মর্মরিয়ে উঠল। হাহাকারের মত ছড়িয়ে পড়ল বাতাসে। সে তার অবচেতনে, অতীতের তার ছেলেবেলায়, যৌবনে, দাম্পত্য জীবনে ফিরে যাচ্ছিল বহু বহু বছর মাড়িয়ে গিয়ে। আর তার ভেতর ক্ষতবিক্ষত হতে লাগল। অসম্মানের তীক্ষ্ণ শরটি বুকের মধ্যে আমূল প্রোথিত। সেই শরটি আজও উৎপাটিত হয়নি। তবু সে প্রেম চায়। সম্মান চায়। চায় মানুষের মধ্যে বাঁচতে। সবার মাঝে নিজের ভালবাসার মানুষকে কাছে পেতে। সেই বাসনার স্বর্গ কি ইন্দ্র এনে দিতে পারে?

আনমনা হয়ে গেছিল উর্বশী।

উর্বশীকে চিত্রার্পিতের মত দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ইন্দ্র একটু ঘনিষ্ঠ হয়ে বলল : উর্বশী নিরাশ হয়ে ফিরব বলে আসিনি। তোমার ইচ্ছের কথা বল।

উর্বশী অতল স্তব্ধতার গহ্বর থেকে সচেতনতায় প্রত্যাবর্তন করল। সরল চোখে অগাধ বিস্ময় নিয়ে নিরুচ্চারে ধীরে মাথা নাড়ল।

ইন্দ্র তার ভাবমূর্তিকে উজ্জ্বল করতে, সকলের সঙ্গে বহুকালের পুরনো সম্পর্ক নবীকৃত করতে এবং তার প্রতি দেবভূমির নরপতিদের কার কত আস্থা ও আনুগত্য তার পরিমাপ করতে সুকৌশলে

দেবসভায় নৃত্যগীতের আয়োজন করল। উর্বশী উপলক্ষ। তাকে সামনে রেখে বিরোধ-বিভেদের উত্তেজনা কমানো এবং রাজনৈতিক স্বার্থগুলিকে সযত্নে রক্ষা করা, সেই সঙ্গে রাজনীতির রাশটা নিজের হাতে রাখতেই ইন্দ্র দেবভূমির সকল নরপতির সঙ্গে গন্ধর্বরাজ বিশ্বাবসু, পুরুরবা এবং মুনি ঋষিদের দেবসভায় আমন্ত্রণ করল। ইন্দ্র জানে, একমাত্র সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সব সম্পর্কের উন্নতি হয়। নৈকট্য বাড়ে। ব্যবধান দূরত্ব যদি কিছু ঘটে থাকে তাও হ্রাস পায়। তাই অনেক ভেবে এবং পরিকল্পনা করে ইন্দ্র রাজকীয় সমারোহে অনুষ্ঠানের আয়োজন করল। এর একটি গূঢ় কারণও ছিল।

সমতলভূমিতে হস্তিনাপুরের যুবরাজ, কুরুবংশের দুর্যোধনের নেতৃত্বে সমমনোভাবাপন্ন নরপতিদের নিয়ে এক রাষ্ট্রজোট গঠিত হয়েছিল এবং দিন দিন যেভাবে তার কলেবর এবং শক্তি বাড়তে লাগল তা ইন্দ্রকে রীতিমত ভাবিয়ে তুলল। এর পাশে অবশ্য তাদের সমর্থিত যে বিপক্ষ রাষ্ট্রজোটটি দ্বারকাধিপতি শ্রীকৃষ্ণর নেতৃত্বে পাঞ্চাল, বিরাট এবং ইন্দ্রপ্রস্থের পঞ্চপাণ্ডবকে নিয়ে গঠিত হল বিপুলতায় এবং সামরিক শক্তিতে রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বে দুর্যোধনের সংগঠন অপেক্ষা অনেক হীনবল ছিল। যে বিপুল রাজনৈতিক সমর্থন এবং সহযোগিতা দুর্যোধনের দিকে আছে তা ভেবে ইন্দ্র দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হল। এ সম্পর্কে দেবভূমির ভূমিকা কি হবে, তাই নিয়ে এক জরুরী আলোচনাও সমাবেশের অন্তর্ভুক্ত হল। এরকম সমাবেশের পরোক্ষ ফল একটা আছে। দুর্যোধন তাতে হয়ত কিছুটা সংযত হতে পারে। সে বুঝবে, দেবভূমি নিরপেক্ষ দর্শক হয়ে চুপ করে বসে নেই। তারা শ্রীকৃষ্ণ ও পাণ্ডব পক্ষে যোগ দিয়েছে। এরকম একটা ধারণা হলে দুর্যোধন স্বর্গভূমির দিকে আর অগ্রসর হবে না। সমতলভূমির বিরোধ দেবভূমিকে স্পর্শ করবে না। এবং দেব নরপতিদের সিংহাসন নিরাপদ হবে।

আমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গ কেউ ইন্দ্রের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য আঁচ করতে পারল না। উপভোগ এবং অবকাশ বিনোদনের মেজাজ নিয়ে তারা অমরাবতীতে এল।

গোটা অমরাবতী একটা উৎসবের রূপ নিল। রাজপথ এবং পথপার্শ্বের গৃহগুলি ফুল-পাতা ও পতাকা দিয়ে সজ্জিত করা হল। অতিথিদের বাসগৃহগুলি সুচারুরূপে সাজানো হল। অতিথিদের আরাম স্বাচ্ছন্দ্য, আনন্দের দিকে বিশেষ নজর রাখা হল। আর এই কঠিন দায়িত্বভারটি ইন্দ্র নিজে নিল।

অতিথিদের সর্বক্ষণ পরিচর্যার জন্যে গুপ্তচরবৃত্তিতে শিক্ষণপ্রাপ্ত নন্দন কাননের সুন্দরী অপ্সরাদের নিযুক্ত করা হল। ইন্দ্র ক্ষুরধার রাজনৈতিক বুদ্ধি দিয়ে বুঝেছিল সব দেশে সর্বকালে কূটরাজনীতি খেলায় বিশ্বস্ত হাতিয়ার হল রূপসী রমণীর কাঞ্চন যৌবন। নেশার মতন পুরুষকে উন্মাদ করে তোলে। তখন অত্যন্ত সচেতন পুরুষও বশে থাকে না। ইন্দ্র রাজনীতির এ দিকটা বেশ ভাল জানে। তাই রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থতার গোপন খেলায় ইন্দ্র অপ্সরাদের মিছরির ছুরির মত ব্যবহার করে। এটা নতুন কিছু নয়। ইন্দ্রের পুরনো খেলা। অপ্সরাদের শক্তিতে সে ইন্দ্র হয়েছে। রাজনীতির এত উর্ধ্বে উঠেছে। কূট রাজনীতির খেলায় অপ্সরারা বড় টোপ। এরাই ইন্দ্রকে সবচেয়ে গোপন সংবাদ সরবরাহ করে থাকে। এদের শক্তিতেই ইন্দ্র শক্তিমান। নিন্দুকের অপবাদ ইন্দ্রকে গৌরবান্বিত করে।

নূপুরের উন্মাদ ঝংকার তুলে উর্বশী নৃত্যস্থলীর শ্বেত পাথরে বাঁধানো বেদিতে এসে দাঁড়াল ধীর পায়ে। বিশাল ঝাড়বাতির উজ্জ্বল আলোর নীচে উর্বশী পূজারিণীর মত বিনম্র ভঙ্গিতে এসে দাঁড়াল। বুকের কাছে দু'হাত জোর করে একটু হেসে মাথা নাড়িয়ে দুচোখের তারায় খুশির ঝলক তুলে দর্শকদের অভিনন্দন জানাল। নিমেষে সভাস্থল স্তব্ধ হল। রাজেন্দ্রানীর মত তার শান্ত সমাহিত রূপের ঐশ্বর্য দেখে দেব নরপতি এবং দর্শকদের অপলক চোখে মুগ্ধ তন্ময়তা থম থম করতে লাগল।

উর্বশীর অধরে অনিন্দ্যসুন্দর হাসির দ্যুতি তখনও লেগে আছে। হতচকিত দর্শকদের দু'চোখে বিহ্বলতার ঘোর। রুদ্ধশ্বাস উত্তেজনায় বিস্ময়ে কয়েকশত দর্শকের চোখ জ্বলজ্বল করে জ্বলছিল তার সুডৌল বুকে রুপোর চুমকি বসানো নীলবর্ণ রেশমের কাঁচুলিতে।

অনির্বচনীয় পুলকানুভূতিতে ইন্দ্রের ধনুকের মত ওষ্ঠাধর কূট হাসিতে বঙ্কিম হল। আর পুরুরবার বুকের ভেতরটা দীপশিখার মত কেঁপে উঠল। কী রকম যেন একটা হু-হু করে উঠল। নিজের মনের

গভীরে ডুব দিয়ে উৎসুক স্বপ্নাচ্ছন্ন চোখে তার দিকে তাকিয়ে রইল। আর চেতনার ভেতর কেমন একটা মধুর আবেশ ছড়িয়ে পড়ল। বুকের শিরায়-উপশিরায় টান ধরল, চোখ দুটো জলে ভরে গেল। সে দেখছিল অতুলনীয় রূপ আর উদগ্র যৌবনের পসরা নিয়ে একটা রঙিন মরীচিকা মূর্তির মত জ্বলজ্বল করে জ্বলছে তার প্রিয় উর্বশী।

একটা অসহ্য জ্বালায় তার বুকের ভেতরটা জ্বলে যেতে লাগল! দাঁতে দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরে নিজেকে সংযত করল সে।

নূপুরের শব্দে সহসা চমকে উঠল দেবসভা। ঢেউয়ের মত দু'খানা হাত দুলিয়ে একরকম দৌড়েই সে গোটা বেদিটা এক পাক ঘুরে এল। দু'হাত চোখের কাছে এনে দুআঙুলে দেখার মুদ্রা রচনা করে উৎসুক দৃষ্টিতে পা ফেলে ফেলে বেদির সামনে দাঁড়িয়ে অভিনয়ের ভঙ্গিতে কাকে যেন খুঁজতে লাগল। অনেকক্ষণ ধরে তন্ন তন্ন করে খুঁজল। হতাশ হওয়ার আকুল যন্ত্রণায় তার সারা শরীরটা মুচড়ে উঠল। নৃত্যের মুদ্রায় ফুটে উঠল তার শরীরী অভিব্যক্তি। তীব্র তীক্ষ্ণ যন্ত্রণায় তার প্রতিমার মত অনিন্দ্যসুন্দর মুখখানা এঁকে বেঁকে দুমড়ে কুঁকড়ে যেতে লাগল। তার পরেই কেমন একটা পাগল করা অনুভূতিতে তার বুকের ভেতরটা তোলপাড় করে উঠল। মৃদঙ্গের ধ্বনিতে, বাঁশির সুরে বিষাদের সুর যেন ক্রমশ গভীর হয়ে উঠল। সেই সুমধুর করুণ সুর স্বপ্নের মত শুভ্রফেননিভ পোশাকের আড়ালে রূপসী নর্তকী উর্বশীর শরীর দেখছিল তারা। সেই গভীর ব্যথার উজান ঠেলে শব্দযন্ত্রের সুরে-ছন্দে-তালে উর্বশীর দেহবল্লরী যেন উত্তাল বেদনার মত নদীর মত তরঙ্গায়িত হয়ে উঠতে লাগল। নৃত্যের প্রতিটি মুদ্রায় ফুটে উঠল তার অন্তরের অভিব্যক্তি।

মুগ্ধ ও অভিভূত পুরুরবার মনে হল সে যেন কোন সুদূর বিস্মৃতকালের অবলুপ্ত অতীতের করুণ সঙ্গীত শুনছে। অনেক স্মৃতি তার বুকের ভেতর তোলপাড় করে উঠল। চোখের তারায় ভাসছিল এক সুদূর অতীত। নদীর নীল জল, দিগন্তের সবুজ বনানী, আকাশের অফুরান আলো, গাছ-গাছালির সঙ্গে সঙ্গে একাত্ম হয়ে উর্বশী নৃত্যটা করছিল। উর্বশীর সবচেয়ে প্রিয় নাচ। সেই নাচটাই করছিল। গভীর বিস্ময়ে অপলক হয়ে উঠল তার চোখেব চাউনি। তীব্র একটা আবেগে বুকের ভেতরটা পাক খেয়ে উঠল। নিদারুণ বেদনায় টনটন করতে লাগল বুকের ভেতরটা। নিজের উপরে তার ঘৃণা হল সর্বাধিক। নিরুচ্চারে বলল : না না উর্বশী। তোমার কোন দোষ নেই। সব দোষ আমার। তোমার অপ্সরা হওয়ার জন্যে দায়ী তো আমি।

হঠাৎ আলো উজ্জ্বল হয়ে উঠল। উর্বশীও দপ করে যেন জ্বলে উঠল। তার সমস্ত চেতনার ভেতর মর্মরিত হয়ে উঠল নাচের ছন্দ। উর্বশী নাচছিল পাগলের মত। তীব্র বেগে নাচের তালে তালে উড়ছিল তার ঘাঘরা, দেহের বসন। বেণীটা কখনও পিঠের উপর, কখনও বুকের উপর চাবুকের মত সপাং সপাং করে আছড়ে পড়ছিল। আর তার শরীরটা যন্ত্রণায় কুঁকড়ে দুমড়ে যাচ্ছিল।

বাজনা প্রবল হল। বীণার ঝংকারে সমুদ্রের উন্মত্ত গর্জন পায়ের নূপুরের ছন্দে ফেনয়িত তরঙ্গ যেন লুটিয়ে পড়ল। আর যৌবনপুষ্ট দেহের লীলায়িত বিন্যাসে সেই অসীম সাগরের ঢেউরে বিচিত্র মুদ্রা রচনা করে নাচতে লাগল।

উর্বশীর কোন হুঁশ ছিল না। স্বর্ণলতার মত বাহুদুটো তুলে চক্রাকারে উল্কার গতিতে পাক খেয়ে খেয়ে নাচতে লাগল। তীক্ষ্ণ তীব্র বিদ্যুতের সাদা আলোর রেখা যেন মুহুর্মুহু ঝলকে উঠে নৃত্যস্থলীর দর্শকদের চোখ ধাঁধিয়ে দিল। বিকল করে দিল স্নায়ু, বিশৃঙ্খল হয়ে গেল তাদের চেতনা। মন্ত্রমুগ্ধের মত নৃত্যস্থলীর দিকে চোখদুটো ছড়িয়ে দিয়ে তারা বসে রইল। কোন হাততালি নয়, উচ্ছ্বসিত বাহবার উল্লাসও নয়, নিথর স্তব্ধতা বিরাজ করছিল সভাকক্ষে। নিস্তব্ধতার এই ক্ষণটুকু বোধ হয় নৃত্যের সবচেয়ে সুন্দর মুহূর্ত। শিল্পীর সাফল্যের প্রাপ্তি।

পুরুরবা অভিভূত আচ্ছন্নতার ঘোরে নিজের আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছিল। উর্বশীর দৃষ্টি গিয়ে পড়ল পুরুরবার উপর। চকিতে চমকে উঠেছিল। মনে হল, বুকের ভেতরে দাঁড়িয়ে যেন অনেক-অনেকদূর থেকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে পুরুরবা। অমনি বুকের ভেতর প্রলয় ঘটে গেল। বিদ্যুৎচমকের মত হঠাৎ সব ধাঁধিয়ে গেল। কী যেন হয়ে গেল বুকের অভ্যন্তরে। পুরুরবার মুখ ছাড়া আর কিছু দেখতে পাচ্ছিল না। হঠাৎ-ই নাচ থেমে গেল।

বঙ্কিম হয়ে উঠল তার ভুরুযুগল। অপমানে লজ্জায় তার বুকের ভেতরটা চিনচিন করে জ্বলে যেতে লাগল।

দর্শকদের অভিভূত আচ্ছন্নতার ঘোর কাটিয়ে উর্বশীর দৃষ্টি অনুসরণ করে পিছনে তাকাল। একটা চাপা হাসির ঢেউ বয়ে গেল নিঃশব্দ সভাকক্ষে। কেউ কেউ কটূ মন্তব্যও ছুঁড়ে দিল। উর্বশীর ভেতরটা ঘেমে উঠল।

কয়েকটা মুহূর্ত কাটল।

রম্ভার বীণার ঝংকার বিদ্যুৎপর্ণার বংশীধ্বনি যেন তার শরীরের মধ্যে কথা বলতে লাগল। উতরোল বাজনা যেন উপচে পড়ল সভাকক্ষে। লক্ষ লক্ষ ফুলকুঁড়ি ফুটে উঠতে লাগল উর্বশীর বুকের ভেতর। মনে হল, চোখের সামনে বর্ষার রূপ ফুটে উঠেছে। আর তার সমস্ত শরীরটা নৃত্যের আবেগে দুলে উঠল। সুরের ভেলায় ভেসে গেল তার মন, প্রাণ, দেহ। উর্বশী নাচছিল। বর্ষা সমাগমে ঘন কালো মেঘের গর্জনের সঙ্গে মৃদু মৃদু বিজলীর দ্রিমি দ্রিমি তালের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এক আনন্দচঞ্চল ময়ূরের মত পেখম মুক্ত করে অন্ধ আবেগে বিভোর হয়ে নাচতে লাগল। আর চারদিকে তার রূপের স্রোত গড়িয়ে পড়ল। উচ্ছ্বসিত দর্শকদের প্রাণে উপচে পড়ল অবলীলায়।

আর মুহুর্মুহু করতালি এবং বাহবা দিয়ে দর্শকরা তাকে উৎসাহিত করতে লাগল। ইন্দ্রের নির্বাচনের তারিফ করল।

॥ সাত ॥

পুরুরবা সারা রাত দু'চোখের পাতা এক করতে পারল না। বিছানায় শুয়ে এ-পাশ ও-পাশ করল। সময় কিছুতে কাটতে চাইল না। বিনিদ্র রাত কাটানো বড় কষ্টের বড় যন্ত্রণার। একা ঘরে জেগে থেকে উর্বশীর কথা ভাবতে লাগল। যত ভাবল তত বুকটা আনন্দে বিপদে উথাল-পাথাল করে উঠল।

গড়িয়ে গড়িয়ে অবশেষে রাত শেষ হল। একটি অন্তহীন রাত বড় মন্থর গতিতে কাটল। ভোরের আলো ফুটল। দেখতে দেখতে সূর্য উঠল আকাশ রাঙা করে।

দর্পণের সামনে দাঁড়াল পুরুরবা। রাত্রি জাগরণের চিহ্ন পড়েছে চোখের কোলে। চোখের চাউনিতে কেমন একটা বিভ্রান্ত ভাব। চুল এলোমেলো। পরনের বসনেও পারিপাট্য নেই। পিপাসার্তের মত নিজের প্রতিবিম্বর দিকে তাকিয়ে বলল : কী লাভ এত উতলা হয়ে? উর্বশীর সাথে দেখা করতে কেন যাবে? কোন মুখে যাবে? তুমি তার কে? তার নিটোল সুখকে বিঘ্নিত করতে যাবে কেন?

উর্বশীর কথা ভাবতে গিয়ে তার চোখে জল এল। বুকের গভীরে একটা পুরনো ক্ষত থেকে রক্তপাতজনিত অবসাদ তাকে দুর্বল করে দিল। বুক কাঁপিয়ে বেশ কয়েকবার দীর্ঘশ্বাস ফেলল। উর্বশী যে এখন তাকে প্রচণ্ডভাবে ভালবাসে, সে আর গোপন নেই। দেবসভায় তার নাচের ভেতর দিয়ে মেলে ধরেছিল নিজেকে।

পরিবেশে না পড়লে তো মনটাকে ঠিক বোঝা যায় না। নৃত্যস্থলীতে অগণিত দর্শকবৃন্দের মধ্যে উর্বশী নাচের ভঙ্গিতে তাকে খুঁজছিল। কিন্তু না পেয়ে হতাশ হয়ে যেন ভেঙে পড়েছিল। কিন্তু পরে তার চোখের উপর চোখ পড়ল যখন, খুব তন্ময় হয়ে তার দিকে অপলক চেয়ে ছিল। পুরুরবা উর্বশীর মুখ এবং তার সমস্ত অভিব্যক্তির মধ্যে তাকে অনুভব করছিল।

উর্বশীর জন্য মন ভীষণ ব্যস্ত হল।

হাতমুখ ধুয়ে পরিষ্কার হয়ে তাড়াতাড়ি বেরোনোর পোশাক পরে নিল নিজে। বাইরের সিঁড়ির মুখে দাঁড় করানো রথে উঠে বসল। সারথীকে বলল : নন্দনকানন।

রথ ছুটল। নদীর ধার ঘেঁষে রাস্তায়। সমস্ত কিছু পিছনে ফেলে পথের ধুলো উড়িয়ে রথ ছুটছিল। পুরুরবা ক্লান্ত অনিদ্রাজনিত জ্বালাভরা চোখে ভোরের প্রকৃতি দেখছিল আর স্নিগ্ধ হচ্ছিল। মানুষের কত অশান্তি, কত উত্তেজনা, কিন্তু প্রকৃতি শান্ত নির্বিকার। নদী, আকাশ, মাটি, পাহাড়, গাছপালা, পাখি, প্রজাপতি সব কিছুর মধ্যে পরিবৃত হয়ে আছে, তবু কারো জন্যে উদ্বেগ, চিন্তা কিংবা আবেগময়তা নেই।

নন্দনকাননে উর্বশীর প্রাসাদের সিংহদ্বারে একটি পলাশের নিচে সারথি রথ রাখল। মুগ্ধ দৃষ্টিতে উর্বশীর প্রাসাদ দেখতে লাগল পুরুরবা। বুকের ভেতরটা হু-হু করে উঠল। উর্বশীর ভাবনা এলেই দারুণ একটা যন্ত্রণা হয়। বিদ্যুৎচমকের মত এক অপ্রাপ্তির যন্ত্রণা তার দাবিহীন জীবনকে চিরে চিরে ফালা ফালা করে দিতে লাগল। এরকম একটা যন্ত্রণা নিয়ে সত্যি কি কেউ বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারে?

নিজের যন্ত্রণার মধ্যে ডুবে গিয়ে প্রশ্ন করল। উর্বশীর কাছে যাবে কেন? উর্বশী তার কে? তার কাছে যাওয়ার কোন মুখ নেই তার? কি সম্পর্ক রেখেছে তার সঙ্গে? তার হাঁটা শ্লথ হল। যেতে যেতে অনেকবার থামল। মনস্থির করতে সময় লাগছিল। তবু নিশি পাওয়া মানুষের মত এক অদৃশ্য আকর্ষণের ঘোরে সে হাঁটছিল। সত্তার একমুখী স্রোত তখন দুরন্ত এক গতিতে তাকে নিয়ে চলল উর্বশীর দিকে।

মনের মধ্যে তার ঝড় উঠল। কোন অধিকারে যাবে? কি আশা নিয়ে যাচ্ছে? তার সঙ্গে সম্পর্কই-বা কি? সে তো আর তার কেউ নয়? এখন সে ইন্দ্রের—বাকী কথাটা মনে করাও পাপ। কে যেন সহসা তার মুখ চেপে ধরল। বুকটা খামচে ধরে দাঁড়িয়ে পড়ল পুরুরবা।

একটা বিদ্যুৎ স্পর্শ করে গেল তার অনুভূতিতে। পুরুরবার মুখে গভীর বিষাদ ও অনুশোচনা থমকে ছিল। মনের গহনে দুর্বার ইচ্ছাটা তাকে খুঁচিয়ে জাগাল। পুরুরবা হঠাৎ টান টান সোজা হয়ে ভিতরকার নিভন্ত আগুন উস্কে দেবার জন্যই বলল : কেন যাব না? একদিন যে সম্পর্কটা ছিল তা তো ছিন্ন করিনি? উর্বশীর উপর তার অধিকার দাবিও ত্যাগ করিনি। সুতরাং সম্পর্কটা নেই একথাটা ভাববে কেন? সম্পর্ক কিছু যদি না থাকে তা-হলে এমন করে তার কাছে ছুটে আসা কেন? সব জেনেও মনটা লুব্ধ হবে কেন? ঘৃণার পরিবর্তে এ কোন শ্রদ্ধার্থ প্রেমে তার হৃদয় প্লাবিত হল?

উর্বশীকে দেখার ইচ্ছেটা দুর্বার হল। মন আর মন নেই। ময়ূরের পেখমের মত কতরকম মায়াবী রঙ ধরেছে। বহুবল্লভা অপ্সরা উর্বশীর প্রতি তার সত্তার এক দুর্নিবার টান অনুভব করল। উজান বাইবার শক্তি তার ছিল না। সে ভেসে যাচ্ছিল এক দুর্বার ভালবাসার স্রোতে।

পরিচারিকা পুরুরবার আগমনের সংবাদ দিল। হঠাৎ-ই নানারকম বিস্ফোরণ ঘটে গেল উর্বশীর বুকের মধ্যে। বুকের ধকধকানিটা শুরু হল এসময়। সে বুঝতে পারছিল পুরুরবা একটা কিছু বলতে চায় তাকে। কথাটা কী তাও আন্দাজ করতে পারে। পুরনো কাঙালিপনা করতে এসেছে পুরুরবা। করুণা, ক্ষমা, প্রার্থনা করে মনটা তার গলাতে এসেছে। একই সঙ্গে বুকের মধ্যে তীব্র আনন্দ ও একটা ভয় হচ্ছিল তার।

কিছুক্ষণ উর্বশী কোন কথা বলতে পারল না। অপলক চোখে তাকিয়ে রইল পরিচারিকার দিকে। উর্বশীর চোখের ফাঁদে বন্দী হয়ে পরিচারিকা ছটফট কবতে লাগল। কিন্তু উর্বশীর ভ্রূক্ষেপ নেই। লুব্ধমন পুরুরবার প্রার্থনার ভালমন্দ বিচার করল। তার ভিতরকার বিচারক সত্তাটি তাকে সাবধান করে দিতে প্রশ্ন করল : পুরুরবা কে? তার সঙ্গে সম্পর্ক কি? পুরুরবা তার প্রথম যৌবনের খেয়ালী স্মৃতি, তার প্রণয়ের মুকুর। তার তো কোন ভূমিকাই নেই এ জীবনে। উর্বশীর জীবনে সে অনেককাল হারিয়ে গেছে। হারানো মনে হাহাকারের ঝড় তুলে কি লাভ? কিসের আশায় দেখা করবে? কথাগুলো রক্তের মধ্যে স্পন্দিত হতে লাগল, তার হৃৎপিণ্ডে ধক ধক শব্দের সঙ্গে এক হয়ে মিশে গেল সে শব্দ। মনের কোণে লুকনো এক যাদু তাকে ভিতরে ভিতরে উত্তেজিত করল। তার শরীর, মন, বুদ্ধি অস্পষ্ট অনির্দিষ্ট প্রতিশোধস্পৃহায় শিহরিত হল।

ক্ষণকাল মৌন থাকার পর পরিচারিকাকে অবাক বিস্ময় প্রকাশ করে বলল : বলিস কি, পুরুরবা এসেছে? তাকে সঙ্গে আনলি না কেন। যা, আমার ঘরে নিয়ে আয়।

পরিচারিকা চলে যাওয়ার পর একটা অদ্ভুত অনুভূতিতে তার বুক প্লাবিত হল। কত ঘটনা, কত স্মৃতি মনে ভিড় করে এল। পুরুরবা সত্যি ভালবাসেনি তাকে। পোষা পাখির মত তাকে নিয়ে খেলা করেছে। তার ভেতর ভালবাসাবাসি ছিল না তাকে নিজের দখলে রাখার চেষ্টা করেনি। ইন্দ্রের

অপমানকর প্রস্তাবে রাজি না হয়ে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করতে পারত তাকে। কিন্তু উর্বশীর মনের জন্য, প্রণয়ের জন্য পুরুরবা সেটুকু করেনি। অথচ, এরকম একটা প্রত্যাশা করেছিল সে। পুরুরবাকে বোঝানোর চেষ্টা করেছিল যে, তার জন্য এক বুক ভালবাসা টনটন করছে উর্বশীর বুকে। তবু পুরুরবা আঁজলা পেতে তা নিল না। নারীর প্রণয়ের জন্য পৃথিবীতে কত বীর প্রতিদ্বন্দ্বিকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করেছে। প্রণয়ীকে দখলে রাখতে মৃত্যুবরণ করেছে। কিন্তু পুরুরবার মধ্যে সেই তেজ সাহস বিক্রম ছিল না। পরিবর্তে তার উপর এমন একটা অন্যায়, অবিচার করেছিল যে, ওই একটি মাত্র লোক ছাড়া আর কেউ করেনি। ধূ-ধূ করা এক দূরত্বের ব্যবধান নিজের ভেতরে গড়ে তুলেছে সে।

হঠাৎ উর্বশীর মনে হল, পুরুরবার সঙ্গে সেও পারে এক অনতিক্রম্য দূরত্ব রচনা করতে। ইচ্ছে করলেই পারে।

পরিচারিকার সঙ্গে পুরুরবা এল।

কেমন একটা আচ্ছন্নতায় আক্রান্ত হয়ে উর্বশী তখন বিছানায় শুয়ে ছিল। পুরুরবার পায়ের শব্দ পেয়েও সে চোখ খুলল না।

খুট খুট করে দরজায় শব্দ করল। কয়েকবার করল। উর্বশীর বুক উথাল পাথাল করে উঠল। চোখ বুজে সে নানারকম কল্পনা করছিল, স্বপ্নের মত দেখছিল। দরজায় খুট্ খুট্ শব্দটা স্বপ্নে হচ্ছে না বাস্তবে তা বুঝতে অনেকক্ষণ সময় নিল। তারপর চোখ বুজে ক্ষীণ গলায় প্রশ্ন করল কে?

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে পুরুরবা ভয়ে ভয়ে বলল : আমি পুরুরবা। একটু আসব?

উর্বশীর আচ্ছন্নভাবটা একমুহূর্তে কেটে গেল। চকিতে উঠে বসল। পুরুরবাকে দেখে তার ভীষণ লজ্জা করল। নিজের শরীরের দিকে চেয়ে দেখল। না শাড়ী, ঠিকই জড়ানো আছে। কাঁচুলির উপর কাপড় টেনে দিয়ে একটু গা ঢেকেই বসল। মাথাটা ঘুরছিল খুব। কপাল টিপে ধরে বলল : এস।

পুরুরবার একচোখ উর্বশীর দিকে আর এক চোখ কক্ষের সাজানো গোছানো পরিপাটি সৌন্দর্য ও পরিচ্ছন্নতার দিকে। মুখখানা থমথমে গম্ভীর। উর্বশী পুরুরবার দিকে এক পলক চেয়েই চোখ নামিয়ে নিল। উর্বশীর বিছানার একপাশে মুখোমুখি বসল সে। পুরুরবার সঙ্গে উর্বশীর সম্পর্কটা আর নেই। তাই ভেতরটা কেঁপে গেল থরথরিয়ে। কত কাছে তারা তবু উভয়ের মধ্যে কত ব্যবধান।

ভারি লজ্জা করছিল উর্বশীর।

পুরুরবা ভয়ে ভয়ে ঢোক গিলে বলল : খুব শুকনো দেখাচ্ছে তোমাকে। রাতে ঘুমোওনি বোধ হয়।

উর্বশী মাথা নিচু করে বলল : আমি ভালোই আছি। রাতে ঘুম না হওয়ার কোনো কারণ নেই।

পুরুরবা কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। ভুরু কুঁচকে নিজের নখ দেখল। তারপর মুখ তুলে বলল : মানুষের বুকের ভেতরটা দেখানোর যদি কোন আয়না থাকত তা হলে দেখাতে পারতাম পুরুরবার বুকে উর্বশীর প্রেম, এবং তার নাম ধ্রুবতারার মত জ্বল জ্বল করছে।

উর্বশী একবার মুখ তুলল। তীব্র হয়ে উঠল তার চোখের দৃষ্টি। বলল : ও সব কথা থাক।

কেন থাকবে? আমার দোষ থাকতে পারে, কিন্তু আমাদের সম্পর্কটা তো তাই বলে মিথ্যে হয়ে যায়নি। আমিও তোমাকে স্ত্রী বলে অস্বীকার করিনি। তুমি পুরুরবার স্ত্রী আছ এবং থাকবে।

মুহূর্তে উর্বশীর বুকের ভেতর প্রলয় ঘটে গেল। কোন কথা না বলে দুটি চোখ পেতে রাখল পুরুরবার মুখের উপর।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর তার গলা থেকে বাঘিনীর চাপা গর্-র্-র্ হুংকার বেরিয়ে এল। বলল : তোমার কোন লজ্জা নেই, সংকোচ নেই তাই এত বড় বউ ঠকানো মিথ্যে কথাটা বলতে পারলে! তোমাকে আমি বিশ্বাস করি না। তুমি সব পার। কোন স্বামী জেনেশুনে নিজের স্ত্রীকে অন্য পুরুষের সঙ্গে ব্যভিচারে যেতে বাধ্য করে না। নিজের বউকে কেউ অন্য পুরুষের দিকে ঠেলে দিতে পারে? তোমার বুকে প্রেম নেই বলে এতই মমতাহীন হতে পারলে!

পুরুরবা মিন মিন করে বলল : কী অসহায় অবস্থার মধ্যে যে মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিলাম সে শুধু আমি জানি। ইন্দ্রের কামনাবহ্নি থেকে তোমাকে বক্ষার শক্তি ছিল না আমার। তাইতো আমাদের সম্পর্কটা এখনও মরে যায়নি উর্বশী। আমরা দু'জনে দু'জনকে ভীষণ ভাবে চাই। শুধু

তুমি একটু চাইলেই আমাদের প্রেম বেঁচে থাকতে পারে। শুধু মন প্রাণ ভালবাসা দিয়ে যদি কেউ তোমাকে একান্ত করে চেয়ে থাকে সে আমি।

তবু উর্বশীর মন ভিজল না। প্রচণ্ড ঘৃণায়, বিদ্বেষে, ক্রোধে ধকধক করছিল তার দুই চোখ। ঝংকার দিয়ে বলল : বিশ্বাস করি না। আমার প্রণয়, আমার জীবন, আমার মাতৃত্ব বেঁচে থাকুক প্রতিষ্ঠানপুরে* কেউ চায়নি।

না, বল, চেয়েছিল শুধু একজন। তবে তার চাওয়ার ভাব ছিল অন্যরকম।

মিথ্যে কথা। আমি বিশ্বাস করি না।

না, ভুল হচ্ছে তোমার। জীবনের অনেক কথাই মন দিয়ে জানতে হয়। তোমার বাইরেটা না চাইলেও মনে তুমি ঠিকই টের পেয়েছিলে। তাই তো নৃত্যানুষ্ঠানে আমার প্রিয় নৃত্যই করে প্রমাণ করলে পুরুরবার প্রতি তোমার অনন্ত প্রেম এখনও ফুরোয়নি।

উর্বশী এই আচমকা কথায় একটু নাড়া খেয়ে বলল : তুমি আমাকে ভালবাস তা আমি খুব গভীরভাবে টের পাই—একথা বলছ?

সরল অকপট গলায় পুরুরবা খুশি খুশি হয়ে বলল : হাঁ-গো আমিও বুকের মধ্যে টের পাই। তোমাকে স্বপ্নে দেখি। স্বপ্নে প্রেম করি।

উর্বশী কিছুক্ষণ বিহ্বল হয়ে চেয়ে রইল। তারপরেই ছিলা ছেঁড়া ধনুকের মত টানটান হয়ে বলল : তোমার কোন কথা বিশ্বাস করি না আমি।

আমি তোমাকে বিশ্বাস করতে বলছি না। জোর করে কিছু বলার মুখ তো আমার নেই।

তুমি চুপ করবে। এসব কথা শুনতে আমার একটুও ভাল লাগছে না। পুরুরবার উর্বশী মরে গেছে। হারিয়ে গেছে অন্য এক জীবনের স্রোতে। তাকে আর কোনদিন পাবে না।

কোন প্রেমই মরে না প্রেয়সী। এক জায়গায় মনটা মাঝে মাঝে আটকে থাকে বলে ঝড় উঠে, তখন পরিবেশ, জীবনযাত্রা সব কিছু সম্বন্ধে বড় বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠি। একঘেয়েমিতার প্রতি জমে উঠা ঘৃণার বিষটাই তখন উগরে দিয়ে ফুরিয়ে যাওয়া জীবনকে নবীকৃত করে, নূতন প্রাণ এনে দেয়। এর নাম জীবনস্রোত।

তোমার কথাই মেনে নিলাম। স্রোত থেমে থাকে না। উর্বশীও থেমে নেই এক জীবন থেকে আর এক জীবন স্রোতে ভেসে গেছে। এক মিথ্যে জীবনের অন্ধকার গহ্বর থেকে অন্য জীবনের আলোকিত প্রান্তরের দিকে সাগরে যাওয়া নদীর মত উন্মত্ত উৎসারে ধেয়ে গেছে।

বুক ব্যথিয়ে উঠল পুরুরবার। বলল : এটা তোমার ছদ্মবেশ। আর কেউ না জানলেও আমি জানি নিজেকে লুকিয়ে রাখার জন্যে কী সংগ্রাম করছ তুমি। মনের সঙ্গে লুকোচুরি খেলবে কতকাল এই ছদ্মবেশ পরে সারাজীবন কি কাটিয়ে দেওয়া যায়?

তুমি আমাকে দুর্বল করে দিও না। বেশ আছি; আমার কোন দুঃখ নেই। শুধু শুধু আমাকে অপমান করে তোমার কি সুখ? আমি এখন ইন্দ্রের প্রিয়সখী। আমার পাষাণ প্রাণ গলবে না তোমার কথায়। তুমি ফিরে যাও রাজা।

ফিরে যাব বলে আসিনি রাণী। আমার সমস্ত সত্তার মধ্যে তোমাকে গভীরভাবে টের পাই।

এসব পুরনো কথা বলে কি সুখ পাও বলত?

বলতে ভাল লাগে। ফুরিয়ে যাওয়া, হারিয়ে যাওয়া আমিটা আবার নতুন হয়ে উঠে। বড় শান্তি পাই মনে।

বানিয়ে বলছ না তো।

বানিয়ে বলতে পারি না বলেই তো নিজেও দুঃখ পেয়েছি, তোমাকেও দুঃখ দিয়েছি।

ঠিক সেই মুহূর্তে দরজার বাইরে অনুচ্চ গলাখাঁকারির শব্দ পাওয়া গেল। তারপরেই মৃদু করাঘাত। উর্বশীর খুব অবাক লাগল। পুরুরবার উৎকণ্ঠিত দুই চোখের দিকে তাকিয়ে সে বিছানা থেকে উঠে দরজা খুলল।

রম্ভা দাঁড়িয়ে। চোখে তার বিদ্যুৎ কটাক্ষ। মুখে বঙ্কিম হাসি। উর্বশীর সারা শরীর বিদ্যুৎ খেলে

গেল। ভুরু কুঁচকে বলল : রম্ভা তুমি? এমন অসময়ে কোনদিন তো তোমার দর্শন পাইনি। কি ভেবে এলে বোন?

রম্ভা ফিক্ করে হাসল! বলল বরের সঙ্গে খিল এঁটে সারাক্ষণ গল্প করলে হবে। তাকে খেতে দিতে হবে না? তোমার বরের পছন্দ খাবার কি জানতে এলাম।

উর্বশী ভ্রূকুটি করল। সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তার চোখের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে একটু বিরক্তি প্রকাশ করে বলল : ও আমার কেউ নয়। একজন চেনা লোক। আতিথেয়তার নামে মশকরা করার কোন দরকার ছিল?

তোমার বরকে দেখব বলেই এসেছি। খুব দেখতে ইচ্ছে করছিল।

কাল তো দেখেছিল।

কই আর দেখলাম? যার জন্যে উর্বশীর তালভঙ্গ হল, সেই মানুষটা কেমন দেখতে, খুব দেখতে ইচ্ছে করে।

উর্বশী হাসল। বলল : তবে ঘরে এস।

পুরুরবাকে দেখিয়ে বলল : এই সেই কঠিন পুরুষ মানুষ যে আমাকে ইন্দ্রের হাতে তুলে দিয়েছিল। রামচন্দ্রও পারেনি নিজের বউকে অন্য পুরুষের হাতে তুলে দিতে! ওর মধ্যে ভালবাসা-টাসা কিছু ছিল না। একদম না। ওর সঙ্গে থাকাটা ভীষণ অপমান।

পুরুরবা জানলার ধারে পাথরের মূর্তির মত চুপ করে দাঁড়িয়েছিল। শরীর যেন প্রাণহীন স্পন্দনহীন। দুটি বড় বড় চোখে নিষ্পলক দৃষ্টি। চোখের চাউনিতে অব্যক্ত যন্ত্রণা। অপমানে মুখখানা গন গন করছিল।

রম্ভা অস্বস্তিবোধ করল। কথা বলার উৎসাহ নিভে গেল। কিছু বলার মত কথা খুঁজে পেল না। উর্বশীর উপর রম্ভার রাগ হল। এত ঘেন্না কি একজন মানুষকে আর একজন মানুষ করতে পারে? উর্বশীকে ভর্ৎসনা করে বলল : ছি! মহারাজ কী ভাবলেন বলত? তোমাদের ঝগড়ার মধ্যে আমি থাকব না। আমি যাই। তোমরা গল্প কর।

রম্ভা নিজেই দরজাটা টেনে দিয়ে গেল। স্বস্তির শ্বাস পড়ল উর্বশীর, বলল : কিছু বুঝতে পারলে রাজামশাই? ও এসেছিল চরগিরি করতে।

কে জানে? পুরুরবার গলায় স্পষ্ট উদাসীনতা।

উর্বশী একটু বিষণ্ণ হেসে বলল : তা-হলে বুঝে দেখ, তুমি আমাকে কত সুখে রেখেছ। সব সময় কেউ না কেউ পাহারা দেয়, আমাকে অনুসরণ করে—তাই না?

তুমি এটাকে সহ্য কর? কেন কর উর্বশী?

উর্বশী পুরুরবার মনোভাব জানে। তবু কেমন যেন এই প্রশ্নে অবাক হয়ে গেল। মাথা নেড়ে বলল : আর করব না।

পুরুরবা ঢোঁক গিলে ভয়ে ভয়ে বলল : একটা কথা জিজ্ঞেস করব?

করবে না কেন?

তুমি কি সুখে আছ?

উর্বশী মাথা নাড়ল। একটু হেসে বলল ঃ দিব্যি আছি। এটাই আমি চেয়েছিলাম। এখানে সামাজিক শাসন নেই, মানিয়ে নেয়ার প্রশ্ন নেই। স্বামীর হুকুম নেই। আশ্রয়ের কোন চিন্তা নেই। স্বাধীনভাবে আরো উদারভাবে বেঁচে থাকার অধিকার এখানে যত পাই তোমার কাছে তার কানাকড়ি পাইনি। অগ্নিসাক্ষীর মূল্য আমাদের জীবনে কতটুকু। প্রেম মানে বিশ্বাস, নারীপুরুষের সম্পর্কের একটা বোঝাপড়া। কিন্তু তার কতটুকু মূল্য উর্বশী তোমার কাছে পেয়েছে, বল? জীবনকে যা সুন্দর আর সার্থক করে তোলে তা-হল বিশ্বাস। বিশ্বাসের অপমৃত্যু যেখানে হয়েছে, কোন প্রত্যাশা নিয়ে সেখানে ফিরব? নিজের অস্তিত্বটাই সেখানে চরম অপমানের। প্রতিদিন নারীত্বের অপমান সহ্য করে সম্পর্কটা টিকিয়ে রাখাটা অসহনীয়। তুমি ফিরে যাও রাজা। আমার চল্লিশ বছর জীবনে আগে কখনোই এখানকার মত এত আনন্দে সময় কাটাতে পারিনি। মন আমার পরম প্রশান্তিতে ভরপুর। আমার আর কোন আকাঙ্ক্ষা নেই। আমার মত সুখী কজন আছে?

বরফের মত ঠাণ্ডা গলায় পুরুরবা বলল : প্রিয়তমা আয়ু রজিকে দেখতে ইচ্ছে করে না? তারা কেমন আছে একবারও জিজ্ঞেস করলে না? কত বড় হয়েছে, কেমন দেখতে হয়েছে, কী করছে, তোমার কথা জিজ্ঞেস করে কি না? জননীর এসব কৌতূহল কিন্তু তোমার ভেতর দেখলাম না? আমি দোষ করেছি, কিন্তু তারা তো কোন অপরাধ করেনি। তুমি তো তাদের জননী। তারা তাদের জননীকে দেখতে পারবে না কেন? অন্তত তাদের কথা ভেবে তো যেতে পার।

আপনা থেকে বুকটা থর থর করে কাঁপিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল উর্বশীর। কথাটা সামাল দিতে চোখ দুটো বুজে এল। চোখ বুজতে আয়ু রজির তুলতুলে কচি মুখ দুটি উজ্জ্বল হয়ে ভেসে উঠল চোখের সামনে। আয়ু রজি একমাত্র তার নিজের। একমাত্র তার বত্রিশ নাড়ী ছেঁড়া ধন। দশমাস দশ দিন তার গর্ভে বাস করে তার শ্বাস হতে শ্বাস নিয়ে পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হল। তাদের দেহের গন্ধ লেগে আছে তার নাকে। বুক জুড়ে বাৎসল্যের সমুদ্র তোলপাড় করে উঠল। কোথায় লুকনো ছিল এই অদ্ভুত অনুভূতিগুলো? একটু আগেও তাদের কোন অস্তিত্ব ছিল না বুকের ভেতর। হঠাৎ কোথা থেকে তারা ছুটে এসে দামাল ছেলের আদরের মত তাকে অস্থির করে দিল। চোখের কোল ভরে গেল জলে। কেমন যেন একটা নেই নেই ভাবে মনটা দীন হয়ে গেল এক দুর্বল আবেগে।

বেশ কিছুক্ষণ চেতনাহীন আচ্ছন্নতার মধ্যে কাটল। উর্বশী চোখ বুজে একটা লম্বা শ্বাস নিল। বাতাস থেকে পুত্রদের গায়ের ঘ্রাণ যেন শুষে নিল। বড় বড় চোখ করে পুরুরবার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে হঠাৎ ঠাণ্ডা গলায় বলল : সব জেনেশুনে একজন মানুষকে কষ্ট দিতে তুমি কি খুব আনন্দ পাও? অতীতকে ভুলতে চাই। বর্তমান থেকে অতীতে ফেরা বড় কষ্টের। আমি আর মা নই, অপ্সরা। অপ্সরাদের জননী হতে নেই। আমার অভিশপ্ত জীবনের কোন আঁচ আয়ু রজির গায়ে লাগতে দেব না। গর্ভে ধারণ করা ছাড়া মায়ের কোন দায়িত্ব আমি করিনি। মহারাজ তুমি বলেছিলে গর্ভে ধারণ করলে মা হয় না। আমার সঙ্গে তাদের কোন সম্পর্ক গড়ে উঠেনি। আয়ু রজির কথা ভেবে আমার আকুল হওয়ার কিছু নেই। ধাইয়ের কাছে তারা ভাল থাকবে। তা হলে আজ এসব কথা উঠছে কেন?

নিজের গলার স্বর তার নিজের কানেই অন্যরকম শোনাল। স্বাভাবিক নয়। তার বুকে একটা অস্থিরতা শুরু হয়েছিল। শ্বাসকষ্ট হচ্ছিল। কিন্তু সেইটা কোন শারীরিক কারণে নয়। অন্য এক অদ্ভুত দুর্বল অনুভূতির কারণে। অবরুদ্ধ আবেগে দাঁতে দাঁত টিপে বলল : আমার জন্যে সত্যি তোমাকে কিছু করতে হবে না। শুধু আমাকে তোমার সন্তানের জননী বলে ভেবো। ওদের তো আমি পেটে ধরেছি। আমার যা কিছু দাবি, অধিকার তা শুধু ওদের কাছেই। ওরা আমাকে মা বলে একটু ভাবলে, ভালবাসলে, শ্রদ্ধা করলেই হবে। ওদের জন্যে আমার যখন খুব কান্না পাবে, যখন মনটা খুবই অশান্ত আর অস্থির হয়ে পড়বে তখন ওদের সঙ্গে দেখা করতে দিও, কাছে ডাকলে পাঠিয়ে দিও। বলতে বলতে দুহাতে মুখ ঢেকে উর্বশী কান্নায় ভেঙে পড়ল।

পুরুরবা কিছুক্ষণ উর্বশীর দিকে চেয়ে থেকে বিভ্রম বোধ করল। প্রস্তাবটা তার প্রত্যাখ্যান করতে ইচ্ছে করল না। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল : যে রকম চাইছ, সে রকম পেলেও তুমি খুশি হবে না। তোমার ভিতরে বড় অস্থিরতা। যে জীবন কাটাচ্ছ তাকে মারতে পারছ না। আর প্রত্যাখ্যানও করতে পারছ না।

উর্বশী কোন উত্তর দিল না। খোলা জানলা দিয়ে হু হু করে বাতাস আসছিল। উর্বশীর চুল উড়ছিল। সে খুব মন দিয়ে সূর্যালোকিত ধরণীর দিকে চেয়েছিল।

আচমকা পুরুরবা উর্বশীর গলাটা দু'হাতে জড়িয়ে ধরল। তার মুখের উপর চোখ পেতে রাখল। করুণ দৃষ্টিতে উর্বশীর মুখখানার দিকে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। উর্বশীর শান্ত দুটি চোখের দৃষ্টি পুরুরবার মুখের সীমানা ছাড়িয়ে চারদিককার আলোছায়ার মধ্যে প্রসারিত হয়ে যাচ্ছিল। উর্বশীর দুই চোখে জল। বড় সুন্দর লাগছিল। পুরুরবা মুছিয়ে দিল নিজের উড়নী দিয়ে। উর্বশী বাধা দিল না, আপত্তি করল না। পুরুরবার বুকের ভেতর একটা দুরন্ত অবাধ্য ইচ্ছা তাকে ভেতরে ভেতরে অস্থির করে তুলল। তৃষিতের মত পুরুরবা তার মুখখানা এগিয়ে দিল। কিছু বোঝার আগেই পুরুরবার তপ্ত এবং ভেজা

দুটি ঠোঁট চেপে বসে গেল উর্বশীর ঠোঁটে। কিছুক্ষণ উর্বশীর বুকের ধক ধক আওয়াজ নিজের বুকে শুনল। উর্বশী বাধা দিল না। শান্ত নদীর মত স্থির হয়ে রইল।

আচ্ছন্ন অবস্থায় উর্বশী বলল : কতদিন পর তুমি আমাকে আদর করলে, চুমু খেলে। মনে হচ্ছিল আমার সমস্ত সত্তা ভরন্ত কলসের মত ভরে যাচ্ছে এক অত্যাশ্চর্য প্রাপ্তির সুখে। তুমি আমার ভিতরটা পর্যন্ত ধুয়েমুছে পবিত্র করে দিয়ে গেলে। কী যে সুন্দর লাগল, কী যে ভাল। নিজেকে তোমার অপবিত্র মনে হচ্ছে না তো? প্রজারা তোমাকে বিশ্বাসঘাতক বলে ভাববে না?

পুরুরবা আস্তে আস্তে মাথা নাড়ল। বলল : না প্রিয়তমা। ইন্দ্রের দিকে ঠেলে দিয়ে যে ব্যথা, যন্ত্রণা আমি পেয়েছি, তার বেশি সুখ ও আনন্দ নিয়ে যাচ্ছি দেবভূমি থেকে। জীবনে যাকে কিছু দেওয়া হয়নি, ইন্দ্রের কাছে সে যদি খুঁজে পেয়ে থাকে জীবনের সুখ, সুখের আশ্রয়, মনের মত গৃহ তা-হলে এর মত আনন্দ আমার কি আছে?

অমন করে বল না। সত্যি বলছি আমাকে তুমি ভুলে যাও। সেই-ই হবে আমার তোমার ভালবাসার সবচেয়ে বড় প্রমাণ।

নয়নভরা জল নিয়ে উর্বশী ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল।

একা জানলার ধারে চুপ করে বসেছিল উর্বশী। একা হলেই মানুষ নিজের সঙ্গে অজস্র কথা বলে। অবারিত পৃথিবীর দিকে দুটি চোখ পেতে রেখে উর্বশী বিভোর হয়ে ছিল। চোখে তদগত দৃষ্টি, যা সাধকের থাকে। তবে বৈরাগ্য কিংবা নিস্পৃহতা নয়। চোখে এক ধরনের ধিকি ধিকি আগুন জ্বলছিল উর্বশীর। পুরুরবার অধরসুধা পান, আলিঙ্গনের সুখস্পর্শে তার হৃদয় মথিত ব্যথিত হচ্ছিল। আর একটা অদ্ভুত অনুভূতি, উপলব্ধিতে মনটা আচ্ছন্ন হয়ে রইল।

ভালবাসা ব্যাপারটা বোধ হয় মানুষের একটা অদ্ভুত অনুভূতিগত ব্যাপার। পাত্র বিশেষে এক একজনের বেলায় এক এক রকমের অনুভূতি। সন্তানকে হৃদয় নিংড়ে দিয়ে যে অনুভূতি হয়, ইন্দ্রের প্রেমে সে অনুভূতি হয় না। পুরুষের বুকে নদী হয়ে মিশে যাওয়ার সুখও আলাদা। ইন্দ্রের সঙ্গে অবৈধ প্রণয় উন্মাদনায় ঘুঙুর বাজে শরীরের মধ্যে। সমস্ত হৃদয়টা যেন ভরে ওঠে এক তীব্র জ্বালাধরা আনন্দে। কিন্তু পুরুরবার বাহুবন্ধনে তা হয় না। আলিঙ্গন কেমন একটা পবিত্র প্রসন্নতায় ভরে দেয় অন্তর। তবু এক গভীব অস্তিত্ববোধে তার বুক তোলপাড় করে। এক ধরনের কষ্ট হয়। নিঃশ্বাস ভারি হয়ে উঠে বুকের মধ্যে। আয়ু, রজির গায়ের গন্ধ ফুলের মিষ্টি গন্ধের মত তার অনুভূতিতে ছড়িয়ে পড়ে। বুক হাহাকার করে উঠে।

মানুষের মনটা উর্বশীর সমুদ্র সঙ্গম বলে মনে হয়। সব নদী সাগরে এসে মেশে। তেমনি বিভিন্ন অনুভূতি মনে জমা হয়। সাগর সঙ্গমের মতন নানা মিশ্র স্রোতের আলোড়ন হয় মনের অভ্যন্তরে। একটি ছোট্ট নদীও তার ছোট্ট অংশটুকু ছড়িয়ে দিচ্ছে বিরাট গুরুগর্জনে অনন্তকাল ধরে বয়ে যাওয়া সাগরের পটভূমিতে। পটভূমিই সব। পটভূমি না পেলে মানুষের মনের রূপ তার অনন্ত প্রেম ও ভালবাসার স্বরূপটা ঠিক খোলে না। মানুষের মনটা সত্যিই খুব ছোট্ট জায়গা। বিশাল পটভূমিতে তার বৈচিত্র্য, এবং চিন্তার বিশালতা ধরা পড়ে। খুব কম নারী তার মত এত বিচিত্র অনুভূতি লাভ করেছে এক জীবনে।

এসব বড় ও মহান ভাবনা ভাবার জন্যে উর্বশী নয়। তাকে নিয়ে যাদের অনন্ত কৌতূহল তারা গবেষণা করুক। নিজের অন্তর্জগতে স্বাধীনতা আনতে পারলেই সে সুখী। প্রত্যেক মানুষের জীবনেই বোধ হয় সে নিজেই কেন্দ্রবিন্দু। তাকে কেন্দ্র করেই চারধারে অন্যান্য সব সম্পর্ক আছে। সেই সব সম্পর্ক না থাকলেও কিংবা চিরদিনের জন্য কেটে গেলেও বোধ হয় একজন মানুষ দিব্যি সুখে বেঁচে থাকতে পারে। এই সত্যই এক মুগ্ধ চমকের মত চমকে দেয় তাকে। যা যা ঘটেছে তার জীবনে, তা যদি না ঘটত তাহলে জীবনটা দৈনন্দিনতার একঘেয়ে অভ্যেসের মতই সামান্য হয়ে থাকত। তা হয়নি শুধু তার নিজের জন্যই। জীবনের অন্ধকার গহ্বরের গোলকধাঁধার ভেতর ঢুকে পড়ে নিজের

নগ্ন শরীরের সুগন্ধে বুঁদ হয়ে আর একটা শরীরের সঙ্গে কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুমিয়ে থাকেনি।

পুরুরবার গৃহ থেকে যেদিন ইন্দ্রের নন্দন কাননে নির্বাসিত হয়েছিল সেদিনটা মনে আছে উর্বশীর। জীবনে কিছু কিছু ঘটনা থাকে যা মানুষ কোনদিন ভোলে না। ভোলা যায় না বলেই মনে থাকে। রথে বসে নন্দনকাননের তার দর্শনীয় বাসগৃহটি দেখামাত্র বুকের ভেতরটা হু হু করে উঠেছিল। মনে হল, তার কলিজার মধ্যে কে যেন তীক্ষ্ম ছুরি বসিয়ে দিয়েছিল আমূল। সেদিন মনে হয়েছিল এ জীবনে আর বাঁচা হল না তার। পুরুরবাকে ছাড়া, আয়ু রজি ছাড়া সে বাঁচবে কী করে?

কিন্তু বেশ বেঁচে আছে।

আসলে বোধ হয় প্রত্যেক মানুষের মধ্যে একজন ভণ্ড মানুষ থাকে। সে সত্যি যা নয় নিজেকে সেই মিথ্যেরূপেই অন্যের কাছে প্রতিভাত করার একটা সহজাত প্রবণতা তার থাকে। এটা বেঁচে থাকার একটা ধাঁধা। অন্য মানুষ তার ছদ্মবেশ ধরে সাধ্য কী?

বাইরে বেলা পড়ে এসেছে। রোদের রঙ কমলা হয়ে এসেছে। দূরে কোথাও বউ কথা কও পাখি, চোখ গেল চোখ গেল পাখি ডাকছে বড় আর্তসুরে। তার নিজের ভেতরটাও অমন কেঁই কেঁই করছে।

বেহুঁশ এরকম একটা অনুভূতিতে তার চেতনা ছিল আচ্ছন্ন। হঠাৎ পায়ের খস খস শব্দে চোখ তুলে চাইল উর্বশী। পরিচারিকা সুকেশী কিছু একটা বলার জন্যে উশখুশ করছিল। এ হল তার ভূমিকা। সেই কথাটা কী হতে পারে আন্দাজ করতে পারে উর্বশী। নিশ্চয়ই দেবরাজ ইন্দ্র তার অপেক্ষা করছে তার প্রমোদকক্ষে। সুকেশীর সাহস হচ্ছিল না সেই কথা বলতে। উর্বশীই জিজ্ঞেস করল : কিছু বলবে?

আঙুলে কাপড় জড়াতে জড়াতে মাথা হেঁট করে বলল : দেবরাজ ইন্দ্র এসেছেন। দেবনরপতি মিত্র ও বরুণকে সঙ্গে করে প্রমোদকক্ষে অপেক্ষা করছেন। তুমি এস। চাহনি দেখে মনে হচ্ছে কিছু একটা মতলব আছে।

কেমন করে জানলি?

—দুঃখকে যারা জেনেছে, তারা সব আগে আগে টের পায়। ওদের চাউনি ভাল নয়। আমার কিন্তু ভাল লাগছে না।

আমাদের ভাল মন্দ বলে, কিছু আছে কি? কোন সর্বনাশের ভয় করব আমরা? সর্বনাশের বাকী আর কি আছে? আমাদের কথা কেউ ভাবে না কখনও।

দিদি তুমিও বলছ।

সহজ এবং স্বাভাবিক না হতে পারলে মুক্তির সব পথই বন্ধ বোন। সেই বন্ধনের ফাঁসে সমস্ত সত্তাটা নীল হয়ে যাবে। অথবা নিজের নিজের মনের কারাগারে কয়েদী হয়ে বাস করবে। আবেগ, স্বাভাবিকতা যারা বাঁচিয়ে রাখতে পারে তারাই কেবল নদীর মত ঢেউয়ে ঢেউয়ে এগিয়ে যেতে পারে এ জীবনে। বাঁচে তারাই। জীবন নদীর মত। কত স্রোত কোথা থেকে আসছে কেউ জানে না। তবু সব স্রোত বুকে নিয়ে নদী চলেছে সাগরের দিকে। জীবনটাকে আমি নদীর মতই ভাবি। তাই কোন দুঃখ-অভিমান মনে জমিয়ে রাখি না। যা হবার সব হয়ে গেছে এ জীবনের মত। ফেরার পথ আর নেই। নদীর মত আমার এ জীবনে অবগাহন করে অনেক নরপতিকে ডুবতে হবে। যাদের ডুবে মরতে ভয় নেই তারাই আসে। কিন্তু ইন্দ্র জানে না, যে একজন মানুষ ডুবলেই মরে না। সাঁতরে এসে নতুন করে বেঁচে উঠে। শুধু ভাবি আমার অদৃষ্টটা বড় মন্দ। নীরব অদৃশ্য লড়াই তার সঙ্গে লেগেই আছে। প্রতিমুহূর্ত হারজিতে ভরা আমার জীবন। আমার মত এসব অভিশপ্ত হতভাগা জীব পৃথিবীতে ঈশ্বর আর একটাও সৃষ্টি করেনি। উর্বশীর কণ্ঠে কেমন এক অদ্ভুত হতাশা সুকেশীকে অবাক করল। একটু থেমে সুকেশী বলল : প্রত্যেক মানুষের সব বিরোধ তার নিজের সঙ্গে। চিরদিনের জন্য, নয়ত কিছু দিনের জন্য। সেই ঝগড়া থেমে গেলে অনেক হতাশা ও ক্লান্তি, গ্লানি জন্মায় মনে। তোমার মনে অনেক তাপ জমেছে। ব্যর্থ প্রেমের অভিমান বুকে নিয়ে ইন্দ্রের বুকে আছড়ে পড়ার সেই সুখটুকু কি তোমার ভাগ্যেও ফুরোল?

না তুমি যা ভাবছ, তা নয়। মাঝে মাঝে জীবনে এরকম যতির বোধ হয় খুব দরকার হয়।

দীর্ঘ পথ চলা বড়ই ক্লান্তির, একঘেয়েমির। মাঝে মাঝে ক্লান্তি আসে, অবসাদ নামে মনে। তখন সব মানুষ নিজের কাছেই ফুলে ফুলে কাঁদে। আবার চোখের জল মুছে দ্রুতগতিতে বয়ে যাওয়া জীবনস্রোতে ইচ্ছাহীন, মনহীন শরীরটা নিয়ে ভেসে পড়ে। থেমে থাকা মানেই একধরনের মৃত্যু। জোয়ার-ভাটার সন্ধিক্ষণটুকুই বোধ হয় সেই যতি।

জীবনের কথা এত জটিল করে বল তুমি যে, তার মানে বুঝতে পারি না।

না বোঝার কী আছে বোন? অনুভূতির উপর মনের আলো ফেলে দেখলে তুমিও টের পাবে বিরাগ বিতৃষ্ণায় হঠাৎ দামী হয়ে উঠে জীবন। আর তখনই ভিতরের ডাক শোনা যায়।

বলতে গিয়ে উর্বশীর গলার স্বর কেঁপে গেল, মুখের ভাব বদলে গেল। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে বলল : দেবরাজকে একবারটি আমার বসার ঘরে আসতে বলবে বোন।

হঠাৎ ঘরের মধ্যে নিস্তব্ধতা নেমে এল। সুকেশী একটু দাঁড়িয়ে চলে গেল।

উর্বশী একটু হালকা প্রসাধন করে এল বসার ঘরে। সুদৃশ্য বাহারী কেদারায় ইন্দ্রের দিকে মুখ করে বসল। ইন্দ্রের ফর্সা মুখ তাতেই লাল হয়ে গেল। কিছুক্ষণ চুপ করে অপলক চেয়ে থাকার পর উর্বশী কৌতুক করে বলল : দেবরাজ ইন্দ্রের মেয়েমানুষের খোঁজ করতে কি বন্ধুদের নিয়ে এখানে ওঠা হল? নন্দন কাননে মেয়েমানুষের অভাব নেই, দেবরাজ ভুল করে কি উর্বশীর ঘরে ঢুকে পড়েছেন? আপনাকে নিয়ে সত্যিই আমি পারি না। কী লজ্জা বলুন তো?

লজ্জা! লজ্জা কিসের? লজ্জার মত কোন কাজ তো করিনি।

ছিঃ, একজন মেয়ে হলে বুঝতেন, কী অপমানটা আপনি আমাকে করলেন?

ইন্দ্র চুপ করে উর্বশীর দিকে চেয়ে রইল। কথা বলল না। উঠে গিয়ে উর্বশীর পাশে বসল। বসে উর্বশীর হাতটা তুলে নিল। আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে দিল। তারপর ওর মুখখানা নিজের চোখের উপর ধরল। চোখের মধ্যে চোখের দৃষ্টি এমন করে ফেলল ইন্দ্র, যেন উর্বশী অন্য দিকে চোখ ঘোরাতে না পারে। উর্বশী ইন্দ্রের এই সোহাগ, আদর, তাকানোর অর্থ জানে। তবু, ঐ ভাবে চোখে চোখ রাখার ভেতর একটা নেশা আছে। কিছুক্ষণ অপলক চেয়ে থাকার পর বলল : এবার চোখ নামান। আপনার ফন্দী আমি জানি।

উর্বশী, মিত্র বরুণ তোমার নৃত্য দেখে খুশি হয়ে অভিনন্দন জানাতে এসেছে।

উর্বশীর ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটল। কটাক্ষ করে বলল : তাই বুঝি? কিন্তু অভিনন্দন কুড়োতে আমার বড় ভয় করে।

ভয়ের কী আছে?

দেবরাজ চেয়ে দেখুন বাইরেটা। কোথাও অন্ধকার নেই। ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় আকাশ হাসছে। রাত্রির কোন অবগুণ্ঠন নেই। সবটাই মুক্ত, অবারিত। অনেকদূর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। রাতের গন্ধের সঙ্গে বনফুলের গন্ধ, জুঁই, মালতী, মাধবীর গন্ধ মিশে গেছে। ধরণী বুঁদ হয়ে গেছে গন্ধে। এই মায়াবী চাঁদনী রাত যদি চোরের মত আমাকে চুরি করে, —বলে থেমে গিয়ে মুখ নামাল উর্বশী।

ইন্দ্র আশাভঙ্গতায় ছাই হয়ে বলল : তা বটে। কিন্তু সভ্রান্ত অতিথিরা এসেছেন তোমায় দর্শন করতে, অন্তরের খুশি জ্ঞাপন করতে। ওঁদের ইচ্ছে অপূর্ণ রাখলে অপমান করা হয়।

কিন্তু ওদের চোখে উপোসী ভিখারির খিদে জ্বল জ্বল করছে।

ইন্দ্র মৃদু হেসে বলল : তাদের চোখে দেখলে না, অথচ তাদের চোখের ভাষা বুঝে ফেললে—

সব মেয়ের একটা অতিরিক্ত ইন্দ্রিয় থাকে। তাই দিয়ে আগেভাগে বিপদ টের পায় যে।

ইন্দ্র এবার হেসে উঠল। হা-হা করে হাসল। উর্বশীর মনে হল, দস্যু হাসল চাঁদের রাতে। উর্বশীর হাত আলগা হয়ে গেল। ইন্দ্রের মুঠি থেকে হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে বলল : আপনার হাসিটা ভয়ংকর। ভীষণ খারাপ লোক আপনি।

লোকে তাই বলে।

ইন্দ্রের রসিকতার মধ্যে এমন একটা রুক্ষতা ছিল যে উর্বশীর খুব কষ্ট হল। গলার কাছে কী যেন একটা দলা পাকিয়ে আটকে রইল। উর্বশী জানলার কাছে উঠে গেল। একটা বুনো কটু গন্ধ পেল নাকে।

বাইরের দিকে তাকিয়ে বলল : অনেকগুলো পথের মোড়ে এসে মাঝে মাঝে থমকে দাঁড়িয়ে পথিককে ঠিক করে নিতে হয় কোন পথে যাবে? সাহস, বুদ্ধি সব সময় যে কাজে লাগে না আমার জীবনে তা বহুবার দেখেছি। এক্ষেত্রে সঠিক নির্বাচনই আসল কথা। কারণ একবার ভুল পথে গেলে খেসারত দিতে হয় অনেক। কখনো কখনো সে ভুল শোধরানোর রাস্তাও খোলা থাকে না।

ইন্দ্র বেশ একটু বিরক্ত হয়ে বলল ঃ আমি নাটক বুঝি না। আমি তোমাকে নিজের স্ত্রীর অধিক ভালবাসি, সম্মান করি। পরস্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও। তবু তোমরা এই সতীপনার নাটক কর।

নাটক? উর্বশী আহত গলায় বলল। তারপর মুখ ফিরিয়ে দাঁতে দাঁত টিপে কষ্টে বলল : হয়ত নাটকই।

ইন্দ্র নিজের অন্যায় বুঝতে পেরে তাকে সামাল দেবার জন্যে বলল : তুমি সব বোঝ, কেবল বোঝ না শরীর ছাড়াও একজন পুরুষকে দেওয়ার মত অনেক কিছুই আছে তোমার। নিজে যা নয়, অনেক সময় অবস্থার ফেরে তাই হয়ে উঠতে হয় তাকে? কিন্তু সত্যি কি সে তা হয়? নাটকে রাজার পোশাক পরে অভিনয় করলেই কি জীবনে রাজা হয়ে যায়? কিংবা যে অসৎ, চরিত্রহীন, সে মহতের কিংবা ধার্মিকের অভিনয় করলেই কি তার ব্যক্তিত্ব কিংবা চরিত্র বদলে যায়? শরীরের প্রেমে কোন দোষ নেই, ওটা পোশাকেরই মতই। ধুলোর মত ঝেড়ে ফেললেই হল। শরীরে কোন পাপ লাগে না। পাপ হয় মনে। দোষ মনের প্রেমের। তাও দোষ মনে করলেই দোষ।

উর্বশী চমকে ইন্দ্রের মুখের দিকে তাকাল। তীব্র ঘৃণায় মুখ বিকৃত করল। বলল : দেবরাজ, আপনি পুরুষমানুষ। মেয়েমানুষ হলে বুঝতেন শরীরও সম্পূর্ণ সত্তার অনেকখানি। শরীরও জীবন। শরীরে কিছু হলে মনে কষ্ট হয়। শরীর সুস্থ না থাকলে মন মরে যায়।

ইন্দ্র বেশ একটু গম্ভীর গলায় বলল : তুমি বড় বাড়াবাড়ি করছ উর্বশী। মিত্র বরুণ আমার অতিথি। তাদের অসম্মান করলে দেবতারা ইন্দ্রকে নিন্দে করবে। কারণ সব দেবনরপতির তুমি বাঞ্ছিতা। সবাই তোমার পরশে ধন্য হতে চায়। তুমি শুধু ইন্দ্রের নও। দেবলোকের পরম বিত্ত। একি কম কথা! পাঞ্চাল রাজকন্যা দ্রৌপদীর কথা ভাব। পাণ্ডবদের ঐক্যের স্বার্থে নিজেকে আহুতি দিয়েছে। এজন্যে কিন্তু তার মনে কোন গ্লানি নেই, পাপ, অপরাধবোধও নেই। অথচ, যুধিষ্ঠির ছাড়া আর কারো সঙ্গে তার সম্পর্ক সামাজিক ও বৈধ ছিল না। তবু পঞ্চপাণ্ডবকে নিবিড় প্রণয়ে বাঁধতে তার কোন বাধা হয়নি। তোমার কেন হবে? আজ তুমি দেবলোকের প্রণয়িণী। এর চেয়ে গর্ব, সৌভাগ্য আর কী আছে?

অবাক চোখে তাকিয়ে রইল উর্বশী। গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল : কিছু বলার নেই আমার। ভালবাসা ভালবাসা খেলা পুরুষেরই মানায়।

পুরুরবাকে অপমান করার জন্য, ফিরিয়ে দেবার জন্য উর্বশীর ভীষণ কষ্ট হল। এই মুহূর্তে তাকেই সবচেয়ে বেশি মনে পড়ল।

একবুক অভিমান নিয়ে স্তব্ধ হয়ে বসে রইল উর্বশী। মুখখানা বিষাদে থম থম করছিল। ধবধবে সাদা বিছানায় আধশোয়া হয়ে জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে ছিল। চোখের সামনে ধূ-ধূ নীল আকাশে ধকধক করে ধ্রুবতারা জ্বলছিল। উর্বশীর মনে হচ্ছিল অন্ধকারের বুকে হারিয়ে যাওয়া পৃথিবীর সব রূপ রঙ, শব্দ ও গন্ধের দিকে লোভীর মত তাকিয়ে আছে ধ্রুবতারা।

বরুণের নিঃশব্দ আগমন উর্বশী টের পেল। কিন্তু ঘাড় ফিরিয়ে একবারও দেখল না তাকে। সন্ধ্যার ধ্রুবতারা তার মুগ্ধ ব্যথিত হৃদয়কে এমন করে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল যে অন্য কিছুর প্রতি কৌতূহল ছিল না। বরং বরুণের আগমনে তার মনে হল, ওর মধ্যে বোধ হয় সামান্য কেশী, সামান্য পুরুরবা এবং অনেকখানি ইন্দ্র আছে।

বরুণ ঘরে ঢুকে উর্বশীর দিকে স্নিগ্ধ চোখ মেলে চেয়ে রইল, পদ্ম যেমন ভোরের সূর্যের দিকে তাকিয়ে থাকে। কী ভাল লাগছিল তাকে। পা টিপে টিপে এসে ওর পালঙ্কে বসল। এত কাছ থেকে

এত আলোর মধ্যে এমন করে আসে কখনও দেখেনি বরুণ। কেমন যেন নতুন লাগল তাকে। এক একজন নারীর এমন একটা অব্যক্ত সৌন্দর্য থাকে যে তার মাধুর্য চোখে লেগে থাকে। অজান্তে বুক থেকে একটা গভীর শ্বাস পড়ল।

উর্বশী চমকাল, কিন্তু ঘাড় ফিরিয়ে দেখল না। বরুণ একটু ইতস্তত করে বলল : সুন্দরী আমি দেবরাজ বরুণ। তোমার রূপের খ্যাতি কানে শুনেছি, এবার দু'চোখ ভরে দেখলাম। নয়ন জুড়াল। তোমার রূপের নরম উজ্জ্বলতা ধ্রুবতারাকেও লুব্ধ করে তুলেছে। আমার মতই হ্যাংলা হয়ে তাকিয়ে আছে।

উর্বশী হাসল। আশ্চর্য এক বিষণ্ণ হাসি। ধ্রুবতারার দিকে চেয়ে বলল : ধ্রুবতারা চিরকাল সব পথিককে পথ দেখিয়ে এসেছে, কিন্তু উর্বশীর পথের কোন নিশানা সে দিতে পারল না।

বরুণ শব্দ না করে হাসল। হাসি হাসি মুখ করে বলল : এ প্রশ্ন নিজেকে করেছ কোনদিন?

দূর আকাশের দিকে তাকিয়ে বলল উর্বশী। নিজেকে প্রশ্ন করার সময় পেলাম কোথায়? আমার চারপাশের মানুষের এত ভাললাগা, ভালবাসা, স্তুতি, প্রীতি ছড়িয়ে রয়েছে যে তাদের কান ভরা কথা, মন ভরা সুখ, তৃপ্তি ছেড়ে হিসেব করতে ইচ্ছে হয় না কি পেলাম, আর কি পেলাম না?

তুমি আনন্দরূপিনী। চারপাশের মানুষ, পৃথিবীর সঙ্গে ঐ তারা ভরা আকাশ, জ্যোৎস্না প্লাবিত বন-প্রান্তর, পাহাড়-নদীর মত তুমিও একত্র হয়ে আছ এক বিরাট জীবনস্রোতের অংশ হয়ে। বহুকে রঞ্জিত করার জন্যে এক বিরাট সত্তা নিয়ে বহু মানুষের সঙ্গে মিলিত হবার জন্যে তুমি জন্মেছ। সরে দাঁড়ানোর জন্যে নয়। তোমার রক্তধারা অনন্ত প্রবাহে এক থেকে বহুমুখী, সদাই মিলনে উৎসুক। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের মত তুমি শুধু আকর্ষণ কর। নিজেকে নতুন করে তৈরি কর। এক্ষমতা খুব কম নারী-পুরুষের থাকে। তুমি সেই দুর্বার শক্তির অধিকারিণী। ব্রহ্মের প্রকাশ ঘটেছে তোমার মধ্যে। জান তো, ব্রহ্মার সবচেয়ে প্রকট যে রূপ তা আনন্দরূপ। রসো বৈ সঃ। তিনি রসিক, রসপ্রিয়, রসলোভী। রস অনুভব করে তিনি আনন্দ পান। রস তো একা অনুভব করা যায় না তার জন্য চাই আরো একজন। কথাটা শেষ করেই বরুণ উর্বশীর উপর ঝুঁকে পড়ে চুমুর পর চুমু খেতে লাগল। পাগলের মত।

বরুণের শরীরের ঘরে ঘরে দীপ জ্বলে উঠল। ঘণ্টা বেজে উঠল পুজোর। উর্বশীর সারা শরীর ছটফটিয়ে উঠল। আর বরুণ তাকে পরম আদরে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরল এমন করে যাতে একটুও পিছলে না যায়। চাপা গলায় মন্ত্রোচ্চারণের মত বলতে লাগল : এ না'হলে রসের ধারা বইবে কী করে সুন্দরী? এক থেকে ব্রহ্মা যে দুই হল; আর তার তর সইল না। সে—

নিজেকে অনাবৃত করতে করতে বরুণ বলল : নিজেকে বহু করে আনন্দ সমুদ্র মন্থন করে রসের অমৃত ভাণ্ডার মাথায় করে স্বয়ং লক্ষ্মী উঠে এল মানুষকে অমরত্ব দিতে। শরীর হল সেই সাগর। কামরূপী অসুর, প্রেমরূপী দেবতা মিলে তাকে মন্থন করল। সেই মন্থনে আনন্দস্বরূপিণী লক্ষ্মী ধন্য হয়ে প্রেমের প্রসাদ নিয়ে এল কুম্ভ ভরে।

বরুণের কথাগুলো জড়ানো অস্পষ্ট। তার সারা শরীরে সঘন নিঃশ্বাসের ঘুঙুর বাজছিল। প্রাগৈতিহাসিক গুহামানব তার বাঞ্ছিতা গুহামানবীকে যেমন করে চুমু খায়, রমণ করে তেমন করে পাগলের মত চুমুতে চুমুতে আচ্ছন্ন করে দিল উর্বশীকে। নির্ভেজাল শরীরী উচ্ছ্বাস তাতে এত বেশি ছিল যে উর্বশীর নড়াচড়া করার শক্তি ছিল না।

বরুণের দুরন্ত প্রমত্ততার আবেগে হঠাৎ করে জেগে উঠল তার ভেতর সুপ্ত কামনাগুলো। তীব্র স্বস্তির সঙ্গে উর্বশী বুঝতে পারল সে ফুরিয়ে যায়নি! এখনও অনেক পুরুষকে আনন্দ দেবার মত অনেক কিছুই তার শরীরে আছে। এই প্রথম অনুভব করল একজন মেয়ের বেঁচে উঠার সঙ্গে তার কামবোধের বোধ হয় এক ধরনের সরাসরি, গভীর যোগাযোগ আছে। কামহীনতা একধরনের মৃত্যু। তীব্র কাম- তীব্রভাবে বেঁচে থাকার অন্য এক নাম।

এই হঠাৎ আলোড়নে উর্বশীর শরীরে ব্যথা এবং একটা কামভাব ছড়িয়ে গেল তার ইচ্ছার মধ্যে। স্নায়ুর মধ্যে, রক্তের মধ্যে। এরকমভাবে দলিত মথিত হতে তার ভাল লাগছিল। বরুণের আগ্রাসী চুম্বনে নিজেকে সঁপে দিয়ে সেও নিঃশেষে তার ভিজে ঠোঁট দুটিকে শুষে নিতে লাগল নিজের ঠোঁটে।

আর এক তীব্র রমণ সুখের মধ্যে মনে হতে লাগল অনেককাল ধরে মনের ভেতর যে বিষাদ, অভিমান দুঃখ জমে উঠেছিল তার কোন ভিত নেই। প্রকৃতই তার কোন মানে নেই জীবনে। এগুলো মানুষের একধরনের দুঃখ বিলাস। সব মানুষের মনের প্রকৃত সুস্থতা বোধ হয় লুকিয়ে আছে সুস্থ উদ্দীপক কামের তীব্রতার মধ্যে। ইন্দ্র ও পুরুরবার সঙ্গে সহবাস করে এই সরল সত্যটাকে সে বুঝতে পারেনি। বরুণ তাকে তীব্রভাবে বুঝিয়ে দিল এক নতুন জীবনসত্য। বরুণকে তার ভীষণ ভাল লাগল। শরীরের কোষে কোষে মৃদু তরঙ্গ বয়ে যাচ্ছিল। সারা শরীরে ভিতরে ভিতরে একটা প্রার্থনা নীরবে মাথা কুটছিল যেন : ওগো সুন্দর পুরুষ, আমাকে আরো জড়িয়ে ধর, ভীষণ জোরে। এত জোরে তোমার বুকে চেপে ধর যেন আমার শ্বাস বন্ধ হয়ে যায়। যেন ভেঙে গুঁড়িয়ে যাই আমি।

॥ আট ॥

এর মধ্যে অনেকগুলো ঋতু এল আর গেল।

বসন্তকাল।

অমরাবতীতে তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুনের আগমন ঘটল।

পুত্র এল পিতার কাছে। বহুকাল পর প্রবাসী পুত্র পিতৃগৃহে ফিরল। কিন্তু ইন্দ্রের পিতৃহৃদয়ে তার কোন প্রতিক্রিয়া নেই। পুত্রের জন্যে পিতার কোনরকম উদগ্রীব প্রতীক্ষা ছিল না। কোন ব্যাকুলতাও জাগল না অন্তরে। অর্জুনকে দেখেও কোন উথলে ওঠার ভাব হল না ইন্দ্রের। তার সঙ্গে কোন আত্মীয়তাও অনুভব করল না।

অর্জুন সম্পর্কে ইন্দ্রের কোন অনুভূতি হল না! কেন? অর্জুন তার কে? —কেউ নয়। কথাটা বলতে গিয়ে ইন্দ্র থমকে গেল। পৃথিবীশুদ্ধ লোক জানে অর্জুন তার ক্ষেত্রজ পুত্র। প্রেম-প্রীতি-ভালবাসার গর্ভে এক ফোঁটা ঔরস জমে অলক্ষ্যে যে রক্তমাংসের প্রাণ সৃষ্টি করে, অর্জুন তা নয়। অর্জুন এক নারীর অচরিতার্থ প্রবৃত্তি থেকে জাত। প্রতিহিংসা নিতে কুন্তী তার মাধ্যমে একটি ভ্রূণকে গর্ভে ধারণ করেছিল। সঙ্গমেচ্ছু একটা নারীর সঙ্গে অবৈধ সঙ্গম করে অর্জুন হল! কিন্তু অর্জুন যে তার ঔরসে শরীর ধারণ করল সে রহস্য তার অধিগম্য নয়। এ ছেলে যে তার, একথাও মনে হয় না কখনও।

ইন্দ্রের একা থাকতে থাকতে মনে হল মানবশিশু তো কেবল নারী-পুরুষের সঙ্গমের ফল নয়। অনেক আকাঙ্ক্ষার সমষ্টি। সন্তানের মাধ্যমে মানুষ তার আকাঙ্ক্ষাগুলোকে জন্ম দেয়। কুন্তীর সুপ্ত ভোগস্পৃহা, আকাঙ্ক্ষা, যৌবনোচিত অতৃপ্ত কামনা-বাসনার এক জটিল সৃষ্টিলীলার গর্ভে জন্ম হয় সন্তানের। অর্জুনও তাই। কারণ কুন্তী চেয়েছিল রাজ্যচ্যুত অক্ষম অসহায় স্বামীর ভাগ্য ফেরাতে। ভাগ্যকে কুন্তী জয় করতে চেয়েছিল। সেই চাওয়াটা শুধু আর একটু অন্যরকম ছিল। নতুন করে নতুনভাবে বাঁচতে চেয়েছিল। বাঁচার মত বাঁচতে না পারলে বেঁচে থাকাটাই হয় এক ধরনের আত্মহত্যা। অধিকার আর ক্ষমতা ছাড়া কোন মানুষ বড় কিছু করতে পারে না। তাই রাজ্যচ্যুত পাণ্ডুকে হস্তিনাপুরে পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্যে চাই রাজনৈতিক আশ্রয়, লোকবল, শক্তিশালী রাজন্যবর্গের সহায়তা। কিন্তু নির্বাসিত জীবনে তার মত এক সামান্য রমণীর সেই রাজনৈতিক বন্ধনটা গড়ে তোলা ছিল দুরূহ। তাই কুন্তী কতকগুলো সামাজিক প্রথা, সংস্কার আর বিশ্বাসের ফালতু মায়ায় নিজেকে আটকে রাখল না। একটু উদার হলেই অনায়াসে একজন সামান্যা রমণীও সব চাওয়া পূর্ণ করতে পারে।

একজন নারীর জয় করার সব শক্তি নিহিত আছে তার দেহের মধ্যে। জীবনের অনেক দাবি মেটাতে হয় তাকে শরীর দিয়ে। পুরুষকে বশ করতে, জয় করতে শরীর দিতে হয় নারীকে। মেয়েমাত্রই একথা জানে। প্রবৃত্তিতাড়িত মানুষের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে কুন্তী একদিন তার কাছে শরীরের দাবি নিয়ে এসেছিল। পাণ্ডুকে হস্তিনাপুরের রাজনৈতিক ক্ষমতায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা স্বপ্ন ছিল তার

দুই চোখে। ধর্ম, পবন, ইন্দ্রের ক্ষেত্রজপুত্র গর্ভে ধারণ করে কার্যত ধৃতরাষ্ট্রকে বোঝাতে চাইল সে একা কিংবা অসহায় নয়। দেব-নরপতিরাও আছে তার পাশে। দেব-নরপতিদের সামনে রেখে কুন্তী এক নেপথ্য রাজনৈতিক ক্ষমতা পুনরধিকারের সংগ্রামে জিততে চাইল। কুন্তী মোটেই ভাল চরিত্রের মেয়ে নয়। তবু তাকে ইন্দ্র শ্রদ্ধা করে, ভালবাসে আবার ঘৃণাও করে।

কুন্তী বহুভোগ্যা রমণী। একাধিক পুরুষের সংস্পর্শে এসেছে। কে জানে কার ঔরসে অর্জুন হল? তার সঙ্গে অর্জুনের প্রভেদের অন্ত নেই। অর্জুনের আকৃতি, গায়ের রঙ, স্বভাব, আচরণ তার মত হয়নি। গায়ের রঙটাও তার অদ্ভুত রকমের। এ গায়ের রঙ দ্বারকার শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া আর কারো নেই। কুন্তীর মধ্য দিয়ে সৃষ্টি হয়েছে বলেই হয়ত মাতৃবংশের রক্তধারার সঙ্গে তার এই সাদৃশ্য। সুতরাং অর্জুন তার ঔরসজাত সন্তান এই সত্যটা মানতে ইন্দ্রের দ্বিধার অন্ত নেই। অথচ, এরকম একটা প্রচার প্রতিদিনই মানুষকে সত্য ছেড়ে মিথ্যেকে আঁকড়ে ধরতে শেখাচ্ছে।

অর্জুন তার ক্ষেত্রজ পুত্র এই রহস্য কতখানি সত্য ইন্দ্রের জানা নেই। অর্জুনকে সন্তান বলে স্বীকার করতে তাই কুণ্ঠার অন্ত নেই। অর্জুনকে নিয়ে মনের ভেতরে তার গ্রহণ বর্জনের দ্বন্দ্ব। কিন্তু পুত্ররূপে পেলে তার হাতটাই শক্ত হবে। তার ইন্দ্রত্বের গায়ে কোন আঁচড় লাগবে না। অর্জুন বীর পুত্র। পৃথিবী জোড়া তার খ্যাতি। এই অনুভূতিটা তার বুকে একসঙ্গে অহংকার আর গর্বের হাজার দীপ জেলে দিল। কিন্তু খুব বেশিক্ষণ স্থায়ী হল না। কোথা থেকে আশঙ্কার দমকা বাতাস এসে নিভিয়ে দিল তাকে। অসামান্য বুদ্ধির আলো জমাট হয়ে আছে অর্জুনের গভীর চোখ দুটোয়। তার চাহনির মধ্যে এমন একটা মায়াবী রহস্য লুকিয়ে আছে যা অতি সহজে মানুষের মনে রেখাপাত করে। ঐ মায়াবী মানুষকে বিশ্বাস করা শক্ত। পুত্র বলে মেনে নিলে সিংহাসনের দখল নিয়ে ইন্দ্রত্ব নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা বেধে যেতে পারে। ইন্দ্রত্ব হারানোর কথা মনে হলে দেহে মনে একটা দুর্বোধ্য জ্বালা ছড়িয়ে পড়ে। তখন অর্জুনকে আর পুত্র বলে নয় একেবারে আলাদা করে দেখার ও বিচার করার প্রবণতা বড় হয়ে ওঠে।

সত্যিই তারা দুই পৃথিবীর মানুষ। কেউ কারোকে চেনে না। তাদের প্রভেদ ধর্মে, ভাষায়, সভ্যতায়, সমাজের মানসিকতায় এ ন কি জল হাওয়া, খাদ্যের বেশভূষায় চালচলনে। এত বড় পার্থক্য সত্ত্বেও অর্জুনকে যদি পুত্র বলে মেনে নেয় তাহলে দেবভূমির সব কিছু নিয়ে একদিন ভাগাভাগির লড়াই বেধে যাওয়া কোন বিচিত্র নয়। সেই আশংকাই ইন্দ্রের মনে প্রবল হল।

অর্জুন তো মনে করতে পারে তাকে উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে, পুত্রের অধিকার পাচ্ছে না। তখন তো প্রতিবাদ করতে পারে। বিদ্রোহ করতে পারে। কারণ তারা এখন অসহায়, তাদের পায়ের তলায় মাটি নেই। রাজ্যচ্যুত হয়ে বনে জঙ্গলে যাযাবরের মত ঘুরে বেড়াচ্ছে। স্বরাজ্য ফিরে পাওয়ার জন্যে চাই তাদের একটা শক্ত রাজনৈতিক আশ্রয়। যাকে ঘাঁটি করে তারা রাজ্য পুনরুদ্ধারের লড়াইতে নামতে পারে। অর্জুন সেই উদ্দেশ্য পুরণ করতেই অমরাবতীতে হাজির হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। এতকাল এই দাবির কথা তার মনে হয় নি। কিংবা অমরাবতী আসার প্রয়োজন হয়নি। কয়েক যুগ পরে মনে হল ইন্দ্র তার পিতা। পিতার কাছে পুত্রের ফিরে আসার কোন সময় নেই, বাধা কিংবা লজ্জাও নেই। কিন্তু এই আগমনটা তার আরো ছোট বয়সে কিংবা তারুণ্য থেকে হতে পারত। পিতা-পুত্রের সম্পর্কটা অনেককাল আগে থেকে গড়া যেতে পারত। দুর্ভাগ্যবশত তার কোন চেষ্টাই অর্জুন কিংবা তার জননী করেনি। হঠাৎ তাদের এক বিশেষ সংকটকালে পুত্রের দাবি নিয়ে অর্জুন অমরাবতী এল। পিতা-পুত্র কেউ কারোকে চেনে না। পারস্পরিক জানাজানি, বোঝাবুঝির কোন ব্যাপার নেই বছরের পর বছর। অচেনা অর্জুনের আগমনকে ইন্দ্র ভাল মনে মেনে নিতে পারল না। বারংবার মনে হল, এর পেছনে কোন রহস্য লুকানো আছে।

অনেক কথাই মনে এল। সন্দেহের ভূত একবার মাথায় ঢুকলে তাকে আর তাড়ানো যায় না। ক্রমেই সন্দেহের জালে জড়িয়ে পড়ল। ইন্দ্রেরও সেই অবস্থা হল। কত কী মনে হল। যে নারীর সহবাসের ছলনার মধ্যে দিয়ে অবৈধভাবে সন্তান আসে তার পিতৃত্বকে সমাজ অনুমোদিত পথে স্বীকার করলে ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব খর্ব হয়। তার অহংকার ভেঙে পড়ে। তার ইন্দ্রত্বকে হেয় করতে কিংবা কৌশলে

তাকে ফাঁদে ফেলার অভিসন্ধি নিয়ে অর্জুন অমরাবতীতে আসতে পারে। সন্দেহটা একটা দুর্গন্ধের মত মনে ভরপুর হয়ে থাকল।

অর্জুনের হঠাৎ আগমনের উদ্দেশ্যটা বিশ্বাস করার মত যথেষ্ট যুক্তি বা কারণ খুঁজে পেল না ইন্দ্র। অর্জুন বীর। শ্রীকৃষ্ণের খুব ঘনিষ্ঠ ও নিকট বন্ধু। দ্বারকা ভারতের অপ্রতিদ্বন্দ্বী এক শক্তি হয়ে উঠতে চাইছে। পাঞ্চাল বিরাট এবং পাণ্ডবদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে শ্রীকৃষ্ণ যে বিশাল ভারতবর্ষের অধিপতি হওয়ার স্বপ্ন দেখছে তা যথেষ্ট আতঙ্কজনক। ইন্দ্রের সব ভয় এখন দ্বারকাকে। শ্রীকৃষ্ণ যেভাবে শক্তিশালী হয়ে উঠছে, অসুর দানবদের পদানত করে একচ্ছত্র শক্তির অধিকারী হচ্ছে তা ইন্দ্রকেও শঙ্কিত করে তুলেছে। শ্রীকৃষ্ণকে সে তার অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি মনে করে। একদিন প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী হয়ে সে যে ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব কেড়ে নেওয়ার সংঘর্ষে লিপ্ত হবে না, এমন কথা জোর দিয়ে কেউ বলতে পারে না। কৃষ্ণই হয়ত অর্জুনকে পাঠিয়েছে। কুটকৌশলে ইন্দ্রর ইন্দ্রত্ব হরণের কোন গোপন চক্রান্ত করছে। একথাটা স্বয়ং অর্জুনের মুখ থেকেই কৌশলে জানা দরকার। কিন্তু অর্জুনও বড় সাবধানী এবং সুচতুর। তাই ব্রহ্মচারী পরিব্রাজক সেজে এসেছে। ব্রহ্মচারীর সংযত জীবন যাপনের ভেতর এমন একটা অকৃত্রিম কৃচ্ছতা, শুচিতা আছে যা মানুষকে মুগ্ধ করে। সাধু সন্ন্যাসীর প্রতি মানুষের সহজাত সশ্রদ্ধ সম্ভ্রমবোধ থাকায় ব্রহ্মচারীকে কেউ অবিশ্বাস করে না। ব্রহ্মচারী থাকে সকল সন্দেহের উর্ধ্বে। একজন ব্রহ্মচারী রাজনৈতিক সন্ন্যাসী হয়ে খুব সহজে মিষ্টি আচরণে, মিষ্টি কথায় মানুষের মনকে জয় করতে পারে, তাকে বশীভূত করতে পারে আশ্চর্যজনকভাবে।

ইন্দ্র তার রাজনৈতিক প্রজ্ঞা দিয়ে বুঝল অর্জুনের ব্রহ্মচারী বেশ হল তার ছদ্মবেশ। দেবভূমি ভোগবিলাসের দেশ। সুরা কিংবা সুন্দরী নারীর নিবিড় সান্নিধ্যে যাতে কোন বিভ্রম না হয়, মোহ না জন্মে সেজন্য ব্রহ্মচারীর শান্ত সংযত, শুদ্ধাচার জীবনে নিজেকে অভ্যস্ত করেছে। নারী সংস্রব থেকে নিজেকে দূরে রাখার এ এক কৌশল।

ইন্দ্র এক ভয়ংকর মানসিক সংকটে ভুগতে লাগল। অর্জুন যে রাজনীতি করতেই এসেছে এমন কোন নিশ্চয়তা নেই। তবু তার আগমন এক জটিল প্রশ্নচিহ্নের মত থমকে দাঁড়াল। কারণ সমতলে যে পথে সাম্রাজ্যবাদী রাজনীতি এগোচ্ছে সেই পথের বাস্তব চেহারা দেখে ইন্দ্র মনে মনে শঙ্কিত। আজ ভারত রাজনীতি সংহারী শুধু নয়; আত্মসংহারী। একদিন দেবভূমির দিকে সেই ঘটনা প্রবাহ ত্বরিত গতিতে প্লাবনের মত ধাবিত হওয়া আশ্চর্য নয়। কুন্তীপুত্র পাণ্ডবেরা সেই বিপদ ডেকে আনতে পারে। এই চিন্তাটা তার মনে গেঁথে গেল। অর্জুনের সঙ্গে তার সম্পর্ক স্বীকার করে নিতে কোন উৎসাহ পেল না। বরং নিঃসহায় বেদনায় ইন্দ্র ক্লান্ত বোধ করল। কারণ শীঘ্রই ভারতের রাজনীতিতে এক নতুন লড়াই সূচনা হবে। এ'হল সাম্রাজ্যবাদী শক্তি শিবিরের সঙ্গে গণতন্ত্র মনোভাবাপন্ন প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রজোটের লড়াই। এ লড়াই আবার ভাইয়ের সঙ্গে ভাইয়ের, আত্মীয়ের সঙ্গে আত্মীয়ের, বন্ধুর সঙ্গে বন্ধুর, সহকর্মীর সঙ্গে সহকর্মীর। এ হল অন্তর্বিরোধ। আত্মঘাতী অন্তর্যুদ্ধ, যার থেকে হয়ত দেবভূমিরও নিস্তার মিলবে না। আবার এড়িয়ে যাবে সে পথও খোলা নেই। এখন কী উপায়ে স্বার্থ নিরাপদ করা যেতে পারে সেই নিয়ে ইন্দ্রের যত ভাবনা। তার আগে অর্জুনের মতি, গতি, উদ্দেশ্য ভাল করে পরখ করে শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রায়কে বুঝতে হবে।

নিজের অজান্তে উর্বশীর মুখখানা মনে পড়ল ইন্দ্রের। অধরেও কপট হাসি ফুটল।

॥ নয় ॥

আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়ল উর্বশী।

ঘুম এল না চোখে। মনটা ভীষণ ভার লাগছিল। কিছুই ভাল লাগছিল না। বুকের ভেতর এমন একটা আকুলি-বিকুলি ভাব যে সমস্ত মন পাগল পাগল লাগল। কি যেন একটা গেঁথে ছিল মনের সঙ্গে ফুলের গন্ধের মত, সুগন্ধী দ্রব্যের মত তার সৌরভে মন ভরপুর হয়েছিল।

ঝরনার ধারে অর্জুনের নৃত্যের সেই দৃশ্যটা উর্বশীর চোখে লেগেছিল। সেই নৃত্য চোখে, মনে

হৃদয়ে এমন ভাবে বসে যায় যে তার সমস্ত অনুভূতি এবং স্মৃতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে গেঁথে ছিল বিনিসুতোর মালার মতন।

সোনাঝরা ভোরের আলোয় সে প্রথম অর্জুনকে দেখল। তার দর্শনটা ছিল নাটকীয়। সখী অপ্সরাদের সঙ্গে ঝরনায় স্নান করতে গিয়েছিল পাহাড়ের ধারে। হঠাৎ নূপুরের অস্পষ্ট ধ্বনি শুনতে পেল। মনে হল আকাশ, মাটি, ফুল প্রকৃতির পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছে। নটরাজ যেন নাচছে কার পায়ে? কৌতূহলী হয়ে তাকাল। দেখল নরম মাটির পাহাড়ের গা বেয়ে আঁকাবাঁকা রাস্তা ধরে কে যেন দেহটাকে ভাসিয়ে দিয়ে উড়ে আসছে। সে হাঁটছিল না। ময়ূরের মত নেচে নেচে চলছিল। তার দু'খানা হাত যেন পাখির ডানা হয়ে গেল। সূর্যোদয়ের দিকে বলাকারা যেমন সারিবদ্ধ হয়ে উড়ে যায় তেমনি ওই মানুষটা পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নাচের মুদ্রা রচনা করে যেন ধেয়ে আসছিল।

উর্বশী স্তব্ধ। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল। শরীরের মধ্যে ভালবাসার ঘুঙুর বাজছিল। নৃত্যের সেই মুদ্রা, দেহবল্লরীর হিল্লোল, নূপুরের ধ্বনি উর্বশীর সত্তার সঙ্গে এক হয়ে গেল। কল্পনায় সে অর্জুনকে দেখতে পাচ্ছিল। অর্জুন নামটা নিঃশব্দে মনের মধ্যে বার বার উচ্চারণ করল। আর এক গভীর আবেশে, তৃপ্তিতে, সুখে মন ভরপুর হয়ে উঠল। হঠাৎ উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে বুকের মধ্যে কী সব জিনিস যেন গলিয়ে দিল। অর্জুনের পীতাভ গায়ের রঙ, নীল দুটি চোখ, চোখা নাক, খাসা মুখ, ঠোঁট, চিবুক, কুচকুচে কালো কোঁকড়া চুল, সুঠাম তনু, অপরূপ মুখশ্রী, অনিন্দ্যসুন্দর স্মিত হাসি সব মিলিয়ে কেমন একটা দারুণ মুগ্ধতায় তার ভিতরটা বার বার চমকে উঠল। রক্তের মধ্যে হু হু করে বয়ে যাচ্ছিল উষ্ণ প্রস্রবণের স্রোত।

ঘর অন্ধকার। কিন্তু বাইরেটা জ্যোৎস্নায় ভরা। জানলা দিয়ে বসন্তের উজ্জ্বল জ্যোৎস্নালোকিত পৃথিবীর দিকে স্থির নয়নে তাকিয়ে ছিল উর্বশী। স্নিগ্ধ নীল আকাশের গায়ে তারারা বিন্দু বিন্দু আলো হয়ে স্পন্দিত হতে লাগল। হতে থাকল সারা রাত। উর্বশী বিস্ময়ে চেয়ে রইল আকাশের দিকে। তার বুকের মধ্যে কেমন একটা অচেনা অদ্ভুত কম্পন হচ্ছিল। ভীষণ ভাল লাগছিল এই শির-শিরে ভাবটা। খুবই ইচ্ছে করছিল জ্যোৎস্নার আলোর গন্ধ মেখে এমন অন্ধকার উদ্বেল আকাশে পাখি হয়ে সটান উড়ে যায় অর্জুনের কাছে।

নিঝুম রাত। রাতের অনেক কিছুই জেগে আছে তার মত। পেঁচার এবং ঝিঁঝির কিম্ভূতকিমাকার বেসুরা ডাকে ঘুমোয় না রাত। গাছেরা পাহাড়েরা ফ্যালফ্যাল করে সব চেয়ে আছে আকাশের দিকে। অন্ধকারের বুকে মুখ ডুবিয়ে নিঃশব্দে শ্বাস ফেলছিল। একটা চাপা কান্না মিশেছিল তাতে।

ঘুম এল না উর্বশীর। উদাস চোখদুটো মধ্যরাত্রির আকাশে ঝুলে পড়া চাঁদের দিকে ভাসিয়ে দিয়ে নিজের ভাবনার ভেতর বুঁদ হয়ে বসে রইল।

নানা কথা, ছোটবেলার কথা, নানা ঘটনা গভীর রাতের মতই নিঃশব্দে চুপি চুপি তার সমস্ত চেতনার মধ্যে, অনুভূতির মধ্যে ঢুকে পড়ল। জীবনটা তার রূপকথার গল্পের মতন। কত আর বয়স তখন? তবু ঐ ছোট্ট জীবনে কত অদ্ভুত অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছে। অনেক মানুষ অনেক বৈচিত্র্য নিয়ে তার অতীত। বুকের ভিতর দপ করে স্মৃতির দীপ জ্বলে উঠল। রাত্রির অন্ধকারের ভিতর থেকে তার পঞ্চদশী বালিকার শরীর ফুটে উঠল। ফুটন্ত যৌবন। রূপ তো নয়, রূপের আগুন। একবার তাকালে চোখ ফেরানো যায় না আর। সে নিজেও ঐ অল্প বয়সে দর্পণ থেকে চোখ তুলতে পারত না। নিজেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখত। দেখার একটা সুখ ছিল। কিন্তু সুখটা আনন্দে ভরে উঠত না। অজান্তে আকুল উদ্বিগ্নতায় বুকের ভিতরটা কেঁপে যেত, মুখ শুকিয়ে যেত, এক গভীর বিষণ্ণ দীর্ঘশ্বাসে মনটা ভারি হয়ে উঠত। ঐ বয়সেই বুঝেছিল এ'রূপ নয়, জ্বলন্ত মশাল। রূপ নারীর যেমন গর্ব তেমনি অভিশাপও। তার ভাগ্যে কি লেখা আছে ঈশ্বরই জানে।

উর্বশীর ভাগ্যটাও বড় বিচিত্র। বিধাতা বোধহয় একটু অন্যরকম করে গড়তে চেয়েছিল তাকে। তাই, এক অলীক জীবনের শূন্য গহ্বর থেকে অন্য জীবনের আলোকিত প্রান্তরের দিকে অদৃষ্ট টেনে নিয়ে গেল যেন তাকে। তুষার ধবল নরম বালিশে মুখ ডুবিয়ে উর্বশী অন্ধকারে নিশ্চল হয়ে রইল।

চিতল হরিণী যেমন চাপ চাপ সবুজ কোমল কচি ঘাসে মুখ ডুবিয়ে গন্ধ নেয় তেমনি এক অজ্ঞাত জীবন রহস্যের মধ্যে হারিয়ে যাওয়া ঘ্রাণ নিচ্ছিল সে।

কিছু কিছু সময় মুহূর্ত আসে সকল মানুষের জীবনে যখন এক গভীর দুঃখের সঙ্গে মিশে যায় এক গভীর তীব্র ভাল লাগা যে ভাল লাগাটা শুধু তারই। একান্ত তার একার।

উপুড় হয়ে শুয়ে থাকা অবস্থায় উর্বশী নাভি থেকে টেনে খুব জোরে শ্বাস নিল। নিঃশ্বাস ফেলতে বুকের মধ্যে হঠাৎ একটা শূন্যতা হাহাকার করে নিস্তব্ধ ঘরে ছড়িয়ে পড়ল যেন। নরম বালিশটা আশ্লেষে বুকের মধ্যে চেপে ধরল। বাইরের আলোকিত জ্যোৎস্নার দিকে তাকিয়ে বিদ্যুৎ চমকেরই মত একটা মুখ দেখতে পেল। ঐ মুখ তার মায়ের। কোনদিন মাকে দেখেনি। মাকে দেখতে কেমন তাও জানে না। তবু স্বপ্নের মতন মায়ের অচেনা মুখটি দেখল কল্পনায়। মনে হল, প্রকৃতির মধ্যে পরিব্যাপ্তি হয়ে গেছে স্নেহময়ী জননী। জ্যোৎস্না হয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে সস্নেহ দৃষ্টিতে। উর্বশীর সমস্ত চেতনায় কেমন একটা বিহ্বলতা নামল। বড় ঘুম পেল। হাই তুলল কয়েকবার। চোখের পাতায় সুগন্ধী স্বপ্নের মত জড়িয়ে রইল গল্পে শোনা জননীর নিষ্পাপ মুখটি।

সন্ধ্যা নামার মত খুব ধীরে ধীরে ঘুম নামল চোখে। ঘুমিয়ে পড়ল উর্বশী। ঘুমন্ত অবস্থায় তাকে শাপগ্রস্তা প্রস্তরীভূতা দেবীর মত দেখাচ্ছিল। স্বপ্নের ভেতর উর্বশী স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিল, জননী তার নরম তুলতুলে গালের উপর মুখ রেখে আদর করছে অনেকক্ষণ ধরে। টপ টপ করে জলের ধারা গড়িয়ে পড়ল তার ডালিমের মত গালের উপর। সে কান্না থামতে চায় না। ঘুমের ঘোরে সারা গায়ে মাখল তার অশ্রুধারা।

নিরুপায় জননীর কান্না চেপে তাকে বুকে করে বনপথের দিকে এগোতে লাগল। গাছের স্নিগ্ধ ছায়ায় এসে দাঁড়াল। ঝরে পড়া শুকনো পাতার উপর শুইয়ে দিল তাকে। জলভরা ছলছল চোখে চেয়ে রইল। তারপর, তাকে রেখে একা এগোতে লাগল।

কয়েক পা গেল। তারপরেই ফিরল। দু'পা এসে থমকে দাঁড়াল। বিষধর একটা সাপ কুণ্ডলী পাকিয়ে চক্রায়িত ফণা ধরে তার মাথার কাছে স্থির হয়ে আছে। মাঝে মাঝে তার লক-লকে জিভটা বার করছে।

জননী স্তম্ভিত। ভয়ে শুকিয়ে গেল মুখ। কী করবে। ভেবে পেল না। এক নিরুপায় অসহায়তা নিয়ে তার মুখের দিকে অপলক তাকিয়ে রইল। আর মুখে হুশ হুশ শব্দ করল। অবশেষে সব ভয় এবং আড়ষ্ট ভাবটা কাটিয়ে উঠে সোজা হয়ে দাঁড়াল। ব্যাগ্র দু'খানি হাত মেলে দিয়ে খুব সন্তর্পণে সাপের চোখে চোখ রেখে আস্তে আস্তে এগোতে লাগল। আর সাপটাও ফণা গুটিয়ে ধীরে ধীরে চলে গেল বনের ভেতর।

জননী কোলে তুলে নিল তাকে। আনন্দে দু'চোখ ভরে জল নামল তার। বুকের মধ্যে তাকে জড়িয়ে ধরে খুব কাঁদল। ভয় পেয়ে সেও ঠোঁট ফুলিয়ে কাঁদবার উপক্রম করল। জননী তাকে শান্ত করার জন্য স্তন্যদান করল। আর এক আশ্চর্য অবুঝ মায়ায় নিজের মনে তাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলতে লাগল : তোকে নিয়ে কী করি বলত মা? যাওয়ার কোন জায়গা নেই। অপ্সরারা বড় একা। তাদের কেউ নেই। সন্তান হওয়া তাদের অভিশাপ। এখন তোকে কোথাও ফেলে গিয়ে শান্তি পাব না। কী যে করব, কিছুই মাথায় আসছে না। বড় ইচ্ছে করছে দেবলোকের পঙ্কিল আর কলঙ্কের জীবন থেকে ছুটে পালিয়ে গিয়ে তোকে নিয়ে জীবনের বাকি দিনগুলো কাটিয়ে দিই। কিন্তু কেমন করে দেব? কে আমাদের আশ্রয় দেবে? নিরাপত্তা দেবে? দিনগুলো চলবে কেমন করে? আমার অদৃষ্টে বিধাতা বেশ্যাবৃত্তি লিখে রেখেছে, অন্যতর সুখ আমার জন্য নয়। এখন আমার যা সবচেয়ে দরকার তা হল তোকে নিয়ে পালানো। একটা নিরাপদ আশ্রয়। জঙ্গলের মধ্যে কুটির বেঁধে না হয় তোকে নিয়ে বাস করব।

বুকে তাকে জাপ্টে ধরে জননী খুব জোর পায়ে হাঁটতে লাগল। দুর্বল শরীর। মাথার ভেতর টলছিল। পায়ের তলার মাটি, আকাশ, বন সব ঘুরছিল। হাঁফাতে হাঁফাতে একটা গাছের তলায় গিয়ে

বসল। তার তুলতুলে মুখখানা চুমু দিয়ে ভরিয়ে দিল। আদর করতে করতেই মাটিতে টলে পড়ল। জ্ঞান হারাল। আর সে মার কোল থেকে গড়িয়ে পড়ে গেল। খুব জোরে ডুকরে কেঁদে উঠল।

জ্ঞান ফিরলে জননী দেখল, শিয়রের পাশে তার অচেনা কতকগুলো লোক দাঁড়িয়ে আছে। তাদের একজনের কোলে আছে সে। অসীম মমতা মাখানো দুটি ক্লান্ত চোখ মেলে জননী তার দিকে চেয়ে আছে। লোকটি ব্যাকুল উৎকণ্ঠা নিয়ে প্রশ্ন করল: এখন কেমন বোধ করছ দেবী? তুমি কে? এই বিজন বনে কেন? কোথায় চলেছ? তোমার গৃহ কোথায়? তোমাকে খুবই দুর্বল আর পীড়িত বোধ হচ্ছে।

জননীর রোগ-ক্লান্ত শীর্ণ মলিন মুখে হাসি ফুটল। প্রায় নিশ্চল হয়ে আসা হাতখানা মৃদু নাড়ল। ক্ষীণ কণ্ঠে আস্তে আস্তে বলল : পথিক আপনি কে জানি না। তবে বড় দুঃসময় ঈশ্বর আপনাকে পাঠিয়ে আমার উপকার করলেন। মরবার আগে অন্তত জেনে গেলাম, আমার দুর্ভাগা কন্যা একটা আশ্রয় পেয়েছে। নইলে, আমার সঙ্গে এই জঙ্গলে কোন পশুর মুখের গ্রাস হয়ে থাকত। কথাগুলো খুব কষ্ট করে থেমে থেমে বলল। খুব জোরে শ্বাস নিতে লাগল। আর গলা থেকে একটা ঘড়ঘড় আওয়াজ বেরোচ্ছিল।

বড় হয়ে উর্বশী যেমনটা শুনেছিল স্বপ্নে সেই দৃশ্যটা অবিকল দেখল। ঘুমের মধ্যে অনেকবার মা-মা করে ডাকল। অঝোরে কাঁদল। ঘুমের ভেতর বুকটা ব্যথায় চিন চিন করছিল। গলা শুকিয়ে গেল। আর তখনই ঘুম ভেঙে গেল। চমকে তাকাল। কোথাও কিছু দেখতে পেল না। নিজের বিছানাতেই শুয়ে আছে সে আর বালিশটা ভিজে গেছে চোখের জলে। খুব অবাক লাগল উর্বশীর। বুকের মধ্যে বন্ধ দরজাটা হঠাৎ এমন করে কে খুলে দিল? থম ধরা একটা ব্যথা নিয়ে চুপ করে বসে রইল বিছানায়।

ভোরের আলোয় ঝলমল করছে চারিদিক। শিশিরধোয়া নীল আকাশের বুকে একঝাঁক পাখি ডানা মেলে নিশ্চিন্তে নিঃশব্দে ভেসে যাচ্ছে। কোথায় যাচ্ছে কেউ জানে না। ওদের দুঃখ নেই। বিষণ্ন মন নিয়ে ওরা কেউ জন্মায় না। ওরা সবাই সুখী। সহজে সুখী হয়, সুখে থাকে। কখনও মানুষের মত বিষণ্ন মন নিয়ে জন্মায় না। কেবল মানুষেরই দুঃখবোধ থাকে। বোধ হয় এই অতৃপ্তিবোধের ভেলায় ভেসে ভেসে মানুষ অন্ধকার থেকে আলোর দিকে অভিসার করে। কিন্তু যাকে আলো ভাবছে সে তো মনের অন্ধকার। তাই এই অন্ধকার থেকে আলোয় ফেরা এত যন্ত্রণার। এত কষ্টের। না, কোন ব্যথা বা বেদনা বা জ্বালা নয়। যেন একটা ভারি কিছু হৃৎপিণ্ডের সঙ্গে ঝুলে আছে। সত্য যা তা এমনি অমোঘভাবে হঠাৎ নিজের কাছে প্রকাশিত হয়ে পড়ে বলেই ভিতরটা এমন অস্থির হয়।

বসন্তের শিশিরভেজা আকাশের গন্ধ মেখে একটা হলুদ পাখি ডাকতে ডাকতে উড়ে গেল পাহাড়ের উপর দিয়ে রূপালী রেখার নদীর ধার ধরে গভীর জঙ্গলের দিকে। উর্বশী খোলা জানলা দিয়ে চেয়ে রইল সেই দিকে। কিসের সন্ধানে? কে জানে?

॥ দশ ॥

ইন্দ্রের কথা ভেবে উর্বশীর সারা দুপুরটা একটা ঘরের মধ্যে কাটল। কত প্রশ্ন করল নিজেকে। কিন্তু একটা প্রশ্নেরও সদুত্তর পেল না। বরং বিস্ময় জাগল অর্জুন সত্যিই কি নৃত্যশিক্ষা করতে এসেছে তার কাছে? উর্বশীর কেমন সন্দেহ হল। নৃত্যে নিজে যে নটরাজ তাকে কোন নৃত্য শেখাবে উর্বশী? ইন্দ্র তাকে নিয়ে হয়ত কৌতুক করেছে। অথবা অন্য কোন মতলব আছে ইন্দ্রের। কিন্তু সে সম্পর্কে স্পষ্ট কোন ধারণা ছিল না উর্বশীর। সে কেবল অনুমান করতে পারে।

অর্জুনকে ইন্দ্রের খুব ভয়। তাকে ভীষণ ঈর্ষা করে। দেবভূমিতে অর্জুনের অতর্কিত ও অপ্রত্যাশিত আগমনকে ইন্দ্র খুব ভাল চোখে দেখেনি। বরং মনে হয়েছিল, দুঃসময়ে এসে অর্জুন শুধু শুধু তাকে উত্যক্ত করল।

লোকচক্ষে ইন্দ্র এখন কিছুটা ছোট হয়ে গেছে। তাকে হেয় করে অর্জুন কৌশলে কিছু সুখসুবিধে আদায় করতে এসেছে। সেই চাওয়াটা তার ইন্দ্রত্ব বিপন্ন করতে পারে এরকম একটা আশঙ্কা ইন্দ্রকে

সতর্ক এবং সাবধান করে রাখল। উর্বশী ইন্দ্রের মনের সেই আশঙ্কার কথা ভাল করেই জানে। পুত্রের অধিকারে অর্জুনের ইন্দ্রত্ব দাবির আশঙ্কা করে ইন্দ্র অস্থির হল। কারণ অর্জুন যেভাবে অন্য দেব-নরপতিদের মনোরঞ্জন করেছে তাতে ইন্দ্রের ভয় পাওয়ার কথা।

অর্জুনের বক্তব্যের মধ্যে কোন অস্পষ্টতা ছিল না। দেবসভায় সকল নরপতির সামনে মুক্তকণ্ঠে নির্ভয়ে বললে : একদিন সমভূমিতে দেবভূমির প্রভাব প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করতে তাঁরা পঞ্চপাণ্ডবকে সৃষ্টি করেছিলেন। কিন্তু পিতার কোন দায়িত্ব তাঁরা পালন করেননি। সন্তানের কাছে তাঁরা কেবল প্রত্যাশা করেন। বলতে কি সন্তানদের জীবনে প্রতিষ্ঠিত করার কোন কর্তব্যই করেননি। তার জন্যে পঞ্চপাণ্ডবের দুঃখ নেই, ক্ষোভ নেই। কোন অভিযোগও নেই। প্রতিকূল ভাগ্যের সঙ্গে বিপন্ন অস্তিত্বের নিরন্তর লড়াই এখনও তাদের অব্যাহত আছে। সামনে আরো বড় লড়াই অপেক্ষা করছে তাদের জন্য। সেই লড়াইতে পাণ্ডবেরা জয় চায়। জয়কে সুনিশ্চিত করতে যা যা করা দরকার তা দেবভূমিকেই করতে হবে। দেবনরপতিদের কাছে এটাই আমাদের একমাত্র প্রার্থনা। আমরা এই মাটিতে জন্মেছি। জন্মেই এর শ্বাস নিয়েছি। তবু এই দেবলোকের সঙ্গে আমাদের আত্মার যোগ হল না। অথচ দেবলোকের বহু প্রত্যাশার যোগ্যতা আমরা পূরণ করেছি। তবু এখানকার সন্তানের কোন গৌরব কিংবা মর্যাদা পাণ্ডবেরা পেল না। এটাই আশ্চর্যের কথা। নিজের পুত্রদের প্রতি দেবলোকের এতটুকু গর্ববোধ যদি থাকত তা হলে পাণ্ডবদের জীবনে পদে পদে এত অসম্মান কুড়োতে হত না। আজ পাণ্ডবদের প্রতিনিধি হয়ে দেবভূমির সন্তানের দাবি নিয়ে তৃতীয় পাণ্ডব এসেছে দেবলোকের সাহায্য চাইতে। অধিকার তো কেউ কাউকে দেয় না। অধিকার আদায় করে নিতে হয়। জন্মগত অধিকার সূত্রে দেবলোকের সর্বরকম সাহায্য আমি দাবি করছি।

কথাগুলো শুনে চমকে উঠেছিল ইন্দ্র। বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে চেয়েছিল দেবনরপতিরা। ইন্দ্র সকলের মুখের দিকে চেয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস চেপে বলেছিল : তা তো বটেই।

অর্জুন আকুল কণ্ঠে বলেছিল : এ সঙ্কটে পাণ্ডবেরা আপনাদের সাহায্য এবং সহযোগিতা চায়। আপনাদের জন্য কিছু একটা করতে চায়। পাণ্ডবদের উপর আপনারা আস্থা রাখুন। তাদের অন্তত বিশ্বাস করে দেখুন।

তবু ইন্দ্র চিন্তামগ্ন হল। তার প্রশস্ত কপালে চিন্তার গাঢ় কুঞ্চন, নাসিকার প্রচ্ছন্ন জিঘাংসার সেই কুটিল মূর্তিটি উর্বশীর চোখে ভাসতে লাগল।

আর অর্জুনের চোখ আত্মপ্রত্যয়ের আবেগে জ্বল জ্বল করছিল। তার প্রত্যয়দৃপ্ত কথার মধ্যে নিহিত ছিল কঠিন দাবির ঘনীভূত ব্যঞ্জনা। অর্জুনের দাবি প্রাণের পূর্ণ এবং সুস্থ প্রকাশ। প্রকাশ উদ্বেল জীবনীশক্তির। এজন্যেই অর্জুনকে ভয় পায় ইন্দ্র। আসলে ইন্দ্র ভীরু, ক্ষমতাপ্রিয়।

অধিকার দাবিতে ভয় পেয়ে ইন্দ্র অর্জুনকে একান্তে ডেকে কঠিন ভাষায় বলেছিল : অর্জুন, তোমাকে বলার কিছু নেই। তবে তোমার এগোনোর ধরনটা আমার পছন্দ নয়। দেবভূমিতে তুমি নৃত্যশিক্ষা করতে এসেছ, লোকে এটাই জানে। কিন্তু এটা যে কত মিথ্যে, তুমি ভাল করেই জান। নৃত্যশিক্ষা যদি একান্তই সত্য হয় তাহলে উর্বশীই তোমাকে তালিম দেবে। কিন্তু কক্ষণো সমতলভূমির রাজনীতি করার কথা ভাববে না। কিংবা তার সঙ্গে আমাকে জড়াবে না।

বিস্ময়ে অর্জুন প্রশ্ন করল : তার মানে?

ইন্দ্র অপলক কঠিন ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে বলল : এখানে আসবার আগে তুমি কৈলাশ নগরের শঙ্করের কাছে গিয়েছিলে। তাঁর মনোরঞ্জন করে সমতলভূমির যুদ্ধের ঘোলা আবর্তের মধ্যে তাঁকে টেনে এনেছ। শঙ্করের ভয়ংকর পাশুপাত অস্ত্রও তুমি পেয়েছ বন্ধুত্বের নিদর্শন স্বরূপ। তাই না?

কে বলল, এসব কথা?

যে বলুক, কথাটা সত্য।

সময় হলে আমি বলতাম। কিন্তু সেই সময়টুকু পাওয়ার আগেই বুঝে গেলাম আমার পেছনে গুপ্তচর ঘুরে বেড়াচ্ছে। পুত্রকেও অবিশ্বাস। পুত্রের প্রতি আপনার আচরণ নির্মম।

আমার আচরণ নিয়ে তোমার মাথা না ঘামালেও চলবে।

অর্জুন অদ্ভুত ভঙ্গি করে ম্লান হাসল। বলল : পিতৃস্নেহ হতে পঞ্চপাণ্ডব চিরবঞ্চিত। কোনদিন কোন দাবি নিয়ে আসেনি তারা। আপনারাও কোন দাবি তাদের পূর্ণ করেননি। কিন্তু আজ বিপন্ন অস্তিত্বের এক ভয়ংকর সংকট দেখা দিয়েছে তাদের। তার সঙ্গে শেষ বোঝাপড়ার আগে দেবভূমির মনোভাবটা ভাল করে বুঝে যাওয়া দরকার।

তুমি কি আমাকে ভয় দেখাতে চাও?

না, পিতা। যে মর্যাদা, গৌরব, সম্মান আমাদের এখানে প্রাপ্য ছিল তা থেকে বঞ্চিত করাই কি আপনার রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত? এই কি আপনার শেষ বিচার?

অর্জুনের কথার ভেতর এমন কিছু লুকনো ছিল যা ইন্দ্রকে ভাবনায় ফেলল। তার জ্বলজ্বলে দু'চোখে কী দেখল ইন্দ্রই জানে। কিন্তু তাকে বেশ চিন্তিত দেখাল। মনে হয়েছিল সে যেন খুব দ্রুত সব কিছু চিন্তা করল। দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে গেল উদ্বেগ : বলল ঠিক আছে। আমরা কেউ অন্যায় করিনি। বঞ্চনার কথা আসে না। সত্যের জন্যে তোমাদের আত্মত্যাগের কোন তুলনা হয় না। আমরাও গর্ব বোধ করি। তোমরাই আমাদের সমতলের ভরসা। তোমাদের শক্তিবৃদ্ধিতে দেবলোকই লাভবান হবে। সব বুঝি, তবু ইন্দ্রকে ভাবতে হয় অনেক কিছু। এখন তো সময় আছে। তোমাকেও এখানে থাকতে হবে অনেকদিন। একটু একটু করে সব শিখে নাও। উর্বশীর কাছ থেকে নৃত্য-গীতটা শিখে নিতে ভুলো না।

ইন্দ্র কথাটা যত সহজ করে বলুক উর্বশীর ভিতরে কিন্তু শিহরন খেলে গেল। মনের সেই বিস্ময়ের কোন ভাষা ছিল না। কেবল মনের ভেতরে একটা চাপা উত্তেজনার স্রোত বয়ে গেল। সেই মুহূর্তে অর্জুনের দুই চোখ তার মুখের উপর ঝলকে উঠেছিল। আর সে লজ্জায় অন্যদিকে চোখ ঘুরিয়ে নিল। কিন্তু তার সেই চাহনিটা উর্বশী ভুলতে পারল না। মনে হল, এক অদৃশ্য বন্ধনে অর্জুনের সঙ্গে বাঁধা পড়েছে সে। যে বন্ধন উর্বশী নীরবে অনুভব করে তার বুকের ভেতর। জ্যোৎস্নালোকিত রাতের চাঁদের মতই স্নিগ্ধ মনোরম সে দ্যুতি। যাকে সে পাহাড়ে, বনে, নদীতে, ঝরনায়, মনের চোখে প্রত্যক্ষ করে বার বার পুলকিত হয়ে উঠে। প্রেমিকের প্রথম উষ্ণ পরশের মত লেগে আছে তার চেতনায়।

পাখি উড়ে যাচ্ছিল বেলাশেষের আকাশে। সেই দিকে মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে উর্বশীর মনে হল এ কোন অনুভূতিতে তার হৃদয় মন প্লাবিত হল? গভীর এক ভাললাগার অনুভূতিতে আবিষ্ট হয়ে বসে রইল। যে অনুভূতিকে তেমন করে এখনও প্রকাশ করার সময় হয়নি অর্জুনের কাছে। ইন্দ্রের মতলবে সেই সুযোগ তৈরি হল কেবল।

সময় বড় সাংঘাতিক। সময়ের ঘটনা মানুষকে বদলে দেয়। নিজের মনের মধ্যে কত যে অনাবিষ্কৃত জগৎ আছে সময় না হলে তার কোন সন্ধান জানা যায় না। অর্জুনের সাথে দেখা হওয়ার পর তার মনে নতুন করে প্রশ্ন জাগল।

নিজেকে নিয়ে নতুন করে ভাবার বোধ হয় একধরনের আনন্দ আছে। এই আনন্দ বোধ হয় আবিষ্কারের। মানুষের মনের জঙ্গলে কত যে সুখ, আনন্দ, আকাঙ্ক্ষা, তৃষ্ণা, তৃপ্তি লুকনো আছে সমাজ সংসারের বাইরে না গেলে তার পরিমাপ হয় না। নিজের মনটাই থেকে যায় অনাবিষ্কৃত। তাই সমাজ সংসারে একজন মেয়ে শরীরটাকে সমাজের খাঁচায় বন্দী রাখে। এর নাম সতীত্ব, নারীত্ব। কিন্তু তার কাছে মনের অঙ্গীকারের বাধ্যবাধকতা নেই। মনকে দেখার চোখ ক'জনের থাকে? মনকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য দৃষ্টি দিয়ে দেখার কোন চোখ নেই। তাই শরীরের জবাব পেলেই শাস্ত্রকাররা খুশি। শরীরটা বাঁধা, মনটা ছাড়া। শরীর বাঁধলে মন বাঁধা পড়ে না, কেবল কষ্ট পায়। নীল আকাশে ডানা মেলে মন দিব্যি উড়ে বেড়ায়। কিন্তু খাঁচার ভেতর বন্দী শরীর কেবল ঝটপট করে। ক্লান্ত হয়। নিজের কাছে হেরে গিয়ে ঝিমোয় যেন।

অর্জুনদের পরিবারটা তার কাছে একটু অন্যরকম মনে হল। সমাজকে কোনদিন মানে নি তারা। পাণ্ডুমহিষী কুন্তী-মাদ্রী, পাণ্ডবমহিষী দ্রৌপদী বনেব পাখির মত। যে ভালবাসা ব্যাপ্তভাবে আকাশে মুক্ত থাকে, অন্তরের মধ্যে দেয় সে সঙ্গ; যে ভালবাসা বিশেষভাবে প্রতিদিনের সব কিছুতে যুক্ত

হয়ে থাকে, সংসারে সে দেয় সঙ্গ। দ্রৌপদীর দুটোই রইল খোলা। প্রেমের পরমহংস সে। প্রেমের গায়ে কলঙ্ক লাগে না। পাঁচজনকে দিয়েথুয়েও নষ্ট হয় না যে প্রেম, সেই প্রেম দ্রৌপদীর। তার প্রেম মুক্ত অনন্ত। নারী-পুরুষের শরীর সম্পর্কে সে এক নয়া মূল্যবোধের প্রবক্তা। নারীর সামাজিক শৃঙ্খলমুক্তির এক বাস্তব দৃষ্টান্ত। কুন্তী দ্রৌপদীকে দিয়ে নারী সম্পর্কে প্রচলিত মূল্যবোধগুলি একেবারে বদলে দিল নানাভাবে। অবশ্য স্থান এবং পাত্র হিসাবে এই রূপান্তরও ভিন্ন রকম।

সমাজে সংসারে নারীর মাথা উঁচু করে বাঁচার জন্যে চাই একটা সুস্থ মানবিক পরিবেশ। কুন্তী-পুত্রেরা নারী-পুরুষের কতগুলো জটিল সম্পর্ক নিয়ে বিবেকবান মানুষের কাছে যেন কিছু প্রশ্ন রেখেছে। এই প্রশ্ন করার অধিকার তাদের আছে। কারণ এই পৃথিবীতে নারীকে কেউ যদি বেশি সম্মান করে থাকে তা পাণ্ডবেরাই করেছে। যে নারী প্রেমিকা, সেই নারীই আবার জননী। প্রেমের কোরকে একফোঁটা ঔরসে মাতৃত্বের জন্ম। পবিত্র মাতৃত্ব লাভের প্রকৃতিগত ব্যাপারটাই নারীর জীবনের একটা মস্ত সমস্যা। এ সমস্যা পুরুষের তৈরি। পুরুষ একটু উদার হলেই, আর একটু চাইলেই মাতৃত্ব নিয়ে নারীর কোন সমস্যাই থাকে না। কুন্তী এবং দ্রৌপদীকে দিয়ে পাণ্ডবেরা সমাজের কাছে তার এক আদর্শ স্থাপন করেছে।

একটা নিষ্পাপ শিশুর জন্মের সঙ্গে বৈধ-অবৈধর প্রশ্ন জড়ানো পাপ। মানবিকতার প্রতি ঘোরতর অবিচার। মনুষ্যত্বের অপরাধ। নারীর অপমান। মাতৃত্বকে বৈধ অবৈধতার প্রশ্নে শৃঙ্খলিত করা একটা সামাজিক পাপ, সভ্য মানুষের বিবেকহীনতার পরিচয়। পাণ্ডবেরা এর অবসান চায়। তাই নিজেদের কৌন্তেয় বলে তারা। মায়ের পরিচয় সন্তানের পরিচয় হলে সন্তান যে গুণ ও কর্মে ছোট হয় না, কুন্তী নিজের জীবন দিয়ে সেই সত্যকে প্রমাণ করতে বদ্ধপরিকর যেন।

পুরুষের বিবেকহীন স্বাধীনতা এবং নির্লজ্জ স্বার্থপরতা নারীকে প্রাপ্য সম্মান থেকে বঞ্চিত করছে একথা বোঝাতেই যেন পাঁচ ভাই মিলে এক নারীকে বিয়ে করল। নারীর মাতৃত্ব তার সন্তান পরিচয়ে, তার সামাজিক স্বীকৃতি এবং বংশ কৌলীন্য ইচ্ছে করলেই বদলানো যায়। প্রত্যেক পুরুষ মানুষ একটু চাইলে নারী অনেক সুস্থ, সুন্দর, সম্মানজনক জীবনযাপন করতে পারে। নিরাপত্তারও কোন অভাব থাকে না। হীনমন্যতার যন্ত্রণায় কষ্টও পেতে হয় না তাকে। দ্রৌপদী তাদের সেই শপথের প্রতিশ্রুতি। নারীমুক্তির আদর্শ। সন্তানের পিতৃ-পরিচয়ের বৈধতা প্রশ্নটি নারীর মাতৃত্ব ও জীবনকে শুধু জটিল করছে। এর অবসান চেয়েছে পাণ্ডবেরা। কারণ সন্তান জন্মদানের মত একটি জটিল সৃষ্টিলীলার ক্ষেত্রে নারীর দায়িত্ব ও ভূমিকা যেহেতু বেশি। তাই মাতৃপরিচয়ই সন্তানের একমাত্র পরিচয় হওয়া আবশ্যক। তা হলেই নারী সমাজে সম্মানিত হবে।

কিন্তু, এসব বড় মনের ভাবনা উর্বশীর জন্য নয়। তবু অর্জুনের প্রতি গভীর অনুরাগ ও প্রগাঢ় অনুরাগবশত কথাগুলো মনে হল। এক অদ্ভুত ভাললাগার আবেশে মন ভরে থাকল। কিন্তু অর্জুন তার কে? তার কথা ভেবে কী লাভ? নিজের অন্তর্জগতের স্বাধীনতা আনতে পারলেই সে সুখী। সেই স্বাধীনতার কোন অভাব হয়নি কোথাও। নিজের সম্পর্কে এই প্রচ্ছন্ন গর্ববোধ তাকে অন্য এক চিন্তায় নিয়ে গেল।

ভালবাসার ব্যাপারটা নারী-পুরুষের একটা বোঝাবুঝির ব্যাপার। মনের শুচিতা বোধ প্রত্যেকের এক স্বয়ংসম্পূর্ণ বোধ। কেউ তা আর একজনকে দিতে পারে না। এটা সম্পূর্ণ মনের ব্যাপার। কাকে তা দেওয়া হবে তার বাদ বিচার না করে, ক্ষোভ দুঃখ না জমিয়ে, হৃদয় নিঙড়ে উজাড় করে দিলেই নিজের হৃদয় ভরে উঠে। সেই সুখ এক বিশেষ মানসিক উচ্চতাতে পৌঁছে দেয়। তখন জাগতিক জীবনের সাধারণ সতীত্বের সংস্কারকে আর পাপ মনে হয় না। কুন্তী, দ্রৌপদী সেই জাতের রমণী। শ্রদ্ধায় ভরে উঠল উর্বশীর মন। ফুলের গন্ধের মত ভালমানুষের মনের গন্ধও আপনিই ছড়িয়ে যায় মানুষের মনে।

এসব ভাবতে গেলেই উর্বশীর সব কেমন গোলমাল হয়ে যায়। কিন্তু তবু আজকাল এসব চিন্তাই বেশি করে মনে পড়ে। দিনে রাতে প্রতিটি মুহূর্তে। কারণ সময় বয়ে যাচ্ছে। অনেক বসন্তের পায়ের শব্দ সে শুনেছে। আরো একটি বসন্ত এসেছে। কোকিল ডাকছে পাতার ফাঁকে। মনটা সত্যি হু হু

করে। নিজেকে বড় একা আর নিঃসঙ্গ লাগে। জীবনের বসন্তগুলো এক এক করে হারিয়ে গেলে একজন মানুষ কী করে বাঁচে? সে কথা মনে করলে উর্বশীর বড় কষ্ট হয়।

উর্বশীর চোখে এক গভীর বিষণ্ণতা নামল। অপলক স্থির দুই চোখের তারায় সে অর্জুনের শান্ত সৌম্য রূপ দেখছিল। মনে হচ্ছিল, তার জন্মান্তরের চেনা। তাকে না পেলে জীবন ব্যর্থ হয়ে যাবে। তার জীবনে এখনও অনেক কিছু অপূর্ণ রয়ে গেছে। অফুরন্ত আনন্দ সব পাওয়া হয়নি। তার শরীরে এখনও অনেক কিছু লুকনো আছে যা অন্য পুরুষকে দেওয়া হয়নি। অনেক বসন্ত গেলেও না। অর্জুনকে দেখে বারংবার মনে হল এই সেই পুরুষ যাকে ভালবাসলে এক অনাবিল আনন্দ ও শান্তি পাবে মনে। একা থাকলে কেবলই মনে হয়, অর্জুন যেন দৌড়ে এসে তার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে বলল ঃ উর্বশী আজ নৃত্য শিখতে আসিনি। শুধু তোমাকে একটু দেখতে এলাম। পরে আসব তোমার কাছে। সময় নিয়ে। রাতভর থাকব। হয়ত জীবনভর। আমি যে তোমাকে ভালবেসে ফেলেছি। ভীষণ। আজ নয়। আসব আমি। ঠিক আসব। বলতে বলতে অর্জুন লজ্জা পেয়ে পালাল।

একটা ঘোরলাগা আচ্ছন্নতার মধ্যে বুকের ওড়নায় মুখ চাপা দিয়ে নিজের মনেই ফিক করে হাসল উর্বশী। তারপরেই অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে গেল। বুকের গভীর থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল। মনে হল কী যেন বেরিয়ে গেল। পুরো বুকটা খালি হয়ে গেল।

॥ এগারো ॥

তিন বছর পরের ঘটনা।

দিন রাত্রি কোথা দিয়ে কীভাবে কেটে যায় অর্জুন টের পেল না। সমস্তক্ষণ তার শিক্ষণের মধ্যে কাটতে লাগল। দিনে দিব্যাস্ত্র প্রয়োগের কলাকৌশল তালিম নেয় দেবসেনাপতি কার্তিকের কাছে, আর রাতে উর্বশীর কাছে নৃত্যগীত শিক্ষা করে। সব রাত্রি নয়। শুক্ল ও কৃষ্ণপক্ষের জ্যোৎস্নালোকিত রাত্রে পৃথিবী যখন ঘুমিয়ে পড়ে। নীল আকাশকে চাঁদ নরম আলোর উজ্জ্বলতায় ভরিয়ে তোলে তখন উর্বশী অর্জুনকে আহ্বান করে নৃত্যে। নারীমাংসলোলুপ পুরুষ দর্শকের সামনে উর্বশী অর্জুনের সঙ্গে নৃত্য করে না। এই নৃত্যের জন্যে মনঃসংযোগের যেমন দরকার, তেমনি প্রয়োজন অনুরাগদীপ্ত শুভ্র মনের মহৎ উদার পবিত্র অনুভূতি। জ্যোৎস্নালোকিত পৃথিবীর নিস্তব্ধতা উর্বশীর সমস্ত চেতনার ভেতর দীপ জ্বেলে দেয়। তীব্র একটা আবেগে অন্তরটা চন্দ্রের মত জ্যোতির্ময় হয়ে ওঠে। বিপুলব্যাপ্ত নীল আকাশ অন্তহীন বন প্রকৃতি, পাহাড়-নদী সব কী আশ্চর্য আর একটা অদ্ভুত অনুভূতিতে তার চিত্ত আকুল করে তোলে। বড় বড় দুই চোখে কেমন একটা স্বপ্নাচ্ছন্নতা সৃষ্টি হয়। পরনের শুভ্র মেঘের মত বসন আর উত্তরীয় হঠাৎ উত্তাল হয়ে ওঠে। তার লীলায়িত দুই বাহুর মোমের মত মসৃণ কোমল ত্বকের পেশীর বিচিত্র অঙ্গুলি বিক্ষেপে সকরুণ ব্যাকুলতার এক একটা মুদ্রা ফুটে উঠে।

মুগ্ধ বিহুল দুটি চোখ মেলে অর্জুন উর্বশীর দিকে চেয়ে রইল। উর্বশীও তার দৃষ্টি সরিয়ে নিল না। তারপরেই কী যেন ঘটে গেল অর্জুনের শরীরের মধ্যে। উর্বশীর সঙ্গে পায়ে পা মিলিয়ে নাচ শুরু করল। নৃত্যের ছন্দে ছন্দে প্রতিটি পদক্ষেপে অর্জুন অনুভব করতে লাগল তার অন্তরের মধ্যে বিরাট মহৎ জ্যোতির্ময় সত্তার এক অস্তিত্ব। তার সুডৌল মুখে ঝিকমিক করছিল হাসি। কিন্তু উর্বশীর দুই চক্ষু ছিল বোজা। পূজারিণীর মত বিনম্র ভঙ্গিতে নাচছিল।

হঠাৎ থেমে গেল উর্বশীর নাচ। বুকের ভেতর কি এক তীব্র যন্ত্রণায়, অনুশোচনায় তার মনটা পাথরের মত ভারি হয়ে গেল। মনের অনেক নীচে গহন লোকের গূঢ় কথা তো বলে বোঝানো যায় না। তাই কেমন একটা ক্লান্তিতে অবসাদে ভেঙে পড়ল। মাটিতে উপুড় হয়ে পড়ে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল। আর তার শরীরটা তীব্র-তীক্ষ্ণ যন্ত্রণায় এঁকে-বেঁকে কুঁকড়ে কুঁকড়ে উঠতে লাগল।

অর্জুন স্তম্ভিত। কেমন একটু দিশাহারা হয়ে পড়ল। এই মুহূর্তে তার কী করা উচিত ভেবে পেল না, কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকার পর ডাকল : দেবী। তোমার কি খুব কষ্ট হচ্ছে? তোমাকে আমি কীভাবে সাহায্য করতে পারি বল?

অর্জুনের উদ্বিগ্ন জিজ্ঞাসা এবং ব্যাকুলতা উর্বশীর চেতনার ভেতর মধুর একটা আবেশ ছড়িয়ে

দিল। আস্তে আস্তে উঠে বসল উর্বশী। ব্যথিতভাবে হৃদয়টা আচ্ছন্ন। নিজের মনেই বলল : কী সাহায্য করবে? যে মানুষ নিজের কাজ থেকে নিজে পালিয়ে যেতে চায়, চেনা আলো থেকে যেতে চায় অজানা অন্ধকারে তাকে সাহায্য করার থাকে না কিছুই। তার নিজেরও বলার কিছু থাকে না কারো কাছে।

উর্বশী নিজের মনেই পথ চলতে লাগল। অর্জুন ছায়ার মত তাকে অনুসরণ করল। কিছুটা পথ আসার পর উর্বশী প্রশ্ন করল : তৃতীয় পাণ্ডব তুমি আমায় খুব ঘৃণা কর তাই না?

অর্জুন বড় বড় চোখ করে অবাক বিস্ময়ে উর্বশীর দিকে তাকাল। কিন্তু উর্বশী পিছন ফিরে থাকার দরুন তার মুখ দেখতে পেল না। বলল : একথা বললে কেন দেবী? আমার আচরণে কি তুমি ব্যথা পেয়েছ? তোমাকে ঘেন্না করার কী আছে? সবাই তোমার রূপ গুণ পুজো করে দেবী।

উদাস গলায় উর্বশী বলল : কী জানি? মনের কথা মনই জানে। মনকে দেখার চোখ কজনের আছে? পুরুষ জাতের প্রাণটা পাথরে গড়া। একটু মায়া মমতা নেই। তোমারও নেই তৃতীয় পাণ্ডব। সুন্দরী বৌ ফেলে বিদেশ বিভুঁইতে কেউ একা একা কাটায়?

ওরা পাশাপাশি হাঁটছিল। যেতে যেতে আড়চোখে তাকাল উর্বশী।

অর্জুন তার কথা শুনে মৃদু হাসছিল।

উর্বশী বলল : আচ্ছা, আমার সম্পর্কে তোমার কোন কৌতূহল হয়?

শ্রদ্ধা হয়।

অপ্সরাকে কেউ শ্রদ্ধা করে? হাসালে! তোমার মনের ঘেন্নাটা বিদ্রূপের ভাষায় উগরে দিলে শুধু।

না দেবী। শ্রদ্ধা আর সম্মান দিয়ে তো মানুষের সমস্ত সম্পর্কের ভিত গড়ে উঠে। প্রেমের বন্ধুত্বের স্নেহের মমতার। আমরা ছোট থেকে সেই শিক্ষা পেয়ে এসেছি। আমাদের কোন সংস্কার নেই। দেহের শুচিতা সম্পর্কে চিরাচরিত ধ্যান-ধারণাকে আমরা মানিও না।

আর কোন কথা হল না তাদের ভেতর। উর্বশীকে প্রাসাদ পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে অর্জুন ফিরে গেল নিজের গৃহে।

চাঁদের স্নিগ্ধ মায়াময় আলোয় ঝলমল করছিল উর্বশীর গৃহ উদ্যান। নিথর নিস্তব্ধতার মাঝখানে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে পাহাড় চূড়ার মত পাতাবাহারী দেবদারু, ঝাউগাছ। তরল সোনার মত চাঁদের আলো গলে গলে পড়ছে তাদের ডালে এবং পাতায়। বিভোর হয়ে সেই দৃশ্য দেখছিল অর্জুন। হঠাৎ নূপুরের শব্দে চমকে উঠল। তন্ময়তা কেটে গেল।

উজ্জ্বল চাঁদের আলোয় উর্বশীর রক্তবর্ণের ঘাঘরা দেখা যাচ্ছিল। ঘাঘরার নিচে দেখা যাচ্ছিল তার নিটোল দুখানা মেয়েলী পা। যেন গোলাপী রঙের প্রলেপ দেয়া। প্রতি পদক্ষেপে উতরোল হয়ে উঠল নূপুরের নিক্কণ।

রক্তবর্ণ পোশাকের আড়ালে অগ্নিশিখার মত জ্বলন্ত সেই যৌবনমূর্তি তার চেতনার ভেতর মর্মরিত হয়ে উঠল। অর্জুনের খুব অবাক লাগল। পাছে প্রকৃতির মৌনতা ভেঙে যায় তাই ঘুঙুর পায়ে নাচে না উর্বশী। আজ সেই নিয়মের ব্যতিক্রম করল উর্বশী। কিন্তু কেন?

কোনদিকে না তাকিয়ে উর্বশী শ্বেতমর্মরের বেদিতে এসে দাঁড়াল। অর্জুনের দিকে তাকিয়ে একটু হাসল। তার হাসিটি বড় অদ্ভুত। মোহমাখা হাসি। ভাষাহীন এক সংকেত। অর্জুনের বুকের ভেতরটা গুর গুর করে উঠল। বলল! আজ দুজন হাত ধরাধরি করে নাচব ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ দুরন্ত ফেনিল সমুদ্রের মত।

কিন্তু অর্জুনের অপেক্ষা না করেই সে নাচ শুরু করল। উর্বশী নাচছিল প্রাণের আবেগে। উতরোল হয়ে উঠল তার নূপুরের ঝুম ঝুম শব্দ। চক্রাকারে পাক খেয়ে খেয়ে উন্মত্ত বেগে নাচছিল উর্বশী। তার আলুলায়িত বিশ্রস্ত কেশদাম সমুদ্রের মত আছড়ে পড়ছিল উত্তুঙ্গ বুকের উপর। আবার চোখের পলকে সেই ঢেউ সরে যাচ্ছিল। আর বিদ্যুৎ-রেখার মত ঝলসে উঠছিল রঙিন কাঁচুলির আড়ালে আন্দোলিত দুটি দুরন্ত পয়োধর। টান দিয়ে ছিঁড়ে ফেলল ফুলের অলংকার, মালা, খুলে ফেলল ওড়না, অমনি তীক্ষ্ণ বিদ্যুতের সাদা আলোর মত ঝলসে উঠল তার দীপ্ত যৌবনশ্রী। মুঠো মুঠো জ্যোৎস্না দিয়ে গড়া যেন তার তন্বী দেহ। অগ্নিশিখার মত জ্বলজ্বল করছিল। তার সুডৌল মুখে ঝিকমিক

করছিল হাসি। তার রূপ যৌবন আর গর্বের হাসি।

নৃত্যের ছন্দে হিল্লোলিত দেহবল্লরী উর্বশীর এতই নগ্ন ছিল যে অর্জুনের চেতনাকে পীড়িত করছিল। অসাড় হয়ে এল তার উদ্দীপনা। নৃত্যে কোন উৎসাহ পেল না। পারল না উর্বশীর সঙ্গে নাচে অংশ নিতে। নাচের ছন্দ তার চেতনার ভেতরে মর্মরিত হয়ে উঠল না। নিঃশব্দ পায়ে উঠে গেল অর্জুন। দীঘির ধারে বাঁধানো বেদিতে গিয়ে বসল। উদাস চোখ দুটো রাতের আকাশে অস্তমান চাঁদের দিকে ছড়িয়ে দিয়ে কেমন একটা বিষাদ অনুভব করছিল অর্জুন। খুব গভীর বিষাদ।

অর্জুনের নিঃশব্দ প্রস্থান উর্বশীকে খুব অবাক করল। এত করেও অর্জুনের পুরুষ প্রাণে কামনার আগুন জ্বেলে দিতে পারল না। নিজেকে তার বড় ব্যর্থ মনে হল। হেরে যাওয়ার গ্লানিতে মনটা চিন চিন করতে লাগল। স্নায়ুর ভেতর তীব্র একটা অপমানের জ্বালা সারা শরীরে মোমের মত গলে গলে পড়তে লাগল। উর্বশী এই প্রথম একটি পুরুষের কাছে হারল। এই বেদনাটা সে সহ্য করতে পারছিল না। তালভঙ্গ হল নৃত্যের। আর নাচল না উর্বশী। অসহিষ্ণু ক্রোধে নূপুর ছুঁড়ে ফেলল। মুহূর্তে তার অনুভূতিতে বিপর্যয় ঘটে গেল।

ক্রোধে উন্মাদ হয়ে অর্জুনের কাছে গেল উর্বশী। কথা বলার সময় গলা কেঁপে গেল তার। ধরা গলায় বলল : তোমাকে আমি ঠিক বুঝতে পারি না তৃতীয় পাণ্ডব। আমাকে দুঃখ দিয়ে অপমান করে তুমি কী সুখ পাও?

দেবী আমাকে অপরাধী কোর না। তোমাকে আমি সত্যিই শ্রদ্ধা করি। ভীষণ শ্রদ্ধা করি।

হয়েছে, এই কথাটা বলে তুমি আমাকে ভদ্রভাষায় ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ কর।

চমকানো বিস্ময়ে অর্জুন আর্তস্বরে বলল : না।

উর্বশীর দুচোখ কুঞ্চিত হল। বলল : আমার সঙ্গে আজ তো নাচলে না। তুমিও জান তোমার সঙ্গে নাচলে আমি কত শান্তি পাই। যুগল নৃত্যে তুমি আমাকে প্রাণ দাও। ফুরিয়ে যাওয়া আমাকে নবীকৃত কর। আজ সেই ছোট তৃপ্তি থেকে বঞ্চিত করে আমাকে ক্ষতবিক্ষত করলে কেন?

অর্জুনের দুচোখে সকরুণ বিহ্বলতা নামল। বিষণ্ণ গম্ভীর গলায় বলল : ভেতর থেকে সাড়া না পেলে আমি নাচতে পারি না।

আমার নাচ তোমার পছন্দ হয়নি?

ভাল লেগেছে। মনে হল, এ নাচ তোমার কিন্তু তোমার নয়!

তোমার কথার অর্থ বুঝলাম না।

বেদনার সমুদ্র মন্থন করে এক অন্য উর্বশীর জন্ম হল তোমার নৃত্যে। সে নাচছিল তোমার মধ্যে দিয়ে। বুকের ভেতর তার জমানো বেদনা হঠাৎ বন্ধনমুক্ত নদীর মত তরঙ্গায়িত হয়ে উঠল তোমার দেহবল্লরীতে। যন্ত্রণার জ্বালাকে সহ্য করতে না পেরে বসনগুলো যখন ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলছিলে তখন কষ্টে তোমার দিকে তাকাতে পারছিলাম না। চোখ দুটো আপনা থেকে বুজে গেল। চোখ ভরে গেল জলে। নিজেকে প্রশ্ন করি এ কার নৃত্য দেখছি আমি? এ তো উর্বশীর নৃত্য নয়? এ যে রতিরসে ভরা এক অপ্সরার নৃত্য।

উর্বশী কথা বলতে পারল না। নিকটের একটি গাছকে জড়িয়ে ধরে সে আকুল হয়ে কাঁদতে লাগল।

অর্জুন বিব্রত হল। কেমন একটু দিশেহারা বোধ করল। বিষণ্ণ ভারাক্রান্ত গলায় বলল : দেবী, আমার কথায় তুমি কি দুঃখ পেলে? বিশ্বাস কর, আমি তোমাকে ব্যথা দিতে চাইনি।

উর্বশীর ভেতরে অস্থিরতা আগের মত তীব্র নয়। শান্তভাবে নিরুত্তাপ কণ্ঠে বলল ঃ তোমার কোন দোষ নেই। সব দোষ আমার। আমি একটা নষ্ট মেয়েমানুষ। এছাড়া আমার আর কোন পরিচয় নেই। আমার সব পরিচয় মিথ্যে হয়ে গেছে।

দেবী তোমার ধারণা ঠিক নয়। ও রকম ভাবাই ভুল।

কি জানি? আমার বুকে এখনও অফুরন্ত ভালবাসা আছে! কেউ একটু চাইলে আমার ভালবাসা নিয়ে আবার নতুন করে বাঁচতে পারতাম। আমি এখনো উর্বশী আছি। অপ্সরা হয়ে যাইনি।

অর্জুন চুপ করে রইল।

হু হু করে ঠাণ্ডা বাতাস আসছিল। উর্বশীর চুল উড়ছিল। অর্জুন মন দিয়ে দীঘির কালো জলের দিকে চেয়েছিল। কিছুক্ষণ পর বলল : আজ তোমার মন ভাল নেই। চল, তোমাকে গৃহ পর্যন্ত পৌঁছে দিই।

যেতে যেতে উর্বশীর বেশ কয়েকবার দীর্ঘশ্বাস পড়ল। নিজের মনেই বলল : নবমীর চাঁদ ডুবে গেছে। বেশ অন্ধকার চতুর্দিকে। খুব ইচ্ছে করছে এই অন্ধকারের মধ্যে ডুবে থাকতে, ডুবে যেতে। অন্ধকার সব কিছু ঢেকে দেয়। আড়াল করে রাখে বলে, অন্ধকারকে আমার ভীষণ ভাল লাগে। অন্ধকারে মানুষ বোধ হয় সবচেয়ে বেশি নিজেকে খুঁজে পায়।

অর্জুন কোন কথা বলল না। পাশাপাশি হাঁটতে লাগল।

উর্বশীর ঘুম এল না। শ্রান্তিতে অবসাদে দুচোখের পাতা জড়িয়ে রইল। উদাস দুটি চোখ অন্ধকার তারাহীন আকাশে ছড়িয়ে দিয়ে চুপ করে শুয়ে রইল। খোলা জানলা দিয়ে অনেকখানি আকাশ দেখা যাচ্ছিল। গাছগুলো ভুতুড়ে চেহারা নিয়েছিল। দুরন্ত এক অস্থিরতায় তার ভেতরটা এলোমেলো হয়ে গেল। কত কথা মনে হতে লাগল। কিন্তু কোন কথাই তার মনে দাগ কাটল না। থেকে থেকে মনে হতে লাগল অর্জুনের কাছে তার এক মস্ত পরাজয় হয়েছে। এই অনুভূতিটা তাকে কাঁটার মত বিঁধতে লাগল।

বিছানা ছেড়ে ঘরময় পায়চারি করতে লাগল। হঠাৎ কি ভেবে দর্পণের সামনে দাঁড়াল। তারপর নিজেকে আবৃত করে স্বল্প আলোতে দেখতে লাগল। তার অনুপম রূপ-লাবণ্য, সৌন্দর্যের কোন ভাঁটা পড়েনি। এদেহে তার অনন্ত যৌবন। রূপের আগুন। বুক ভরা দুটি নিটোল ডালিম, স্বপ্নমদির কটাক্ষ এখনও হাতছানি দেয়। লুব্ধ করে। ইন্দ্র বলে, উর্বশীর কোন বিকল্প নেই, থাকতে পারেও না কোন পুরুষের কাছে। সে কি মিথ্যে মন ভোলানো কথা? কিন্তু কৃষ্ণবর্ণা দ্রৌপদী কিংবা কৃষ্ণভগিনী সুভদ্রা, উলুপীর সঙ্গে তার কোন তুলনাই হয় না। তারা কেউ প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারে না তার।

সে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। কোন পুরুষকে চাইবে অথবা প্রত্যাখ্যান করবে তার নিজের ব্যাপার। কোনদিন পুরুষের নিজের চাওয়া কিংবা প্রত্যাখ্যানের দ্বারা চলেনি। এরকম কোন দুর্ঘটনাও ঘটেনি তার জীবনে। ঘটবেও না। কারণ পুরুষ মানুষ বড় দুর্বল, বড় ভঙ্গুর, আর ভীষণ সস্তা। শরীরের শব্দ পেলেই পুরুষ আর পুরুষ থাকে না। জানোয়ার হয়ে যায়। একজন পুরুষ সিংহও মেষ হয়ে যায়। প্রত্যেক নারীই পুরুষের এই দুর্বলতা জানে। তাই শরীরের মধ্যে টেনে এনে পুরুষকে বশ করা, বন্দী করা, জয় করা, প্রত্যেক নারীর একটা সহজাত প্রবণতা। কিন্তু সে একটু ব্যতিক্রম। তার সান্নিধ্যের লোভ কোন পুরুষ সামলাতে পারে না, পারবেও না। এই গর্বটুকু ছিল উর্বশীর একান্ত নিজের। চিরদিন সেজন্য গর্বিত বোধ করে এসেছে। সেই গর্বকে হারিয়ে দিল অর্জুন। পঞ্চস্বামী সোহাগিনী কৃষ্ণাই তার পথের কাঁটা। কিন্তু তাকে প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবার কোন কারণ আছে বলে উর্বশীর মনে হল না, কৃষ্ণার আছে কী? প্রশ্নটা নিজের কাছে একান্তে করতে গিয়েও কয়েকবার ঢোক গিললো। কারণ সব পুরুষ তাকে চায়। একবার যে দেখেছে, সে মজেছে। তাকে পাওয়ার জন্যে রক্তারক্তি হয়েছে। কুরু-পাণ্ডবের প্রকৃত বিবাদ তাকে নিয়ে। সুতরাং, একটা কিছু আছে তার মধ্যে। হয়ত তাকে ভয় পায় অর্জুন। কিন্তু তাই বা কেমন করে সম্ভব? উলুপী, চিত্রাঙ্গদা, সুভদ্রাকে দ্রৌপদীর অজান্তে বরণ করেছে। এরা কেউই দ্রৌপদীর স্থান পূরণ করেনি। দ্রৌপদীর মধ্যে পঞ্চপাণ্ডব কি খুঁজে পেল? বোধ হয় বৈচিত্র্য। বৈচিত্র্যের রহস্য এক একজন মানুষের কাছে এক একরকম। কার কাছে কী ভাবে সেটা ধরা দেয় মানুষ নিজেও বোধ হয় জানে না।

দর্পণের দিকে গর্বিতভাবে তাকিয়ে থাকতে থাকতে একটা অদ্ভুত হাসি ফুটল তার মুখে। সে হাসিতে ভীষণ সুন্দর দেখাল তাকে। এই মায়াবী হাসির ছোঁয়ায় বাঘা বাঘা পুরুষেরা পর্যন্ত কুঁকড়ে যায়। সে যত বড় মাপের মানুষ হোক, একটু ছোঁয়া পাওয়ার জন্য কাঙাল হয়ে উঠে। তখন তাদের কৃপা করতে করুণা করতে খুব মজা লাগে। ভালও লাগে। এ সব বেঁচে থাকার কৌতুক, শৌখিনতা, বিলাস, আনন্দ প্রত্যেক সুন্দরী নারীর। সঙ্গমের চেয়ে পুরুষের এই ছটফটানি, স্তুতি, স্তাবকতা দেখতে

বেশি মধুর লাগে মেয়ে মাত্র। কিন্তু অর্জুন সকলের থেকে একটু আলাদা। কোন উপাদানে বিধাতা যে গড়েছিল তাকে তিনিই জানেন।

দর্পণের সামনে দাঁড়িয়ে উর্বশী কাপড় পরল। নিজেকে বড় পরাজিত, অপমানিত মনে হল। কী এক গভীর যন্ত্রণা আর অনুশোচনার বোধ ঝড়ের মত ধেয়ে এসে তাকে ছিন্নভিন্ন করে দিল। মনের পায়ে জোর পাচ্ছিল না। পালঙ্ক পর্যন্ত হেঁটে যেতে তার পা কাঁপছিল। অবশ লাগছিল সারা শরীর। আগে কখনও হয়নি এমন। শয্যার উপর টলে পড়ল রণক্লান্ত, আহত যোদ্ধার মত। অবসাদে ক্লান্তিতে শরীরটাকে টান টান করে মেলে দিল বিছানার উপর।

উর্বশী হঠাৎ হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল। অবাক হল নিজেই। ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, আত্মজ্ঞানসম্পন্ন এক গর্বিত উর্বশীর এ কি দশা! নিজেরই রক্ত নিজের সঙ্গে যখন লড়াই করতে থাকে তখন বোধ হয় এমন হয়। না হেরে গিয়ে তখন উপায় থাকে না।

কয়েকটা দিন অস্থিরভাবে কাটল। দিন যে এমন দুঃসহ মর্মান্তিকভাবে কাটতে পারে উর্বশীর জানা ছিল না। রূপ যৌবনের জোরে ব্যক্তিত্বের জোরে যে গর্ব অহংকার দুর্মর আকাঙ্ক্ষাগুলো তার ভিতর নখদন্ত মেলে বসেছিল তা যেন স্তিমিত হয়ে আসতে লাগল। নিজের রূপ যৌবন নিয়ে কতকগুলো দুর্বল, লম্পট, কামুক মানুষের চিত্ত জয় করে মনে যে আত্মশ্লাঘা হয়েছিল তার মত মিথ্যে আর কিছু ছিল না। শরীর দিয়ে সস্তা জয়লাভ হয় কিন্তু তা নিয়ে গর্ব করা কিংবা তুষ্ট হওয়ার কিছু থাকে না। সত্যিই থাকে না। অর্জুনের কাছে প্রথম জানল শরীর দিয়ে নারী কিছুই জয় করে না, শুধু হারায়। শরীরের জয় কোন জয় নয়। সে জয়ের কোন ভিত নেই। এ রকম একটা ভাবনায় মনটা খারাপ হয়ে গেল। বিষণ্ণতায় থম থম করতে লাগল মুখ। এক সময় নিজের অজান্তে চোখ দুটো জলে ভরে গেল।

উর্বশী নিজের কাছে এবং অর্জুনের কাছে এই হারটাকে মেনে নিতে পারছিল না। আবার তাকে জয় করার আশাও ছাড়তে পারছিল না। ভাবাবেগের শেকড়টা একটা বিশ্বাস নিয়ে সব সময় নিঃশব্দে শিকড় চালিয়ে দেয় দেহ-মনের গভীরে। মনের আবেগ দমন করতে পারল না উর্বশী; দ্রুত একটা কিছু ভেবে নিয়ে প্রসাধনে মন দিল।

সকাল থেকে আকাশে মেঘ করেছিল। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছিল। ঘরে মন বসছিল না। ভিতরে পরাভবের নিদারুণ যন্ত্রণা তার অবসন্ন ক্লান্ত মনকে এই ঠাণ্ডার ভেতরে উত্তেজিত তপ্ত করে তুলল। অসহ্য আবেগের তাড়না সহ্য করার শক্তি তার অবশিষ্ট ছিল না।

টিপ টিপ বৃষ্টির মধ্যে অর্জুনের গৃহে ফিরল। বিকেল-বিকেলই পৌঁছল। কিছুই ভালো লাগছিল না। তাই আপন মনে বীণা বাজাতে বাজাতে বিভোর হয়ে গেল অর্জুন। দুচোখ তার বোজা। বীণার অনবদ্য ঝংকার যেন মৃদু তরঙ্গের মত স্পন্দিত হতে থাকে। উর্বশী থমকে দাঁড়াল। মন দিয়ে বীণাধ্বনি শুনতে লাগল। বিস্ময়ে চেয়ে রইল উর্বশী। কী অপরূপ লাগছিল অর্জুনকে। মেঘমল্লার রাগের এই ছটফটহীন শান্ত ধীর-স্থির ভাবটি ভীষণ ভাল লাগে উর্বশীর। অর্জুনের সমস্ত অবয়বে মুখের অভিব্যক্তিতে এবং একটা শান্ত সৌম্য ভাব ফুটে উঠল। তার নিজের ভেতর সব চঞ্চলতাও যেন রাগের ভাবে পুরোপুরি তাকে সমাহিত করে রাখল। চোখের সামনে বর্ষার রূপ ফুটে উঠল। মনে হল সুরের ভেলায় তার মনটা ভেসে ভেসে চলল যেন কোন অমরার সন্ধানে। ভীষণ ভাল লাগল উর্বশীর। গান শুনতে শুনতে সেও বিভোর হয়ে গেল। অর্জুনের আলাপে শয়ে শয়ে পাখি যেন আকাশে উড়তে লাগল। লক্ষ লক্ষ ফুল কুঁড়ি ফুটে উঠল বনে বনে। মত্ত ময়ূরী যেন নাচছিল তালে তালে। তারও হৃদয়ের মধ্যে নূপুর বেজে যাচ্ছিল আবেগে, অনুরাগে শ্রদ্ধামিশ্রিত সোহাগে।

বেশ কিছুক্ষণ পর গান থামল। এই সময়টা বোধ হয় গানের সবচেয়ে সুন্দর মুহূর্ত। শিল্পী মনে বিভোরতার সঙ্গে সুরের রেশটুকু তখনও ধূপের গন্ধের মত ফুলের পবিত্রতার মত বাতাসে মিশে ছিল। অদ্ভুত বিহ্বলতার জড়ানো দুটি চোখ মেলে উর্বশীকে দেখল। নিজের অজান্তে বিগলিত

খুশির ভাব ফুটল মুখে। অধরে স্মিত হাসি। চোখে বিদ্যুৎদীপ্তি। মুখে সপ্রতিভ হাসি বলল ঃ দেবী, কী ভাগ্য আমার।

উর্বশী লাজুক অপ্রতিভ চোখে তাকাল। বলল ঃ বড় মিষ্টি গান। এমন গান বহুকাল শুনিনি। এসব কোথায় শিখেছিলে? চিত্রাঙ্গদার কাছে?

তা তো জানি না। শোনানোর মত মানুষ আর গাইবাব মত মেজাজ এই দুইয়ের যোগাযোগ না ঘটলে গান, কখনও গান হয়ে ওঠে না। হয়ত তোমার পায়ের ধুলো পড়ে আমার সামান্য গান অসামান্য হয়ে গেল।

এমন অবিশ্বাস্য কথা বললে কেউ বিশ্বাস করে?

দরকার কী বিশ্বাসের? তোমাকে অপ্রত্যাশিত দেখার আনন্দে মন যেন আমার পাখা মেলে দিল সুরের আকাশে। একথা তো সত্য।

উর্বশীর ভেতরটা চমকে উঠল। হঠাৎ দুর্বার ভাললাগার আনন্দে কান দুটো তেতে উঠল। সমস্ত শরীরের মধ্যে জ্বালাধরা অনুভূতি ছড়িয়ে পড়ল। একটা দমিত আবেগের ঘোরে সে অনবরত মাথা নাড়তে নাড়তে বলল : মিথ্যে কথা। কক্ষণো না। তোমার কথা এক বর্ণও সত্যি নয়। প্রশংসা স্তুতি আমার ভাল লাগে না। স্তুতি করলে ভয় হয় ঠকাবার আশঙ্কায় ভেতরটা ছটফট করে। তোমার স্তুতি আমি চাই না। আমাকে তোমার একটু ভালবাসা দাও। তোমার অনন্ত ভালবাসার সাগর থেকে উর্বশী যদি একমুঠো ফেনা নিয়ে যায়, তাতে সাগর কি রিক্ত হয়ে যাবে? উলূপী চিত্রাঙ্গদার মত আমাকেও তুমি ধন্য করে, ভরপুর করে চলে যাও। তোমার স্মৃতি নিয়ে আমি অক্ষয় স্বর্গ রচনা করব। বল প্রিয়তম এটুকু পারবে না? ভীষণ ক্লান্ত আমি। আমাকে একটু আশ্রয় দাও। বলতে বলতে উর্বশী অপ্রত্যাশিতভাবে অর্জুনকে জড়িয়ে ধরে চোখেব জলে ভিজে গাল দুটো তাব বুকের উপর ঘসতে লাগল। বলল : অর্জুন, পাষাণী উর্বশীকে একটু প্রাণ দিয়ে যাও। আমি একটু মুক্তি চাই। তোমার প্রেমেই আমার সে মুক্তি। আমাকে একটু মানুষের মত বাঁচতে দাও। প্রিয়তম একটু শক্ত করে ধর আমায়।

অর্জুনের বুকের উপর উর্বশীর সারা শরীর থর থর করে কাঁপছিল। অর্জুন বিস্মিত এবং বিব্রত। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে উর্বশীর দিকে একবার তাকাল। ভয়ে শরীরটা কুঁকড়ে গেল। নিজের অজান্তে তাকে জড়িয়ে ধরল যাতে শিথিল শরীরটা পড়ে না যায়। একজন নারীকে এইভাবে ধরে থাকা বড় বিপদের। বেশ অনুভব করছিল উর্বশীর শিথিল শরীরের প্রতিটি অঙ্গ যেন তার শরীরের সঙ্গে মিশে গেছে। আশ্চর্য এক সমর্পিত তন্ময়তায় তার চিত্ত একটু একটু করে বিকল হয়ে যাচ্ছিল। নানারকম মিশ্র অনুভূতির প্রতিক্রিয়ায় প্রতিক্রিয়াশীল। তার কঠোর ব্রহ্মচর্যের দীর্ঘ বছরগুলিতে সংযমে দমিয়ে রাখা অবদমিত কামের ঘরে পাছে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠে তাই অর্জুন চোখ বুজে জননী কুন্তিকে কল্পনা করল। চিত্তকে সংযত শান্ত ও দৃঢ় রাখার জন্য মনে মনে নিরুচ্চারে বলল, আমি ব্রহ্মচারী। ইন্দ্রিয় সুখের কোন অধিকার আমার নেই। ব্রহ্মচারীকে নারীর সংস্পর্শে নপুংসকের মত জীবনযাপন করতে হয়। ব্রহ্মচর্যের মূল কথা বীর্যধারণ। আস্তে আস্তে একটা শান্ত সংযতভাব ফিরে এল। সমস্ত সত্তা দিয়ে অনুভব করল : উর্বশী বড় পবিত্র নারী। মলিন আত্মার অধিকারিণী কোন স্বৈরিনী নারীর শরীরে এই স্বর্গীয় দীপ্তি থাকতে পারে না। নারীর পবিত্রতা ছড়িয়ে আছে তার দেহে। তাই কোন চিত্তবিভ্রম হল না। পরিবর্তে কেমন একটা মহৎ উদার পবিত্র অনুভূতিতে আচ্ছন্ন হয়ে গেল তার সমস্ত চেতনা। তীব্র একটা আবেগে অন্তরটা জ্যোতির্ময় হয়ে উঠল। মনে হল, উর্বশী যেন জননী কুন্তী হয়ে গেছে তার ভাবনায়।

একটা নিটোল স্তব্ধতার মধ্যে হারিয়ে গিয়েছিল উর্বশী। এই সময়টুকু তার কোন চেতনা ছিল না। কিছু ভাবছিলও না। অর্জুনের কাঁধে মাথা রেখে স্থির হয়ে ছিল।

অর্জুনের কোন প্রতিক্রিয়া নেই। পাথরের মত নির্বিকার। ভীষণ শান্ত এবং ঠাণ্ডা। উর্বশী ক্লান্তি বোধ করল। অর্জুনের ঔদাসীন্যে সে পীড়া বোধ করতে লাগল। অনেক কথাই মনে ভীড় করল। বলবে বলবে করেও বলতে পারল না। একটা বিষাদ অনুভব করছিল। খুব গভীর বিষাদ।

অবাক চোখে অর্জুন উর্বশীকে দেখছিল। মুখে স্মিত হাসি। উর্বশীর কপালে তার ঠাণ্ডা হাতখানা রাখল। তারপর আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে দিল। কী ভাল যে লাগছিল উর্বশীর, সে নিজেই জানে। চোখ বুজে এল তৃপ্তিতে। বুক ভরে শ্বাস নিল। একটা অপ্রতিরোধ্য কাঁপুনি সে নিজের ভেতর টের পাচ্ছিল। অর্জুনের হাত চেপে ধরে যেন অবিশ্বাস ভরে মাথাটা নাড়তে লাগল। বলল : আমি যে বিশ্বাস করতে পারছি না অর্জুন। উঃ কী ভাল লাগছে আমার। কত চেষ্টা করেছি নিজের কথা বোঝাতে কিন্তু পারিনি। তোমার হাতের পরশে আমার জীবনটা ধন্য হয়ে উঠল। মনে হচ্ছে আমার পাওয়ার ঘর ভরে গেল।

অর্জুন একটু হাসবার ব্যর্থ চেষ্টা করে বলল : তোমার হৃদয় জুড়ে ব্যথার হাহাকার। তুমি কিছু না বললেও আমি টের পাই জননী। তোমার আত্মাকেও দেখতে পাই।

জ্যা ছেঁড়া ধনুকের মত ছিটকে গেল উর্বশী। অর্জুনের আচমকা 'জননী' ডাকে তার ভেতরটা আর্তনাদ করে উঠল। বুকটা মোচড় দিয়ে উঠল। মনে হল কোথায় যেন পাহাড় চূড়া ভেঙে পড়ার শব্দ হল। পায়ের তলার মাটিটা থর থর কেঁপে উঠল। আসলে তার নিজের হৃদয়ের মধ্যে বিপুল বিপর্যয় ঘটে গেল। এ তারই অপ্রতিরোধ্য আন্দোলন। বুকের ভেতর তার একটাই প্রশ্ন : অর্জুন এত নিষ্ঠুরভাবে তার প্রেমকে আঘাত করল কী করে? তাকে অপমান করে লজ্জা দিয়ে তার কী সুখ? একটা তীব্র অপমানবোধে তার বুক উথাল পাথাল করে উঠল। প্রবল শ্বাসের সঙ্গে তীক্ষ্ণ গলায় বলল : না। কক্ষণো না। কিছুতেই না। আমি তোমার জননী হতে পারি না। কেন হব?

রাগে অভিমানে দুঃখে উর্বশীর চোখ জলে ভরে গেল। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদল অনেকক্ষণ। তার পরেই দপ্ করে জ্বলে উঠল ক্রোধে ঘৃণায় বিরক্তিতে। দু'চোখে আগুন জ্বেলে বলল ছিঃ ছিঃ অর্জুন। এত ছোট তুমি? এত ভীরু, কাপুরুষ তোমাকে জানতাম না। কোন মুখে আমাকে জননী বলে ডাকলে? আমি কখনও তোমার জননী হতে পারি? না হওয়া যায়? জননী হওয়া এত সহজ? স্বতঃস্ফূর্ত অপত্যস্নেহের ভাব বুক ঠেলে বাইরে বেরিয়ে এলেই তবে জননী হওয়া যায়। বাসনার দীপ জ্বালিয়ে দেহে মনে যাকে কামনা করলাম তার সঙ্গে সন্তান সম্পর্ক গড়ব কোন মন্ত্রবলে? মাতা-পুত্রের পবিত্র সম্পর্ক তার ভেতর থাকে কী করে? একজন বয়স্ক পুরুষকে সন্তান ভাবা কি এতই সহজ! একবারও বিচার করলে না কাকে কী বলছ? এতে যে আমাকে অপমান করা হয় এই বোধটুকুও তোমার নেই। আমি নষ্ট মেয়েমানুষ। কিন্তু তোমার মত বিকারগ্রস্ত, বিবেকহীন, মনুষ্যত্বহীন নই। আমার প্রেমকে তুমি প্রত্যাখ্যান করতে পার, কিন্তু এভাবে আমার সঙ্গে নিষ্ঠুর কৌতুক করার তোমার কোন অধিকার নেই।

অর্জুন কিন্তু রাগল না। উর্বশীর সব অভিযোগ তিরস্কার মন দিয়ে শুনল। বুকটা তার জন্য দয়ায় মায়ায় করুণায় কেমন করছিল। সেই অবোধ রহস্যময় অনুভূতির কোন মানে হয় না। এই দুর্বলতার রন্ধ্রপথ ধরে আসে পতন। তাই নিজের মনটাকে অর্জুন কঠিন ও নির্বিকার রাখল। মুখে তার স্মিত হাসি। মৃদুস্বরে বলল : কোন কৌতুক করিনি আমি দেবী। কামনা বশে তুমি বিস্মৃত হয়েছ আমাদের পবিত্র সম্পর্ক। মহারাজ পুরুরবার পত্নী তুমি। পুরুবংশের বধূ। সেই বংশের সন্তান আমি। পুরুবংশের রক্তধারা বইছে আমার ও মহারাজ পুরুরবার ধমনীতে। তিনি আমার শ্রদ্ধেয় পিতৃব্য এ কথাটা ভুলব কেমন করে? আমার তোমার সম্পর্ক যে মাতা-পুত্রের। কেমন করে সেই কথাটা ভুলি? যার সঙ্গে আমার জননীর সম্পর্ক সে আমাকে প্রেম নিবেদন করবে, প্রেমিকার ভাষায় কথা বলবে, তাকাবে, সোহাগ করার চেষ্টা করবে জেনে শুনে এই পাপ কেউ করে? করা উচিত? আমি শুধু নৈতিক কর্তব্য করেছি। পৃথিবীর সবচেয়ে পবিত্র সম্পর্কের বিশুদ্ধতা রক্ষা করেছি।

উর্বশী সন্দিহান হয়ে তাকাল তার দিকে। তীক্ষ্ণস্বরে বলল : মিথ্যে কথা। ব্রহ্মচর্য-ভ্রষ্ট হওয়ার আশঙ্কায় তুমি আমাকে ঠকিয়েছ। নিজের সঙ্গেও তুমি ছলনা করছ। কৃষ্ণ ভগিনী সুভদ্রার সঙ্গে তোমার ভগিনী সম্পর্ক। ভ্রাতা-ভগিনীর মধুর পবিত্রতার সম্পর্ক ভুলে তাকে প্রণয়বশে কামনা করলে। বধূরূপে বরণ করার সময় তোমার এই নীতিজ্ঞান ছিল কোথায়? পাঞ্চালী শুধু মহারাজ যুধিষ্ঠিরের পরিণীতা স্ত্রী। অগ্রজ ভ্রাতৃবধূর সঙ্গে সহবাসকালে একবারও কি নৈতিক কর্তব্যের কথা স্মরণ কর? ভুলে

যেও না ব্রহ্মাচর্যকালে মিথ্যে বলাও পাপ। নিজের সঙ্গে মিথ্যাচারণ করে তুমি ব্রতভঙ্গ করছ।

উর্বশীর কর্কশ, সুরহীন হিংস্র কণ্ঠস্বর অর্জুনের ভিতর সব স্পন্দনকে যেন কয়েক নিমেষের জন্যে স্তব্ধ করে দিল। যেন বা থেমে গেল রক্তের প্রবহমানতা, বন্ধ হয়ে গেল হৃৎপিণ্ডের ধুকপুক শব্দ। কিছুক্ষণ স্তব্ধ বিস্ময়ে চুপ করে থাকার পর অভিভূত গলায় বলল : জানি না। সত্যি জানি না।

উর্বশীর বিস্ময় মিশ্রিত প্রশ্ন : সত্যি জান না?

অর্জুন শান্ত কণ্ঠে বলল : জানি। কিন্তু তুমি বিশ্বাস করবে না। বুকের ভেতর থেকে হঠাৎ ঐ ডাকটা উৎসারিত হয়ে আমার হৃদয় মন ভরে দিল। বোধ হয় ঐ চোখেই তোমাকে দেখতাম, শ্রদ্ধা করতাম।

দুর্বোধ্য যন্ত্রণায় উর্বশী মাথা নাড়ল। নাড়তে গিয়ে তার চোখ থেকে অবাধ্য জল গলে পড়ল গাল বেয়ে। ফোঁপানির শব্দ হল। ঠোঁট দাঁতে কামড়ে কান্না সামলানোর চেষ্টা করল। আর্তস্বরে বলল : অর্জুন তুমি বড় নিষ্ঠুর। তোমার হৃদয় বলে কিছু নেই। তুমি পাষাণ। তুমি আমার সামনে থেকে দূর হও। তোমাকে আর আমি সহ্য করতে পারছি না।

একটা শিহরন আর ভয় খেলা করে গেল অর্জুনের শরীরে। তাকে যে এমনভাবে উর্বশী কামনা করে, এত পাগলের মত চায় এটা ভাবতেই শিউরে উঠল গা। তাই নিজেকে যথাসম্ভব নিরাবেগ এবং সংযত রাখল। মৃদুস্বরে বলল : মাতঃ যা দামী, তার দাম না বুঝে অকারণ মন খারাপ করছ। বিলাপ করা তোমাকে মানায় না। জীবন একটা খেলার মাঠ। নিষ্পাপ মনে যতদিন যতক্ষণ ছুটতে পারবে ততদিন ততক্ষণ তুমি বেঁচে আছ। নইলে তুমি জানবে তুমি মরে গেছ। আর সম্পর্ক পরিবর্তনের কথা বলছ? ওটা সম্পূর্ণ মনের ব্যাপার। মন যদি থাকে হীরের টুকরো লোকের কচকচানিতে তা কাচ হয়ে যায় না। মনটাকে পরিবর্তন করার ব্যাপার শুধু। এও একধরনের খেলা। খেলতে গিয়ে মনটাকে অপবিত্র করে তোলাও দোষের। তবু কখনো কখনো তা ঘটে যায়। দুর্বল ইচ্ছেটা সব কিছু নষ্ট করে দেয়। নিজেকে নষ্ট করার অধিকার প্রত্যেক মানুষের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার ব্যাপার। কিন্তু নিজেকে নষ্ট করতে গিয়ে যদি অন্য কাউকে নষ্ট করা হয় সেটাই হবে দুঃখের।

কথা বলতে গিয়ে উর্বশীর চোখের পাতা কেঁপে গেল, মুখের ভাব পাল্টে গেল। বলল : অন্য কাউকে নষ্ট করিনি। আমার কারণে কেউ নষ্ট হয়ে যাক তা কখনও চাইনি আমি। এখনও চাই না। মিথ্যাচার ব্যাপারটা আমার মধ্যে নেই বলে এই মিথ্যেচারী ভণ্ড পৃথিবীতে আমার মত মানুষরাই শুধু হেনস্তা হয়।

উর্বশী কথা বলতে পারল না। হৃদয় ভাঙা অভিমান, দুঃখ, বেদনা নিয়ে উর্বশী ধীরে ধীরে ঘর থেকে বাইরে এল। যেতে যেতেই সে অর্জুনের কথাগুলো শুনতে পাচ্ছিল। এ তোমার অভিমানের কথা মাতা। তোমার জীবনের সব কিছুই তোমাকে ঘিরে ছিল, এখনও আছে। মিছিমিছি নিজেকে দুঃখ দাও। নিজেকে নির্যাতন করে তুমি তোমার ভালবাসার প্রতিশোধ নাও। মহারাজ পুরুরবা তোমার মনের কথাটা বোঝেন। তাই তোমার অবহেলা প্রত্যাখ্যান পেয়েও বৎসরান্তে একবারটি ঠিক তোমার কাছে আসেন। যেদিন তুমি দেবলোকে এসেছিলে মহারাজ তোমাকে ফিরিয়ে যাওয়ার দাবি নিয়ে আসেন। কিন্তু তুমি তাকে প্রতিবার নিরাশ করে চলে যাও। আসলে তোমার আত্মত্যাগের জন্যে তিনি গর্বিত। তোমাকে নিয়ে পুত্রদেরও যে আনন্দ আছে গর্ব আছে সেটুকুও তুমি তাঁর কাছে শুনতে চাও না। আসলে তুমি নিজেকে ভালবাস। তাই তাঁর মনের কথা বোঝার মত ধৈর্য এবং সময় তোমার কোনদিনও হল না। আত্মহত্যার বদলে এই স্বেচ্ছামৃত্যু তুমি নিজেই নিজের কাছে চেয়ে নিয়েছ।

যেতে যেতে উর্বশী থমকে দাঁড়াল। দু'চোখে বিস্ময়ের দীপ জ্বেলে অর্জুনের দিকে জলভরা চোখে চেয়ে রইল অনেকক্ষণ। তারপর মাথা হেঁট করে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল।

বাইরে তখন গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছিল।

চারদিক থেকে কুয়াশার মত অন্ধকার নামল খুব ধীরে।

কটা রাত ঘুমোতে পরল না উর্বশী। দিন এবং রাত একটা থম ধরা গভীর বিষণ্ণতায় কাটে। নিজের মনেই বিড় বিড় করে বলে, জীবনে যা কিছু ঘটে তার একটা অর্থ থাকে! সব কিছুর মধ্যে দিয়ে না গেলে কোন জীবনই পূর্ণ হয় না। তাই বোধ হয় সব ঘটনার একটা নির্ধারিত সময় থাকে। সেই সময়ের জন্যে প্রত্যেককে অপেক্ষা করতে হয়। মুকুলের জন্য বসন্তের প্রতীক্ষা করতে হয়। তারপর কুঁড়ি ধরা, ফুল ফোটা, ফল হওয়া, ঝরে পড়া সব কিছুই ঠিক সময়ে হয়। কেউ আগে চাইলেই তা হয় না।

অসাধারণ থেকে সাধারণ হওয়ার বেলাতেও এই সময়ের প্রতীক্ষা করতে হয়। অসাধারণ যারা, সাধারণের চেয়ে বড় বলেই তারা অসাধারণ। তাই চাইলেই সাধারণ হয়ে উঠতে পারে না। অন্য দশজন সাধারণ মেয়ে যা করে তাই করার ডাক এসে পৌঁছেছে তার কাছে অর্জুনের মধ্যে দিয়ে। এই ডাকটা শুনবার কাঙালপনা হয়ত তার মনের অভ্যন্তরেই ছিল। অর্জুন শুধু তাকে বার করে আনল। তারপর থেকেই অন্তরটা ব্যাকুল হয়ে উঠল তার। ভেতরটা হাউ হাউ করে কাঁদছিল নিরন্তর। সে কান্না কেউ চোখ দেখতে পায় না।

দর্পণের সামনে দাঁড়িয়ে জলভরা চোখে নিজের প্রতিবিম্বকেই উর্বশী প্রশ্ন করল : ইন্দ্রের উর্বশীও কাঁদে? চোখের জল মুছে ঠোঁট বেঁকিয়ে বলল : অহংকার, গর্ব যদি তোমার একটু কম থাকত তা-হলে জীবনটা কত অন্যরকম হতে পারত। চিরদিন খেয়ালে চললে। মন যা চাইল, কাজে তার উল্টোটা করলে। মনের দরজায় খিল এঁটে কী পেলে উর্বশী?

প্রতিবিম্বকে উত্তর দিল উর্বশী। বলল : ভুল সব মানুষের হয়। কিন্তু সব নারী উর্বশী হয় না। উর্বশী একজনই হয়।

দর্পণে উর্বশীর মুখের হাসি বক্র হয়ে উঠল। প্রতিবিম্ব যেন ভর্ৎসনা করে বলল : এখনও অহংকার গেল না তোমার। তুমি তো স্বয়ংসম্পূর্ণা। তা-হলে তোমার ভেতর এই অস্থিরতা কেন? প্রত্যেক মানুষের আসল সব বিরোধ তার নিজের সঙ্গে। কোন বিবাদই দীর্ঘকাল টেকে না। একটানা দীর্ঘ পথ চলার মতই ক্লান্তিকর এই ঝগড়া। বাইরের বারান্দায় বসে অনেকদিন নিজের সঙ্গে কোন্দল করে আর কোলাহল করে সময়টা কাটিয়ে দিলে। বাইরে বসে থাকলে ভিতরের ডাক শোনা যায় কখনও? অথচ, ভেতরে যে মানুষটা কেঁই কেঁই করে কাঁদছে তার ডাক বয়ে আনল অর্জুন। এজন্যে তার উপর রাগ না করে কৃতজ্ঞ থাকা উচিত তোমার।

উর্বশীর হৃদয় মথিত করে একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস পড়ল। দর্পণের সামনে থেকে সরে দাঁড়াল। চেতনার ভেতর থেকে অর্জুনের 'মাতা' ডাকটা হঠাৎ তার ভিতরে গম গম করে উঠল। সমস্ত স্নায়ুর ভেতর তার বিদ্যুৎ শিহরন বয়ে গেল। বুকের পাঁজরে অনুরণিত হল সেই ডাক।

নির্জন ঘরে ঐ ডাকটা তার বুকের ভেতরে কি সব জমে থাকা জিনিস হঠাৎ করে গলিয়ে দিল। ঐ ডাকটা শুনবার জন্যে যে অন্তরটা এত তৃষ্ণার্ত হয়েছিল জানা ছিল না। অর্জুন হঠাৎ বজ্রহস্তে বন্ধ মনের দরজার খিলটা ভেঙে দিয়ে মনের ঘরে ঢুকল। অপ্রত্যাশিত 'মাতা' ডাকটা চমকে দিল। তাকে মাতা বলে ডাকার যে এখনও কেউ আছে এসংসারে একথাটা ভুলেই গিয়েছিল। অর্জুনের আচমকা ঐ ডাকটা সহস্র হস্তে তাব বাসনার বুকে ছুরি মারল। আয়ু ও রজির কচি গলার ডাকেরই মত বড় এলোমেলো করে দিল তার ভেতরটা। অর্জুনের মুখে সে আয়ু ও রজির কচি মুখখানা দেখল। কতকাল তাদের দেখিনি। মনের ঘরে খিল এঁটে দিয়ে তাদের দূরে সরিয়ে রেখেছিল। সেই খিল আজ নেই। মনও বাধা মানছিল না। পাখি হয়ে সটান উড়ে যেতে ইচ্ছে করছিল আয়ু ও রজির দিকে। অপত্যস্নেহের ফল্গুধারা হয়ে হঠাৎ উৎসারিত ফোয়ারার মত ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে এল মায়া, মমতা, স্নেহ, ভালবাসা। বিস্ময়ের অন্ত নেই উর্বশীর! যতদিন মনের ঘরের দরজা রুদ্ধ ছিল একবারও বুঝতে পারেনি যে থাকাকে সে না থাকা বলেই জানত তাইই ছিল এক বড় থাকা। শীতের শৈত্যের প্রভাবে পাতা ঝরে পড়া গাছের ডাল পালার কঙ্কালের মধ্যেও যে প্রচণ্ডভাবে প্রাণ সুপ্ত থাকে বসন্তের আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই রিক্ত ডালপালায় কচি কচি পাতা বিপুল হর্ষে জেগে ওঠে। সবুজ কিশলয়ের সহস্র সহস্র সবুজ পাতায় ভরে উঠে প্রমাণ করে যে তারা প্রচণ্ডভাবে ছিল।

কিন্তু লুকিয়ে ছিল, ঘুমিয়ে ছিল। বসন্ত তাদের ফুরিয়ে যাওয়া জীবনকে নবীকৃত করে তুলল, তেমনি অর্জুন তাকে নতুন প্রাণ দিল।

মানুষের কোন কিছু নষ্ট হয় না। হারিয়ে যায় না—সব কিছুই থাকে। প্রচণ্ড ভাবে থাকে। তার নিজের মধ্যে সুপ্ত থাকে। উর্বশী কেবল এই সত্যটাই জানত না। এই উপলব্ধিটা যে তার নিজের জীবনের বেলাতেও প্রযোজ্য হবে তা জানা ছিল না। নিজের জন্যে পুরুরবার জন্য, আয়ু রজির জন্য গভীর বেদনা অনুভব করল। অর্জুনের মুখে মাতা ডাকটা তার চেতনার ভেতর মর্মরিত হতে লাগল গভীর ভাবে। আয়ু রুজির কচি গলায় মা ডাকের মতই তার ভেতরটা তছনছ করে দিল। তার আমিত্ব, ব্যক্তিত্ব, অহং, সব ভেঙে খান খান হয়ে গেল।

খোলা দ্বার দিয়ে হু-হু করে বাতাস ঢুকছিল ঘরে। স্নিগ্ধ শীতল বাতাসে তার দেহ-মনের জ্বালা জুড়িয়ে যেতে লাগল। কিন্তু বুকের ভেতর হায় হায় ভাবটা রয়ে গেল ঠিকই। তার সমস্ত চেতনা জুড়ে আয়ু আর রজি। ওরা এতদিন কত বড় হয়েছে। এখন কি তাকে চিনতে পারবে? মা বলে দৌড়ে এসে তার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়বে কি? যদি জিজ্ঞেস করে, এতদিন কোথায় ছিলে? কেন ছিলে? আমাদের ছেড়ে থাকতে তোমার কষ্ট হল না? তুমি কেমন মা? সেই এলে বড় দেরি করে এলে মা। এ সব প্রশ্নের কী জবাব দেবে?

কেমন একটা আচ্ছন্নতার ভেতর উর্বশী কল্পনায় দেখতে লাগল, আয়ু ও রজি দু'হাত বাড়িয়ে হাওয়ায় ভেসে আসছে তার দিকে। পুরুরবাও আছে তাদের সঙ্গে পুরুরবাই তাকে চিনিয়ে দিল। বলল : এই হল তোমাদের মা। এমন মা সকলের হয় না। দেশের জন্যে মানুষের জন্যে আমাদের সকলের মঙ্গলের জন্যে তোদের মা যা করল আমরা কেউ তা করলাম না। তোদের মাই তোদের সব। তাকে কখনও অবহেলা করবি না। দুঃখ দিবি না। তাকে আমাদের সকলের শ্রদ্ধা করা উচিত।

আয়ু-রজি অবাক হয়ে তাকে দেখছে। কিন্তু তাদের জায়গা থেকে এক পা এগিয়ে এল না। আয়ু-রজি বালক নেই। তারা যুবক। উর্বশীও আড়ষ্ট ভাবটা কাটিয়ে বাবা, বাছা বলে তাদের দিকে ছুটে যেতে পারল না। আবার বুকে টেনে নিয়ে আদরও করতে পারল না। কেমন একটা আড়ষ্টতায় শক্ত হয়ে রইল। মাতা ও পুত্রের মাঝখানের ফাঁকটুকু দেখাশোনার অভাবে শুধু বেড়ে গেছে। সেটুকু পেরিয়ে কেউ কারো কাছে যেতে পারছে না। বুকের গভীর থেকে এরকম একটা স্বপ্ন-কল্পনা উর্বশীর মনটাকে শুধু শুধু খারাপ করে দিল। নিজের অজানিতে দুচোখের পাতা ভিজে গেল।

কার্যত, কী ঘটবে ভবিষ্যৎ জানে। তবে আয়ু-রজি কেউ একজন 'মা' বলে ডাকলে তার বুকের মধ্যে জমাট বরফ গলে জল হয়ে যাবে। কিন্তু মাতা ও পুত্রের পারাপারের যে সেতুটি ছিল স্নেহ ও বাৎসল্যের, দীর্ঘকাল অব্যবহারের ফলে তা বিপজ্জনক হয়ে ছিল। অথচ ঐ একটি মাত্র সাঁকো পার হয়ে পৌঁছতে হবে তার নিজের কূল থেকে আয়ু ও রজির কূলের দিকে। বাধা যেটুকু আছে সে তার মনের। অর্জুন বলে মনের পাপই পাপ। সন্তানের কাছে মায়ের কোন লজ্জা সংকোচ থাকার কথা নয়।

এসব নানা কথা চিন্তা করে মন উত্তাল হল উর্বশীর। মনের ভেতর বড় ছটফটানি বোধ করে আজকাল। পুত্রদের উপর অভিমান করে নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিল। বড় বেশি দূরে। এখন তাদের মধ্যের সেতুটি বিপজ্জনকভাবে ভেঙে গেছে। তাদের কাছে যাবেটা কী করে? জীবনের এরকম কোন গভীর প্রশ্নচিহ্নের কাছে উর্বশী কখনো থমকে যায়নি। নিজের আনন্দের খোঁজে সে বেরিয়ে পড়েছে বার বার। কারো সাহায্য পরামর্শ ছাড়াই সে ভেসে গেছে নিজের গন্তব্যের দিকে, নিজের প্রকৃত সুখের দিকে। হা-হুতাশ করে মরার চেয়ে সময় থাকতেই নোঙর ছেঁড়াকে সে ভাল বলে মনে করে এসেছে। চিরদিন মন যা চেয়েছে তাই করেছে, আজ তার উল্টোটা করবে কেন?

উর্বশী উঠে দাঁড়াল। তার বুকে রাগ অভিমান অহংকার কিছু ছিল না। সমস্ত প্রাণ জুড়ে বেজে যাচ্ছিল মিলনের রাগিণী।

সারথীকে ঐ কাকভোরে রথ প্রস্তুত করতে বলল উর্বশী।

খুব দ্রুত প্রসাধন সেরে রথে উঠল। রথ ছুটল প্রতিষ্ঠানপুরের দিকে। কিছুটা যাওয়ার পর এক

বিস্মিত জিজ্ঞাসার ঝিলিক দিল তার মনে। কেন যাচ্ছে? কোন মুখে দাঁড়াবে তাদের সামনে? অপ্রস্তুত বিস্ময়ে থমকে গিয়েছিল কয়েক মুহূর্তের জন্য। একটা অদ্ভুত কষ্টে আর ব্যথায় তার বুক টনটন করতে লাগল। শরীরও কাঁপল। বিষাদে দুই চোখ বুজল। চোখ বুজতে দেখতে পেল মাতৃস্নেহ হতে বঞ্চিত আয়ু ও রজির ব্যথিত ও বিমর্ষ মুখ। অমনি চেতনার মধ্যে বিস্ফোরণ ঘটে গেল মাতৃস্নেহের। নিজের মনে বলল : মায়ের দাবি আর অধিকার নিয়ে যাব তাদের কাছে। সন্তানের কাছে জননীর কোন লজ্জা থাকে না। কোন জননী ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে দাঁড়ালে কোন পুত্রই ফেরাতে পারে না তাকে। কেন ফেরাবে? জননী এসেছে ছেলের কাছে। তারই ছেলে। বড় আদরের ধন। বিধাতার আশীর্বাদ। মাতৃহারা পুত্রেরাও মা পাবে চিরদিন। এ কি কম কথা।

পুবের আকাশ লাল হয়ে উঠল।

মুনি-ঋষিদের উদাত্ত কণ্ঠের সূর্যবন্দনার সুরেলা গীতি ভেসে আসছে। আর আকাশে-বাতাসে ছড়িয়ে পড়ছে খুশির মূর্ছনা।

দেবভূমিকে পিছনে ফেলে উর্বশীর রথ এগিয়ে চলল সমতলভূমির দিকে। কুয়াশাচ্ছন্ন রাজ্য থেকে আলোকিত সূর্যের দিকে।

রাত জাগা উর্বশীর মুখে ভোরের নরম রোদ এসে পড়ল। আর তাতেই তাকে প্রাণ প্রতিষ্ঠিত প্রতিমার মত দুর্জয় আর অপরূপ দেখাল।

দুপাশের বন সূর্যের আলো মাথায় করে রথ ছুটে যাচ্ছিল বনপথ দিয়ে। গাছেরা হাতছানি দিচ্ছিল। বনের গন্ধ, বনফুলের সুগন্ধ ছাপিয়ে উর্বশীর নাকে আয়ু ও রজির গায়ের গন্ধ লেগে রইল। নিজের সন্তানের গায়ের গন্ধের মত মিষ্টি গন্ধ পৃথিবীর কোন সুগন্ধ পুষ্পেরও হয় না। শুধু মায়েরাই সে গন্ধর কথা জানে।

গান্ধারী, কুরুক্ষেত্রের গান্ধারী

অধ্যাপক ডঃ সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায়

ও

শ্রীজীবিতেশ চক্রবর্তী

শ্রদ্ধাস্পদেষু

দৃষ্টিকোণ

গান্ধারী মহাভারতে প্রধান চরিত্র নয়। তার অনুপস্থিতিতে মহাকাব্যের কোন ক্ষতি হত না। আবার মহাকাব্যে স্থান নির্দেশ করে তার চরিত্রের কোন গুরুত্ব বাড়েনি। কেবল মহাকবির পরিকল্পিত কয়েকটি উদ্দেশ্য তাকে দিয়ে সম্পন্ন করা হয়েছে। অর্থাৎ, মহাকবির হাতের পুতুল। তার হাসি, কান্না, মান-অভিমান সব কৃত্রিম। মহাকবি মেপে দিয়েছেন। মাপের ভেতর তার চলাফেরা। গান্ধারী চরিত্রকে এই কৃত্রিমতার মোড়কে মুড়ে দেয়া হয়েছে। ধর্ম, সত্য, আদর্শের রঙীন ক্যাপসুলটি রোগ প্রতিষেধক বটিকার মতই আমাদের কাছে লোভনীয়। কখনও ক্যাপসুলের আবরণ খুলে দেখি না তার ভেতর কি আছে? "স্ত্রী পর্বে" কুরুক্ষেত্রের মহাশ্মশানে দাঁড়িয়ে গান্ধারী প্রথম পুতুলের সাজ খুলে দাঁড়াল। রক্ত-মাংসের মানুষের হৃৎস্পন্দনের ধুক্‌পুক্‌, ধুক্‌পুক্‌ শব্দ প্রথম শুনলাম তার বুকে। মানবী গান্ধারীর সঙ্গে দেখা হল কুরুক্ষেত্রে। সেখানে সে তার কর্মের ফলভোগ করছে। ইংরেজীতে যাকে বলে, suffering character গান্ধারী হল তাই। গান্ধারী চরিত্রের এই দুই সত্তার স্বরূপ অন্বেষণ করতে গ্রন্থের নাম রেখেছি **"গান্ধারী, কুরুক্ষেত্রের গান্ধারী"**।

আলোচ্য উপন্যাসে আমার বিচার-বিশ্লেষণ এবং অনেক সিদ্ধান্ত নবীকৃত হয়েছে। পরিবর্তনও হয়েছে। মানুষের চিন্তা ত থেমে থাকে না। বয়সের সাথে, পরিণত বোধের সঙ্গে ধ্যান-ধারণার রূপ পাল্টায়। সেটা কোন অন্যায় নয়। একবার একটা সিদ্ধান্ত করেছি বলে সেটা অপরিবর্তিত থাকবে তার কোন মানে নেই। মনের এই প্রবাহমানতা শিল্পী মনের অত্যজ্য ধর্ম। ব্যবসায়িক মনোবৃত্তি নিয়ে কিছু করিনি। পাঠক-পাঠিকার কাছে এই অকপট কৈফিয়ৎ দেবার জন্যেই গৌরচন্দ্রিকা করলাম। এর পরেও যদি কারো অবিচার পাই তাহলে আমার অপরাধের গ্লানি কোনদিন মুছবে না।

শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করি, এই গ্রন্থ পরিকল্পনার নেপথ্যে আছেন একজন অপরিচিতা জননী স্বরূপা গুণমুগ্ধা পাঠিকা শ্রীমতী রেণুকা গুহর একটি পত্র। ১৯৮২ সালে তিনিই আমাকে গান্ধারী সম্পর্কে একটি পৃথক গ্রন্থ রচনার ফরমাস করলেন। পাঁচ বছর পর মহাভারতের 'স্ত্রী পর্ব' পড়তে পড়তে হঠাৎ সেই ধারণাটা মাথায় এল। আগের ধ্যান-ধারণা বিশ্বাসগুলো বদলে যেতে লাগল। এক নতুন সত্য মনের মধ্যে দীপ জ্বেলে দিল। মনে হল, এতদিন যা লিখেছি তা নিরপেক্ষ হয়নি। এখনও অনেক সত্য ও তথ্য অনুদ্ঘাটিত রয়ে গেছে। অন্ধকার থেকে তাদেরও আলোয় আনা দরকার। কিন্তু পাঠক-পাঠিকার কথা ভেবে বিব্রতবোধ করছিলাম। কারণ, মহাভারতকে নিয়ে অনেক বই লিখলাম। প্রত্যেকটি বই স্বতন্ত্র। এবং পাঠকের প্রশংসাধন্য। তবু কুণ্ঠা কাটছিল না। কেবলই একটা যন্ত্রণা ভোগ করছিলাম। অবশেষে আলোচ্য গ্রন্থে সেই যন্ত্রণার মুক্তি ঘটল।

এতদিন শুধু ঋষি দ্বৈপায়নের চোখ দিয়ে পান্ডবদের দেখেছি। এবার বোধ হয় সেই দোষ এড়ানো গেলে। মহাভারতের কাহিনী'ত পান্ডবদের বিজয় কাব্য। পান্ডবদের খুশি করেই লেখা। পান্ডবেরা তাই নিরপরাধ। তাদের কোন দোষ, দোষ নয়। তারা ধার্মিক। নির্লোভী। সত্য ও ধর্মের জন্যে তারা আজীবন লড়েছে। কিন্তু এসব কত মিথ্যে চক্রান্ত আর সাজানো ঘটনা "স্ত্রী পর্ব" পড়লে জানা যায়।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ যদি ধর্মযুদ্ধ হয়ে থাকে তাহলে ধর্মপ্রাণ গান্ধারীর চোখে ক্রোধের আগুন কেন? কৃষ্ণকে কেন অভিশাপ দিল? যুধিষ্ঠিরকে তিরস্কার করল কেন? দুরাত্মা পাপী বলে যে দুর্যোধন দুঃশাসন তার কোন মার্জনা পেল না জীবনভোর, ধর্মের জন্যে যার হৃদয় পাষানের মত কঠিন, কুরুক্ষেত্রের মহাশ্মশানে তার চোখে এ কোন্ অশ্রুর বন্যা নামল? রণক্ষেত্রে নিহত শবের মধ্যে গান্ধারী কাকে খুঁজছিল? যাকে কোনদিন আদর করল না, স্নেহ দিল না, প্রাণভরে যাকে শুধু ঘৃণা করল তার জন্যে এত অনুতপ্তা কেন সে? নিজের কাছেই প্রশ্ন তার; অনেক ভুলের পাহাড় চূড়ায় বিস্ফোরণ ঘটে গেল এক মহাযুদ্ধের। এই মহাযুদ্ধের জন্যে নিজেকেও দোষী এবং দায়ী মনে হল। কারণ এই অবিশ্বাসের যুগে সে মানুষকে বিশ্বাস করেছিল। মিলে মিশে থাকতে চেয়েছিল। পান্ডবদের জয় চেয়েছিল। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে জানল মানুষকে বিশ্বাস করে সে ঠকেছে, শুভ কামনা করে পাপ করেছে, ধর্মের জয় চেয়ে নিজের সর্বনাশ করেছে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ তার সেই পাপের, ভুলের প্রায়শ্চিত্ত। গান্ধারীর দৃষ্টিকোণ থেকেই সেই ভ্রম অন্বেষণ করেছি। আর তাতেই গোটা মূল্য-বোধটা পাল্টে গেল।

আমার গ্রন্থে গান্ধারী তনয় সুযোধন দূরাত্মা নয়। তার কাজের ভেতর সত্যি কোন দুষ্ট অভিসন্ধি ছিল কিনা পাঠক-পাঠিকাই বিচার করবেন। তবে, ধর্মের জন্যে তাকে অনেক মূল্য দিতে হয়েছে। অধর্ম যুদ্ধের সূচনা করেছে পান্ডবেরা প্রথম। জীবনযুদ্ধে পান্ডবদের জিতিয়ে দেয়ার জন্যে মহাকবি অনেক মিথ্যে সৃষ্টি করেছেন। তার দাম দিতে হয়েছে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ কখনও ধর্মযুদ্ধ নয়। অধর্মের যুদ্ধ। অধর্মকরেই পান্ডবেরা জয়ী হয়েছে। তাইত, পান্ডব প্রধান ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির পঞ্চ ভ্রাতাসহ নরকদর্শন করল আর দুর্যোধন সশরীরে স্বর্গলাভ করল। দুর্যোধন যে ধর্মযুদ্ধ করেছিল এটাই হল তার বড় প্রমাণ। আর তার স্বর্গপ্রাপ্তির ঘটনা হল মরণোত্তর পুরস্কার।

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

ড. দীপক চন্দ্র

এক

ফাল্গুন মাস। বাতাস বইছে পূর্ব-দক্ষিণ থেকে। সোয়াত ও বুনের পাহাড়ে ঢালে ঘন অরণ্যের মত নিবিড় গাছপালা। শাল্মলী, তমাল, খেজুর, হরতুকি, বহেরা, আমলকির বনানী সবুজ রঙে ছেয়ে আছে। সবুজের ফাঁকে ফাঁকে পলাশের আগুন রঙ। গাছের পাতায় বসন্তের পাগল করা উচ্ছ্বাস। ডালে ডালে পাতা ঝাপ্টানোর শব্দ। ঝির ঝির করে বাজে। ঘূর্ণি হাওয়ায় ঝরা পাতা পাক খেতে খেতে ছড়িয়ে পড়ে কান্দাহারের ধূলি-ধূসরিত রুক্ষ প্রান্তরে।

প্রাসাদ তোরণে দাঁড়িয়ে গান্ধার রাজকুমারী গান্ধারী। নিবিষ্ট হয়ে প্রকৃতি দেখছিল। বিকেলের পড়ন্ত সূর্য ক্রমে গাঢ় রক্তের লাল হল। দক্ষিণে উঁচু বনের ফাঁক দিয়ে দৈত্যের মত হন্ হন্ করে নেমে এল গরু, মহিষ, ভেড়া, উটের পাল। যেতে যেতে জলার ধারে একটু দাঁড়িয়ে জলে মুখ ডুবিয়ে চোঁ-চোঁ করে দ্রুত জল পান করে নিল। দু'তিনজন রাখাল পাঁচন হাতে তাদের দিকে তেড়ে গেল। তাড়া খেয়ে অনিচ্ছায় জল থেকে মুখ তুলে সারা অঙ্গে ঢেউ তুলে দৌড়াতে লাগল। ধুলো উড়িয়ে খুব উল্লাসে ঘর পানে ছুটল। বুনো পাখির ঝাঁক ওদের সাথে মজা করতে গাছের ডালে হই-হই বাধিয়ে দিল। তাতেই গরু, মোষ ভেড়া, উটের দল হতচকিত হয়ে উর্ধ্বশ্বাসে দৌড় দিল। তাদের পিছু পিছু রাখালরাও ছুটল। গান্ধারী খুব মজা পেল। নিজের মনেই খুক্ খুক করে হাসল।

বিকেলের আলো গড়িয়ে আসছে। পাহাড়ী ঝরোর আঁকা-বাঁকা স্রোতে গা ডুবিয়ে একদল রমণী সান্ধ্য স্নান করছে। বৌ-ঝিয়েদের খালি গা। আয়নার মত স্বচ্ছ জলে তাদের শরীর দেখা যাচ্ছে। অল্পবয়সী মেয়ের দল এ-ওর শরীর নিয়ে নিজেদের মধ্যে মশকরা করছে। বড়রা তাদের হাসি-ঠাট্টায় যোগ দিচ্ছে। নানারকম মজার কথা বলছে। প্রাসাদ তোরণ থেকে গান্ধারী তাদের কথাবার্তা কিচ্ছু শুনতে পাচ্ছিল না। কিন্তু অঙ্গ-ভঙ্গি দেখে আলোচনাটা কিছু অনুমান করতে পারছিল।

বিকেলের পড়ন্ত রোঁদের আলোর তীব্রতা নেই। ঔজ্জ্বল্যও গেছে নিভে। কেমন একটা অলস ক্লান্তির ভাব মিশে আছে বিকেলের অলস আলোয়। তবু ব্যস্ততা আছে। দৌড়-ঝাঁপ নেই, কিন্তু ঘরে ফেরার তাড়া আছে সকলের। গরু-মহিষের গলায় ঘণ্টা বাজছে, পাখিরা মুখর গাছের ঝোপে ঝাড়ে। মেয়েরা স্নান শেষ করে কলসী কাঁখে নিয়ে কলহাস্যে পথ মুখর করে ঘরে ফিরছে।

গান্ধারী বিকেলের নিজস্ব ঘরাকন্নার রূপ দেখে তন্ময় হয়ে গেছে। কখনো বড় চোখ জোড়ায় অবাক অন্যমনস্কতা। গভীর দৃষ্টি ডুবে আছে যেন কোন গহন অতলে। মুখেতে ভাল লাগার প্রশান্তি। কোমল মেয়েলি মুখে গোধূলির স্নিগ্ধ দীপ্তি।

দক্ষিণ থেকে আসা বাতাস এখনও ঠাণ্ডা। গা জুড়িয়ে যায় তার ছোঁয়ায়। মনের ভেতর সুর গুন-গুনিয়ে ওঠে। গান্ধারী নিজের মনেই গান ধরল। ভাল লাগার গান। ভালবাসার গন। গাইতে গাইতে নিজের কক্ষে ঢুকল।

ঘরে দীপ জ্বলছিল। রেশমের পর্দা সরিয়ে ঘরে ঢুকল গান্ধারী। অসময়ে শকুনিকে তার গৃহে দেখে ভীষণ বিস্ময় বোধ করল। দরজার দিকে পিছন করে শকুনি পালঙ্কের বাজুতে মাথা রেখে মেঝের দিকে চেয়ে চুপ করে তার প্রতীক্ষায় বসে আছে। প্রদীপের আলো পড়েছিল তার রঙিন ঝলমলে রক্তবর্ণের পরিচ্ছদে। আর তাতেই অপরূপ দেখাচ্ছিল তাকে। কিন্তু গান্ধারীর ভেতরটা একটু তরঙ্গ বয়ে গেল। অমঙ্গল আশংকায় বুকটা ধড়াস করে উঠল। শকুনিকে এরকম বিমর্ষচিত্তে তার ঘরে বসে প্রতীক্ষা করতে আগে দেখেনি কখনও। তা-ছাড়া শকুনি তার গৃহে আসেও কম। তবে কি জরুরি কোন দরকার তার? ভাবতে গিয়ে একটু দিশাহারা বোধ করল।

শকুনি চিন্তিত এবং বিমর্ষ। নিজের চিন্তায় সে এতই অন্যমনস্ক এবং উদাসীন যে কক্ষে তার

আগমন পর্যন্ত টের পেল না। গান্ধারী পা টিপে টিপে শকুনির খুব কাছে এসে দাঁড়াল। পিঠে হাত দিয়ে ডাকল: দাদা! তোমার কী হয়েছে?

গান্ধারীর হাতের স্পর্শে সারা শরীরটা চমকালো। চোখে একটা চকিত কষ্টের ছায়া নামল। চমকানো গলায় উচ্চারণ করল : গান্ধারী!

গান্ধারীর ভেতরটা কেঁপে গেল। বিব্রত বিস্ময়ে হাসার চেষ্টা করল। বলল : তুমি থামলে কেন? কিসের সংকোচ?

শকুনি সেই মুহূর্তে কোন কথা বলতে পারল না। বড় বড় চোখ করে গান্ধারীর দিকে চেয়ে রইল। তারপর কী মনে করে গান্ধারীর কপাল থেকে সস্নেহে চুলগুলো সরিয়ে দিল। একটু হাসার চেষ্টা করল। যা হাসি ছিল না। বুক থেকে উঠে আসা একটা কষ্টের সঙ্গে বলল : কেমন করে বলি বোন? পারছি কৈ? সব কথা বোধ হয় সবক্ষেত্রে বলা যায় না। বলতে নেই। বলা উচিতও নয়। কিন্তু আমরা যে কত অসহায়, সেকথা কেমন করে বোঝাই তোকে? গান্ধারীর বুকের ভেতরটা অজানিত একটা ভয়ে কেঁপে উঠল। আটকে যাওয়া স্বরকে মুক্ত করে বলল : তোমার কথা শুনে আমার বড় ভয় করছে।

শকুনি মাথা নাড়ল। দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে বলল : ভয় পাওয়ার কথা।

গান্ধারী আচমকা ভয় মিশ্রিত উৎকণ্ঠায় উচ্চারণ করল : দাদা !

শকুনির ভুরু কুঁচকে গেল। উদ্গাত নিঃশ্বাস বুকের কাছে আটকে গেল। একটা তীব্র ব্যথায় টনটন করছিল তার বুকের ভেতরটা। গান্ধারীর উদ্বেগ লাঘব করতে সমবেদনায় মাথা নাড়াতে লাগল। সমস্ত ব্যাপারটার আকস্মিকতা তাকে বিষণ্ণ গম্ভীর আর কেমন সংকুচিত করল। সে কোন জবাব দিতে পারল না কিছুক্ষণ। গান্ধারীকে শুধু আদরে বুকে টেনে নিল। অনুতাপিত গলায় বলল : মানুষ বড় স্বার্থপর আর সুযোগসন্ধানী। মানুষে-পশুতে কোন তফাত নেই।

গান্ধারীর বুকের ভেতরটা কেমন করে উঠল। শকুনির কথাগুলো সে ভাল করে বুঝতে পারল না। ফ্যাল ফ্যাল করে তার দিকে উদ্বিগ্ন অসহায়তা নিয়ে চেয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত। ধীরে ধীরে দীর্ঘশ্বাস পড়ল। বুকাজোড়া ভয়, উৎকণ্ঠা নিয়ে ব্যাকুল কণ্ঠে প্রশ্ন করল : দাদা তুমি চুপ করে থাকলে'ত আমার প্রশ্নের উত্তর পাব না। তুমি কথা বল। আমাকে সংশয়ে রেখ না। মানুষ ভাগ্যের অধীন। যার ভাগ্যে যা আছে তা ঘটবেই। বিধিলিপি খণ্ডাবে কে? জীবন রঙ্গমঞ্চে মানুষের ভূমিকা খুবই যৎসামান্য।

শকুনির দুচোখে অবাক বিস্ময়। চিরচেনা গান্ধারীর রূপটাই যেন অকস্মাৎ তার কাছে বদলে গেল। তাকে ভীষণ নতুন আর অদ্ভুত লাগল। আস্তে আস্তে বলল : সত্যি মানুষের সাধ্য কি ভাগ্যকে নিয়ন্ত্রণ করে? ভাগ্য মানুষের জীবনে এক অমোঘ শক্তি। কিন্তু সেই অমোঘ শক্তি কি এত নিষ্ঠুর, নির্দয় হয়? আগে ভাগ্য বলে কিছু বিশ্বাস করতাম না। কিন্তু আজ মনে হচ্ছে ভাগ্য এক অদৃশ্য ভয়ংকর শক্তি। তার সঙ্গে যুদ্ধ চলে না। ভাগ্যকে নীরবে শুধু মেনে নিতে হয়। কোন সংকেত না দিয়ে আচমকা ঝাঁপিয়ে পড়ে সে।

গান্ধারী দুচোখ মেলে ভাবলেশহীন দৃষ্টিতে শকুনির দিকে চেয়ে রইল। তার চাহনিতে কোন প্রশ্ন ছিল না। বুকের ভেতর উদ্বিগ্ন উৎকণ্ঠার তরঙ্গ বয়ে গেল। শকুনির হেঁয়ালি ভাল লাগল না। গান্ধারী কষ্টে মাথা নাড়ল। বলল : তুমি কোনো কথাই সহজ করে বলতে পার না। সব কথাই এমন জটিল করে তোল যে কথা বলার আনন্দ ও আগ্রহ দুই নষ্ট হয়ে যায়।

ভগিনীর অভিযোগে শকুনি একটু হাসার চেষ্টা করল। বলল : এখন হেঁয়ালি করার সময় নয় বোন। মনে সে অবস্থাও নেই। আমরা খুব সংকটের মধ্যে আছি। বাস্তব জীবনে মাঝে মাঝে এমন সব ঘটনা ঘটে যে মুখ বুঝে মেনে নিতে হয়! কিন্তু সেটা মেনে নেয়ার ভেতর যে কত অপমান আর আত্মগ্লানি থাকে এমন করে আগে অনুভব করিনি।

গান্ধারীর ভিতরটা শক্ত ও কঠিন হল। এক আশ্চর্য দৃঢ়তায় তাকে আরো সুন্দর দেখাল। বলল : আমি এমন কোন মন্দ কপাল করে আসিনি যে তার জন্যে কোন শংকা থাকতে পারে। তবে,

রাজকন্যা বলেই দুর্ভাবনা। কারণ, রাজনীতির ঘোলা আবর্তে তোমরা ঘরের মেয়েকে টেনে আনতে কুণ্ঠা কর না। তাদের নিয়ে তোমার রাজনীতির জুয়া খেল। মেয়ে মানুষের ভাগ্যটা বিধাতা মন্দ করে গড়েছে। মানুষের সভ্যসমাজে মেয়েদের কোন সম্মান নেই। তাদের কোন ইচ্ছে থাকতে নেই। তোমাদের জুলুম, অপমানকে তাদের শুধু বরণ করে নিতে হয়। এ তো মেয়েমানুষের ভাগ্যলিপি। এর জন্যে তোমার সংকোচের কী আছে? এ তো পুরনো খেলা।

গান্ধারীর কথাগুলো শকুনির মনটাকে যেন চিরে চিরে দিয়ে গেল। কোন-দিন এরকম একটা জটিল প্রশ্নচিহ্নের সামনে দাঁড়িয়ে বিচার করতে হয়নি তার কর্তব্যকে। সহসা তাই কোন কথা বলতে পারল না। অপরাধীর মত মাথা হেঁট করে রইল। গান্ধারী তাকে নীরব দেখে বলল : দাদা, রাগ কর না। কি বলতে, কি বলে ফেললাম, কেন যে বললাম নিজেও জানি না। আমি তোমার মনের কথা জানি। তবু আমরা ছায়ায় সঙ্গে লড়াই করতে ভালবাসি। ছায়াটা যে নিজের সেটা ভুলে যাই। জ্ঞান ফিরলে যখন বুঝতে পারি সেটা ছায়া, তখন বড় লজ্জা হয়। কোন জায়গায় দাঁড়াবো, প্রশ্নটা বড় হয়ে ওঠে। আমি তোমার সমস্যাটা বুঝতে পেরেছি। তোমার ভারাক্রান্ত মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে কষ্ট হয়। আমার জন্যে তুমি শুধু শুধু কষ্ট পাচ্ছ।

শকুনির দু'চোখ সহসা আর্দ্র হল। কেমন একটা শিথিল অসাড়তার ভেতর ডুবে গেল সে। দীর্ঘশ্বাস পড়ল। বিষণ্ণ গলায় বলল : সবই নিয়তি।

ওসব কথা ভাল লাগছে না আর। তোমার দেশভ্রমণের গল্প শুনতেই আমার ঔৎসুক্য বেশি। তুমি হস্তিনাপুরের কথা বল।

গান্ধারীর প্রশ্নে শকুনির বুকের ভেতরটা থর থর করে উঠল। চোখের পাতা দুটো বিস্ময়ে কেমন স্বপ্নালু হল। কিন্তু তার শরীরটা অস্বস্তিতে আর সংকোচে শক্ত হয়ে রইল। মসৃণ কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমল। কথা বলতে গিয়ে ঠোঁট দুটো একটু কাঁপলও। নরম গলায় বলল : হস্তিনাপুরে আদরযত্ন, আপ্যায়নে কোন ত্রুটি ছিল না। রাজকীয় সমারোহ মনে রাখার মত। বলতে কি রাজকীয় ঐশ্বর্য, সম্পদে, সমৃদ্ধিতে, গৌরবে হস্তিনাপুরের কোন তুলনা হয় না। ভারতবর্ষের সকল শীর্ষস্থানীয় রাজ্যগুলির মধ্যে অন্যতম। তুমি তো ভাল করে জান, ভারতবর্ষের রাজ্য ও রাজন্যবর্গ নিয়ে যে শক্তি জোট হয়েছে বর্তমানে তার নেতৃত্বে আছে হস্তিনাপুরের ধৃতরাষ্ট্র। নেতা হিসাবে ধৃতরাষ্ট্রের কোন তুলনা হয় না। সুদর্শন, স্বাস্থ্যবান, সহৃদয়, বন্ধুবৎসল, অতিথিপরায়ণ এক মহান মানুষ। তথাপি, আশ্চর্য লাগে জন্মান্ধ এক ব্যাক্তির ওপর ছোট বড় রাজন্যবর্গের এত আস্থা কেন? কি আছে তার? নিশ্চয়ই এমন কোন শ্রেষ্ঠত্ব, মহত্ত্ব, ব্যাক্তিত্ব ধৃতরাষ্ট্রের আছে, যার চুম্বক আকর্ষণ থেকে কেউ মুক্ত নয়। ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গ ভাল লাগে। প্রশাসনেও তার দক্ষতা, নিপুণতার কোন তুলনা হয় না। সকলেই তার প্রতি সমান বিশ্বস্ত এবং অনুগত। কেবল যাদব সমবায় রাজ্যগুলি হস্তিনাপুরের প্রবল প্রতিপক্ষ। যাই হোক, ধৃতরাষ্ট্রের ব্যক্তিত্বের ভেতর নিশ্চয়ই কোথাও একটা বড় দিক আছে, যাকে অবহেলা কিংবা উপেক্ষা করা যায় না। এতগুলি রাজ্য ও রাজন্যবর্গ যে তার নেতৃত্বের ছত্রচ্ছায়ায় জোটবদ্ধ আছে, এটা কম কথা নয়। ধৃতরাষ্ট্রকে যত দেখি, আর তার কথা শুনি ততই আশ্চর্য লাগে। এমন সুন্দর স্বাস্থ্যবান, রূপবান, মহান মানুষটির প্রতি বিধাতা এত নিষ্ঠুর হল কেন? দৃষ্টিহীনতাই ধৃতরাষ্ট্রের একমাত্র ত্রুটি। শুধু সেই কারণেই সিংহাসনের উত্তরাধিকারি থেকে বঞ্চিত সে। এই বঞ্চনা হস্তিনাপুরের রাজপরিবারে এক ঠাণ্ডা গৃহযুদ্ধ সূচনা করেছে ভাইতে ভাইতে।

শকুনি এই পর্যন্ত বলে একটু থামল। আর গান্ধারী অনন্ত বিস্ময় নিয়ে শকুনির মুখের দিকে চেয়ে রইল। শকুনির কথা বলার ধরনটি ছিল অদ্ভুত। বেশ একটা উদ্দেশ্য নিয়ে সে যে, খুব সতর্কভাবে এগোচ্ছিল তাতে গান্ধারীর বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। মনের ভেতর শকুনির কথাগুলো প্রতিমুহূর্ত যাচাই করতে লাগল। শকুনি কিছু একটা বলতে চাইছিল। রাজনৈতিক জোটের কথা তুলল কেন? কোন একটি শক্তি জোটের বাইরে থেকে আলাদা অস্তিত্ব রক্ষা করা ছোট রাজ্যগুলির এক সমস্যা হয়ে উঠেছে। প্রতিবেশী অমরাবতী রাজা ইন্দ্রের সর্বগ্রাসী ভয়ংকর লোভ থেকে গান্ধার নিজের অস্তিত্ব বাঁচাতে হস্তিনাপুরের বন্ধুত্ব এবং নিঃশর্ত সহযোগিতার প্রার্থনা নিয়ে কুরুকুলপ্রধান

গাঙ্গেয়র কাছে গিয়েছিল। কিন্তু শকুনি সে প্রসঙ্গ এড়িয়ে গেল। অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের প্রশংসা ও প্রশস্তি করে তার ভাবমূর্তিকে তার কাছে উজ্জ্বল করে তুলতে চাইল কোন স্বার্থে? শকুনির আবেগপ্রবণতায় গান্ধারী শংকিত হল। ভয়ে তার শ্বাস রুদ্ধ হল। কারণ শকুনির মনের অভিপ্রায় বুঝতে তার কষ্ট হল না। এক বুক উৎকণ্ঠা নিয়ে সে চুপ করে রইল। আর, এ অপ্রিয় সত্যকে বরণ করার জন্যে মনকে নিঃশব্দে প্রস্তুত করতে লাগল।

শকুনি বিপন্ন মুখে অপ্রস্তুত হাসি নিয়ে তাকিয়ে ছিল গান্ধারীর দিকে। অনেকক্ষণ পর স্তব্ধতার গহ্বর থেকে যেন উঠে এল শকুনি। ধীরে, কিন্তু দৃঢ়-স্বরে বলল : আমাদের শান্ত স্রোতহীন জীবনে রাজনীতির যে ধাক্কা লাগল তাতে সুখ, শান্তি সব নষ্ট হতে বসেছে। এখন আর ফেরার পথ নেই। ইচ্ছে, অনিচ্ছাও মূল্যহীন হয়ে গেছে। হস্তিনাপুরের গাঙ্গেয়র কাছে সাহায্য চাইতে গিয়ে পেলাম এক প্রার্থনা। তার খুব ইচ্ছে গান্ধারের সঙ্গে হস্তিনাপুরের একটি পারিবারিক সম্পর্ক গড়ে ওঠুক।

গান্ধারী কথার মধ্যে আচমকা প্রশ্ন করল : তুমি কী বললে?

শকুনি ভ্যাবাচাকা ভাবটাকে চট করে লুকিয়ে বলল : ভদ্রতা রক্ষা করতে বলতে হল, এ তো উত্তম কথা। কিন্তু পাত্রটা কে? গাঙ্গেয় দ্বিধাহীন গলায় বলল : জন্মান্ধ ধৃতরাষ্ট্র। অকস্মাৎ বাজ পড়ল মাথায়।

সেই মুহূর্তে একটা তীব্র অজানা অনুভূতি তীরের মত বিঁধল গান্ধারীর বুকে, আর একটা অস্ফুট আর্তনাদ বেরোল তার কণ্ঠ থেকে।

শকুনি গান্ধারীর খুব কাছে সরে এল। তার হাতটা নিজের হাতে নিয়ে দেখতে লাগল চুরি, বালা, অলংকার, আংটি। তারপর দু'চোখ মেলে ভাবেলশহীন দৃষ্টিতে মুখের দিকে চেয়ে রইল। শকুনির দৃষ্টিতে কোন প্রশ্ন ছিল না। যন্ত্রবৎ গান্ধারীকে বলল : এক অদ্ভুত রাজনৈতিক পাঁচে ফেলেছে গাঙ্গেয়। আত্মীয়তা প্রস্তাবে যদি গান্ধাররাজের সম্মতি না থাকে তাহলে গাঙ্গেয় তার প্রস্তাবের সম্মান রক্ষা করতে গান্ধার আক্রমণ করবে। ভুজবলে গান্ধারীকে জয় করে হস্তিনাপুরে আনবে। ধৃতরাষ্ট্র এবং পাণ্ডব জননীদের যেমন কাশীর স্বয়ম্বর সভা থেকে তুলে এনেছিল, প্রয়োজন হলে পুত্রদের বেলাতেও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি করতে গাঙ্গেয় দ্বিধা করবে না। এ ক্ষেত্রে গাঙ্গেয় ইচ্ছেটাই বড়। গাঙ্গেয়কে কেউ অপমান করলে সে কখনও ক্ষমা করে না। সে যা চায়, হয় তা পাবে; না হলে কেড়ে নেবে। গান্ধার রাজকুমারীর ক্ষেত্রে তার নীতির কোন পরিবর্তন হবে না।

অপমানে গান্ধারীর ভেতরটা পুড়ে যাচ্ছিল। মুখ গনগন করছিল। সবিস্ময়ে প্রশ্ন করল : এই কথা বললে?

এর চেয়েও অপ্রিয় কথা।

গান্ধারীর বুকের ভিতরটা ধক্ করে শব্দ হল। বলল : কি এমন কথা?

সে এ উদ্ভট প্রস্তাব। কোন বিয়েতে কোথাও যা হয় না, তাই হবে ধৃতরাষ্ট্রে বিয়েতে। গান্ধার রাজকন্যাকে গান্ধার থেকে হস্তিনাপুরে যেতে হবে জন্মান্ধ ধৃতরাষ্ট্রকে পতিত্বে বরণ করতে।

ঘৃণায় বিরক্তিতে গান্ধারীর ভুরু কুঁচকে গেল। চতুর্দিক সে অন্ধকার দেখল। কিন্তু এই দুর্ভাগ্য থেকে মুক্তির কোন পথ দেখতে পেল না। এ তার নিয়তি। তার ভাগ্য। শকুনি শুধু নিমিত্ত। গান্ধারী খুব অল্পেতেই অশান্ত মনকে শান্ত করল। হঠাৎ ফিক্ করে এক অদ্ভুত ভঙ্গি করে হাসল। বলল : এ আর এমন কি কথা। আমি ভাবলুম আরও বড় অপমান করেছে।

এ কি কম অপমান?

অপমান? অপমান কোথায়? বীরভোগ্যা বসুন্ধরায় দুর্বল আর গরিবের মান-অপমান বলে কিছু নেই। বীর্যবানের ন্যায়সঙ্গত দাবি পূর্ণ করতে তোমার ভগ্নী যদি বীরাঙ্গনার মত অশ্বের পিঠে চেপে পাহাড়-পর্বত ডিঙিয়ে, বনভূমি পার হয়ে, ধুলো-বালির পথ ভেঙে বিশাল সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে হস্তিনাপুর প্রবেশ করে, তাতে দোষ কী? এতে অপমানেরও কিছু নেই। বিরাট দেশ জয় করে রাজা যেমন বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে রাজধানীতে অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে প্রবেশ করে, আমিও তেমনি সসম্মানে যাব। হাতে আমার অস্ত্র নেই, গায়ে বর্ম নেই, মাথায় শিরস্ত্রাণ নেই। কিন্তু বুকের

মধ্যে লুকিয়ে নিয়ে যাব প্রেমের একটি মুক্তো। একে তো জোর করে পাওয়া যায় না। আবার জোর করে কেউ বন্দী করবে, কিংবা ধরে নিয়ে যাবে এমন নারী আমি নই। আবার অনুকম্পা দেখিয়ে ধন্য করবে সেও আমি নই। অকিঞ্চনের হাত পাততে হয় আমার জন্যে। গাঙ্গেয়কে অকুণ্ঠ চিত্তে বলব, আমি গান্ধারী। আমি চাই ধৃতরাষ্ট্রকে। আপনার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করতে আমি এসেছি।

শকুনির মুখ শুকিয়ে গেল। ভুরু কুঁচকে গেল। দুই চোখে কেমন একটা দিশেহারা ভাব। একটু থমকে গিয়ে কুণ্ঠিত স্বরে বলল : এভাবে একজন মেয়ের আত্মসমর্পণ করা ভীষণ অপমান। এতে গান্ধারের কোন গৌরব বাড়বে না।

গান্ধারী দু'চোখে সহসা কৌতুক ঝলকে উঠল। ভুরু কুঁচকে গেল। চোখের মণি একটু ছোট করে প্রশ্ন করল : তা হলে কী করবে?

শকুনি দিশেহারা চোখে চেয়ে রইল গান্ধারীর দিকে। তারপর চোখ সরিয়ে নিয়ে সে একটু স্বাভাবিক হতে চেষ্টা করল। লম্বা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল : সেটাই তো বুঝতে পারছি না। পথ আছে শত লক্ষ শুধু আলো নেই। উত্তরণের পথও দেখতে পাচ্ছি না। বড় অসহায় আর বিপন্ন বোধ হচ্ছে। যুদ্ধ করে মরতে পারি বড় জোর।

গান্ধারী গভীর দুঃখের ভেতরেও কৌতুক করল। মুখে চুক চুক করে একটা অদ্ভুত শব্দ করল। গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল : হতভাগিনী ভগ্নীর জন্য অকালে প্রাণটা দিয়ে তোমাকে আর বীর হতে হবে না। বরং বীর্যবতী নারী হয়ে আমি না হয় নারীকুল আলো করে থাকব। নারী স্বাধীনতার এক নতুন দিগন্ত হয়ত তাতে খুলে যাবে। আমার মত এরকম দাবি এ পর্যন্ত কোন নারী কোন পুরুষের কাছে করেনি। পুরুষেরাই চিরকাল অসহায় দুর্বল নারীর কাছে কেশরফোলা সিংহের মত সিংহনাদে নিজের অধিকার আর প্রভুত্বই দাবি করে এসেছে। নারীকে পাশব পৌরুষবলে অধিকার করা যদি তার নির্লজ্জতা না হয়, তাহলে নারীর নির্ভীক প্রার্থনাটা আত্মসমর্পণ হবে কোন যুক্তিবলে? এক অসহায় পুরুষকে চাওয়ার ভেতর কোন অপমান নেই, লজ্জা নেই। বরং একধরনের গৌরব এবং আত্মতৃপ্তির ভাব আছে।

শকুনি অবাক হয়ে চেয়েছিল তার দিকে। গান্ধারীর চোখে এক ফোঁটা জল নেই। দিগন্তহীন মরুভূমির মত জ্বলছে।

কৃষ্ণা চতুর্দশীর প্রশ্নচিহ্নের মত বাঁকা চাঁদের দিকে চেয়ে গান্ধারী নিজেকে প্রশ্ন করল : কেন তার জীবেন এমন অদ্ভুত ঘটনা ঘটল? এর কোন প্রয়োজন ছিল? ভিতরটা মৃদু মৃদু কাঁপছিল আশায়, আশংকায় । আর কেমন অবসন্ন লাগছিল।

আর কিছুক্ষণের মধ্যে গান্ধার রাজ্য ছেড়ে যেতে হবে গান্ধারীকে। পনেরো বছরের সব সম্পর্ক মুছে ফেলে চিরকালের মত বিদায় নিতে হবে তাকে। ফেলে রেখে যেতে হবে অসংখ্য স্মৃতি, ঘটনা ও মানুষ। কথাটা মনে হলে গান্ধারীর কান্না পায়। বুকের ভেতর কেমন করে।

সব মেয়েকে বিয়ের পর বাপের বাড়ি ছেড়ে স্বামীর ঘর করতে যেতে হয়, এটা নতুন কিছু নয়। চিরকাল ধরে হয়ে আসছে। এটাই প্রথা, নিয়ম। ছোট থেকে মেয়েদের মনটা পরিবেশের ভেতর সেইভাবে তৈরি হয়। সংসারের নিয়মের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নেয়ার মত করেই তারা নিজেদেরও তৈরি করে। তৈরিটা হয়ে যায়। কিন্তু গান্ধারী সংসার জীবনের আরম্ভটা সেই প্রথাসিদ্ধ পথে হল না। সংসারে প্রবেশের পথটা তার একটা অপমান দিয়ে অভিষিক্ত হল। সূচনা যার ভাল নয় তার শেষ পরিণতি যে কোথায় কেমন করে কোন চোরাবালিতে গিয়ে পূর্ণচ্ছেদ টানবে, কে জানে? কারো কাছে তার অভিযোগ করার যেমন কিছু নেই, প্রতিকার প্রার্থনারও কিছু নেই। এই দুটো জিনিস দাবি করা যায় পিতার কাছে আর নিজের ভাগ্যের কাছে। কিন্তু তারাই এই ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে গেছে। এর অর্থ সে অবলম্বনহীন, আশ্রয়হীন।

অদৃশ্য বিধাতার অমোঘ চক্রান্তে তার জীবনের সব স্বপ্ন, কল্পনা বানচাল হয়ে গেল। কোন

দিন ভুলেও কোন মেয়ে কল্পনা করে না তার স্বামী হবে একজন অন্ধ পুরুষ। ভাবে না বরের গৃহে কৃপাপ্রার্থী হয়ে বর বরণের কথা! কথাটা মনে হওয়ার সাথে সাথে দুঃখে, অভিমানে তার দু'চোখে ভরে জল এল। গান্ধারী নিজের মনে কাঁদল অনেকক্ষণ। আর সান্ত্বনা পাওয়ার জন্যে মনে মনে বার বার বলল : শত্রু শুধু অদৃষ্ট নয়, মানুষও! মানুষের শত্রুতাও তার জীবনে কম নয়।

সুবল ও শকুনি দরজার পাশে দাঁড়িয়ে নীরবে এবং নিঃশব্দে দেখল সব। বুকের ভেতরটা তাদের ব্যথা করতে লাগল। নিঃশব্দে মাটি মাড়িয়ে সুবল কন্যার পাশে দাঁড়াল। দু'হাতে তাকে বুকে টেনে নিয়ে আদর করল, মুখখানা মুছিয়ে দিল। মাথা আঘ্রাণ করল। অনুতাপিত গলায় বলল : আমিই বোধ হয় সবচেয়ে বেশি অপমান করলাম মা। বাপ হয়ে মেয়ের মর্যাদা রাখতে না পারার লজ্জায়. ব্যর্থতায়, অপমানে, দুঃখে আমার ভেতরটা পুড়ে যাচ্ছে। বিশ্বাস কর মা, এ বুকে বড় জ্বালা। ভীষণ জ্বালা। তোর অসহায় বাবাকে কোনদিন ক্ষমা করিস না। বীর্যের গর্বে, ক্ষমতার দম্ভে যারা তোর মাথাটা দেশের মানুষের কাছে, পৃথিবীর কাছে হেঁট করে দিল তাদের তুই ক্ষমা করিস না কোনদিন। যারা তোর সুখ, শান্তি, ইচ্ছেকে মেরে ফেলল তাদের সঙ্গে কোন আপস করিস না। তোর ঘৃণায় যেন তারা ধ্বংস হয়।

সুবলের বাক্যে আচমকা একটি অনুভূতি হল গান্ধারীর। বুকটা একটু কেমন করে উঠল। সম্মোহিতের মত শূন্যদৃষ্টিতে সুবলের দিকে চেয়ে রইল। পিতার অসহায় অবস্থা দেখে তার কষ্ট হল। কয়েকটা মুহূর্ত কেটে গেলে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে অস্ফুটস্বরে উচ্চারণ করল—বাবা, তুমি মন খারাপ কর না। সব আমার অদৃষ্ট।

সুবল পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহের মত গর্জন করে বলল : মিথ্যে কথা। মানুষের নিষ্ঠুর অবিচারে তোর জীবনটা বিষিয়ে গেল। দুর্বল, অক্ষম পিতার এই মর্মবেদনা যে কত ভয়ংকর সে কথা বলি কাকে? পিতা হয়ে কন্যাকে আমি হত্যা করেছি। অন্ধের হাতে সমর্পণ করা আর তাকে জলে ফেলার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। আমি আমার কন্যাকে হত্যা করেছি। আমি চাই প্রতিশোধ। শকুনি, গান্ধারী তোর গলার হার, চোখের মণি। তোর বুক তার দুঃখে কি ফেটে যাচ্ছে না?

শকুনি কাঁদ কাঁদ স্বরে বলল : যাচ্ছে পিতা। যাচ্ছে। একটা ভয়ংকর কিছু করতে ইচ্ছে করছে। গান্ধারের লজ্জা, গান্ধারীর অপমান, আমার ভেতরে ধৈর্যের বাঁধ কেটে দিচ্ছে।

পুত্র আমাদের বড় আদরের গান্ধারীর সুখ শান্তি যারা কেড়ে নিল, তার ইচ্ছেকে ভাললাগাকে যারা নির্দয়ভাবে হত্যা করল তাদের সঙ্গে কোন আপস কর না পুত্র। কখনও তাদের শান্তিতে থাকতে দিও না। গান্ধারীর অপমানের প্রায়শ্চিত্ত করতে তুমিও তার সাথে হস্তিনাপুরে যাও।

গান্ধারী ভয়ংকরভাবে চমকে উঠেছিল। উৎকীর্ণ উৎকণ্ঠা নিয়ে চমকানো বিস্ময়ে ডাকল : পিতা!

সুবলের অকম্পিত দুই চোখের মণি ঘোলাটে। ওই চোখ, চাহনি গান্ধারীর গভীরভাবে চেনা। গান্ধারীর খবু অবাক লেগেছিল, কতখানি আশাহত হয়ে অন্তরের জ্বালা আর ক্ষোভ নিয়ে পিতা বুকের ভেতর জমে থাকা গ্লানির বাঁধ কেটে দিল। গান্ধারীর অন্তরে তার নানাবিধ মিশ্র অনুভূতির প্রতিক্রিয়ায় জটিল। নিরুচ্চারে নিজের মনে সে বলল : পিতা, সুখে থাকা, শান্তিতে থাকা তো এক নয়। শান্তিটা মনের ব্যাপার। কিন্তু সুরুটাই ভাল নয় বলে এ দুর্ভাবনা তোমার। বাকিটা আমার ভাগ্যের। পিতা, তুমি চোখের জলে আমার ভাগ্যলিপি মুছে দিতে পারবে না! শুধু শুধু মনের শান্তি নষ্ট করা আর, কষ্ট পাওয়া। অশান্তির ভেতর আমার সুখ খুঁজতে হবে। তোমার মত আমারও ইচ্ছে হয়, যারা আমার সুখ কেড়ে নিল, ইচ্ছেকে মেরে ফেলল, তাদের আমি শান্তিতে থাকতে দেব না। পিতা, তুমি দেখ, গাঙ্গেয়র ঘুম আমি কেড়ে নেব। তার দর্প মাটিতে মিশিয়ে দেব।

কিন্তু এসব কিছুই বলতে পারল না গান্ধারী। বুকটা তার কষ্টে, যন্ত্রণায় ক্ষত-বিক্ষত হল। আস্তে আস্তে বলল : পিতা, বধূ হয়ে স্বামী, সংস্কারের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করব কেমন করে? কোনো মেয়ে পারে? না, পারতে আছে? তোমার কথা শুনলে তোমার মেয়ের গৌরব কি বাড়বে তাতে?

গান্ধারীর উত্তরে সুবল অপ্রস্তুত হল। অস্বস্তি বোধ কবল। বুদ্ধিমতী এই কন্যাটিকে তার ভীষণ ভয়। সুবল তার জিজ্ঞাসার কোন জবাব দিতে পারল না। কয়েকটা মুহূর্ত চুপ করে কাটাল। তার

পর বিচলিত ভাব প্রকাশ করে বলল : আমার মন ভাল নেই। সব কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। ভালমন্দ বিচার করার শক্তি নেই।

গান্ধার রাজমহিষী এতক্ষণ একটা কথাও বলেনি। চুপ করে কন্যার পাশে দাঁড়িয়ে শুনছিল। তার কালো চোখের দৃষ্টিতে যেন একটা উদাস বিষণ্ণতা। বিচ্ছেদের কষ্ট যেন যন্ত্রণায় তীব্র হল। প্রায় আটকে যাওয়া স্বরকে মুক্ত করে হঠাৎ বলল : কন্যা, আমি তোমার আর্ত মনকে পীড়া দেব না। পৃথিবীকে এরকম নিষ্ঠুরতা শুধু স্বার্থপর আর শত্রুই করতে পারে। কিন্তু কেউ তোমার ওপর নিষ্ঠুরতা করল বলে, তুমি নিজের ওপর নিষ্ঠুরতা করবে এটা কোন কাজের কথা নয়। গান্ধারী, যে মানুষ তোমার স্বামী হবে, সে কেমন লোক আমার জানা নেই। তবে, সংসারে সকলকে সুখে রাখা, সুখী করা মেয়েমানুষের বড় ধর্ম। সেবা, ত্যাগ, সহিষ্ণুতা, ভালবাসা দিয়ে মেয়েরা সংসারকে স্বর্গ করে তোলে। নিজের সুখকেও দেখবে। যদি সুখী না হও তা-হলে ভেঙে পড় না। প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে লড়াই করে একটা কীটকেও বাঁচতে হয়। বাঁচার মত বেঁচে থাকাই জীবনধর্ম। তুমি জয়ী হও, যশস্বিনী হও মা।

জননীর কথাগুলো মৃদু সুগন্ধের মত তার মন ছেয়ে রইল। মনটা তাতে বেশ হাল্কা হল। একটু হাসার চেষ্টা করল। কিন্তু সেটা হাসি ছিল না। বুক থেকে উঠে আসা একটা কষ্টে তার ঠোঁটটা অল্প একটু কেঁপে ছিল শুধু। মৃদু নিঃশ্বাসে বুক একটু ফুলে উঠল। চোখে চকিত কষ্টের একটা ছায়া পড়ল। নিজের কষ্টে সে জোরে জোরে মাথা নাড়তে লাগল। আর্তকণ্ঠে অস্ফুট স্বরে বলল : মা, মা-গো আমার দুঃখ তো তোমার জন্য। তোমাকে কতদিন দেখতে পাব না সেকথা ভাবলে কান্না পায়।

উদ্গত অশ্রু দমনে গান্ধারী অসহায়। চোখেব জলে বুক ভাসল। কান্না গিলে গিলে বলল : মা, মা-গো মেয়েমানুষের কোন দুঃখ থাকে না। কেন দুঃখ থাকবে? মানুষের সাধ্য কি অদৃষ্টের সঙ্গে লড়াই করার?

সুবল অশ্রু বিগলিত গলায় বলল : অমন করে বলতে নেই মা।

পিতা, যাকে কখনো চোখে দেখেনি তার জন্যে দুঃখের কথা কী করে ভাববে বা? ভাবছি আমার অদৃষ্টের কথা। অদৃশ্য অদৃষ্টের সঙ্গে যে কোন যুদ্ধ চলে না। তাই, আমরা হেরে গেলাম। অদৃশ্য চক্রের হাতে বন্দী হলাম।

হস্তিনাপুরের দিকে রথ ছুটল। কত বন, উপবন, নদী, পাহাড়, নগর, জনপদ পার হয়ে গেল তারা। গান্ধারী নির্বাক পাষাণ মূর্তির মত বসে রইল। শকুনির সাথে একটা কথাও বলল না। এ চির জিজ্ঞাসার কাছে উৎকর্ণ, বোবা। চোখের তারায় কোন উৎসুক্য ছিল না। পথের কোন দৃশ্যের ওপর তার দৃষ্টি ছিল না! নিজের চিন্তায় অন্যমনস্ক হয়ে গিয়ে সে ভাবছিল ভাগ্য কী? কে তাকে নিমন্ত্রণ করে? কোনো অমোঘ শক্তি? সেই অমোঘ শক্তি কি অন্ধ?

পাঁচদিন পাঁচরাত্রির পর হস্তিনাপুরের দ্বারে এসে থামল। প্রধানমন্ত্রী কণিক এবং বিদুর গান্ধারীকে সমাদর করে গৃহে নিয়ে গেল। পুরনারীরা উলুধ্বনি দিল, শঙ্খধ্বনি করল। কেমন একটা আচ্ছন্নতা নিয়ে সে হস্তিনাপুরে রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করল। অমনি একটা দুরন্ত অভিমানে তার দুই চোখ রাঙা হয়ে গেল।

দুই

পঞ্চদশী গান্ধারী একটি তৈলচিত্রের সামনে চিত্রার্পিতের মত চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল। দু'চোখে তার বিস্ময়। তৈলচিত্রটি এক সুন্দর রূপবান, সুদর্শন স্বাস্থ্যবান প্রাণচঞ্চল তরুণের। মুখে বুদ্ধির ছাপ। কিন্তু দু'চোখের মণি দীপ্তিহীন। জীবনের স্বাভাবিকতা তাতে নেই। কিন্তু তার অফুরন্ত প্রাণপ্রাচুর্যে

ভরা দৃপ্ত যৌবনের দিকে তাকিয়ে চোখ ফেরাতে পারল না সদ্যোদ্ভিন্না গান্ধারী। প্রশ্ন প্রশ্ন প্রশ্ন। নিজের মনেই প্রশ্ন করল : কে এই যুবা?

পায়ের খস্‌খস্‌ শব্দে গান্ধারী হঠাৎ চমকে ওঠল। অজানিত আশংকায় গা শির শির করল। সন্ত্রস্ত দৃষ্টিতে একবার দরজার দিকে একবার পিছনের দিকে তাকাল। একটা ছায়া পড়ল ঘরের মেঝেতে। গান্ধারীর বুকের ভেতরটা ধক্‌ করে উঠল। তারপরেই দেখতে পেল রাজবেশে সুসজ্জিত হয়ে এক বয়স্ক ব্যক্তি প্রবেশ করল। তার বিশাল বপু, দীর্ঘ আকৃতি পঞ্চদশী গান্ধারীর বুকের ভেতর থর থর করে কাঁপিয়ে দিয়ে গেল। ব্যক্তিটি দৃপ্ত ভঙ্গিতে দৃঢ় অথচ মন্থর পদে তার সামনে এসে দাঁড়াল। গান্ধারীর তখন কেঁদে ফেলার মত অবস্থা। ভেতরের বেসামাল অবস্থাকে সামাল দিতেই যেন এক নিঃশ্বাসে বলল : আমি গান্ধারী।

গাঙ্গেয় আমি।

প্রণাম গ্রহণ করুন আর্য।

কল্যাণ হোক কল্যাণী। তুমি আমাকে চেন?

হস্তিনাপুরের গাঙ্গেয়কে বিশাল ভারতবর্ষে সবাই চেনে। এতদিন নামটাই শুধু জেনে এসেছি, এবার চোখে দেখলাম। কথা বললাম। সান্নিধ্য পেলাম। অতিথি হলাম।

থামলে কেন কল্যাণী! তোমার কথাগুলো ভারি সুন্দর। মন কেড়ে নেয়।

গান্ধারের মানুষের প্রতি তোমার অনুরাগ ও শ্রদ্ধা আমাকে বিস্মিত করছে। তোমার সঙ্গে কথা বলতে আমার ভীষণ ভাল লাগছে। তোমার কথা আমি শুনেছি কল্যাণী। মনে বড় সাধ ছিল ভ্রাতুষ্পুত্রের বধূ করব তোমায়। ঈশ্বরের কৃপায় আমার ইচ্ছা পূরণ হল।

গান্ধারী একটু চমকে উঠেছিল। বুকের ভিতর দপ্‌ করে জ্বলে উঠল বয়সের স্বপ্ন, আরো কত সব মধুর কল্পনা। মনে হল, রূপকথার একচক্ষু রাক্ষসের মত গাঙ্গেয় তাকে সোনার সিন্দুকে লুকিয়ে রাখছে। তার ইচ্ছের কোন মূল্য নেই। বিনা কারণে তার ওপর শুধু নির্দয় হল। একটা চাপা কষ্টে গান্ধারীর মুখখানা গন্‌গন্‌ করতে লাগল। জোরে শ্বাস পড়ল। কষ্টে উচ্চারণ করল : একে আপনি ইচ্ছেপূরণ বলেন?

কেন বলব না কল্যাণী? ইচ্ছেপূরণের ইচ্ছেটাই বড় কথা। কেমনভাবে হল আর কী করে হল সেটা কোন ব্যাপার নয়।

কয়েক মুহূর্ত নিঃশব্দে কাটার পর গাঙ্গেয় বলল : তুমি তো কিছু বললে না কল্যাণী।

দুর্বল নারী আমি। কতটুকু আমরা বলতে পারি? বলতে পারলেও বলা উচিত নয়। পুরুষের যা শোভা পায় অবলা নারীর তা মানায় না। মেয়েদের ধরিত্রীর মত সহিষ্ণু হতে হয়, আকাশের মত নীরব থাকতে হয়। এর অন্যথা হলে গৃহে, সংসারে শান্তি নষ্ট হয়—ছোট থেকে জননীর কাছে এই শিক্ষাই পেয়ে এসেছি।

চমৎকার। আচ্ছা কল্যাণী, তুমি কি খুব অসহায় বোধ করছ?

গান্ধারীকে নিরুত্তর দেখে গাঙ্গেয় পুনরায় বলল : তুমি তন্ময় হয়ে যে তৈলচিত্রটি দেখেছিলে ওটা আমার ভ্রাতুষ্পুত্র জন্মান্ধ ধৃতরাষ্ট্রের। ওর দিকে তাকানো যায় না। ওকে দেখলে বড় কষ্ট হয়। ঈশ্বর সব দিয়েছে, কেবল দেখার দৃষ্টি দেয়নি। চোখ থাকতেও অন্ধ। দৃষ্টির অভাবে ফুলের মত একটা জীবন নষ্ট হয়ে যাবে? পারবে না এই অসহায় মানুষটিকে একটু করুণা করতে? তোমার একটু দয়া পেলে যার জীবন ধন্য হয়ে যায়, হৃদয় ভরে ওঠে সুধায় তাকে ঘৃণা করে কিংবা প্রত্যাখান করে নিষ্ঠুর হয়ো না জননী। তোমার কাছে গাঙ্গেয়র এ মিনতি। আমি বলছি রাজমহিষী হবে তুমি।

অপমান ও বঞ্চনার কষ্টে ও দুঃখে গান্ধারীর বুকটা ব্যথা করতে লাগল। নিরুচ্চারে মনে মনে বলল : হায় রে অদৃষ্ট! এ কি নিষ্ঠুর বঞ্চনা।

গান্ধারীর দু'চোখ ধৃতরাষ্ট্রের তৈলচিত্রের উপর স্থির। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্রের প্রতিকৃতি সে দেখছিল না। তার চোখের তারায় ভাসছিল শকুনির মিনতিভরা অসহায় মুখখানা, পিতা সুবলের জলভরা দুটি চোখ, মাতার বুকফাটা কান্না। গান্ধার ত্যাগ করার সময় তার বুকের ভেতরটা একদম শূন্য

হয়ে গিয়েছিল। কোন অনুভূতি, রাগ, হিংসে, জ্বালা কিছুই বোধ করেনি। মেয়ে হয়ে জন্মানোর অভিশাপে তার মনটা পাথর হয়ে গিয়েছিল। বড় অসহায় লাগছিল। দু'চোখ দিয়ে অজস্র ধারায় জল পড়ছিল। মনে হয়েছিল, পায়ের তলা থেকে তার মাটি সরে গেছে। তার কোন ভবিষ্যৎ নেই, স্বপ্ন নেই, আকাঙ্ক্ষা নেই। যা রইল তা' হল অপমান, বঞ্চনা আর কান্না। তাই এক নিদারুণ অভিমান নিয়ে মুখ বুজে ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাসকে ভুলে থাকতে হস্তিনাপুরে যাওয়ার উৎসাহ দেখাল। পথে যেতে যেতে বারংবার মনে হল সুন্দর পৃথিবীটা মানুষের স্বার্থে বড় মলিন হয়ে গেছে। এখানে মানুষের মনুষ্যত্বের কোন মূল্য নেই, স্বার্থহীন আত্মদানে মহান নয় মানুষের পৃথিবী। এই পৃথিবীতে তার মত মানুষকই নির্বাসনে যেতে হয়। এই যাওয়াটা যে কত যন্ত্রণার আর কষ্টের তার হিসাব-নিকাশ কেউ করবে না কোনদিন।

কিন্তু এই অন্তঃপুরে পা রাখার পর তার মনের ভেতর যে উল্টো পাল্টা ঝড় বয়ে যাচ্ছিল হঠাৎ গাঙ্গেয়র আর্বিভাবে থমকে গেল। শ্রদ্ধায় মনটা আপ্লুত হল। স্নেহে মন ভিজে গেল। গাঙ্গেয়র মহানুভবতার কাছে নিজেকে বড় দীন মনে হল। কোন অধিকার কিংবা দাবি প্রতিষ্ঠা নয়, আবেদনও নয়, ভিক্ষা চাওয়া। মরমী মানুষের কাছে দরদী মানুষের প্রার্থনা। তার মুনষ্যত্বের কাছে, বিবেকের কাছেই প্রশ্ন করেছে। এখন গান্ধারী কী জবাব দেবে তার? এক কঠিন সংকটে পড়ল সে।

গান্ধারীর হঠাৎ মনে হল তৈলচিত্রটি যেন তার দিকে বোবা দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। মুখে হাসি। ভুরু ভঙ্গিমায় কৌতুক। নয়নে নীরব প্রার্থনা। নিষ্প্রাণ দুটি চোখের পাতায় ব্যথা ফুটে উঠেছে। গান্ধারী সর্বাঙ্গ দিয়ে ধৃতরাষ্ট্রের ব্যথাকে অনুভব করতে পারল। মনের মধ্যে তার অস্তিত্বের স্পর্শ লাগল। ধৃতরাষ্ট্রের প্রতিকৃতি যেন সহসা কথা বলে উঠল। গান্ধারী তার নিঃশ্বাসের শব্দ এবং কণ্ঠস্বর শুনতে পেল। ধৃতরাষ্ট্র ফিস ফিস করে যেন বলল : অন্ধ হওয়া বড় কষ্ট গো। মনের কষ্টের কাছে রাজসুখ কিছু নয়। জীবনের সব কিছুই তার কাছে মূল্যহীন। সব প্রাপ্তিই অপ্রাপ্তিতে ভরে যায়। কিছুই করার থাকে না তার। অশেষ যন্ত্রণায় শুধু দয়া চাওয়া যায়। জীবনের জন্য করুণা ভিক্ষে করা যায়। নারীর কাছে বলা যায় শুধু আমার প্রাণে অনেক ভালবাসা আছে, ভালবাসায় প্রাণ আমার ভরপুর। কিন্তু আমার পাওয়ার ঘর শূন্য। আমার চারধারে শুধু অন্ধকার। আমি একা। বিধাতা আমার জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে, আমার জীবনটা নষ্ট করে দিচ্ছে। কেবল তুমিই পার আমাকে বাঁচাতে। তোমাকে দেখে কেন জানি না মনে হচ্ছে, তুমি আমাকে ভালবেসেছ। প্রতিকৃতি দেখেও ভালবাসা হয়ে যায়, ঘটে যায়। তোমার সুন্দর মুখে এক আশ্চর্য প্রসন্নতামাখা প্রেম ছবি ফুটে উঠতে দেখেছি অস্ফুটে চাপা। মনের চোখে দেখতে পাচ্ছি, তুমি আমার আলোর দূতী।

গান্ধারী বুকের ভেতরটা সির সির করে উঠল। প্রতিকৃতি তো কথা বলতে পারে না। তা'হলে এ তো তারই গভীর অভ্যন্তরের কথা। ধৃতরাষ্ট্রের কাল্পনিক সংলাপের রূপ নিয়ে ছড়িয়ে গেল তার অনুভূতির রন্ধ্রে রন্ধ্রে। ভালবাসাটা কখনো পরিকল্পনা করে হয় না। ভালবাসাটা হয়ে যায় আপনা আপনি। এই হওয়াটার জানান দিতেই যেন মনটা তার কানে কত কি ফিসফিস করে বলল।

জন্মান্ধ ধৃতরাষ্ট্র সম্পর্কে গান্ধারীর মনে যেটুকু বিরূপতা ছিল, তাও আর রইল না। একটু একটু করে অনুরাগের ছোঁয়া লাগল সেখানে। কেমন একটা প্রসন্ন প্রশান্তিতে ভরে উঠতে লাগল সে। করুণা নয়, মায়া নয়, সত্যিকারে ভালবাসার এক সাগর সৃষ্টি হল। কতরকম অদ্ভুত আবেগের তরঙ্গে দুলতে লাগল পঞ্চদশী গান্ধারীর বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ।

গাঙ্গেয় জিজ্ঞাসার এক মিশ্র প্রতিক্রিয়ায় গান্ধারীর কয়েকটা মুহূর্ত কাটল নিঃশব্দে। মাথার মধ্যে শিরাগুলো দপদপ করছিল ভয়ে। কাঁপা গলায় ধীরে ধীরে উচ্চারণ করল : করুণা কেন বলছেন? আমি সামান্যা রমণী। একজন বীর্যবান, রূপবান, ঐশ্বর্যসম্পন্ন পুরুষকে করুণা করার যোগ্যতাই বা আমার কি? আমি নারী। সেবা, মমতা, ভালবাসা দিয়ে অন্ধ রাজপুত্রের ব্যথার জায়গায় একটু হাত বুলিয়ে দিতে পারি। তার দুঃখের সঙ্গী হতে পারি। রাজপুত্রের সমৃদ্ধ জীবনের কোন কিছু যাতে নষ্ট না হয় তার জন্যে নিজেকে নিঃশেষে নিবেদন করতে পারব।

গান্ধারী! চমকানো বিস্ময়ে গাঙ্গেয় ডাকল। গাঙ্গেয়র দু'চোখে অবাক বিস্ময়। অপলক চোখে

গান্ধারীর দিকে চেয়ে রইল। গান্ধারী লজ্জা পেয়ে মাথা হেঁট করল। জানলার ধারে সরে গিয়ে গরাদ ধরে দাঁড়িয়ে রইল। জানলা দিয়ে বিদায়ী সূর্য তির্যক হয়ে তার মুখে পড়েছিল।

বেশ কিছুক্ষণ নিঃশব্দে কেটে গেল। গাঙ্গেয়র বুক থেকে একটা স্বস্তির শ্বাস পড়ল। বহুকাল পর বুকের ভারটা নেমে গেল। আস্তে আস্তে আস্তে বলল : গান্ধারী তুমি, সত্যি অসাধারণ। তোমার কোন তুলনা হয় না। রমণিকুলে তোমার মত রমণী পৃথিবীতে কেন বেশি হয় না।?

বাইরের দিকে চেয়ে গান্ধারী নিরুচ্চারে নিজের মনে বলল : তা'হলে পৃথিবীটা স্বর্গ হয়ে যেত।।

বিয়ের প্রথম রাত। সে রাতটা একটা আশ্চর্য রাত। চারদিকে দীপাবলীর উজ্জ্বল আলো আর জোৎস্না মিলে হস্তিনাপুরের রাজপ্রাসাদকে ইন্দ্রের অমরাবতী করে তুলল। গান্ধারী হেমনির্মিত পালঙ্কের দুগ্ধ ফেননিভ কোমল শয্যার এক কোণে দরজার দিকে পিঠ করে খোলা জানলার দিকে চোখ মেলে চুপ করে বসে ছিল। কত অদ্ভুত অদ্ভুত কল্পনা, অনুভূতি তাকে মুহর্মুহ ছুঁয়ে যাচ্ছিল। বুকের ভেতরটা আশংকায় মৃদু কাঁপছিল।

মেঝেতে খস্ খস্ পায়ের শব্দে হঠাৎ চমকে ওঠল। চক্ষু আবরণী দিয়ে চোখটা তাড়াতাড়ি বাঁধল। পায়ের শব্দ ক্রমে নিকটতর হল। গান্ধাবীর বুকের ভেতরটা কেমন করছিল। বার বার মনে হচ্ছিল এবার একটা কিছু হবে। একটা কিছু ঘটবে তার নারী জীবনে প্রথম।

পা টিপে টিপে খুব সাবধানে কে যেন আসছিল তার দিকে। মনের মধ্যে আগন্তুকের অস্তিত্বের স্পর্শ লাগল যেন। আর এক অবোধ রহস্যময় অনুভূতিতে তার ভেতরটা শীত শীত করতে লাগল।

পিঠের ওপর একটা ভারী হাতের স্পর্শ অনুভব করল। সেই স্পর্শের মধ্যে তড়িৎ ছিল। সারা অঙ্গে তার শিহরন ছড়িয়ে পড়ল। এ অনুভূতি সম্পূর্ণ নতুন। মনে হল, যুগান্তরের ঘুম থেকে যেন জেগে উঠল। আর একটার পর একটা অনুভূতির বিস্ফোরণ ঘটে গেল তার ভেতর।

চিত্রার্পিতের মত দাঁড়িয়ে আছে গান্ধারী। চক্ষু আবরণী দিয়ে চোখ ঢাকা থাকার জন্য কিছুই দেখতে পাচ্ছিল না। স্পর্শের আশ্চর্য স্পর্শটা সারা শরীরে ঘুঙুরের মত বাজছিল। সেই প্রথম প্রেমের কল্লোল।

ধৃতরাষ্ট্রের হাতটা একটু একটু কাঁপছিল। ওর ভিতরে কী হচ্ছিল কে জানে। তারপরে? তারপরেই তাকে বুকের মধ্যে চেপে ধরল। কিছুতে ছাড়ছিল না। গান্ধারী অসহায়ের মত নিষ্পেষিত হতে লাগল। ভাল লাগছিল সে ভুজবন্ধন। তবু হাত ছাড়াতে চেষ্টা করল। পারছিল না। ধৃতরাষ্ট্রের মুখ তার মুখের ওপর নেমে এল। সে নিজেও ধৃতরাষ্ট্রের অধরে অধর রেখেছিল। সম্ভবত, ধৃতরাষ্ট্রের শরীরের নিবিড় স্পর্শে, নানা বাধার নিচে চাপা পড়া রক্তের বারুদে আগুন লেগেছিল। গান্ধারীর প্রতিটি অঙ্গে দুরন্ত উত্তাপ তখন দপদপিয়ে ওঠেছিল এবং আবেগের তীব্রতায় আত্মহারা অগ্রাসী চুম্বনে তার কোমল ঠোঁটের ত্বক কেটে রক্তে মাখামাখি হল।

অনন্ত সময় বয়ে যাচ্ছিল। কতক্ষণ ধরে তার পরস্পরে আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়েছিল কে জানে? ধৃতরাষ্ট্র তাকে ছাড়ছিল না। কিন্তু বুক ভরে একটু বাতাস নেয়ার জন্যে সে তখন ছটফট করছিল। মুখটা তার আগ্রাসী চুম্বন থেকে দূরে দূরে রাখতে চেষ্টা করছিল। আর দু'হাত দিয়ে গান্ধারী তাকে ঠেলে সরিয়ে দিতে চাইছিল। আর মুখে বলছিল, ছাড়, ছাড়? ভীষণ লাগছে, আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে। আমার সমস্ত শরীরটা যে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে। ভুজ বন্ধন ভুজঙ্গবন্ধন হয়ে উঠেছে। নিজেকে যে ছাড়াই সে উপায় নেই আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে।

ধৃতরাষ্ট্রের বাহুবন্ধন তৎক্ষণাৎ শিথিল হয়ে গেল। হাতটা টানতে গিয়ে গান্ধারীর চক্ষু অবারণীতে ঠেকে গেল। ধৃতরাষ্ট্রের সারা শরীরের শিহরন গান্ধারী তার হাতের মুঠোয় অনুভব করল। দু'জনে কেউ কারো মুখ দেখছিল না। কেবল অস্তিত্বের স্পর্শ দিয়ে টের পাচ্ছিল পরস্পরকে। অনেকক্ষণ পর্যন্ত ঐ স্পর্শটা গান্ধারীর হাতে লেগে রইল। এরকম এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতায় শরীরের মধ্যে ঘুঙুর বেজে যাচ্ছিল। প্রজাপতির মত মনটা তৃপ্তি সুখের উল্লাসে ডানা মেলে দিল।

ধৃতরাষ্ট্র তার গালে হাত দিল। চক্ষু আবরণীতে হাত রাখল। তারপর দু'হাত দিয়ে কপাল, চুল, নাক, ঠোঁট খুঁজে খুঁজে দেখল, বার বার পরখ করে অবাক স্বরে বলল : গান্ধারী, আমার মন তুমি বিস্ময়ে ভরে দিলে। এভাবে তোমার চোখ আবৃত করলে কেন? এর কি কোন দরকার ছিল? এ মিথ্যে আচরণ করে নিজেকে তুমি ঠকাচ্ছ কেন?

গলার ওপর ধৃতরাষ্ট্র দু'হাতের যে মালা রচনা করছিল গান্ধারী সে দুটি হাত ধরে ভাল লাগার এক আশ্চর্য সুখে বলল : প্রিয়তম, ঠকানোর কোন কাজ করনি। প্রত্যেক মানুষের ভালবাসার রকম'ত আলাদা আলাদা। এও একরকম অভিব্যক্তি।

তোমার কথা বোধগম্য হল না।

এতে না বোঝার তো কিছু নই। মানুষ হলেই তার মন বলে একটা ব্যাপার থাকে। মন থাকলে তাকে ভাবতে হয়।

তুমি কী ভাবলে?

সব ভাবনার কথা বলতে নেই স্বামী। তাতে লাভ হয় না কারো। বোধ হয়, কোন রহস্যের পুরোপুরি ভেদ করতে নেই। ভেদ করলে তাতে দু'জনের সমান অসম্মান হয়!

ছিঃ, এ কথা মনে হল কেন? অসম্মানের কথা উঠলে বড় ভয় হয়। মনের মধ্যে ঝড় ওঠে। ভীষণ অসহায় আর হতাশ বোধ করি তখন। বিশ্বাস কর, আমি কোন অসম্মান করিনি।

গান্ধারীর কণ্ঠস্বরে বেশ একটা হাসির ভাব ফুটল। বলল : অসম্মান করেছ এ কথা তো বলিনি। আসলে প্রত্যেক মানুষ আলাদা। মানুষে মানুষে বড় তফাত করে রেখেছে বিধাতা। এক এক জনের ভাবনা এক এক স্তরে চলে। তাই কোনকিছু নিজে বোঝা, নিজের অনুভব করা এক জিনিস, আর অন্যকে তা বোঝানো, অন্যের কাছে তার নিজের সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে পরিপূর্ণভাবে নিঃশেষে নিংড়ে নেওয়া অনুভূতিকে পৌঁছে দেওয়া সম্পূর্ণ আর এক জিনিস।

গান্ধারী, তুমি কি সহজ করে কোন কথা বলতে পার না?

স্বামী, মানুষের মনের জঙ্গলের রহস্য সব সময় পৌঁছনো সম্ভব নয়। বড় কষ্টের। শুধু মনের জন্যে কথা দিয়ে হয়ত রহস্যে সব সময় পৌঁছানো সম্ভব নয়। তুমি বল, দৃষ্টিও দৃষ্টিহীনতার যে ব্যবধান আমার ও তোমার তা কেমন করে দূর করতে পারি? অথচ আমাদের সম্পর্ক সৃষ্টিতে এটা তো একটা বাধা। চক্ষু বন্ধনীর সাহায্য আমি সেই বাধাটুকু পার হতে চেয়েছি।

গান্ধারী! ধৃতরাষ্ট্রের গলায় চমকানো বিস্ময়।

প্রিয়তম, শ্রদ্ধা আর সম্মান দিয়েই তো মানুষের সমস্ত সম্পর্কের ভিত গড়ে ওঠে। প্রেমের, বন্ধুত্বের, আত্মীয়তার। আমি নিজের দৃষ্টিকে ঢেকে রেখেই তোমার কাছে পৌঁছতে চাই। জীবনের সব কিছু যদি ভালবাসায় অর্থবাহী না হল তা হলে বুঝতে হবে সে ভালবাসেনি। তার জীবন বৃথা।

'গান্ধারী, তুমি মহাপ্রাণ। আমি ভাগ্যবান। এমন মহৎ বোধ পাওয়া জীবনে দুর্লভ।

স্বামী, আমার মত একজন সাধারণ রমণী তোমাকে ভালবেসে বস্ত্রখণ্ড দিয়ে দৃষ্টিকে আবৃত করে কত যে ধন্য, কত মহার্ঘই যে হয়ে উঠল তা আমিই জানি। এইভাবে তোমাকে পাওয়া কি কম পাওয়া? বল?

গান্ধারী, তুমি সত্যি বলছ? আমায় উপহাস করছ না তো?

প্রিয়তম, আমার এই চোখ দুটো বড় ভয় পাই। এদের আমি বিশ্বাস করি না।

কেন প্রিয়ে?

পাছে অপমান করি, তাই ভয়ে ভয়ে থাকি।

কিসের ভয়?

পাছে তোমায় দেখে করুণা হয়, দয়া হয় তাই চোখ ঢেকে রাখি। দয়ায় করুণায় প্রেম নোংরা হয়ে যায়। প্রেমের পবিত্রতা অক্ষুণ্ণ রাখতে আমি তোমার সমতলে নেমে এসেছি।

গান্ধারী, তুমি এত মহৎ! আমার মনের সব কষ্ট তোমার শান্ত-স্নিগ্ধ ভালবাসার প্রলেপে জুড়িয়ে গেল। আজ ভীষণ সার্থক আর সুখী মনে হচ্ছে।

সকাল হচ্ছে, রাত্রি আসছে। অমোঘ নিয়মে দিনের চাকা ঘুরছে। সেই ঘূর্ণায়মান চক্রে গান্ধারী প্রতিদিন এক অন্য নারী হয়ে উঠল। সংসারকে বড় বিচিত্র আর আশ্চর্য লাগল। চেনা মানুষের পৃথিবীটা তার সামনে থেকে একটু একটু করে সরে গেল। অচেনা মানুষগুলোর সাথেই এক নতুন বন্ধন গড়ে উঠল ধীরে ধীরে। প্রতিটি দিন শেখাল কী করে সকলের সাথে সকলকে দিয়ে থাকতে হয়। এতে মনের যন্ত্রণা শিথিল হয়ে এল। মনকে ঘুম পাড়িয়ে ফেলল। বরং এখন মনে হয় দুঃখও সুন্দর, জীবনও সুন্দর। ভালবাসার জন্যে আত্মীয় কিংবা পরিচিত হওয়ার প্রয়োজন হয় না। ভালবাসা আলোর মত সব কিছুকে উজ্জ্বল করে দেয়। কিন্তু সেই ধারণাটা যে ভুল ধৃতরাষ্ট্রের কাছে প্রথম শুনল। শায়িত গান্ধারীর মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে ধৃতরাষ্ট্র বলল : গান্ধারী তুমি খুবই সহজ-সরল। তোমার চোখে সব ঢাকা আছে। তাই, কয়েকটা কথা বলার আছে।

আমি নতুন। সব কিছু ভাল করে বুঝিও না। কে, কেমন, জানিও না।

ওটা কোন কথা নয় সুন্দরী। কেউ কাউকে জানায় না কিছু। সব নিজের জেনে নিতে হয়। যারা তা করে না তাদের জীবনভোর দাম দিতে হয়।

আমাকে কী করতে হবে বল?

গান্ধারী জীবনের সব কথা বলে বোঝানো যায় না। বুঝে নিতে হয়। তোমার কথাতেই বলি, কোন কিছু নিজে বোঝা, নিজে অনুভব করা এক জিনিস আর অন্যকে তা বোঝানো, অন্যের অনুভূতির কাছে তা পৌঁছে দেওয়া সম্পূর্ণ আর এক জিনিস। সব সময়ও সব কথা বোঝানোর মত মন থাকে না। নিজেকে প্রকাশ করার মত যে ভাষার দরকার হয় সব অবস্থায় তাকে প্রকাশ করা হয়ে ওঠে না। নিজেকে তার স্বরূপটা বুঝে নিতে হয়। অবস্থা, পরিবেশ, ঘটনা সম্বন্ধে অবহিত হতে হয়।

এসব কথা বলছ কেন? আমি তোমার কথা এক বর্ণ বুঝতে পারছি না।

ধৃতরাষ্ট্র একমুহূর্ত থামল। দীর্ঘশ্বাস ফেলল। বলল : তুমি আমাকে উপহাস করছ না তো?

তুমি কী বলছ? উপহাস করব তোমায় গান্ধারী!

প্রিয়তম, আমার এই চোখ দুটিকে বড় ভয়। এদের আমি বিশ্বাস করি না। ভ্রমবশত কোন দয়া কিংবা করুণা যদি মনে জাগে তাই চোখ ঢেকে রাখি। দয়ায়, করুণায় প্রেম নোংরা হয়ে যায়। এত করেও আমার প্রেমের পবিত্রতা অক্ষুণ্ণ রাখতে পারলাম কই?

ধৃতরাষ্ট্রকে দু'হাতে সরিয়ে দিয়ে গান্ধারী পাশ ফিরে শু'ল। গান্ধারীর কণ্ঠস্বর শুনে ধৃতরাষ্ট্রের ভেতরটা চমকে গেল। অপরাধীর মত অপ্রস্তুত গলায় বলল : গান্ধারী নিজেকে বড় অসহায় লাগে। আমার মত এমন একটা বিষণ্ণ মন নিয়ে যেন কেউ না জন্মায়। অন্ধত্ব আমার জীবনের অভিশাপ। অথচ সব মানুষের স্বপ্ন থাকে। স্বপ্ন নিয়ে বাঁচে। কিন্তু আমার কী স্বপ্ন আছে বল? আমার স্বপ্নের ফুল নিয়ে মালা গাঁথা হল পাণ্ডুর গলায়। অন্ধত্ব আমার অপরাধ। অন্ধ বলেই রাজ্য সিংহাসনের ওপর আমার কোন অধিকার নেই। আমাকে এই বঞ্চনা করার ঘটনাটা যতদিন মনে থাকবে ততদিন পাণ্ডুর সঙ্গে আমার বিরোধের অবসান হবে না।

ধৃতরাষ্ট্রের কথাগুলো গান্ধারীর মন ভিজিয়ে দিল। মনটা তার বিষাদে ভরে গেল। মানুষটা সারাজীবন দুঃখ পেয়ে এসেছে। কিন্তু এই দুঃখটা এক ধরনের অবহেলা বোধ থেকে হয়েছে। আর এই বোধ থাকে কেবল মানুষের। তবু তাকে একটা সান্ত্বনা দেওয়ার জন্যে বলল : দুঃখ করে কী হবে বল? ভাগ্য তোমায় বঞ্চিত করেছে। ভাগ্যের সঙ্গে' তো যুদ্ধ চলে না।

গান্ধারী, ভাগ্য দুর্বলের আত্মসান্ত্বনা। ভাগ্যের দোহাই দিয়ে আমি হেরে যেতে রাজি নই। আমি আমার ভাগ্যের স্রষ্টা হয়ে বাঁচতে চাই।

গান্ধারীর বুকের ভেতর তরঙ্গ বয়ে গেল। আঙুল দিয়ে ধৃতরাষ্ট্রের শরীর স্পর্শ করল। তার বুকের ঘনকালো লোমের মধ্যে মুখ ডুবিয়ে যৌবনের ঘ্রাণ নিল। আর কি এক সুখের আবেশে ভরপুর হয়ে উঠল। বলল : কী ভালো যে লাগছে আমার ! কে বলল তুমি অন্ধ? অন্ধ কখনও কেশরফোলা সিংহের মত গর্জন করে না। বীর্যের গর্বে ভাগ্যের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে না।

মহিষী!

স্বামী, নিজের অধিকার এ পর্যন্ত দাবি করেনি কোন অন্ধ। তোমার কণ্ঠেই প্রথম ধ্বনিত হল : অন্ধত্ব অপরাধ নয়। অন্ধেরও স্বপ্ন আছে। অন্ধ বলে তাকে শুধু করুণা কিংবা অবহেলা করবে তাও সে নয়। একজন অন্ধের এ দাবি কিন্তু কম নয়।

তোমার উষ্ণ অভিনন্দন আমি উজ্জীবিত হলাম। যে মন নিয়ে তুমি আমাকে উৎসাহিত করলে সেই মন আমাকে দাও।

আমার সব হারানো সব খোয়ানো প্রেম তোমাকে দিয়েছি।

তবু মনে হয়, আমার সব কিছু দিয়ে কোথায় যেন তোমাকে স্পর্শ করতে পারছি না। তোমার আমার মধ্যে একটা ব্যবধান যেন কোথায় আছে একটু। সেই বাধাকে পেরিয়ে আসতে পারছি কই?

ওটা তোমার ধারণা। নিজের মন গড়া কিছু।

ধৃতরাষ্ট্রের বুক কাঁপিয়ে গভীর দীর্ঘশ্বাস পড়ল। বলল : কি জানি গান্ধারী? ফল্গুধারার মত আমার মনের অতলে যে উচ্চাকাঙ্ক্ষার স্রোত বইছে, যে স্বপ্ন ঈর্ষা, বিদ্বেষ, প্রতিহিংসা আমার সব শান্তি কেড়ে নিয়েছে, প্রতিদিন আমাকে অস্থির করে তুলেছে, তার খোঁজ রাখ কি?

স্বামী, অপরাধ নিও না। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কোন তফাত রাখব না বলেই স্বেচ্ছায় চক্ষু আবরণী গ্রহণ করেছি। খোলা চোখে একটা মানুষকে দেখলে হাব-ভাব, আচার-আচরণ থেকে তার মনের গতি, প্রকৃতি, প্রতিক্রিয়া অনেকখানি হৃদয়ঙ্গম করা সহজ হয়। কিন্তু আমাদের কথা দিয়ে সেখানে পৌঁছতে হয়। চুপ করে থাকলে, কিংবা কথা না বললে তো আমার কেউ কারো মনের নাগাল পাব না। এ নিয়ে আমাদের পরস্পরকে দোষারোপ করা কিংবা অভিযোগ করাও উচিত নয়।

তুমি ঠিক বলেছ। আমারই ভুল হয়েছে। গান্ধারী ধৃতরাষ্ট্রের কাঁধের ওপর মাথা রেখে বলল: তুমি আমার ওপর রাগ করলে তো?

ধৃতরাষ্ট্র অন্য কথা ভাবছিল। গান্ধারীর প্রশ্নে তার মন ছিল না। নিজের ভাবনায় অন্যমনস্ক হয়ে গিয়ে সে একটু দ্বিধাগ্রস্তভাবে বলল : আচ্ছা গান্ধারী, কথাটা যখন বললে, একটা প্রশ্ন করব। ঠিক জবাব দেবে তো?

গান্ধারী হাসি হাসি মুখ করে বলল : বলেই দ্যাখো না।

অন্ধ বলে, রাজ্যের অধিকার থেকে আমাকে বঞ্চিত করা কি ঠিক হল?

বড় কঠিন প্রশ্ন। উত্তর দেওয়া বেশ শক্ত। ন্যায়-অন্যায় বিচার, ক্ষেত্রবিশেষে এক একজন মানুষের বেলায় এক একরকম হয়। তবে কোন মানুষকেই জন্মগত অধিকার থেকে বঞ্চিত করা উচিত নয়। কিন্তু মানুষের সংসারে নিত্য বঞ্চনা লেগেই আছে। অধিকার নিয়ে মানুষে মানুষে যত বিরোধ আদর্শ নীতি নিয়ে তত নয়। কেউ অধিকার ছাড়তে চায় না। অধিকারকে অধিকারে রাখতে হয়। অধিকার শুধু ধরে রাখার জিনিস। যার সে যোগ্যতা নেই অধিকার নিয়ে তার মনস্তাপ করা উচিত নয়।

গান্ধারীর কথা শুনে খুব ভাল লাগল ধৃতরাষ্ট্রের। তবু মনে হল, গান্ধারীর মনের নাগাল এখনও সে পায়নি। জীবন মাটিতে পা ফেলে হেঁটে তাকে সে ছুঁতে পারেনি। তাই গান্ধারী সম্পর্কে নানা কৌতূহল তার। একটু চুপ করে ধৃতরাষ্ট্র প্রশ্ন করল : আচ্ছা গান্ধারী, যারা আমাকে সিংহাসনে বসতে দিল না, তাদের চেন তুমি?

পাণ্ডুর অভিষেক তো আমার আগমনের বহু আগের ঘটনা।

তুমি কিছু শোননি?

এসব কথা কেউ বলে?

আচ্ছা গান্ধারী তোমার রাজমহিষী হতে ইচ্ছা করে না? রাজমহিষী না হওয়ার জন্যে তোমার দুঃখ হয়?

স্বামী, মানুষের বাসনার শেষ নেই। বাসনা অগ্নিশিখার মতই শুধু জ্বালায়, জ্বলে আর বিস্তৃত হয়। আমার কোন দুঃখ বিলাসিতা নেই। তবে দুঃখ না থাকলে মানুষ বড় কিছু করতে পারে না। অভাব থেকেই মানুষ মানুষের মত হয়ে উঠে।

গান্ধারী তুমি কত গভীর কথা, কত সহজ করে বলতে পারো। অথচ আমি চেষ্টা করেও নিজের মনের কথাটা তোমার মত অক্লেশে বলতে পারি না।

ওসব কথা থাক্। তোমার বঞ্চনার কথা বল।

গান্ধারীর জিজ্ঞাসায় ধৃতরাষ্ট্র একটু বিব্রত বোধ করল। তার কানের পর্দায় ঝংকারে বাজছিল পিতামহ ভীষ্ম এবং ঋষি দ্বৈপায়নের কণ্ঠস্বর। বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে স্বগতোক্তির মত বলল : রাজ্যাভিষেক নিয়ে হস্তিনাপুরের রাজনীতির অভ্যন্তরে খুব গভীর এবং গোপনে প্রস্তুতি চলছিল অনেকদিন ধরেই। পিতৃব্য ভীষ্ম এর কিছুই জানতেন না। প্রথানুযায়ী এবং ন্যায়ত ধর্মত পরিবারের জ্যেষ্ঠপুত্র হিসাবে আমারই সিংহাসনে অভিষেক হওয়ার কথা। কিন্তু অভিষেকের কিছুদিন আগে থেকে এই নিয়ে একটা সংশয়ের সূচনা হল। কে বা কারা এই বিতর্কের উদ্ভাবক টের পাওয়া গেল না। কিন্তু রাজানুগ্রহ প্রাপ্ত মুনিঋষিরা বলল ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ। সাধারণ মানুষের স্বার্থ ও রাজ্যের নিরাপত্তা রক্ষায় কতখানি যোগ্য তার সিদ্ধান্ত রাজ্য পরিচালকমণ্ডলীর সঙ্গে রাজ্যের হিতার্থী এবং মুনিঋষিরা একত্রিত হয়ে গ্রহণ করুন। অভিষেক কার হবে—ধৃতরাষ্ট্রের, পাণ্ডুর, না বিদুরের? সরল সাদাসিধে পিতামহ ভীষ্ম খোলামনেই প্রস্তাব অনুমোদন করল।

ধৃতরাষ্ট্র একটু দীর্ঘশ্বাস ফেলে চুপ করল। গান্ধারী ধৃতরাষ্ট্রের আদুল বুকের ঘন কালো লোমের মধ্যে ধীরে ধীরে আঙুল চালিয়ে দিতে দিতে বলল : স্বামী, পিতামহ গাঙ্গেয় বার্হস্পতির কূটনীতি সবিশেষ অভিজ্ঞ। খোলামনে প্রস্তাবটা নিয়েছেন বলে মনে হয় না। বরং বলা ভাল মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। না নিয়ে তাঁর উপায় ছিল না। বিচক্ষণ রাজনীতিবিদ্ গাঙ্গেয় বুঝেছিলেন ষড়যন্ত্রের শিকড় রাজনীতির গর্ভদেশে এতদূর গিয়েছে যে, তার মূলোৎপাটন অসম্ভব। তাই বাস্তবসত্য স্বীকার করে নিলেন। তোমার মত অন্যেরাও তাঁর মনের অভিপ্রায় টের পেল না।

তুমি টের পেলে কী করে? পিতামহ তোমাকে কিছু বলেছে?

একটু আগে তুমিই বললে, সব কথা বোঝানো যায় না, বুঝে নিতে হয়। আমিও তেমনি পিতামহের কাজকর্ম চলাফেরা দেখে নিজের মত করেই বুঝেছি।

কী বুঝেছ?

সেই কথাই তো বলছি। প্রস্তাবটা মেনে নিয়ে পিতামহ কারোকে বুঝতে দিলেন না, তিনি কী চান। নিরপেক্ষ থেকে তিনি এক ঢিলে দুই পাখি মারলেন। নিজের ভাবমূর্তি তো উজ্জ্বল হলই; তা-ছাড়া সকলে জানল অভিষেকের ব্যাপারে ভীষ্ম কারো পক্ষে নয়। তাঁর নিরপেক্ষ ভূমিকায় ষড়যন্ত্রকারীদের সাহস ও মনোবল বৃদ্ধি পাবে। এবং তিনিও সহজে তার ভেতর থেকে ধৃতরাষ্ট্র বিরোধীদের ছেঁকে বার করে নিতে পারবেন।

তোমার এসব কল্পনা-নির্ভর কথার কোন মানে হয় না। পিতামহ নিজের মহানুভবতায় ভুলে গিয়ে আত্মরক্ষার একমাত্র অস্ত্রটি অন্যের হাতে তুলে দিয়ে যে ভুল করলেন তার জন্যে অনেক দাম দিতে হয়েছে। সিংহাসনের উত্তরাধিকারী নির্বাচনের দায়িত্ব মহর্ষি দ্বৈপায়নকে দিয়ে ভুলই করেছেন। মহর্ষি আমাদের কারো নামোল্লেখ না করে অভিষেক সম্পর্কে কতকগুলি নিয়ম ও নীতির কথা বললেন। তাতেই অভিষেকের গোটা ব্যাপারটা পাণ্ডুর পক্ষে গেল। মহর্ষিকে কথা বলতে দিয়ে পিতামহ মারাত্মক ভুল করলেন।

গান্ধারী একটু চুপ করে থেকে বলল : কোন ভুলই করেননি। তিনি কেবল নিজের হিসাবটা মিলিয়ে নিয়েছেন। শত্রুকে চিহ্নিত করতেই তাকে নিজের অস্ত্র ব্যবহারের সুযোগ করে দিয়েছেন। অন্তর্দ্বন্দ্বের বীজটা শান্তনুপুত্র আর সত্যবতীর পুত্রের মধ্যে। দ্বন্দ্বের সেই ক্ষেত্রটা কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত

হয়েছে তা নিরীক্ষণ করতেই তিনি অভিষেকের মত গুরুত্বপূর্ণ একটা অনুষ্ঠানকে নিজের স্বার্থে ব্যবহার করলেন। সমরকুশলী দেবব্রত শত্রুর কাছে পরজয় স্বীকার করে নিয়ে বৃহত্তর কোন জয়ের জন্যেই যেন একটু সময় নিলেন। এটাকে তাঁর সমরকৌশল বলতে পার।

ধৃতরাষ্ট্রের মনে খটকা লাগল। গান্ধারীর কথায় যথেষ্ট যুক্তি ছিল এবং সত্য বলে মনে হল। নির্বিরোধী মানুষ বলেই পিতামহ ভীষ্মকে বাইরে থেকে টের পাওয়া যায় না। তবে তিনি যে একটা হতাশ বিষণ্ণতায় বেশ কিছুকাল ধরে ভুগছেন তাতে সন্দেহ নেই। ধৃতরাষ্ট্রের আচমকা মনে হল, যে লড়াইটা ভীষ্ম ও দ্বৈপায়নের মধ্যে সূচনা হয়েছিল হঠাৎ তাদের দিকে ঘুরে গেল। লড়াইয়ের ক্ষেত্রটা তাঁর দিক থেকে এখন পাণ্ডুর দিকে সরে গেছে। সেইজন্যেই বোধ হয় পিতামহ পাণ্ডুকে বলেছিল, বিশাল সাম্রাজ্য রক্ষার জন্যে রাজার বাহুবল সৈন্যবল যে আছে তার একটা মহড়া দেওয়া দরকার হয়ে পড়েছে। রাজার প্রতি জনগণের আস্থা অটুট রাখতে এবং রাজ্যের সামরিক শক্তি উত্তরোত্তর শক্তিশালী হচ্ছে এটা জানান দেবার জন্যে রাজাকে যুদ্ধযাত্রা করতে হবে। যুদ্ধটা রাজ্যের স্বাস্থ্য ও গৌরব বৃদ্ধি করে। তাই, আমার ইচ্ছে, শুভদিন দেখে অচিরেই তুমি দিগ্বিজয়ে যাত্রা কর।

ভীষ্মের কথাগুলো তার কাছে নতুন অর্থ বহন করে আনল। শরীর ও হৃদয় জুড়ে বেজে যাচ্ছিল আশার নাকাড়া। সেই রহস্যময় অনুভূতির মধ্যে বাস্তব হারিয়ে গেল। এই অবোধ কল্পনার কোন মানে হয় না। তবু স্বপ্ন থেকে যায়। মানুষ তো স্বপ্ন নিয়ে বেঁচে থাকে। নিজের চিন্তায় বিভোর হয়ে গেল ধৃতরাষ্ট্র।

গান্ধারী অনেকক্ষণ ঘুমিয়ে পড়েছে। অঘোরে ঘুমোচ্ছিল। নিস্তব্ধ রাতে তার শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শোনা যাচ্ছিল।

রাত আস্তে আস্তে গভীর হচ্ছিল।

ঘুম এল না ধৃতরাষ্ট্রের। এপাশ-ওপাশ করছিল। পাশ ফিরল। তারপর উঠে বসে রাতের শব্দ শুনতে লাগল। চারধার থেকে ঝরনার মত ঝিঁঝিঁ ডাকছে একটানা। আর এক অস্ফুট আলোড়নের শব্দ শুনতে পায় শরীরের ভেতর।

পাণ্ডু দিগ্বিজয়ে যাত্রা করলে তার শূন্যস্থান পূর্ণ করতে ভীষ্ম কোন বিতর্কে গেল না। বিশাল সাম্রাজ্য পরিচালনার ভার নিজের হাতেও রাখল না। কারো কিছু বোঝার আগেই পাণ্ডুর স্থলাভিষিক্ত করল ধৃতরাষ্ট্রকে। আচমকা রাজা হওয়ার সংবাদে ধৃতরাষ্ট্রের মনে অনেক অনুভূতি জাগল যা আগে কখনও মনে হয়নি। পিতামহ ভীষ্মকেই তার বড় আপন আর নিজের মনে হল।

ধৃতরাষ্ট্রের গলার স্বর শুনতে পেয়ে গান্ধারী দৌড়ে এসে তার কোমড় জড়িয়ে ধরল। তার বুকের ওপর মাথা রেখে বলল : কেমন খুশি তো!

গান্ধারীর দু'গালে হাত রেখে ধৃতরাষ্ট্র তার মুখখানা নিজের মুখের খুব কাছে তুলে ধরে শ্বাসরুদ্ধ উৎকণ্ঠায়, হতাশ গলায় বলল : স্বপ্ন থেকে বাস্তবে ফেরার মধ্যে যে এত কষ্ট লুকিয়ে থাকে তা তো জানি না। এই মুহূর্তে আমার ভীষণ ভয় করছে গান্ধারী। সামনে আমার কঠিন পরীক্ষা। কিন্তু সাফল্যের কোন প্রতিশ্রুতি নেই। আমার ভবিষ্যৎ এখনও অন্ধকারে ঢাকা। পাণ্ডু ফিরে এলে আবার যে কে সেই অবস্থা। মাঝখানে কয়েকটা দিনের জন্যে আমার রাজত্ব করে কী লাভ? মনে হচ্ছে, পিতামহ বোধ হয় আবার একটা ভুল করলেন। আমি তাঁর ভুলের মাশুল।

ধৃতরাষ্ট্রের উদ্বিগ্ন উৎকণ্ঠায় গান্ধারীর বুকের ভেতরটা কেঁপে গেল। চিত্ত আলোড়িত হল। তবু মন দিয়ে কথাটা জানতে পারল না। মৃদু ভর্ৎসনা করে বলল : ছিঃ, এমন কথা মনে করাও পাপ। এই মিথ্যে জীবনের বুকের শূন্য অন্ধকার গহ্বর থেকে অন্য জীবনের আলোকিত প্রান্তরের দিকে তিনি তোমাকে নিয়ে যেতে চান। তোমার সামনে তার সুযোগ সৃষ্টি করেছেন। এখন ক্ষমতা, যোগ্যতা

এবং বুদ্ধি দিয়ে নিজেকে তুমি রক্ষা কর। তুমি যদি নিজেই নিজেকে রক্ষা করতে না শিখে থাক তাহলে পিতামহের সাধ্য নেই বাইরের জগতের নানা বাধা-বিপত্তির আক্রমণ থেকে তোমাকে সর্বদা রক্ষা করে। সিংহাসন তোমার যোগ্যতা পরীক্ষার উপলক্ষ মাত্র। পাণ্ডুর সিংহাসন ধরে রাখার তৎপরতা, বুদ্ধি, কৌশল এবং সচেতনতাই তোমাকে উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূরণের দিকে সবেগে টেনে নিয়ে যাবে।

ভীষণ আনন্দে হৃদয় মথিত হল ধৃতরাষ্ট্রের। একটা সুখের ভেতর ডুবে গিয়ে বিপুল প্রত্যাশা নিয়ে বলল : গান্ধারীর তুমি বলছ?

আমি কেন বলব? এ হল জীবনের নিয়ম। মানুষের স্বভাব। তার প্রবৃত্তিগত দিক। উচ্চাকাঙ্ক্ষার ধর্ম হল ভেতর থেকে বাইরের দিকে, অন্ধকার থেকে আলোর দিকে, আপাত অসত্য থেকে সত্যের দিকে নিয়ে চলে প্রাণোচ্ছল ঝরণার চলকানো জলের মত।

চমকানো ভাল লাগার বিস্ময়ে উচ্চারণ করল : গান্ধারী!

গান্ধারী হাসি হাসি মুখ করে বলল : উহুঁ, বল রাজমহিষী!

ধৃতরাষ্ট্র মন্ত্রণাকক্ষে শকুনিকে ডেকে পাঠিয়েছিল। সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠতে উঠতে শকুনির মনে হল, আমি কেন যাচ্ছি? একদিন ভীষ্ম তাদের গোটা পরিবারকে অপমান করেছিল। পিতাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল এই অপমানের প্রতিশোধ নেবে। কিন্তু এখনও তা করা হয়নি। অবশ্য সুযোগ আসেনি। ধৃতরাষ্ট্র এখন রাজা। প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার এটাই হল সুবর্ণ সময়। কিন্তু গান্ধারীর কথা ভাবলে সে ভীষণ সংকুচিত হয়ে পড়ে। ধৃতরাষ্ট্র তো গান্ধারীর স্বামী। তার তো ভগ্নীপতি। এদের ওপর সে প্রতিশোধ নেবে কেমন করে? ভুল-ত্রুটি যদি কিছু করে থাকে সে তো ভীষ্ম। ধৃতরাষ্ট্র সম্পূর্ণ নিরপরাধ। বড় অসহায় বেচারী। তার ওপর প্রতিশোধ নিলে অধর্ম হবে। ধৃতরাষ্ট্রের ক্ষতি হলে গান্ধারীই দুঃখ পাবে। গান্ধারীর কষ্ট সে দেখতে পারবে না। মনের উত্তাপটা সহসা কমে এল।

শকুনি ধীরে ধীরে সিঁড়ি ভাঙ্গতে লাগল। মনের মধ্যে আবার প্রশ্ন : কেন যাচ্ছি? পরক্ষণে আবার আগ্রহ বোধ করল। ধৃতরাষ্ট্রের একঘেয়ে ঘটনাহীন জীবনে একটা কিছু অন্যরকম যদি ঘটে ঘটুক না।

মন্ত্রণাকক্ষে ধৃতরাষ্ট্র এবং গান্ধারী মুখোমুখি বসে। দ্বারের সামনে দাঁড়িয়ে শকুনি কয়েকমুহূর্ত স্থির হয়ে দেখল তাদের। ধৃতরাষ্ট্রের সাজ-পোশাক নজর কেড়ে নিল। রাজার সাজ। মাথায় মুকুট। বাহুতে বলয়, কব্জিতে মণিবন্ধ, কানে সোনার কুণ্ডল, কণ্ঠে মণিহার, পরনে বিশুদ্ধ রেশমীর ওপর মুগার বুটি দেওয়া দারুণ একখানা কাপড়। কাপড়ের সঙ্গে মিলিয়ে চুমকির কাজ করা জামা। ভীষণ ভাল লাগছিল ধৃতরাষ্ট্রকে। শকুনি বেশ অবাক হয়ে দেখল। কিন্তু মুগ্ধ হয়ে গেল না। একটু ইতস্তত করে শকুনি বলল . আমি শকুনি। হঠাৎ জরুরী তলব কেন তোমার?

ধৃতরাষ্ট্রের গলায় আহ্বানের সুর। বলল : এস ভাই। দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ করে, কাছে বস। এ পুরীতে আপন বলতে তো তুমি আর পিতামহ। পিতামহের সঙ্গে সব কথা'ত হয় না আর। কেবল তোমার কাছে আমার কোন সংকোচ নেই।

শকুনি ধীরে ধীরে নিঃশব্দে দরজাটা বন্ধ করে দিল। গান্ধারীর দিকে একটু তাকাল। মাথায় তার রানীর মুকুট। আগের থেকে অনেক মলিন, আর শীর্ণ হয়ে গেছে সে। চক্ষু আবরণী দিয়ে চোখ তার ঢাকা। তাকে দেখে বুকটা কেমন করে উঠল। চোখের চাহনিতে বিনম্র কোমলতা নামল। নিজের অজান্তে চাপা দীর্ঘশ্বাস পড়ল।

গান্ধারী অন্ধের মত হাতড়াতে হাতড়াতে তার দিকেই আসছিল। শকুনি দু'কদম এগিয়ে এসে তাকে ধরল। নিজের জায়গায় বসিয়ে দিল। গান্ধারী শকুনির দুটো হাতের ওপর মুখ রাখল অনেকক্ষণ। ভগ্ন কণ্ঠে জিগ্যেস করল : কেমন আছ দাদা? অভাগিনী ভগ্নীর একটু খোঁজ তো করতে পার। দুটো সুখ-দুঃখের প্রশ্ন তো করতে পার?

শকুনি নিরুত্তর। ধৃতরাষ্ট্রের দিকে তাকিয়ে বলল : কতক্ষণ এসেছ?

তুমি আসার কিছু আগেই এসেছি। তোমার কথা বল।

বা রে, আমি তো তোমার দরকার শুনতে এসেছি।

আমার দরকার অনেক। তার আগে, আমার সাফল্যের একটা হিসাব দাও বন্ধু। খুব অবাক লাগছে, তাই না? জীবনে যা কিছুই করা যাক না কেন, সব কিছুরই জন্যে আলাদা আলাদা করে হিসেব করতে হয়। হিসেবের ভুল হলে তার জন্যে জীবনভোর মূল্য দিতে হয়। হিসেব-নিকেশ করেই মানুষের সব চাওয়া ভরপুর হয়ে ওঠ।

নিজের প্রশংসা শুনতে চাও? খুব ভাল লাগে, তাই না?

না বন্ধু, হিসেব মেলাতে চাই।

তোমার কী হয়েছে, বল তো?

আমার জমানা আর খুব বেশি দিনের নয়।

তার মানে?

পাণ্ডু ফিরছে।

তুমি তাকে রাজ্য ফিরিয়ে দেবে?

বারে! সিংহাসন তো তার।

পরিহাস ছেড়ে সত্য কথা বল। একজন মানুষ কিছু করে কোন কিছুর প্রত্যাশা নিয়ে। প্রত্যাশা পূরণ হয়ে গেলে প্রচণ্ড সফল মানুষও ব্যর্থ হয়ে যায় হয়ত।

তুমি বলছ কী? একদিন নৃপতি নির্বাচনের রহস্যময় খেলায় রাজার ব্যক্তিত্ব, বুদ্ধিমত্তা, বিচক্ষণতা এবং নেতৃত্বের ক্ষমতার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। নৃপতি নির্বাচনের সময় মানুষের চিত্ত প্লাবিত করার আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব অবশ্যই একটি পূরণীয় শর্ত ছিল। নৃপতির পরনির্ভরশীল হওয়া রাজ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। এই একটি প্রশ্নে তোমরা সব দাবি খারিজ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তোমার সাফল্য তাদের চোখ খুলে দিয়েছে। মানুষের কর্মক্ষমতা, উদ্যোগ এবং নিষ্ঠা থাকলে সে মানুষের সাফল্য কেউ কেড়ে নিতে পারে না। পাণ্ডুর এসব কিছুই ছিল না। তোমার ছিল বলেই সার্থক রাজা হতে পেরেছে। এই সাফল্য, সার্থকতা কেউ এনে দিতে পারে না। তোমার নিজের কৃতিত্বে, রাজনৈতিক প্রজ্ঞায়, আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বে এবং নেতৃত্বের গুণে হস্তিনাপুরের রাজনীতিতে এবং পররাষ্ট্রনীতিতে এক নতুন প্রাণাবেগ সঞ্চারিত হয়েছে। এ ব্যাপারে পাণ্ডুর কোন ভূমিকা নেই। কিন্তু তুমি ভারতের রাজনীতিতে হস্তিনাপুরের একটা বিশেষ স্থান করে দিয়েছ। এই অল্প সময়ের মধ্যে বিভিন্ন রাজ্যের সঙ্গে দূত বিনিময় করে প্রতিবেশী রাজ্যগুলির সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সহযোগিতা ও মেলামেশার এক নতুন দিগন্ত তৈরি করেছ। অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা বাড়িয়ে তুলতে নতুন নতুন বাণিজ্য-চুক্তি করেছ। তোমার সাফল্যই তোমাকে নতুন শক্তিজোটের অন্যতম নায়ক করে তুলেছে। এ কি কম কথা! অন্ধ হয়েও তুমি যে পরনির্ভরশীল নও একথা প্রমাণ হয়ে গেছে। তোমার রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, বিচক্ষণতা, কর্তব্যনিষ্ঠা, বিবিধ জনকল্যাণমূলক কাজ তোমাকে জনগণের খুব কাছে এনেছে। তোমার জনপ্রিয়তা শত্রুও ঈর্ষা করে। জনগণের অনুরাগ শ্রদ্ধা এবং আস্থা তোমার সিংহাসনের ভিতকে মজবুত করেছে। পাণ্ডুকে আর কেউ রাজা করতে আগ্রহী নয়। জনগণের অন্তরের কথা জানতে আমি নিজে প্রচ্ছন্নভাবে নগরে গ্রামে ঘুরেছি। সর্বত্র এক ছবি। তুমি নিশ্চিন্ত থাক। সব দেখেশুনেই পাণ্ডুই হয়ত সিংহাসনের দাবি থেকে সরে দাঁড়াবে।

স্তব্ধ বিস্ময়ে ধৃতরাষ্ট্রের বাক্‌রোধ হল। কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তার নাভিমূল থেকে উৎসারিত হল একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস। বলল : ক্ষমতার নেশা সুরা আর রূপসী রমণীর কাঞ্চন যৌবনের মত নেশাপ্রদ। রমণীর নেশা কাটে কিন্তু ক্ষমতার মাদকতা কাটতে চায় না। ক্ষমতার তপ্ত স্বাদ পাণ্ডু কি ভুলতে পারবে?

তুমি তাকে সিংহাসন ফিরিয়ে দেওয়ার কথা ভাবছ কি? অধিকার হাতে পেয়ে যে ফিরিয়ে দেয়, সে পাগল, না হয় নির্বোধ।

জানি। কিন্তু এক আকাশে চন্দ্র সূর্য যেমন ধরে না, তেমনি পাণ্ডু ও আমার একত্র সহাবস্থান হয় না। এখন কী করব বল?

বিপুল জনসমর্থন তোমার রক্ষাকবচ।

তাও জানি। দুর্বলতার রন্ধ্রপথ দিয়ে কোন অসতর্ক মুহূর্তে শত্রু আমার গোপন অন্তঃপুরে হানা দিতে পারে—এটা বন্ধ করতে হবে। ধৃতরাষ্ট্র কয়েকটা মুহূর্ত চুপ করে থাকল। তারপর শশব্যস্ত হয়ে বলল : গান্ধারী তুমি কিছু বলছ না।

গান্ধারী নিস্পৃহভাবে বলল : আমি শুনছি। শ্রোতারও দরকার হয়।

শকুনি, শুনলে তোমার ভগিনীর কথা। অথচ একদিন ও বলেছিল, মানুষ নিজের ভাগ্য নিজেই তৈরি করে। চেষ্টা করলে তার ভাগ্য জয় করা কোন অসম্ভব ব্যাপার নয়। অন্তত কিঞ্চিত পরিবর্তন তো ঘটাতে পারে বলেই তোমার বিশ্বাস। আজ যখন দুর্ভাগ্য জয় করলাম তখন তুমিই ভীষণ নীরব। গান্ধারী তুমি চুপ করে থেক না।

শকুনি বলল : ভগিনী, ধৃতরাষ্ট্র তোমার কাছে কিছু শুনতে চায়। তুমি চুপ করে থাকলে সে তো কিছুই শুনতে পারে না। হ্যাঁ-না কিছু বল। তোমার বোঝা উচিত, পাণ্ডুর প্রত্যাগমনে তার ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। আশার দীপ নিভে যেতে বসেছে। তার মনের সুখ-শান্তি নষ্ট হচ্ছে। এসব জেনেও যদি চুপ করে থাক তাহলে বেচারীর সান্ত্বনা বলে কিছু থাকে না। একটু থেমে শকুনি পুনরায় বলল : রাজার সাজ-সজ্জা, পোশাক-পরিচ্ছদ নিজের হাতে খুলতে কার না কষ্ট হয়? দু'দিনের জন্যে রাজার ভূমিকার অভিনয় করার কথা, কেউ ভাবে কখনও? গান্ধারী তুমি চুপ করে থেক না। কিছু বল?

গান্ধারী নীরব। কিন্তু সেও চিন্তা করছিল। ভেবে ভেবে তার চিত্ত আলোড়িত হচ্ছিল। তাই কথা বলতে কেবলই দেরী হচ্ছিল। কোথা হতে কীভাবে আরম্ভ করলে সব দিক রক্ষা পায় সেই কথাই ভাবছিল। বহুক্ষণ পর একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল : আমি নিজের কথাই ভাবছিলাম। রাজ্য ও রাজনীতিতে ভ্রাতা-ভগ্নী বলে কিছু নেই। ছোটবেলার সেই মিষ্টি-মধুর প্রণয় সম্পর্কও স্বার্থের সংঘাতে তিক্ত হয়ে যায় এখানে। এ যেন জঙ্গলের জায়গা। এর চেয়ে জঙ্গল ভাল। সেখানে বেঁচে থাকার লড়াই আছে কিন্তু কর্তৃত্বের সংঘাত নেই। কর্তৃত্ব, আধিপত্য, অধিকারবোধ মানুষের সম্পর্ককে নোংরা করে দেয়। এসব আমার ভাল লাগে না। তবু এর মধ্যে তো আছি। একে তো এড়িয়ে থাকতে পারব না। স্বামীর উচ্চাশা ব্যর্থ হয়ে গেলে যেমন বুক ফাটে, তেমনি তার বঞ্চনার দিকে তাকাতেও কষ্ট হয়। আবার তার দুঃখটাও ভুলতে পাবি না, নিজের বিবেচনাবোধও ত্যাগ করতে পারছি না। সংশয়ের সংকটে ভুগছি। কি বললে ভাল হয়, সবদিক রক্ষে পায় আমি ভাবতে পারছি না। সব মেয়ের মতই স্বামীর সুখে আমিও সুখী। তার গর্বে আমিও গর্বিত হব।

ধৃতরাষ্ট্র আক্ষেপ করে বলল : বিধাতার কাছে আমি কি পেয়েছি? অন্ধত্ব আমার জীবনের অভিশাপ। সিংহাসন আমার অভিশপ্ত জীবনের মরূদ্যান। আর তুমি আমার মরূদ্যানের জীবনদায়িনী স্নিগ্ধ সুশীতল ছায়া। আমরা অন্ধ জীবনে শুধু এটুকুই পাওয়া। এই পাওয়াটুকু আমি হারাতে চাই না।

গান্ধারী ক্লান্ত গলায় অস্ফুট স্বরে বলল : তুমি কী চাও?

গান্ধারীকে বড় দূরের মানুষ মনে হল ধৃতরাষ্ট্রের। কোন দূর গ্রহের মানুষ যেন সে। তাকে ধরা যায় না। ছোঁয়া যায় না। কেবল চেয়ে থাকা যায়। ধৃতরাষ্ট্র উদাস বিষণ্ণ গলায় বলল : উদ্ভিদের মত মাটি কামড়ে নিজে দাঁড়িয়ে আছি। সে মাটিতে পাণ্ডুর কোন স্থান নেই। তাকে হস্তিনাপুর ছেড়ে যেতে হবে। শতশৃঙ্গ পর্বতে আমি তার আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে রেখেছি। তুমি শুধু অনুমোদন কর।

শকুনি উল্লসিত হয়ে বলল : চমৎকার ব্যবস্থা। সাপও মরবে, লাঠিও ভাঙবে না।

কিন্তু গান্ধারীর কোন বাক্যস্ফূর্তি হল না। বুকের গভীর থেকে একটা শ্বাস পড়ল। হাহাকারের শব্দ নিয়ে ঘরটা বিধুর হয়ে গেল।

তিন

পাণ্ডুর শতশৃঙ্গ পর্বতে গমনের এক বছর পরের ঘটনা।

কুন্তী পুত্রের জননী হয়েছে, বিদুরই এ সংবাদ গান্ধারীকে দিল, প্রথম। এরকম সংবাদ শোনার জন্যে গান্ধারী প্রস্তুত ছিল না। তাই, খবরটা তাকে খুব চমকে দিল। ভুরু কিছু কুঞ্চিত হল। দু'চোখ টান টান করে বিদুরের দিকে তাকিয়ে রইল বেশ কিছুক্ষণ। লজ্জায়, ধিক্কারে তার শরীর কন্টকিত হল। গান্ধারী কিছুক্ষণের জন্য কথা বলতে পারল না। তারপর মৃদুস্বরে বলল ওঃ! কিন্তু—

কিন্তু, কেন করছ বৌঠান? বিদুর বলল।

মানে, ওরা কার সন্তান?

ঈশ্বরের।

দেবর, আমি কি বলতে চাইছি, নিশ্চয়ই বুঝেছ? আমি তো জানি, ও কোন দিন মা হতে পারবে না।

বিদুর অদ্ভুত ভঙ্গি করে হাসল। গান্ধারীর কথাটা ভীষণভাবে সত্য। কারণ, পাণ্ডুর কোন প্রজনন ক্ষমতা ছিল না। হস্তিনাপুরে সকলে সেই কথা জানে। কুন্তীর পুত্রলাভের ঘটনায় গান্ধারী তাই একটু হতবাক হল। বিদুর কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে গান্ধারীর বিস্ময়ের প্রত্যুত্তরে বলল : পাণ্ডুর ইচ্ছায় ও সম্মতিতে কুন্তী ধর্মরাজের সঙ্গে মিলিত হয়। ধর্মরাজের ঔরসে জন্ম নিল পাণ্ডুর ক্ষেত্রজ পুত্র যুধিষ্ঠির।

গান্ধারীর বুকের ভেতর একটা মৃদু তরঙ্গ বয়ে গেল। মনে হল, কুন্তী যেন কিছু একটা ঘটাতে চাইছে। এই সন্তান হওয়া তার সংকেত কেবল। কুন্তীর লক্ষ্য হস্তিনাপুরের সিংহাসন। সিংহাসন নিয়ে যে লড়াই পাণ্ডু ও ধৃতরাষ্ট্রের মধ্যে ছিল, তাকে সে পরের প্রজন্মের মধ্যে টেনে আনল। উত্তরাধিকারী নিয়ে নতুন বিতর্ক ও বিবাদ সৃষ্টির ক্ষেত্রে কুন্তী তার চেয়ে একধাপ এগিয়ে রইল। একথা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার বুকে ঈর্ষার উদয় হল। কুন্তীকে তার প্রথম প্রতিপক্ষ মনে হল। কুন্তীর প্রতি তার যে গভীর ভালবাসা, প্রীতি এবং সখ্য ছিল হঠাৎ করে তার পাহাড়-চূড়া থেকে গড়িয়ে ঘৃণার উপত্যকায় গিয়ে পড়ল। কুন্তীর ওপর ঘেন্না হল। তার সঙ্গে কুন্তীর এতদিনের সম্পর্কটা হঠাৎ অশুচি হয়ে গেল। অথচ এরকম মনে হওয়ার কোন কারণ নেই। তবু বেশ একটু বিতৃষ্ণায় ভরে গেল তার ভেতরটা। ক্ষুব্ধ গলায় বলল : ছোট'র ভয়-ডর নেই। এত নির্লজ্জ, বেহায়া হতে তার রুচিতে বাঁধল না? ছিঃ লজ্জা! কোন মুখে বলবে, কুন্তীর পুত্র হয়েছে? এতে কি বংশের গৌরব বাড়বে?

বিদুব মনে মনে প্রমাদ গুনল। জবাবে কী বললে ভাল হয় ভেবে পেল না। তর্কে প্রবৃত্ত হওয়ার ইচ্ছে ছিল না তার। গান্ধারীর প্রতিক্রিয়া দেখার জন্য সে চুপ করে চেয়ে রইল। গান্ধারীর চোখ তার চোখের ওপর স্থির। তাকে বেশ চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন দেখাল।

গান্ধারী ভাবছিল, কুন্তী কৌশলে কৌরব বংশের সর্বাগ্রজ পুত্র সন্তানের জননী হল। কথাটা গানের কলির মতই বার বার তার কানের পর্দায় বাজছিল। আর বুকটা কেমন করছিল। তার যন্ত্রণা সব বুকের ভেতর। এই যন্ত্রণার কোন ব্যাখ্যা নেই।

কুন্তীর পুত্র হওয়ার সংবাদে সে যে এতটা বিচলিত হবে, বিভ্রান্ত বোধ করবে ভাবতেও পারিনি। মুহূর্তে একটা বিরাট ওলোট-পালট হয়ে গেল তার অনুভূতির রাজ্যে। প্রত্যাশায় ব্যথা লাগা চমকানো কষ্টে ও হতাশায় বলল : দেবর, তুমি যাও। আমায় একটু একা থাকতে দাও।

বিদুর তবু দাঁড়িয়ে রইল। নানা শব্দ, তরঙ্গ, গন্ধ তার চেতনার মধ্যে চারদিক থেকে উৎক্ষিপ্ত হয়ে ছড়িয়ে যাচ্ছিল মস্তিষ্কের অভ্যন্তরে। সে দেখতে পাচ্ছিল গান্ধারীর বুকে ঝড়। সেই ঝড়ের ধাক্কায় গান্ধারীর বুকের মধ্যে দরজাটা হঠাৎ খুলে গেল। কিন্তু এ কোন গান্ধারীর মূর্তি দেখল? এত তার চেনা গান্ধারী নয়। তা'হলে কে? গান্ধারীর সত্তার ভেতর লুকনো চিরন্তনী নারী হঠাৎ তার ঈর্ষা পরশ্রীকাতরতা নিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

গান্ধারী এই প্রথম অনুভব করল, সংসারে মেয়েমানুষের ভালবাসা দুটো রূপ পাশাপাশি, ঘেঁষাঘেঁষি বাস করে। একটা জায়া, অন্যটি জননীর। জায়ারূপে সে চারপাশে আলোয় ভরে দেয়, তার অনুরাগের আলোয় সামান্য জিনিস অসামান্য হয়ে ওঠে, প্রিয় প্রিয়তর হয়। জায়া জননী হলে জগৎটা আলাদা হয়ে যায়। বৃহৎ পৃথিবীটা তখন তার কাছে ক্ষুদ্র হয়ে যায়। মহীয়সী রমণীও সামান্য রমণীর মত ঈর্ষায়, ঘৃণায় পরশ্রীকাতরতায় সাধারণ হয়ে যায়। এজন্যে কোন নারীর আপসোস কিংবা অনুশোচনা হয় না। অন্তত নিজের ভেতর সে'রকম কোন প্রতিক্রিয়া টের পেল না। বরং কেবল মনে হতে লাগল, ভাবী সন্তানের জননী সে। সন্তানের স্বার্থকে নিরাপদ করার চিন্তাই বারংবার তার মনে যাতায়াত করতে লাগল। কুন্তী-পুত্র যেন তাদের পথ আগলে দাঁড়িয়ে রইল। আর একটা দুরন্ত ঈর্ষায় তার জননী সত্তা যেন জ্বালা করতে লাগল।

গান্ধারীর মন অর্ন্তমুখী হল। নিজেকে দেখার চোখ তৈরি হল। নারীর মন বিধাতা একটু অদ্ভুতভাবেই তৈরি করেছে যেন। তার দুটি পৃথক সত্তার পাশাপাশি ঘরের ভেতর দিয়ে ঘরে যাওয়া-আসার কোন দরজা নেই। তার কোন জানালাও নেই। নিজের অনুভূতি জগতের বিস্ফোরণ দিয়ে সে তা টের পেল। মনের ভেতর এই যে দুটি পৃথিবী জননী হয়েই জানল। দুই জগতের চলার ছন্দ মেলাতে পারেনি বিধাতা। তাই বোধ হয়, কুন্তীর পুত্র হওয়ার সংবাদে তার তালভঙ্গ হল।

তার পেটেও সন্তান এসেছে। নিভৃতে নিজের মনের জানলায় বসে তাকে নিয়ে কত কি চিন্তা করে, কত স্বপ্ন দেখে। বিদুরের বার্তা তার আশাভঙ্গ করল। হস্তিনাপুরের সিংহাসনের ওপর ধৃতরাষ্ট্র এবং তার পুত্রদের বৈধ উত্তরাধিকারের দাবি কেড়ে নেওয়ার উদ্দেশ্যেই কুন্তী লজ্জাজনক ব্যভিচারও করতেও কুণ্ঠিত হয়নি। গান্ধারী তার প্রজ্ঞা দৃষ্টি দিয়ে দেখতে পেল কুরুবংশের সিংহাসন নিয়ে এক নিঃশব্দে গোপন সংঘাতের জমি তৈরি করছে কুন্তী। এই পুত্র তার সূচনা। অমনি ঘৃণায়, ঈর্ষায়, রোষে ও হতাশার এক জ্বালাধরা অনুভূতিতে তার শরীর রি-রি করতে লাগল।

বহুক্ষণ ধরে তার একটা কথাই বার বার মনে হচ্ছিল, কুন্তীর এ পুত্র বৈধ নয়। কুরুবংশের অনুমোদিত কোন ক্ষেত্রজ পুত্র নয়। কুন্তীর নির্লজ্জ স্বেচ্ছাচার এবং ব্যভিচারের এক কলংক। এই পুত্র পাণ্ডু জন্ম দেয়নি। পাণ্ডুর স্ত্রী কুন্তীর মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছে মাত্র। এই ছেলে তো পাণ্ডুর নয়। এই বংশেরও কেউ নয়। এর সঙ্গে হস্তিনাপুরের কোন সম্পর্ক নেই। তার সঙ্গে সিংহাসনের উত্তরাধিকারীত্বেরও কোন প্রশ্ন জড়িত থাকতে পারে না। ধর্মাত্মা বিদুরের সেকথা অজানা থাকার নয়। এই পরিবারের একজন হয়েও তিনি নির্বিকার। কুন্তীর পুত্রলাভের ঘটনাকে নিন্দা পর্যন্ত করল না। অথচ এরকম একটা সংবাদ হস্তিনাপুরের সুনাম নষ্ট হওয়ার পক্ষে যথেষ্ট, বিদুর সেকথাটা খুব চিন্তা করেছে বলে গান্ধারীর মনে হল না। বিদুরের কথার ভেতরেই সব রহস্য লুকনো। কিন্তু গান্ধারী সে রহস্য ভেদ করতে পারল না। বুকজোড়া ভয়, উৎকণ্ঠা, দ্বিধা, এলোমেলো হাজার চিন্তায় সে বিবশ হয়ে বসে রইল। মনটা ভীষণ তেতো হয়ে গেল। কিছুই ভাল লাগল না। কথা বলতে ইচ্ছা করছিল না। চুপ করেছিল।

গান্ধারীকে নীরব এবং নির্বাক দেখে বিদুর ডাকল : বৌ-ঠান। তার শুকনো ঠোঁটের ফাঁকে এক আশ্চর্য কৌতুক মাখানো হাসি।

গান্ধারীর ভেতরটা ভীষণ চমকে ওঠল। গা শির-শির করল। প্রীতি ও সখ্য সম্পর্কের গর্ভে এক ফোঁটা ঘৃণা অলক্ষ্যে জমা হল। কেমন এক আচ্ছন্নতায় আক্রান্ত হল। চোখ বুজে সে নানারকম দুঃস্বপ্ন দেখতে লাগল। বিদুরের হাসির ধার সে সইতে পারল না। ক্লান্ত কণ্ঠে বলল : দেবর, তুমি এখন যাও। আমার মনটা ভাল নেই।

মাথা নেড়ে বলল : মনের কী দোষ বল? গর্ভপাত না হলে তুমিই হতে সর্বাগ্রজ কৌরব জননী। সবই বিধিলিপি। ভেবে কি হবে বল?

গান্ধারী চকিতে নিজের শরীরের দিকে চেয়ে দেখল। না, গর্ভিণীর কোন লক্ষণ বোঝা গেল না। তবু শাড়ি দিয়ে পেটটা ঢেকে বসল। মাথায় যন্ত্রণা হচ্ছিল খুব। রগের দু'পাশ একটু রগড়াল। দীর্ঘশ্বাস ফেলল খুব ধীরে। আচ্ছন্ন গলায় বলল : ভেবে কোন ফল হয় না। তবু ভাবনা হয়, ভাবনা থাকে।

বৌঠান, তোমার মন ভাল নেই। মনটা হঠাৎই খারাপ হল কেন? অকারণ মনের শান্তি নষ্ট করার মত মুর্খোমি এ সংসারে কিছু নেই। জীবনের সব কিছুকে যে সহজে মেনে না নিতে পারে তার কষ্ট, দুঃখ কোনদিন ঘোচে না। জীবন, মন নদীর মত। শুধু অনন্ত উৎসারে বয়ে যাওয়া। জীবন থেমে থাকে না। সময় স্রোতে নিঃশব্দে এগিয়ে চলে। সময় কোন কিছুতে বাঁধা থাকে না। চলাই তার ধর্ম। কিন্তু চলতে চলতে হঠাৎ যদি থেমে পড়ে কোন কারণে তা'হলে আর গতি ফিরে পাবে না। জীবনস্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কাটাতে হবে তাকে। নিজের বদ্ধ গণ্ডির মধ্যে কোন মানুষকে ধরে না! গণ্ডিবদ্ধতা মৃত্যুর নামান্তর। জীবন ধর্মের স্বাভাবিকতা হারালে আর জীবন থাকে না।

গান্ধারীর অসহ্য লাগল। দম বন্ধ হয়ে এল। মনে হল বিদুরের কাছে সে ধরা পড়ে গেছে। ভীষণ ভয়ের এক অনুভূতি তার চোখের চাহনিতে ফুটে ওঠল। শাপগ্রস্তা প্রস্তরীভূত দেবীর মত তাকে দেখাচ্ছিল। হঠাৎ তীব্র বিতৃষ্ণায় তার কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে এল। বলল ঃ দেবর, মানুষের জীবনে কিছু কিছু শ্রান্তি আছে, কিছু কুসুমগন্ধী ক্লান্তি আছে, যা পরম প্রার্থনার। নদী আর সময়ের প্রবাহমানতা দিয়ে তার মিল খোঁজার মত মুর্খোমি মানুষের জীবনে আর কিছু নেই। সময় প্রবাহ, নদীর প্রবাহ, জীবন প্রবাহ আলাদা আলাদাভাবে ভাগ করা সব। সব ভাগই ভিন্ন। জীবন প্রবাহের শৈশব যৌবন, বার্ধক্য সব কি এক? তা'হলে সকলে বার্ধক্য পর্যন্ত পৌঁছতে পারেনা কেন?

বিদুর চমকে চোখ তুলে চাইল। অকাট্য যুক্তি। বিদুরের দু'চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেই নিবে গেল। চোখের তারায়, ভুরুতে একটু বিব্রত ভাবও খেলে গেল।

জানলার পর্দার ওপর ফাঁক দিয়ে বিকেলের পড়ন্ত কমলা রঙের রোদ এসে পড়েছিল এক চিলতে। হঠাৎ গান্ধারীর চোখ পড়ল দেয়ালে। যেখানে তার ও ধৃতরাষ্ট্রের যুগল প্রতিকৃতি একটি সুন্দর সুদৃশ্য ফ্রেমে বাঁধানো অবস্থায় ঝুলছিল। তাদের বিয়ের পরেই ধৃতরাষ্ট্র শিল্পীকে দিয়ে আঁকিয়েছিল। দু'জনেরই প্রতিকৃতি সমান সুন্দর। শীতের দুপুরের মত সুন্দর স্নিগ্ধ, উজ্জ্বল, রূপময়। তাদের উভয়ের শরীরে রূপ-যৌবন ঢলঢল করছিল। কিন্তু তা চক্ষুবন্ধনীর জন্যে মুখের সৌন্দর্য এবং শ্রী ঢাকা পড়েছিল। ধৃতরাষ্ট্রের পাশে তাকে কিছু অসুন্দর দেখাচ্ছিল। ধৃতরাষ্ট্রের দীপ্তিহীন নিষ্প্রভ দুটি আঁখির ওপর তার অপলক দৃষ্টি কিছুক্ষণ স্থির হয়ে রইল। আকস্মিক কি যেন হয়ে গেল সেখানে। শয্যার ওপর আছাড়ে পড়ল গান্ধারী। বালিশে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। হঠাৎ শব্দ করে কেঁদে ওঠল। বালিশের মধ্যে মুখডুবিয়ে বুকের ভেতর পোষা দুঃখটাকে জীবন্ত সমাধি দেওয়ার চেষ্টা করল প্রাণপণ।

বিদুর কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখল সে দৃশ্য। তারপর ক্ষীণ গলায় বলল : বৌঠান তা'হলে আমি এখন আসি।

বিদুরের প্রস্থানের পরেও গান্ধারী ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদল। নিজেকে তার বড় নির্বোধ মনে হল। অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রকে আবেগের বশে বিয়ে করা তার ভুল হয়েছে। কুন্তীকে শতশৃঙ্গ পর্বতে যেতে দেওয়াও তার ভুল হয়েছে। এই ভুলের রন্ধ্রপথ দিয়ে শনি প্রবেশ করেছে তার ঘরে। গান্ধারী করুণ দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল : নিয়তি। সব নিয়তি।

দিন কয়েক মাথার সত্যিই ঠিক ছিল না গান্ধারীর। সেই কয়েকটা দিন সে ছিল ভীষণ অস্বাভাবিক। ঘরে একা একা বসেই কাঁদত, কখনো হাসত; কখনো চুপ করে বসে থাকত। কিছুই ভাল লাগত না। কী ভাবত, নিজেই ভাল করে বুঝে উঠতে পারত না। কখনো একটা জিনিস নিয়ে সম্পূর্ণ ভাবতে পারত না। এক প্রসঙ্গ থেকে অন্য প্রসঙ্গে চলে যেত ভাবনা। কুন্তীর কথা যখন ভাবত তখন বিদুরের মুখ মনে পড়ে যেত। হঠাৎ তারপর মহর্ষি বেদব্যাস এবং পিতৃব্য ভীষ্মের মুখখানা ভেসে ওঠত। ধৃতরাষ্ট্রের জন্যে ভাবনা হত তখন। বুকের মধ্যে না হওয়া একটা বাচ্চার অশ্রুত কান্নার শব্দ শুনতে পায়। অমনি একটা শিহরন আর ভয় খেলা করে গান্ধারীর শরীরের ভেতর।

ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে কয়দিন হল গান্ধারী কথা বলে না। কিন্তু তার এই আকস্মিক ভাবান্তরের কারণটা জানতেই ধৃতরাষ্ট্র একটু ক্ষুব্ধ কণ্ঠে অনুযোগ করল। বলল : সারাজীবন ছদ্মবেশ পরে কাটিয়ে দেয়া যায় না গান্ধারী। তুমি যে একটা ভীষণ কষ্টে দিন কাটাচ্ছ আমার চেয়ে বেশি কে জানে?

ধৃতরাষ্ট্রের অভিযোগে কেঁপে উঠল গান্ধারীর বুক। বলল ঃ তোমার অভিযোগের কোন জবাব হয় না। তবে, একটা কষ্টে আমার দিন কাটছে সত্যি। কিন্তু কষ্টের কারণটা জানতে চেয়েছ কোনদিন?

অনেকবারই ইচ্ছে হয়েছিল। কিন্তু তোমার অনিচ্ছটাকে খুঁচিয়ে কিছু করতে চাইনি। এটা অবশ্য আমার অপরাধ।

তোমার অপরাধ অনেক।

আমাকে ধাঁধায় ফেললে।

তোমার মত বোকাই ধাঁধায় পড়ে!

আশ্চর্য! বোকামিটা বুঝিয়ে বলবে'ত?

তোমার যদি কিছুমাত্র বুদ্ধি থাকত, পাণ্ডুকে শর্তশৃঙ্গ পর্বতে পাঠাতে না।

পুরুষের রাজনীতি তুমি বুঝবে না।

তোমার চতুর রাজনীতি মেয়েমানুষের কোন্দল-নীতির কাছে যে কত তুচ্ছ তার খোঁজ রাখ কি?

রাজার কাজের সমালোচনা কিন্তু কম দুঃসাহসের কথা নয়!

তাই বুঝি! নীরেট রাজা, পাণ্ডুকে শর্তশৃঙ্গ পর্বত পাঠিয়ে কতটা লাভক্ষতি করল, তার হিসেব করেছ কোনদিন?

যোগ-বিয়োগের অঙ্কটা জেনে রাখ তা' হলে মহিষী। যারা রাজ্য সিংহাসনের উত্তরাধিকারী থেকে আমাকে অন্যায়ভাবে বঞ্চিত করল এবং পাণ্ডুকে রাজা করল তাদের সব চক্রান্ত ব্যর্থ হয়ে গেছে আমার কূটনীতিতে। আমার হৃত অধিকার ও সিংহাসন পুনরধিকার করতে একবিন্দুও রক্ত ঝরল না। এ কি কম কথা! এটা লাভ নয়? হস্তিনাপুরের রাজ্য ও সিংহাসন নিয়ে রাজনৈতিক বিরোধ ও সংঘর্ষের কোন পুনরাবৃত্তি যাতে না হয় সেজন্য দুর্গম শর্তশৃঙ্গ পর্বতে পাণ্ডুকে কুন্তী ও মাদ্রী সহ নির্বাসন দিয়েছি। ওদের চলাফেরা এবং গতিবিধির ওপর সমান দৃষ্টি রাখতেই পাণ্ডু ও তার স্ত্রীদের ভরণপোষণের মাসোহারা ব্যবস্থা করেছি। এর অর্থ হস্তিনাপুরের সিংহাসনের প্রতি যতদিন আনুগত্য থাকবে ততদিনই এই সাহায্য পাবে। আনুগত্য হারানোর অর্থ উপবাস, মৃত্যু। বলতে পার, এও এক ধরনের লাভ।

একে তুমি লাভ বল? তোমার এই আপাত লাভের অন্তরালে যে বিরাট পরাজয় হল তার খোঁজ রাখ কি?

এ্যাঁ, পরাজয়! বলছ কী?

গান্ধারী মলিন একটু হাসল। বলল : তা অবশ্য ঠিক। তোমার হিতৈষী বুদ্ধিদাতার অভাব নেই। কিন্তু তবু বলব, এই বুদ্ধি যারা দিয়েছে, তারা কেউ মিত্র নয় তোমার। কিংবা তাদের দূরদৃষ্টি নেই।

গান্ধারী! তাদের শ্রদ্ধা করতে যদি না পার, সন্দেহ করে অপমান কর না।

প্রিয়তম, তর্ক নয়, বিচারের সময়। হস্তিনাপুর থেকে পাণ্ডুকে নির্বাসিত করে প্রকারান্তরে তাকে রাজনীতিতে পুনঃ প্রত্যাবর্তনের পথ করে দিয়েছ।

ধৃতরাষ্ট্রের কণ্ঠস্বর সহসা নরম হল। সবিস্ময়ে বলল : তার মানে?

এত সহজ কথাটা বুঝতে পারলে না? পাণ্ডুকে হস্তিনাপুর থেকে সরিয়ে দিয়ে নিজেকে তুমি নিষ্কণ্টক ভাবলে। কিন্তু কুন্তী তোমার পথে কাঁটা দিল। সম্পর্কের সুতোয় বাঁধা এই কণ্টকমালা তোমার আমার বুকে ফুটে শুধু রক্ত ঝরাবে, সে কথা ভেবেছ একবারও? কুন্তী যদি হস্তিনাপুরে থাকত তা'হলে এই সন্তান আসত না। ব্যভিচারিণী হত না। হস্তিনাপুরের রাজপরিবারের অভ্যন্তরে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী নিয়ে বিরোধের বীজ বপন করতে পাবত না।

গান্ধারীর মুখের ওপর ধৃতরাষ্ট্র সখেদে চিৎকার করে বলল : গান্ধারী! এসব কথা বলছ কেন?

কুন্তীর পুত্র'ত পাণ্ডুর নয়। ঐ পুত্রের সঙ্গে কুরুবংশের কোন সম্পর্ক নেই। বংশানুমোদিত কোন ক্ষেত্রজ পুত্রও নয় সে। জারজ সন্তান কোনকালে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হয় না। তুমি অকারণ ভয় পাচ্ছ।

তোমার মত আমিও যে, এসব ভাবেনি তা নয়। কিন্তু সেই ভাবনার কোন মানে নেই। পাণ্ডুর সম্মতিতে এবং অনুমোদনে যদি কুন্তী ক্ষেত্রজ পুত্র লাভ করে থাকে তা'হলে সিংহাসনের উত্তরাধিকার থেকে তাকে বঞ্চিত করবে কেমন করে? মনে রেখ. সর্বাগ্রজ কৌরব সে।

ধৃতরাষ্ট্র নির্বাক। অনেকক্ষণ বাদে একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল। বলল : সমস্যার কথাই বটে।

স্বামী, মেয়েমানুষ বলে অবহেলা কর না, শ্রদ্ধা কর। মনে রেখ, মেয়েদের একটা অতিরিক্ত ইন্দ্রিয় আছে। আগে থেকে সে বিপদ টের পায়। আমার সমস্ত অনুভূতি দিয়ে অনুভব করতে পারছি একটা ঝড় আসছে। শর্তশৃঙ্গ পর্বতের পাহাড় চূড়ায় তা কেন্দ্রীভূত হচ্ছে। একদিন হস্তিনাপুরের ওপর আছড়ে পড়বে।

ধৃতরাষ্ট্র বিভ্রান্তস্বরে উচ্চারণ করল : গান্ধারী! এক নতুন উৎপাত এল জীবনে।

এত জটিল করে দেখার কী আছে স্বামী?

তুমি পরিহাস করছ?

একটু ভাবতে বলছি। আমার অকাল গর্ভপাতের পর তারা শর্তশৃঙ্গ পর্বতে গেছে। সেখানে বছর অতিক্রান্ত হতেই তার পেটে বাচ্চা এসেছে। এর অর্থ বোঝ? কুন্তী পাণ্ডুর অপমানের প্রতিশোধ নেবে তার সন্তানকে দিয়ে। পাণ্ডুর সিংহাসনের ওপর তার ক্ষেত্রজ পুত্রের দাবি ও অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে একদিন পুত্রসহ হস্তিনাপুরে আসবে সে। তখনই টের পাবে পাণ্ডুকে নির্বাসন দিয়ে কী ক্ষতি করেছ তোমরা?

মহিষী, এরকম একটা সমস্যা আসতে পারে, আমরা কেউ ভাবেনি। ক্ষেত্রজ পুত্রর কথাটা আমাদের ভাবা উচিত ছিল। ভেবেও যে খুব একটা উপকার হত মনে হয় না। সিংহাসন তাহলে পাণ্ডুরই থাকত। ধৃতরাষ্ট্রের সম্মান, গৌরব তাতে বাড়তে না। হাতে মুকুট পেয়ে মাথায় যে পরে না, পৃথিবীতে তার মত নির্বোধদের অনেক দাম দিতে হয়। চিরদিন জেনে এসেছি ক্ষমতাই শক্তির উৎস। জয়ের রাস্তা। শকুন্তলার আংটির মত। যতক্ষণ সঙ্গে আছে ততক্ষণই সবাই চিনবে, মানবে, ভয় করবে, শ্রদ্ধা করবে। একবার হারালে ত সব খোয়ালে। পাণ্ডুর সেই আংটি হারিয়ে গেছে। হারানো আংটি ফিরে পেয়েও শকুন্তলা স্পর্শ করেনি, কারণ হারানো গৌরব তাতে ফিরে আসবে না। ক্ষমতায় যখন আছি, তখন ক্ষমতা ত্যাগের প্রশ্ন আর ওঠে কী করে?

তোমার কথা ঠিক। কিন্তু ওরা আমার পুত্রদের সুখে থাকতে দেবে না। এই চিন্তায় আমার মনটা ক্ষতবিক্ষত হচ্ছে। তাই, কুন্তীর পুত্র হওয়ার সংবাদে, আমি খুশি হতে পারেনি। একটুও আনন্দ হয়নি আমার। বরং বিষাদে ভরে গেছে অন্তর। আমার কিছু ভাল লাগছে না। মনের সঙ্গে দিবারাত্র লড়ছি। ভাল করে কিছু ভাবতে পারছি না। বুকের ভেতর একটা বিরাট ভাঙাগড়া হচ্ছে। সব কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। মাথটা ঠিক নেই। মায়ের মনকে তুমি ঠিক বুঝবে না। স্বপ্ন-ভঙ্গের কষ্টে বুক ফেটে যাচ্ছে। আমার সন্তানের কোন ভবিষ্যৎ দেখতে পাচ্ছি না। তার ভূমিষ্ঠ হওয়ায় আর কি কোন প্রয়োজন আছে?

আশাভঙ্গের নিদারুণ মর্মযন্ত্রণায় তার বুকের ভেতর টাটাচ্ছিল। দুই চোখ ভরে জল এল। কান্নায় তার ঠোঁট মুখ ভুরু বেঁকে যেতে লাগল। গান্ধারী দু'হাতে মুখ ঢেকে কিছুক্ষণ কেঁদে নিল। কিন্তু কোন শব্দ বেরোল না কণ্ঠ দিয়ে। কয়েকটা মুহূর্ত কেটে যাওয়ার পর গান্ধারী বলল : আমার পুত্র একজন সামান্য রাজপুত্র হয়ে থাকবে এ আমি সইব কেমন করে? আমিতো নিজেকে সেভাবে তৈরি করিনি। আমি স্বপ্ন দেখেছি, আশা করেছি। আমার ইচ্ছেটাই যদি মরে গেল তা-হলে আমার গর্ভজ ভ্রূণের পৃথিবীর আলো দেখে কি হবে? চাই না, আমি এ সন্তান। এ সন্তান মরে যাক।

তারপরেই গান্ধারী ভীষণ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল নিজের ওপর। গর্ভের উপরেই তার আক্রোশ। আশাভঙ্গের নিদারুণ মর্মজ্বালায় ও যন্ত্রণায় ভয়ংকর হয়ে উঠল তার মূর্তি। মুহূর্তে গান্ধারী হিংস্র

হয়ে পাশব ক্রোধে আত্মহারা হয়ে দুই হাত দিয়ে এলোপাথাড়ি গর্ভের ওপর উপর্য্যুপরি আঘাত করতে লাগল। ঘন ঘন শ্বাস পড়ছিল। আর একটা কাতর যন্ত্রণায় তার মুখ নীল হয়ে গেল। অব্যক্ত যন্ত্রণায় টাটাতে লাগল সর্ব শরীর।

ধৃতরাষ্ট্র অসহায়ের মত ডাকল গান্ধারী। তুমি কী করছ? তুমি কি পাগল হয়ে গেলে?

তীব্র গোঙানিতে আর্ত হল তার কণ্ঠস্বর। বল, কি রইল আমার জীবনে? অতি তীব্র হাহাকারের মত ঝংকারে বাজতে লাগল তার কণ্ঠস্বর প্রকোষ্ঠের অভ্যন্তরে।

কিন্তু খুব বেশিক্ষণ নয়। ধৃতরাষ্ট্রের বুকে মাথা রেখে সে মূর্ছা গেল। আর চৈতন্যের অবলুপ্তির মধ্যে তলিয়ে যেতে যেতে অনুভব করল কি একটা গরম তরল পদার্থ যেন তার গর্ভদেশ থেকে স্খলিত হয়ে জঙ্ঘা বেয়ে বাইরে বেরিয়ে আসছে। আর শুনতে পেল ধৃতরাষ্ট্রের ক্ষীণকণ্ঠস্বর। কুন্তীকে ঈর্ষা করে তুমি কার ওপর প্রতিশোধ নিলে? আমি এখন কী করি?

মহর্ষি ব্যাসদেবের চিকিৎসায় গান্ধারী সুস্থ হল। শরীরের ভেতর আর একটা প্রাণের নড়াচড়াকে টের পেল প্রতিদিন প্রতিমুহূর্ত। নিজের শ্বাসে গান্ধারী তার নাড়ীর স্পন্দন শুনতে পায়।

তারপর একদিন সুন্দর স্বাস্থ্যবান এক পুত্র হল।

দিনটা ছিল প্রাকৃতিক দুর্যোগে পরিপূর্ণ। সূর্যোদয়ের বহু আগে থেকেই আকাশ কালো মেঘে ঢাকা ছিল। ভোর হল। কিন্তু আঁধার কাটল না। বেলা যত বাড়তে লাগল তত হাওয়া জোরে জোরে বইতে লাগল।

অপরাহ্নে প্রবল ঝড় উঠল। রে রে কালো মেঘ তেড়ে এল ডাকাতদলের মত। মুহূর্তে অন্ধকারের বুকে মুখ লুকিয়ে ঘুমিয়ে পড়া গাছগুলো ভয় পেয়ে হঠাৎ যেন ঘুমের ভেতর আর্ত চিৎকার জুড়ে দিল! গাছের ডালে বসা পাখিরা ত্রাসে কলরব করে উঠল। পশুরাও অসহায়ভাবে ডাক ছেড়ে করুণ সুরে কাঁদল। প্রকৃতি অশান্ত, উত্তাল। ঝড়ো বাতাসের সঙ্গে নেমে এল মুষলধারায় বৃষ্টি। আকাশে, বাতাসে, বনে বনান্তরে আরম্ভ হল প্রকৃতির প্রলয় নাচন। ঘন ঘন বজ্রনির্ঘোষে, মুহুর্মুহু বিদ্যুতের চমকে এক ভয়ংকর পরিবেশ তৈরি হল। অবিরাম বারিপাতের শব্দ যেন বাতাসে লক্ষ করতালির মত বাজতে লাগল।

গান্ধারীর মনটা খারাপ হয়ে গেল। নানারকম কু-গাইছিল মনের ভেতর। কিছুতেই সে নিজেকে শান্ত করতে পারছিল না। মনে হচ্ছিল, এই প্রাকৃতিক দুর্যোগে যে শিশু জন্মাল নিশ্চয়ই তার জন্যে একটা কিছু ঘটবে। একটা বড় কিছু হবে। নারীর নিজস্ব সংস্কার এবং কতকগুলো অমঙ্গল আশংকা এবং অশুভ চিন্তা তার মনকে কুরে কুরে খেতে লাগল।

সদ্যোজাত পুত্রের মুখের দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে রইল অনেকক্ষণ। আর বুকের ভেতর কেমন একটা অদৃশ্য টান অনুভব করল। নিবিড় মমতায় স্নেহে আরামে সুখে উল্লাসে তার হৃদয় টইটুম্বর হয়ে গেল। সে আর আবেগ সামলাতে পারল না। বাৎসল্যের ঢল নামল বুকে। দুরন্ত ক্ষিপ্রতায় শিশুকে দু'হাতে তুলে নিল। বুকের ওপর চেপে ধরল। এক অনাস্বাদিত সুখ ও তৃপ্তিতে ভরে উঠল বুক। চোখ দুটি আরামে বুজে গেল। কচি তুলতুল্ গালের ওপর মুখ রাখল। তার শরীরের ঘ্রাণ নিল। বুকের ওপর কান পাতল। ধক ধক আওয়াজ শুনল। কতভাবে আদর করল। চুমু দিল হাতে, পায়ে। বার বার তার মুখের দিকে অপলক চোখে তাকাল আর নিজের মনে কত কথা বলল। সে কথার কোন অর্থ নেই। উত্তরের প্রত্যাশা নেই, সাড়া পাওয়ার প্রতীক্ষা নেই। শুধু নিজের মনে অজস্র কথা বলল। সে প্রগলভতায় সব জননীর মত গান্ধারী এক অনির্বচনীয় আনন্দ ও সুখে আবিষ্ট হয়ে রইল।

হঠাৎ গর্দভের কর্কশ স্বর শোনা গেল বাইরে। প্রবল ঝড় এবং বারিপাতের শব্দ ছাপিয়ে তার কণ্ঠস্বর শোনা গেল। ভুলে যাওয়া অশুভ চিন্তায় তার মনের শান্তি নষ্ট হল। থম ধরা ব্যথায় তার বুক টাটাতে লাগল। তবে কি পুত্র তার কোন দুর্যোগের বার্তা বহন করে আনল? অথবা

কোন দুরাত্মা তার ভেতর দিয়ে সৃষ্টি হল? কথাটা মনে হতেই গান্ধারী কেঁদে ফেলল। বিধাতার নিজের হাতে গড়া সবচেয়ে মহৎ এবং পবিত্র হল মানবশিশু। যার কোন আত্মপর জ্ঞান নেই, যে ভীষণ অসহায় এবং পরনির্ভরশীল সে কখনও পাপী দুরাত্মা হয়? না হতে পারে? যুক্তিহীন বিশ্বাস, কুসংস্কার, প্রথাবদ্ধ, ধারণাগুলো মেয়েমানুষের জীবনে জন্মগত অভিশাপ। এর প্রতি তাদের একধরনের দুর্বলতা আছে। এর জন্যে নারীকে যে কত বেশি দাম দিতে হয় গান্ধারী জননী হয়ে জানল প্রথম।

রাত গভীর হল। বাইরের ঝড়-বৃষ্টি থেমে গেছে। কেবল ঝিঁ-ঝিঁ আর ভেকের ডাক শোনা যাচ্ছে অবিরাম। নিশাচর পেঁচার ডাকের সঙ্গে ভেকের ডাক, ঝিল্লির রব মিশে যাচ্ছে। রাত জেগে উঠেছে। গান্ধারীর ঘুম এল না। এপাশ-ওপাশ করতে লাগল। তারপর ওঠে বসে প্রদীপের আলো উস্কে দিয়ে নবজাতকের মুখের দিকে অপলক স্থির চোখে চেয়ে রইল। তার বুকে কান পেতে বুকের ধুক্ পুক্ শব্দ শুনল। মুখ নিচু করে শিশুর শরীরের ঘ্রাণ নিল। নাভি থেকে টেনে গন্ধ নিল। এই গন্ধ মায়ের কাছে প্রিয় এবং মনোরম। সব মেয়েই এই গন্ধটুকু নেওয়ার জন্য কি কষ্টই না করে? সে কি শয়তান জন্ম দিতে?

ভাবনায় পেলে গান্ধারীকে। জানালা দিয়ে আকাশে চেয়ে ছিল গান্ধারী।

বনের মধ্যে ছাইরঙা অন্ধকারে, সপ্তমীর চাঁদের আনন্দের সঙ্গে বনের স্যাঁতসেঁতে ভেজা ভাবটা মিশে এক স্বপ্নরাজ্য তৈরি হয়েছে যেন। দেব-দেবীরা বোধ হয় এই সময়েই জেগে ওঠে। গান্ধারী ছাইরঙা অন্ধকারে নরম বৃষ্টিভেজা আকাশের দিকে তাদের দেখবে বলে চেয়ে রইল। দেবতাদের লক্ষ লক্ষ চোখ নক্ষত্রের আলোয় তাকে ও তার পুত্রকে যেন নিরীক্ষণ করছিল। গান্ধারী সেইদিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল। সহসা তার বুক থেকে ধাবিত হল পুঞ্জীভূত অভিমান। আমার পুত্র কী করেছে? তার জন্মদিনে কেন এই দুর্যোগ? নবজাতকের উপর তোমার এই শত্রুতা কেন? কী করেছে সে তোমার? বল ভগবান, এই দুর্যোগ কার সংকেত? বল? গান্ধারীর দু'চোখ ভরে জল এল।

আর নিজের অজান্তেই মনে এল, এরকম ভয়ংকর প্রাকৃতিক দুর্যোগের রাতে যদুপতি শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেছিল। সেই দিনটির সঙ্গে এই দুর্যোগের কোন প্রভেদ নেই। অথচ দেবকীর জননীর অন্তরে কোন আতংক কিংবা আশংকা ছিল না। বরং একটা প্রত্যাশাই ছিল। শূরসেনের চরম রাজনৈতিক বিপর্যয় যেন দুর্যোগময়ী প্রকৃতির রূপ ধরে এসেছিল। কিন্তু এরকম কোন চিন্তায় তার হৃদয় ভরে উঠল না কেন? অকারণ একটা আশংকা তাকে শুধু অন্যমনস্ক করে দিচ্ছিল কেন? জননীর অন্তরে এ কোন পাপ চিন্তার উদয় হল? মাতৃস্নেহেতে কোন পাপ নেই। এই নবজাতকের কাছে দেবকীর মত তার কোন প্রত্যাশা নেই কেন? প্রশ্নটা গান্ধারী নিজেকে করল? তার বাহ্য চেতন লুপ্ত হয়েছিল। তাই ধৃতরাষ্ট্রের নিঃশব্দ আগমন টের পেল না।

ধৃতরাষ্ট্রের প্রশ্নে সে চমকে উঠল। তাড়াতাড়ি চক্ষু আবরণী দিয়ে চোখ ঢেকে বলল স্বামী, তুমি এসেছ?

রানী, এতবড় একটা আনন্দের খবর শুনে আমি কি চুপ করে থাকতে পারি? চোখ নেই, পুত্র মুখচন্দ্র দর্শন করতে পারলাম না, এ কি কম দুঃখ মহিষী? নবজাতককে দেখতে কার মত হল? আমার মত, না তোমার মত? নিশ্চয়ই ও তোমার মতই হয়েছে? অথচ কয়েকমাস আগে অবাঞ্ছিত মনে করে তাকে হত্যা করতে চেয়েছিল। আজ তাকে পেয়ে তোমার হৃদয় ভরে উঠল। ভীষণ শান্তি, তাই না?

স্বামী আমার বড় ভয় করছে। এ কোন প্রলয় নামল পৃথিবীতে?

প্রলয় বলছ কেন রানী? বল্ হস্তিনাপুরের সিংহাসনের উত্তরাধিকারের দাবি নিয়ে ভয়ংকরের বেশে দুর্যোগের রথে চেপে এসেছে তোমার বীর পুত্র। ভয় কি তোমার? পাণ্ডুপুত্রের কথা মনেও স্থান দিও না রানী। আমাদের শিশুপুত্রই হবে এই সিংহাসনের উত্তরাধিকারী।

গান্ধারী দীর্ঘশ্বাস মোচন করে বলল : মহারাজ, পারিপার্শ্বিক অবস্থা কিন্তু ক্রমেই জটিল হয়ে উঠছে। ধাত্রী বলছিল, কুন্তীর আরো একটি ক্ষেত্রজ সন্তান আসন্ন। এবার দেবরাজ পবনকে সে আহ্বান করেছে।

ধৃতরাষ্ট্রকে খুব চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন দেখাল। বিমর্ষ গলায় বলল : রানী এসব করার অর্থ কী?

প্রতিশোধ। সিংহাসনের উপর পাণ্ডুর পুত্রের দাবি ও অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে কুন্তী সুপরিকল্পিতভাবেই এগোচ্ছে। হিমালয়বাসী দেবতাদের সঙ্গে রক্তের সম্পর্ক স্থাপন করে দেবপুত্রদের সামনে রেখে সে এখনই এক অঘোষিত স্নায়ুযুদ্ধ সূচনা করেছে রাজপরিবারের অভ্যন্তরে এবং রাজার মনোরাজ্যে।

রানী তোমার আশংকা অমূলক নয়। কিন্তু কারা এসব করছে? কেন করছে? তাদের স্বার্থ কী? এরা কারা?

মহারাজ, এরা সাপের মত নিঃশব্দে চলে। ওদের গতিবিধি টের পাওয়া কঠিন।

দুর্যোগের স্মৃতিটা মানুষের মন থেকে মুছে যাওয়ার আগে রাজপরিবারের অভ্যন্তরে এবং হস্তিনাপুরের মানুষের মুখে মুখে সুযোধনকে নিয়ে আলোচনার অন্ত ছিল না। একটা নিষ্পাপ শিশু যে এরকম একটা আলোচনার বিষয়বস্তু হতে পারে গান্ধারীর জানা ছিল না। সুযোধনের জন্মের সঙ্গে দুর্যোগের দিনটিকে যুক্ত করে নানা ঘটনার অপব্যাখ্যা চলল। অনেককাল ধরে। এর মধ্যে গান্ধারী আরো তিনটি সন্তানের জননী হল। তবু কুৎসা শ্রান্ত হল না। রাজপুরীর অভ্যন্তরে কারা যেন গোপনে এবং নিচু স্বরে বলাবলি করে, সুযোধন দুরাত্মা। পাপী। শয়তান। ঘোর কলি। জননীও ভ্রূণ অবস্থায় তার পাপ বহন করতে পারছিল না বলে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিল। দুরাত্মা বলেই গান্ধারীর গর্ভ নষ্ট হয়নি। অন্য ভ্রূণ হলে গর্ভপাত হত। সুযোধনের আবির্ভাবে ধরণীও খুশি হয়নি। চরাচরও মেনে নেয়নি তার আগমন। তাই প্রকৃতির অভ্যন্তরে এক ভয়ংকর গোলমাল শুরু হয়েছিল। চৈত্রের নীল আকাশ হঠাৎ ভয়ে কালি হয়ে গিয়েছিল। সূর্য কালো মেঘের অন্তরালে মুখ লুকোল। বিবর্ণ ভয়ে, কর্কশস্বরে ডেকে উঠেছিল। পশুরা অসহায়ের মত ডুকরে কেঁদেছিল। নরাধম ভূমিষ্ঠ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবী জুড়ে এক তাণ্ডব সৃষ্টি হল। আকাশ গর্জন করতে লাগল। বাতাস শাসাতে লাগল। বজ্রের ভীম প্রহরণে ধরিত্রী ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস ফেলতে লাগল। দুর্যোধন পাপাত্মা বলে তার জন্মের নিমিত্ত এইসব দুর্লক্ষণ প্রকাশ পেল। এহেন শিশুপুত্র রাজ্যের পক্ষে বিপজ্জনক। এই সন্তান প্রজাপুঞ্জের জীবনে অভিশাপ। মহারাজের উচিত এই কুগ্রহকে বিসর্জন দেওয়া।

কথাটা গান্ধারীর কানেও পৌঁছল। মায়ের প্রাণ কেঁদে উঠল। বেশ বুঝতে পারল পুত্রকে নিয়ে এক গভীর ষড়যন্ত্র চলেছে; এ শুধু সূত্রপাত। শেষ কোথায় গান্ধারী জানে না। ভাবনাটা সেজন্যেই। ষড়যন্ত্রকারীরা অত্যন্ত হীন বলেই একজন অবোধ নিষ্পাপ বালককে নিয়ে এরকম কুৎসিত অপপ্রচার করতে পারে। জীবনের কোন স্বাদ যে পেল না, সিংহাসন কি জানল না, তাকে অপপ্রচারের মধ্যে টেনে এনে প্রকৃতপক্ষে হস্তিনাপুরের সিংহাসনের ওপর কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠিরের দাবির অনুকূলে এক পরিবেশ তৈরি করছে।

পুত্রকে হেয় করলে কোন জননীর সহ্য হয়? যুধিষ্ঠির ধর্মাত্মা, আর সুযোধন পাপাত্মা—এই হীন প্রচারের তেতো সংবাদটা গান্ধারী ভুলতে পারল না। গান্ধারীর ভেতরটা ঈর্ষায় দপ্ করে জ্বলে উঠল। নিজের সঙ্গে তুলনা করলে কুন্তীর ভাগ্যটা ভাল বলে মনে হয়। তার অদৃষ্টের মতন গ্রহণ লাগা নয়। কুন্তী নারীকুলের লজ্জা। তার মত নির্লজ্জ বেহায়া মেয়েমানুষ এই সমাজকে নরকে টেনে আনছে। কুন্তীর কথা মনে হলে গান্ধারীর ঘৃণা হয়। অবৈধ পুত্র যুধিষ্ঠিরের জন্যে সে হস্তিনাপুরের সিংহাসনের স্বপ্ন দেখে। অথচ, তার পুত্রেরা কেউ কৌরব বংশের নয়। তাদের ধমনীতে নেই পুরুবংশের রক্ত। তারা এক স্বতন্ত্র বংশধারা। নতুন প্রজন্ম। তারা পাণ্ডব। কৌরব বংশের একটি শাখা। পাণ্ডবেরা কৌরব হতে পারে না। কুরুবংশের সিংহাসনের ওপর পাণ্ডুর অবৈধ পুত্রদের দাবি কখনই গ্রাহ্য নয়।

গান্ধারী প্রজ্ঞাদৃষ্টি দিয়ে দেখতে পেল, পারিবারিক অন্তর্কলহের এক ঘূর্ণিঝড় হস্তিনাপুরের দিকে তেড়ে আসছে। এই ঝড়ের গতি ঘুরিয়ে দেওয়ার সামর্থ্য অমিত বীর্যসম্পন্ন গাঙ্গেয়েরও নেই।

দেড় যুগ পরে শর্তশৃঙ্গ পর্বত থেকে পাণ্ডু দুই মহিষী এবং পাঁচ পুত্রকে নিয়ে হস্তিনাপুরে ফিরছে এই সংবাদটা লোকের মুখে রটনা ছিল। কিন্তু রাজধানীতে তাদের আগমনের কোন সংবাদ ছিল না। সংবাদটা ইচ্ছে করেই পাণ্ডবেরা পাঠায়নি। ধৃতরাষ্ট্র কিংবা দেবব্রত, পাণ্ডু এবং তার মহিষী ও পুত্রদের আগমন সম্পর্কে কিছুই জানত না। গান্ধারীর বিস্ময়টা এখানেই। মনে মনে তার প্রত্যাবর্তনের কারণ পর্যালোচনা করল। পাণ্ডুর আগমন কোন আকস্মিক ঘটনা নয়, এটা দীর্ঘ প্রস্তুতির ফল। এখন তার ক্ষেত্র পরিবর্তনের প্রয়োজন হয়েছে। সেই ক্ষেত্র হস্তিনাপুর।

গান্ধারীর মনটা ভাল যাচ্ছিল না। উৎকর্ণ অস্থিরতায় কয়েকদিন ধরে সে ছটফট করল। একটা বড় কিছু ঘটার আশংকায় তার বুকের ভেতরটা থরথর করে কেঁপে উঠল। একটা কাল্পনিক ভয়ে দু'চোখ বুজল। নিঝুম হয়ে বসে রইল কিছুক্ষণ। হঠাৎ-ই মনে হল ভীষ্মের কাছে উদ্বেগটা বলতে পারলে সে হয়ত একটু স্বস্তি পেত। পিতৃব্যের মনোভাবটাও জানা হয়ে যেত। কিন্তু মনের উদ্বেগকে পিতৃব্যের কাছে প্রকাশ করতে কেমন একটু কুণ্ঠা হল। চেষ্টা করেও দ্বিধা-সংকোচের পাহাড় সরাতে পারল না। ভেতর ভেতর সে একটু অধৈর্য হয়ে পড়ল। কারণ একজন মানুষ সারা জীবন পথ চলে কোন কিছু প্রত্যাশা নিয়েই। সব মানুষই তাই চলে। প্রত্যাশা অপূর্ণ হলে সকল মানুষও ব্যর্থ হয়ে যায়। গান্ধারী ব্যর্থ হতে চায় না। তার সব চাওয়াই এখন সুযোধনের সিংহাসন প্রাপ্তির চিন্তায় কেন্দ্রীভূত।

সারাদিন ধরে এই একটা চিন্তাই তাকে কুরে কুরে খায়। কেমন উদাস লাগে। কিছু ভাল লাগে না। সারাদিন এক ভারহীন শরীরে সে হাঁটে, চলে, শোয়। সারাদিন তার চোখের দৃষ্টিতে কেমন একটা খ্যাপামির ভাব। কিন্তু হুট করে কিছু করলেও আর হয় না। সব দিক ভেবে-চিন্তে সে এগোতে চায়।

অবশেষে শকুনির পরামর্শে সে একদিন পিতৃব্য ভীষ্মের প্রাসাদে গেল। একা।

তখন দুপুর। কিন্তু মধ্যাহ্ন অপরাহ্নের দিকে ঢলে পড়েছে। রোদের তীব্রতাও কম। মেঘশূন্য নীল আকাশের বুকে দিনের আলোর ছড়াছড়ি। গাছপালা স্থির। অসহায়ের মত চেয়ে আছে।

গান্ধারী রথ থেকে নামল। সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠল। বিশাল চত্বর পেরিয়ে গেল পায়ে পায়ে। কেউ কোথাও বাধা দিল না। গান্ধারী নিঃশব্দে একের পর এক দালান অতিক্রম করল। দোতলা থেকে দরাজ গলায় গানের সুর ভেসে আসছিল। ভীষ্ম চোখ বন্ধ করে একা গাইছিল।

দরজা খোলা। গান্ধারী নিঃশব্দে ঘরে পা রাখল। কিন্তু ভীষ্মের কোন সাড়া নেই। দু'চোখের কোণ দিয়ে জল গালে গড়িয়ে পড়ছিল টপ টপ করে। গান্ধারী অবাক চোখে চেয়ে ছিল ভীষ্মের দিকে। এই প্রথম মনে হ'ল এই মানুষটির মুখের দিকে কোনও দিন ভাল করে তাকিয়ে দেখেনি। তার ভেতরেও যে একটা রক্তমাংসের মানুষের মন লুকিয়ে আছে, তাও দেখা হয়নি কোনদিন।

গান্ধারী ভীষ্মকে দেখছিল। না থাকার মধ্যেও যে ছিল, সেটা যেন নতুন করে আবিষ্কৃত হল তার চোখে। তার ভাবনার মধ্যে সুযোধন ছিল না। সে ভীষ্মকে দেখছিল, তার কথাই ভাবছিল। এই মানুষটা সারাজীবন ধরে কী পেল? বুকের ভেতর একটা কষ্ট মথিত হতে লাগল। নিজের অজান্তেই বড় নিঃশ্বাস পড়ল। চোখের পাতা ভিজে গেল হঠাৎই। চোখের কোণ মুছল। তার শূন্য চোখে একটা বিস্ময় আবেগ ফুটে উঠলো। ভীষ্মের চোখে অন্যমনস্কতা।

গান্ধারী নিঃশব্দে ফিরে যাবার জন্যে ঘুরে দাঁড়াল। চৌকাঠ পার হতে ভেতর থেকে ভীষ্মের গম্ভীর গলা শুনল। ভীষ্মের বিস্ময়সূচক জিজ্ঞাসায় গান্ধারী চমকে উঠল। ভেতরটা থর থর করে কেঁপে উঠল। বৌ-মণি, তুমি! বুক ভরা অভিমান নিয়ে নিঃশব্দে ফিরে যাচ্ছ কেন? এস মা লক্ষ্মী। তোমার কাছে এমনিই আমার অনেক অপরাধ জমা হয়ে আছে। আরও অপরাধী করবে আমায়?

গান্ধারী ত্রস্ত বিস্ময়ে চকিতে তাকাল তার দিকে। চোখের জলের দাগ তখনও গালে শুকোয়নি। আলোয় চিক চিক করে উঠল।

ভীষ্ম বেশ একটু অবাক হয়ে করুণ চোখে তার দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। অস্ফুট ভাঙা

গলায় প্রশ্ন করল : মা জননী, তোমরা একী চেহারা হয়েছে? চোখের কোণ বসা। মুখে কেমন একটা ক্লান্তির ভাব। কী হয়েছে তোমার?

গান্ধারীর বুকটা থরথর করে করে কাঁপিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। কী এক গভীর সুখে সে চোখ বুজল। আর স্নিগ্ধ হল ভেতর ভেতর। আনন্দে বিষাদে বুকটা উথাল পাথাল করে চোখ ভরে জল এল। কথা বলতে গিয়ে গলার স্বর ভারী হল। বলল : পিতৃব্য, আপনাকে দেখার পর থেকে মনটা দীন হয়ে গেল, মাথা নুয়ে এল আবেগে। নিজের সব কথা ভুলে গেলাম। মনে হল, আমার চেয়েও একজন দুঃখী মানুষের কাছে নিজের দুঃখ জানানোর মত বিড়ম্বনা আর কিছু নেই।

ভীষ্ম চুপ করে থাকল কিছুক্ষণ। খুব করুণ দৃষ্টিতে গান্ধারীর মুখের দিক চেয়ে বলল : মাঝে মাঝে বড় শূন্য আর একা লাগে। নিজেকে বড় নিঃস্ব মনে হয়। সেইসময় কিছু ভাল লাগে না। সঙ্গীত নিয়ে নিজেকে ভুলিয়ে রাখি।

গান্ধারীর কণ্ঠে যুগপৎ বিস্ময় ও উৎকণ্ঠা প্রকাশ পেল। বলল : কিন্তু আপনি এরকমভাবে নিজের দুঃখের ভারবাহী হয়ে থাকলে যে শরীর ভেঙে পড়বে।

ভীষ্ম একটু হাসল। কৃতজ্ঞতার হাসি। বলল : আমি তো ঠিক আছি। তোমার শরীর ভাল নেই মা জননী। তোমার কোন কথাই কিন্তু আমাকে বললে না।

বলার মত কিছু নয়।

আবার অবহেলার করারও নয়।

গান্ধারী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল : হ্যাঁ! কিন্তু আপনি নিজেকে গুটিয়ে রাখলে আমরা কার কাছে যাব? এ বাড়িতে আপনিই আমাকে বধূ করে এনেছেন। আমার ওপর আপনার নৈতিক কর্তব্য কিন্তু ফুরিয়ে যায়নি। আমার দুর্ভাগ্যই বলুন, আর ভাগ্যই বলুন; সব কিছুর মূলে কিন্তু আপনি। বলতে পারি আমার গোটা জীবনে সঙ্গে জড়িয়ে আছেন। অন্তত একদিন সেই প্রতিশ্রুতিই আপনি দিয়েছিলেন।

আমার প্রতিশ্রুতি ফিরিয়ে নেবার মত কোন ঘটনা হয়নি।

পিতৃব্য, বড় ভাবনা য়। ভাবনার ওপর মানুষের কোন হাত নেই বলেইতো সংশয়। ভয়, অবিশ্বাসের পাহাড় জমে ওঠে। বিশেষ করে মেয়েদের মনে। মায়ের বুকে।

তুমি যে খুবই চিন্তিত বুঝি। কিন্তু এত ভাবার মত কিছু হয়নি।

গান্ধারী ভীষ্মের মুখের দিকে চেয়ে রইল শূন্য চোখে। কিছু একটা অনুমান করার চেষ্টা করল। তারপর ভুরু কুঁচকে বলল : পিতৃব্য বহুদিন পর দেবর রাজধানী ফিরছে। কত আনন্দের কথা। একটা খবর তো দিতে পারত। কিন্তু সে সব কিছুই করল না। চুপি চুপি অপরাধী ছেলের মত নিঃশব্দে হস্তিনাপুর ঢুকছে। এরকম হবে কেন? আমি জানি কুন্তী মাদ্রীর গর্ভজ পুত্রদের কে কি চোখে নেবে; গ্রহণের পর্বটা কি রকম হবে; এই সব ভেবেই পারিবারিক মিলনটা খুব চুপিচুপি সেরে ফেলতে চায়। কিন্তু এতে তার পুত্রদের গৌরব বাড়বে না। হীনমন্যতায় ভুগবে। একটা সম্মানজনক কিছু হওয়া চাই। আমি একটু উদার হলে তার সব অপরাধ ঢেকে দিতে পারি। তার জন্যে তো একটা রাজকীয় অভ্যর্থনার ব্যবস্থা তো করতে পারি।

ভীষ্ম ভুরু কুঁচকে চেয়ে রইল গান্ধারীর দিকে বেশ কিছুক্ষণ। তারপর গভীর দীর্ঘশ্বাস মোচন করে গলার একটা আওয়াজ করল, হুঁ। ধৃতরাষ্ট্র কী বলল?

বলল, পাণ্ডু খবর দিয়ে এলে যে কাজটা সহজ হত, সেটা জটিল করে ফেলেছে। রাজধানী তার আগমনের খবর না জানলে কেমন করে অভ্যর্থনার আয়োজন করবে? তার আগমনের সংবাদের সত্যতা কতটুকু? একটা শোনা কথার ওপর তো কোন রাজকীয় অভ্যর্থনা হয় না। কোন কারণে সংবাদ মিথ্যে হলে রাজার সুনাম নষ্ট হয়। আয়োজনটা হয়ে পড়ে হাস্যকর।

ভীষ্ম মাথা নাড়ল। একটু ভেবে বলল : ওর রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি আছে। বাস্তব জ্ঞান প্রখর। তবু বিধাতা ওর সঙ্গে শত্রুতা করলে। তাঁর মত বড় শত্রু ওর আর কেউ নেই। আজ ওর দৃষ্টিহীনতার জন্যেই সব তালগোল পাকিয়ে গেল। জান, মা জননী, ধৃতরাষ্ট্রের জন্যে আমার বড় কষ্ট হয়।

ভাবনা হয় ও আমার পায়ের বেড়ি, কণ্টক মালা। এও জানি, আমি সরে গেলে ও বিপদে পড়বে। যতদিন বেঁচে থাকব ওকে আগলে বেড়ানোই আমার কাজ।

গান্ধারীর বুকের ভেতর একটা তরঙ্গ বয়ে গেল। স্বস্তির শ্বাস পড়ল। কৃতজ্ঞতায়, আনন্দে চোখ ভরে জল এল। মনে হল, বুকের আগুনটা নিবে গেছে। ভীষ্মকে প্রত্যাশার বেশি পাওয়া হল তার।

পাণ্ডু পুত্রদের স্বীকৃতির ব্যাপারে হস্তিনাপুর একেবারে নীরব। কেউ কোন মুখ খুলল না। পাণ্ডু এবং পাণ্ডু পুত্রদের নিয়ে নানারকম জল্পনা কল্পনা চলল। যে যার নিজের মত করে ব্যাখ্যা করতে লাগল। হস্তিনাপুরের প্রশ্রয়ে স্বীকৃতির ব্যাপারটা ক্রমেই জটিল হয়ে উঠল।

কিন্তু অলক্ষ্যে বিধাতা এই ঘটনার সহজ নিষ্পত্তির একটা ছক কেটে রেখেছিল। অন্তত গান্ধারীর তাই মনে হল। না হলে একটা প্রতিকূল অবস্থা অনুকূল হয় কখনও? গান্ধারী যতকাল জীবিত থাকবে পাণ্ডুর মৃত্যুটা কোনদিন ভুলতে পারবে না। এই মৃত্যুটা না হলে হস্তিনাপুরের মাটিতে পাণ্ডবেরা কখন শিকড় গেড়ে বসতে পারত না। পাণ্ডুর আকস্মিক মৃত্যুটাই তার পুত্রদের ভাগ্য খুলে দিল। গোটা ব্যাপারটা সহজ করে দিল। পাণ্ডুর শবদেহ সামনে রেখে যেমন একটা পারিবারিক মিলন ঘটল, তেমনি শোকস্তব্ধ বিষণ্ণতা দিয়ে প্রতিকূল অবস্থাকে ঠেকাল।

শবদেহ নিয়ে এত বড় একটা কূটনৈতিক সাফল্য যে হয় গান্ধারী এত বিশাল করে কখনও ভাবেনি। ভাবল বড় দেরিতে। তখন, যা ঘটার ঘটে গেছে। কিন্তু ঘটেছিল বড় বিচিত্রভাবে।

হস্তিনাপুরে পৌঁছনোর বেশ কয়েকদিন আগে পথিমধ্যে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে পাণ্ডু শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্যে বিশেষ রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় তার দেহ সংরক্ষণ করে রাজধানী হস্তিনাপুরে নিয়ে এল কুন্তী ও তার পুত্ররা।

পাণ্ডুর মৃত্যুর খবরটা পরিবারের সকলকে এমনভাবে স্পর্শ করল যে সমস্ত রাজপুরী অকস্মাৎ ভীষণ মৌন এবং শব্দহীন হয়ে গেল। উপস্থিত সকলের শ্বাসের অস্বাভাবিক শব্দে জায়গাটা বিষণ্ণ হয়েছিল, তখন মনটা সকলের এক জায়গায় আটকে ছিল। নানা আবেগ এবং সংস্কার কাজ করছিল। পাণ্ডু-পুত্রদের সম্পর্কে সেই মুহূর্তে কৌতূহল দেখানো কিংবা প্রশ্ন করা ছিল ভীষণ নিষ্ঠুরতা। এই নিঃশব্দ শব্দময়তার মধ্যে মানুষের অন্তরে বোধ হয় কোন ঘৃণা, বিদ্বেষ, ঈর্ষা, কিংবা শত্রুতা থাকে না। হৃদয় বিদীর্ণ করতে পারার মত মৃত্যুশোকের চেয়ে ভাল অস্ত্র আর নেই। পাণ্ডুর শবদেহ কুন্তির সেই অস্ত্র। শোকপ্রকাশে তাই কোন বাড়াবাড়ি ছিল না। শোকস্তব্ধ শান্ত, সৌম্য, সমাহিত ভাবটি তাদের দুঃখ, বেদনা, যন্ত্রণা, অসহায়তাকে স্পষ্ট করে তুলল। সকলের মন কেড়ে নিল আশ্চর্যভাবে।

কান্নারও একটা সময় থাকে। সেই সময় উত্তীর্ণ হলে তার গৌরব কমে যায়। ঠিক জায়গায় থামতে জানা চাই। কাঁদতে কাঁদতে একসময় থেমে যায়, শুকিয়ে যায় চোখের জল। প্রগাঢ় যন্ত্রণায় থম থম করে মুখ। চোখে লেগে থাকে ফুরিয়ে যাওয়ার আগের শূন্যময়তা। শোক প্রকাশের সেটাই হল সবচেয়ে সুন্দর মুহূর্ত। সে নিঃশব্দের মধ্যে শোকের রেশটি পুরোপুরি থাকে। শোকার্তের সঙ্গে সান্ত্বনাদাতার হৃদয়ের যে যোগাযোগ তা মুহূর্তে ঘটে যায়। বিদ্যুৎ চমকের মতই হঠাৎ হৃদয় বাঁধা পড়ে। গান্ধারীর হৃদয়টা অনুরূপভাবে বাঁধা পড়ল কুন্তীর সঙ্গে।

কুন্তীর স্তব্ধ গম্ভীর বিষণ্ণ মূর্তিটি এক প্রবল সম্মোহনে তার দৃষ্টিকে আটকে রেখেছিল অনেকক্ষণ। নিজে মেয়ে বলেই কুন্তীর স্বামীহীনতার শূন্যতার অনুভূতি প্রবলবেগে তাকে তার দিকে টানছিল। স্বামীহীনতার শূন্যতা রমণীর জীবনে অভিশাপ। প্রেমাস্পদকে চোখে দেখতে না পাওয়ার শূন্যতার কষ্ট কত মর্মান্তিক নিজের অতৃপ্তি দিয়ে গান্ধারী অনুভব করতে পারছিল। কুন্তীর জন্যে বুকটা তার কেমন করছিল। তার ওপর গান্ধারীর আর কোন রাগ, বিদ্বেষ কিংবা ঈর্ষা ছিল না। সহানুভূতির সমুদ্র তার বুকে টলমল করতে লাগল।

গান্ধারী কুন্তীর পাশে এসে দাঁড়াল। গায়ে হাত দিতেই কুন্তী তাকে জড়িয়ে ধরল। উচ্ছ্বসিত কান্নায় ভেঙে পড়ল। শিথিল শরীরের সব ভার গান্ধারীর ওপর এলিয়ে দিয়ে অসহায়ের মত

ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদল। গান্ধারীও নিজেকে সংবরণ করতে অক্ষম হল। তার নিজের ভেতর যে এত কান্না জমে ছিল তা জানা ছিল না তার নিজেরও।

কুন্তীকে জড়িয়ে ধরে গান্ধারী এল নিজের ঘরে। পালঙ্কের ওপর তাকে বসাল। তারপর, এলোমেলো চুল কপালে এবং চোখের ওপর থেকে সরিয়ে নিজের আঁচল দিয়ে চোখ মুছে দিল। শান্ত গলায় বলল : এত ভেঙে পড়লে হয়, বোন? আমরা তো আছি। নিজেকে এত অসহায় ভাবছ কেন? ছেলেগুলোর মুখের দিকে তাকিয়ে অন্তত শান্ত হও। দ্যাখ, সুযোধন ওদের হাত ধরে এই ঘরেই আসছে।

কেমন একটা ঝিমধরা আচ্ছন্ন চোখে কুন্তী তাকাল ছেলেদের দিকে। হতাশ গলায় বলল ঃ মনে হচ্ছে, সব আমি হারিয়ে বসে আছি। আমার কোন জোরই আর থাকল না।

গান্ধারী মৃদু ভর্ৎসনা করে বলল : ছিঃ। ওসব কি কথা? কিছুই হারায় না। সব সম্পর্ক সময় ও পরিবেশে নবীকৃত হয় কেবল।

কুন্তী কথা বলতে পারল না। চোখ ভরে জল এল। দীর্ঘশ্বাস পড়ল। শূন্য চোখে চেয়ে থাকে স্বপ্নাচ্ছন্নের মত। ধীরে ধীরে বলল ঃ তোমার কথাই ঠিক। রাতের সব তারাই আছে দিনের আলোর গভীরে। শুধু সময়ের তফাতে সম্পর্কটা বদলে যায়। দৃশ্য, অদৃশ্য হয়। একই আকাশে রোদ যাকে সহ্য করে না, রাত তাকে ডেকে নেয়। প্রকৃতির এ এক বিচিত্র কৌতুক।

কথাগুলো গান্ধারীর বুকের ভেতর ঢেউ দিয়ে গেল। কথাটার একটা নিজস্ব গন্ধ আছে। সেই গন্ধে ঘরের বাতাস ভরে গেল। গান্ধারীর ঘ্রাণেন্দ্রিয়তে এই গন্ধটা লেগে রইল। কিন্তু সেই মুহূর্তে মজা লাগল তার ঘ্রাণ নিতে। যে মানুষ অনেক রেখে ঢেকে কথাগুলো বলল, গান্ধারী তার ব্যক্তিত্ব এবং ইচ্ছেটাকে ভাল করেই চেনে। তবু সেই সময় গান্ধারীর নিজের অজান্তে কি যে তার চুরি হয়ে গেল তা সে টেরও পেল না। কিন্তু কথাটা তার মনে তালার মত ঝুলে রইল।

পাণ্ডুর অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার বেশ কয়েক বছর পরের ঘটনা। গান্ধারী বারান্দায় বসে একা একা নিজের মনে কাপড়ে রঙিন সুতো দিয়ে ফুল করছিল। আর একটা গানের কলি গুণগুণ করছিল।

অপরাহ্নের শেষ।

কার্তিক মাস। আকাশের রঙ বদলাচ্ছে প্রতিদিন। বাতাস পালটি খায় বিপরীত গতিতে, অতি ধীরে। গাছপালা স্থির। আকাশ ঝকঝকে, নীল হয়ে উঠছে দিন দিন। নদীর জল স্বচ্ছ। আয়নার মত। হেমন্তের প্রকৃতি যেন উদাস, বৈরাগী, ধুলামাখা। রাজপ্রসাদের গা দিয়ে বয়ে গেছে যে নদী তার জলে পাহাড়ী ঢলের রক্তভাবের চিহ্ন নেই, স্রোতে নম্রতা, ভাটার টানে একতারা উদাসী ঝংকার। কূলের অনেক সুখ-দুঃখের কথা যেন গান হয়ে ভেসে যায় অকূলে।

হাতের কাজ বন্ধ রেখে গান্ধারী প্রকৃতি দেখছিল। আর একটা দুশ্চিন্তা কেবলই তাকে অন্যমনস্ক করে দিচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, প্রকৃতির এই শান্ত রূপের সঙ্গে হস্তিনাপুরের রাজ-অন্তঃপুরের জীবনস্রোতের কোথায় যেন একটা বেশ মিল আছে। কৌন্তেয়রা এখানে নিরাপদ। কিন্তু নিন্দুকেরা মুখর। তাদের কুৎসা, নিন্দা, সমালোচনা সব তার পুত্রদের নিয়ে। গান্ধারীর মনে হল পুত্রেরাই যেন হেমন্তের শান্ত, শীর্ণ নদী। তাদের অফুরন্ত প্রাণপ্রাচুর্য সুখ, আনন্দ হাসির যেন টান ধরেছে। পুত্রদের শুষ্ক, ম্লান মুখের দিকে তাকালে গান্ধারীর খুব কষ্ট হয়। ভাবতেও খারাপ লাগে। নিজের অশান্তিতেই নিজেই কষ্ট পায়।

লঘু পায়ে কেউ আসছিল তার দিকে। গান্ধারী ঐ শব্দ চেনে। তাড়াতাড়ি চক্ষু আবরণী দিয়ে চোখ ঢাকল। বিধাতার বঞ্চনায় যে মানুষটি প্রিয়তম স্ত্রীর মুখ দেখতে পেল না কোনদিন, তার জন্যে গান্ধারীর কষ্ট হয়। তাই নিজের চোখ আবৃত করে স্বামীর দৃষ্টিহীনতার কষ্ট ও অসহায়তাকে তার সঙ্গে ভাগ করে নিল। ভালোবাসার মধ্যে দিয়ে নূতন করে জানতে পেল ত্যাগ করার সুখ।

একজন শূদ্রানী পরিচারিকা ধৃতরাষ্ট্রের হাত ধরে গান্ধারীর কাছে পৌছে দিয়ে গেল। ধৃতরাষ্ট্র

গান্ধারীর সুমুখে বসল। তার একখানা হাত নিজের হাতের মুঠোয় নিয়ে বলল : তোমার কাছে এলে যে আমার কী ভাল লাগে।

গান্ধারীর অভিমান হল। হাতটা ছাড়িয়ে নেওয়ার একটু চেষ্টা করল। বলল : আমি পুরনো হয়ে গেছি। যত পুরনো হচ্ছি ততই সস্তা হয়ে যাচ্ছি। এখন তোমার সব মধু ঐ শূদ্রানী রমণীতে। অমন কত রমণীই তোমাকে আনন্দ দেবার জন্য আছে।

তুমি না বড় বেরসিক মহিষী! এমন একটা সুন্দর ভাল লাগা মুহূর্তকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে দিয়ে কী সুখ পাও বলতো?

তুমি তো সুখ চাও না স্বামী। সুখ কাকে বলে কেমন করে জানবে? তুমি তো ত্যাগ করনি? ভালবাসনি? ত্যাগ করার সুখ, ভালবাসার আনন্দ তুমি কী বুঝবে?

মহিষী, তুমি ভারি সুন্দর কথা বল। তোমার সঙ্গে কথা বলতে ভীষণ ভাল লাগে। কিন্তু তোমাকে কোনদিন চোখে দেখা হল না। তুমি কত সুন্দর, মনে মনে তার ছবি কল্পনা করি। ভীষণ আনন্দ হয়।

কেন তোমার প্রমোদ সঙ্গিনীদের শরীরে কি আনন্দ নেই?

না। তার চেয়ে মনের আনন্দ অনেক বেশি গভীর।

বাজে কথা। মনটা তো শরীরের মধ্যে বেঁচে আছে। শরীর না থাকলে মন থাকত কোথায়?

মহিষী, শরীর বড় নোংরা। শরীরের মধ্যে টেনে এনে তোমার পবিত্র প্রেমকে আমি নষ্ট করে দেব না। অথচ, শরীর থাকলে ক্ষুধা থাকে। দৃষ্টিহীন বলেই আমার জীবনের একঘেয়েমি, ক্লান্তি, বিষণ্ণতার দমবন্ধ ঘরের লাগোয়া ঐ প্রমোদ রঙ্গিনীরা জীবনের আলো-হাওয়ার একফালি বারান্দা। আর তুমি আমার পূজার ফুল। আমার জীবনের একমাত্র আনন্দ, গর্ব। মহিষী, শরীর কারো চিরদিন থাকে না। মন চিরদিনের।

গান্ধারী একটু হেসে বলল : চিরদিন তো আমরাও থাকব না।

অত সব বুঝি না। তোমার সঙ্গে কথায় পারব না।

তা-হলে কথার পিঠে কথা বল কেন?

স্বাম-স্ত্রীর ভালবাসাটাই এমন।

কথা কাটাকাটির খেলার এক বিশেষ আনন্দ আছে যে।

ধৃতরাষ্ট্র আবেগ ভরা গলায় বলল। অন্তত গান্ধারীর তাই মনে হল।

খুব তাড়াতাড়ি একটা সময়ের হিসাব করে নিয়ে ধৃতরাষ্ট্র হঠাৎ-ই বলল : আমরা মানে, আমি আর তুমি এখন আর নিজেদের জন্যে বাঁচি না। ছেলেদের জন্যেই বাঁচি। আমাদের সব আনন্দ, পাগলামিকে ছাপিয়ে তাদের ভবিষ্যৎ চিন্তাই এখন বড় হয়ে ওঠা উচিত।

গান্ধারী অবাক হওয়া গলায় প্রশ্ন করল : মানে।

মহিষী, যারাই ব্যতিক্রম হয়, মূল্য তাদের ধরে দিতেই হয়। নিজের মত করে বাঁচতে হলে মানুষকে দাম দিতে হয়!

একধরনের অপ্রকাশ্য নিষিদ্ধ আতঙ্ক মেশা উৎকণ্ঠা নিয়ে প্রশ্ন করল : তোমার কথার মধ্যে একধরনের চাপা নিষ্ঠুরতা আছে। কিন্তু আমি তার রহস্য ভেদ করতে পারছি না। তুমি স্পষ্ট বলতে পারলে না। গান্ধারীর মনের দিকে তাকিয়ে একটু সময় নেওয়ার জন্যে ভণিতা করে বলল : তোমাকে ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারব না। বলতে গেলে আমারই ভীষণ লাগবে। তুমিও হয়ত একটু আহত হতে পার। এসব কথা পরিবেশনের সমস্যা অনেক। কারণ এমন কিছু কিছু কথা থাকে, যা নিজে বোঝা যায়, কিন্তু অন্যকে বোঝানো যায় না ঠিকভাবে। একথাটাও বোধ হয় সেইরকমই।

তোমার অত ভণিতা করে কাজ নেই। কথা নিয়ে যদি এত ঘোরপ্যাঁচ হয়, তাহলে আমরা স্বামী-স্ত্রী হলাম কেন?

তুমি ঠিক বলেছ। আসলে যত দিন যাচ্ছে, ততই মনে হচ্ছে, একটা ভীষণ ভুল হয়েছে। ভুল আমাদের উভয়ের হয়েছে। তবে, ভুলের জন্যে অনেক বেশি মূল্য দিতে হবে। প্রথমে যা ভাবা

গিয়েছিল, এখন মনে হচ্ছে তা সত্যি নয়। আমরা মরীচিকার পেছনে ছুটছিলাম রানী। আমি কি বলতে চাইছি, তুমি নিশ্চয়ই বুঝেছ।

স্বামী, আজ যে কথা বলতে পারছ, সেদিন কিন্তু বলতে পারনি। বলার মত পরিবেশ ছিল না। পাণ্ডুর শবদেহের ওপর মাদ্রী মূর্ছিতা, কুন্তী একপাশে দীন হীনা রমণীর মত ম্লানমুখে অবনত মস্তকে বসে আছে। কুন্তীর সেই হতশ্রী চেহারা দেখলে প্রত্যেক মেয়েমানুষের বুকের ভেতরটা কেঁপে ওঠে। তারও মনটা হায় হায় করে ওঠে। ঐ অবস্থায় একজন মানুষের যা করা উচিত আমি তাই করেছি। ওটুকু না করলে নিজের বিবেককে কি কৈফিয়ত দিতাম? লোকনিন্দা তো হতই। প্রজাপুঞ্জের চোখে আমরা চির অপরাধী হয়ে থাকতাম। শত্রু কুৎসা রটনার অনেক সুযোগ পেত। কিন্তু আমার সহৃদয় ব্যবহারে তাদের সে ইচ্ছে পূরণ হয়নি। পাণ্ডুর শবদেহ নিয়ে দেবতা এবং ঋষিরা মিলে যে অস্ত্র বানিয়েছিল, সে অস্ত্র ব্যবহারের কোন সুযোগ আমি তাদের দিইনি। সেদিন আমি যা করেছি তাতে ভাল ছাড়া মন্দ কিছু হয়নি।

ধৃতরাষ্ট্র লম্বা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল : হুম্। এত গভীর করে ভাবিনি। কিসে সুযোধন রক্ষা পায়, তার ভাল হয় শুধু এই কথা ছাড়া অন্য চিন্তা আমার মনে কিছু আসে না।

তুমি যাই বল, কুন্তীর ছেলেরা সব সোনার টুকরো। বড় মিষ্টি ব্যবহার। ভীষণ নম্র, শান্ত এবং বিনয়ী। বড় ভাল লাগে। কুন্তীর সন্তান ভাগ্য গর্ব করার মত।

তোমার সন্তান ভাগ্য খারাপ কিসে? সুযোধনকে তুমি তাদের চেয়ে ছোট করে ভাবতে পারলে, রানী? কৌন্তেয়দের সঙ্গে আমার কোন পুত্রের বিরোধ নেই, বিদ্বেষ নেই, শত্রুতা নেই। সুযোধন, দুঃশাসনের কোন দোষ আমি দেখি না। ওরা তো কৌন্তেয়দের সঙ্গে মিলেমিশে থাকার আপ্রাণ চেষ্টা করছে। কিন্তু কৌন্তেয়রাই তাদের ভাল থাকতে দিচ্ছে কৈ? ভীমের দৌরাত্ম, অত্যাচার, নির্যাতনের ভয়ে পুত্রেরা তার অনুগত থাকতে চেষ্টা করে। শিক্ষায় দীক্ষায় সকলে সমান হয় না। কিন্তু তাকে প্রকাশ্য প্রতিযোগিতায় এনে কে বেশি যোগ্য এবং অযোগ্য এই পরীক্ষায় পুত্রদের মনকে বিষিয়ে তুলছে। প্রতিযোগিতার নামে ঈর্ষা, বিদ্বেষের বিষ ঢেলে দেওয়া হচ্ছে তাদের সরল মনে। বন্ধুত্ব, সৌভ্রাত্র, সহযোগিতার সম্পর্ক নষ্ট হচ্ছে।

গান্ধারী বিস্ময়ে চমকে বলল : সে কী কথা? এত সব ঘটনা ঘটছে অথচ আমি তার কিছুই জানি না।

জানতে চেষ্টা কর না। মা হয়ে যা জানতে পার না, আমি পিতা হয়ে তা জানি। এটাই মজার কথা।

গান্ধারী ভীষণ অপমান বোধ করল। কানের দুপাশে তার জ্বালা করতে লাগল। বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বেদনাহত গলায় বলল : মা হিসাবে হয় তো আমি ব্যর্থ। সন্তানদের সঙ্গে আমার হৃদয়ের সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি। তাই আমি যেখানে পৌঁছতে পারিনি, তুমি অনায়াসে তাদের ছুঁয়েছ সেখানে। আমার এই অক্ষমতার কোন কৈফিয়ত হয় না। মাঝে মাঝে আমিও নিজেকে প্রশ্ন করি : পুত্রেরা আমাকে এড়িয়ে চলে, না আমি তাদের এড়িয়ে থাকি? না, উভয়ে একটা সমদূরত্ব রেখে চলি। সত্যিই যদি তাই হয়ে থাকে, সে দোষ তো আমার। আমি তো মা, সন্তানকে কাছে টেনে নিতে না পারা তো অপরাধ।

ধৃতরাষ্ট্র একটু বিব্রত হয়ে বলল : তুমি একটুও রসিকতা বোঝ না। নিজেকে শুধু শুধুই অপরাধী করেছ।

অপরাধ আমার অদৃষ্টের। সারাজীবন ধরে নিষ্ঠাভরে শিবপূজা করলাম। কিন্তু কী পেলাম? বিধাতার বঞ্চনা বড় নিষ্ঠুর স্বামী।

এমন সময় বিদুরের আগমন বার্তা নিয়ে এল পরিচারিকা। ধৃতরাষ্ট্রের অনুমতি নিয়ে পরিচারিকার প্রস্থানের অল্পকাল পরেই বিদুর এল। পায়ের শব্দ পেয়েই ধৃতরাষ্ট্র প্রশ্ন করল : বিদুর, এমন অসময়ে রানীর খাসমহলে এলে ব্যাপার কী?

মহারাজ সর্বনাশ হয়েছে।

ধৃতরাষ্ট্র চমকে প্রশ্ন করল : কী হল বিদুর?

ভীমকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। কৌন্তেয়দের কেউ জানে না ভীম কোথায়?

এতে উদ্বেগের কি আছে। ভীম সব ভাইদের মধ্যে একটু হাঁকা-ডাকা, বেশি দুঃসাহসী, বেপরোয়া। কোথাও হয়ত গিয়ে থাকবে। তারপর সে বলশালী। তার জন্যে এত দুর্ভাবনার করার মত কিছু হয়নি।

আপনি বলছেন কী? সন্ধ্যা হয়ে এল। তবু তার দেখা নেই। কোনদিন এত দেরি করে ফেরে না সে।

তা-হলে তো ভাবনার কথা। তুমি অনুসন্ধানকারী দল পাঠাচ্ছ না কেন?

তারা ফিরে এসেছে। দুর্যোধন দুঃশাসনের সঙ্গেই নাকি ভীম গঙ্গায় বৈকালিক স্নানে গিয়েছিল। তার পরের খবর কেউ জানে না। দুই রাজপুত্রও না। কুন্তী তো পাগলের মত করছে।

বিদুরের কথার ইংগিত গান্ধারীকে হুলের মত বিঁধল। বেশ একটু ক্ষুব্ধ হয়েই বলল : দেবর, তোমার কথার ইংগিতটা খুবই স্পষ্ট। তোমার কি ধারণা সুযোধন দুঃশাসন মিলে তার কোন ক্ষতি করেছে?

বিদুর গান্ধারীর কাছে এরকম প্রশ্ন প্রত্যাশা করেনি। তাই বুকের ভেতরে একটু ধক্ করে উঠল। বলল ঃ দেবী অপরাধ নিও না। একদল ধীবর দেখেছিল, তোমার নরাধম পুত্ররা—

গান্ধারী আর্তকণ্ঠে বিদুরকে বাধা দিল। বলল : দেবর! তারপর নিজেকে সংযত করে বলল : ছেলেমানুষের ঝগড়ার মধ্যে বড়দের নাক গলানো মোটেই ভাল কাজ নয়। তোমার মত বিচক্ষণ মিষ্টভাষী ধর্মাত্মার কাছে এরকম নিষ্ঠুর আচরণ, কর্কশ বাক্য আমি প্রত্যাশা করিনি। দেবর, তুমি এত জান। এটুকু বোঝ না, মায়ের কাছে ছেলের নিন্দে করা কিংবা তাকে কটূক্তি করে ভর্ৎসনা করলে মায়ের বুকে কতখানি লাগে? কুপুত্র হয়, কিন্তু কুমাতা হয় না। আমার পুত্রেরা ভীমের নিখোঁজের সঙ্গে কতখানি দোষী সেকথা প্রমাণ না করে শুধু শুধু তাদের দুষছ কেন? তোমার কাছে তারা তো কোন অপরাধ করেনি। তবু, তাদের প্রতি নির্দয় ব্যবহার কেন? কৌন্তেয়দের সঙ্গে ধার্তরাষ্ট্রদের তফাত করে দেখছ কেন? তোমার কাছে দুজনে তো সমান। কিন্তু আচরণে তা প্রকাশ পায় না কোনদিন। তোমাদের অনেকের অসতর্কতায়, পক্ষপাতিত্বে, অবিচেনায় এই পরিবারের সমূহ ক্ষতি হচ্ছে। তোমরা চোখে দেখেছ, কিন্তু প্রতিকার করছ না। তোমাদেরও যে কিছু করার আছে এটা ভুলে গেছ, অথবা দায়িত্ব নিচ্ছ না। বল, আমরা তোমার সঙ্গে কী শত্রুতা করেছি?

বিদুর স্তব্ধ। আত্মসংবরণ করতে তার একটু সময় লাগল। তারপর মৃদুস্বরে বলল : দেবী, আমি ভুল করেছি। আমার অপরাধ মার্জনা কর। আসলে উদ্বিগ্ন উৎকণ্ঠায় আমি একটু বেশি বিচলিত হয়ে পড়েছিলাম।

গান্ধারী গম্ভীর গলায় বলল : ধীবরেরা কী দেখেছিল?

ও কথা থাকুক।

থাকবে কেন, বলতে তো এসেছিলে। না বলে, যাবে কেন?

বলার ইচ্ছেটাই মরে গেছে। তা ছাড়া কথা বলার মত মনের অবস্থা নয়। আমি যাই দেবী।

মিছেমিছি রাগ করে কোথায় যাবে দেবর? আমাদের মত দুটি দৃষ্টিহীন মানুষের ওপর তোমার রাগ করতে কষ্ট হল না? বল? চুপ করে আছ কেন? পুত্ররা আমার দোষ, অন্যায় করতে পারে। কিন্তু তুমি তো তাদের শাসন করতে পার। তিরস্কার ভর্ৎসনা করে তো অপরাধ শুধরে দিতে পার। কিন্তু কর না, কেন? তারা কি তোমার স্নেহের যোগ্য নয়?

এসব কথা বলছ কেন?

তুমি শুধু নও, তোমরা সকলে মিলে বলাচ্ছ। বলার মত অবস্থা সৃষ্টি করেছ।

দেবী, আমার মন ভাল নেই। মনের ভেতর আমার অস্থিরতা। তুমি জেনেশুনে আমাকে অভিযুক্ত করছ। পুত্রেরা তোমার দুরন্ত, দুর্বিনীত, উদ্ধত, কোন শাসন নিষেধ মানে না।

দেবর একথা তো আগে কখনও শুনিনি। এখন শুনছি। মেনে নিলাম তারা দুর্বিনীত, উদ্ধত।

কিন্তু আদর স্নেহ পেলে বনের হিংস্র পশুও বশ হয়। মানুষ হবে না? শুনেছি, মধ্যম কৌন্তেয় দুরন্ত, দুর্দান্ত এবং অত্যন্ত হিংস্র ও উগ্র প্রকৃতির। খেলাধুলার সময় খেলুড়েদের ওপর নির্যাতন, অত্যাচার করে ভীষণ আনন্দ পায়। তোমরা তো শাসন কর তাকে। সে কি শোনে তোমাদের কথা? সবসময় দুর্যোধনকে জব্দ করার ফন্দী তাঁর। তবু তোমার চোখে সে দোষী নয়। এটাই আমার বলার উদ্দেশ্য। কুন্তীর পুত্রদের জন্যে তুমি কত ভাব? তাদের জন্যে তোমার দুশ্চিন্তার অন্ত নেই। কিন্তু আমার পুত্রদের সম্পর্কে তোমার সে অনুভূতি কোথায়? দেবর, আমি তোমার কাছে একটু সহানুভূতি পেতে পারি না কি? আমার পুত্রেরা খারাপ হয়ে যাচ্ছে তোমার সামনে, তবু তাদের ভাল করার কোন দায়িত্ব নিচ্ছ না তুমি? সবার কাছে তাদের শুধু অপরাধী করে রাখছ। শত্রু করে তুলছ। শত্রুর চোখে দেখছ। এটাই আশ্চর্যের কথা।

বিদুর গম্ভীর গলায় বলল ঃ দেবী, কৌন্তেয়দের ঈর্ষা করে তুমি শুধু নিজেকে ছোট করলে।

হায়রে অদৃষ্ট! কৌন্তেয়দের জন্যে নিজের পুত্রদের দিকে তাকালাম না কোনদিন। এত করেও অপবাদ জুটল কপালে। চিরদিন সৎপথে থাকলাম, সৎকর্ম করলাম, সৎ-আচরণ করলাম, সত্য কথা বললাম, ধর্মকে আঁকড়ে থাকলাম। কিন্তু কী পেলাম? আজ নির্মম সত্য কথাটা যখন তোমার ও আমরা পুত্রদের মধ্যে অন্তরাল ভেঙে দিল তখন তুমি আমাকে অপবাদ দিয়ে নিজের দোষ ঢাকলে। আশ্চর্য তোমার চাতুরী। ধিক্ ধিক্ দেবর। তোমাকে ধিক্। তুমি যাও। আমার সব বোঝা হয়ে গেছে। বলতে বলতে রুদ্ধ অভিমানে গান্ধারীর স্বর ভঙ্গ হল। এক গভীর দুঃখের সঙ্গে মিশে গেল তার বুক ভরা কান্না। যার নাম হাহাকার।

চার

একা ঘরে বসেছিল গান্ধারী। কয়েকদিন ধরে তার মন ভাল যাচ্ছিল না। কিসের একটা ভার মনের সঙ্গে সব সময় ঝুলেছিল। গান্ধারী মোটে স্বস্তি পাচ্ছিল না। দুঃখটা কেবল ছাপিয়ে উঠছিল। আর শরীরের ভেতর একটা ছটফটানি হচ্ছিল। কিছু ভাল লাগল না। নিজের মনে ঘর-বার করছিল।

কুন্তীর কথা মনে পড়ছিল। কুন্তী তার জীবনের রাহু। তার স্বপ্ন, প্রত্যাশা, শান্তি, সুখ যেন গিলে খাওয়ার জন্য মুখ ব্যাদান করে আছে। অথচ, হস্তিনাপুরে যখন এল, একবারও মনে হয়নি সে কথা। মানুষের সঙ্গে মানুষের প্রভেদ করার শিক্ষাটা তার ছিল না। এক মহৎ মানবিকতায় ভুলে সে কুন্তীর নির্লজ্জ ব্যভিচারকে ক্ষমা করল, কোনরকম বাদানুবাদ না করে কুন্তী পুত্রদের কোল দিল। সেই ঔদার্যের দাম পরিশোধ করতে হল তার নিজের পুত্রদের দিয়ে। সে কথা মনে হলে গান্ধারীর বুকটা হাহাকার করে ওঠে।

হস্তিনাপুরের সিংহাসনে কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠিরের অভিষেক হবে। দিকে দিকে তার আয়োজন চলছে। সমস্ত নগরী উৎসবে মেতে উঠেছে। ঘরে বসেও গান্ধারী তার নজর কেড়ে নেওয়া প্রস্তুতি দেখতে পাচ্ছিল। দৃশ্যটার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে নাভি থেকে খুব জোরে শ্বাস নিল। একটা গভীর দুঃখের সঙ্গে মিশে গিয়ে দীর্ঘশ্বাস পড়ল। বুকের মধ্যে এক শূন্য যন্ত্রণা অনুভব করল। যার নাম হাহাকার, অনুশোচনা। এ তার সম্পূর্ণ নিজের। একেবারে একার। কারণ এ তার নিজের ভুলের খেসারত। জীবনের কোন কোন ভুল এমনি করে গেঁথে যায়, গেঁথে থাকে। জীবনের শত আবিলতাতেও তা ম্লান হয় না। এই মুহূর্তে সেগুলি মনে ভিড় করে এল গান্ধারীর। উথাল পাথাল করে উঠল বুক।

অনুতাপানলে দগ্ধ হতে হতে নিজের মনে নিরুচ্চারে বলল : হস্তিনাপুরের জীবনে আমি হাঁপিয়ে উঠেছি। এখানে বেঁচে আছি বটে, কিন্তু কোনক্রমে। প্রশ্বাস নেওয়া আর নিঃশ্বাস ফেলা জীবনের লক্ষণ। কিন্তু বেঁচে থাকাটা অন্য ব্যাপার। কুন্তী আমার সেই ইচ্ছেটাকে মেরে ফেলেছে। সন্তানদের সঙ্গে আমার স্নেহমধুর সম্পর্ককে নষ্ট করে দিয়েছে। আমার মনটাকে তেতো করে দিয়েছে। আমার ঔদার্যের ছিদ্র পথ দিয়ে শত্রু প্রবেশ করেছে। আমি নির্বোধ। তাই ষড়যন্ত্রকে টের পায়নি। আমি

চোখ থাকতেও অন্ধ। হায় অদৃষ্ট! রাজমাতা হওয়ার স্বপ্ন গেলে, আমি কী নিয়ে বেঁচে থাকব? সুযোধনের জীবনেরই বা কী রইল?

দরজার কাছে 'মা' ডাক শুনে গান্ধারী চমকে উঠল। স্বপ্ন থেকে হঠাৎই জেগে উঠল। ভীষণ অবসন্ন বোধ করল। চেতনা ফিরে এলে যন্ত্রণা বুকের ভেতর মোচড় দিল। জেগে উঠলে বাস্তবে এত কষ্ট! এত রক্তক্ষরণ হয়!

গান্ধারী কষ্টে দুর্যোধনের দিকে তাকাল। হঠাৎ এই মা ডাকটা তার বুকের ভেতরটা গলিয়ে দিল। সেই গভীর অনাস্বাদিত অনুভূতি বুকের ভেতর কোথায় যে মুখ লুকিয়েছিল জানতে পারেনি। হঠাৎ যেন তারা সুযোধনের আচমকা মা ডাকে অপত্য স্নেহে উৎসারিত হয়ে ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে এল। সুযোধনকে এই মুহূর্তে তার জিজ্ঞাসার জবাব দেবার কিছু নেই। বরং, তাকে দেখেই আতঙ্কে, ভয়ে, হৃৎপিণ্ড স্তব্ধ হয়ে গেল।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সুযোধন বলল : আমার আর বাঁচতে ইচ্ছে করে না। বেঁচে থেকে কী লাভ?

স্তব্ধ হয়ে গেল গান্ধারী। তার বুকের ভেতরটা কেমন করে উঠল। উদ্বিগ্ন উৎকণ্ঠা নিয়ে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল : কেন?

সকলে আমার শত্রু। আমার ভাল চায় না কেউ। ভালবাসে না কেউ।

গান্ধারী লক্ষ্য করল সুযোধনের গলার স্বর কাঁপছে। একটু উঁচু সুরে বাঁধা। বুঝতে অসুবিধে হল না, সুযোধন ভীষণ রেগে আছে। সামলাতে পারছে না নিজেকে। তার নিজের মনটাও সুযোধনের ব্যর্থতায় টাটাচ্ছিল। হতাশ গলায় বলল। কী বলছিস তুই? এসব তোর মনগড়া ধারণা। দু'দিন পরে সব ঠিক হয়ে যাবে।

মাগো, মেনে নেওয়া আর মানিয়ে নেওয়াটা অপমানের ব্যাপার। দুটোই সমান অসম্মানজনক। এই প্রশ্নটা তখনই আসে যখন বঞ্চিত হয় কেউ। ন্যায়ত ধর্মত এ সিংহাসনের উত্তরাধিকারী আমি। কিন্তু আমাকে বঞ্চিত করে যুধিষ্ঠিরের রাজ্যাভিষেক হচ্ছে। নিজের পুত্রের স্বার্থ নষ্ট করে পৃথিবীর কোন রাজা অন্য একজন অবাঞ্ছিত তৃতীয় পক্ষকে সিংহাসনের অভিষেক করছে, শুনেছ কখনও?

গান্ধারী দুঃখের মধ্যে মলিন হাসল। ঠিক হাসি নয় ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে একটু ঠোঁটটা বেঁকে গেল। বলল : আমি না হয় তোদের খারাপ মা, তোদের ভালবাসি না। তুই নিজেই সব সময় সে কথা বলিস। কিন্তু কুরুপতির চোখের মণি তো তোরা। তবু সে এমন কাজ করল কেন?

সুযোধনের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। গান্ধারীর গলার স্বরে এমন কিছু ছিল যে সুযোধন ভয় পেয়ে আস্তে আস্তে চোখ রাখল গান্ধারীর চোখের ওপর। যে ভয়টা গান্ধারীর দিকে তাকানোর সময় সুযোধনের মুখে মাখামাখি হয়েছিল, কথা বলার সময় কিন্তু তা থাকল না। বরং মুখটা বিমর্ষ বেদনায় করুণ আর কাতর হল। বলল : হয়ত, অদ্ভুত বাজে লোক, খারাপ লোক, খারাপ ছেলে, বেশি দুর্বিনীত উদ্ধত বলেই পিতাকে বাধ্য করা হল নামটা বাতিল করতে। তারপর একটু থেমে বলল : আচ্ছা মা, সকলেই আমাদের খারাপ বলে, বাজে বলে, সত্যিই কি তাই? তোমার কী ধারণা?

আমার ধারণার মূল্য কী?

অন্যের কাছে না থাকলেও আমার কাছে তার দাম অনেক। যে যা বলে, বলুক, তুমি কেবল খারাপ বল না। সত্যিই আমি খারাপ নই। একটা ঘটনাও তুমি দেখাতে পারবে না যে, আমি খারাপ কিছু করেছি। আমার কপালটাই নিন্দের। যাই করি না কেন, নিন্দে হয়ে যায় সব।

কী যে বলবে ভেবে পেল না গান্ধারী। সুযোধনের চোখের তারায় নিজের মুখখানা দেখতে পেল। মুগ্ধ বিস্ময়ে চেয়েছিল সুযোধনের দিকে। কতকাল পরে এমন নিবিড় করে দেখল তাকে। সুযোধনের যা কিছু দুষ্কর্ম, সুকর্ম, সব'ত জীবন সম্বন্ধীয় ব্যাপার। কার্যকারণের সঙ্গে যুক্ত। তাই গান্ধারীর বিচার বিবেচনাবোধের মধ্যে গোল বাধাল। তাকে সত্যিই মন্দ করে দেওয়া হল। শিক্ষার

নামে, প্রতিযোগিতার নামে তাদের ওপর অবিচার করা হল শুধু। ঈর্ষা, পরশ্রীকাতরতার বিষে বিষিয়ে দিল তাদের সরল নিষ্পাপ শিশুমনটা। সত্যিই বড় অভাগা তার পুত্রেরা। তবু গান্ধারী সুযোধনের অশান্ত মনকে সঞ্জীবিত করতে বলল : তোমরা নিজেরাই নিজেদের ভবিষ্যৎ নষ্ট করেছ। এর জন্যে বাবা-মাকে দোষী করে তো লাভ নেই। তোমরা অনেক বোকামি করেছ। নির্বোধরাই অমন করে। কোথায় কি করলে ভাল হয় এই বিচারবোধ তোমাদের কোথায়? তোমরা শুধু মিছিমিছি মাথা গরম করে সকলের বিরাগভাজন হয়েছে। নিজেদের কর্মের দোষেই শত্রু হয়েছ।

সুযোধনের দুই চোখ দপ্ করে জ্বলে উঠল। তার গলায় স্বর ঝাঁঝালো হল। বলল : মা তুমি সব জান না। তোমার কানে সব পৌঁছয় না। সব জানলে একথা বলতে পারতে না। তুমিই বল, অন্যায়ের প্রতিবাদ করা কি অপরাধ? চক্রান্তকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া কি অপরাধ? মিথ্যেকে মিথ্যে বলা কি পাপ? ন্যায়বিচারের দাবি করা কি অন্যায়? আমার এই সততা, ব্যক্তিত্ব, সত্যান্বেষণ একশ্রেণীর লোকের পছন্দ নয়। তাই এই সব অন্যায় চলছে। প্রকৃত সত্য জানলে চলত না। সেই প্রচারের কাজটায় আমি পিছিয়ে আছি।

পুত্র, মিছিমিছি অন্যকে দোষারোপ করা, কারো অবমূল্যায়ন করা তোমার উচিত কাজ নয়। পিতৃব্য ভীষ্ম বলেন, যে মানুষ উত্তম সে বোঝে কোনটা ভাল, আর যে মানুষ অধম হয় সে বোঝে কিসে অনিষ্ট হয়। যে উত্তম সে নিজের সত্তাকে ভালবাসে, অন্যকে শ্রদ্ধা করে, আর যে অধম সে ভালবাসে ঈর্ষাকে, প্রাপ্তিকে। যে উত্তম সে তার ভুলের জন্য অনুশোচনা করে, আর নিজেকে শুধরে নিয়ে অসাধারণ হয়ে ওঠে, আর যে অধম সে মনে রাখে কি করে প্রতিশোধ নেবে, কেমন করে নিজের অধিকার, পুরস্কার অর্জন করবে।

সুযোধন গান্ধারীর কথা শুনে রাগ করল না। কোন অভিমানও করল না। একটু হাসল শুধু। ভীষণ বিষণ্ণ আর মরা সে হাসি। বলল : মা, মানুষ এক এক সময়ে এক এক ভাষায় কথা বলে। হস্তিনাপুরে সেই সময় শুধু সুযোধন থাকত। যুধিষ্ঠির এবং তার পঞ্চভ্রাতারা তখন আসেনি। পিতামহ তোমাকে কতবার বলেছেন সুযোধন বড় ভাল। ভারি সহজ-সরল। শিশুর মত। বড় হয়েও ওর ছেলেমানুষী গেল না। মনে পাপ নেই। কোন কথা লুকোতে পারে না, যা মনে হয় বলে ফেলে। এরকম ছেলে জটিল রাজনীতিতে একেবারে বেমানান। জীবনে ওর মতন ছেলেরাই বেশি ঠকে। মনে পড়ে মা কথাগুলো? পিতামহের কথাগুলোই বোধ হয় ঠিক। কিন্তু কোন্ কথাটা ঠিক?

গান্ধারী নিরুত্তর।

জননীর নীরবতা সুযোধনকে বড়ই ধাক্কা দিল। জননী সব জানে, বোঝে সবই। তবু মুখে কিছুই বলে না। ইচ্ছে করেই কি বলে না? এমন উপেক্ষার চেয়ে, বরং দুটো রূঢ় কথা বলতে পারত। হঠাৎ রেগে গিয়ে দুটো কিল-চড় মারতে পারত। তা-হলে জানত সুযোধন যে, জননীর কাছে তার কিছু দাম আছে। কিন্তু গান্ধারীর অদ্ভুত ঠাণ্ডা এই নির্বিকার দ্বেষহীন, ঈর্ষাহীন ব্যবহার তাকে ভিতরে ভিতরে ভীষণ যন্ত্রণা দেয়। প্রতিকারহীন যন্ত্রণা তার বুকের ভেতর পাকিয়ে ওঠে। দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে বেরিয়ে এল তীব্র জ্বালার উষ্ণ লু-তে। বলল : মা তোমার এই নিস্পৃহ নীরবতা আমি সইতে পারি না। ভীষণ অপমান লাগে। নিজেকে বড় ছোট মনে হয়। তোমার বিরাগের হেতু বুঝি না। অথচ, একটাই শুধু দোষ করেছি। তাও ইচ্ছায় নয়, ঈর্ষাতেও নয়। অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে ভীমকে আমাদের ভেতব থেকে সরিয়ে দেয়ার জন্যে হাত-পা বেঁধে জলে ফেলে দিয়েছি, সেটাই ছিল আমার একমাত্র অপরাধ, আর ভুল। এর জন্যে অনেক শাস্তি, তিরস্কার পেয়েছি। কিন্তু কেউ ভেবে দেখল না, ভীমের হাতে আমাদের অদৃষ্টের লাঞ্ছনা এখনও অনেক বাকি বলেই তার কোন ক্ষতি হল না। আমাদের অদৃষ্টের গুণেই ভীম প্রাণ নিয়ে ফিরল। এটা কেউ দেখল না। ছেলেমানুষীর সেই কলঙ্ক গেল না। ভীমের দুর্ব্যবহার, অত্যাচার, নিষ্ঠুরতা চাপা পড়ে গেল, আমাদের কলংক বড় হল। সেই একটাই তো ঘটনা। কিন্তু তবু আমার ছেলেমানুষীকে তুমি ক্ষমা করতে পারলে না। বুঝতে চাইলে না আমরা মনের দিক দিয়ে কতখানি অসহায় ছিলাম। অভিমান নিয়ে তুমি আমাদের কাছ থেকে দূরে সরে থাকলে। আমবা তোমার চোখেও দুরন্ত, দুর্বৃত্ত, দুর্বিনীত, উদ্ধত হয়ে থাকলাম।

তোমার অবহেলা পেয়েই তো সুযোধনের জীবনটা নষ্ট হয়ে গেল। তোমার একটু সমাদর পেলে সুযোধনের জীবনটা ভরে উঠত।

গান্ধারী সুযোধনের চোখে চোখ রেখে বলল : পুত্র, আমার মন ভালো নেই; তোমার কথা শুনলে কারো মন ভালো থাকে না। এমন করে তুমি আমাকে অভিযোগ করতে পার না।

মা, যে সবের জন্যে তোমার মন ভাল নেই, যে সব কথা তোমার শুনতে ভাল লাগছে না, তার জন্যে তো তুমি দায়ী। তোমার দোষেই তো আমি মানুষের চোখে খারাপ হয়ে গেলাম।

ছিঃ!

মা-গো এ-সংসারে অন্য কারো জন্যে যে কিছু করতে পারে সেই ভাগ্যবান। আর যার জন্যে কিছু করার তেমন কেউ নেই সেই হতভাগা। তুমি একটু চেষ্টা করলে ভীমকে নিবৃত্ত করতে পারতে। যুধিষ্ঠির তো তোমার অনুগত ছিল। তাকে একটু বললেই সব মিটে যেত। কিন্তু তুমি তা করনি। এ বিরোধ মিটিয়ে ফেলতে তুমি চাওনি। তুমি নীরব থেকে বিরোধ বাড়তে পরোক্ষ ইন্ধন দিয়েছ। একটু ভেবে দেখলে কথাটা অস্বীকার করতে পারবে না।

সুযোধন, এসব তোমার মন গড়া ধারণা। মা হয়ে সন্তানের কেউ ক্ষতি চায়?

মা, আমার বুকের ভেতর জ্বালা ধরা অনুভূতিতে জ্বলছে। আমার সমস্ত খারাপত্বকে আমি স্বীকার করি, কিন্তু একথা বলতে পারো না যে, তুমি আমাকে ভাল করার জন্যে কোন সৎ উপদেশ দিয়েছ; কিংবা ভাল হয়ে চলার পরামর্শ দিয়েছ? অথচ সব মা তার সন্তানকে এই শিক্ষাটুকু দিয়ে থাকে। তুমি দাওনি। অথচ তোমার একটা ডাক শোনার জন্যে আমার কি ব্যাকুল প্রতীক্ষাই না ছিল। অনেক ছোট-খাট দোষ তো তোমার ডাক শোনার জন্যে করেছি। কিন্তু সে ডাক কোনদিন এল না। যুধিষ্ঠির এবং ভাইরা কত ভাগ্যবান। ছোট মা (কুন্তী) তাদের সঙ্গে জড়িয়ে ছিল। মায়ের অভাব কোনদিন তারা বোধ করেনি। তাই বোধ হয় ওরা আমাদের চেয়ে বেশি প্রকৃতিস্থ এবং শান্ত। ওদের দিকে তাকালে নিজেকে বড় ব্যর্থ, আর দীন মনে হত।

গান্ধারীর বুক কেঁপে গেল। একটা ব্যথা ব্যথা করতে লাগল। হতভম্ব চোখে সে সুযোধনের মুখের দিকে কিছুক্ষণ বাক্যহারা হয়ে চেয়ে রইল। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে স্খলিত স্বরে উচ্চারণ করল : সুযোধন! দুটো চোখ ভরে জল টলটল করতে লাগল।

সুযোধনের মনটাও কেমন করে উঠল। বুকের ভেতরটা তার ভেঙে গুঁড়িয়ে যেতে লাগল একটা পাষাণ ভারে। দুটো বড় চোখে নিষ্পলক দৃষ্টি। কেমন শূন্য। ভারাক্রান্ত গলায় চাপা স্বরে বলল : আমি না হয় খারাপ। খুব খারাপ। ধরলাম আমি না হয় অনেক অপরাধ করেছি।

গান্ধারী দু'হাতে কান চাপা দিয়ে যন্ত্রণায় মাথা নাড়ল ঘন ঘন। বলল : ও সব কথা থাক। আমি আর শুনতে চাই না!

কেমন একটা মরিয়া আবেগে সুযোধন দ্রুত চাপা গলায় বলল : শোন, শোনাটা ভীষণ দরকার। অন্যায়, অপরাধ দোষ; কে করেনি মা? কেউ ধোয়া তুলসীপাতা নয়। অমন যে আচার্য দ্রোণ, তিনি নির্দোষ নন। অর্জুনও সমান অপরাধী। কেবল প্রকাশভঙ্গি প্রত্যেকের আলাদা। দ্রোণাচার্য, অর্জুনের অধর্মের কোন তুলনা হয় না। তবু তারা কেউ অপরাধী নয়। খুব অবাক লাগছে তাই না? ধনুর্বিদ্যায় অর্জুনের সমকক্ষ হতে না পারার দুঃখ ছিল মনে। অর্জুনের অহংকারে আমি খুব অপমান বোধ করতাম। ঈর্ষায় পাগল হয়ে তাকে হারাতে চেয়েছি, এটাই আমার অপরাধ। তুমি তো বল ভাল ঈর্ষা সব সময় বরণীয়। ঈর্ষা সুমহতি। ঈর্ষা মানুষকে শ্রেষ্ঠত্ব দেয়। আচার্য দ্রোণ আমার ঈর্ষাকে দেখলেন, আমার অসম্পূর্ণতা পূরণের উদ্যমকে দেখলেন না। আমার প্রতি সুবিচার করলেন না। অর্জুনই আচার্যের সব নজর কেড়ে নিল। আচার্য অর্জুনের সাফল্যে কৃতিত্বে গর্বিত। নিজের ব্যর্থতা এবং আচার্যের স্নেহভাজন না হওয়ার অভিমানে অভিমানী সুযোধন কেমন একটু বদলে গেল। আগুন যেমন জলকে বদলে বাষ্প করে দেয়, তেমনি একটা পরিবর্তন অনুভব করল সুযোধন। অর্জুনের অহংকার আর আচার্যের গর্ব চূর্ণ হয় এমন একটা বিকল্প তৃতীয় শক্তি খুঁজলাম। একদিন আশ্চর্যভাবে জুটেও গেল। বিকর্ণ, দুঃশাসন, আমি তিনজন মৃগয়া করে ফিরছি। দেখলাম এক নিষাদ

বালক চোখ বন্ধ করে আমাদের লক্ষ্য করে অবিরাম শর বর্ষণ করে চলেছে। আমাদের আক্রমণের কোন সুযোগ দিচ্ছে না। আমাদের নিবৃত্ত করছে, অথচ একটি শরও আমাদের শরীর বিদ্ধ করছে না। আবার কোন ক্ষতও হল না। এ হেন দক্ষ শরচালনায় পুলকিত হয়ে অর্জুনকে বললাম : তৃতীয় পাণ্ডব, আচার্য দ্রোণের শিষ্য একলব্যের শরনিক্ষেপের নৈপুণ্যের কাছে তুমি শিশু। তার সমকক্ষ হতে তোমার আর এক জন্ম দরকার হবে। অর্জুন সেকথা শুনে ক্ষিপ্তপ্রায় হয়ে দ্রোণাচার্যকে বলল : আপনার প্রিয় শিষ্য বলে আমার আর কোন গর্ব রইল না। নিষাদ-পুত্র একলব্যকে অর্জুনের প্রতিদ্বন্দ্বী করে অপমান করার কি কোনও দরকার ছিল আচার্য?

আচার্য দ্রোণের সব গর্ব চূর্ণ হল। আচার্যের বিনা সহায়তায় নিজ প্রতিভায় ও অনুশীলনে একলব্য হল শ্রেষ্ঠ ধনুর্ধর। অর্জুন তার কাছে তুচ্ছ। অর্জুনকে সন্তুষ্ট করতে তার প্রতিদ্বন্দ্বীকে নির্মূল করতে আচার্য ধর্মবুদ্ধি বিসর্জন দিলেন। অত্যন্ত অন্যায়ভাবে একলব্যের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠটি গুরুদক্ষিণা চাইলেন। বীর একলব্য হাসতে হাসতে সে আদেশ পালন করল। আচার্যের এত বড় অধর্মের কোন নজির নেই। অর্জুনের এহেন সংকীর্ণ স্বার্থপরতার কোন ক্ষমা নেই। তবু তারা মহান। অথচ একলব্যের মহৎ আত্মত্যাগের জন্যে অর্জুনের কোন সহানুভূতি ছিল না। এমনই পাষাণ প্রাণ তার। কিন্তু পাষণ্ড সুযোধনের প্রাণ ফেটেছিল একলব্যের জন্যে। সুযোধনের আনন্দ, সুখ সহানুভূতিকে বলা হল ঈর্ষা, অর্জুনের সঙ্গে শত্রুতা করা। বলতে পার, সুযোধন ও অর্জুনের শত্রুতার সেই সূচনা।

গান্ধারী অবাক হল না। এতো সে জানেই। এই ঘটনার কিছুকাল পরেই সুযোধনই তাকে প্রশ্ন করেছিল। বহুকাল পর সেই অদ্ভুত প্রশ্নটি তার নতুন করে মনে উদয় হল। আচ্ছা মা, একটা কথা প্রায় শুনি, আমরা কৌরব আর যুধিষ্ঠিররা পাণ্ডব। এর মানে কী? একবংশের ছেলে আমরা। তবু ওরা নিজেদের কৌরব না বলে, পাণ্ডব বলে কেন? ওরা কৌরব নয় কেন? ওরা যদি পাণ্ডব হয়, আমরা তবে ধার্তরাষ্ট্র নই কেন? গান্ধারী কিছুক্ষণের জন্যে ভীষণ অন্যমনস্ক হয়েছিল। নিজের মনে মাথা নাড়তে লাগল। দুঃখে কেঁপে উঠল তার বুক। একটা শ্বাস তার বুকে আটকে আঁকুপাঁকু করতে লাগল। কাঁপা গলায় বলল : আমার মন্দভাগ্যের জন্যেই তোমাদের এত দুর্ভোগ।

সুযোধন প্রশ্নাতুর চোখে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বলল : মন্দভাগ্য করে কেউ আমরা আসেনি। লোকের চোখে আমাদের মন্দ করে তোলা হয়েছে। কীভাবে করা হল সেই রহস্য ভেদ করতে না পারলে ভুল ভাঙবে না। তোমার চোখ খুলবে না। আচার্য দ্রোণ, কৃপ কোন অদৃশ্য কারণে পাণ্ডবদের সঙ্গে আমাদের আলাদা করে দেখতেন জানি না। আমরা আচার্যদ্বয়ের কোন অসম্মান করিনি, অশ্রদ্ধা করিনি। তাঁদের অবাধ্য হইনি। নির্দেশ অমান্য করিনি। তাঁদের শিক্ষায় কোন ফাঁকি দেইনি। অনুশীলনের কোন ত্রুটি করিনি। তবু সর্বক্ষণ পঞ্চ-পাণ্ডবের সঙ্গে তুলনা করে আমাদের অপমান, অসম্মান করা হত। অপরাধ কি, দোষ কোথায়, তিরস্কার, ভর্ৎসনার কারণ কি—প্রশ্ন করা, কিংবা জানতে চাওয়া ছিল আমাদের অপরাধ। আমাদের প্রতি আচার্যদের দুর্ব্যবহারে পাণ্ডবেরা কৌতুক অনুভব করত। আর আমরা অপমানিত বোধ করতাম। সব কিছু সহ্যের একটা তো সীমা থাকে। মানুষের যা কিছু সুন্দর অনুভূতি পাওয়া তা তো ভালবাসা দিয়ে তৈরি। কিন্তু বিরাগ, বিতৃষ্ণা যখন আমাদের সব কিছুকে বিদ্রূপ করে, তখন বুকের ভেতর জেগে ওঠা বঞ্চনার যন্ত্রণা, আর ভীষণ অপমান যেন উগরে দেয় বিষ। জানি, ওর ভেতর একরকম চাপা নিষ্ঠুরতা আছে, এক অন্ধ পাশবিক ক্রোধ আর নীরব জেদ আছে। গুরু-শিষ্যের উভয়েরা অসম্মানের সম্পর্কটা অন্যরূপ নিল। তাতে ক্ষতি হল আমাদের। কুপুত্র, কুলাঙ্গার, দুরাত্মা, ঘোর কলি গালাগালিতে আমাদের সম্পর্কটাই প্রায় মরে যাওয়ার মত হল। অস্ত্রপরীক্ষার রঙ্গভূমিতে সেই তফাতটা একদিন ধরা পড়ল। প্রতিযোগিতা সর্বসাধারণের জন্যে উন্মুক্ত করে দিয়ে কার্যত অর্জুনের সমকক্ষ ধনুর্ধর অন্বেষণ করাই ছিল লক্ষ্য। অনাহূত কর্ণ অর্জুনের অস্ত্র নিক্ষেপের নৈপুণ্য দেখে একটুও অবাক হল না। বরং তার কৃতিত্বের পরীক্ষা দিতে এগিয়ে এল। তার স্পর্ধা এবং সাহসে বিচলিত হল পাণ্ডবেরা, আচার্য দ্রোণ এবং পিতৃব্য বিদুর। কর্ণের কাছে অর্জুনের পরাজয় অনিবার্য চিন্তা করেই তাঁরা একটা গোলমাল পাকাল। জাতপাতের প্রশ্নে, জনতা পাণ্ডব-কৌরব দুই শিবিরে বিভক্ত হয়ে গেল। কৌরবের শত্রু

ও মিত্রবেশী শত্রুকে সেইদিনই চেনা হয়ে গেল। অর্জুন কর্ণের ভয়ে ভীত। কর্ণের পক্ষ নিয়ে অর্জুনের গর্ব খর্ব করতে আমরা পাণ্ডবদের ও অন্যান্য পূজ্যপাদদেরও বিরোধিতা করলাম। একটা দারুণ মজা আর উত্তেজনার মধ্যে সময় কেটে গেল। বিপন্ন আচার্য দ্রোণ তখন প্রিয়তম শিষ্যকে আগলানোর জন্যে বললেন, রাজার ছেলে এবং রাজা ব্যতিরেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে না। তৎক্ষণাৎ কর্ণকে আমি অঙ্গরাজ্যে অভিষেক করলাম। পাণ্ডবপক্ষের সকলে আমাকে ছিঃ ছিঃ করল।

আচার্য দ্রোণ কটুবাক্যে ভর্ৎসনা করল। বলল : তুমি অত্যন্ত হীন, নীচ। ঈর্ষাপরায়ণ। তোমরা ঔদ্ধত্য ক্ষমার অযোগ্য। একজন সামান্য রাজপুত্র হয়ে তুমি অধিরথপুত্র কর্ণকে অঙ্গরাজ্য দেবার কে? তোমাকে সে অধিকার দিল কে? ন্যায়ত ধর্মত মহারাজা ধৃতরাষ্ট্রই রাজ্যের অধিপতি। তাঁর অনুমতি, সম্মতি ব্যতীত কোন রাজ্যই কাউকে দেওয়া যায় না। কিন্তু তুমি মূর্খ। হিংসায়, বিদ্বেষে অন্ধ হয়ে নিজের অধিকারের সীমা লঙ্ঘন করেছ। রাজ্য কারো খেলনা নয়। এখানে বয়োজ্যেষ্ঠ পিতামহ ভীষ্মও আছেন, তুমি তাঁকেও অপমান করছ। তোমার ধৃষ্টতা দেখে আমরা-মর্মাহত। লঘু-গুরু জ্ঞান পর্যন্ত নেই। তোমার অভিষেক গ্রাহ্য নয়। অর্জুন কখনও একজন অজ্ঞাতকুলশীল ব্যক্তির সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে পারে না।

আচার্যের তিরস্কারে ভর্ৎসনায় অপমানিত সত্তা হঠাৎ বিদ্রোহ করল। শরীরের কোষে রক্তের উত্তাপ চড়ল। ক্রোধ সংবরণ করতে পারলাম না। আচার্যের মুখের উপরেই বললাম : এই রণক্ষেত্রে সর্বসাধারণের প্রতিযোগিতার অধিকার আছে। প্রতিযোগিদের কুলশীলের কোন নিষেধ নেই। বীর্যের পরিচয়ই সব। বীর্যের দাবি নিয়ে যে কেউ প্রতিযোগিতা করতে পারে। জাতিগত, বৃত্তিগত, কোন শর্ত-প্রতিযোগিতায় নেই। আপনারা অনর্থক জাতপাতের প্রশ্ন তুলে ভেদাভেদ সৃষ্টি করছেন। সুস্থ প্রতিযোগিতার পরিবেশকে বিষিয়ে তুলছেন।

আচার্য দ্রোণ ধমকে বলল : তুমি চুপ করবে?

বললাম : আচার্য, অপরাধ মার্জনা করবেন। বলতে বাধ্য হচ্ছি, একজন যথার্থ বীরের এহেন অবমাননা, অসম্মান, কোন বীর করে না। কর্ণের সবচেয়ে বড় পরিচয় জামদগ্নের শিষ্য সে। জাতপাতের ব্যাপারটা সেখানেই শেষ হয়ে গেছে। তবু বন্ধুবর কর্ণকে অপমান করা হল অর্জুনের স্বার্থে। এটা ন্যায়বিচার নয়। আপনাদের ধর্মবুদ্ধির কাছে আমারও পাল্টা প্রশ্ন : পাণ্ডবদের অজ্ঞাতকুলশীল বলব না কেন? তারা কৌরববংশের কেউ নয়। নিজেদের তারা কখনও কৌরব বলে না। একই পরিবারে পাণ্ডব-কৌরব দুটি বংশধারা কেমন করে হয়? অর্জুনের প্রতিযোগিতায় যদি অধিকার থাকে, তা-হলে কর্ণেরও আছে। কর্ণ অজ্ঞাতকুলশীল নয়। আমরা চাই এই প্রতিযোগিতা হোক সমানে সমানে। এতে আপত্তির কী থাকতে পারে? নিম্নশ্রেণীর দর্শকেরা সহসা হর্ষোৎফুল্ল হয়ে করতালি দিল। ঠিক এই সময় ঘটল এক নাটকীয় ব্যাপার। ছোট-মা মূর্ছা গেল।

প্রচণ্ড হৈ-চৈ উত্তেজনার মধ্যে কারো গলার স্বর কিছুক্ষণ শোনা গেল না। কিন্তু সব কোলাহল ছাপিয়ে উঠল পিতৃব্য বিদুরের কণ্ঠস্বর। ক্রোধে তাঁর দুই চোখ জ্বল জ্বল করতে লাগল। উত্তেজনায় ঠক ঠক করে কাঁপছিলেন। কম্পিত গলায় বললেন : কুলাঙ্গার। বংশের দুর্ভাগ্য। গান্ধারীর পূর্বজন্মের পাপ। তাই তোর মত এমন নরাধমকে পেটে ধরেছিল।

গান্ধারীর বুকের ভেতরটা ভীষণ কেঁপে উঠল। মনে হল, আকাশ যেন ভেঙে পড়েছে তার মাথার ওপর। আর তার তলায় চাপা পড়ে ছটফট করছে সে। বিদুর সঞ্জয়ের কথাগুলো চোখের ওপর ছায়া ফেলেই দ্রুত সরে যাচ্ছে। মস্তিষ্কে সেই ছায়া পৌঁছে দিতে পারছে না কোন একটা গভীর প্রত্যয়। কারণ এখন মস্তিষ্কের মধ্যে অনেক জায়গা। এতদিন ধরে বুঝতে পারিনি, বিদুর সঞ্জয় তাকে অন্ধকারে রেখেছে। তাদের কাছে শুনে শুনেই মনটা তেতো হয়ে উঠেছিল। মরুভূমির মত উষর। রুক্ষ কাঁটাগাছের জীবন বুকে করে সে বেঁচেছিল। শূন্যতা পূরণ হলেই শুধু জানা যায় তার ব্যাপ্তি এবং গভীরতা কতখানি। তখনই সে অনুভব করে জীবনযুদ্ধে প্রতিদিন প্রতি প্রহরে কত ঘটনার সঙ্গে হাতে হাত রেখে মৃত্যুর মুহূর্ত অবধি চলতে হয়। এটাই জীবনের নিয়ম। বাঁচা মানে যে এমন এক ভরন্ত উচ্ছল অভিজ্ঞতা নিয়ে বাঁচা গান্ধারী ভাবতেই পারেনি। তাই ভীষণ

অনুশোচনা হল। দুঃখ হল। বেশ বুঝতে পারল মনটা একেবারে পুরনো পথ থেকেই সরে এল। তবে বড় দেরি করে এই বুঝতে পারার জন্যে তাকে দাম দিতে হল। গান্ধারীর নির্লিপ্ত ভাবটা কেটে গেল। এমন করে ভুল ভাঙাতে সুযোধন আগে কখনও আসেনি তার কাছে। সব বাঁধন আলগা করে ভাসিয়ে নিয়ে গেল প্রাত্যহিক গার্হস্থ্য-অপত্যের জটিলতার জীবনে। আনন্দের তীব্রতম বিন্দুতে পৌঁছানোর পরেই বোধ হয় মন বড় ছটফট করে। গান্ধারীর এ অনুভূতি সম্পূর্ণ নতুন। হঠাৎ পাওয়া। এই মন নিয়ে বড় জ্বালা। গান্ধারী বড় কষ্টেই উচ্চারণ করল : সবকিছুর ভেতর যে এত জটিলতা আছে কেমন করে জানব পুত্র? বেঁচে মরে থেকেই বলেছি 'চমৎকার আছি'। জীবনটাকে পুরোপুরি মাটি করেই প্রতিনিয়ত নিঃশব্দে যে পৌঁছে যাচ্ছি শ্মশানে টের পাইনি। আজ বাঁচাটা এমন এক ভরন্ত উচ্ছল অভিজ্ঞতা যা তোর কাছ থেকে না শিখলে আমার জানার বাইরে থাকত।

রাত নেমে আসছে ধীরে ধীরে।

অন্ধকারের ভেতর আলাদা আলাদা করে গাছপালা, বাড়িঘর কিছুই চেনা যাচ্ছিল না। গান্ধারীর নাকে রাতের গন্ধ ছাপিয়ে সুযোধনের গায়ের গন্ধ লাগছিল। নিজের সন্তানের গায়ের গন্ধের মত মিষ্টি গন্ধ পৃথিবীতে আর নেই। সব বাবা-মায়েরাই সে গন্ধ চেনে। এক আশ্চর্য মুগ্ধতা নিয়ে গান্ধারী চেয়ে রইল। বুকের ভেতর হৃদয় ভাঙা হাহাকার তাকে অস্থির করে তুলল। সেই তীব্র শূন্যতাকে পূর্ণ করে নিতে মনে মনে নিরুচ্চারে বলল : হ্যাঁ, সুবিচার বা অন্যায়ের প্রতিকার এইভাবেই করা উচিত। মুখ বুজে অন্যায় মেনে নিলে অন্যায়ের পাল্লা শুধু ভারী হয়, আত্মসম্মানও নষ্ট হয়। আত্মসম্মান আর করুণা চাওয়া এক জিনিস নয়। সুযোধন ঠিকই করেছে। অবিচারকে অবিচার দিয়েই মুচেছে। সুবিচার, ন্যায় বিচার যেখানে নেই, সেখানে অন্যায় করা অনেক ভাল।

গান্ধারী সুযোধনের মাথায় হাত রাখল! মাথা আঘ্রাণ করল। আর এক অনাস্বাদিত সুখ আর তৃপ্তিতে কি যেন গলে পড়তে লাগল, আর এক অনাস্বাদিত তৃপ্তিতে ভরে উঠল তার ভেতরটা। আস্তে আস্তে বলল : আমি জানতাম, আমরা পুত্রেরা খারাপ নয়, খারাপ কাজ করতে পারে না। তবু, আমাকে যারা তোদের কথা বলত, তারা কেউ সত্য কথা বলেনি। তাদের বিশ্বাস করে আমি ঠকেছি। না বুঝে, না জেনে আমার পুত্রদের অপমান করেছি।

একটা ঘটনাতেই তুমি অনেক বদলে গেছ।

গান্ধারীর চোখে মুগ্ধতা। গলার স্বরে অভিভূত আচ্ছন্নতা। বলল : তা ঠিক। না বদলানো মানে'ত থেমে থাকা। যুধিষ্ঠির আর তার ভাইদের প্রতি যে বিশেষ বাৎসল্যের ভাবটা ছিল। তা, বোধ হয় আর নেই। শক্ত হবার, স্বার্থপর হবার সময়, নিজের দিকে চাইবার সময় সব মানুষেরই জীবনে আসে। তবে আমার ক্ষেত্রে বড় দেরি করে হল।

চমক ভেঙে সুযোধন বিস্ময়ে উচ্চারণ করল : সে কী?

গান্ধারীর গলার স্বর দৃঢ় অথচ গম্ভীর হল। বলল : নিজের পথে চলতে ভয় পেও না পুত্র। আমার কোন কাজের অর্থ যদি বুঝতে না পার, আমার ওপর বিশ্বাস রাখতে চেষ্টা কর।

সুযোধনের অবাক হওয়ার পালা। বহু বছর পরে এই প্রথম জননীকে খুব কাছে পেল। একেবারে নিজের মত করে পেল। জীবনের একটা চরম সংকটের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যখন থমকে দাঁড়াল, ঠিক তখনই ঘটল এই অদ্ভুত ঘটনা। খুব আশ্চর্য লাগল সুযোধনের। এমন করে মাকে জেতার কথা আগে কখনও ভাবেনি সে। এখন মনে হচ্ছে, যা সে জানত আজ অবধি তা ঠিক নয়। কারো জানা বোধ হয় অভ্রান্ত নয়। জানার জগৎ রোজই বিশেষ বিশেষ ঘটনায় বদলে যায়। এতকাল জননী সম্পর্কে যেটাকে অভ্রান্ত এবং নিশ্চিত সত্য বলে জানত। সেটা যে তার কত বড় ভ্রম, আজ জানল। হয়ত এমন না হলে সকলের জীবন এমন এক নিশ্চল বিন্দুতে স্থির হয়ে থেমে থাকত। তার অবাক জিজ্ঞাসু দুই চোখে কেমন একটা তন্ময়তা ফুটে ওঠল। একটা আবেগ অনুভব করল। কণ্ঠরুদ্ধ নিচু স্বরে বলল : মা, কী ভালো যে লাগছে! দারুণ! আজ আমি জয়ী। আমার সবচেয়ে বড় জয় হয়েছে।

বিশাল বারান্দা পেরিয়ে আসতেই বিদুর দেখল কুন্তী খোলা দরজার মুখে দাঁড়িয়ে আছে। বোধহয় তারই প্রতীক্ষা করছিল।

কুন্তীর দিকে চেয়ে রইল বিদুর। কিছুক্ষণ আগেই স্নান করেছে। বেশ একটা স্নিগ্ধ নির্মলতা তার সর্বাঙ্গ ছুঁয়ে আছে। দুগ্ধ ফেননিভ সাদা রেশমের শাড়ি তার পরনে, গায়ে ব্লাউজ। চুলে সাদা কবরী। দারুণ সুন্দর লাগছিল কুন্তীকে। কাকাতুয়ার মত। দেবকীর (বিদুরের স্ত্রী) চেয়ে অনেক বেশি সুন্দরী কুন্তী। এই বয়সেও তার শ্রী অটুট আছে। দেবকীর সৌন্দর্য শুধু শরীরে। কুন্তীর রূপ, সৌন্দর্য শ্রী শরীর ছাপিয়ে মনে, বুদ্ধিতে, পরিশীলনের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। প্রকৃত সৌন্দর্য তো শরীরসর্বস্ব নয়, আরো কিছু। মনের আলোয় আভাসিত না হলে তার দীপ্তি বিচ্ছুরিত হয় না।

মুগ্ধতায় বিদুরের দুই চোখের চাহনিতে কেমন একটা তন্দ্রার ভাব নামল। ভারি সুন্দর একটু হাসল। চোখের পাতা কেঁপে গেল কুন্তীর। লজ্জা পেয়ে মলিন হাসল। লাজুক হাসি। বলল : ঘরে এস।

কুন্তী নিজের পালঙ্কের এক কোণে মাথা হেঁট করেই ছিল। সেইভাবেই নিজের করতলের দিকে চেয়ে বলল : ক্ষত্তা এখানে যা কিছু জোর, অধিকার তোমাকে নিয়েই। তোমার জন্য সব ফিরে পেয়েছি।

বিদুর সহসা একটু অপ্রস্তুত হল। বলল : এই একটা কথা বার বার বলে, তুমি কি মজা পাও বলতো?

উদাস গলায় বলল : আমার সমস্ত জীবন দিয়ে তোমাকে চেয়ে আর তোমাকে গোপন রেখে কাটিয়ে দিতে হল। মনে হচ্ছে, আমাদের সেই সম্পর্কটা এবার নাড়া খাবে।

বিদুর একটু রসিকতা করতে গিয়েও চুপ করে গেল। একটু ইতস্তত করে বলল : হঠাৎ এরকম অদ্ভুত কথা মনে হল কেন?

কুন্তী বলল : যুধিষ্ঠিরের অভিষেকের একবছর পূর্ণ হল। তবু কৌরবদের সঙ্গে তার সম্পর্ক ভাল হল না। উভয়ের ভেতর কোন সেতুবন্ধনও হল না। কৌরবেরা পাণ্ডবদের শত্রুর চোখে দেখে। শত্রুর মত আচরণ করে। এটা ভাল বোধ হচ্ছে না।

বিদুর হাসি হাসি মুখ করে বলল : রাজনীতিতে, উত্তেজনা, অনিশ্চয়তা, থাকবে পৃথা। নিরুত্তাপ রাজনীতি কারো ভাল লাগে?

ক্ষত্তা, আমরা কিন্তু ব্যাপারটা ভাল লাগছে না। গান্ধার থেকে শকুনি পাকাপাকিভাবে এসেছে হস্তিনাপুরে। তার আগমনের সঙ্গে সঙ্গে হস্তিনাপুরের রাজনীতি নতুন রূপ নিয়েছে। এখন সংঘাত কৌরবদের সঙ্গে পাণ্ডবদের প্রত্যক্ষ হয়। সংঘাত হস্তিনাপুরের যুবরাজ যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে সাধারণ মানবকুলের।

বিদুর নিরুত্তাপ গলায় বলল ঃ জানি।

জেনেশুনে তুমি চুপ করে থাকতে পারছ?

সব কিছুর প্রস্তুতির জন্যে একটা সময় দরকার।

তোমার কথা শুনে আমার ভয় করছে।

পৃথা, আবেগ দিয়ে নয়, বুদ্ধি দিয়ে বোঝ। নানারকম স্বার্থে সংগঠিত হচ্ছে জনগণ। শ্রেণী সংঘাত গোষ্ঠী সংঘাতের প্রবল ঝড় তেড়ে আসছে যুধিষ্ঠিরের সিংহাসনের দিকে। একলব্যের গুরুদক্ষিণা, কর্ণের অপমান, শূদ্র কর্ণকে ভীমের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, শকুনির সাধারণ মানুষ ক্ষেপানোর অস্ত্র হয়ে উঠেছে। শকুনি খুব সহজে এদেশের নির্জিত, অশিক্ষিত জনতাকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছে পাণ্ডবেরা শূদ্রদের ঘৃণা করে, তাদের অচ্ছ্যুৎ বলে, তাদের শ্রেষ্ঠত্বকে অস্বীকার করে, মানুষ বলে জ্ঞান করে না। তাদের পদানত করে রাখতে চায়। ব্রাহ্মণ, মুনি-ঋষিদের তোষামদ করা, ব্রাহ্মণ্যরাজ প্রতিষ্ঠাই তাদের লক্ষ্য। কিন্তু দুর্যোধন বংশগত তো নয়ই, জাতিগত, বৃত্তিগত, ভেদাভেদও মানে

না। তার কাছে মানুষ বড়, মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব, বীরত্বকে সে পূজা করে। বীরশ্রেষ্ঠ কর্ণের অপমান দূর করতে তার হৃত গৌরব ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করতে দুর্যোধন তাকে সখা করেছে, অঙ্গরাজ্যে অভিষেক করেছে। একলব্যের প্রতিভার সমাদর করতেই তাকে অর্জুনের প্রতিদ্বন্দ্বী করেছে। আর পাণ্ডবেরা একলব্যের খ্যাতি কেড়ে নিতে তার অমূল্য বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠটি কেটে নিয়ে তাকে চিরতরে পঙ্গু করে দিয়েছে। সত্যমিথ্যে মেশানো এসব ঘটনা ও যুক্তি সাধারণ মানুষের মন কেড়ে নিয়েছে। দুর্যোধন যে তাদের খুব নিকট-জন এই বিশ্বাস শূদ্র ও অনার্যর প্রতি তার প্রবল সহানুভূতিবোধ থেকেই সৃষ্টি হয়েছে। তাদের বিশ্বাসকে নিজের অনুকূলে ব্যবহার করতে দুর্যোধন প্রচার করল, শূদ্র ও অনার্যদের গৌরব ও মর্যাদা বৃদ্ধির উদ্যোগটি পাণ্ডবদের পছন্দ নয় বলেই পঞ্চপাণ্ডবেরা তাদের নানাভাবে হেনস্থা করছে। দুর্যোধন পাণ্ডব ও ব্রাহ্মণদের জাতপাঁতের গোঁড়ামির বিরোধিতা করে বলে, বর্ণবিদ্বেষের বাড়াবাড়ি ও মানুষে মানুষে বিভেদ সৃষ্টির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াচ্ছে বলেই পাণ্ডবেরা তাদের সম্পর্কে নানা অপবাদ রটাচ্ছে।

কুন্তী অধৈর্য হয়ে বলল : ক্ষত্তা, এসব মনগড়া ব্যাখ্যা দিয়ে যুধিষ্ঠিরের শত্রুতা করছে। এরকম বড় মিথ্যের জাল বুনে দুর্যোধন পারবে নিজের স্বার্থকে চিরকাল টিকিয়ে রাখতে?

পৃথা, রাজনীতিতে নিজের স্বার্থ নিরাপদ করাই হল বড় কথা। এর সঙ্গে সত্য, মিথ্যা, ন্যায়-অন্যায়, অধর্মের কোন সম্পর্ক নেই।

বিদুরের অকপট স্পষ্ট ভাষণের উত্তরে কুন্তী কোন কথা বলতে পারল না। একেবারে অভিভূত হয়ে গেল। বিদুরকে ক্লান্ত, বিমর্ষ ও চিন্তিত দেখাল। বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে কাটল উভয়ের। তারপর কুন্তীই বলল : ক্ষত্তা, যুধিষ্ঠির কী এইসব মানুষের বিশ্বাস, আস্থা ও শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে উঠতে পারে তার ব্যবস্থা কর।

বিদুরের মুখে স্মিত হাসিটি বেশ গোলাকার হল। বলল : আমিও যে সেকথা ভাবিনি তা নয়। কিন্তু সব সময়ের ব্যাপার।

তুমি শুধু সময় সময় করছ কেন? মানুষের জীবনের সময় বড় অল্প। এই অল্প সময়ের ভেতর সুধন্য ভরপুর হয়ে চলে যেতে হয় তাকে।

পৃথা, সমস্যার মূলে যে‌েত হবে। যুধিষ্ঠির যে বিরাট ক্ষমতার অধিকারী, সে তার নিজের অর্জিত নয়, উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়াও ঠিক নয়। বহু মানুষ বিশ্বাস করে ব্রাহ্মণ, অমাত্যদের চাপে পড়ে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র নিজের পুত্রকে বঞ্চিত করে পান্ডুপুত্রের হাতে ক্ষমতা তুলে দিতে বাধ্য হয়েছে। এই ক্ষমতা ব্রাহ্মণ-পুরোহিতদের করুণায় পাওয়া। এ ক্ষমতার ব্যবহারে সাধারণ মানুষের কোন কল্যাণ, মঙ্গল এবং উন্নতি হবে না। বরং, যুধিষ্ঠিরের রাজ্যে তাদের স্বার্থ ও সুখ বিপন্ন হবে।

ক্ষত্তা, এতবড় মিথ্যে প্রচারটাকে লোকে বিশ্বাস করল।

পৃথা, ভুল আমাদের কিছু হয়েছে। যে ব্রাহ্মণ মুনি-ঋষিদের সাহায্য নিয়ে যুধিষ্ঠির সিংহাসন পেল, জয়ের পর তাদের দাবি মেটাতে গিয়ে আদর্শের দিক থেকে, সত্যের দিক থেকে যুধিষ্ঠিরকে দেউলে হয়ে যেতে হয়েছে। এটা সত্য। যত কঠোর হোক স্বীকার করতেই হবে। সাধারণ মানুষ নিজের চোখেই দেখেছে যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণদের নিষ্কর জমি এবং গোধন দান করেছে। রাজকোষ থেকে ব্রাহ্মণ ও মুনি-ঋষিদের সেবায় নিয়মিত অর্থের মাসোহারা বন্দোবস্ত করেছে। কিন্তু গরিব নিরন্ন প্রজাদের অবস্থার কোন উন্নতি হয়নি। তারা যে দরিদ্র সেই দরিদ্রই থেকে গেছে। যুধিষ্ঠিরকে তারা বিশ্বাস করে না। যতদিন কর্ণের এবং একলব্যের মত বীরের অপমান, অসমাদর এবং ব্রাহ্মণদের প্রতি যুধিষ্ঠিরের পক্ষপাতিত্বের কথা সাধারণ মানুষের মনে থাকবে ততদিন এ রাজ্যের বঞ্চিত নির্যাতিত মানুষ যুধিষ্ঠিরকে বিশ্বাস করবে না।

তা-হলে উপায়? যুধিষ্ঠিরের কী হবে?

দুর্যোধনের বিরোধী জনমত গড়ে তোলা খুব কঠিন। তারপর তোমার আমার সম্পর্ক নিয়ে নানারকম বিদ্রূপ কানে আসছে। ঘরে বাইরে তুমি ও তোমার পুত্রেরা শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছ। হস্তিনাপুরে বেশিদিন থাকা এখন তোমাদের নিরাপদ নয়। এখান থেকে সুকৌশলে গাত্রোত্থান

করা এবং রাজ্য-রাজধানীর বাইরে যাওয়া খুবই জরুরী হয়ে পড়েছে। প্রাসাদ অভ্যুত্থানে তোমার পুত্রদের বিপদ হওয়া কোন অসম্ভব ব্যাপার নয়।

কুন্তীর মুখে কোন কথা যোগাল না। দুই ভুরুর সংযোগস্থল কুঁচকে গেল। ললাটের মধ্যশিরা ফুলে উঠল। আতঙ্কে, সংশয়ে, জিজ্ঞাসায় তার মুখের রঙ কেমন ফ্যাকাশে হয়ে গেল। কেমন বিভ্রান্ত হয়ে পড়ল সে। কুন্তীর পায়ের তলায় ভূকম্পন হচ্ছিল। ভেতরে ভেতরে সে অধৈর্য হয়ে পড়েছিল। বহু কষ্টে উচ্চারণ করল : তা-হলে আমরা কী করব?

বিদুর নিরাবেগ চিত্তে বলল : আপাতত হস্তিনাপুরের বাইরে যাওয়া দরকার। সেখান থেকে অন্য কোথাও। কিন্তু সব কাজটাই ভীষণ চুপিসারে করতে হবে। ধৃতরাষ্ট্র কিংবা শকুনি কিছু বুঝে ওঠার আগেই যুধিষ্ঠির ধৃতরাষ্ট্রের অনুমতি নিয়ে কুরুজাঙ্গালের বাইরে মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে বিশ্রাম ও বিনোদনের জন্যে রাজকার্য থেকে কিছুদিন অব্যাহতি নিয়ে যদি যেতে পারে তা-হলে সবচেয়ে ভাল হয়।

কুন্তী ভীষণ চমকে উঠল। ভেতরটা তার শীতে-হাড়-কাঁপুনি হাওয়ার মত কাঁপিয়ে দিয়ে গেল। অবিশ্বাসভরা চোখে বিদুরের দিকে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর হতাশ গলায় বলল : ক্ষত্তা, অবশেষে তুমিও বদলে গেলে। নিঃসহায় পাণ্ডবেরা সত্যিকারে অনাথ হল এবার। তাদের বন্ধু-আত্মীয় বলে কেউ থাকল না। অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ, ভাগ্য আর ঈশ্বর তাদের সহায়। কিন্তু আমি যে হারালাম বিশাল সাম্রাজ্য।* কিসের আশায় বেঁচে থাকব বলতে পার? তুমিই আমার আশার দীপ। সে দীপ নিভে গেল। হায়রে! অদৃষ্ট!

কুন্তীর দিকে গভীর দৃষ্টিতে চেয়ে রইল বিদুর। তার দুই চোখে কৌতুক ও মৃদু হাসি। বলল : অভিমানেই তোমাকে সুন্দর দেখায়। পরে, সে সময় অনেক পাব। এখন শুধু মনকে দৃঢ় কর। ভবিষ্যতের জন্যে প্রস্তুত হও। সব কিছুর জন্যেই জীবনের অনেক মূল্য দিতে হয়। রাজনীতিতে চিরস্থায়ী জয়-পরাজয় বলে কিছু নেই। অধিকার হারায়, আবার ফিরেও পায়। ওসব নিয়ে চিন্তা করা বৃথা। তুমি ভয় ত্যাগ কর। বিশ্বাস রাখ!

বুক খালি করা নিঃশ্বাস ত্যাগ করে কুন্তী বিদুরের মুখের দিকে তাকাল। তাকাতে গিয়ে চোখটা ঝাপসা হয়ে গেল।

পাঁচ

পাণ্ডবদের হঠাৎ বারাণবতে যাত্রা নিয়ে গান্ধারী কোন মাথা ঘামাল না। যুধিষ্ঠির তার কাছে বিদায় নিতে এলে কোন ঔৎসুক্য দেখাল না। জিগ্যেস করল না, কেন যাচ্ছ? হঠাৎ এমন কী ঘটল যে লোকালয়ের বাইরের নির্জন অরণ্যে বসবাস করার জন্যে কুঠি করলে? অথবা, কবে ফিরছ? বারণাবতে কতকাল থাকবে? এসব বললে, পাঁচটা কথা এসে যায়। তাই ওসব কিছুই বলল না। মামুলি বাঁধাধরা কটা কথা বলল। সাবধানে থেক। মায়ের দিকে দৃষ্টি রেখ। ভীমকে একটু সামলিয়ো! তারপরেই যুধিষ্ঠিরের চিবুকে হাত দিয়ে নিজের মুখে ঠেকাল। আর চুক্‌চুক্ করে মুখ দিয়ে অদ্ভুত একটা শব্দ বার করল। যরা অর্থ স্নেহচুম্বন অর্পণ। বলল : এস বাছা। যাত্রার সময় দেরি করে দেব না।

যুধিষ্ঠির কথা বলার কোন সুযোগ পেল না। মাথা হেঁট করে নিঃশব্দে ধীর পায়ে বেরিয়ে গেল। যুধিষ্ঠিরের প্রস্থানে গান্ধারী বেশ একটা স্বস্তি অনুভব করল। বুকের ভেতর থেকে উৎকণ্ঠার ভার নেমে গেল। একটা দারুণ ভাল লাগার সুখে সে তার ভেতরটা ভরে উঠতে লাগল।

গান্ধারীর দুই চোখ যুধিষ্ঠিরের ওপর স্থির। যুধিষ্ঠির একবারও পিছন ফিরে তাকাল না। লম্বা

---

* আগ্রহী পাঠককে এ সম্পর্কে আরো গভীর করে জানতে হলে মৎ-লিখিত "কুরুক্ষেত্রে দ্বৈপায়ন" অবশ্যই পাঠ করতে হবে।

লম্বা পা ফেলে সে এগোতে লাগল। গান্ধারীর হঠাৎ মনে হল, হস্তিনাপুরের আকাশ থেকে ধূমকেতুও অপসারিত হল যেন। সেইসঙ্গে সব অমঙ্গল, অশান্তিও বিদায় নিল। মনটাও পবিত্র হয়ে গেল।

অপরিসীম তৃপ্তিতে, সুখ ও আনন্দে তার হৃদয় মথিত হতে লাগল। আর ভীষণ ভারমুক্ত মনে হল।

গান্ধারী দু'চোখ খুলে আরেকবার চাইল যুধিষ্ঠিরের দিকে। বড় ভাল লাগল। কী যে দেখাচ্ছিল তার ঐ যাত্রার মধ্যে? মন কখন কার মধ্যে যে কী দেখে মনও বোধ হয় জানে না। মনের এসব লীলা বোঝাই ভার। এ সবের যে ব্যাখ্যা হয় না তা নয়! কিন্তু মস্তিষ্কের কাছে তার কোন মূল্যই নেই। থাকবে কী করে? গান্ধারীর অন্তরে কোথায় কত জায়গায় যে ব্যথা তা তো অন্যে জানবে না।

এই মুহূর্তে গান্ধারী নিজের শূন্যতাকে বড় বেশি করে অনুভব করল। এই শূন্যতা সব সময় সে আড়াল করে, গোপন করে একা বয়ে বেড়ায়। কখনও কারোকে টের পেতে দেয়নি। পাছে দুর্যোধন জানলে কষ্ট পায়, কিছু একটা করে বসে—এই ভয়ে সে নিজের সব কষ্টকে, দুঃখকে আত্মসাৎ করে নিয়েছে নিজের ভেতর। আজ সেই লুকোন মনটা তার কাছেই ধরা দিল। তাই এক নিষিদ্ধ ঈর্ষায়, সে এত নির্লজ্জ ও নিষ্ঠুর হয়ে উঠল। কে জানে তার ব্যক্তিত্ব, নারীত্ব, মাতৃত্বই বোধ হয় তাকে এই নির্লজ্জতা দিয়েছে। দিয়েছে শুধু তাকে নয়, সব মেয়েকে, সব মাকেই। এটা সে ভুলে গেছিল। ইচ্ছের রক্তশূন্যতায় তাই তাকে ভুগতে হচ্ছিল। যুধিষ্ঠিরের চলে যাওয়ার সাথে সাথে মনে হল, পৃথিবীর আর সকল মায়ের মতই সন্তানের সাফল্য ও সার্থকতার সুখে নিজেকে ভরপুর করে বাঁচবে। নিজের জীবন, নিজের ভাললাগা, নিজের ইচ্ছেকে নিয়ে, পুত্রদের নিয়ে তার সকাল-সন্ধে কাটবে, কারোকে ভয় না করেই।

গান্ধারীকে ভাবনায় পেল। নারী মাত্রেই জায়া ও জননী। সব নারীই তাই চেয়ে এসেছে স্বামী পুত্রের সাফল্য, সুখ, আরাম, তৃপ্তি, শান্তি। যুধিষ্ঠিরের যাওয়ার পেছনেই যেন পড়ে রইল সেই প্রত্যাশার পৃথিবীটা।

জানলা দিয়ে বাইরে দিকে মনে মনে বলল : যুধিষ্ঠির, সুযোধন তোমাদের মত কেড়ে নিয়ে ভোগ করতে জানে না। কেড়ে নিতে পারে না বলেই, আত্মসম্মান জ্ঞান, অভিমান, আরো অনেক গভীর বোধগুলি তার বেশি। সে কেবল ওর ভেতরই আছে বলে, ও তোমাদের মতও নয়, আর দশটা মানুষেরও মতও নয়। চারপাশের প্রতিবেশী রাষ্ট্র ও কুরুজাঙ্গলের কৃষ্ণকায় শ্বেতকায় সাধারণ মানুষগুলো আজ তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে, তার সঙ্গে রয়েছে। তোমরা ভয় পেয়ে, ভরসা হারিয়ে অভিসন্ধি নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছ। তাই বড় ভয় হচ্ছে। মানে, তোমাদের ভয় পাচ্ছি।

আতংকে গান্ধারী চোখ বুজল। ঢোক গিলল।

গান্ধারীর আশংকাই একদিন সত্য হয়ে গেল। রাজধানীতে সংবাদ এল বারণাবতের বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে পঞ্চ-পাণ্ডবদের বাসগৃহ সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়েছে। দগ্ধ গৃহের ভস্মরাশি সরিয়ে একটি মহিলা ও পাঁচটি যুবকের দগ্ধ দেহ পাওয়া গেছে। তাদের চেনা যাচ্ছে না। সুতরাং তারা কুন্তী এবং পঞ্চ-পাণ্ডব ছাড়া অন্য কেউ নয় বলেই সকলের অনুমান। এরকম একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছল সকলে। রাজধানী হস্তিনাপুরে শোকের ছায়া নামল।

কিন্তু গান্ধারীর কেমন যেন খটকা লাগল। সন্দেহটা কিছুতে গেল না। বার বার মনে হতে লাগল, এর ভেতর কোথাও একটা বড় ভুল আছে, কিন্তু তার কিনারা করতে পারল না।

বারাণাবত থেকে ফিরে এসে সুযোধন এক অদ্ভুত কথা শোনাল। গান্ধারীর মনটা তাতেই ভীষণ খারাপ হয়ে গেল। বড় গর্ব ছিল সুযোধনকে নিয়ে। নিমেষে সব কেমন গোলমাল হয়ে গেল। বুকের ভেতরটা গুঁড়িয়ে গেল এক অসহ্য যন্ত্রণায়। গান্ধারীর ফর্সা মুখখানা কাগজের মত সাদা রক্তশূন্য। নিজেকে তার বড় দীন লাগল। সামান্যা রমণী মনে হল। দুঃখটাকে বুকে চেপে ধরে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে কথা গিলে গিলে বলল : একি গর্ব করে বলার মত কোনো কথা? এই জঘন্য

হত্যাকাণ্ডের পেছনে আমার সন্তানেরা আছে একথা ভাবতে কষ্ট হচ্ছে। ঘেন্না হচ্ছে। আমি একজন হত্যাকারী, ঘাতকের মা যাবে। আমার সব গর্ব এমন করে ধুলোয় গড়াগড়ি ভাবতে পারেনি। ভীষণ কষ্ট হচ্ছে। নিজেকে আমার সান্ত্বনা দেবার মত কিছু থাকল না। শান্তও হতে পারছি না। এ এক ভীষণ সমস্যা। আমার স্বপ্ন ভাঙল, বিশ্বাস গেল, আদর্শ হারাল। আমি কী নিয়ে বাঁচব! সব মানুষ একটা প্রত্যাশা নিয়ে বাঁচে, আমার কোন প্রত্যাশাই রইল না।

গান্ধারীর ব্যাকুলতায় সুযোধন একটু বিব্রত ও বিচলিত হল। উদ্বিগ্ন গলায় বলল : মা উতলা হওয়ার মত কিছু হয়নি। ভাবাবেগ অস্থির হওয়রা মত কোন কারণ ঘটেনি। তুমি শুধু বুঝতে চেষ্টা কর।

ঈর্ষায় অন্ধ হয়ে, ক্ষমতায় উন্মত্ত হয়ে তুই খুন করেছিস। নিদ্রিত অবস্থায় অত্যন্ত অসহায়ভাবে তাদের হত্যা করা হয়েছে। এর চেয়েও জঘন্য পাপ, অপরাধ কিছু হয় না।

মা, কোনটা পাপ, কোনটা পুণ্য বিচার করা খুব কঠিন। রাজনীতিতে হত্যা কোন অপরাধ নয়, পাপও নয়। এই হত্যা রাজনৈতিক কারণে হয়েছিল। অমন যে রামচন্দ্র জিতবার জন্যে নিরপরাধ বালীকে হত্যা করে সুগ্রীবের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছিল। রাবণ, ক্ষমতা করায়ত্ত রাখতে ভগ্নীপতি বিদ্যুৎজিহ্বাকে হত্যা করেছিল। বিভীষণের মত সত্যদর্শী ভ্রাতুষ্পুত্র ইন্দ্রজিৎকে হত্যা করতে সাহায্য করেছিল। মহর্ষি দধীচিও জ্ঞাতি বধের জন্যে নিজের দেহাস্থি দান করতে কুণ্ঠিত হয়নি। রাজনীতিতে হত্যা কোন ঘটনা নয়। সেজন্য পাপ, অনুশোচনাও কেউ করে না। রাজনীতি মানেই শুধু স্বার্থ। যেন তেন প্রকারে স্বার্থ ও ক্ষমতাকে স্ববশে রাখাই রাজধর্ম। রাজনীতিতে একেই বলে কূটনীতি।

গান্ধারী ধাঁধায় পড়ল। সত্য-মিথ্যার কুটিল দ্বন্দ্বে তার চিত্ত আলোড়িত হতে লাগল। এক গভীর অন্যমনস্কতার মধ্যে চোখ টান টান করে সে ভাবতে লাগল। আর নিজের মনেই মাঝে মাঝে মাথা নাড়াচ্ছিল যার অর্থ নানাবিধ ও অপরিচ্ছন্ন।

সুযোধন জননীর এই সংকট সময়টিকে নিজের অনুকূলে আনার জন্যে বলল : পাণ্ডবেরা সাপের মত নিঃশব্দে চলাফেরা করে এবং সুযোগ পেলেই অতর্কিতে দংশন করে, এই কথাটা তোমার জানা দরকার আছে।

গান্ধারী গভীর আচ্ছন্নতার মধ্যে ডুবে থেকে বলল : সাপ আর মানুষ এক হল?

পাণ্ডবদের সঙ্গে সাপের স্বভাবের তেমন কোন পার্থক্য নেই। যে সাপুড়ে দুধ কলা খাইয়ে সাপকে বাঁচায় পরিচর্যা করে, সেই সাপ কিন্তু সাপুড়ের সামান্য অসতর্কতার সুযোগে তাকে দংশন করতে ভোলে না। এই যে তোমরা পাণ্ডবদের বুকে তুলে নিলে, তারা তোমাদের মহানুভবতা, স্নেহের কী দাম দিল? পিতা তো সম্পূর্ণ সুস্থ সবল, স্বাভাবিক, কর্মঠ তবু তাদের দেরি সহ্য হল না। তড়িঘড়ি করে যুধিষ্ঠিরকে যুবরাজপদে অভিষেক করল! কেন করল? অবিশ্বাস, সন্দেহ। সিংহাসনের ওপর পাণ্ডুর উত্তরাধিকারীত্বকে কায়েম করে রাখল। এতে যে পিতার অপমান হল, তার স্নেহের প্রতি অবিশ্বাস করা হল সেটুকু তারা অনুভব করল না। তাদের এই স্বার্থপরতা, হীনতাকে আমার ভাল লাগেনি। অনেকেরই পছন্দ হয়নি। মন্ত্রীবর কনিক তো সখেদে বললেন : মহারাজ কাজটা ভাল করেননি। শত্রুকে সমাদর করে কিংবা রাজ্য সম্পদ দিয়ে মনোরঞ্জন করে কেউ কখনও তার হৃদয় পরিবর্তন করতে পারে না। নিজের ধ্বংসকেই অনিবার্য করেছেন। এখনও সময় আছে। — আমি, মাতুল, শকুনি, সখা কর্ণ, ভ্রাতা দুঃশাসন, মহাপ্রাজ্ঞ কনিক মিলে সেই সময়টাকে যুধিষ্ঠিরের দিক থেকে আমাদের দিকে পার হওয়ার সেতু তৈরি করেছি।

গান্ধারীর দীর্ঘশ্বাস পড়ল। অনুভূতির রন্ধ্রে রন্ধ্রে পুত্র সুযোধনের জঘন্য স্বজনবধের একটা গভীর দুঃখবোধ নিবিড় বেদনায় মিশে ছিল। সেই দারুণ পরিতাপ গভীর হতাশায় শ্বাসের সঙ্গে বেরিয়ে এল। যার নাম হাহাকার। অনুতাপবিদ্ধ কণ্ঠে গান্ধারী বলল : স্বজনহত্যার ওপর প্রতিষ্ঠিত সিংহাসনে বসে তোরা কোন্ শান্তি, সুখ পাবি?

সুখ শান্তি মনের ব্যাপার। তবে, কাজের জন্যে কোন অনুতাপ কিংবা কোন দুঃখ নেই আমার।

শত্রুনিধনের করণীয় কর্মকাণ্ড নিয়ে কোন অনুশোচনা আমার নেই। পাণ্ডবেরা আমাদের আত্মীয় নয়। আত্মীয়ের মত কোন কাজ তারা করেনি। ক্ষমতার আসন আঁকড়ে ধরে থাকার জন্যে কত জঘন্য মন্তব্যই না করেছে তারা। স্বজনবেশী সেই শত্রুকে বিনাশ করা কোন পাপ নয়। তার জন্যে মনের শান্তিও নষ্ট হয় না। তুমি মন খারাপ কর না। তাতে শুধু দুঃখ পাবে। রাজনীতির চাকা থেমে থাকবে না। স্বার্থ, লোভ, ঈর্ষা, হিংসা, উচ্চাশা, অন্ধ উন্মত্ততা নিয়ে ঠিক নিজের পথে এগোবে। তা-নাহলে পাণ্ডবদের পালের হাওয়া আমরা কেড়ে নিলাম কেমন করে?

কথাটা শুনে গান্ধারীর বুকের ভেতর অস্থিরতার ঢেউ বয়ে গেল। তার সূক্ষ্ম অনুভূতিতে ধর্মবোধে নানা মিশ্র অনুভূতির প্রতিক্রিয়া ঘটল। আস্তে আস্তে, ক্লান্ত শ্বাসের সঙ্গে উচ্চারণ করল : পুত্র, এইভাবে কেড়ে নেওয়া নিয়ে গর্ব কর?

সুযোধন উৎফুল্ল হয়ে বলল : গর্ব হয় বৈকি! সব জানলে তোমারও গর্ব হবে।

গান্ধারীর অধরে বিচিত্র মলিন হাসির বিদ্যুৎ খেলে গেল। বলল : সন্তান স্নেহে অন্ধ হয়ে বিবেক বিসর্জন দিইনি পুত্র।

সুযোধনের মুখে হাসি চোখে কৌতুক। বলল : ধর্মাত্মা মায়ের সেই গর্বটুকু আমারও সুখ। ধর্মপ্রাণ মায়ের সন্তান হয়ে আমিও ধর্মত্যাগ করিনি। পিতার ধর্ম-মাতার ধর্ম যেমন এক নয়, তেমনি রাজার ধর্ম-প্রজার ধর্ম, সাধুর ধর্ম-গৃহীর ধর্ম এক নয়। ধর্মের অর্থ বহু। ধর্ম একটা বিশাল অনুভূতির ব্যাপার। ক্ষেত্র ও পাত্র বিশেষে ধর্মের প্রকৃতি ও চরিত্রও ভিন্ন। যুধিষ্ঠির, পিতৃব্য বিদুর অধর্ম করিনি। যখন জানতে পারলাম, হস্তিনাপুরে যুবরাজ যুধিষ্ঠির খুব নিরাপদ বোধ করছে না। এবং কোন একটা অছিলায় স্থান ত্যাগে প্রস্তুত, তখনই চটপট তাদের উদ্দেশ্যমত একটা পরিকল্পনা করলাম। তাদের কিছু বোঝার আগেই পিতা তাদের বসন্তকালীন বিনোদন করতে বারণাবতে পাঠাল। যুধিষ্ঠির প্রস্তাবটা লুফে নিল।

এসব কথা বলতে তোমরা লজ্জা হল না?

লজ্জা হবে কেন? মায়ের কাছে ছেলের কোন লজ্জা নেই। একমাত্র মায়ের কাছে অকপটে সব বলা যায়।

গান্ধারীর বুকের ভেতর একটা অদ্ভুত শিহরন ছড়িয়ে গেল। দারুণ মুগ্ধ চমকে মুখের ভাবটাও পাল্টে গেল। সুযোধন মিথ্যে বলতে পারে না। মিথ্যাচার ব্যাপারটা ওর ভেতর নেই বলেই মিথ্যাচারী ভণ্ড পৃথিবীতে ওর এত দুর্দশা। গান্ধারী একটুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইল।

সুযোধন আড়চোখে তাকিয়ে থেকে গান্ধারীর মনের ভাব বুঝতে চেষ্টা করল। তারপর কী ভেবে নিয়ে কথা বলার ধারাটা একটু বদলাল। বলল : পাণ্ডবেরা নিজেরাই হস্তিনাপুর থেকে বেরোনোর একটা অজুহাত খুঁজছিল। মিথ্যে ছলনা করে যাওয়া থেকে তাদের বাঁচানো কী অপরাধ? তারপর একটু থেমে জননীকে প্রশ্ন করল · হস্তিনাপুর থেকে পাণ্ডবদের যাওয়ার উদ্দেশ্য কী, জানতে চাইলে না তো?

জেনে কী হবে?

সত্যটা জানতে পারতে। সুযোধন বিরোধী জনমত সংগঠন করতে যে শোষিত অব্রাহ্মণ শ্রেণীকে তারা মানুষ বলে মনে করেনি, জাতপাতের প্রশ্নে দূরে সরিয়ে রেখেছিল তাদের সঙ্গে একটা সুসম্পর্ক গড়ে তোলা ছিল তাদের বড় স্বার্থ। অবাধে সে কাজ করার সুযোগ দেওয়া কি দোষের? তাদের সেবাযত্নের কোন ত্রুটি যাতে না হয়, সেজন্য মন্ত্রীবর পুরোচনকে নিযুক্ত করা কি খুব খারাপ কাজ হয়েছিল? সৌন্দর্যপ্রিয় পাণ্ডবদের বাসগৃহটি তাদের পছন্দমত চিত্তাকর্ষক করতেও কোন ত্রুটি ছিল না। কিন্তু তাদের অতিরিক্ত দুর্যোধন বিরোধী কার্যকলাপের ফলে যদি নিশীথে প্রতিশোধের আগুন দপ্ করে জ্বলে, তাহলে কি খুব একটা দোষ হয়?

সুযোধন। গান্ধারী আর্তস্বরে চিৎকার করে ওঠল। বলল : মানুষ এত নির্দয়, নিষ্ঠুর হতে পারে?

মানুষ পারে, পশু পারে না।

সুযোধন আমার সামনে থেকে সরে যা। নরঘাতক, পিশাচ পুত্রের মুখ দর্শনও পাপ।

মা, ধৈর্য হারিয়ো না। জীবনের সব উত্তর তো আবেগ দিয়ে পাওয়া যায় না। অতীতও মুছে যায় না। বরং অতীতের পাঠ থেকে মানুষ শিক্ষা নেয়। এই ঈর্ষা, দ্বেষ, আমাদের পুরনো শত্রুতা। তাই আমার কোন অনুশোচনা নেই। দুঃখ্যু হয় পুরোচনের জন্যে। প্রতিহিংসার আগুন জ্বালতে গিয়ে সে নিজের গৃহে নিজের দ্বগ্ধ হল। আমার সব কান্না তার জন্যে। আমি একজন বন্ধু হারালাম। কৌরব-পাণ্ডবের বিরোধের প্রথম শহিদ সে!

গান্ধারী সহসা গম্ভীর হল। কেমন একটা অন্যমনস্কতায় চোখ টান টান করে সে সুযোধনের মুখের দিকে চেয়ে রইল। অনেকক্ষণ চোখের তারা দুটিতে অন্তর্ভেদী নিবিড়তায় ঘন হয়ে উঠল। মন নানাবিধ মিশ্র প্রতিক্রিয়ায় জটিল। এখন কোন গ্লানিবোধ ছিল না। যা বিঁধে ছিল তা একটি মারাত্মক সন্দেহ; আর একটা গভীর জিজ্ঞাসা। নিজেই নিরুচ্চারে প্রশ্ন করল : পুরোচন নিজের গৃহে অগ্নিদগ্ধ হল কেন? ভস্মরাশি সরাতে গিয়ে একটি সুড়ঙ্গ পাওয়া গেল কেন? ছটি অগ্নিদগ্ধ দেহই বা এল কোথা থেকে? সব মিলিয়ে গোটা ব্যাপারটাই তার কাছে জটিল হয়ে গেল।

বারো বছর পরের ঘটনা। কিন্তু গান্ধারী ভুলে যায়নি বারণাবতের ঘটনা। একা থাকলেই তার মনে পড়ে যায়। নিজের কাছেই তখন তার উত্তরহীন প্রশ্ন, বারণাবতে পাণ্ডবেরা সত্যিই কি অগ্নিদগ্ধ হয়েছে? এই জিজ্ঞাসায় মনটা কিছুক্ষণ পাখির মত ডানা মেলে দেয় বারাণাবতের আকাশে। একটা সত্যে পৌঁছনোর চেষ্টার মধ্যে সময়টা বেশ কেটে যায়। চিন্তার মধ্যে এক ধরনের মুক্তি পায়। কিন্তু বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না। ঘটনাগুলোকে নেড়ে-চেড়ে, ঝাড়াই-বাছাই করতে করতে ক্লান্তি নেমে আসে। তখন এটাকে আর আবশ্যিক মনে হয় না। চরম ব্যর্থতা আর হতাশা থেকেই বোধ হয় এরকম দৃষ্টিভঙ্গি জন্মায়।

কয়েকদিন ধরে গান্ধারীর মনটা ভাল যাচ্ছিল না। ভেতরে ভেতরে একটা উৎকণ্ঠা তাকে কুরে কুরে খাচ্ছিল। কারণ একটা ছিল। সুযোধন গেছে পাঞ্চাল রাজ্যে। সেখানে পাঞ্চালরাজ দ্রুপদের বিদূষী এবং অনিন্দ্য সুন্দরী কন্যা কৃষ্ণা বীর্যশুল্কা হবে।

স্বয়ংম্বর সভায় যোগ দেবার জন্যে এবং প্রতিযোগী হওয়ার জন্যে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বহু রাজা, রাজপুত্র, বীর যোদ্ধা, রথী, মহারথী পাঞ্চালে এল। হস্তিনাপুরও নিমন্ত্রিত হল। সুযোধন, দুঃশাসন ও কর্ণের সঙ্গে স্বয়ম্বর সভায় যোগ দিল। যাত্রার আগে গান্ধারী তাদের ডাকল। বীর্যশুল্কার পরিণাম কখন ভাল হবে না তার মনে হল। এতে অংশগ্রহণকারী প্রতিটি প্রতিযোগীর মধ্যে রেষারেষি বাড়বে। মিত্রও শত্রু হবে। শ্রেষ্ঠ সুন্দরী রমণী নিয়ে পৃথিবীতে যত যুদ্ধের হুংকার শোনা গেছে, রণ দামামা বেজেছে, হিংসার আগুনে রাজ্য জ্বলেছে, গ্রাম-নগর পুড়েছে, আর কিছুতে তত হয়নি। বীর্যশুল্কা করে দ্রুপদ যে একটা কিছু করতে চাইছে, এটা গান্ধারীর জননী-প্রাণ টের পেল। তাই সুযোধন, দুঃশাসন এবং কর্ণকে দিয়ে শপথ করে নিলে যে বীর্যশুল্কায় কৃষ্ণাকে যে লাভ করবে অন্য দু'জন বন্ধু হয়ে তার বিপদের পাশে দাঁড়াবে এবং তাকে সব রকম সাহায্য করবে।

গান্ধারীর অন্তরে তবু স্বস্তি ছিল না কেবলই মনে হচ্ছিল, এই স্বয়ম্বর সভা খুব একটা নিশ্চিত অনুষ্ঠান নয়। তার বাতাসে ঝড়ের সংকেত। একটা ভয়ংকর কিছু ঘটবে। ইতিহাসের মোড় ঘুরবে। মাতৃহৃদয়ের এই উদ্বেগটা তাকে আচ্ছন্ন করে রাখল। কারণ অগণিত বীরের ভেতর যে কৃষ্ণাকে জিততে পারবে সে রাজকন্যার সঙ্গে বীর-গর্ব, খ্যাতি, প্রতিষ্ঠা পাবে। একটা বিরাট রাজ্য জয়ের মতই সম্মান ও সৌভাগ্য অর্জন করবে। বৃহৎ শক্তিজোটের* ওপরেও তার ধাক্কা পড়তে পারে বলেই শক্তিজোটের দুই শিবিরে সব রাজাই পাঞ্চালে সমবেত হয়েছে। কিন্তু বৃহৎ শক্তিজোটের বাইরে

* মৎ-লিখিত 'শ্রীকৃষ্ণ পুরুষোত্তম' পাঠ ব্যতীত শক্তিজোটের উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য-স্পষ্ট হবে না। উৎসুক পাঠক-পাঠিকাকে উক্ত গ্রন্থটি পাঠ করতে অনুরোধ করি। দুই বৃহৎ শক্তিজোটের একদিকে আছে জরাসন্ধের অনুগত ও প্রভাবিত ৮৪টি ভারত রাজ্য (উত্তর, পূর্ব ও মধ্য ভারত) এবং পশ্চিমের যাদব সমবায় রাজ্য।

নিরপেক্ষ পাঞ্চাল রাজ্যে এরকম একটা অদ্ভুত শক্তিপরীক্ষার প্রতিযোগিতা করে নিজেকে বিতর্কের ভেতর টেনে আনল কেন? এই 'কেন' প্রশ্নটাই রহস্যে আবৃত। বীর্যশুল্কা দ্রুপদ-নন্দিনী কৃষ্ণার স্বয়ম্বর সভা বহুজনের কৌতূহল নিয়ে বোধ হয় কোন নতুন ইতিহাস সূচনা করবে। সেই অজানাকে জানার জন্যে গান্ধারীর উৎকণ্ঠিত প্রতীক্ষা ধৈর্য মানছিল না।

গান্ধারী কল্পনায় দেখল, বীর্যশুল্কা কৃষ্ণা স্বয়ম্বর সভায় এসে দাঁড়িয়েছে। বিয়ের কনের সাজে কী অপূর্ব লাগছে তাকে। তার মেঘধূসর কুন্তল, চন্দ্রশোভার মত ললাট, পদ্মনালের মত কণ্ঠ, আর যুগল কমল কলির মত বুক, মৃগ নয়নের মত চোখ যেন অনন্ত সৌন্দর্য ডোরে বাঁধা পড়েছে। গান্ধারীর বুকের ভেতরটা কেঁপে গেল। নিজের অজান্তে একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস পড়ল। শ্বাসের সঙ্গে মনে মনে উচ্চারণ করল : পাঞ্চালী, জয়-পরাজয়ের মরীচিকা তুমি। তোমাকে দেখে ভয় হয়। তবু কল্পনা করতে ভাল লাগল। কন্যাপণের বিচিত্র শর্তগুলো মেনে সুযোধন জয়ী হয়েছে। কৃষ্ণা তাকে বরমাল্য পরিয়ে বরণ করছে। সুযোধনের দুই চোখে আনন্দ, মুখে বিজয়ীর গর্বিত হাসি। তারপর কৃষ্ণার হাত ধরে সোনার রথে উঠল। কৃষ্ণাকে পাশে বসিয়ে তার বীরপুত্র আসছে সোনার রথে। পথের দুইধারে অগণিত জনতা হর্ষোৎফুল্ল হয়ে জয়ধ্বনি দিচ্ছে। আর সেই কাল্পনিক দৃশ্যে গান্ধারীর বুকের ভেতরটা নিবিড় সুখের অনুভূতিতে টইটুম্বর হয়ে গেল।

স্বর্ণ-পালঙ্কের গান্ধারী চুপ করে বসেছিল। অথচ পালঙ্কের খুব কাছেই শ্বেতপাথর নির্মিত এবং নানারকম রত্ন-খচিত আরাম কেদারায় ধৃতরাষ্ট্র বসেছিল। ধৃতরাষ্ট্রের মণিহীন দুটি চোখ গান্ধারীর মুখের ওপর স্থির। চোখে চক্ষু আবরণী ছিল বলেই গান্ধারী দেখতে পেল না ধৃতরাষ্ট্র কথা বলার জন্যে উসখুশ করছে। বেশ একটু ক্ষোভ প্রকাশ করে বলল : গান্ধারী, গল্প করবে বলে ডেকে আনলে, অথচ তুমিই চুপ করে রইলে। এ তোমার কেমন কৌতুক!

গান্ধারীর প্রস্তরবৎ আচ্ছন্নতা কেঁপে ওঠল। এক মুহূর্ত কী যেন চিন্তা করল। তারপরেই আচ্ছন্নভাবটা গেল সঙ্গে সঙ্গেই। গলার স্বরে নেমে এল থমথমে গম্ভীর ভাব। হঠাৎ একটা ভাবনা থেকে আর একটা প্রসঙ্গে প্রত্যাবর্তনের সময় তার গলার স্বর একটু বসে গেল। ধরা গলায় বলল : আচ্ছা, একটা আঙুল ধরতো?

কেন?

ধরই না।

ধৃতরাষ্ট্র কিছু না ভেবেই তর্জনীটা ধরল। অমনি হাতের মুঠোয় গান্ধারীর শরীরের কাঁপুনিটা টের পেল। আঙুল ধরা অবস্থায় প্রশ্ন করল : গান্ধারী তোমার কী হল? এমন করে কেঁপে উঠলে কেন? তবে কি অমঙ্গল আশংকার আঙুলটাকে ধরলাম? তুমি কথা বলছ না কেন? তুমি হঠাৎ এত নির্লিপ্ত হয়ে গেলে কেন?

অধীর উৎকণ্ঠায় গান্ধারীর ভেতরটা উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল। আর কেমন একটা দার্শনিক ভাবনায় বিভোর হয়ে গেল। আস্তে আস্তে গম্ভীর গলায় ধৃতরাষ্ট্রের প্রশ্নের উত্তরে বলল : কী হবে জেনে? জীবনের সব প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় না। বারো বছর ধরে আমি নিজের কাছে যা জানতে চেয়েছি তা অব্যক্ত থাকলে দোষ কী? জীবনের যুদ্ধ, প্রতি প্রহরের। প্রতিদিন অগম্য পরীক্ষার হাতে হাত রেখে মৃত্যুর মুহূর্ত পর্যন্ত হেঁটে যেতে হয়। এর মাঝখানটুকু ভরা থাকে শুধু প্রতীক্ষা আর উৎকণ্ঠায়। দীর্ঘশ্বাসে আর হাহাকারে।

ধৃতরাষ্ট্র কিছু বুঝতে না পেরে গান্ধারীর হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে ঘ্রাণ নিল, গালের ওপরে চেপে ধরল। নরম হাতের পাতার ছোঁয়াতে তার নিজের গা শির শির করে উঠল। গান্ধারীর করপদ্মের ওপর মুখে রেখে তার নিজের গা শির শির করে উঠল। গান্ধারী তোমার কথার রহস্য বুঝি না। একটু আগের উৎফুল্ল হাসিখুশি ভাবটা হঠাৎ নিবে গেল। গভীরে বিষাদ নেমে এল তোমার গলার স্বরে। এর মধ্যে এমন কী ঘটে গেল তোমার মনে?

ধৃতরাষ্ট্রের কথাগুলো অভিযোগ আর অভিমানে ভরা। মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গেল গান্ধারীর। বিষণ্ণ গলায় বলল : না। কিছু নয়। আসলে, আমার মনটা ভাল নেই। তাই, সব উদ্ভট কথা মনে হয়। হয়ত তার কোন মানে হয় না। কিন্তু আমার কাছে তার অস্তিত্বটা আঁশটে বাতাসের গন্ধের

মত নাকে লেগে থাকে।

কিসের গন্ধ?

কৃষ্ণার স্বয়ম্বর এতক্ষণ হয়ে গেছে হয়ত! কার অদৃষ্টে কী আছে, কে জানে?

এরকম করে বলছ কেন?

জানি না। সব মায়ের বোধ হয়, সন্তান সম্বন্ধে একটা অতিরিক্ত ইন্দ্রিয় থাকে। অনেক কিছুই আগে থেকে টের পায়।

চুপ করে রইল ধৃতরাষ্ট্র।

গান্ধারী নিজের মনের আবেগে বলল : কাল সারারাত ঘুমুতে পারিনি। ছটফট করেছি বিছানায়। চোখের ওপর শুধু পঞ্চ-পাণ্ডবের মুখ ভেসে উঠেছে। আমি স্পষ্ট দেখেছি ওদের হাসি। কুন্তীর গলার স্বর পর্যন্ত স্পষ্ট শুনতে পেয়েছি। কুন্তীময় রাত পোহাল বটে, কিন্তু মন থেকে ভাবনাটাকে কিছুতে তাড়াতে পারলাম না। মনে হচ্ছে, পাণ্ডবেরা কেউ বরাণাবতে দগ্ধ হয়নি, তারা ভালভাবেই বেঁচে আছে। কেবল পাণ্ডব ও কৌরবের সম্পর্কটা মরে গেছে।

গান্ধারী কথাগুলো এত স্পষ্ট যে ধৃতরাষ্ট্র ভেতরে ভীষণ ছটফট করে উঠল। গান্ধারীর ধরা হাতেও চঞ্চলতার ছোঁয়া লাগল। থতমত হয়ে বলল : তুমি শুনেছ কিছু?

সব কথা শুনে বোঝা যায় না। বুঝে নিতে হয়। পাঞ্চালের স্বয়ম্বর সভার বিচিত্র কন্যাপণের শর্ত আমাকে ভাবিয়ে তুলছে। কারো একজন আত্মপ্রকাশের দিকে তাকিয়েই যেন বিবাহের বিচিত্র ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেই আত্মপ্রকাশটা যে পাণ্ডবদের হবে না কে বলতে পারে?

বারো বছর পর এ প্রশ্ন ওঠে?

পাঞ্চালীর স্বয়ম্বরের বিচিত্র শর্ত দেখে মনে প্রশ্ন জেগেছে। প্রতিহিংসা বড় সাংঘাতিক জিনিস। মন থেকে কিছুতে মোছে না। পাণ্ডবেরা আত্মগোপন করে হয়ত দৃষ্টির আড়ালে থেকে সকলের অজান্তে হিংসার ছুরিতে লুকিয়ে শান দিচ্ছে। আমি কুন্তীকে বিশ্বাস করি না।

এসব তোমার অবাস্তব আশংকা। কষ্টকল্পনা।

আশংকা, ভাবনা থেকেই মানুষ এক অজ্ঞাত সত্যে পৌঁছয়। অন্ধকার থেকে আলোর পথে ফেরে। আমিও একটা সমাধানে পৌঁছতে গিয়ে দেখেছি বিদুরের ভাবলেশহীন মুখ, শান্ত দুটি চোখ। কী ভীষণ নির্লিপ্ত এবং গম্ভীর। বারণাবতের অগ্নিকাণ্ডের পর তার কোন প্রতিক্রিয়া চোখে পড়েনি, একবারও কাঁদতে দেখিনি, হা-হুতাশ করতে শুনিনি, পুত্রদের সম্পর্কে কোন কটু মন্তব্যে বিষিয়ে তোলেনি হস্তিনাপুরের বাতাস। পাণ্ডব-প্রাণ বিদুরের এই অদ্ভুত আচরণ দেখলে বোঝা যায়, বিশাল ভারতবর্ষে কোথাও তারা লুকিয়ে আছে এবং বিদুর সেটা আগে থেকে জানত।

যে অধ্যায়টা চিরকালের মত শেষ হয়ে গেছে সেই প্রসঙ্গটা আজ টেনে আনায় কোন অর্থ হয়?

সত্যিই হয় না, তবু সকাল থেকে মনে কু গাইছে। মার প্রাণ যেন টের পেয়েছে, একটা কিছু ঘটবে স্বয়ম্বর সভায়। এত আয়োজন, সমাবেশ, অদ্ভুত কন্যাপণ—কার স্বার্থে? হয়ত সকলকে অবাক করে দিয়ে পাণ্ডবেরা আত্মপ্রকাশ করবে। মৃত বলে যারা পরিচিত তারা যে জীবিত এটা সকলের সামনে একবার প্রমাণ হয়ে গেলে তুমি তাদের অস্তিত্ব ও দাবি অস্বীকার করতে পারবে না। এ তাদের হস্তিনাপুরে পুনঃপ্রত্যাবর্তনের ভূমিকামাত্র। বিদুর এসবের পেছনে যে নেই, কে বলবে? তার পরামর্শেই হয়ত দ্রুপদ পাণ্ডবদের বীরত্বপুর্ণ আত্মপ্রকাশ ঘটাতে এই বিচিত্র কন্যাপণ করেছে।

এরকম ভাবনার কোন যুক্তি নেই। পাণ্ডবেরা মৃত।

স্বামী ভস্মরাশি অপসারণের সময় জতুগৃহের অভ্যন্তরে যে সুড়ঙ্গটি পাওয়া গেল তা নিয়ে কেউ মাথা ঘামাল না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস পাণ্ডবেরা হত্যার ষড়যন্ত্রের কথা জানতে পেরে সকলকে বোকা বানানোর জন্যে নিজের হাতে জতুগৃহে আগুন দিয়ে ঐ সুড়ঙ্গ দিয়ে পালিয়েছে। স্বগৃহে অগ্নিদগ্ধ হয়ে পুরোচনের মৃত্যু আমার সন্দেহ ও বিশ্বাসকে আরো দৃঢ় করেছে।

তা-হলে মৃতদেহগুলি কার?

যদি বলি নিষাদ মাহুত এবং তার পরিবারের। ওরাই তো বারণবতে পাণ্ডবদের দেখাশোনা

করত। বারণাবতের অগ্নিকাণ্ডের পর তাদের কিন্তু আর কোন খোঁজ মেলেনি। তোমরা বলেছ, ভয়ে তারা উধাও হয়ে গেছে। আমি বলছি ধোঁকা দিকে পাণ্ডবেরা ওদেরই হত্যা করেছে।

গান্ধারী! চমকানো বিস্ময়ে আর্তস্বরে ডাকল ধৃতরাষ্ট্র। এতকাল বলনি কেন?

কৃষ্ণার স্বয়ম্বর সভা না হলে বোধ হয়, আমার মনের জট খুলত না। ঐ অদ্ভুত কন্যাপণের রহস্য আমাকে ভাবিয়ে তুলেছে। এই বারোটা বছর আমার কী অশান্তিতে কেটেছে, তুমি বুঝবে না। সুযোধনকে এই নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের জন্যে দায়ী করে তার ওপর ভীষণ অবিচার করেছি। আজই প্রথম মনে হল, সুযোধনের কোনও অপরাধ নেই, সে নির্দোষ। তার জন্যে আমার বড় মন কেমন করছে। ভীষণ অনুশোচনা হচ্ছে।

দেবী! আচমকা বিদুরের ডাকে গান্ধারী চমকাল। বুকের ভেতর থর থর করে কেঁপে গেল। নিজেকে একটু সামলে নিয়ে বলল : এসেছ দেবর! কখন ফিরলে? বিশ্রাম নিয়েছ তো? কোন্ ভাগ্যবানের গলায় কৃষ্ণা বরমাল্য দিল?

দেবী, সে এক বিচিত্র ঘটনা। চোখে দেখলেও বিশ্বাস হয় না। লৌহশকটে রাখা একটা ধনু, আর শর দুর্যোধন কেন, বাঘা বাঘা বীর শিশুপাল, শল্য, নরকাসুর,—আর কত নাম করব, কেউ ঐ মায়া ধনু তুলতে পারল না।

গান্ধারীর সব উৎসাহ চুপসে গেল। থমথমে মুখে চুপ করে থেকে কিঞ্চিৎ উৎসাহ দেখিয়ে বলল : কর্ণ?

হাঁ, কর্ণের বেলায় ঘটল এক অদ্ভুত ব্যাপার। সে ধণু স্পর্শ করার সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণা সদর্পে সভামধ্যে ঘোষণা করল : সুতপুত্র বরিব না কভু।

ধৃতরাষ্ট্র অস্ফুটস্বরে প্রশ্ন করল : কেন? কেন? মুক্ত প্রতিযোগিতায় সকলের অধিকার।

বিদুর নির্বিকার গলায় বলল : কৃষ্ণার মর্জি। অপমানে কর্ণে মাথা হেঁট হয়ে গেল। বেচারীর জন্যে ভীষণ কষ্ট হল।

ধৃতরাষ্ট্র গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল : তা-হলে কৃষ্ণা কার জয়লব্ধা হল?

অবশ্যই কৌরবের। বিদুরের কণ্ঠে বিগলিত খুশির ভাব।

গান্ধারীর বুকের মধ্যে কেমন ভূমিকম্প ঘটে গেল। হঠাৎ-ই তার আশংকাটা এক গভীর যন্ত্রণা আর আশাভঙ্গের কষ্টে তার মনের তটভূমিতে আছড়ে পড়ে তার অস্তিত্বকে যেন কাঁপিয়ে দিয়ে গেল। প্রশ্ন করতেও ভয় করল। বুক কাঁপিয়ে একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস পড়ল।

ধৃতরাষ্ট্র বেশ একটু অবাক হয়ে বলল : কৌরব বংশের সেই ভাগ্যবান কে?

এক হারিয়ে যাওয়া রাজপুত্র। ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে বীর্যশুল্কের পাঞ্চালীকে জয় করল। পাঞ্চালী জয়লব্ধা ঐ বিপ্র—

গান্ধারী তার পাদপূরণ করে বলল : অর্জুন নিশ্চয়ই।

বিদুর বলল : হ্যাঁ দেবী।

ধৃতরাষ্ট্র হতাশ হয়ে আরাম কেদারায় টান টান করে দেহটা এলিয়ে দিল।

গান্ধারীর মাথা ঘুরতে লাগল। ভাগ্যের কাছে আঘাত খেয়েও সচেতনভাবে মনের মধ্যে তিল তিল করে পাহাড়ের মত জমিয়ে তুলেছিল পুত্র সুযোধন সম্পর্কে কত স্বপ্ন, আশা এবং আকাঙ্ক্ষা। সেই পাহাড়েরই ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরিতে অগ্ন্যুৎপাত হয়ে গেল হঠাৎ-ই। বুঝতে পারল, এ শুধু ভাগ্যের নিষ্ঠুর বঞ্চনা আর প্রতিশোধ। কিন্তু ভাগ্যের সঙ্গে তার তো কোন শত্রুতা নেই। ভাগ্যদেবতাকে প্রসন্ন করার জন্য নিয়মিত পূজা করে, ব্রাহ্মণ সেবা করে, দুঃস্থদের দান করে। তবু ভাগ্য তার প্রতি কুপিত, বিরূপ। নিষ্ঠুর, মমতাহীন। পাণ্ডবেরাই তার দুভার্গ্যের মূর্তি ধরে এসেছে। শনির মত, রাহুর মত তাকে খাবলে খাচ্ছে। তার স্বপ্ন, সুখ, শান্তিটুকুকে ছিন্নভিন্ন করে দিচ্ছে। পরক্ষণেই নিজের দুর্ভাগ্যের সঙ্গে পাণ্ডবদের যুক্ত করার জন্যে তার ভীষণ অনুশোচনা হল। নিজেকে কৈফিয়ত দিতেই যেন বলল, অপত্যস্নেহের চেয়ে গভীরতর বোধ আর কিছু নেই একজন মায়ের কাছে। সন্তানের মুখ চেয়েই পৃথিবীর সব মা বোধ হয় এমন আত্মকেন্দ্রিক আর স্বার্থপর হয়। এটা বোধ হয় জননীর ধর্ম। কুন্তীও নিজের সন্তানের স্বার্থ দেখেছে। তাদের সুখেব কথা ভেবেছে। গান্ধেয়েদের কথা ভাবলে কখনও ভ্রাতৃবিদ্বেষের আগুন জ্বলত

না। কুন্তীকেও দোষ দিয়ে কি হবে? সে তো তার মতই এক হতভাগ্য জননী। সন্তানের স্বার্থ তার কাছে বড়। গান্ধারীর খুব অবাক লাগল এরকম একটা চিন্তায়। আজ যখন নিজের ভেতর ডাক পড়েছে তখন অন্য দশজন সাধারণ জননী যা করে সেও তাই করছে, ভাবছে। অথচ অসাধারণ হওয়ার ইচ্ছে কত ফলবতী তার ভেতর। তবু শত চেষ্টাতেও সে সাধারণের উর্ধ্বে উঠতে পারল না।

কেন এমন হয়। অনুশোচনায় গান্ধারী নিজেকে প্রশ্ন করল। আর ভাবল কত বদলে গেছে তার চিন্তাধারা।

জীবনের এক একটা মুহূর্তে আসে মানুষ যখন নিজেকে বড় বেশি করে অনুভব করে। বেশি করে দেখতে পায়। আজ হঠাৎ-ই সে জানতে পারল, তার জীবনের সবকিছুই সুযোধনকে ঘিরে আছে। একজন মা তার পুত্রের কাছে যা যা চায়, তার সবই সুযোধন দিতে পারে। সুযোধনের ব্যর্থতা তাই গান্ধারী সইতে পারল না। হঠাৎ-ই ডুকরে কেঁদে উঠল।

স্তব্ধতা ভেঙে বিদুর বলল : দেবী, তোমার দুঃখটা আমি বুঝি। কিন্তু এও জানি তুমি নিজের পুত্রদের চেয়ে পাণ্ডবদের অধিক স্নেহ কর। পাণ্ডবেরা জননীর অধিক তোমাকে শ্রদ্ধা করে। হস্তিনাপুরে কৃষ্ণাসহ প্রত্যাবর্তনের সেটাই তাদের মূলধন। তুমি বিরূপ হলে তারা দাঁড়ায় কোথায় বলতো? তুমি যে তাদের বড় মা। বিদুরের গলাটা একটু দুর্বল শোনাল।

ছয়

অর্জুনের জয়লব্ধা দ্রৌপদীর সঙ্গে পঞ্চ-পাণ্ডবের পরিণয় হয়েছে কথাটায় গান্ধারীর নারী-হৃদয় বিচলিত করল। কিন্তু বিশ্বাস হল না। বিদুরের মুখে শোনার পর প্রত্যয় জন্মাল। আর তখনই কুন্তীর ওপর একটা ভীষণ রাগ আর ঘেন্না হল। জঘন্য, নোংরা, মেয়েমানুষ না হলে এমন একটা কুৎসিত প্রথাবিরোধী অসামাজিক কাজ করতে পারত না। সে নিজের জীবনে যাই করুক, অন্য একটি সম্ভ্রান্ত রাজবংশের মর্যাদা, সম্ভ্রম, রাজকন্যার নিজস্ব সম্ভ্রম ইচ্ছে নিয়ে এভাবে খেলা করা ঠিক হয়নি। তার পুত্ররা না হয় নির্লজ্জ হল, কিন্তু দ্রৌপদী তো একটা মেয়ে। তার তো লজ্জা, সরম আছে। পঞ্চ-পান্ডবের ভার্যা হয়ে লোকসমাজে সে মুখ দেখাবে কেমন করে। রাজ্যের লোকেরা কী বলবে তাকে? মানুষের কাছে সমাজের কাছে তার কোন মর্যাদাই থাকল না; কেউ তাকে সম্মান দেবে না। মেয়ে মানুষের জীবনে বহু পুরুষ থাকার লজ্জা যে কত, কুন্তী নিজেকে দিয়ে বুঝল না? সব খুইয়ে দ্রৌপদী কী নিয়ে থাকবে? পঞ্চ-পাণ্ডব তাকে কি দিতে পারবে? সে কি রক্তমাংসের নররূপী পুতুল? প্রবৃত্তিগামী পুত্ররা মায়ের কাছে আবদার করল, আর মা তা দিয়ে দিল—এটা কেমন কথা? তার মন বলে কি কোন বস্তু নেই? গান্ধারী নিজের মনে কুন্তীকে ধিক্কার দিল। সমস্ত অন্তর তার ছিঃ ছিঃ করে উঠল। দ্রৌপদীর জন্যে তার বুকটা টাটাতে লাগল।

এক গভীর সহানুভূতির ভেতর ডুবে গিয়ে গান্ধারী বিদুরের কণ্ঠে কুন্তীর কথাগুলো নিজের বুকের ধুক-পুক ধুক-পুক শব্দের মধ্যে শুনতে পেল। কল্পনায় দেখতে পাচ্ছিল কুন্তীকে। তার চোখের তারায় জ্বলজ্বল করছিল কুন্তীর আত্মপ্রত্যয় দৃপ্ত তেজস্বিনী মূর্তি, যা তার মুখের ও চোখের রূপ বদলে দিয়েছিল। কেমন একটা খুশি আর গৌরববোধ নিয়ে কথাগুলো বলছিল। আর তার সামনে ম্লানমুখে অপরাধী মত দাঁড়িয়েছিল দ্রৌপদী। দ্রৌপদীর আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে কুন্তী বলল : অপূর্ব তুমি। তোমার রূপে মোহ, চোখে চুম্বক, স্পর্শে দাহ। তোমার রহস্য-বাঁকা ওষ্ঠাধরের দিকে তাকালে পুরুষের হৃদয়ে আগুন জ্বলে। তুমি নেশার মত, আলোর মত। তোমার রূপই তোমার শত্রু। রাগ কর না মা, তোমার মত মেয়েকে একজন পুরুষের সামলানো খুব কঠিন। স্বয়ম্বর সভায় তোমার জন্যে কত বার কত তারবারি খুলেছে, কত মানুষ আহত হয়েছে। একজনের ভার্যা হওয়া তোমার নিরাপদ নয়। পঞ্চ-পাণ্ডব মিলে তোমাকে রক্ষা করবে। তুমি পাণ্ডবের জয়লক্ষ্মী। পাণ্ডবের মান, সম্মান, গৌরবও তোমাকে ঘিরে। তুমি তাদের গৌরব মুকুট, পৌরুষের বিজয় কেতন। পাণ্ডবের সেই বিজয় গৌরব কোন একজনের নয়। পুত্রদের আমি শিখিয়েছি যা কিছু তোমাদের শক্তি তা পাঁচজনের ঐক্যে। যা কিছু তোমার জয় করবে, ভোগ করবে, তাতেও পাঁচ জনেরও সমান ভাগ থাকবে। আজও তার অন্যথা করতে পারি না। পঞ্চ-পাণ্ডবের জয়লক্ষ্মীর উপর পঞ্চ-পাণ্ডবের তেমনি সমান দাবী। তুমি শুধু অর্জুনের নও। পঞ্চ-

পাণ্ডবের ভার্যা। পাণ্ডবের উষর মরুর মরূদ্যান তুমি। তোমার কাছে তারা প্রেম চায়। প্রেমের বীর্যে তুমি তাদের নিঃশঙ্ক কর। সত্যকার প্রেম কখনও ভোগে মলিন হয় না। প্রেম হল ত্যাগের, ঔদার্যের, বিশ্বাসের, মহানুভবতার। প্রেম নির্ভরতার শক্তি। সহযোগিতার দাক্ষিণ্যে শ্রেষ্ঠ ও সুন্দর হয় প্রেম। সত্যকারের প্রেম বিশ্বাসে বলীয়ান, ত্যাগে মহান, বাসনায় সুন্দর। ঈশ্বর তোমাকে সেই শক্তি দিয়ে পাঠিয়েছেন। পঞ্চ-পাণ্ডবের ভার্যা হয়ে তুমি ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ করলে। পঞ্চ-পাণ্ডবকে ধন্য করলে। আজ আমার বড় সুখের মুহূর্ত।

গান্ধারীর দীর্ঘশ্বাস পড়ল। দ্রৌপদীর প্রতি এক চরম সহানুভূতিবোধ তার নিজের চোখই ছলছলিয়ে উঠল। একটা গ্লানিকর নারীত্বের লজ্জায় তার বুকটা উথাল পাথাল করতে লাগল। কুন্তীর ওপর তীব্র ঘৃণা এবং রাগে তার বুকটা কেমন করতে লাগল। বারংবার একটা কথা বেশি করে মনে হল—কুন্তীর নিজের চরিত্র ভাল নয়। দ্রৌপদীকেও সে ভাল থাকতে দিল না। দ্রৌপদীর মত মেয়েকে তার ভয় বেশি। কারণ, তার শরীরের ভেতর যে অপরাধী মনটা বাস করে দ্রৌপদীর মত প্রখর বুদ্ধিমতী মেয়ে কাছে থাকলে তার গোপন জীবনের সব দুষ্কর্ম কখন কী টের পেয়ে যায় সেই ভয়ে তাকে একটু সাবধান হতে হল। তার নিজের লজ্জা ও পাপ দ্রৌপদীর কাছে গোপন রাখতে এবং তাকে সমব্যথী করে কাছে পেতেই যেন পঞ্চ-পাণ্ডবের ভার্যা হতে তাকে বাধ্য করল। এ তার নিজের ওপর নিজের প্রতিশোধ।

কুন্তীর কাজটা গান্ধারী সমর্থন করতে পারল না। কুন্তী নিজে মেয়ে হয়ে আর একটা মেয়ের মনকে বুঝল না? দ্বিচারিণী হওয়ার কি জ্বালা, কুন্তী নিজে সে কথা ভাল করে জানে। তবু পুত্রবধূকে সেই জ্বালার ভেতর টেনে আনল। পুত্রদের নির্লজ্জ প্রবৃত্তিতাড়িত লোভের দিকে তাকিয়ে কাজটা ভাল করেনি কুন্তী। বলা যেতে পারে একটা খারাপ নজির তৈরি করল। দ্রৌপদীকে জীবনভোর তার দাম দিতে হবে। দ্রৌপদীর সেই দুঃখের দিনগুলোর কথা ভেবে গান্ধারীর নিজেরই কান্না পেল। ভীষণ কষ্ট হল। মায়া হল। দ্বিচারিণী হওয়ার মত অভিশাপ নারীর জীবনের আর হয় না। সমাজে তার সম্মান নেই। কোন পুরুষই তাকে শ্রদ্ধার চোখে দেখে না। সব গৌরব হারিয়ে সে শুধু ভোগ্যবস্তু হয়ে থাকে। পৃথিবীর সব পুরুষের কাছে সে শুধু শয্যাসঙ্গিনী এবং নর্মসঙ্গিনী। এর চেয়ে একটা মেয়ের জীবনে লজ্জা, অপমান, অগৌরব কিছু নেই। কুন্তী নিজের স্বার্থে দ্রৌপদীকে বরবধূ নামে বারবধূ করল।

কথাটা হঠাৎ-ই মনে হওয়ায় সে ভীষণ অস্বস্তি বোধ করল। একটা তীব্র অপরাধবোধের যন্ত্রণায় তার বুকের ভেতরটা টাটাতে লাগল। অস্ফুট আর্তচিৎকার বুকের অভ্যন্তরে নিরুচ্চারে হাহাকারের মত ছড়িয়ে পড়ল। আর এক নিদারুণ যন্ত্রণায় বলল : অন্যায়। সঙ্গে সঙ্গে কুন্তীর প্রতি তীব্র ঘৃণায় তার ভেতরটা শক্ত হয়ে উঠল। নিরপরাধিনী দ্রৌপদীর কথা ভেবে সে একটা কষ্ট-বিদ্ধ যন্ত্রণায় কাতর হল। তার কারণ দ্রৌপদীর জীবনের বিয়েটাও বড় অদ্ভুত। তার জীবনের সমস্যাটা বড় গভীর এবং ব্যাপক। অর্জুনের জয়লব্ধা, কিন্তু যুধিষ্ঠিরের পরিণীতা। অন্য পাণ্ডবদের সঙ্গে তার কোন পরিণয় হল না অথচ সকলের সঙ্গে এক স্থূল সহবাসের সম্পর্ক থাকল। থাকল ভোগের সমান অধিকার। দ্রৌপদীর ইচ্ছা-অনিচ্ছা, সুখ-দুঃখ, মান-অপমান বোধের কোন প্রশ্ন থাকল না। রক্তমাংসের তৈরি একটা পুতুল সে।

কুন্তীর ওপর খুবই রাগ হচ্ছিল গান্ধারীর। কুন্তীর রুচি বলে কি কিছুই নেই? বনে-জঙ্গলে বাস করতে করতে তার কি রুচি-বিকৃতি ঘটল? তার পাওয়ার ঘর শূন্যতায় ভরে দিয়ে কুন্তী কোন সুখ পাবে? পঞ্চ-পাণ্ডবে মিলে দ্রৌপদীর জীবনটা এমন করে নষ্ট করে ফেলবে? বাজপাখির মত ছোঁ মেরে তার মনের ছোট্ট সুখও ছিনিয়ে নেবে? তার সত্তাকে খাবলে খাবে? পাণ্ডবদের সঙ্গে বনের পশুর তা-হলে পার্থক্য কোথায়? তা হলে মানুষ সমাজ গড়েছিল কেন? নিয়ম, নীতি তৈরি করেছিল কার জন্য? পাণ্ডবদের কাছে সেই সব প্রয়োজন কি ফুরিয়ে গেল? এই সমাজ নিয়ে যদি তাদের কোন মাথা-ব্যথা না থাকে তাহলে হস্তিনাপুর না ফিরে তো গুহা-কন্দরে ফিরে গিয়ে আদিম মানুষের মত জীবন-যাপন করতে পারত? সেখানে প্রকৃতির প্রাণীর মত ওরা যা কিছু করত তাই তাদের নিজস্বতা বলেই করত। কী দরকার ছিল তাদের হস্তিনাপুরে ফেরার? কুন্তী একবারও ভাবল

না, হস্তিনাপুরে ফিরলে এখানকার প্রজারা, বন্ধু রাজ্যগুলি কী ভাববে? সভ্য মানুষের সমাজে মুখ দেখাব কেমন করে? পাণ্ডবরা সভ্য মানুষের কলংক। দ্রৌপদীর বেঁচে থাকার মজাটাই বোধ হয় চিরকালের মত ফুরোল। জীবনের অনেক জটিল প্রশ্নের উত্তর তাকে একা একাই করতে হবে নিজেকে। সেইসব মুহূর্ত কঠিন পরীক্ষার মুহূর্ত। অতি বড় শত্রুর জীবনেও এমন পরীক্ষা না এলেই ভাল। কথাটা মনে হতেই নাভি থেকে টেনে খুব জোরে শ্বাস নিল। গান্ধারী নিঃশ্বাস ফেলতেই দ্রৌপদীর জন্যে বুকটা হাহাকার করে ওঠল। বড় শূন্যতা, বড় কষ্ট বড় ছটফটানি তার শরীর জুড়ে।

গান্ধারীর কিছুই ভাল লাগছিল না। ভীষণ ক্লান্ত আর অবসন্ন লাগছিল। তবু নিজের মত করে ভাবছিল। বদবুদ্ধির মানুষ ঘরে এসে চলে গেলে তার গায়ের গন্ধ যেমন ঘরে লেগে থাকে তেমনি দ্রৌপদীর হস্তিনাপুরে আগমন এবং তার জীবনের দুর্ভাগ্য যেন এক ভয়ংকর সর্বনাশের ইংগিত বয়ে আনল। কোথায় কাকে নিয়ে যাবে কেবল নিয়তিই জানে?

সকাল বেলা।

বাইরে রথ থামার শব্দ হল। দরজা খোলা ও বন্ধের শব্দ হল। মানুষ ওঠা-নামা, লোকজনের পায়ের শব্দ, কথাবার্তাও শোনা গেল। ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারীর কাছে বসে ছিল। রোদ এসে পড়েছিল তাদের গায়ে।

রথের শব্দ উভয়কেই উৎকর্ণ করে তুলল। দুজনে দু'জনের দিকে অসহায় উদ্বিগ্ন, ভয় নিয়ে তাকিয়ে আছে। দৃষ্টিহীনতার জন্যে কেউ কাউকে দেখতে পেল না। বুঝতে পারল না কার কি মনের ভাব!

ধৃতরাষ্ট্র হাঁফাচ্ছিল। ভয়ে মানুষ সবচেয়ে বেশি ক্লান্ত ও অবসন্ন হয়। পাণ্ডুপুত্রদের আগমনে ধৃতরাষ্ট্রের সব কিছু গোলমাল হয়ে গেল। ওদের ভেতর একটা লুকনো ঝড় আছে। কাছে এলেই বোঝা যায়। তবে সব বোঝে না। বোঝার বাইরে অনেক কিছু থাকে।

ধৃতরাষ্ট্র বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর গান্ধারীকে শুধাল যাবে নাকি তুমি?

গান্ধারী হাসল। অবাক স্বরে প্রশ্ন করল : কোথায়?

দ্রৌপদীকে দেখবে না? পাণ্ডবদের দেখতে ইচ্ছে করে না।

কেন দেখতে যাব, বলতে পার?

দোষের তো কিছু নেই।

যাওয়ার কোন প্রশ্ন ওঠে না। কুন্তী যা করল তা বড় নগ্ন, অসভ্যতা। কোন সভ্য মানুষ কল্পনাও করে না। কৌরববংশের প্রতি তার কোন শ্রদ্ধাবোধ নেই বলেই এই পরিবারে ভাল-মন্দ, ক্ষতি সম্পর্কে কোন কিছু চিন্তা করে না। দ্রৌপদীকে নিয়ে যা করল তাতে মুখ দেখানোর মত অবস্থা আর থাকল না একজন নারী হয়ে আমিও খুব অপমান বোধ করেছি।

ধৃতরাষ্ট্র কোন জবাব দিল না। গান্ধারীও চুপ করে থাকল না। একটা কষ্টবিদ্ধ যন্ত্রণায় সে বলল : এই সমাজে সংসারে নারীর যত হেনস্তাই হোক, একটা সম্মানের আসন তবু আছে তার। সেটা দয়া কিংবা অনুগ্রহের দান নয়। সেটা নারীর অর্জিত। তার সেই ব্যক্তিসত্তাটিকে প্রত্যেক পুরুষ শ্রদ্ধা করে। কুন্তীর নির্লজ্জ আচরণে সেই শ্রদ্ধার আসন টলে গেল। নারীর সম্ভ্রম, লজ্জা, আজ বিপন্ন। সে নিজে মেয়ে। নারী জাতিকে এভাবে অপমান করল কেন? যুগ যুগ ধরে গড়ে ওঠা নীতিবোধ, প্রথা, সংস্কার, বিশ্বাস, মূল্যবোধ, সামাজিক অনুশাসনকে অবহেলা করা, অবজ্ঞা করা, তাকে ভেঙ্গে ফেলার এক ভয়ংকর খেলায় মেতে উঠল কেন? দ্রৌপদীর বুকে প্রতিহিংসার এ কোন অনল জ্বালিয়ে তুলল কুন্তী? ওই কচি বুকে যে আগুন ধিকি ধিকি করে জ্বলছে সেই আগুনে সে নিজে জ্বলবে, অন্যে পুড়বে। ঐ মেয়ে কাউকে শান্তিতে থাকতে দেবে না। ওর মনের আগুনে হস্তিনাপুরের প্রাসাদ জ্বলবে, রাজ্য ছারখার হবে। অমঙ্গল আশঙ্কায় আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে। তুমি পাণ্ডবদের অন্যত্র বাসস্থানের ব্যবস্থা করে দাও।

ধৃতরাষ্ট্র কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল : আমিও তাই ভেবেছি। পিতামহ ভীষ্মকেও বলেছি, ছোট্ট হস্তিনাপুরে একসঙ্গে কৌরব ও পাণ্ডবের স্থান সংকুলান হবে না। এক নতুন প্রজাতি পাণ্ডববংশের হাতে পিতৃপুরুষের সিংহাসনের অধিকার অর্পণ করতে পারি না। এ রাজ্যের ওপর তাদের সমানাধিকার

যদি আপনারা স্বীকার করেন তবে কুরুজাঙ্গালের অন্তর্গত বিশাল খাণ্ডববন আমি তাদের রাজ্য ও রাজধানীর জন্য দিতে পারি। সেখানে তারা নিজেদের পছন্দমত রাজ্য ও রাজধানী তৈরি করে নিক। এক নতুন রাষ্ট্রের জন্ম হোক। নতুন করে তাদের বংশের কৃষ্টি, ঐতিহ্য তৈরি হোক। তা-হলে এ-রাজ্যের মানুষের মনে দ্রৌপদীর অদ্ভুত বিবাহ নিয়ে যে প্রশ্ন, কৌতূহল জেগেছে তার কোন জবাবদিহির দায়ও আমাদের থাকবে না। সেটাই হবে কৌরব ও পাণ্ডবের পক্ষে মঙ্গলজনক শর্ত।

গান্ধারী কোন কথা বলল না। একটা অনুভূতি অজ্ঞাত ভয়ের মত তার মস্তিষ্ক জুড়ে নেমে আসতে থাকল, তাকে ঘিরে থাকল। একটা ভয়ের আশংকায় সে ধৃতরাষ্ট্রের হাতটা চেপে ধরল শক্ত করে নিজের মুঠোয়।

সাত

গান্ধারী উদ্বিগ্ন উৎকণ্ঠা নিয়ে চেয়েছিল পথের দিকে। গাছপালার ফাঁক দিয়ে দূরে যে পথটা দেখা যাচ্ছিল ঐ পথেই ইন্দ্রপ্রস্থ থেকে ভাইদের সঙ্গে সুযোধনের ফেরার কথা। কিন্তু তাদের প্রত্যাবর্তন কেবলই বিলম্ব হচ্ছিল। তাই, দুর্ভাবনায় দুর্ভাবনায় গান্ধারীর দিন কাটছিল। মায়ের মন তো। কারণে-অকারণে নানা কু'কথায় মন ভারাক্রান্ত এবং বিষণ্ণ হল। অপ্রাসঙ্গিক, অবান্তর অনেক কথাই মনের জানলায় বসে অবিরাম ভাবে। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের আমন্ত্রণের পিছনে নিশ্চয়ই কোন গূঢ় অর্থ আছে। যুধিষ্ঠিরের রাজচক্রবর্তী হওয়া, শ্রীকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠ পুরুষের অর্ঘ্য পাওয়া, পাণ্ডবদের গৌরব মর্যাদাকে সুদৃঢ় করা ছাড়াও আরো কিছু আছে।

কুন্তীকে বিশ্বাস হয় না গান্ধারীর। কুন্তী নিজের পুত্রদের উন্নতি ও স্বার্থ ছাড়া অন্য কিছু ভাবে না। ভীষণ স্বার্থপর আর আত্মকেন্দ্রিক মেয়েমানুষ। শতশৃঙ্গ পর্বত থেকে হস্তিনাপুরে ফেরার দিন থেকে কৌরবদের সঙ্গে তার শত্রুতার শুরু। ধার্তরাষ্ট্রদের বিষ নজরে দেখল। প্রথম থেকেই দুরন্ত ভীমকে দিয়ে গোলমাল বাধাল। নিষ্পাপ শিশুমনে বিদ্বেষ ঘৃণার হলাহল ঢেলে দিল। নিরপরাধ পুত্রদের অন্তর থেকে সৌভ্রাত্রবোধ মুছে ফেলার এক হীন চক্রান্তে সে লিপ্ত ছিল। পুত্রদের দিয়ে ধার্তরাষ্ট্রদের নানাভাবে অপদস্থ করল। তাদের সুনাম নষ্ট করতে, লোকচক্ষে হেয় করতে, সুযোধনের জনপ্রিয়তা মসীলিপ্ত করতে বারণাবতের বাসগৃহে নিজেরাই আগুন দিল। জনমন বিভ্রান্ত করাই ছিল তাদের উদ্দেশ্য। মানুষের নিরন্তর সন্দেহে ও কৌতূহলে সুযোধন লোকের চোখে দোষী ও অপরাধী হল। পাণ্ডবদের আত্মপ্রকাশের পর বহুকালের সেই ভুল ভাঙল। ইন্দ্রপ্রস্থে অনুরূপ কোন পাল্টা ঘটনায় তাদের জড়ানোর জন্যে এই অহেতু বিলম্ব যে করা হচ্ছে না, কে বলবে? অন্তত কুন্তী এবং তার পুত্রদের গান্ধারী বিশ্বাস করে না। তারা সব পারে।

তবু এই অবিশ্বাস এবং সংশয়টা মনের ভেতর শিকড় গেড়ে বসতে পারল না। রাজসূয় যজ্ঞের দায়িত্ব বণ্টনের ব্যাপারটা মধ্যে বেশ একটা আন্তরিকতা এবং পারিবারিক স্পর্শকাতরতা ছিল। যেটাকে কোন সময়ের জন্যে ভুলে থাকা যায় না। দুই পরিবারের অভ্যন্তরে দীর্ঘকাল ধরে যে বিরোধ, বিভেদের অন্তর্কলহের উত্তাপ জমেছিল তাকে শীতল করার আন্তরিক একটা প্রয়াসও ছিল এর ভেতর। পাণ্ডব ও কৌরবেরা যে এক পরিবারভুক্ত, এ কথাটা নিমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গকে ভাল করে জানিয়ে দেওয়ার জন্য যুধিষ্ঠির কৌরবপক্ষের প্রধান প্রধান ব্যক্তিকে বিবিধ কর্মের দায়িত্ব দিল। এটা যে তাদের নিছক সৌজন্য তাতে কোন সন্দেহ ছিল না।

নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের উপহার, উপঢৌকনাদি গ্রহণ করা এবং তাদের প্রীতিদানে আপ্যায়িত করার দায়িত্ব অর্পণ করল অতিথিবৎসল সুযোধনকে। খাদ্যভাণ্ডারের তত্ত্বাবধান ও বণ্টনের ভার ছিল ভোজনপ্রিয় দুঃশাসনের। ব্রাহ্মণদের যত্ন, পরিচর্যা ও আতিথেয়তা দায়িত্ব সুযোধন-বান্ধব দ্রোণাচার্য-পুত্র অশ্বত্থমাকে দেওয়া হল। ঐশ্বর্যে বীতস্পৃহ গুরু কৃপাচার্যকে ধনভাণ্ডার ও রত্নাভাণ্ডার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব নিতে অনুরোধ করল। দুঃস্থ, আতুর, দরিদ্র এবং ব্রাহ্মণদের দক্ষিণাদি প্রদানের ভার রইল মাতুল শকুনির ওপর। ভগ্নীপতি জয়দ্রথকে গৃহস্বামীর ন্যায় গৃহের সমস্ত কার্য পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণের ভার দিল। এই ব্যাপারটাকে গান্ধারী তুচ্ছ করে দেখল না।

তবু গান্ধারীর মনের ভেতর এলোমেলো হাজার চিন্তা। নিজের অজান্তে কত কু-কথা মনে এল এবং গেল। তবু মনের ভারাক্রান্ত বিষণ্ণভাব কিছুতে কাটে না। কাটবে কোথা থেকে? মায়ের মন বড় দুর্বল। অশুভ কথাটাই আগে মনে আসে। মনের কাছে, ভগবানের কাছে কত অপরাধ স্বীকার করে তখন। সব মা নিজের সন্তান সম্পর্কে বড় বেশি সতর্ক আর সাবধান বলেই অমঙ্গল, অশুভ কথাটা সবার আগে মনে পড়ে, না মন টের পায়?

রাজসূয় যজ্ঞ শেষ হয়ে গেছে। মাসাধিক কাল হল। তবু কৌরবদের কেউ ইন্দ্রপ্রস্থ থেকে ফিরল না। গান্ধারী একটু বিচলিত হল। কিন্তু এই বিলম্বের ভেতর একটা ভাল কিছু হয়ত আছে। এই যে রাজ্যপাট ফেলে নিশ্চিন্তে থাকা এটার কিন্তু একটা শুভ লক্ষণ আছে! এক প্রাণ থেকে আর এক প্রাণে স্নেহ, ভালবাসা বন্ধুত্বের প্রদীপ জ্বলে ওঠার নামই ভ্রাতৃপ্রেম। সেই ভ্রাতৃপ্রেমে তারা কী তবে ভেসে গেল? বুকের ভেতর থেকে জিজ্ঞাসাটা শ্বাসবায়ুর সঙ্গে বেরিয়ে এসে বিপুল পৃথিবীর আরো নানা শব্দের সঙ্গে মিশে গেল।

কথাটা সম্পূর্ণ করে ভাববার আগেই চিন্তাসূত্রের খেই হারাল কেন? গান্ধারী নিজেকে বোকার মত প্রশ্ন করল। আবার নিজের মনেই সে তার উত্তর সাজাল। যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞ করে দুনিয়ার মানুষকে একটা কিছু বোঝাতে চাইছে। বহুকালের ভ্রাতৃবিরোধের ওপর যবনিকাপাত হওয়াটা প্রেম, মৈত্রী, বন্ধুত্ব, সহযোগিতা, সহধর্মিতার এক বিশ্বস্ত বার্তা।

গান্ধারী নিজের মনে মাথা নাড়ল। নিরুচ্চারে বলল : এই উপলব্ধিটাই সমস্যা। হঠাৎ বুক কাঁপিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল গান্ধারীর। আর কেমন একটা গভীর ভাবাচ্ছন্ন মায়াবী দৃষ্টি মেলে চেয়ে রইল পথের দিকে।

মানুষের অস্পষ্ট কথাবার্তা, অশ্বের পদধ্বনি তাকে উৎকর্ণ করল। গাছপালার ফাঁক দিয়ে অনেক দূরে একটা রথকে উল্কার বেগে ছুটে আসতে দেখল। ভিতরকার উদ্বেগ, উৎকণ্ঠায় গান্ধারী টানটান হয়ে দাঁড়াল। স্পষ্ট দেখতে পেল, সুযোধন ভানুমতীকে নিয়ে যেন উড়ে আসছে রথে। আরো অনেক রথ তার পিছন পিছন আসছে। কিন্তু ধুলোয় ঢাকা পড়ে গেল বলে সেগুলি কার রথ ভাল করে চেনা গেল না।

গান্ধারীর বুকের মধ্যে তড়িৎ প্রবাহ বয়ে গেল। গান্ধারী ভয় পেল। উদগ্র সন্দেহে পুনরায় উঠল। তার মায়ের মনের আশংকাটাই কি তবে সত্য হল? রাজসূয় যজ্ঞে অসূয়ায় আগুন জ্বলতে পারে এমন একটা সন্দেহে তার ভেতরটা কন্টকিত হচ্ছিল। সুযোধনের বুকে অসূয়ার আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে না ওঠা পর্যন্ত ইন্দ্রপ্রস্থ থেকে মুক্তি মেলেনি। অসূয়ার আগুন একবার জ্বললে আর নেভে না। কোনও কিছু দিয়ে নেভানো যায় না।

সুযোধন যেরকম নির্দয় হাতে রথ চালাচ্ছিল, তা দেখে গান্ধারী ভীষণ ভয় করছিল। তার স্পর্শকাতর স্নেহপ্রবণ মনটাই তাকে সবচেয়ে বেশি কষ্ট দিচ্ছিল। সে কথা গান্ধারীর কাউকে বলতে পারে না। একা একা নিজের ভাবনার অন্ধকূপের মধ্যে তলিয়ে যায়। তখন পৃথিবীর আর কোন আত্মজনকে নয়, সুযোধনের কথাই বেশি করে মনে হয় তার। কোন কোন হৃদয়বেদনা বেশী করে আকুল করে গান্ধারীকে।

সারাটা জীবন সুযোধন যতটুকু এগোল, জীবনের সমস্ত টুকরো-টাক্‌রা যোগ দিয়ে তার, চেয়ে পেছোল অনেক বেশি। কোন কোন মানুষের ভাগ্যের লিখন এমনি করেই লেখে অদৃষ্ট দেবতা। গান্ধারী ফুঁপিয়ে ওঠার মত চাপাস্বরে আর্তনাদ করেছিল একবার এবং তারপরেই মনে হয়েছিল, পাণ্ডবদের জন্যেই পুত্রদের সমস্ত জীবন ব্যর্থ হয়ে গেল।

একটা কষ্টে মুখ বিকৃত করল গান্ধারী। কপটতা কত মর্মান্তিক হতে পারে এবং তার প্রতিক্রিয়া একটা মানষের জীবনে কত গভীর এবং ব্যাপক, সুযোধনকে দেখে বার বার গান্ধারী অনুভব করে। সেই মুহূর্তে গান্ধারী আর কিছুই ভাবতে পারছিল না। তার ব্যথিত বিষণ্ণ দুই চোখের গভীর তারায় ভেসে উঠেছিল সুযোধনের গনগনে মুখখানা। মানুষ গভীরভাবে অপমানিত হলে ভিতরকার তাপে শুকিয়ে যায়, তাম্রাভ হয়ে ওঠে মুখখানা, চোখদুটো পাগলের চোখের মত অস্বাভাবিক হয়ে ওঠে। গান্ধারীর সমস্ত চৈতন্য জুড়ে সুযোধনের মুখচোখের সেই ছবিটা জ্বল জ্বল করছিল।

গান্ধারীর বুকের ভেতর টনটন করছিল। যন্ত্রণার গভীর থেকে সহসা উৎসারিত হল কুন্তীর নাম, স্বতঃস্ফূর্তভাবে এবং অজানিতে। নিরুচ্চারে বলল : কুন্তী তুমিই আমার নিয়তি। তুমি খুব নোংরা মেয়েমানুষ। আমার সব শান্তি, সুখ, আনন্দকে কেড়ে নিতে এসেছে। কেন? কেন? আমি তোমার কী করেছি?

ইন্দ্রপ্রস্থে সুযোধনের অপমানকে গান্ধারী তুচ্ছ করে দেখল না। যত দিন যেতে লাগল ততই মনে হল, এই অপমানকে কেন্দ্র করে পাণ্ডব বৈরীতার একটা আগুন শীঘ্রি জ্বলবে। দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভার বঞ্চনা, অপমান, ব্যর্থতা আক্রোশ অনেকেই ভোলেনি। এই সুযোগে তারা নিঃশব্দে, গোপনে সুযোধনের পাশে দাঁড়িয়ে নিজেদের স্বার্থে তার অপমানকে উস্কে দিয়ে প্রতিশোধের আগুন জ্বালাতে চাইছে। আগুন এখন সুযোধনের মনেই। গান্ধারী সাধ্য নেই সেই আগুন নেভানোর। সুযোধনের কথা ভেবে গান্ধারীর মনটা কষ্টে, দুঃখ, উৎকণ্ঠায় ভারাক্রান্ত হয়। একা থাকলে অনেক অশুভ চিন্তা জড় হয়। তার কোন অর্থ হয় না, তবু আকুল করে তোলে। স্নেহের ধর্মই হচ্ছে উদ্বিগ্ন করা।

সুযোধন নিজে এখন হস্তিনাপুরের রাজা। পরামর্শদাতার অভাব নেই। অঙ্গরাজ কর্ণকে গান্ধারীর বড় ভয়। তবে, লোকটি ভীষণ বিশ্বস্ত আর অনুগত বান্ধব। সুযোধনকে কখনও বিপদে ফেলবে না। দুর্দিনে তাকে ত্যাগও করবে না, এইটুকুই গান্ধারীর ভরসা। কর্ণ বুদ্ধিমান এবং চতুর। মানুষকে চেনার ও জানার একটা অসাধারণ ক্ষমতা আছে তার। কিন্তু হালে যা হচ্ছে তার অজ্ঞাত অশুভ আশংকায় তার ভিতরটা চঞ্চল হয়ে উঠল।

ইন্দ্রপ্রস্থের অনুকরণে সুযোধন নতুন রাজগৃহ নির্মাণ করল। হস্তিনাপুরের কিছুই অভাব নেই। তবু বহুব্যয়ে বিলাসবহুল এরকম একটি অট্টালিকা নির্মাণ করা গান্ধারীর পছন্দ হল না। এভাবে ঈর্ষাকে শুধু জিইয়ে রাখা হয়। ঈর্ষা কোন সমাধান নয়। তবু যুধিষ্ঠিরের গর্ব টেক্কা দেওয়ার জন্য সুযোধন এই অট্টালিকা করল। ইন্দ্রপ্রস্থের চেয়েও সমৃদ্ধ ও সুচারু করে এই গৃহ নির্মাণের কোন প্রয়োজন ছিল না। রাজার গর্ব, অহংকার চরিতার্থ হয়, শিল্পরুচি ও অনুরাগের বাহবা পাওয়া যায়, ঈর্ষা পরিতৃপ্ত হয়—কিন্তু তারপর? গান্ধারী নিজের মনের অনুচ্চারিত জিজ্ঞাসার জবাব হঠাৎ পেয়ে গেল একদিন।

নবনির্মিত অট্টালিকা সবে সমাপ্ত হয়েছে। সুযোধন গান্ধারীকে তার নতুন প্রাসাদ দেখাতে আনল। চোখ কেড়ে নেওয়ার মত অপরূপ তার ভাস্কর্য, স্থাপত্য, শিল্পকার্য। যেদিকে তাকায় চোখ ফেরাতে পারে না। নেশার মত, মায়ার মত চোখকে শুধু আকর্ষণ করে। একটা ভীষণ ভাল লাগার সুখে তার বুকের ভেতরটা ভরে উঠল। ভীষণ তৃপ্তি আর আনন্দ পেল। প্রাণভরে শ্বাস নিয়ে বলল : বড় শান্তি পেলাম পুত্র। এ গৃহের নাম শান্তিগৃহ হোক।

গান্ধারীর বুকের ভেতরটা দারুণ আতঙ্কে থর থর করে কেঁপে উঠল। পুত্রকে মৃদু ভর্ৎসনা করে বলল : ছিঃ! ও কী কথা?

সুযোধনের মুখে হাসি, চোখে কৌতুক। বলল : মায়ের কাছে সন্তানের কোন আড়াল থাকে না। বোধ হয়, এখানে মানুষ সবচেয়ে নিজেকে মেলে ধরে। এমন বিশ্বাসের জায়গা তো পৃথিবীতে আর কোথাও নেই।

গান্ধারী সহসা কোনও কথা বলতে পারল না। বিস্ময়ে চেয়ে রইল সুযোধনের দিকে। সুযোধনের স্পষ্টভাষণ তাকে উদ্বিগ্ন করল। মুখে দুশ্চিন্তার ছাপ ফুটে উঠল। খুব ধীরে এবং আচ্ছন্ন গলায় বলল: শান্তিগৃহে অশান্তির কথা বলতে নেই। ঈর্ষার শেষ হোক এখানে। চিত্তে শান্তি আসুক নেমে।

সুযোধন গান্ধারীর যুক্তিহীন আচরণ এবং ভাবাবেগে মৃদু হাসল। বলল : মা রাগ কর না। পরিপূর্ণ শান্তি বলতে কিছু নেই। একজনের যা শান্তি, অন্যজনের তা অশান্তি। আমি জানি, তুমি শান্তি চাও। শান্তি সকলে চায়? তবু অশান্তি তার জীবনের পাশাপাশি আছে। এর মানে কী? শান্তিও

সুন্দর, অশান্তিও সুন্দর। অশান্তির দুঃখদহনের নিশ্চয়ই কোন অলৌকিক তৃপ্তি আছে, নইলে লোকে অশান্তি কেন জিইয়ে রাখবে বল?

গান্ধারীর মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গেল। সুযোধনের কথাটা মনের ভেতর ঘুরতেই লাগল একটা দীর্ঘশ্বাসকে পাক দিয়ে দিয়ে—কষ্টে উচ্চারণ করল : কথাগুলো খুব সত্যি। কিন্তু সদিচ্ছাটা বড় কথা। তার জন্যে বিশ্বাসের পরিবেশে সৃষ্টি করা চাই। আন্তরিকতা চাই।

কোন শর্তেই বোধ হয় শান্তি শেষ কথা নয়। শান্তি চেয়ে মেলে না, পরিকল্পনা করে আসে না। অনেক ঘটনার মধ্যে শান্তিটা আপনা থেকে আসে। আমি তো শান্তির পরিবেশ তৈরি করতে, পাণ্ডব-কৌরবের পুরোনো বিরোধের ছেদ টানতেই ইন্দ্রপ্রস্থে গিয়েছিলাম। সেখানে কত স্বার্থের সংঘাতে, রাজনৈতিক বিরোধ ও জটিলতায় রাজসূয় যজ্ঞ পণ্ড হওয়ার উপক্রম হল, কিন্তু আমি তো সংযত থাকলাম। ধৈর্যের পরীক্ষা দিলাম। কিন্তু শেষ রক্ষা হল কই? পাণ্ডবেরা আমাদের বিস্ময় ও সরলতা নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করল। তাদের পরিহাস, উপহাস ভুলতে পারি না। এখন কানের পর্দায় ঝংকারে বাজে ভীমের অট্টহাসি, অর্জুনের পরিহাস, নকুল সহদেবের জঘন্য কটূক্তি। ওরা আমার সদিচ্ছাকে মেরে ফেলল। আমাকে ভাল থাকতে দিল না। ঈর্ষার ঘৃণায় আমার সর্বশরীর রি-রি করতে লাগল। কত রাত আমি ভাল করে ঘুমোতে পারিনি। চোখ বন্ধ করলে আমি সেইসব দৃশ্য দেখতে পাই। আর অপমানে জ্বলে উঠি। কিন্তু আমি তো একটা মানুষ। কত দিন ধরে নিজেকে আর ঠেকিয়ে রাখাব বল? ঘরে আগুন লাগলে যেমন কেউ চুপ করে বসে থাকতে পারে না, তেমনি, আমার অপমানের, লাঞ্ছনার প্রতিকার করার জন্যেও কিছু একটা করা দরকার। ঈর্ষার শান্তি পেতেই এই শান্তিগৃহ তৈরী হল।

গান্ধারী করুণ-চোখে সুযোধনের দিকে চেয়ে রইল। বেশ একটা অস্বস্তিবোধ করতে লাগল। কিন্তু কী করতে পারে, বুঝতে পারল না। ভয়ে তার বুকের ভেতর কাঁপছিল অসহায়ভাবে বার কয়েক সুযোধনের দিকে তাকাল। আর, পায়ের আঙুল মেঝেতে ঘষতে লাগল। তারপর একটা গভীর দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে বলল : যা বলছ, তার ভেতর কোন দোষ নেই ঠিক। কিন্তু তোমার এ মনোভাবের প্রশংসা করতে পারলাম না। ওরকম চিন্তা-ভাবনা থাকলে জীবনে সুখী হওয়া মুশকিল।

সুযোধন অদ্ভুত ভঙ্গি করে হাসল। বলল : সুখ। সুখ যেন কাচ দিয়ে তৈরি। একটু অসাবধান হলেই ভেঙে যায়। একবার ভাঙলে আর জোড়া লাগে না।

গান্ধারী স্তব্ধ হয়ে চেয়ে রইল। তার গলার কাছে কী যেন দলা পাকিয়ে গেল। কথা বলতে পারল না। আস্তে আস্তে খোলা জানালার সামনে এসে দাঁড়াল। বিকেলের মিষ্টি উষ্ণ রোদ এসে পড়েছে সাদা আর কালো পাথরের মেঝেতে। নিচের পথ দিয়ে এখানকার শান্ত জীবনধারা বয়ে চলেছে। ওই জনস্রোতের সঙ্গে মিশে যেতে ইচ্ছে করে, চলতে ইচ্ছে হয়। কোথায় যাবে এবং আদৌ কোথাও গিয়ে পৌঁছবে কি না, সেটা জানার পর্যন্ত ইচ্ছে থাকে না। শুধু চলা থাকে। চলার মধ্যেও বোধ হয় এক ধরনের আনন্দ আছে। যা, কখনও থেমে থাকে না। সুযোধনের চলাটা কি সেইরকম কোনও চলা? চুপ করে গান্ধারী অসহায়ভাবে বুকের কাঁপুনি ভোগ করতে লাগল।

গান্ধারী স্বগৃহে বসেই শান্তিগৃহের বিশাল সভাকক্ষে পুরুষকণ্ঠের উত্তেজিত উল্লাস, চিৎকার, উন্মত্ত কোলাহল শুনতে পাচ্ছিল। ক্রমেই উত্তেজনা, চেঁচামেচি, হই-হল্লোড় সপ্তমে উঠল। উৎকর্ণ উৎকণ্ঠা নিয়ে গান্ধারী শুনতে লাগল। কিন্তু কারো কণ্ঠস্বর বোঝা গেল না। উল্লসিত উত্তেজনায় প্রত্যেকের গলার স্বর ভাঙা এবং বিকৃত। বহুজনের মিলিত কণ্ঠস্বরের ভেতর কোন একজনের গলার স্বর পৃথক করে নিতে পারল না। কিন্তু হঠাৎ এত হই-হল্লোড় কেন? উত্তেজনাই বা কেন? এত আনন্দই বা কী নিয়ে? ওই লোকগুলো কারা? এতগুলো জিজ্ঞাসা তার উৎকর্ণ উৎকণ্ঠাকে পাক দিয়ে দিয়ে ঘুরতে লগাল মস্তিষ্কের অভ্যন্তরে। দুশ্চিন্তা, উৎকণ্ঠার সত্যি কোন কারণ আছে কি না জানতে একজন বিশ্বস্ত পরিচারিকাকে পাঠাল।

সকাল থেকে তার মনটা ভাল ছিল না। বামচোখের পাতা লাফানো থেকে মনটা আরো খারাপ

হয়ে গেল। অমঙ্গল আশংকায় তার বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠল। সুযোধনের শান্তিগৃহ তো অশান্তির নিশানা। শান্তিগৃহের দ্বারোদ্‌ঘাটন উপলক্ষে বহু ভারতীয় রাজন্যবর্গের সঙ্গে পাণ্ডবেরা কুটুম্ব এবং আত্মীয় বলে নিমন্ত্রিত হল। কিন্তু পাণ্ডবদের আগমনের পর থেকে গান্ধারীর মনে শান্তি ছিল না। প্রতি মুহূর্ত একটা বিপদের আশংকা কাতর করছিল তাকে। কখন কী হবে এই উৎকণ্ঠায় তার সময় কাটছিল না। কর্ণ, দুঃশাসন, শকুনি, সুযোধনের সন্দেহজনক কথাবার্তা, চলাফেরা মধ্যে প্রতিমুহূর্ত সে একটা বিপদের গন্ধ পাচ্ছিল। আর যাই হোক, শান্তিগৃহে পাণ্ডবেরা নিরাপদ নয়। যে কোন মুহূর্তে তাদের বিপদ হতে পারে। এই উৎকণ্ঠা তাকে সুখে থাকতে দেয়নি। সর্বক্ষণ মনে হয়েছে বিপদের ছায়া পান্ডবদের অনুসরণ করছে। আর সে ভয়ে ভয়ে থেকেছে। তার মনের এই অসহায় অবস্থা কারো কাছে বলার নয়। কাকে বলবে? কে শুনবে? ধৃতরাষ্ট্র, কুন্তী, ভানুমতী, কিংবা দ্রৌপদী কেউ তার মত নয়। ওদের বুকের গভীরে স্বার্থপরতার চাপা নিষ্ঠুরতা আছে। নিজের সন্তান এবং স্বামী ছাড়া অন্য কারো সুখ, স্বার্থের কথা ওরা ভাবে না। কিন্তু গান্ধারী ওদের মত হতে পারল না। এই পরিবারে যদি কারো ভেতর সত্যিকারের প্রেম, মমতা, স্নেহ, ভালবাসা, বিবেক এখনও বেঁচে থাকে সে আছে গান্ধারীর ভেতর। যার বিবেক বেঁচে থাকে তার সুখ মরে যায়। গান্ধারী নিজেকে দিয়েই তা বুঝতে পারছে। সুখী হবার শান্তি পাবার সহজ উপায় বিবেকহীন হওয়া। বিবেক বিবশ হলেই নিজের জন্যে বাঁচা যায়। কেমন এক থম ধরা ব্যথায় গান্ধারী বুকের ভেতরটা টাটাচ্ছিল। আর চোখের পাতায় নিবিড় ব্যথার ছায়া ঘন হয়ে উঠল।

ঘাড় ফেরাতেই গান্ধারী দেখল কুন্তী সামনে দাঁড়িয়ে। কুন্তীর মুখে ঝড়ের ঝাপ্টা, চোখে আগুন। গান্ধারীর দিকে ঝলকানো চোখে তাকাল। গান্ধারী মুহূর্তে একটু থমকে গেল। কিঞ্চিৎ বিব্রত এবং অসহায় বোধ করল। বিভ্রান্ত চোখে অসহায়ের মত কুন্তীর দিকে তাকাল। কুন্তী কথা বলতে পারছিল না। অবরুদ্ধ কথায় তার বুক ওঠানামা করছিল। দুচোখের প্রখর দৃষ্টি ঘৃণায় রাগে জ্বলছিল। আর তার তীব্র তাপ গান্ধারীর সারা শরীর এবং স্নায়ুতে স্নায়ুতে জ্বালা ধরিয়ে দিল।

আচমকা একটা প্রশ্ন জাগল গান্ধারীর মনে। হঠাৎ, কুন্তীর বুকে এ কোন আগ্নেয়গিরির উদ্গীরণ? এই বিরাগ, অসহিষ্ণুতা তার বুকে কোন ঝড়ের সংকেত বয়ে আনল? গান্ধারী অস্বস্তিবোধ করল। মুখে বিমর্ষতার ছায়াপাত ঘটল। নিজের হতচকিতভাব কাটিয়ে উঠে ভুরু কুঁচকে বলল, কী হয়েছে ছোট? কিছু বলবে?

বুকভরা নিঃশ্বাস পড়ল কুন্তীর। অনেক জমা করা তাপের সঙ্গে বেরিয়ে এল কথাগুলো। বলল, কী বলব? কার কাছে বলব? বলে কী হবে? তুমি কিছুই শোননি কি? বোকা সেজে থাকলে কি পার পাবে ধর্মের কাছে? তীক্ষ্ণ বিদ্ধ সন্দেহে মৃদু ও মন্থর ঢেউয়ের কুন্তীর বুক ওঠনামা করছিল।

কুন্তীর কথায় গান্ধারী চমকে ওঠল। অবাক স্বরে ত্রস্ত গলায় বলল, তুমি মিথ্যে দোষারোপ করছ। তোমার কটাক্ষ মর্মান্তিক। মানুষের হৃদয় বোঝ না। মন জান না। কেবল আঘাত করতে পার। কোনদিন সোজা করে কিছু বললে না। জট পাকানোই তোমার স্বভাব। কথাগুলো বলার সময় গান্ধারীর বুকের ভেতরটা থরথর করে কাঁপছিল।

কুন্তী বিষ দৃষ্টিতে গান্ধারীর দিকে তাকাল। দুচোখে আগুন জ্বেলে বলল, তোমার সঙ্গে কথা কাটাকুটির খেলা করার মত মনের অবস্থা আমার নয়। আমার বুক ফেটে চৌচির হয়ে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে, হঠাৎ একটা ঝড় এসে আমার জীবনটাকে ওলোট-পালোট করে দিলে। মাথার উপরে ঘরের ছাদ উড়ে গেলে যেমন অসহায় লাগে, কিংবা হঠাৎ আশ্রয়চ্যুত হলে মানুষ যেমন হতভম্ব হয়ে যায় —ঠিক তেমনি এক অসহায় অবস্থা আমার। এই দুর্ভাগ্য আমার জীবনে নতুন কোন ঘটনা নয়, তবু অতীতের সব ঘটনাকে ম্লান করে দিয়েছে আজকের ঘটনা।

গান্ধারী বিপন্ন বিব্রত মুখে অসহায়ের মত কুন্তীর মুখের দিকে তাকাল। হতবুদ্ধির মত চেয়ে রইল। বুকের মধ্যে ভয়ের আশংকা চমকে উঠল। অকস্মাৎ চোখের তারায় ভেসে ওঠল সুযোধনের মুখ। আহত অপমানে পাণ্ডুর ঈর্ষায়, ক্রোধে, প্রতিহিংসায় জ্বলন্ত। অমনি একটা দুরন্ত উদ্বেগ জিজ্ঞাসা তাকে আকুল করে তুলল। বুকটা মোচড় দিল। যে কুন্তীর কথা মনে হলেই তাকে খুব দুঃখ দিতে ইচ্ছে করত, সেই কুন্তীর মাতৃ অন্তরের বিষাদ, হাহাকার, বেদনা তাকে মুহূর্তে সহানুভূতিশীল করে

তুলল। কিন্তু সংযম হারাল না। এক চমকানো জিজ্ঞাসায় অবাক হয়ে গম্ভীর গলায় গান্ধারী বলল, তুমি যখন বলতেই এসেছ তখন বাগাড়ম্বরের কী দরকার? স্পষ্ট করে বল। আজ এমন কী ঘটল যা তোমাকে বিচলিত করল? এরকম উদভ্রান্তের মত ছুটেই বা এলে কেন? তোমার মনের কষ্ট দূর করতে আমি কী করতে পারি বল?

কুন্তী স্থির দৃষ্টিতে গান্ধারীর দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। বলল, আমার জন্যে তোমার কিছুই করার নেই। তবু এলাম, কেন? হস্তিনাপুরে আজ উৎসবের ধুমধাম। তোমার বড় আনন্দের দিন, বড় সুখের দিন। আমার পুত্রেরা আজ ডুবতে বসেছে। পাপ পাশা খেলায় তার সর্বস্বান্ত হয়েছে। রাজ্য, সম্পদ, ঐশ্বর্য দ্যূত পণে সব হারিয়েছে। এখন তারা নিঃস্ব, রিক্ত, ভিখারী। সর্বহারা। পাণ্ডবেরা আগে যা ছিল, আবার তাই হল। পাণ্ডবদের ভাগ্যটা বড় অদ্ভুত! শুধু দুঃখ দারিদ্র কষ্ট দিয়ে তৈরি। তুমি এখন খুশি তো?

গান্ধারী হতভম্ব। বোবা বিস্ময়ে তার দুই ভুরু টানটান হল। কুন্তীর কথাগুলো তার বুকে বিঁধে রইল। তীব্র অপমানে তার বুক টাটাতে লাগল। কেমন একটা শীতলতায় তার সমস্ত শরীর অবশ হয়ে এল। মাথাটা গুলিয়ে গেল বারবার। কৌরব ও পাণ্ডবদের বিরোধ ও সম্পর্কের নানারকম ছবি তোলপাড় করে গেল তার চোখের তারায়। আর একটা অসহনীয় যন্ত্রণা সহ্য করল দাঁত টিপে। একটা ঘোর ঘোর আচ্ছন্নতার মধ্যে অতি কষ্টে শান্ত নিরীহ গলায় বলল, ছিঃ, এমনভাবে কথাটা বলতে তোমার বিবেকে বাধল না। সবাইকে তোমার মত এক ধাতুতে তৈরি ভাবছ কেন? তোমার পুত্রদের দুর্ভাগ্যে আমি খুশি হব—এত বড় একটা নিষ্ঠুর মিথ্যে ভাষণ দিতে তোমার একটু মমতা হল না। ছিঃ।

ভাগ্য বিপর্যয়ের দুঃখে কুন্তীর দুই চোখ ছলছল করে উঠল। ভেজা গলায় বলল, পঞ্চপাণ্ডব আজ থেকে তোমার পুত্র দুর্যোধনের দাস। তার আজ্ঞাবাহী ভৃত্য।

গান্ধারীর বুক থেকে অস্ফুট শব্দ করে একটা গভীর শ্বাস নামল। যন্ত্রণার গভীরে ডুবে গিয়ে নিঃশব্দে আর্তনাদ করে উঠল, ছোট!

আমিও পুত্রদের মত তোমার সেবিকা। বলতে গিয়ে তার দুচোখ জলে ভরে গেল।

গান্ধারীর মুখখানা অপমানে রাঙা হল। মুখ কান ভীষণ তেতে উঠল। কুন্তীর কথাগুলো কানের পর্দায় ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের হুল ফোটাতে লাগল। কারণ তার নিজের মনেই পুত্রদের প্রতিশোধাত্মক মনোভাব সম্পর্কে একটা ক্ষীণ সন্দেহ এমনি ছুঁয়ে ছিল। কুন্তীর কথায় তার ভিতরটা একটু চমকালেও শৈথিল্য দেখাল না। নিজেকে স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করল। বলল, পাগলের মত কী যা তা বলছ সব! ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করার সময় পেলে না!

কুন্তীর বুক ভাঙা নিঃশ্বাস পড়ল। দাঁতে দাঁতে চাপল। উদ্গত অশ্রু কখন যে মিলিয়ে গেল টেরও পেল না। একটা তীব্র কষ্টে তার বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠল। আর্তস্বরে গম্ভীর গলায় বলল, তোমার সঙ্গে রসিকতা করার মন মরে গেছে। কেউ নিজের দুর্ভাগ্য নিয়ে মজা করে না। এসব বলতে আমার ভাল লাগছে না। আমার সর্বস্বান্ত পুত্রদের সৌভাগ্য ফেরানোর কোন আর্জি নিয়ে তোমর কাছে আসিনি। এ তাদের নিজের তৈরি দুর্ভাগ্য। তাদের কর্মফল। কিন্তু সৌভাগ্যবান তোমার পুত্ররা কৌরব বংশের কি সর্বনাশ আজ করল তাঁর খোঁজ রাখ কি?

গান্ধারীর বুকের ভেতরটা ধরাস করে উঠল। বিব্রত বিস্ময়ে ভারাক্রান্ত গলায় অস্ফুট স্বরে উচ্চারণ করল, সর্বনাশ! সর্বনাশের কী করল?

গভীর একটা দুঃখে দীর্ঘশ্বাস মর্মরিত হল কুন্তীর কম্পিত কণ্ঠস্বরে। বলল, দ্যূত পণে পরাজিত পঞ্চ-পাণ্ডবের নয়নমণি পাঞ্চালীর সম্মান হনন করতে দুঃশাসন সভাকক্ষে টেনে নিয়ে গেল। পাষণ্ড দুঃশাসন তাকে নির্দয়ভাবে চুলের মুঠি ধরে বলির পশুর মত টানতে টানতে নিয়ে গেল।

চমকানো বিস্ময়ে গান্ধারী ধমকে উঠল, ছোট! বুকের ভেতর আশাভঙ্গের অসহ্য একটা যন্ত্রণা পাক খেয়ে উঠে এল গলার কাছে। দুঃসহ দুঃখে, অভিমানে, পুত্রগর্ব ভঙ্গের কষ্টে রুদ্ধ হয়ে গেল তার কণ্ঠস্বর।

গভীর দুঃখের মধ্যে কুন্তী তার অস্তিত্ব ভুলে গেল। গান্ধারীর অভিব্যক্তি এবং প্রতিক্রিয়ার দিকে

তার কোন দৃষ্টি ছিল না। পাঞ্চালীর নিপীড়ন, নিগ্রহ এবং লাঞ্ছনার বহু ছবি তার চোখের সামনে ভেসে উঠল। একটা কষ্টবিদ্ধ যন্ত্রণায় দু'হাতে বুকে চেপে ধরে শ্বাস ফেলে বলল, নরপিশাচ দুঃশাসনের হাতে তার এখনও আর কি লাঞ্ছনা বাকি, ঈশ্বর জানে। ওই শোন, পাঞ্চালীর আকুল ক্রন্দন। কী আর্তস্বরে ডাকছে, কোথা পতিতাপাবন নারায়ণ, রক্ষা কর অসহায় পাঞ্চালীর লজ্জা। শুনতে পাচ্ছ, তোমার বর্বর পুত্রদের পাশব উল্লাস। অথচ সেখানে উপস্থিত আছেন ধর্মজ্ঞ পিতামহ ভীষ্ম, ধর্মাত্মা বিদুর, আচার্য দ্রোণ, কৃপ, মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র, অগণিত মুনি, ঋষি, বীর, রথী। তাদের সম্মুখে চলেছে পাঞ্চালীর নিগ্রহ অপমান। নারীর আজ বড় দুর্দিন। বিপন্না, অসহায়া, ধর্ষিতা, লাঞ্ছিতা, অপমানিতা, নির্যাতিতা নারী আজ নিঃসহায়া। পুরুষ নির্লজ্জ। নারীর সম্ভ্রম, মর্যাদা, সতীত্ব নিয়ে যে বর্বর কৌতুক এবং খেলা হচ্ছে অথচ তা কোন পুরুষের পৌরুষ, বিক্রম, বিবেক জাগ্রত করছে না—এ বড় আশ্চর্য! বিপন্না পাঞ্চালীকে দুর্বৃত্তরা নিগ্রহ করছে তবু তাদের বিকেহীন, কাণ্ডজ্ঞানহীন, নীতিহীন, ধর্মহীন সমাজবিগর্হিত কার্যের কেউ প্রতিবাদ করল না। অসহায়া নির্যাতিতা পাঞ্চালীকে রক্ষা করতে কোন বীর কিংবা ধর্মাত্মা ব্যাক্তি এগিয়ে এল না। কোন পুরুষ অবলা জ্ঞানে মুছিয়ে দিল না তার আঁখিজল। ক্রোধে কেউ অসহিষ্ণু হল না। লজ্জায় সভাকক্ষ ত্যাগ করল না। ক্লীবের মত বসে রইল পাঞ্চালীর শরীর দর্শনের লোভে! ধিক্ ধিক্ পুরুষের পৌরুষকে। পাঞ্চালী আজ বড় নিরুপায়, অসহায়। তার পঞ্চস্বামীরা ক্রীতদাস। অধিকার স্বাধীনতা হারিয়ে নিরীহ পশুর মত তারা রজ্জুবদ্ধ। বোবা যন্ত্রণায় তাদের বুক ফেটে যাচ্ছে। পাঞ্চালী বড় একা। এই মেয়েমানুষকে রক্ষা করার একজন পুরুষও নেই হস্তিনাপুরে! দিদি, তুমি তার একমাত্র রক্ষাকর্তা। পাঞ্চালী আমার তোমার মত নারী। তার এই দুর্দিনে আমরা মেয়েমানুষ হয়ে তার দুঃখ বেদনা, অপমান, লজ্জাকে নিজের বুকের ভেতর অনুভব না করি, যদি তার পাশে না দাঁড়াই তবে মেয়েমানুষকে রক্ষা করবে কে? কে বাঁচাবে তাকে? মেয়েমানুষই মেয়েমানুষের দুঃখ, অপমান যত বুঝবে, অন্যে বুঝবে না। তাই বড় নিরুপায় হয়ে অসহায়ের মত তোমার কাছে এসেছি। সমস্ত মেয়েমানুষের হয়ে আমি নয়নের জলে তোমার কাছে ভিক্ষে চাইতে এসেছি পাঞ্চালীর সম্ভ্রম। নারীর লজ্জাটুকু তার রক্ষা কর। একমাত্র তুমিই পা: তাকে লাঞ্ছনা থেকে বাঁচাতে। দিদি, সময় বড় অল্প। সব রাগ, অভিমান ত্যাগ করে একজন বিপন্ন. অসহায়া নারীকে উদ্ধারের জন্য সভাকক্ষে চল।

গান্ধারী স্তব্ধ। কাঠের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইল। তার মুখখানা কাগজের মত সাদা হয়ে গেল। একটা অদ্ভুত কষ্টে আর ব্যথায় তার বুক টনটন করতে লাগল। চোখের তারায় তার অন্তর্ভেদী নিবিড়তা নামল। সে কথা বলতে পারছিল না। বুকের ভেতর নিঃশব্দ কান্নার ঢেউ তাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল দ্রৌপদীর দিকে। তার দৃষ্টি স্থির এবং শূন্য। কিছুই নজরে পড়ছিল না। কেবল দ্রৌপদীর মুখখানা মনে পড়ছিল। শংকিত বিহ্বল অনুভূতির মধ্যে সে নিজেকে হারাল না। কেমন একটা ঘোর লাগা আচ্ছন্নভাবে ভেতর সে নিঃশব্দে সভাকক্ষের দিকে এগিয়ে চলল।

গান্ধারী যখন সভাগৃহে ঢুকল তখন লুব্ধদৃষ্টিতে সকলে দ্রৌপদীকে দেখতে ব্যস্ত। গান্ধারীর নিঃশব্দ আগমন তাই কেউ টের পেল না। সভাকক্ষে পা রেখে গান্ধারী শুনতে পেল দ্রৌপদীর কণ্ঠস্বর। লাঞ্ছিতা, অপমানিতা এক নারী যেন নিজেকে গোটা নারী জাতির হয়ে বলছে, মেয়েরা বড় দেহসর্বস্ব জীব। এই দেহটাই তার বড় শত্রু। ক্ষুধার্ত পাশব সত্তাকে আশ মিটিয়ে পেট পুরে খাওয়ানোর এক রহস্য ছাড়া আর কিছু নেই এ দেহের মধ্যে। তবু পুরুষ জাতটা এর গন্ধ নেবার জন্যে, তাকে অনাবৃত করে দেখার জন্য কত বিবেকহীন হতে পারে আজ এখানে না এলে এত গভীর করে জানা হত না। জীবনের অনেক ঋণ, অনেক কৃতজ্ঞতা যে মেয়েদের দেহ দিয়ে মেটাতে হয় এই প্রথম জানলাম। গুরুজন থেকে আরম্ভ করে আত্মীয়-অনাত্মীয় সকলে চোখ ভরে এই দেহটাকে দেখার ইচ্ছে হয়েছে বলেই তাদের প্রচ্ছন্ন প্রশ্রয়ে মদতে আমার দেহ নিয়ে, শরীর নিয়ে দুঃশাসন একটা পশুর মত যা খুশি করছে। লজ্জাই যখন কেড়ে নিল তখন নিজেকে অনাবৃত করতে বাধা কোথায়? কার কাছে লজ্জা করব? জঙ্গলের পশুর কাছে মানুষের কোন লজ্জা নেই। নরাধম দুঃশাসনের আর কষ্ট করার দরকার নেই। আমিই নিজেকে অনাবৃত করছি। দ্যাখ নরাধমেরা।

সেই মুহূর্তে গান্ধারীর কণ্ঠ থেকে সরু সুরে এক আর্তস্বর বেরোল। না। না। পাগল মেয়ে, কার ওপর তোমার অভিমান?

সভাস্থ লোকেরা চমক ভাঙল। সুপ্তোত্থিতের মত তারা দেখল কুন্তীকে ধরে গান্ধারী পাগলের মত দ্রৌপদীর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। দু'হাতে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে গান্ধারী তার মাথা আঘ্রাণ করল। দর দর করে চোখ দিয়ে কয়েক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল দ্রৌপদীর মাথায়। বিগলিত স্বরে ভাঙা গলায় বলল : পাগল মেয়ে। কার ওপর অভিমান তোর? অভিমান করে আত্মঘাতী হওয়া যায়, কিন্তু বাঁচা যায় না। ইজ্জত বাঁচাতে না পারলে মেয়েমানুষের কোন সম্মান থাকে না। আমিও তোর মতই এক হতভাগিনী। অনেক দুঃখ, অনেক তাপ জমা হয়ে আছে বুকে। তবু কারো ওপর অভিমান নেই।

দ্রৌপদী কাঁদল না। তার চোখদুটো গ্রীষ্মের দুপুরের মত ধূ-ধূ করতে লাগল। গান্ধারী কাঁধের ওপর চিবুক রেখে শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে রহিল। গান্ধারীর বুকের ধুকপুক ধুকপুক শব্দের সঙ্গে দ্রৌপদীর বুকের শব্দ এক হয়ে মিশে গেল। গান্ধারীর নিজের শরীরে দ্রৌপদীর গায়ের জমানো তাপ অনুভব করল। খুব অস্বস্তি লাগছিল। অব্যক্ত এক ঘেন্নায় তার নিজের মুখটা একটু কুঁচকে গেল। ভিতরে ভিতরে একটা দুঃসহ লজ্জা, আত্মগ্লানি তাকে নিরন্তর পীড়া দিচ্ছিল। কিছু ভয়, কিছু দুঃখে তার বুকটা টাটাতে লাগল। আলিঙ্গনাবদ্ধ দ্রৌপদীর ভেতরে নিরুদ্ধ অপমানের রোষ, জ্বালা মুক্ত করে দেবার জন্যে বলল কৃষ্ণা তোর বুকে এ কোন আগ্নেয়গিরি ফুটছে, মা? সারা শরীরে মরুভূমির দাহ কেন? চোখে একটা ফোঁটা জল নেই। কেমন অন্যধারা হয়ে গেছিস। পাগল মেয়ে। এত অভিমান চলে নিজের মায়ের ওপর আর নিজের অদৃষ্টের উপর। জন্তুর ওপর কোন অভিমান চলে? পুরুষ মানুষ হল নৃসিংহরূপী। ভগবান ওদের মানুষ করেনি। মানুষের আকৃতিতে পশু। পুরুষ জাতটার মধ্যে মানুষ কমই শুধু অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বেশি। পাশব সত্তাটা তার আশ মিটিয়ে পেট পুরে শুধু খায়। আবার ওদেরই আমরা পেটে ধরি। সেটাই আমাদের বড় অপমান। মেয়েমানুষের বড় লজ্জা।

তারপর দ্রৌপদীর আলিঙ্গনমুক্ত হয়ে সভাস্থ ব্যক্তিবর্গের দিকে মুখ করে বলল, ধিক ধিক সভাস্থ ব্যক্তিবর্গ। একটি নারী আপনাদের চোখের সামনে নিগৃহীত হচ্ছে, লাঞ্ছিত হচ্ছে, আপনাদের সাহায্য চাইছে, তবু আপনারা নিশ্চল থাকতে পারলেন? সভায় এতগুলো পুরুষ আছেন, তবু দুর্বৃত্ত কাপুরুষ ধার্তরাষ্ট্রদের হাত থেকে অবলা নারীকে উদ্ধার করতে একজনও এল না? আপনাদের মত নৃসিংহরূপী পুরুষদের ধিক্কার দিতেও ঘেন্না হয়। আপনার পুরুষ নামের অযোগ্য। মহারাজ, কুলবধূকে তোমার পুত্রেরা প্রকাশ্যে নিগৃহীত করছে জেনেও তুমি নীরব। তাদের নিবৃত্ত করার কোন চেষ্টা করনি। তুমিও চেয়েছ শালীনতাবোধ বাদ দিয়ে, ভদ্রতার ধার না ধরে এই নিগ্রহ হোক। হয়ত কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য আছে।

গান্ধারীর অভিযোগের ভেতর এমন একটা ইঙ্গিত ছিল যা ধৃতরাষ্ট্রকে বেশ একটা অস্বস্তিতে ফেলল। তার অপদস্থতাকে চাপা দেবার জন্যে ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলল, রানি! ক্রোধের বশে গোটা সভাকে অপমান করছ।

তোমরা দ্রৌপদীকে লাঞ্ছিত করে গোটা নারী জাতিকে অপমান করেছ। এতে কৌরবদের কোন সম্মান বাড়েনি। তোমার নীরব অনুমোদন নারী নিগ্রহের কলংক হয়ে থাকবে। এই একটিমাত্র ঘটনাই তোমাদের ভাবমূর্তি নষ্ট করার পক্ষে যথেষ্ট। যে রাজ্যে রাজবধূ নিজে নিগৃহীত, সেই রাজ্যে সাধারণ রমণীরা সম্মান নিরাপত্তা আশা করবে কেমন করে? তারা কত অসহায়, বিপন্না তা যদি জানতে? মহারাজ আমিও এ রাজ্যের একজন রমণী। রমণীর অপমান আমাকে মর্মাহত করেছে। আমিও তার মত সমান অপামানিত বোধ করছি। সমস্ত নারীর হয়ে মহারাজের কাছে চোখের জলে বিচার প্রার্থনা করি। যারা নারীর সম্মান রাখল না, নারীকে যা খুশি তাই করে অপমান করল সেই বর্বর নরাধম অপরাধীদের শাস্তি দাও। পুত্র হলেও তারা ক্ষমার অযোগ্য। দাও তাদের নির্বাসন দণ্ড। বিনিময়ে পাণ্ডবদের দ্যুত পণ থেকে মুক্ত করে দাও। ফিরিয়ে দাও পাণ্ডবদেব রাজ্য, সম্পদ, ঐশ্বর্য সব।

ধৃতরাষ্ট্র একটু গম্ভীর হল। প্রস্তাবটা তার খুব পছন্দ হল না। তবু গান্ধারীর সঙ্গে প্রকাশ্যে সংঘাতে গেল না। অভিযোগ এবং তার প্রার্থনা বড় নিষ্ঠুর। পাছে রাজ্যের ওপর, সিংহাসনের

উপর সন্তানদের অধিকারটুকু চলে যায় সেই ভয়ে পাগল হয়ে যাচ্ছিল ভিতরে ভিতরে। তাকে ভীষণ অশান্ত ও বিচলিত দেখাল। একটা শ্বাস তার বুকে আটকে আঁকুপাঁকু করতে লাগল। দীর্ঘশ্বাস ফেলে অপরাধ স্বীকার করে নিয়ে বলল, সত্যিই আমরা একটা ঘোরের মধ্যে ছিলাম। পুত্রেরা বড় বাড়াবাড়ি করেছে। আমি সকলের হয়ে মা দ্রৌপদীর কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।

হঠাৎ বিকর্ণ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, যে সম্মান সে হারাল, সে সম্মান তাকে ফিরিয়ে দাও তাহলে?

কথাটা ধৃতরাষ্ট্রের সমস্ত শরীরে শাঁখের মত বেজে ওঠেছিল। স্পষ্ট টের পেল তার মুখ রক্তশূন্য হয়ে গেছে। বুক কাঁপছে। একটু থমকে বিব্রত গলায় বলল, যা যায় তা ফিরে পাওয়া যায় না। তাকে কেবল পূরণ করা যায়। আমি দ্রৌপদী মাকে পণ থেকে মুক্তি দিলাম। নারীর পূর্ণ মহিমা, অধিকার নিয়ে পঞ্চস্বামীর সঙ্গে ফিরে যাও তুমি ইন্দ্রপ্রস্থে। আর তোমায় যারা অপমান করল তার সব দোষ, অপরাধ আমি শিরে তুলে নিলাম। এতো আমারই অপরাধ। পারলে, এই অন্ধ, দুর্বল, অসহায় বুড়ো ছেলেটাকে ক্ষমা কর মা।

সূর্যটা ডোবার সঙ্গে সঙ্গে গান্ধারী কেমন যেন হয়ে যায়। মনটা ভারাক্রান্ত হয়। কিছু ভাল লাগে না। ধীরে ধীরে সন্ধা নামল। অন্ধকার গভীর হল। শান্ত নীরব রজনীর মত নিজেকে তার বড় বিষণ্ণ আর একা মনে হয়। অন্ধকার রাত্রির মত ভয়ংকর একা আর ভীষণ শূন্য লাগে।

একমাত্র অন্ধকারে মানুষ নিজেকে বড় নিবিড় করে পায়। মনের সঙ্গে মুখোমুখি বসার সেই হল সুযোগ। মানুষের জীবনের কিছু মূল প্রশ্নের উত্তর বোধ হয় তাকে একা একাই দিতে হয়।

থমথমে অন্ধকার তার চার পাশের নিস্তব্ধতাকে আরো গভীর করে তুলল মনটা অন্ধকারের মত রহস্যময় হয়ে উঠল। কত অদ্ভুত সব চিন্তা মনে হল। মস্তিষ্কের ভেতর অবাধে ছড়িয়ে পড়ল।

গান্ধারীকে ভাবনায় পেল।

মাঝে মাঝে জীবনে এমন এমন দুর্দৈব মুহূর্ত আসে যখন অনেক থেকেও কিছু থাকে না, সকলে থেকেও কেউ তার নয়। এ এক অদ্ভুত শূন্যতা। পুত্রদের নিয়ে কত স্বপ্ন ছিল। হঠাৎ, সব এলোমেলো হয়ে গেল। বুকটা উথাল-পাতাল করে ওঠল। একটা চাপা উত্তেজনা বোধ করল। আর সেই মুহূর্তে কী একটা হারানোর বেদনায় হু হু করে ওঠে মন। যেখানে থেকে সবচেয়ে বেশি পাওয়ার প্রত্যাশা ছিল সেখান থেকে খালি হাতে ফিরল আর যেখানে প্রত্যাশার কিছুমাত্র ছিল না সেখানে কি এক অনাস্বাদিত মুগ্ধতায় মন ভরে গেল। চিন্তাটা খুব বেশিক্ষণ স্থায়ী হল না।

অন্ধকারের মধ্যে দ্রৌপদীর দুটি চোখ দেখতে পাচ্ছিল। আপহত সর্পিনীর মত দু'চোখে তার আক্রোশের আগুন জ্বলছে। অমনি একটা অমঙ্গল আশংকায় মনটা তার খারাপ হয়ে গেল। পুত্র সুযোধনকে অপরাধী মনে হল। কিন্তু সুযোধনকে সত্যই কি অপরাধের জন্য দায়ী করা যায়? অদ্ভুত সব স্মৃতি ঘটনা হানা দিয়ে গেল মস্তিষ্কের ভেতর। অপরাধ তো তার বুকে তৈরি করা হয়েছে। পুঞ্জীভূত অনেক অপমান, ক্ষোভ, ঈর্ষা সুতীব্র আত্মাভিমানের সঙ্গে মিশে, তার বুকে বিদ্রোহের সাগর সৃষ্টি করল। কিন্তু তার নারী নিগ্রহের বর্বরতা হৃৎপিণ্ডের সঙ্গে ঝুলে রইল।

যমুনার বুক থেকে ফুরফুরে হাওয়া আসছিল। এলোমেলো হাওয়ায় মাথার চুল ওলোট-পালোট হয়ে গেল। তবু মস্তিষ্কের বদ্ধ কুঠুরীর মধ্যে যে প্রদাহ অঙ্গারের মত ধিক্ ধিক্ করে জ্বলছিল তার জ্বালা জুড়োল না।

আনমনে বাইরে কালো অন্ধকারের দিকে তাকিয়েছিল গান্ধারী। বুকের গভীরে এক অব্যক্ত বেদনা তাকে ভীষণ অশান্ত করে তুলল। নিজের অজান্তে মাঝে মাঝে কপালের দু'পাশ চেপে ধরছিল। কখনও চুলগুলো মুঠো করে খামচে ধরছিল। একটা বিপুল কিছু উৎপাত চলছিল তার বুকের ভেতর। সুযোধন এর স্রষ্টা।

সুযোধনকে নিয়ে গান্ধারীর একটা নিজস্ব গর্ব ছিল। কুন্তীর সন্তান গর্বকে সে টেক্কা দিয়েছিল। এটাই ছিল বড় জয় তার অবচেতন মনে। যা কিছুই নিজের জন্যে অথবা অন্যের জন্যে খুশি মনে একজন মানুষ করে তাইই শুধু থাকে জীবনে। শুধু সেইটুকু আনন্দ এবং গর্ব বুকের মধ্যে

বেঁচে থাকে। গান্ধারীর প্রাণের ভেতর এরকম একটা দ্বীপ সৃষ্টি করেছিল সুযোধন।

পাণ্ডবদের মত কৌরবরাও অভিন্ন ভ্রাতৃবোধে ঐক্যবদ্ধ। কিন্তু কৌরবদের পাণ্ডবদের মত ভ্রাতৃপ্রীতির ঐক্যের কোন পরীক্ষা দিতে হয়নি। তাদের পারস্পারিক বিশ্বাসের কোন সংকট আসেনি। তাদের আনুগত্য, বন্ধুত্ব, ভ্রাতৃত্ববোধ, সহযোগিতা এবং ঐক্যবোধ ছিল স্বতঃস্ফূর্ত। এর সব কৃতিত্বই সুযোধনের। কৌরবদের ভ্রাতৃপ্রেমকে একসূত্রে গ্রথিত করতে কিংবা বিশ্বাসে অটুট রাখতে দরকার হয়নি দ্রৌপদীর মত কোন নারীর। পঞ্চপাণ্ডবের নিরাপত্তার রক্ষাকবচ করতে কুন্তী দ্রৌপদীর শরীরকে খণ্ড খণ্ড করে পঞ্চপাণ্ডবের মধ্যে বণ্টন করে দিয়েছে। এরকম নির্লজ্জ নোংরামি তাকে করতে হয়নি। কৌরবদের ভ্রাতৃপ্রেমের শিকড় বটগাছের মত শাখা-প্রশাখা থেকে বেরিয়ে অনেকদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে গেছে। তাকে নির্মূল করে এমন সাধ্য পাণ্ডবদের নেই। ভেদবুদ্ধির চক্রান্ত দিয়ে কেউ যদি তার মূলে কুঠারঘাত করে তাহলে সে তার শাখা-প্রশাখার শিকড়ের ওপর দাঁড়িয়ে থাকবে। এটাই পুত্রদের সম্পর্কে গান্ধারীর বড় গর্ব। এই গর্বের মধ্যে সে বেঁচে আছে। কিন্তু গর্বটুকু দস্যুর মত ছিনিয়ে নিল দ্রৌপদী। কোন মানুষই বোধ হয় তার একান্ত গর্বকে সম্পূর্ণ করে পায় না। যতটুকু পাওয়া যায়, ততটুকু নিয়েই সন্তুষ্ট থাকা ভাল। যে পাওয়াটা নিজের হাতে নয়, সেটা চেয়ে পেতে গেলেই শুধু অশান্তি বাড়ে। কোন মানুষের কোন পাওয়া পুরোপুরি হয় না। হলে বোধ হয়, মানুষের জীবনে কোন সমস্যাই থাকত না। অশান্তির বীজ রোপিত হত না বুকের গভীরতম প্রদেশে।

ছিঃ ছিঃ করে উঠল গান্ধারীর মন। কুন্তীর কাছে পুত্র গর্বে সে হেরে গেল। এই লজ্জাটুকু তার রাখার জায়গা নেই। হেরে গেল একটা জানোয়ারের কাছে। প্রাগৈতিহাসিক নারী পুরুষের বোধ, বিকৃত কামনা, ঘুমন্ত বিবেকহীন মনুষ্যত্ব অবহেলায় হারিয়ে দিল তার বহু ঘষা-মাজা সুরুচিসম্পন্ন পুত্রের গর্বভরা মাতৃহৃদয়কে। কুন্তীর কাছে এই পরাজয়টা তাকে কষ্ট দিল। তার মনের সব তৃপ্তিটুকু বাজপাখির মত ছোঁ দিয়ে নিয়ে গেল কুন্তী। এই বোধটাই পাথরের মত ভারী হয়ে চেপে বসে রইল তার মনের ওপর।

রাগ এবং অভিমান হল সুযোধনের ওপর। হঠাৎ বিধুর হয়ে গেল চোখের দৃষ্টি। ভিজে গেল চোখের পাতা। কষ্টে চোখ বুজল। দু ফোঁটা জল গাল গড়িয়ে পড়ল তার বুকের ওপর।

গান্ধারী ভাবছিল, কার যে কার কাছে কখন হেরে যেতে হয় অসহায়ভাবে তা মানুষ আগে থেকে জানে না। জানলে বোধ হয় তাকে হারতে হত না। ব্যভিচারিণী, স্বৈরিণী কুন্তীর কাছে হেরে গেল পতিব্রতা ধর্মপরায়ণা গান্ধারী! হেরে গেল তার মাতৃত্বের গর্বের কাছে? সত্যিই কি দ্রৌপদীর প্রতি প্রতিহিংসাই তাকে হারিয়ে দিল? হেরে যাওয়ার এই গ্লানিবোধে তার বুকের ভেতরটা পুড়তে লাগল। হঠাৎ গান্ধারী অন্যভাবে ভাবতে লাগল. একজন মানুষের গর্বকে তার আত্মশ্লাঘাকে ভেঙে হয়তো ফেলা যায়, তার মনটাকে হয়ত ব্যর্থতায়, বেদনায় বিষিয়ে তোলা যায়, কিন্তু কখনো তাকে হারিয়ে দেওয়া যায় না, যদি না সে নিজে থেকে নিজের কাছে হারে। নিজের কাছে হেরে যাওয়া লজ্জাকর। অন্তত সেই লজ্জাজনক অবস্থায় তো তাকে পড়তে হয়নি। গান্ধারী জ্বালা ধরা চোখে খোলা জানলার দিকে চেয়ে রইল।

বাইরে ঘন কালো অন্ধকার। কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। তবে আকাশ নির্মেঘ হওয়ায় কোটি কোটি নক্ষত্র আকাশে দেখা গেল। গান্ধারীর মনে হল দেবতার লক্ষ লক্ষ চোখ হয়ে যেন তার দিকে কৌতূহলী জিজ্ঞাসা নিয়ে তাকিয়ে আছে। তাদের কৌতূহলী দৃষ্টির সম্মুখে দাঁড়িয়ে তার একটা কথা কেবলই মনে হতে লাগল, দ্রৌপদীকে কোন অসম্মান করেনি সুযোধন। তাকে সত্যি যদি কেউ অসম্মান করে থাকে সে করেছে কুন্তী। নিজে নারী হয়ে তাকে এ নিষিদ্ধ অসামাজিক দাম্পত্য প্রেমের মধ্যে টেনে এনেছে, তার শরীরটাকেই করেছে পাণ্ডবদের নিরাপত্তার রক্ষাকবচ। স্বৈরিণী কুন্তীর নির্লজ্জ মনোভাবেই তাকে এই নির্লজ্জতা দিয়েছে। দ্রৌপদীর নিজের যে একটা জীবন বলে কিছু আছে, ভাল লাগা আছে, ইচ্ছে আছে, নিজের খেয়াল খুশি নিয়ে একজনকে দিয়ে থুয়ে ভরপুর সুধন্য হয়ে ওঠা তার কিছুই দ্রৌপদীর জীবনে নেই। এ হল তার জীবনে একরকম শারীরিক দাসত্ব, মানসিক দাসত্ব। সেই হল তার ভালবাসার, তার নারীত্বের বড় অপমান। পঞ্চস্বামী থাকার জন্যে

দ্রৌপদী সস্তা হয়ে গেছে। সমাজে তার মূল্য কমে গেছে। তার প্রতি পুরুষের শ্রদ্ধাও কিছু নষ্ট হয়ে গেছে। শ্রদ্ধা আর সম্মান দিয়েও মানুষের সমস্ত সম্পর্কের ভিত গড়ে ওঠে। দ্রৌপদীর ক্ষেত্রে এই ভিত নড়ে গেছে। দ্যূত পণে সেই সম্পর্কটাই হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল শুধু। সুযোধন শুধু নিমিত্ত। এসব ভাবনায় গান্ধারীর মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গেল! তার চোখেও নেমে এল এক গভীর বিষণ্ণতা।

নিশ্ছিদ্র অন্ধকার তাকে দু'দণ্ডের শান্তি দেবে ভেবেছিল। কিন্তু একা থাকলেই বোধ হয় মানুষ নিজের সঙ্গে বেশি কথা বলে। মুখ চুপ করলেও মস্তিষ্ক চুপ করে থাকে না। অজান্তে অনেক কথাই মনে হল। বুকের গভীরে জমানো সব কান্না, যন্ত্রণা যেন চুপিসারে পা টিপে টিপে মনের বনে হেঁটে বেড়ায়। তখন নানা ঘটনা, স্মৃতি, বিশ্লেষণ শিহরন তুলে চমকে বেড়ায় মস্তিষ্কের বন্ধ কুঠুরিতে। কিন্তু কোন চিন্তাই বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না। শরতের মেঘের মত মন জুড়ে বিচরণ করে।

অন্ধকারে একটা পাখি একাই ডাকছিল। বোধ হয় ঘরের কাছে তার সঙ্গী পাখীকে ডাকছিল। হয়ত ডেকে ডেকে তাকে কিছু বলছিল। গান্ধারীর মনে হল ঐ পাখীটার মত সেও বড় একা। একটা অসহায় কান্না তার বুক ঠেলে যেন উঠে আসছে। ধীরে ধীরে একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল। আর তার ভেতরটা কেঁপে গেল।

গান্ধারী চোখ বুজল। চোখের ওপর নানারকম দৃশ্য ভেসে ওঠল। তার সবটার কোন অর্থ হয় না। তবু তার ভেতর ডুবে যেতে ভাল লাগল। আর এক অসহনীয় যন্ত্রণা সহ্য করতে দাঁত টিপে ধরল। বিশ্বাস, গর্ব ভেঙে গেলে মানুষের এত কষ্ট হয়, গান্ধারী জানত না। এই প্রথম জানল।

চোখ বুজলে গান্ধারী শকুনির মুখ দেখতে পায়। তার গলার স্বর শুনতে পায় স্পষ্ট। শকুনি যেন তার খুব কাছে দাঁড়িয়ে বলছে এত অল্পে ভেঙে পড়লে হবে কেন? এখন তো সবে শুরু। নিজেকে শুধু ভেঙে ভেঙে নতুন করে গড়তে হবে। অনেকদিনের ধারণা, বিশ্বাস, মূল্যবোধ বদলে যাওয়ার জন্যে একটু দুঃখ, কষ্ট, আত্মগ্লানি'ত হবে। সোনা না পুড়ে কবে খাঁটি হয়? তোমাকেও অনেক কিছুর ভেতর দিয়ে গিয়ে তাবে প্রকৃত সত্যকে জানতে হবে।

গান্ধারী কথা বলেনি। আড়চোখে শকুনির দিকে তাকিয়েছিল। আর তার মুখের পেশীতে কেমন একটা টান ধরল। শক্ত হল। ভুরু কুঁচকে গেল। শকুনি তার বিরক্তি প্রকাশ করার আগেই বলল হাজার হোক, সুযোধন তোমার পুত্র। সার্থক পুত্র বলেই শত্রুরা তাকে হেয় করার চেষ্টা করে। তার সম্বন্ধে অনেক আজেবাজে কথা বলে তোমার কান ভারী করে তুলেছে। মনকে হয়ত বিদ্রুপ করেছে। বিষিয়ে তুলেছে মাতা-পুত্রের সম্পর্ক। কিন্তু আমি দায়িত্ব নিয়ে বলছি, সুযোধন কোন অপরাধ করেনি। ন্যায়ত ধর্মত কোন দোষ করলে বিদুর চুপ করে থাকত না। পিতামহ ভীষ্মও দ্রৌপদীর ধর্ম ও ন্যায়ের প্রশ্নের কোন উত্তর দিতে পারেনি। কেন পারেনি, সে কথা একবারও না ভেবে সুযোধনকে অপরাধী করবে কেন?

এই 'কেন' জিজ্ঞাসাই গান্ধারীকে অস্থির, অশান্ত করে তুলল। কথাগুলো ঘোর লাগা আচ্ছন্নতার মধ্যে চিকুর হানা মেঘের মত দপ্‌দপ্ করতে লাগল। নিজের ধারণা ও বিশ্বাসের সঙ্গে শকুনির প্রশ্নের নিরন্তর সংঘাতের কষ্টে হৃদয় মথিত হতে লাগল।

জানলা দিয়ে প্রাসাদ চত্বরে ছোট্ট উদ্যানের দিকে চেয়ে রইল। জ্যোৎস্নার নরম শুভ্র আলোয় স্বপ্নময় হয়ে আছে জায়গাটা। রজনীগন্ধা ফুটেছে অনেক। কিছু কুঁড়ি ফোটার প্রতীক্ষায় চেয়ে আছে। নিঃশব্দ এক প্রাণের খেলা চলেছে এই একটুকরো উদ্যানের চৌহদ্দিতে।

চটি পায়ে সুযোধনের সঙ্গে শকুনিও আস্তে আস্তে ঢুকল। গান্ধারী মাথা হেঁট করে ওদের চলন ভঙ্গির দিকে তাকিয়েছিল। পায়ের ধাপ ফেলা দু'জনের সমান মাপের হচ্ছিল না। আগে-পিছে হচ্ছিল। একটু অস্বাভাবিকও ছিল। তাদের প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে গান্ধারীর বুকে মৃদু তরঙ্গ বয়ে গেল। কিন্তু কোন প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পেল না তার। কেবল রুদ্ধ নিঃশ্বাসে তাদের আকুল আহ্বানের প্রতীক্ষা করতে লাগল।

সুযোধন প্রতিদিনই শয়নের আগে জননীকে একবার দর্শন করে যায়। আজ তার মুখোমুখি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কেমন সংকুচিত হয়ে পড়ল। বুকের উচ্ছলতা যেন হঠাৎ স্তিমিত হয়ে গেল। আগ্রহের

দীপ জ্বলে চোখের তারায়। আজ হঠাৎ কি যেন হয়ে গেল তার। গান্ধারীর কাছে কিছুতে সহজ হতে পারছিল না। তীব্র অপরাধের একটা ভার তার হৃৎপিণ্ডের সঙ্গে ঝুলে রইল যেন। কিছুতেই ভয় আর দুর্বলতাকে কাটিয়ে উঠতে পারল না। নিজেকে তার বড় অলম্বনহীন মনে হল। তাই শকুনিকে ডেকেছিল। কিন্তু এখন মনে হল কাজটা ভাল করেনি। শকুনি তার অপরাধের সাক্ষী। তাকে সাক্ষী করে পরোক্ষভাবে সে তার দোষ কবুল করল। এই সব ভাবতে ভাবতেই সুযোধন স্বপ্নাচ্ছন্নের মত গান্ধারীর দিকে এগোল। খুব কাছে এসে দাঁড়াল। ভীরু চোখে তার দিকে অপলক চেয়ে রইল বেশ কিছুক্ষণ। তারপর গাঢ় স্বরে অস্ফুট কণ্ঠে ডাকল, মা। আজ আমি জয়ী। কিন্তু তোমাকে তো খুশি হতে দেখলাম না।

গান্ধারী চমকাল। বিস্ময়ে তাকাল। একটা দুরন্ত আবেগ তাকে ভেতরে দুর্বল করে দিচ্ছিল। তবু কোন শৈথিল্য দেখাল না। ভুরু কুঁচকে বলল, এই জয় নিয়ে তোমার গর্ব করতে লজ্জা করল না?

জয়ের কোন জাত নেই মা। যে কোন ধরনের সাফল্যই জয়। জয়ের ভেতর একটা সুখ অবশ্যই থাকে।

আনন্দ পেয়েছ?

আনন্দ করার মত কোন ঘটনাই হয়নি।

আনন্দ ছাড়া জয়ের কোন গৌরব নেই। তুমি যাকে জয় বলছ, আমি তাকে বলি তোমার পরাজয়। একটা ঘটনাই তোমার সব গৌরব ঢেকে দিল। মুখে চুনকালি মাখাল। কোনদিন তোমার সে কলংক মুছবে না।

সুযোধন হাসি হাসি মুখ করে বলল, চাঁদেরও কলংক থাকে। সে কলংক চাঁদের লজ্জা নয়, তার ভূষণ। দ্রৌপদীর লাঞ্ছনার ঘটনা আমার সমাদরকে বাড়িয়ে তুলবে। প্রকৃত সত্যকে প্রকাশ করবে।

ছিঃ, মেয়েমানুষের গায়ে হাতে দিয়ে পৌরুষের বড়াই করতে তোমার লজ্জা করল না। গোটা নারী জাতিকে তুমি অপমান করেছ। কুলবধূর অসম্মান করে নিজের বংশমর্যাদা লোকের চোখে হেয় করে দিয়েছ নিজেকেও ছোট করেছ।

মা তোমার বিচারে ভুল হচ্ছে। বিশ্বাস কর, নারীজাতিকে আমি শ্রদ্ধা করি, সম্মান করি।

শ্রদ্ধা করলে দ্রৌপদীকে ওরকম হেনস্তা করতে না।

সব কথা শুনলে তুমিও অবাক হবে। নিজের দুষ্কর্মের কোন সাফাই গাওয়া আমার ইচ্ছে নেই। কোনোদিন তা করিনি। আমি যা করেছি তার সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিয়ে তোমাকে কিছু বলতে চাই। মাতা পুত্রের মধ্যে কোন ব্যবধান গড়ে ওঠুক এ আমি চাই না। আমার সাম্রাজ্য, সিংহাসন হারানোর চেয়েও বেশি বেদনাদায়ক তোমার স্নেহ বঞ্চিত হওয়া। তুমি শুধু ধৈর্য ধরে আমার কথাগুলো শোন। আমার কথা যদি তোমার মনঃপূত না হয়, তাহলে তোমার দেওয়া শাস্তি মাথায় পেতে নেব।

সুযোধনের কথাগুলোর ভেতর এমন একটা মন গলানো ব্যাপার ছিল যে গান্ধারী অভিভূত হল। তার দু'চোখের চাহনি নিবিড় হল। ছলছল চোখে সুযোধনের দিকে চেয়ে রইল। তাকাতে গিয়ে বুকের ভেতর অব্যক্ত বিস্ফোরণ ঘটে গেল। নিজের অজান্তেই তার একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস পড়ল।

সুযোধন কয়েকটা মুহূর্ত চুপ করে জননীর প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করল। প্রবল আত্মাভিমানে তার বুকের ভেতরটা টাটাচ্ছিল। একটা গভীর দুঃখে কষ্টে এবং আত্মগ্লানিতে তারও চোখ ছলছল হয়ে উঠল। তারপর একটা ঘোর লাগা আচ্ছন্নতার মধ্যে ধীরে ধীরে বলল, দ্রৌপদীকে কেউ যদি অসম্মান করে থাকে সে করেছে পাণ্ডব-প্রধান যুধিষ্ঠির। আমরা না চাইলেও যুধিষ্ঠির চেয়েছিল পণ রেখে দ্যুতক্রীড়া করতে। মাতুল শকুনি তাকে নিষেধ করল। কিন্তু যুধিষ্ঠির কথা শুনল না। তার জেদাজেদিতেই অবশেষে পণ রেখে খেলা সাব্যস্ত হল। একজন দক্ষ পাশা খেলোয়াড়ের গর্ব ও আত্মবিশ্বাস নিয়ে যুধিষ্ঠির বাজি ধরল। স্থির হল, যে পক্ষ হারবে রাজ্য, ঐশ্বর্য, সম্পদ, সিংহাসনের অধিকার বিজয়ীর হাতে সমর্পণ করতে হবে। কারণ, যুধিষ্ঠির জানত, তার সমকক্ষ খেলোয়াড় কৌরবদের ভেতর নেই। তাই এমন অদ্ভুত বাজি ধরতে তার বুক কাঁপল না। কিন্তু আমি জানি

মাতুল শকুনি কেবল তার সঙ্গে খেলার সাহস রাখে। কিন্তু এতবড় একটা দায়িত্ব নিয়ে দ্যুতক্রীড়া করতে রাজি হল না। যুধিষ্ঠিরের মনোভাব খুবই স্পষ্ট। অক্ষক্রীড়ায় হারিয়ে দিয়ে সে আমার হস্তিনাপুরে কেড়ে নিতে চাইছে। আমাদের পথের ভিখারী করার সংকল্প তার। মাতুল এরকম পণ রেখে পাশা খেলতে রাজি হল না। কিন্তু যুধিষ্ঠিরে এক কথা, পণ ছাড়া পাশ খেলা জমে না। উত্তেজনা থাকে না। রাজা-রাজাড়ার খেলা বলে কথা! অমনি আত্মগর্বী দুর্যোধনের রক্ত টগবগ করে উঠল। মনে হল, অদৃষ্টে যদি রাজ্য হারানো থাকে তাহলে কার সাধ্য তা খণ্ডায়? অতএব, যুধিষ্ঠিরের প্রস্তাবে রাজি না হওয়ার অর্থ পরাভবকে মেনে নেয়া। কিন্তু ক্ষত্রিয় তো রণে ভীত নয়। তা-হলে বাধা কোথায়? রণে নিরাশ করা কখনও ক্ষত্রিয়র ধর্ম নয়। ক্ষত্রিয় হয়ে যুধিষ্ঠিরকে দ্যুতক্রীড়ায় নিরাশ করলে আমার অপযশ রটবে। উপস্থিত অতিথিবর্গের সামনে আমি ছোট হয়ে যাব। মাতুলকে অনেক বলে কয়ে খেলতে রাজি করালাম। আমার প্রতিনিধি হয়ে খেলল।

গান্ধারীর দুই চোখে আগ্রহের দীপ জ্বলে উঠল। অবাক মুগ্ধতা নিয়ে সুযোধনকে দেখতে লগাল। অন্ধকার থেকে আলোয় ফেরার এক কষ্টকর অভিজ্ঞতা হল। সুযোধনের প্রতি তার ক্ষোভের ভাবটা একটু কমল। আচমকা একটা অনুভূতির হল। বলল, আমার কাছে বোস্।

সেই মুহূর্তে সুযোধনের বুকে এক অবোধ আনন্দের তরঙ্গ বয়ে গেল ভুরু কুঁচকে গেল বিস্ময়ে! কয়েক মুহূর্ত অবাক হয়ে গান্ধারীব দিকে চেয়ে রইল। তারপর কাঁপা বুক নিয়ে গান্ধারীর খুব কাছে এসে বসল। শান্ত স্বরে বলল, কোন অধর্ম করিনি। তাই ধর্মের জয় হল। পাণ্ডবেরা সর্বস্বান্ত হল। রাজ্য-সম্পদ-ঐশ্বর্য সব যুধিষ্ঠিরের লোভের জন্য হারাল। যুধিষ্ঠির এরকম পরাভবের কথা স্বপ্নেও চিন্তা করেনি। কারণ, অক্ষক্রীড়ায় তার প্রবল আত্মবিশ্বাস এবং গর্ব ছিল। সে জানত, কৌরব ভ্রাতাদের কেউ তার সমকক্ষ নয়, প্রতিদ্বন্দ্বীও নয়। তবু একে একে হারাতে হল রাজ্য, সম্পদ, সিংহাসন। মাতুলের দক্ষতা এবং সাফল্যে সভাশুদ্ধ লোক বিস্ময়ে অভিভূত। মাতুলের জয় এবং সাফল্যে যত উল্লসিত হয়েছি ততই একশ্রেণীর পাণ্ডব চাটুকার শকুনির 'জাদু জাদু' বলে চিৎকার করল। কিন্তু কোন পাণ্ডব মাতুলের দক্ষতা এবং সাফল্য কপট ক্রীড়ার অপবাদ দিতে পারল না। যাই হোক, যুধিষ্ঠির যত হারল ততই জয়ের নেশায় মরিয়া হয়ে ওঠল। হস্তিনাপুরের সিংহাসনের সঙ্গে পঞ্চভ্রাতার দাসত্বকে পণ রাখল। পাশার ছকে পাণ্ডবেরা হারল। তবু লোভের কাছে হার মানল না যুধিষ্ঠির। তখন সে ভ্রাতাদের সঙ্গে স্বপ্ন দেখছে মিলিলেও মিলিতে পারে হস্তিনাপুরের সিংহাসন। আশা কুহকিনী, সর্বস্বান্ত যুধিষ্ঠিরের আর অবশিষ্ট তার পরিণীতা স্ত্রী পাঞ্চালী। পাণ্ডবের বিজয়লক্ষ্মীকে পণ রেখে যুধিষ্ঠির তার ভাগ্য জয়ের স্বপ্ন দেখল আবার।

গান্ধারী বিছানার জাজিমে হাতটা ঘষতে ঘষতে বিব্রত ভাবে বলল, ছিঃ ছিঃ যুধিষ্ঠিরের মত আদর্শবাদী ধার্মিকের পার্থিব সম্পদের, সিংহাসনের প্রতি এত পিপাসা?

শকুনি মৃদু হেসে বলল, দ্যুতাসক্ত ব্যক্তির ধর্মই হল সর্বস্ব না খুইয়ে শান্ত হয় না। এ এক ভয়ংকর নেশা। মরীচিকার মত জয়ের আশায় ছুটে চলে।

গান্ধারীর একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল। মুখখানায় বিমর্ষতার ছায়াপাত ঘটল। বিরক্তিতে ভুরু কুঁচকে গেল। বলল, আশ্চর্য। গৃহবধূকে পাশা খেলায় বাজি ধরতে যুধিষ্ঠির একটু অসম্মান বোধ করল না?

সুযোধন স্নিগ্ধ ও স্মিত মুখে গান্ধারীর মুখের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে বলল, কুলবধূর অসম্মানে শঙ্কিত হয়েছিল সবাই। পিতা, পিতামহ, পিতৃব্য সকলেই তাকে নিবৃত্ত করল। নিন্দে করল। বিকর্ণ জেহাদ ঘোষণা করল, এভাবে গৃহবধূর সম্মান নষ্টের কোন অধিকার তোমার নেই। দ্যুতক্রীড়ার মধ্যে তাকে টেনে এনে উত্তেজনার আগুন ছড়িয়ো না। বিশ্বাস কর আমিও চাইনি পাঞ্চালীর অপমান। তবু, পাঞ্চালীর নিয়তি পাঞ্চালীকে টেনে আনল শত সহস্র কৌতূহলী দৃষ্টির সম্মুখে।

গান্ধারীর ভেতর একটা তীব্র ক্ষোভ আর যন্ত্রণা বাধ কেটে যাচ্ছিল। চোখে-মুখে সত্যিকারে উদ্বিগ্ন অসহায়তা ফুটে উঠল। নিরুপায় হয়ে বলল, এর কোন মানে হয়? অতিবড় পাষণ্ডও বোধ হয় নিজের স্ত্রীর দাম বোঝে!

শকুনি মৃদু হেসে বলল, যুধিষ্ঠিরও নিজের স্ত্রীর দাম দিয়েছে। বলতে পার দামটা ঘষে-মেজে পরখ করে দেখে নিয়েছে। জানতো ভাগিনী, আমি সব ব্যাপারটাই একটু জটিল করে দেখতে ভালবাসি।

তোমাদের কারো ভাবনার সঙ্গে আমার বিচারের অঙ্ক মিলবে না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যুধিষ্ঠির পূর্বে অন্য ভাইদের সম্মতি নিয়েছিল। নিজের সিদ্ধান্তে সে কখনও পঞ্চভ্রাতার পত্নী দ্রৌপদীকে রাজসভায় আনেনি। এর পেছনেও তাদের অনেক চিন্তা ও পরিকল্পনা ছিল। রাজসূয় যজ্ঞের পর পাণ্ডবদের পক্ষে কে থাকল এবং গেল, নৃপতিবর্গের কার কী অভিব্যক্তি দ্যুতক্রীড়ার জয়-পরাজয়ের হর্ষ ও বিষাদ থেকে তার পাঠ গ্রহণ করা ছিল উদ্দেশ্য।

গান্ধারী গভীর এক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে মৃদু ভৎর্সনা করে বলল একটা কাল্পনিক কিছু বিশ্বাস করে পাণ্ডবদের চরিত্রে কালিমালেপন করার একটা সুখ হয়ত আছে, কিন্তু তাতে দ্রৌপদীর লাঞ্ছনার অপরাধ চাপা পড়বে না। ওসব গবেষণা না করে আত্মবিশ্লেষণ কর।

শকুনি গান্ধারীর কথায় রাগল না। বরং একটু হাসল। বলল, আমাদের কার্যকলাপ, প্রতিক্রিয়া কার্যকারণসূত্রে বাঁধা। আত্মবিশ্লেষণের সঙ্গে যুক্ত। জানতো, ঘৃণা-বিতৃষ্ণার সঙ্গে শ্রদ্ধার সম্পর্কটা না বুঝলে দ্রৌপদীর লাঞ্ছনা ধাঁধাটা কাটবে না।

এ কথাটা একটু বিঁধল গান্ধারীকে। বেশ একটু অবাক হয়ে শকুনির দিকে চেয়ে রইল। তারপর বলল, ছিঃ, একটা মেয়েমানুষকে অপমান করার দোষ ঢাকতে তোমরা কত কথা চিন্তা করছ। ধিক তোমাদের নির্লজ্জ পৌরুষের। সুযোধন বেশ একটু উদ্বেগের সঙ্গে বলল, মা, তুমি রাগ করলে আমরা যে ন্যায্য বিচার পাই না। কোন অপরাধ না করে তোমার কাছে অপরাধী হয়ে থাকব কেন? আমাদের কৈফিয়েৎ তোমার ওপর চাপিয়ে দেব না, তোমার বিচারবোধ দিয়ে আমাদের বিচার কর। মা-ছেলের সম্পর্কটা ঠিক থাকুক।

গান্ধারী কথা বলতে পারল না। শুধু মাথা নাড়ল।

শকুনি নিশ্চিন্ত হয়ে একটা শ্বাস ফেলে বলল, যুধিষ্ঠির পাপ করেছে বলেই অনুশোচনা ভোগ করছে। যুধিষ্ঠির পাঞ্চালীকে দিয়ে এক ঢিলে দুই পাখি মারতে চেয়েছিল। কুলবধূর সম্মানে, কৌরবরা যদি খেলায় অংশগ্রহণ না করে তাহলে অসমাপ্ত খেলার জয়-পরাজয় অমীমাংসিত থাকবে। এবং পরাজয় থেকে একটা বিরাট জয় আদায় করে নেবে। খেলা অসমাপ্ত থাকলে কৌরবদের ফিরিয়ে দিতে হবে হারানো সব সম্পদ। সুতরাং ভরাডুবি থেকে বাঁচতে যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীকে টোপ হিসাবে ব্যবহার করল। যুধিষ্ঠিরের কূট চাল ধরে ফেলল কর্ণ। পাশায় দান ফেলল যুধিষ্ঠির। পরের দানেই সে হারল। পাণ্ডব-মহিষী পাঞ্চালী হল দুর্যোধনের দাসী। পণে জিতলে মানুষ একটু আত্মহারা হয়ে পড়ে। উন্মাদনায় তার আচরণ প্রকৃতিস্থ থাকে না। তাছাড়া বিজেতা বিজিত'র সম্পর্ক শ্রদ্ধা, ভালবাসার নয়—ঘৃণার, বিতৃষ্ণার, শত্রুতার। শত্রুকে নিপড়ীন করা, লাঞ্ছিত করাই বিজয়ীর ধর্ম। দ্রৌপদী তখন আর নারী নয়, শত্রুপক্ষের এক আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব। তার সঙ্গে শত্রুর মত আচরণ করা হয়েছে। অমন যে আদর্শবান, বীর্যবান, বীরপুরুষ রামচন্দ্র তিনিও স্বামী-শোকাতুরা অসহায়া তাড়কাকে লাঞ্ছিত করতে, হত্যা করতে কুণ্ঠিত হননি। নারী বলে চিত্তের ঔদার্য দেখাননি কিংবা ক্ষমাও করেননি তাকে। শত্রু, নারী হলে বধার্হ। শত্রুর সঙ্গে শত্রুর মত আচরণ করাই রাজধর্ম। একই কারণে লক্ষ্মণ শূর্পনখার নাক কেটে কোন অন্যায় করেনি। সেজন্য কোন অনুতাপ, অনুশোচনাও ছিল না। রামচন্দ্র থেকে আরম্ভ করে মুনি ঋষি সকলে বাহবা দিয়েছে। রামচন্দ্রের তাড়কাকে বধ করা, লক্ষ্মণের শূর্পনখাকে লাঞ্ছনা করা যদি অপরাধ না হয় তা হলে দুঃশাসনের দ্রৌপদী নিগ্রহ দোষের হবে কনে? সভাস্থ কোন ব্যক্তি কিন্তু দুঃশাসনের নীতিহীন কর্মের প্রতিবাদ করেনি। ধর্মজ্ঞ পিতামহ ভীষ্ম, ধর্মপ্রাণ পিতৃব্য বিদুরও দুঃশাসনের কাজকে অধর্ম বলতে পারেনি। দুঃশাসনের চোখে দ্রৌপদী কোন নারী নয়, কুলবধূও নয়— শত্রু। শত্রুর সঙ্গে শত্রুর মত আচরণ করা কি অন্যায়? শত্রুবর জরাসন্ধকে ভীম যুদ্ধনীতি লংঘন করে নির্দয়ভাবে নিপীড়ন করে নৃশংসভাবে হত্যা করেছে। শত্রুকে প্রতারিত করার জন্যে এই যুধিষ্ঠির এক অনার্য রমণীসহ তার পঞ্চপুত্রকে জতুগৃহে জীবন্ত দগ্ধ করেছে। এই খল আচরণতো তাদের কাছে শেখা।

শকুনির অকাট্য যুক্তি ও বাক্য গান্ধারীকে বার বার অবাক করে দিল। রাম-লক্ষ্মণের দৃষ্টান্ত তার যুক্তিশীল মনকে নাড়া দিল। ক্ষুব্ধ মনের ভিতর ভিতরে যে একটা ভূমিকম্প হচ্ছিল, সেটা

সে বুঝতে পারল। তার মুখে-চোখে একটা বিহ্বল ভাব নামল। শকুনি সুযোধনের সামনেই তার কেমন একটা রূপান্তর ঘটে গেল কয়েক মুহূর্তে। •

সুযোধন স্খলিত ভেজা গলায় ডাকল, মা। হঠাৎ 'মা' ডাক শুনে গান্ধারী একটু চমকে উঠল। মুখটায় একটু ভ্যাবাচ্যাকা ভাব দেখা দিল। বেশ একটা লম্বা শ্বাস নিয়ে খুব শান্ত গলায় সুযোধন প্রশ্ন করল, এর পরেও তুমি আমাদের ওপর রাগ করে থাকবে?

গান্ধারীর বুকে হৃদস্পন্দনের শব্দ সহসা বেড়ে গেল। দ্রুত হল। তীক্ষ্ণ চোখে একবার সুযোধন আর একবার শকুনির দিকে চেয়ে দেখল। কিছু বুঝবার চেষ্টা করল। তারপর গম্ভীর গলায় বলল, জীবনের সব কিছুকে বোধ হয় নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। যা ঘটবার তা ঘটে যায়। মনে হচ্ছে, আমারও যেন কিছু করার নেই। তোমরা বড় হয়েছ। নিজেরা সব বোঝ। এমন কিছু করা উচিত নয় যা অন্যকেও অস্বস্তিতে ফেলতে পারে। বাইরের জগতে সকলে তোমাদের কাজটা বাঁকা চোখে দেখবে। দ্রৌপদীর লাঞ্ছনা, অপমানের গল্প যতদিন পৃথিবীতে বেঁচে থাকবে, ততদিন তোমাদের চরিত্রের কলংক মুছবে না। রামচন্দ্র, লক্ষ্মণের চরিত্রের কলংক মোছেনি বলেই মানুষ অপকর্মের সমর্থনে দৃষ্টান্ত হিসাবে তাদের নাম করে নিজের অপরক্ক এড়ায় একজন মহাপুরুষ একটা অন্যায় করেছে বলে সেটা কোন আদর্শ দৃষ্টান্ত নয়। কলংক, কলংকই। তোমরা চিরদিনই কলংকের অংশভাগী হয়ে থাকলে, এই বেদনাটা আমার মরে গেলেও যাবে না। এই দারুণ অস্থিরতায় মাথা নাড়াতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে কষ্টে উচ্চারণ করল, আমার ছেলে বলে তোমাদের নিয়ে যে গর্ব ছিল, তার পাহাড়চূড়া হঠাৎ সশব্দে যেন ভেঙে পড়ল। বড় ফাঁকা লাগছে বুকটা।

শ্বাস ছাড়তে গিয়ে গান্ধারী শুধু নয়, সুযোধনও টের পেল, শ্বাসের বাতাসটা কেঁপে গেল। সুযোধনেরে বুকের ভেতর তোলপাড় করে উঠল। কিসের একটা তরঙ্গ বয়ে গেল। কিছু বলার মত খুঁজে পেল না।

সে রাতে আর ঘুম এল না গান্ধারীর। চোখের পাতা খুলে বাইরের দিকে চেয়ে রইল।

ঘরে দীপ ছিল না। ঘরময় চাঁদের আলো ভরে ছিল।

থমথমে আবছা অন্ধকার নিস্তব্ধতাকে গভীর করে তুলল। অস্বস্তিতে ছটফট করতে লাগল গান্ধারী। আর এপাশ-ওপাশ করতে লাগল। অদ্ভুত অদ্ভুত সব ভাবনা-চিন্তায় তার মন আচ্ছন্ন হল। দ্রৌপদী নয়, পাণ্ডব-প্রধান যুধিষ্ঠিরের রহস্যপূর্ণ আচরণ, বিদুরের পাণ্ডবপ্রীতি, পক্ষপাতিত্ব তার হৃৎপিণ্ডের সঙ্গে ঝুলে রইল। অন্ধকারের ভেতর থেকে তারা উঠে এল।

যমুনার বুক থেকে ফুরফুরে হাওয়া আসছিল। সে হাওয়ায় এলোমেলো হয়ে গেল গায়ের শাড়ি, মাথার চুল, ঘরের যাবতীয় জিনিস। হাওয়ায় দেহ-মন জুড়ে গেল। এক অব্যক্ত কথায় তার বুক ভরে উঠল। মনে হল, সে যেন একটা ব্যথার সিঁড়ি বেয়ে রহস্যের সাগরের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।।

পাশা খেলা একটা ছলনা। ছলনাটা বিদুরের তৈরি। একটা সূক্ষ্ম রাজনৈতিক চক্রান্ত সকলের চোখ এড়িয়ে গেল। অথচ কেউ টের পেল না। গান্ধারী সহসা দিব্যচক্ষু পেল। পাশা খেলাকে একটা নাটকের মহড়া মনে হল। এর দুই বিবদমান পক্ষ হল পাণ্ডব ও কৌরব। কুশীলবেরা হল যুধিষ্ঠির, সুযোধন, শকুনি, কর্ণ, বিদুর দ্রৌপদী, কুন্তী। এ এক অদ্ভুত পারিবারিক, রাজনৈতিক, সামাজিক নাটক। গোটা ব্যাপারটাই গান্ধারীর কাছে অদ্ভুত লাগল। ইন্দ্রপ্রস্থে সুযোধনকে অপমানিত, লাঞ্ছিত করে পাণ্ডবেরা প্রকৃতপক্ষে ইন্দ্রপ্রস্থের রাজসূয় যজ্ঞের বিপর্যয়ের রাজনৈতিক পালা বদলের একটা পাঠ নিতে চাইল। পাণ্ডবেরা জানত সুযোধন তার অপমানকে ভুলবে না। সে একটা কিছু করবে। সুযোধন তার অপমান, ঈর্ষা ভুলতে, পাণ্ডবের গর্ব ও অহংকার ভাঙতে শান্তিগৃহ নির্মাণ করল। ধৃতরাষ্ট্র বিদুরকে সুযোধনের ইচ্ছার কথা বলেছিল। চতুর বিদুর বুঝে নিয়েছিল পাণ্ডব-সখা শ্রীকৃষ্ণ রাজসূয় যজ্ঞের উপস্থিত রাজন্যবর্গের পৌরুষে আঘাত হেনে যে অপমান করেছিল; সুযোধন তাদের সংগঠিত করতে নবনির্মিত প্রমোদ ও বিনোদন গৃহে তাদের সকলকে আমন্ত্রণ করল পাণ্ডব বিরোধিতার এক ক্ষেত্র তৈরি করতে। কাজেই বিদুরও স্থির করে নিল, এই শান্তিগৃহে অশান্তির বীজ বপন করবে। দুর্যোধনের প্রতি উপস্থিত রাজন্যবর্গ এবং অতিথিবৃন্দের সব সহানুভূতিটুকু নিজের অনুকূলে নেবে। সেজন্য শঠতার প্রতিমূর্তি করে শকুনিকে, কর্ণকে, দুঃশাসনকে তার পাশে রাখল। তার চাতুরী অন্যে

যাতে টের না পায় সেজন্য ধর্মের নামাবলীতে সর্বাঙ্গ আচ্ছাদিত করে দুর্যোধনের বিরুদ্ধে জোর প্রচার শুরু করল বিদুর। ক্রীড়া-বিনোদন মানে অক্ষক্রীড়া। পাশা খেলার বাগাড়ম্বরপূর্ণ আখ্যান রচনা করে সুকৌশলে সুযোধনের মনে এই জেদটা গেঁথে দিল। ইন্দ্রপ্রস্থে শান্তি গৃহের শুভ উদ্বোধনের নিমন্ত্রণ করতে এসে বিদুর যুধিষ্ঠিরকে পণ রেখে পাশা খেলার জন্য প্রভাবিত করে গেল। কৌরবপক্ষের দক্ষ অক্ষ খেলোয়াড়দের নামগুলোও তাকে জানিয়ে গেল।

কিন্তু বুদ্ধিমান চতুর লোকও মাঝে মাঝে ভুল করে। বিদুর নিজের সাফল্যের বাহবা নিতে ভুলক্রমে মহিষী দেবকীকে আত্মতৃপ্তির কথা বলেছিল। দেবকী ছিল খুবই গান্ধারীর অনুগত। দেবকীর মুখ থেকে বিদুরের কার্যকলাপ শুনে গান্ধারী হতবাক হল। সভাপর্বে পাণ্ডব ও বিদুরের চক্রান্তটি এখন তার সামনে একেবারে পরিষ্কার।

অন্ধকারে গান্ধারীর দু'চোখ জ্বলছে। মাথার ভেতর দপদপ করছে। আস্তে আস্তে বিছানার ওপর উঠে বসল। রাতের শব্দ শোনে। অন্ধকারের একটা আলাদা গন্ধ আছে। গন্ধ নিল নাকে। নাভি থেকে টেনে।

অন্ধকারে গাছগুলো নীরব প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে আছে। মাঝরাতে ঝির ঝিরে হাওয়ায় তার একটা গন্ধ ভেসে আসছে। গন্ধের চেয়েও বেশি আকৃষ্ট করছে ঝিঁঝির শব্দ। তাদের একটানা ডাকে রাত জেগে উঠেছে। চাঁদের আলোর সঙ্গে বনের শব্দ, বাতাসের গন্ধ, ঝিঁঝির ডাক মিলে এক স্বপ্নরাজ্য তৈরি হয়েছে। অনাবৃত করে গান্ধারী তাকে দেখছে।

ভাবনায় পেল গান্ধারীকে। অন্ধকারে একা থাকলেই ভাবনা আসে। ভাবনাটা তখন চেপে বসে। আগে যা কখনও হয়নি. আজ তাই হল। ভাবতে গিয়ে মনের ভেতর ঝড় উঠল। ঝড় উঠলে সে ভীষণ অসহায় বোধ করে। আর তখন মনের ভেতর শকুনির স্পষ্ট কথাগুলো শুনতে পায়। শকুনিই প্রথম গভীরতর রহস্যে ঘেরা জীবনের দিকে তার দৃষ্টি ফিরিয়ে দিল। এই নিঃশব্দ অন্ধকারের মধ্যে গান্ধারী কল্পনায় শকুনির মুখ, চোখ, ঠোঁট দেখতে পেল। মনে হল সে তার সামনে দাঁড়িয়ে। তার কথাগুলো স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিল সে।

শকুনি বলল, সন্তানের বিরুদ্ধে মাকে দাঁড় করানোর এমন সুন্দর চক্রান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে নেই। সংসার রাজ্যের কোন ব্যাপারে তুমি থাক না, পাশা খেলার ব্যাপারটাও তুমি জান না, অথচ কুন্তী তোমার কাছে কেঁদে পড়ল। বলল, বিপন্না অসহায়া দ্রৌপদীকে কৌরব শার্দূলরা লাঞ্ছিত করছে, তাকে বিবস্ত্রা করছে, তুমি ছাড়া তাকে রক্ষা করার আর কেউ নেই। দ্রৌপদীর অপমানের গল্পের স্পর্শকাতরতায় ভুলে গেলে তুমি। কিছু না বুঝে, না জেনে সভায় হাজির হলে। দ্রৌপদী তোমাকে দেখেই জনসমক্ষে নিজেকে নিজে বিবস্ত্রা করবে বলে ঘোষণা করল। চক্ষু আবরণী, তোমার চক্ষু দুটি ঢাকা ছিল তাই তুমি প্রকৃত সত্য দেখতে পেলে না। শুধু তার কণ্ঠস্বর শুনেই বুঝলে কুন্তীর বানানো গল্প সত্যি। একটা জমাট নাটক তুমি মাটি করে দিলে। সর্বজনসমক্ষে মিছিমিছি কটুবাক্যে পুত্রদের তিরস্কার করলে। তাদের মর্যাদাবোধকে পরবর্তীকালে সমালোচনার বিষয় করে তুললে। অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করে কাজটা করনি বলেই পুত্রদের নিষ্কলুষ চরিত্র কলুষিত হল। কুন্তীর উদ্দেশ্য সফল হল। নিজের সন্তানের প্রতি মায়ের অশ্রদ্ধা, ঘৃণার চেয়ে বড় বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষ্য তো আর কিছু নেই। দুঃশাসনকে একটি মানুষ পশু বানিয়ে, সুযোধনকে রাজ্যলোভী, পরস্বোপহারী করে অগণিত মানুষের কাছে, দেশবাসীর কাছে, রাজ্যে রাজ্য অশ্রদ্ধেয় করে তোলার একটা বড় সুযোগ তুমি তাদের করে দিয়েছ। পাণ্ডবের বিদ্বেষের বীজ বপন করতে তুমি হলে তাদের রাজনৈতিক প্রচারের একটা টোপ। অথচ তুমি জানতে পারলে না, কীভাবে তাদের চক্রান্তে পা দিলে আর নিজের পুত্রদের স্বার্থের বিরুদ্ধে কাজ করলে। তোমার মত নির্বিরোধী মানুষের এই রাজনৈতিক জটিলতার মধ্যে আসা ঠিক হয়নি।

গান্ধারীর মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গেল। জানলার গরাদ ধরে দাঁড়িয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইল। জ্যোৎস্নার আলো ফিকে হয়ে এসেছে। গাছের ডালে পাখিরা ভোরের জন্যে অস্থির হয়ে পড়েছে। তাদের ডানা ঝাপ্টানোর শব্দ শুনতে পাচ্ছে। হঠাৎ বুক থেকে একটা শ্বাস পড়ল। আর তাতেই তার অভ্যন্তরটা কেঁপে গেল। শ্বাসের সঙ্গে বেরিয়ে এল কথাগুলো! ভুল করেছি। আমার ভুলে

পুত্রদের সর্বনাশ বয়ে এনেছি। আমিই তাদের মিথ্যে অপবাদের ভাগী করেছি। আমার একটা ভুল তাদের সারা জীবনের কলংক হয়ে রইল। এ অনুশোচনা আমার মরেও যাবে না। কুন্তীকে বিশ্বাস করে আমি অন্যায় করেছি। তাকে এমনিই পছন্দ করি না। শ্রদ্ধা করি না। তবু তার কথা বিশ্বাস করে এ আমি কী করলাম? মা হয়ে সন্তানের এত বড় সর্বনাশ কেউ করেনি কোনদিন? গান্ধারী নিজেকে ধিক্কার দিল।

নিরুচ্চারে গান্ধারী বলল , কুন্তী কাজটা ভাল করেনি। ভীষণ অন্যায় হয়েছে। তৎক্ষণাৎ মনে হল, কুন্তীর কাজটা কি অন্যায় নয়? পাণ্ডুর অক্ষমতা জেনে দেবর বিদুরের সঙ্গে অবৈধ প্রণয় সম্পর্ক, যুধিষ্ঠির যে বিদুরের ঔরসজাত পুত্র এসব কথা আর গোপন নেই। জারজ সন্তানের জননী হয়েও সতীত্বের মুখোশ পরে, দুষ্টুবুদ্ধি গোপন করে ন্যাকা সেজে আছে। নির্লজ্জের মত রাজ্যসুখ ভোগ বাসনায় জারজ পুত্রদের হাত ধরে ছুটে এসেছে হস্তিনাপুরে। একটা পারিবারিক কলংক চাপা দিতেই তাকে মেনে নিয়েছি শুধু। কিন্তু তার জন্য কোন কৃতজ্ঞতা নেই। তার মত ধুরন্ধর অভিসন্ধিপরায়ণ স্বার্থসন্ধানী মেয়েমানুষ পৃথিবীতে যত কম জন্মে ততই মঙ্গল। নিজের সুখের পথ, স্বার্থের পথ নিষ্কণ্টক করতে মাদ্রীকে সহমরণে পাঠাল। কুন্তীর হৃদয় মানবিকতাবোধ শূন্য। উদ্দেশ্যপরায়ণ। জতুগৃহে নিরীহ অনার্য রমণীকে পাঁচপুত্র-সহ জীবন্ত দগ্ধ করে নিজের পুত্রদের নিয়ে পালাতে তার বিবেকে বাধেনি। পুত্রদের ঐক্যের স্বার্থে সমাজনীতি না মেনে পরিবারের, মঙ্গল ও মর্যাদার দিকে না তাকিয়ে দ্রৌপদীকে লুটের মালের মত পাঁচ-পুত্রদের মধ্যে বণ্টন করে দিয়েছে। সেই দ্রৌপদীকে কৌরবদের বেইজ্জত করতে কিংবা অন্য কোন দুরভিসন্ধি নিয়ে যুধিষ্ঠির তাকে পাশা খেলায় পণ রেখেছে। শকুনির এই সন্দেহ এখন আর অহেতু, যুক্তিহীন কিংবা কাল্পনিক বিচার বলে মনে হল না গান্ধারীর।

রাত্রির অবসান হতে আর খুব বাকি ছিল না। গান্ধারী সে রাত্রি আর ঘুমোতে পারল না। এরকম একটা অভিজ্ঞতার কৌতূহল চেপে রেখে নির্লিপ্ত থাকা খুব মুশকিল হল। ভেতরটা তার আরো কিছু জানার জন্যে অধীর হল। বিছানায় শুয়ে সে কড়িকাঠের দিকে চেয়ে রইল। সেখানে এক অজ্ঞাত গুহার অন্ধকার। সেই দিকে ফেরানো চোখে তার উৎকর্ণ কৌতূহল। শকুনির কথাগুলো এই মুহূর্তে স্মরণ করতে তার ভীষণ ভাল লাগল। ঘোরা লাগা আচ্ছন্নতার মধ্যে শুনতে পাচ্ছিল শকুনির কণ্ঠস্বর

ভগিনী, সুযোধনের অচল ধর্মবুদ্ধি এবং সততাকে বিদুর নানারকম গালাগালি করে, কিছুতে ম্লান করতে পারল না। পাপিষ্ঠ, দুরাত্মা বলেও—জনমানসে, সভাস্থ ব্যক্তিবর্গের মনে দ্রোণ, ভীষ্ম, কৃপ, পাণ্ডব মাতুল শল্যর মনে সামান্যতম রেখাপাত করতে পারল না। তখন অনন্যোপায় হয়ে পুত্রদের অভিযুক্ত করার জন্যে তোমাকে দাঁড় করানো হল। তুমিই পৃথিবীর প্রথম জননী যে কিছু না বুঝেই শত্রুপক্ষের কথায় বিশ্বাস করে নিজ পুত্রকে অভিযুক্ত করল। এবং নিজেই মূল সাক্ষী হয়ে রইল। নিজের কর্মের একজন বিচারকও বটে।

একটা অব্যক্ত যন্ত্রণায় গান্ধারী নিজের বুকেব ওপর অস্থিরভাবে হাত বোলাতে লাগল। হাতের খুব কাছে রাখা জলের পাত্র থেকে জল ঢেলে খেল। ঘুমনোর চেষ্টা করল। কিন্তু কানের পর্দায় শকুনির কণ্ঠস্বর তার ঘুম কেড়ে নিল।

গান্ধারীর সমস্ত চেতনা ক্রমে আচ্ছন্ন হয়ে এল। চৈতন্যহীনতার মধ্যে শুনতে পেল, ভগিনী, তোমার যুক্তিশীল মন একবার বিচার করল না যে, অত লোকের সামনে ইচ্ছে থাকলেও কোন পাষণ্ড পারে না বলপূর্বক নারীকে বিবস্ত্র করতে? দুঃশাসনের অপরাধ ভ্রাতৃবধূর হাত ধরে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে সভায় এনেছিল। দেবর তো ভ্রাতৃবধূর হাত ধরতেই পারে। তাতে অপরাধটা কোথায়? অথচ সেই নিয়ে দ্রৌপদী চেঁচিয়ে কেঁদে এক শোরগোল বাধাল। সভাস্থ লোক পর্যন্ত হতভম্ব, হতবাক। দুঃশাসন কোন অপরাধ করল না, অথচ দ্রৌপদী এমন করতে লাগল মনে হল সে একটা ভীষণ কিছু অপরাধ করেছে। বিদুর, পঞ্চপাণ্ডব পর্যন্ত নীরব।

গান্ধারীর সমস্ত শরীর আর হৃদয় দপদপিয়ে উঠল এক অদ্ভুত স্বস্তির উল্লাসে। পরক্ষণে সখেদে তার আচ্ছন্নতার ভেতর উচ্চারণ করল, আমি জানি, আমার পুত্রেরা নিরপরাধ। তারা কোন দোষ

করতে পারে না। দুর্নামের কপাল করে এসেছে বলে মিছেমিছি বিড়ম্বনা ভোগ করেছে। আশ্চর্য ভাগ্য বটে!

নিঃশব্দে একটা লম্বা দীর্ঘশ্বাস বুক থেকে উঠে এল গান্ধারীর। বেশ একটু প্রফুল্লিত হয়ে শকুনির কথাগুলো মনে মনে রোমন্থন করতে লাগল। কোন অদৃশ্য লোক থেকে ভেসে আসা বায়বীয় কণ্ঠস্বরে শকুনি বলছিল, দ্রৌপদীর আচরণে, নারীর লজ্জা, নম্রতা, কোমলতা এবং সংকোচ বলে কিছু ছিল না। সভায় প্রবেশ করেই নিজের অসহায় অবস্থা বোঝাতে কেঁদে-কেটে এক মিথ্যে গল্প তৈরি করল দুঃশাসন এবং তাকে নিয়ে। এটা একটা তৈরি গল্প। দ্রৌপদীকে সসম্মানে সভায় আনার জন্যে সুযোধন বিদুরকে অনুরোধ করল। বিদুর প্রত্যাখান করলে একজন প্রতিহারীকে পাঠাল। কিন্তু দ্রৌপদী রাজমহিষীর মর্যাদা ও সম্মানের প্রশ্ন তুলে তাকে ফিরিয়ে দিল। অগত্য মধ্যমভ্রাতা দুঃশাসন গেল দ্রৌপদীকে আনতে। কিন্তু একজন রাজপুত্র তার শিক্ষা, রুচি শালীনতা বিসর্জন দিয়ে ভ্রাতৃবধূর সঙ্গে বর্বর আচরণ করল একথা বিশ্বাস না করার যথেষ্ট কারণ আছে। দ্রৌপদীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে দেবর সম্পর্কবোধে দুঃশাসন তার হাত ধরে বলপূর্বক টেনে এনেছিল রাজসভায়। একেই নারী-পুরুষের এক কদর্য সম্পর্কের সাথে বিকৃত করে দেখা হল। এই ঘটনার সাক্ষী কেউ ছিল না। দ্রৌপদী দুঃশাসন বিরোধী এক বিষাক্ত মনোভাব সৃষ্টি করতে এই সুযোগের সদ্বব্যবহার করল। মিথ্যে ঘটনার প্রতিবাদ করতে গিয়ে দুঃশাসনের সঙ্গে তার বিবাদের এক নাটক তৈরি হল। নিরপরাধ দুঃশাসন দ্রৌপদীর নির্লজ্জ মিথ্যে গল্পের দুর্নামে ক্রুদ্ধ হয়ে উত্তেজনাবশে তাকে অপমান করতে উদ্যত হল। ঘটনার আকস্মিকতায় উদ্ভুত ঘটনা দ্রৌপদী চতুরা রমণীর মত নিজের অনুকূলে ব্যবহার করার জন্যে দৃপ্ত তেজে উপস্থিত রাজন্যবর্গ ও কুরুবৃদ্ধদের পৌরুষকে আঘাত হানতে বক্তৃতা শুরু করে দিল। ভগিনী, সাধারণ রমণী এই অবস্থায় যে লজ্জা, সংকোচ ও জড়তা অনুভব করে, ভয়ে বিব্রত হয়, দ্রৌপদী সেই অবস্থার মধ্যে সবচেয়ে বেশি নির্ভীক তেজস্বী এবং সরমহীন। তার চোখে মুখে লজ্জা সরমের পরিবর্তে কৌতুক, আর দীপ্ত জ্বালা। শুধু সুযোধনকে অপদস্থ করা, তার সুনাম নষ্ট করা, কৌরববংশকে হেয় করা, সকল সহানুভূতি থেকে তাকে বঞ্চিত করা এবং দুঃশাসন, সুযোধন, কর্ণ, শকুনি যে শঠতার প্রতিমূর্তি এই কথাটা সকলের অন্তরে ভাল করে গেঁথে দেওয়ার জন্যে যা যা করার দরকার, দ্রৌপদী তার সফল অভিনয়ের অনন্যা অভিনেত্রী। ভগিনী, কখনও কোন নারীকে গুরুজন সমক্ষে অসংকোচে, নির্লজ্জভাবে মুক্তকণ্ঠে বলতে পারে 'আমি রজস্বলা'? সভাস্থ ব্যক্তিবর্গের অন্তরে তার কোন কথাই যখন রেখাপাত করল না, তখন সহানুভূতি আদায়ের শেষ অস্ত্রটি দ্রৌপদীর মতই নারী কেবল ব্যবহার করতে পারে! তবুও ব্যক্তিবর্গ হতবাক্। তাদের চোখে দেখা ঘটনার সাথে দ্রৌপদীর অভিযোগ, অনুযোগ, প্রলাপবাক্যের কোন সম্পর্ক ছিল না বলেই সকলে এই অদ্ভুত নাট্যের মজা ও কৌতুক নীরবে উপভোগ করছিল। পঞ্চপাণ্ডব-সহ বিদুরেরও লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে গিয়েছিল।

একটা ঘোর লাগা আচ্ছন্নতার ভেতর শকুনির কথাগুলো গান্ধারীর হৃদয় মথিত করতে লাগল। দুঃশাসনের প্রতি তার অন্তরে যে বিরূপতার মেঘ জমেছিল তা এখন আর নেই। বাইরের আকাশও নির্মল। মেঘমুক্ত। তারারাও সব মিলিয়ে গেছে, কেবল পশ্চিম আকাশে ধ্রুবতারা বিধাতার চোখ হয়ে যেন তার দিকে জ্বলজ্বলে চোখে তাকিয়ে আছে। মৃদু কৌতুকে গোটা আকাশটা যেন হাসছে। গান্ধারীর বুকের অভ্যন্তর পুত্র গর্বের প্রসন্নতার আবার স্নিগ্ধ হয়ে ওঠল। ভীষণ ভাল লাগল রাত্রির এই নির্জন আকাশ।

সুযোধনের প্রতি ক্ষোভ প্রকাশের জন্যে তার ভীষণ কষ্ট হল। অথচ শকুনি যখন কথাগুলো যুক্তি দিয়ে বোঝাল তখন কিন্তু তা হৃদয়, মন, বুদ্ধিকে এমন করে স্পর্শ করেনি। নির্জন রাতের শিশির বিন্দুর মত টপ টপ করে যেন তা মনের ভেতর গলে গলে পড়তে লাগল। আর কেমন করুণায় ভরে গেল অন্তঃকরণ।

নিজের মনে নিরুচ্চারে বলল, সুযোধন, শকুনি কেউ দোষী নয়। সব অপরাধ যুধিষ্ঠিরের একার। যুধিষ্ঠির লোভী। দ্যূতাসক্ত। কুচক্রী। মুখে ধর্মবুলি, অন্তরে রাজ্য লোভের কু-অভিসন্ধি। ধর্মের নামাবলী গায়ে চাপিয়ে দুষ্টুবুদ্ধি আর খল অভিপ্রায়কে ঢেকে রেখেছিল। যুধিষ্ঠিরের শঠতা কপটতা গান্ধারীর কাছে দিনের আলোর মত স্পষ্ট হয়ে ওঠল। কৌরবদের বদন্যতায় দ্যূতপণে পরাজিত সর্বস্ব সম্পদ,

রাজ্য এবং দাসত্ব থেকে মুক্তি পেলে তো কুরু পাণ্ডবের চরিত্র হনন কিংবা ভারতবাসীর কাছে কৌরবদের বীতশ্রদ্ধ করে তোলার কিছু থাকল না। কূট অভিপ্রায় এমন করে ব্যর্থ হয়ে গেল দেখেই যুধিষ্ঠির পুনরায় শকুনির সঙ্গে দ্যূতক্রীড়ায় বসল। এবারে শর্ত আরো বিচিত্র। যে পক্ষ হারবে তাকে রাজ্য ত্যাগ করে ত্রয়োদশ বৎসর বনবাসে যেতে হবে। শকুনি যদি সত্যিই যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে শঠতা কিংবা অধর্ম করে থাকে তাহলে যুধিষ্ঠির তার সঙ্গে পুনরায় পাশা খেলায় বসল কেন? কৌরবপক্ষের অন্য কোন প্রতিদ্বন্দ্বীকে তো নির্বাচন করতে পারত। কিন্তু সে তো করল না। কেন? তবে কি, পাণ্ডবদের দ্বিতীয়বার আত্মগোপনের প্রশ্ন খুব জরুরী হয়ে পড়েছিল? আর তাদের এই আত্মগোপনের মতলবের সব দায়-দায়িত্ব শকুনির শঠতা এবং দুর্যোধনের ঈর্ষাপরায়ণতা পাণ্ডববিদ্বেষের মনোভাবের ওপর চাপিয়ে দিয়ে লোকচক্ষে তাদের হেয় করে তোলা এবং দেশবাসীর মনে তাদের প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণের বীজ বপন করাই ছিল তাদের শেষ চক্রান্ত। আর এই চক্রান্তের কথা ভাবলেই গান্ধারী মনে হয় যুধিষ্ঠিরের মত একজন সেরা এবং অভিজ্ঞ খেলোয়াড়ের বারংবার পরাজয়ের গভীরে কোন রহস্য আছে। এই হার যুধিষ্ঠিরের স্বেচ্ছাকৃত। এবং সাজানো একটা ঘটনা।

আচমকা বন-মুরগি ডেকে উঠল দূরের কোন বনে। ভোর হওয়ার সংবাদ যেন বহন করে আনল ঐ ডাক। পুবের আকাশ রাঙা হল। কিছুক্ষণের মধ্যে সূর্যোদয় হল। গান্ধারী সূর্যোদয় দেখবে বলে পূর্বদিকে তাকিয়ে রইল। তার দুই চোখে অন্ধকারে ফোটা প্রথম আলোর পরশ এসে পড়ল। অনাস্বাদিত তৃপ্তি দুই চোখের পাতা বুজে এল। আলোর গন্ধ নিল। বুক ভরে শ্বাস নিল। মনে মনে বলল : ওগো সবিতা !

কর্ণে যেন শুনি মোর কল্যাণ বচন
চক্ষু যেন দেখে সদা ভদ্র সুমঙ্গল।
অসত্য হতে নাও সত্য পথে মোরে,
তিমির আঁধার হতে
নিয়ে যাও জ্যোতির্ময় পথে,
মৃত্যু হতে নাও দেব অমৃত মাঝারে।

আট

বনবাসের দিনগুলো যুধিষ্ঠিরের বড় মন্থর কাটে।

ঋতুতে ঋতুতে অরণ্যে রূপ বদলায়, রঙ পাল্টায়। কিন্তু পঞ্চপাণ্ডবের জীবনযাত্রায় তার কোন তরঙ্গ এসে লাগে না। প্রকৃতিকে উপভোগ করার অবকাশ কোথায় তাদের? কেমন করে শ্রীকৃষ্ণের স্বপ্নের ভারতবর্ষকে সার্থক করে তুলবে, এক জাতি, এক প্রাণ, এক ধর্মের বহু ভাষার ঐক্যবদ্ধ অখণ্ড ভারতবর্ষ গড়ে তুলবে তার ভাবনায় যুধিষ্ঠিরের কাটে সর্বক্ষণ।

শ্রীকৃষ্ণের স্বপ্ন ও সাফল্যের পথে যারা অন্তরায় তাদের প্রধান হল কৌরবরাজ দুর্যোধন। শ্রীকৃষ্ণ বিরোধী রাষ্ট্রজোটের নেতা। দুর্যোধন তাদেরও পরম শত্রু। তাদের সুখ, শান্তি কেড়ে নিয়েছে। যশ, গর্ব হরণ করেছে। তাদের জন্যেই আজ বনবাসী তারা। কথাটা যুধিষ্ঠিরের বুকে তীরের মত বিঁধল। আর কেউ না জানলেও সে তো জানে, এই বনবাসটা তার একটা ছলনা। প্রকৃতপক্ষে, এ তার স্বেচ্ছাকৃত রাজনৈতিক অজ্ঞাতবাস। শত্রুর চোখে ধুলো দেবার জন্যে পাশা খেলার এই ছলনাটুকু তাকে করতে হয়েছিল। লোকচক্ষের আড়ালে নিজেদের অসম্পূর্ণতা দুর করতে, বড় কিছুর জন্যে নিজেদের প্রস্তুত করতেই তারা বনে গিয়েছিল।

দুর্যোধন তার বড় শত্রু। তার জীবদ্দশায় কোনদিনই সে একাধিপত্য পার না। আর্যাবর্ত এবং দাক্ষিণাত্যের মধ্যে কোন মিলন সেতুও রচনা করতে পারে না। রাজ্যসূয় যজ্ঞের অত বড় নিরূপদ্রব শান্তিপূর্ণ আয়োজনও শেষ মুহূর্তে ব্যর্থ হল। শ্রীকৃষ্ণকে একমাত্র ভারতনেতা করতে দুর্যোধন অনুগামী বিরোধী রাজনৈতিক গোষ্ঠীর আপত্তি রাজসূয় যজ্ঞের প্রকাশ্য বিদ্রোহের রূপ নিল। এদের বিরুদ্ধে এই মুহূর্তে অস্ত্রধারণ করাও কঠিন ছিল। তাই কিছু উদ্যোগ আয়োজন দরকার ছিল লোকচক্ষুর অগোচরে।

শ্রীকৃষ্ণ তাকে মহাভারত গঠনের মুখপাত্র করল। অথচ সে শক্তিতে দীন হওয়ায় লজ্জায় শ্রীকৃষ্ণের কাছে দিন দিন ছোট হয়ে গেল। হীনমন্যতার আত্মগ্লানিতে কষ্ট পাচ্ছিল। অথচ, একদিন তাদের পাঁচভাইয়ের কর্মদক্ষতা, অধ্যবসায়, দুঃখবরণের শক্তি, সংগ্রামী মনোভাব, দুর্ভাগ্যকে জয় করার সাহস, মনোবল, দৃঢ়তা, ব্যক্তিত্ব, চরিত্রগুণে আকৃষ্ট হয়ে শ্রীকৃষ্ণ হয়েছিল তাদের সখা, আত্মীয় ও পথপ্রদর্শক। তাই, পাণ্ডবদের দুর্দিনের পরম বন্ধু, আত্মীয় এবং নেতার একটা সৎ-স্বপ্নের প্রতি মানুষকে শ্রদ্ধাশীল করে তুলতে না পারার ব্যর্থতা তাকে কিছু করার জন্যে উদ্যোগী করল। বোধ হয় তার এই মনটাকে সখা কৃষ্ণ অনুভব করেছিল। প্রজ্ঞাবান সে মহান ব্যাক্তিটি হয়ত আরো উপলব্ধি করেছিল, রাজসূয় যজ্ঞে যুধিষ্ঠিরের উদ্দেশ পণ্ড হবে। রাজসূয় যজ্ঞে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির অর্ঘ্য এবং ভারত নেতার গৌরব শ্রীকৃষ্ণকে অর্পণ করার যে ইচ্ছেই যুধিষ্ঠিরের থাকুক, অন্যেরা তা অনুমোদন করবে না। দূরদৃষ্টিসম্পন্ন শ্রীকৃষ্ণ অন্যভাবে কিছু করার মতলব নিয়ে রাজসূয় যজ্ঞের বিবিধ কর্মবন্টনের এক সুচতুর পরিকল্পনা করল যাতে কৌরব ভ্রাতাদের প্রাণে ঈর্ষার আগুন জ্বলে।* কিন্তু পরিকল্পনা ও প্রতিক্রিয়া দুই অজ্ঞাত থাকল। দুর্যোধন অনুগামী বিরোধী রাজন্যবর্গের বিদ্রোহে যুধিষ্ঠির আশাহত হল। ইন্দ্রপ্রস্থে চতুর্দিকে শত্রুর সতর্ক দৃষ্টির মধ্যে থেকে সখা শ্রীকৃষ্ণের কোন কাজ করা অসম্ভব বিবেচনা করে তারা কৌরব ভ্রাতাদের ঈর্ষাকে প্রজ্বলিত করল। প্রকৃতপক্ষে তাদের নিমন্ত্রণ করে অপমান করা হল। যুধিষ্ঠির জানত দুর্যোধন এই অপমান মুখ বুজে হজম করবে না। একটা কিছু করবেই। সেটাই হবে তাদের ইন্দ্রপ্রস্থ থেকে বেরোনোর পথ।

শান্তিগৃহ তাকে সেই সুযোগ এনে দিল। এখানে বসেই ভাবল, সকলের নিমন্ত্রণ হয়েছে, কেবল যাদবকুল নিমন্ত্রিত হয়নি। অথচ, শ্রীকৃষ্ণ পুত্র শাম্ব, দুর্যোধনের জামাতা। তবু, পরমাত্মীয়রাও বাদ পড়ল। দুর্যোধনের শ্রীকৃষ্ণ বিরোধিতায় ব্যথিত হল যুধিষ্ঠির। বিদুর পূর্বাহ্নে তাকে শুধু সংবাদটা জানায়নি, ইতিকর্তব্যও স্থির করে দিয়েছিল। কে, কিরকম পাশা খেলে তাও বলল। যুধিষ্ঠিরও চিন্তা করে নিল পাশা খেলার জয়-পরায়জয় দিয়ে শ্রীকৃষ্ণ বিরোধিতার অবসান ঘটাবে। দুর্যোধন হারলে তাকে আর কখনও শত্রুতা করার সুযোগ দেবে না। আর, সে হারলে, সর্বত্যাগী মহাপুরুষের আদর্শ ও গৌরব নিয়ে লোকের চোখে সার্থক পুরুষ হয়ে শ্রীকৃষ্ণ সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করবে।

শ্রীকৃষ্ণের কত আশা, ভরসা, বিশ্বাস তার ওপর। আর সে তার যোগ্য হতে পারছে না বলে কষ্ট পায়। অথচ, শ্রীকৃষ্ণের জন্য তার ভীষণভাবে কিছু করা দরকার। এই ইচ্ছের রূপ দিতে এবং সখার চোখে নিজেকে এবং ভ্রাতাদের সার্থক পুরুষ করে তোলার এবং বড় হবার এক অপূর্ব সুযোগ করে নেওয়ার জন্যে তারা এরকম স্বেচ্ছায় বনবাস গ্রহণ করল। শত্রুর চোখে ধুলো দিয়ে, সকল সন্দেহের ঊর্ধ্বে থেকে শত্রু দুর্যোধনের গৌরব, সম্মানকে ধুলোয় মিশিয়ে দিয়ে তারা ইন্দ্রপ্রস্থ ত্যাগ করল। দুর্যোধনের চরিত্রে নারী নিগ্রহের যে কলংক লেপন করল তার দাগ দেশবাসীর মন থেকে কোনদিন মুছবে না। শুধু তাই নয়, তাদের বনবাসের সব দায়-দায়িত্ব দুর্যোধনের ঘাড়ে চাপিয়ে কয়েকজনের চবিত্র হনন করে ভারতবাসীকে তার প্রতি বীতশ্রদ্ধ করে, তাদের সহানুভূতি সমর্থন দুর্যোধনের কূল থেকে তাদের কূলে এনে তারা ইন্দ্রপ্রস্থ ত্যাগ করল। পাশা খেলার পরাজয়ের মধ্যে থেকেও তারা একটা বড় জয় আদায় করে নিল। বিজয়ের এই গৌরবতৃপ্তিতে যুধিষ্ঠিরের মন ছেয়ে রইল।

জয়ের আত্মপ্রসাদে অনেকগুলো দিন কাটল। এবার কর্মের আহ্বান। বনে দ্রৌপদীর সাথে পাঁচভাই সুখভোগ করতে আসেনি। দ্রৌপদী তাদের প্রেরণা দীপ, শপথের অঙ্গীকার। শ্রীকৃষ্ণের মহাভারত গঠনের স্বার্থেই নিরপরাধ রাজ্যসুখ ছেড়ে অক্ষক্রীড়ার নামে বনবাসে রাজনৈতিক অজ্ঞাতবাস বরণ করে নিয়েছে। এখানে যুধিষ্ঠিরের নিজের জন্যে কিছুই আকাংখিত নয়। কৃষ্ণের মত সেও চায় পৃথিবী থেকে অবিচার অত্যাচারের অবসান হোক, শোষণ দূর হোক, মানুষ ধর্মে, বিশ্বাসে, বন্ধুত্বে,

*এই গুরুত্বপূর্ণ বিশ্লেষণটি জানতে মৎ-লিখিত "শ্রীকৃষ্ণ পুরুষোত্তম"-এর অন্তর্গত "ইন্দ্রপ্রস্থে শ্রীকৃষ্ণ" উপন্যাসটি অবশ্যই আপনাকে পাঠ করতে হবে। পুনরুক্তি এড়ানোর জন্যে এই অসম্পূর্ণতা রাখতে হল। আগ্রহী পাঠক-পাঠিকা এই কষ্টটুকু স্বীকার করলে লেখকই ধন্য হবে।

ভালবাসায় সুন্দর হোক। এর জন্যে চাই সততা, ত্যাগ, সাধনা। এখন যুধিষ্ঠিরের সেই জীবন শুরু হল। বনবাস হল তার প্রস্তুতির কাল।

অজ্ঞাতবাসের পূর্ব-অভিজ্ঞতা থেকে যুধিষ্ঠির জেনেছিল হিমালয় সন্নিহিত দেব গোষ্ঠীর মানুষ, গন্ধর্ব, কিন্নর, কিরাত, দুর্যোধনের রাষ্ট্রজোটের বিপক্ষে এদের অপচ্ছন্দ, বিতৃষ্ণা পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে দুর্যোধন নিধন এবং কুরুবংশ ধ্বংসের এক জমি তৈরি করার কথা তার মনে হল। সেই কূটনৈতিক প্রয়াস চালানোর জন্যে অর্জুনকে পাঠানো হল বিভিন্ন দেব শিবিরে মিত্র সম্বন্ধে স্থাপন করে তাদের বহু উন্নত অস্ত্র সংগ্রহ এবং শিক্ষা করতে। কারণ, এই সংঘাত অনিবার্য। ধর্মের সঙ্গে অধর্মের, ন্যায়ের সঙ্গে অন্যায়ের, মহান সংকল্পের সঙ্গে আত্মকেন্দ্রিক স্বার্থের, ভাইয়ের সঙ্গে ভাইয়ের। এই অনুভূতির একটা বিদ্যুৎ স্পর্শ করে গেল যুধিষ্ঠিরের।

যুধিষ্ঠির কিছুক্ষণ বিস্ময়ে ভুরু কুঁচকে নিজের নখ, আঙুল দেখল। কপালের ছোট্ট রেখা একটু গাঢ় হল। দীর্ঘশ্বাস পড়ল। একমাত্র যুদ্ধের দ্বারাই কৌরব রাজশক্তির উৎখাত করতে এখনও অনেক সময় দরকার। এখনও বাকি অনেক আয়োজন। সামনে তার বিপুল কর্তব্যের আহ্বান।

ধূপছায়ার মত অন্ধকার নামল বনে। খুব ধীরে। গাছপালা রহস্যময় কুহেলিকার মধ্যে হারিয়ে গেল। আর ঘন কালো অন্ধকার ভেদ করে আকাশের বুকে চাঁদ হেসে ওঠল। শুভ্র স্নিগ্ধ নরম আলোয় উদ্ভাসিত হল বনভূমি। গাছের পাতায় পাতায় লাগল খুশির দোলা। চুমকি বসানো নক্ষত্রের নীল আকাশ ঝলমল করে উঠল আলোয়।

ধৃতরাষ্ট্রের মুখে গান্ধারী বহুবার পান্ডবদের বনবাসের গল্প শুনেছে। ধৃতরাষ্ট্র চমৎকার গল্প বলে। গল্প বলার সময় ভাবানুযায়ী কণ্ঠস্বরের নিয়ন্ত্রণ ঘটনাকে প্রত্যক্ষ ও জীবন্ত করে তোলে।

গান্ধারীর কতবার মনে হয়েছে পাণ্ডবদের জীবনটা বড় আশ্চর্যের। রূপকথার গল্পের মত। চমকপ্রদ আর আকর্ষণীয়। সত্যি বলতে কি, ঘটনার আকস্মিকতায় তাদের জীবনটা সমস্যা সংকটের আবর্তে বারবার নতুন হয়ে উঠে। পরিবর্তন তাদের জীবনে সব সময় সুখের হয়নি। কিন্তু হতাশায় ভেঙে পড়েনি, জীবনে বিশ্বাস হারায়নি, ঈশ্বরের কৃপায় তো নয়ই। ফলে, এক ঘটনাস্রোত থেকে আর এক ঘটনাস্রোতে তাদের জীবনটা হারিয়ে ফেলেনি। কিংবা একঘেয়েমির শিকার হয়ে থেকে যায়নি। পরিবর্তনের ধারায় ভেসে গিয়ে নিজেদের নতুন করে তুলেছে। বনের নিঃসীম মমতা, প্রকৃতির স্নিগ্ধতা তাদের নতুন প্রাণ দেয়। ফুরিয়ে যাওয়া তাদের জীবনকে নবীকৃত করে তোলে। পরিবেশ, ভাগ্য বিপর্যয়, জীবনযাত্রা সব কিছুর সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার এক অদ্ভুত ক্ষমতা ওদের ভেতর আছে বলেই নিজে নিজের জীবনের ইচ্ছে, খুশি নিয়ে ওরা সুখী এবং সার্থক।

যত দিন যায় গান্ধারীর নিজের ভেতর পরিবর্তনটাকে লক্ষ্য করে আশ্চর্য হয়ে যায়। পাণ্ডবদের প্রতি কেমন একটা মুগ্ধতা ধীরে ধীরে তার হৃদয়ে সর্বব্যাপ্ত হয়ে যাচ্ছে। সিংহাসনে কিংবা নির্জন নির্বাসনে তারা বেমানান নয়, বিভিন্ন পরিবেশে, সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের সঙ্গে বিনা আয়াসে, কত সহজে মিলে যেতে, মিলিয়ে নিতে পারে বলেই বোধ হয় তারা বেমানান হয়নি কোথাও। এমন অদ্ভুত চরিত্রের এবং ব্যক্তিত্বের মানুষের সংস্পর্শে আসা যেকোন লোকের পক্ষেই সৌভাগ্যের ব্যাপার। যেসব মানুষ পঞ্চ-পাণ্ডবের সংস্পর্শে একবার এসেছে, তারাই তাকে আজীবন মনে রেখেছে। এমনই ছিল তাদের চৌম্বক ব্যক্তিত্ব। কোন অবস্থাতে, কোন পরিবেশেই তার নিষ্প্রভ হয়ে যায়নি। এই চরিত্রগুণ ও ব্যক্তিত্বের আকর্ষণে মানুষের হৃদয় জয় সম্পন্ন করে রাজসূয় যজ্ঞ করতে সক্ষম হয়েছিল। স্বার্থের সংঘাতে হয়ত তা শান্তিপূর্ণ হয়নি। তবু যা ঘটেছিল সেদিন, তার দায় একা পাণ্ডবদের নয়, সারা দেশের নৃপতিরও ছিল। রাজসূয় যজ্ঞ ছিল দেশব্যাপী শ্রীকৃষ্ণ বিরোধিতার মাপন মন্ত্র। গোটা ভারতবর্ষের রাজাদের মনোভাব এবং রাজনীতির গতি প্রকৃতি নিরূপণ করতে শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদের পাশার ঘুঁটির মত ব্যবহার করেছিল। সেজন্য তাদের অন্তরে কোন ক্ষোভ নেই। বরং উল্টোটাই ভেবেছে। শ্রীকৃষ্ণকে অস্বীকার করে তারা ভাবল এই বিরোধিতার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের

রাজনৈতিক শ্রেষ্ঠত্বের অবসান হল, ভারত রাজনীতিতে তার গুরুত্ব কমে গেল। তাদের উচিত শিক্ষা দেবার জন্যে শান্তিগৃহে পাশা খেলার ছলে নিজেদের নির্বাসনকে অনিবার্য করে তুলল। শ্রীকৃষ্ণ বিরোধীদের ধোঁকা দেয়ার জন্যে বনবাসে গেল। মুর্খের দল তেরো বছর পর বুঝল, এই বনবাস, নির্বাসন, লাঞ্ছনা ছিল তাদের জীবনের সবচেয়ে বড় সম্মানের এবং গৌরবের।

অজান্তে গান্ধারীর দীর্ঘশ্বাস পড়ল। এই বিশ্লেষণের প্রবক্তা স্বয়ং সম্রাট ধৃতরাষ্ট্র। তেরোটা বছর পর পাণ্ডবদের আত্মপ্রকাশে টের পাওয়া গেল বনবাসের নামে তারা শ্রীকৃষ্ণের রাজনৈতিক স্বপ্ন ও পরিকল্পনাকে সার্থক রূপ দিতেই প্রস্তুত হচ্ছিল। এত বড় একটা প্রস্তুতির জন্যে তেরোটা বছর সময় লগাল। সরঞ্জাম সংগ্রহ, করতে বিশেষ পরিকল্পনা করতে এবং রাজনৈতিক শক্তি কেন্দ্রীভূত করার জন্যেই লাগল। পাণ্ডবদের আত্মপ্রকাশ তাদের বনবাসের গুরুত্বকে বুঝিয়ে দিল।

গান্ধারী নির্নিমেষ নয়নে বাইরে দিকে তাকিয়ে ছিল। বহুদূরে আকাশের গায় এক অতিকায় ঘন কৃষ্ণমেঘের মেঘস্তূপকে দেখতে পেল। ফুরফুরে হাওয়ায় গাছের ডালে ডালে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল। বাতাসের সাঁ সাঁ শব্দ হচ্ছিল। হঠাৎ একটা তীব্র আলোড়ন জাগল পাতায় পাতায়। চারিদিক থেকে উন্মাদ বাতাস ছুটে এল। গাছের ডালপালার সঙ্গে তার দুরন্ত লড়াই দেখতে লাগল গান্ধারী। এক অদৃশ্য পালোয়ানের মত শক্তিমান বাতাসের ধাক্কায় একটা বিরাট মহীরুহ হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ার শব্দ হল। মাটি কেঁপে উঠল। ঘর-দোড় ধুলো-বালি ময়লায় ভরে গেল। গান্ধারীর শ্বাস নিতে কষ্ট হল। তার দম বন্ধ হয়ে এল। এই প্রবল ঝড়ের ভেতর গান্ধারী সমস্ত সত্তা বারবার কেঁপে উঠল। হারিয়ে যাচ্ছিল তার চিন্তাশক্তি। এমন কি তার অহং পর্যন্ত।

পরিচারিকারা চারদিকে তেকে পড়ি-মরি করে দৌড়ে এল, জানলা-দরজা বন্ধ করে দিল। গান্ধারীর চোখে ধুলো পড়ে জ্বালা করতে লাগল। শাড়ির আঁচল দিয়ে চোখ চেপে ধরল। চোখে সে কিছুই দেখছিল না। কানে শুধু শুনছিল ঝড়ের উন্মাদ সাঁ সাঁ শব্দ। আর তার পিপাসিত অনুভূতির প্রতিটি রন্ধ্র দিয়ে অনুভব করছিল আর এক আসন্ন মহান কালান্তক ঘূর্ণিঝড়ের রূপকে। গান্ধারী কিছুক্ষণের জন্য সম্মোহিত, স্তব্ধ, বাক্যহারা।

সুযোধনের ডাকে তার চমক ভাঙল। অন্যমনস্কতা থেকে ফিরে তাকাল। জিব দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে বলল, কিছু বলবে?

গান্ধারীর মুখের দিকে ভাবলেশহীন দৃষ্টিতে সুযোধন কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল, বলতে তো চাই, কিন্তু বলতে দিচ্ছ কই? সব সময় তুমি কী যেন চিন্তা করছ। ক'দিনেই ভীষণ বদলে গেছ। তোমার সেই হাসিখুশি প্রাণোচ্ছাল ভাবটা কোথায় যেন হারিয়ে গেছে। তুমি যেন অনেক দুরের মানুষ। তোমার নাগাল পাই না। এত ভাব কী? ভাবনার কিছু আছে?

গান্ধারী শূন্যদৃষ্টিতে সুযোধনের দিকে তাকিয়ে খুব জোরে শ্বাস টানল, সমস্ত বাতাসটা যেন শুষে নিয়ে বুকের ভেতর শূন্য জায়গাটা ভরিয়ে তুলল। তারপর নিংড়ে নেওয়া নিঃশ্বাসটা ধীরে ধীরে নেমে গেল। ফ্যাল ফ্যাল করে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল। বলল, মানুষ হলেই তার ভাবনা বলে একটা ব্যাপার থাকেই। মন থাকলেই সে ভাবে। ভাবনার সব কথা অন্যকে বলা যায় না। লাভ হয় না কোন। একা একাই তাকে বইতে হয়। উথাল-পাথাল দরিয়ার মত তার অসহায় অবস্থা। একেই বলে ভাগ্যের লিখন। এ থেকে মুক্তি নেই।

সুযোধন আরাম কেদারায় পুরো শরীরটা এলিয়ে দিয়ে বলল, ভাবতে যে চায়, ভাবনা তার ঘাড়ে চেপে বসে। কিন্তু ওইসব স্পর্শকাতরতা ছেড়ে সে বেরিয়ে পড়ে সত্যের খোঁজে, কিন্তু ভাবনা তাকে ছোঁয় না। আরাম কেদারা থেকে শরীরটা একটু তুলে ধরে বলল, বুকের মধ্যে এই বৃথা রক্তক্ষরণ করে কী লাভ? তোমার হয়েছেটা কী, সত্যি করে বল ? মাতা-পুত্রের সম্পর্কের মধ্যে কোন ফাঁক নেই ফাঁকি সেই। এমন অকৃত্রিম বন্ধুও হয় না। অকপটে তোমার কথা বল।

গান্ধারী বোবা চোখে সুযোধনের দিকে চেয়ে রইল। জোড়া চড়ুই পাখি জানলার গরাদে বসে ভালবাসায় ঝাপ্টাঝাপ্টি করছে। দূরে কোথাও ঘুঘু দম্পতি ডাকছে গভীর স্বরে। গান্ধারীর বুকের ভেতরটা হঠাৎ ভার হয়ে উঠল। মানুষের জীবনও ঐ একরত্তি চড়ুইয়ের মত, ঘুঘুর মত ছোট্ট

পরিধির একঘেয়েমির ভেতরেই অমন একটা সুখ খোঁজে। বাৎসল্যের আবেগে বোবা পাথরের ভার সহসা বুক থেকে নেমে গেল। চোখের পাতা ভিজে গেল। নিজেকে একটু সামলে নিয়ে বলল, সত্যিই চিন্তা হয়। পাণ্ডবদের সঙ্গে তুলনা করলে দিশাহারা হয়ে পড়ি। ঈশ্বরের কাজ করতে বোধ হয় ওরা এসেছে। অন্য কোন মানুষ হলে এই টানাপোড়নে, হতাশায়, ব্যর্থতা, দুঃখের যন্ত্রণায় ছিন্নভিন্ন, তুলো পেঁজা হয়ে যেত এতদিন। জীবনের বেশিরভাগ সময়টা বনে-জঙ্গলে নানা কষ্টের মধ্যে বান্ধবহীন অবস্থায় কেটেছে। তবু তারা হারিয়ে গেল না, ফুরিয়ে গেল না। মাথা উঁচু করে তারা সব বাধা-বিপত্তি, প্রতিরোধ, শত্রুতা জয় করে ফিরল। অদৃষ্টকে যারা পরাজিত করল, সেই অপরাজেয় পাণ্ডবদের যুদ্ধে হারানো দুঃস্বপ্ন মাত্র।

সুযোধন কিছু বলার জন্য উসখুশ করছিল। গান্ধারী তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, আমাকে বাধা দিও না। আমার কথাগুলো আমার মত করে বলতে দাও। তাতে তোমার ভাল হবে।

সুযোধন ঔৎসুক্যের চোখে চেয়ে রইল। বলল, ঠিক আছে।

গান্ধারীর গলার স্বর দ্রবীভূত হল। চোখ দুটি উজ্জ্বল হল। বলল, পাণ্ডবেরা বনবাসের নামে মানুষের খুব কাছে গিয়ে তাদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে প্রচার করল যে, একগুঁয়ে কিছু রাজার জেদে, স্বার্থপরতায়, স্বেচ্ছাচারিতায়, বিভেদে, বৈষম্যে সাধারণ মানুষের জীবনটাই নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। সাধারণ মানুষকে নিংড়ে নিয়ে তারা রাজকোষ ভরছে। আর তার সবটাই যুদ্ধের উত্তেজনায়, বিলাস-ব্যসনে অপব্যয় হচ্ছে। আর সাধারণ মানুষের জীবন হচ্ছে অভিশপ্ত। তাই, তাদের কান্নার সাগরে নারায়ণ শয্যা পেতেছেন। তিনিও আর চুপ করে থাকতে পারছেন না। নররূপে শ্রীকৃষ্ণের রূপ ধরে তিনি এসেছেন মানুষের পরিত্রাণ করতে। মানুষকে সেবা করতে। তার দুঃখের প্রতিকার করতে। অত্যাচারী রাজার হাত থেকে দুঃখী, দুর্গত, শোষিত, বঞ্চিত মানুষকে মুক্ত করতে—কংস, জরাসন্ধ, শিশুপাল নরকাসুরকে হত্যা করেছেন। আরো কত হত্যা করতে হবে তাকে। অনেক পাপে ভরা পৃথিবীর জঞ্জাল সরাতে, ধুয়ে মুছে সাফ করতে অনেক রক্তের দরকার। রক্তের বন্যা বইয়ে দিতে হবে পৃথিবীতে। শ্রীকৃষ্ণের প্রতিনিধি হয়ে আমরা এসেছি প্রেম বিলোতে; মাতা, বসুমতীর পূজার বলি চাইতে। শ্রীকৃষ্ণই শোষিত ঞ্চিত মানুষকে মুক্ত করার ব্রত নিয়েছে। আজ সময় হয়েছে লাঞ্ছিত, অপমানিত মানুষের জোট বাঁধার। জোট ছাড়া আগামী প্রজন্মের কাছে প্রতিশ্রুতিময় সুন্দর জীবনকে পৌঁছে দেওয়া যাবে না। শ্রীকৃষ্ণ তাই বলে, মৃত্যুভয়কে জয় করে যেদিন মানুষ জোট বাঁধার স্বপ্ন দেখবে, মরতে ভয় পাবে না, সেদিনই আসবে তার মুক্তি। এসব কথা মনে হলে আর কিছু ভালো লাগে না। শুধু চিন্তা হয়, ভয় হয়, ভাবনা হয়। বড় অভাগী আমি। আমার অদৃষ্টের অভিশাপই বয়ে এনেছে তোমাদের জীবনের অশান্তি। আমার জন্যেই তোমাদের সকলের এত কষ্ট দুর্ভোগ।

সুযোধন হাসল। দুই চোখে তার কৌতুক ঝলসে উঠল। তবু গান্ধারীর দুঃখ, উদ্বেগ বিদ্যুৎচমকের মত যন্ত্রণা চিরে দিয়ে যায় তার বুকের অভ্যন্তরে। মায়ের জন্যে তখন তার খুব কষ্ট হয়। মাকে বোঝানোই শক্ত যে, একজন মানুষ জীবনে যা কিছুই পায় অথবা পায় না, তার কৃতিত্ব বা দায়িত্ব তার নিজের। এর জন্যে তখন তার খুব কষ্ট হয়। মাকে বোঝানেই শক্ত যে, একজন মানুষ জীবনে যা কিছু পায় অথবা পায় না, তার কৃতিত্ব বা দায়িত্ব তার নিজের। এর জন্য অন্যকে দায়ী করা যায় না। কিন্তু তবু জননী তার নিজের অদৃষ্ট এবং কর্মফলের সঙ্গে জড়িয়ে একটা অকারণ কষ্ট ভোগ করছে। জননীকে একটা সান্ত্বনা দেবার জন্যে বলল, শুধু শুধু নিজেকে অপরাধী করছ। জোর করে নিজেকে অপরাধী করার ভেতর কোন কৃতিত্ব নেই। বরং জীবনের লজ্জা আর গ্লানি আছে। অদৃষ্টের কাছে হেরে যাবার মত ভীরুতা আমার নেই। পিতৃব্য বিদুর তোমার মাথায় এইসব অপরাধ বোধ জমিয়ে তুলছে। কিন্তু এসব করে বিদুরের কোন লাভ নেই। আমাকে বিভ্রান্ত করা যাবে না। পাণ্ডবের অনুকম্পা, সমবেদনা চায় না সুযোধন। নিজেকে তার যত খুশি কৃষ্ণের কৃপাপ্রার্থী করুক, কিন্তু সুযোধন কারো কৃপার্থী নয়। সুযোধন সুযোধনই। কিন্তু তুমি কেবল প্রতিমুহূর্ত বদলে যাচ্ছ। হারিয়ে যাচ্ছ দ্বিতীয় সত্তার কাছে। কিন্তু কেন? সুযোধনের উপর একটু ভরসা রাখ জননী। তার ওপর বিশ্বাস থাকলে তুমি কখনো দুর্বল হয়ে পড়তে না। সুযোধন পাণ্ডবদের বনবাসে পাঠিয়ে

বসে নেই। সেও তৈরি। যুদ্ধ হলে তোমার কোন ভয় নেই। আশংকা করারও কিছু নেই। সুযোধনের পেছনে আছে গোটা ভারতবর্ষের তিন চতুর্থাংশ রাজ্য ও রাজার সমর্থন। মজার ব্যাপার হল, পাণ্ডবদের অনেক সমর্থকও আমার সঙ্গে আছে।

গান্ধারী কেমন একটা সতৃষ্ণ নয়নে সুযোধনের দিকে চেয়েছিল। ঘোর লাগা আচ্ছন্নতার মধ্যে বলল, বেশি জেনে লাভই বা কী? বেশ তো আছি।

সুযোধন প্রশ্রয়ভরা দুটি উজ্জ্বল চোখ মেলে তাকিয়েছিল গান্ধারীর দিকে। হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গিয়ে বলল, কিছু কিছু মুহূর্ত আসে সকলের জীবনে যখন কৃতিত্বের এবং সাফল্যের কথা অতি প্রিয়জনকে না শুনিয়ে থাকা যায় না। তুমিও শুনলে অবাক হবে, নকুল-সহদেবের মাতুল শল্য রাজনৈতিক আবর্তের গতিপ্রকৃতি লক্ষ্য করে আমার পক্ষে যোগ দিয়েছে। যে যদুকুল পাণ্ডবদের বড় সহায় এবং বন্ধু তারা এখন দ্বিধাবিভক্ত। দুই শিবিরেই তারা যোগ দিয়েছে। বলরাম তো নিরপেক্ষ। বৃষ্ণি বংশের কৃতবর্মা আমার সঙ্গে আছে। যাদব সৈন্যদের একটা বিরাট অংশ বিদ্রোহ করে কৌরব পক্ষে যোগ দিয়েছে। কৃষ্ণেরও সাধ্য নেই তাদের ফেরানোর। কৃষ্ণের সঙ্গে বৈবাহিকী সম্পর্ক বলে দুই ভ্রাতৃবিরোধের সংঘর্ষে সে পাণ্ডবপক্ষে অস্ত্র ধারণ করবে না বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। তাহলে পাণ্ডবদের পক্ষে যুদ্ধ করার জন্য থাকল কে?

তবু গান্ধারীকে ভীষণ বিষণ্ণ দেখাল। উদ্বিগ্ন গলায় বলল, মাত্র ক'দিন আগের কথা। বিরাট রাজার সঙ্গে যুদ্ধের অভিজ্ঞতা এত তাড়াতাড়ি ভুলে গেলে? শক্তিশালী কৌরব বাহিনীর বাঘা বাঘা বীর, যোদ্ধা, রথী, মহারথী, এমন কি ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ, তুমি, দুঃশাসন সকলে মিলেই মৎস্যরাজ্য আক্রমণ করলে। যুদ্ধও হল কালবৈশখী ঝড়ের মত। কিন্তু পঞ্চ-পাণ্ডব পরিচালিত বিরাটের সৈন্যবাহিনী, লোকবল যুদ্ধে জিততে পারলে কই? মুখ নিচু করছ কেন পুত্র? বিশাল সৈন্যবাহিনী, লোকবল যুদ্ধে জেতার জন্যে খুবই গুরুত্বপুর্ণ, কিন্তু সেটাই যুদ্ধজয়ের সব নয়। সমরকৌশল, সুযোগ্য পরিচালনা, আক্রমণ পদ্ধতি, যুদ্ধজয়ের মূল কথা। এর জন্যে চাই যথেষ্ট দূরদর্শিতা, প্রস্তুতি এবং অনুশীলন। অপ্রিয় হলেও বলব, তোমরা ক্ষুদ্র মৎস্যরাজ্যের শক্তিকে তাচ্ছিল্য করেই তড়িঘড়ি করে আক্রমণ করলে। তোমাদের বিশাল বাহিনীর উপস্থিতিই মৎস্যরাজ্যের বশ্যতা স্বীকারের পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু মৎস্যরাজ্য তোমাদের উল্টে আক্রমণ করার সাহস ও বিক্রম দেখাল। জয় হল তাদের। তবু বাহুবলের, লোকবলের দর্প, অহংকার তোমার গেল না। এই যুদ্ধ থেকে তুমি কোন শিক্ষাই নাওনি। ওটা কুরু-পাণ্ডবের মুখোমুখি লড়াইয়ের একটা ছোট্ট মহড়া। আসন্ন যুদ্ধের পরিণামের কথা ভেবেই আমি শংকিত। আমার মায়ের মন বলছে এই যুদ্ধ ভাল করে কিছু হবে না। সুযোধন, অভাগিনী জননীর মুখ চেয়ে পাণ্ডবদের প্রার্থনামত পাঁচটি গ্রাম দিয়ে শান্তি স্থাপন কর। এতে কোন অপমান হয় না। বিশ্বামিত্রকে সমস্ত রাজ্য অর্পণ করে হরিশ্চন্দ্রের কোন সম্মানহানি হয়নি বরং তার গৌরব বেড়েছিল।

সুযোধনের খুব ক্লান্তি লাগছিল। আরাম কেদারায় বসে মাঝে মাঝে নিজের কপাল চেপে ধরছিল। হাত, নখ দেখছিল। ভেতরটা এক দারুণ অস্থিরতায় ছট্‌ফট করছিল। অথচ জননীর মুখের ওপর তার বলার মত কোন কথা ছিল না। গালে হাত দিয়ে ভাবল অনেকক্ষণ। জননীর জন্যে সত্যি তার কিছু করার নেই। কিন্তু এই ভাবে একটা বিরাট প্রশ্নচিহ্ন আর আর্জির সামনে চুপ করে বসে থাকা তার পক্ষে সম্ভব নয়। সে হঠাৎ উঠে দাঁড়াল। একটা বড় শ্বাস পড়ল। ভয়টা বেরিয়ে গেল শ্বাসের সঙ্গে। গান্ধারীর দিকে চেয়ে অসহায় সুযোধন বিকারগ্রস্তের মত বলল, তা হয় না মা। যুদ্ধটা এখন আর আমাদের একার সিদ্ধান্তের ব্যাপার নয়। এ যুদ্ধ হচ্ছে গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্রের সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদী রাজতন্ত্রের, শ্রীকৃষ্ণের একনায়কত্বের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ বিরোধী রাষ্ট্রসংঘের ভাইয়ের সঙ্গে ভাইয়ের। কৌরব পাণ্ডবের সংঘাতের রূপ ধরে তা প্রকাশ পাচ্ছে কেবল। আমার নিজের স্বার্থের জন্যে, জননীর বাধ্য ছেলে হয়ে বহু মানুষের মিলিত স্বার্থ, উদ্যোগ, উদ্যম, ক্ষোভ, যন্ত্রণা, বঞ্চনা এক কথায় নস্যাৎ করে দিতে পারি না। আমি চাইলেও হবে না।

গান্ধারী ভাবলেশহীন হয়ে চেয়ে ছিল সুযোধনের দিকে। আতঙ্কিত গান্ধারী কিছুতেই সুযোধনের চোখ থেকে চোখ সরাতে পারল না, পাছে সুযোধনের অকল্যাণ হয়ে যায়। খুব ধীরে ধীরে তার বাহ্যচেতনা লুপ্ত হয়ে যাচ্ছিল। সুযোধন যেন তাকে সম্মোহিত করে ফেলল। বোধ হয় একটা অশুভ চিন্তা, আশংকা তার মাথায় থাবা গেড়ে বসেছিল। এক অদ্ভুত শৈত্যে তার ভেতরটা থর করে কাঁপছিল। সে দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিল না। পালঙ্কের বাজুতে শরীর ভর রেখে চোখ বুজল।

গান্ধারী শরীরের ভেতর রক্তের কলধ্বনিতে শুনতে পাচ্ছিল আসন্ন কৌরব পাণ্ডব যুদ্ধের রণদামামা। অনেক যন্ত্রণা দিয়ে বুকের মধ্যে ঝংকারে বেজে যাচ্ছিল। যত দিন যাচ্ছিল ততই শরীরটা ঐ চিন্তায় অবসন্ন হয়ে এল। আর একটা অসহায় চাপা কান্না বুকের পাঁজরে পাঁজরে পাক দিয়ে দিয়ে ঘুরছিল যার অপর নাম হাহাকার। সত্তার ভিতরে তার দীর্ঘশ্বাস কিছুতে থামতে চায় না। একটা কাল্পনিক ভয়ে গান্ধারী বার বার শিউরে উঠছিল। তার চোখে ছিল এক অস্বাভাবিক দৃষ্টি।

কিন্তু এসব নিয়ে এত আতঙ্কিত হওয়ার কিছু আছে কি? রাজ্যরাজনীতিতে যুদ্ধের উত্তেজনা একটা স্বাভাবিক ঘটনা। রাজ্য ও যুদ্ধ হরিহর আত্মা। এর ভেতর কোন অভিনবত্ব নেই। এজন্য কোন দুর্জ্ঞেয় প্রতিক্রিয়া হওয়া উচিত হয়নি তার। তবু হল। মানুষের মনের গতিটাই বড় অদ্ভুত কেউ বলতে পারে না। মনের কোনটা উচিত আর আর কোনটা নয়, একমাত্র মনই বোধ হয় বলতে পারে সে কথা। কিংবা কে জানে, হয়ত সেও পারে না। কিন্তু মনের ভেতর তার অস্তিত্বের যন্ত্রণা থাকে নিরন্তর। অনুরূপ একটা যন্ত্রণায় গান্ধারী ভেতরটা টাটাচ্ছিল।

সাদা কালো পাথরের চক মেশানো মেঝেতে পাশা খেলা ছক থেকে ছিঁড়ে এনে যেন ঘরের মেঝেতে বসিয়ে দিয়েছে কেউ। কতকাল ধরে এই মেঝে দেখছে। এই মেঝের ওপর দিয়ে অষ্টপ্রহর হাঁটছে। অথচ, এমন করে কথাটা মনে হয়নি কোনদিন। আজ হঠাৎ এই মুহূর্তে এই কথাটা মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে বুকটা কেমন উথাল-পাথাল করে উঠল। মনে হল, এটাই যেন কৌরবের অদৃষ্টলিপি।

সেই পাশা খেলার ছকের ওপর পা রেখে গান্ধারী দাঁড়িয়ে আছে জানলার দিকে চেয়ে। দরজার দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে সে। জানলার গরাদ দুটো দু'হাতে শক্ত করে চেপে ধরে, তাতে মুখ রেখে সে তাকিয়ে আছে। শূন্য দৃষ্টি। নির্বিকার এবং উদাসীন। সে স্থির হয়ে আছে চেতন ও অচেতনের সন্ধিক্ষণে, তার কিছুই মনে পড়ছিল না। অথচ একটা ভারী কিছু ঝুলে ছিল হৃৎপিণ্ডের সঙ্গে। নিজের কষ্টে দুই চোখ বুজল। চোখ বুজতেই অন্ধকারে স্পষ্ট ফুটে ওঠল। কুন্তীর মুখ। কুন্তী হাসছে। গর্বের হাসি, জয়ের হাসি। গান্ধারী কম্পিত হস্তে মাথা চেপে ধরল।

কুন্তীর পাশে তাকে বড় নিষ্প্রভ, ম্রিয়মাণ মনে হল। মনটা ভারি খারাপ লাগতে লাগল। ভেতরে ভেতরে অপমান বোধ করল সে। শূন্য চোখে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইল। যমুনার অবিরল জল ভাঙার শব্দ ছাড়া আর কিছুই শুনতে পাচ্ছিল না। যমুনার ঢেউ ছাড়া আর কিছু চোখে দেখছিল না। ওই ঢেউয়ের মধ্যে যুদ্ধের রাশি রাশি সৈন্য দেখল। প্রতিটি ঢেউ যেন একজন সশস্ত্র সৈনিক। একটা ঢেউ গেলে আর একটা ঢেউ যেমন তার জায়গা নিচ্ছে, তেমনি একজন সৈনিকের শূন্যতা আর একজন পূর্ণ করছে। নদীবক্ষ নয়, সে যুদ্ধক্ষেত্র দেখছিল।

গান্ধারী জানলার গরাদ ধরে আরো নিবিড় করে আঁকড়ে ধরল। যুমনার কালো জলের ঢেউয়ে যুদ্ধের করাল চেহারা দেখে তার বুক দুরদুর করে উঠল। মাথার মধ্যে অদ্ভুত একটা বোবা ভাব। সব ভাবনা-চিন্তা থেমে গেছে। কানের পর্দায় বাজছে যুদ্ধের দামামা।

যুদ্ধ কারো মঙ্গল করে না। দেশের মঙ্গল আনে না। যুদ্ধ শুধু ধ্বংস আর ক্ষতিই করে। লোকক্ষয়, ধনক্ষয়, সম্পদক্ষয় এবং রাজ্যের শ্রী ও সমৃদ্ধি নাশ করে। এই কথাটা গান্ধারী কতভাবে সুযোধনকে বোঝাতে চাইল। কিন্তু সুযোধনের এক জবাব।

রক্ত দিয়ে রাজ্য প্রতিষ্ঠা না করলে তার কোন মূল্য থাকে না। দয়ার দানে কিংবা অনুগ্রহে রাজ্য স্থাপন করলে রাজার কোন গৌরব বৃদ্ধি পায় না। রাজাও তার মূল্য দিতে শেখে না। পৃথিবীতে

সব কিছুর জন্যে মানুষকে অনেক মূল্য দিতে হয়। যুধিষ্ঠির তার রাজ্যলাভের জন্যে কোন মূল্য দেয়নি। বিনা আয়াসে রাজ-সিংহাসন পেল। তাই ইন্দ্রপ্রস্থকে রক্ষার জন্যে কিছু করেনি। একজন জুয়াড়ীর মত পাশা খেলার দান রেখে হারাল। বিনামূল্যে কিছু পেলে মানুষ তার অপব্যবহার করে। গান্ধারী ভুরু কুঁচকে যতদূর সম্ভব কঠোর মুখভঙ্গি করে বলল, আমি কিন্তু এসব কথা শুনতে আসিনি। যুদ্ধ নয়, মীমাংসা চাই। শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের জন্যে—

সুযোধন ঠোঁট উল্টে বলল, আর্জিটা বড় সহজ হল না। মীমাংসা আগে হয়েছিল। পারিবারিক সম্মান মর্যাদার বিনিময়ে তার ইন্দ্রপ্রস্থ পেল। কিন্তু শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের পরিবেশ বিষিয়ে তোলার জন্যে দায়ী কে? আমরা মিলেমিশে থাকতে চাইলাম, কিন্তু থাকতে দিল কৈ? তাদের কৌতুক, উপহাস, পরিহাস, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, অপমান করাকে কেউ বন্ধুত্ব বলে ? অজ্ঞাতবাসের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে শর্ত ভেঙে যার আত্মপ্রকাশ করল তাদের বিশ্বাস করব কেমন করে?

গান্ধারীর মাথা ঝিমঝিম করতে লাগল। কয়েকটা মুহূর্ত সে স্থির হয়ে বসেছিল। মানুষের কাছে সবচেয়ে বড় বেদনা বোধ হয় তার আত্মাভিমানকে অকারণ আঘাত করার বেদনা। স্তব্ধতা ভেঙে বলল, অত কঠিন হয়ো না পুত্র। এ সংসারে ভুল মানুষই করে, আবার সে ভুল মানুষই সংশোধন করে। অনুতাপ-অনুশোচনায় ভোগে। এখন পুরনো ঘটনা স্মরণ করে তাদের সঙ্গে অশান্তির করা কি ঠিক? কথাটা বলার সময় গান্ধারী বার দুই ঢোঁক গিলল।

সুযোধন বেশ একটু গম্ভীর গলায় বলল : শোন মা, পাণ্ডবদের সততা শুধু একটা ছলনা। ধর্মের মুখোশ পরে তারা মানুষ ঠকায়। তাদের বিশ্বাস করে নিজের সমূহ বিপদ ডেকে আনা কতখানি সঙ্গত তার কথাও ভাবতে হবে? তুমি ভাবছ, পাঁচখানা গ্রাম চেয়ে তারা খুব বিনয় দেখাল। কিন্তু ঘটনা আদৌ তা নয়। এ হল তাদের প্রচ্ছন্ন শত্রুতা। প্রতিহিংসা, প্রতিশোধ চরিতার্থ করতে গোটা কুরুজাঙ্গাল দখলে যে একদিন মেতে উঠবে না, কে বলবে শত্রুকে বেড়ে ওঠার কোন সুযোগ দিতে নেই।

গান্ধারী একটু রাগত স্বরে বলল, আমি কাউকে খারাপ পরামর্শ দিই না। তুমি যদি আমার কথা ছিটোফোঁটা শোন, তা-হলে তোমার কল্যাণ ছাড়া অকল্যাণ হবে না।

সুযোধন একটু অস্বস্তি বোধ করল। তারপরেই হেসে বলল, আমাকে তুমি নির্বোধ এবং অভিমানী বলে ভাবলেও আমি ততটা নই। আমার অকল্যাণ হতে পারে এমন কোন কথা তুমি বলবে বা বলতে পার আমি স্বপ্নেও কল্পনা করি না। পাণ্ডবদের আর্জির সঙ্গে তুমি জড়িয়ে পড়লে কিন্তু দুঃখ পাবে। আমিও অকারণ কষ্ট ভোগ করব। অথচ, তোমাকে ব্যথা দেওয়ার ক্লেশটা আমি কিছুতে ভুলতে পারব না। আমার পরিতাপ শুধু বাড়বে তাতে। তাই, বিশ্বাস হারানোর আগে আমাকে তুমি বিচার কর। বোঝার চেষ্টা কর।

গান্ধারী নিজের মনের অভ্যন্তরে কথাগুলো বারবার পর্যালোচনা করে দেখল। পুত্র বলে, বাৎসল্যের আবেগ তাকে অন্ধ করল না। নিরপেক্ষ বিবেকের জ্বলন্ত আবেগে এক পরম সত্য তার ভেতরটা উদ্ভাসিত করল। তখন পুত্র সুযোধন নয়, যুধিষ্ঠিরের চেহারার ঋষিসুলভ ত্যাগ, সহিষ্ণুতা, সংযম, গাম্ভীর্য তার চিত্তকে আচ্ছন্ন করে রাখল।

গান্ধারী নিজের অন্যমনস্কতার গভীরে ডুবে গিয়ে ভাবতে লাগল, সুযোধন ছোট থেকে পিতামহ ভীষ্মের মতই বড় বেশি জেদী আর জঙ্গী। একবার যা মনে করবে তার আর নড়-চড় হয় না। সংসারে এই ধরনের একরোখা মানুষ শুধু অশান্তি সৃষ্টি করে। নিজেরাও সুখী হয় না, অন্যকেও সুখে থাকতে দেয় না। সুখ কী বস্তু এরা জানে না। শান্তি সুখ মানুষের জীবনে দুর্লভ জিনিস। এ সংসারে কেউ প্রকৃত সুখী নয়। শান্তি সুখ চেয়ে পাওয়ার জিনিস নয়। তবু ইচ্ছে থাকলে কিছু ত্যাগ আর সহিষ্ণুতার বিনিময়ে বোধ হয় জীবন থেকে শান্তি সুখ আদায় করে নেওয়া যায়। শান্তি সুখের পরিবেশ মানুষকে নিজের তৈরি করতে হয়। এবং তার জন্যে অনেক দাম দিতে হয় মানুষকে। সুখ-শান্তি একলার জিনিস নয়, যৌথ ব্যাপার। সকলের সহযোগিতা, সদিচ্ছা, উদারতা, মহানুভবতা, ত্যাগ, সহিষ্ণুতা, বিশ্বাস,. প্রীতি বন্ধনের ইচ্ছা শান্তি সুখের নীড় রচনা করে। একা যুধিষ্ঠির কিংবা কৃষ্ণ চাইলে তো শান্তি আসবে না। সুযোধনের সদিচ্ছা শান্তি প্রস্তাবের একটা বড় দিক।

একটা তিক্ত হতাশায় গান্ধারীর বুকের ভেতরটা ব্যথিয়ে উঠল। বড় শূন্য লাগে। নিজেকে বড় ব্যর্থ মনে হয়। পুত্রের প্রত্যাখ্যানে জননীর অন্তরটা অপমানে জ্বালা করে। ভেতরে ভেতরে সে দহনের কোন উপশম নেই। অথচ, কত বিশ্বাস ছিল সুযোধন তার বাধ্য ও অনুগত। তার কোন দাবিই সে প্রত্যাখ্যান করেনি। করবেও না। কিন্তু হঠাৎ মাতার ইচ্ছের সঙ্গে পুত্রের ইচ্ছের বিরোধ বাধল। রাজমাতা ও রাজার কর্তৃত্ব ও অধিকারের পৃথিবীটা যে আলাদা গান্ধারী প্রথম জানল। বোধ হয়, নিজের অজান্তে রাজার জগতে অনধিকার প্রবেশ করেছে। পুত্র বলে স্নেহবশে, পরম মঙ্গলাকাংখিনী হয়ে অবাঞ্ছিত পরামর্শ দিয়েছে রাজাকে। পুত্রের সঙ্গে জননী সত্তার এই ব্যবধানের কথা মনে পড়লে তার বুক ব্যথিয়ে ওঠে, শ্বাস দ্রুত হয়। একটা তিক্ত অভাব-বোধে বুকটা খাঁ খাঁ করতে থাকে। জননী না হলে এই কষ্টটা বোঝা যায় না। সন্তানের সঙ্গে মায়ের বিচ্ছিন্নতার একটা কষ্টকর অনুভূতিতে তার বুকটা টাটাতে লাগল। অথচ, এই সন্তান তার নাড়ীর সঙ্গে শ্বাসের সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা ছিল। তার শরীরের কোষ দিয়ে, রক্ত দিয়ে তার দেহ সৃষ্টি হয়েছিল। তারপর মুখের কথা নিয়ে কথা শিখল। তার বুক উজাড় করে দেওয়া সেই ধনের ওপর তার কোন কর্তৃত্ব নেই, দাবি নেই ভাবলে বুক ফেটে যায়। অথচ, যুধিষ্ঠির এখন কুন্তীর কথা শোনে। কুন্তীর পুত্র-গর্বের পাশে নিজেকে বড় দীন মনে হয়। আর, তখনই সমস্ত মনটা বিরূপ হয়ে ওঠে সুযোধনের ওপর। রাগ হয় অভিমান হয়।

সুযোধন এত বোঝে, এটুকু বুঝল না, যুদ্ধের কোন সমাধান হয় না। যুদ্ধ শুধু হিংসাকে উস্কে দেয়। যে পক্ষ হারে, তাকে গোপনে হিংসার ছুরি শানিয়ে তুলতে প্রশ্রয় দেয়। হিংসাই হিংসার শেষ। অথচ যুধিষ্ঠির কত সহজে হিংসার পথ পরিহার করল। সুযোধনের বিবেকের কাছে, তাদের ন্যায্য দাবির একখণ্ডাংশ মাত্র দাবি করল। মানবিক দাবি। আশ্রয়ের জন্যে, বসতির জন্যে, জীবন ও জীবিকার জন্যে একখণ্ড জমি চাই। ইন্দ্রপ্রস্থের বিনিময়ে তারা সেই জমির প্রার্থনা করেছে। শান্তি স্থাপনের জন্যে কত সামান্য প্রার্থনা! অধিকার দাবি করলে, ইন্দ্রপ্রস্থ ফেরত চাইলে যদি বিবাদ সৃষ্টি হয়, শান্তির পরিবেশ বিষিয়ে ওঠে, তাই দাম্ভিক দুর্যোধনের অনুগ্রহ, অনুকম্পা চেয়েছে। শান্তির জন্যে তাদের ত্যাগ, সহিষ্ণুতা, সংযম, উদারতা, মহানুভবতা, সদিচ্ছা গান্ধারীকে অবাক করল। বলতে কি, তাদের আন্তরিক উদ্যোগে সমস্ত মানুষের মন কেড়ে নিল। পৃথিবীর চোখে তারা বড় হয়ে উঠল। দেশের যারা প্রকৃত সুসন্তান হয়, তারা দেশের ও দশের স্বার্থ চিন্তা করে। তার জন্যে বৃহত্তর ত্যাগ করতেও কুণ্ঠিত হয় না। যে দেশ তার জননী, তার পরিবার, তার প্রতিবেশী সেই দেশের জন্যে তার কিছু মানবিক কর্তব্য আছে। সেটুকু না করলে মানুষের কোন গৌরব থাকে না। পাণ্ডবেরা এই বোধের সদ্ব্যবহার করে এক মহান আদর্শে বড় হয়ে ওঠল। কুন্তীও পুত্রদের এই গৌরবভাগী হল। এ কি কম কথা! ঈর্ষায় বুকের ভেতর চিন্ চিন্ করতে লাগল গান্ধারীর।

আজকাল নিজের ঘরেরই চুপচাপ বসে থাকে গান্ধারী। কিছু শীর্ণ হয়েছে ইদানীং। তবু সেই শীর্ণতায় তার ভেতরের জ্যোতি তাকে আরো দীপ্ত ও উজ্জ্বল করল। আজকাল সে ঘর থেকে বড় একটা বেরোয় না। চুপচাপ বসে বসে বিবশ হয়ে ভাবে।

যুদ্ধ যদি বাধে তার সব দোষ দায়িত্ব তো সুযোধনের। কারণ, এই যুদ্ধের সঙ্গে দেশ রক্ষার কোন সম্পর্ক নেই। এ হল তার অহংকারের যুদ্ধ। তার জেদের মূল্য বিশ্বশুদ্ধ মানুষ দেবে কেন? শান্তিপ্রিয় নিরীহ মানুষ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে---কেন হারাবে পিতাকে, জননীকে, স্ত্রীকে, সন্তানকে? কোন পাপে জনক-জননী হবে পুত্রহারা? কোন অপরাধে স্ত্রী বঞ্চিত হবে প্রেমে? সন্তান কেন হারাবে তার পিতাকে? কেন? কেন? এ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ কার স্বার্থে? লাভবান হবে কে? এই সব প্রশ্নে আকুল হল তার চিত্ত। যন্ত্রণায়, দুঃখে মুখ বিকৃত করল গান্ধারী। তার অন্তরের, তার সব যন্ত্রণার গভীর থেকে উৎসারিত হল দীর্ঘশ্বাস। হাহাকারের মত যা বাজল পাঁজরে পাঁজরে।

রাত যায় দিন আসে। সকাল হয়। সকালের নরমরোদ নবীনা তরুণীর মত উষ্ণ চুমু এঁকে দেয় পৃথিবীর সারা শরীরে। এক অদৃশ্য শক্তি প্রতিদিন নরম স্নিগ্ধ রোদের অপাপবিদ্ধ চোখের উৎসুক চাহনিতে, নিবিড় আশ্লেষে, মৃদুমন্দ মলয়ের উড়াল ছন্দে, পাখির সুরে এই পৃথিবীর নবজন্ম দিচ্ছে প্রতিদিন। সূর্যোদয়ে যদি পৃথিবী যদি নতুন করে বাঁচতে পারে, অন্ধকার থেকে আলোয় ফিরতে

পারে, তবে মানুষ সুযোধন পারবে না কেন জ্ঞানহীনতা থেকে জ্ঞানে প্রত্যাবর্তন করতে? কেন পারবে না? নিশ্চয়ই পারবে।

অজ্ঞাতবাস থেকে পাণ্ডবদের আত্মপ্রকাশের বিরুদ্ধে সুযোধনের অনেক অভিযোগ। অভিযোগগুলো একেবারে নিরর্থক নয়। যথেষ্ট যুক্তি আছে, সত্য আছে। তাকে হেলাফেলা করে দেখা নয়। মনোযোগের সঙ্গে নিরপেক্ষ চোখে কোন পূর্বধারণা না নিয়ে তার বিচার হওয়া দরকার। গান্ধারী সুযোধনের কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছিল বুকের অভ্যন্তরে। মাগো তুমি যা ভাবছ, ব্যাপারটা আদৌ তা নয়। ওরা বড় ধূর্ত। ওদের কোনটা সত্য আর কোনটা ছলনা তুমি টের পাবে না। এত ঠকলে তবু জ্ঞান হল না। দুর্জনকে বিশ্বাস কর না। যুধিষ্ঠিরের শান্তি প্রস্তাব সততার ছলনা। আন্তরিকতাও ভাঁওতা। গোটা মানুষকে ভঙ্গী দিয়ে চোখ ভোলানোর প্রয়াস। একটা পর্দার আড়ালে যুদ্ধের ইচ্ছেটাকে ঢেকে রেখে শান্তি শান্তি করছে। বন্ধু শিবিরে একটা বিরাট ভাঙ্গন সৃষ্টি করে আমার মনোবল ভাঙার সংকল্প তাদের।

গান্ধারী বলল, তোমার কথা শুনে আমার কান্না পাচ্ছে। এ অবিশ্বাস, সন্দেহ নিয়ে কেউ বাঁচতে পারে? সব কিছুকে যে অবিশ্বাস করে, অন্যে তাকে বিশ্বাস করবে কেন? অবিশ্বাস, সন্দেহ দিয়ে কোন ভাল কাজ হয় না। মনটাই শুধু অশান্তিতে ভরে থাকে। পুত্র মানুষকে শ্রদ্ধা করতে শেখ। তা হলেই বিশ্বাসে, ফিরতে পারবে।

সুযোধন একটু হেসে বলল, অকপট কথা বলার একটা দোষ আছে। জননীর কাছেও বোধ হয় সে দোষ এড়িয়ে থাকা যায় না। পৃথিবীর সব মা দাবি করে পেটের সন্তানকে সবচেয়ে বেশি জানে সে। তার দেখার কোন ভুল হয় না। কিন্তু বিচারে ভুল করে। এটাই দুর্ভাগ্য!

তুমি কী বলতে চাও?

সুযোধন গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলল। বলল : বলে কী লাভ? আমার কোন কথাই তো তুমি বিশ্বাস কর না। একটা মনগড়া বিশ্বাস নিয়ে তুমি এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছ। তোমাকে বোঝানোর চেষ্টা করা বৃথা। একটু ভাবলেই টের পেতে বনবাসের ত্রয়োদশ বৎসরটি পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাসে কাটল। গোপনে রাজনৈতিক প্রস্তুতি সুসম্পন্ন করল। দুর্বল ক্ষুদ্র মৎস্যরাজ্য হল তাদের আত্মগোপনের সবচেয়ে নিরাপদ জায়গা। কারণ ওখানে আছে আমাদের বন্ধু কীচক। কিন্তু সে সুরা আর নারীতে আসক্ত। তার চোখ ফাঁকি দিয়ে এবং শত্রুর কৌতূহলে ছাই দিয়ে নিশ্চিন্তে ওখানে বসেই কখন কীভাবে আত্মপ্রকাশ করা যায় তার এক ছক তৈরি করল পাণ্ডবেরা। বলতে পার আসন্ন যুদ্ধের খসড়াও ওখানে বসে করল। কিন্তু তাদের গোপন কার্যকলাপ বিরাট রাজের শ্যালক এবং সেনাপতি কীচক কেমন করে টের পেয়েছিল। ঘটনাটা ফাঁস হওয়ার ভয়ে তাড়াতাড়ি কীচককে সরিয়ে দেবার প্রয়োজন হল। লালনপ্রিয় কীচককে পাঞ্চালীর মোহপাশে বদ্ধ করে তারা খুব গোপনে এবং নিঃশব্দে তাকে হত্যা করল। এবং খুব সহজেই ঐ রাজ্যের দুর্বল বাজাকে কব্জা করে ফেলল। কীচক হত্যার ঘটনার সূত্র ধরেই আমরা টের পেলাম পাণ্ডবেরা বিরাট রাজ্যে আছে। কারণ, কীচককে যেভাবে হত্যা করা হয়েছিল, সেইভাবেই ভীম জরাসন্ধকে হত্যা করেছিল। তারপরেই মৎস্যরাজ্য আক্রমণ করলাম। ছদ্মবেশে পঞ্চপাণ্ডব বিরাট রাজের পক্ষে যুদ্ধ করে আমাদের প্রতিহত করল। এটা ছিল তাদের যুদ্ধের মহড়া। জেনেশুনেই তার কৌরবদের বুঝিয়ে দিল পাণ্ডবেরা দুর্বল নয়, তারা অবহেলার পাত্র নয়। তারা অদ্ভুত মারাত্মক যুদ্ধাস্ত্রে বলশালী। বনবাসে পাণ্ডবেরা কিছু হারায়নি। তাদের শক্তি ক্ষয় হয়নি। বরং তারা লাভবান হয়েছে। লোকচক্ষুর অগোচরে তেজ ও শক্তি সংগ্রহ করে আরো দ্বিগুণ তেজে জ্বলে উঠেছে।

গান্ধারী নীরব। তার মুখে কোন প্রশ্ন ছিল না। চুপ করে শুনছিল। আর বুকটা তার উথাল-পাথাল করছিল। ভিতরে ভিতরে ঘুণ পোকার মত কীট তাকে ক্ষয় করে চলল। অথচ তার কিছুই করার ছিল না। কিছু প্রশ্ন তার ঠোঁটে খেলা করল, কিন্তু উচ্চারণ করার মত অবকাশ হল না। সুযোধন কিন্তু এসব কিছুই দেখছিল না। শান্ত কণ্ঠে নির্বিকার ভাবে বলছিল : জান মা, এই যুদ্ধ বিরাট রাজ্যের জন্যে করেনি। তাদের আত্মপ্রকাশের স্বার্থে করেছিল। তাদের পুঞ্জীভূত, বিদ্বেষ, ক্রোধ, ঘৃণা, প্রতিশোধ স্পৃহার স্ফুলিঙ্গ জ্বলে উঠেছিল যুদ্ধে। এই হল কৌরব এবং তার অনুগতদের সতর্ক

এবং সাবধান করার ইঙ্গিত। তাদের উদ্দেশ্য যখন আমাদের কাছে গোপন থাকল না তখনই তারা আত্মপ্রকাশের সিদ্ধান্ত নিল।

একথায় খুব চমকে গেল গান্ধারী। এরকম একটা ধারণা অনেককে বলতে শুনেছে, কিন্তু ঘটনাটা কতখানি সত্য, তাতে তার নিজেরই সংশয় ছিল। কিন্তু তা নিয়ে পুত্রের সঙ্গে তর্ক করল না। গুম হয়ে রইল। অন্যমনস্ক চোখে চেয়ে রইল তার দিকে। চোখে তার গভীর শূন্যতার চাউনি। কিছুক্ষণ পর গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল : এতে তাদের অন্যায়টা কী হল?

শর্ত ভঙ্গ হল। অজ্ঞাতবাসের দিন পূর্তির আগেই তারা তাদের পরিচয় প্রকাশ করল। সত্যাশ্রয়ী যুধিষ্ঠির তা-হলে মিথ্যে বলেছে।

মিথ্যের আশ্রয় নিয়েছে। কিন্তু সত্য-মিথ্যে মেশানো এক অদ্ভুত যুক্তি। লোককে বিভ্রান্ত করার কৌশল। যখন দেখল, অজ্ঞাতবাসের গোপনীয়তা বিপন্ন, তখন জোতির্বিদ নকুল চান্দ্রমাস অনুসারে গণনা করে দেখল তাদের অজ্ঞাতবাসের দিন আগেই শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু সৌর মাসে হিসেব করলে অজ্ঞাতবাস শেষ হতে বাকি আছে আরো পাঁচমাস বারো দিন। পাণ্ডবদের এই ছলনাকে শান্তি স্থাপনের সৎ প্রচেষ্টা বলে ভাবব কেমন করে? রাজ্যলাভের আশা ছাড়েনি বলেই তারা পাঁচখানা গ্রাম চাইল।

গান্ধারী একটু অবাক হয়ে চেয়ে রইল সুযোধনের দিকে। একটা শ্বাস তার বুকে আটকে আঁকুপাঁকু করতে লাগল। আর সে চিত্রার্পিতের মত দাঁড়িয়ে মনে মনে নিজেকে এই প্রথম প্রশ্ন করল, এটা কি যুধিষ্ঠিরের সত্যচ্যুতি নয়? এতে কি বিশ্বাসে সন্দেহ সৃষ্টি হল না? সুযোধন যুধিষ্ঠিরের ছলনার রূপটাকে প্রকাশ করে কোন অন্যায় তো করেনি? তা-হলে, অন্তরে এই বিরূপতা এল কোথা হতে?

কয়েকদিন ধরে দোলাচল মনে যে প্রশ্নটা যাওয়া আসা করছিল তার একটা উত্তর যেন হঠাৎ পেয়ে গেল। আর, স্বস্তি সুখে ভরে গেল তার অন্তর। তার শরীরের কোষে কোষে সে তৃপ্তিটুকু ঘুঙুরের মত বাজতে লাগল। যুধিষ্ঠিরের রহস্যময় সত্যের পর্দাটা সরে যাচ্ছিল। তার আন্তরিকতার প্রতি যে অচল বিশ্বাস জন্মেছিল তাতে টান ধরল। তার সব আবেগ, অনুরাগ, আকর্ষণ যুধিষ্ঠিরের দিক থেকে এখন সুযোধনের দিকে ধাবিত হল।

নিজের ঘরে বসে গান্ধারী বিভোর হয়ে ভাবছিল। আর সুন্দর সকালটা একটু একটু করে মধ্যাহ্নের দিকে গড়িয়ে চলল। হেমন্তের রোদে তীব্রতা নেই। কেমন একটা মিষ্টি ভাব আছে। গান্ধারী কক্ষ-সংলগ্ন খোলা ছাদে দাঁড়িয়ে সারা গায়ে রোদ মাখল।

আজ শ্রীকৃষ্ণ আসছে হস্তিনাপুরে পাণ্ডবের দূত হয়ে। সকাল থেকেই তাই একটা ব্যস্ততা পড়ে গেছে। গোটা রাজপথটা সাজানো হয়েছে ফুলের মালা দিয়ে। সুযোধন বিদুরকে নিয়ে তাকে অভ্যর্থনা করতে গেছে। সুযোধন যে শান্তি চায়, যুদ্ধ চায় না এই সাগ্রহ উপস্থিতির ভেতর দিয়ে সেই সত্য প্রকাশ পেল।

মতান্তর যাই থাকুক, সুযোধন শ্রীকৃষ্ণকে শ্রদ্ধা করে। শ্রদ্ধা ছাড়া কোন সম্পর্ক তৈরি হয় না। সমস্ত সম্পর্কই শ্রদ্ধার ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। যেখানে শ্রদ্ধা নেই, ভালবাসা নেই, সেখানে আনুগত্যের বন্ধনও খুব শিথিল। কৃষ্ণের ভিতর দিয়ে কৌরব-পাণ্ডবের সেই সুসম্পর্ক গড়ে উঠবে। সম্পর্কটা একটা সূত্র ধরে জন্মায়। কৃষ্ণ সেই শুভ ফলের কারণ। তার রক্ষণাবেক্ষণকারীও বটে। কৃষ্ণ দু'পক্ষেরই পরম আত্মীয়। সুযোধনের সঙ্গে তার সম্পর্ক বৈবাহিকীর। সুতরাং সেই পারে ভ্রাতৃবিরোধের অবসান ঘটাতে। কৃষ্ণ বাগ্মী।

কৃষ্ণ মহান। কৃষ্ণ আশ্চর্য সুন্দর এক মানুষ। লোকের অন্তঃকরণের ভাষা বোঝে। মানুষকে তার ইচ্ছায় চালিত করার এক ঈশ্বর প্রদত্ত শক্তি আছে। শুধু তাই নয়, তার সান্নিধ্যটাই মানুষের অন্তরে লেগে থাকে। কৃষ্ণের কথা যত মনে হতে লাগল, গান্ধারী ততই আচ্ছন্ন হয়ে গেল! এই অনুভূতির উৎস কোথায় জানার কোন কৌতূহল বোধ করল না। কেবল এক গভীর প্রত্যাশায় তার ভিতরটা অধীর হয়ে গেল রইল। কারণ, তার ওপরে নির্ভর করছে কৌরব-পাণ্ডবের শেষ সম্পর্ক।

কৌরব-পাণ্ডব যুদ্ধের রাশ টেনে ধরতে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণও ব্যর্থ হল। গান্ধারীর শেষ আশাটুকু দপ্ করে নিভে গেল। কারো কাছে তার প্রত্যাশা করার কিছু রইল না আর। স্বপ্নভঙ্গের নিদারুণ কষ্টে বুকের ভেতরটা টাটাতে লাগল।

কটা দিন গান্ধারীর খুব অশান্তিতে কাটল। কিছু করারও ছিল না। কামনার বস্তু চোখের সামনে না থাকলে প্রত্যাশা ধীরে ধীরে কমে যায়। গান্ধারীর আর কোন স্বপ্ন নেই। তার ভিতরকার উদ্বেগ, অস্থিরতা ক্রমে স্তিমিত হয়ে এল। কিন্তু মনের কোণে স্বপ্নভঙ্গে গ্লানি লেগে রইল। যা মুছেও মুছল না।

চোখের ওপর দিয়ে অন্তহীন দিন বড় মন্থরগতিতে কাটতে লাগল। বড় ক্লান্ত, বিষণ্ণ লাগল। চোখ বুজে শুয়ে রইল। বেশ বুঝতে পারল, কেউ ঘরে এসে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল।

যুদ্ধের দামামা বেজে উঠল। শিবিরে এখন জোর প্রস্তুতি।

উদ্বেগে গান্ধারীর মনটা কেমন হয়ে গেল। দুরু দুরু বুক হাত দিয়ে চেপে ধরল। নিজেকেই প্রশ্ন করল, এত ব্যাকুলতা তার কিসের? সুযোধনকে ভরসা পাচ্ছে না কেন? অথচ ভারত রাজ্যে বেশির ভাগ রাজাই তার পক্ষে। এমন কি যাদবকুলের সাধারণ সেনাবাহিনীও সুযোধনের পক্ষে। তা-হলে ভয়টা কিসের? মাথার মধ্যে চিন্তার ঘূর্ণিঝড়। ভিতরটা তারে দুশ্চিন্তায় কেমন বোবা হয়ে গেল। একটা বিষাদ অনুভব করছিল। খুব গভীর বিষাদ। মনে হচ্ছিল, মনের এই ভার সে একা বইতে অক্ষম।

দুপুরে ভানুমতী খুব ভয়ে ভয়ে তার কাছে এসে বলল : ক'দিন ধরে তো দাঁতে কিছু কাটেন না। এবারে খাবেন চলুন।

গান্ধারী চোখ বড় বড় করে ভানুমতীর দিকে চেয়ে রইল। ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল। মাথা নাড়তে গিয়ে একটা গভীর ভারী শ্বাস পড়ল। ঠোঁট দাঁতে কামড়ে ভেতরের আবেগটা সামলানোর চেষ্টা করল। তারপর খুব ক্লান্ত স্বরে বলল : তোমরা পৃথিবীর গাছপালা, আকাশ, পাহাড়, নদীর মতই নির্বিকার। এত বড় একটা বিপদের জন্যে তোমাদের কোন উদ্বেগ নেই, দুর্ভাবনা নেই। কেবল আমি একা ভেবে মরছি। যত জ্বালা, যন্ত্রণা, উদ্বেগ শুধু আমারই, তোমাদের কিছু নয়।

ভানুমতী একটু হেসে বলল, আমরা কী ভাবব তা বুঝতেই পারছি না। যুদ্ধ তো আজ নতুন কিছু নয়। কত যুদ্ধই হয়েছে। প্রথম প্রথম ভাবনা হত, ভয় করত, এখন আর করে না।

গান্ধারী কিছুক্ষণ নীরব থেকে বলল, বৃদ্ধ হলে মায়া-মমতায় মনটা বোধ হয় দুর্বল হয়। আমি তো মনের ভার বইতে পারছি না। কিচ্ছু ভাল লাগছে না। তুমি যাও।

ভানুমতী বলল, আপনার খাবার তা-হলে এখানে পাঠিয়ে দিই। বেঁচে থাকতে হলে খেতে তো হবেই।

নয়

হিরন্ময়বতী নদীতীরে সন্নিকটস্থ অঞ্চল কুরুক্ষেত্র। ধূ-ধূ করছে বিস্তৃত প্রান্তর। প্রান্তরের দু'দিকে কৌরব ও পাণ্ডবের সৈন্য-শিবির স্থাপিত করল। গোটা অঞ্চলটা পতাকায় পতাকায় ছেয়ে গেল। বিচিত্র বর্ণের পতাকা বাতাসে পত্‌পত্ করে উড়তে লাগল। অশ্বের হ্রেষারবে, হস্তির বৃংহিতে, রথের ঘর্ঘর শব্দে, সৈন্যের কোলাহলে, তাদের পদশব্দে, অস্ত্রের ঝনঝনায় কুরুক্ষেত্র মুখর হয়ে রইল।

অগ্রাহায়ণ মাস।

কুয়াশা কেটে গেছে অনেকক্ষণ। বাইরেটা রোদে ঝলমল করছে। হিরন্ময়বতী নদীর স্রোতে গলন্ত রূপোর মত এসে মিলেছে। নীল উজ্জ্বল আকাশের গায়ে স্পর্ধিত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে কত বিশাল বিশাল গাছ। রোদের আলপনা আর আঁকিবুঁকি ছড়িয়ে আছে লাল কাঁকরে রাঙানো পথে। গাছের ডালে এক মাকড়সা অদ্ভুত দ্রুততায় জাল বুনে চলেছে। বনের ভেতর থেকে কুয়েব পাখি একা একা ডাকছে। তার গম্ভীর কণ্ঠধ্বনি হাহাকারের মত ছড়িয়ে পড়ছে বাতাসে। গাছের ছায়ায়

বসে রাখাল বালক নিজের মনে তন্ময় হয়ে আড়বাঁশি বাজাচ্ছে। আর বাঁশির সুরে তার বুকের ভেতর বেদনাই যেন সুরে গুঞ্জরিত হয়ে ওঠে। চারদিকের অবিচ্ছিন্ন নির্জনতার ভেতর তার বাঁশির সুর হাহাকারের মত শোনাল।

রথে যেতে যেতে গান্ধারী এইসব দৃশ্য ও শব্দ দেখল এবং শুনল। কেমন একটা অভিভূত আচ্ছন্নতায় আবিষ্ট হয়ে গেল তার চেতনা। রাখালের বাঁশির সুরে তার বুকের ভেতরটা মুচড়ে দিল।

সাঁ-সাঁ করে বাতাস কেটে যাচ্ছিল রথ। ক্রমেই বাঁশির সেই সুর ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হতে হতে চারদিকের নিথর স্তব্ধতার ভেতরে বিলীন হয়ে গেল। ক্লান্তি আর অবসন্ন হয়ে বসে রইল গান্ধারী।

কোন কিছুই তার ভাল লাগল না। কোন কিছুতেই মন ছিল না। দীর্ঘল চিত্রময় দৃশ্যগুলো তার চোখের তারায় শুধু লেগে রইল।

ভীষ্মের প্রাসাদ চত্বরে থামল রথ। গান্ধারীকে নামতে দেখে ভীষ্ম অবাক হল না। বরং, এরকম একটা কিছু হতে পারে এই প্রত্যাশা করেছিল।

গান্ধারী সম্মোহিতের মত ভীষ্মের কক্ষে প্রবেশ করল। ভীষ্মের দুই চোখের ওপর স্থির তার চোখ। থর থর করে উঠল তার বুকের ভেতর। সমস্ত সত্তার ভেতর কি যেন প্রলয় ঘটে গেল। ভীষ্মের পায়ের ওপর মাথা রেখে প্রণাম করতে গিয়ে হু-হু করে কেঁদে ফেলল। চোখের জলে ভীষ্মের দু'পা ভিজে গেল।

সস্নেহে দু'হাত ধরে ভীষ্ম তাকে টেনে তুলল। বসাল তাকে পালঙ্কে। আর মুহূর্তে বদলে গেল গান্ধারীর সেই বেদনা বিহুল বিষণ্ণ মূর্তি। আশ্চর্য একটা দৃঢ়তায় সহসা ঋজু হয়ে উঠে দাঁড়াল। সম্রাজ্ঞীর মত দৃপ্ত ভঙ্গী তার। ভীষ্মের চোখে বিস্ময়। অবাক স্বরে বলল, আমি জানতাম তুমি আসবে।

আচ্ছন্ন গলায় বলল, কেমন করে জানলেন!

প্রকৃতি যেমন করে জানতে পারে বসন্তের আগমন, তেমনি করে মন দিয়ে জানলাম। তারপরেই আশ্চর্য একটা আত্মপ্রসাদে আবিষ্ট হয়ে গিয়ে বলল, যুদ্ধে যাওয়ার আগে বৌ-মণি যে একবারে আসবে, এতো আমি জানি। আমার জানাটা যে মিথ্যে নয়, আমার যাওয়ার আগেই তুমি প্রমাণ করলে।

আসতে হল। না এসে পারলাম না। বড় আশা নিয়ে এসেছি। না করে আমাকে ফেরাবেন সে হতে দেব না।

ভীষ্ম হাসি হাসি মুখ করে বলল, এখনও তুমি আগের মত আছ। পৃথিবীর কত কী বদলে গেল, কিন্তু তুমি বোধ হয় একটুও বদলাওনি।

অনেক বদলেছি। এই বাড়িরা বৌ হয়ে যে গান্ধারী এসেছিল আমার ভেতর সেই গান্ধারী হারিয়ে গেছে। তার মনটাই মরে গেছে। গান্ধারীর বুকের ভেতর সেই কান্না শোনবার মানুষ নেই। থাকলে এ যুদ্ধ হত না।

ভবিতব্যকে ঠেকাবে কে?

পিতৃব্য, একে ভবিতব্য বলে না। মানুষ নিজেই এই দুর্ভাগ্যের স্রষ্টা। সকলে একটু চাইলে এ যুদ্ধ এখনও বন্ধ হয়।

ভীষ্ম গান্ধারীর অপ্রত্যাশিত বুদ্ধিদীপ্ত জবাবে একটু চমকে উঠল। মুগ্ধ দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে অপলক চেয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত। তারপর বলল, যুধিষ্ঠিরের উদ্যোগে, কৃষ্ণের মধ্যস্থতায়, কিংবা দ্বৈপায়নের সৎ-পরামর্শে যুদ্ধ বন্ধ হওয়ার মত পরিবেশ তৈরি হল কই? এঁরা তো সত্যিকারে চেয়েছিল, তবু যুদ্ধ বন্ধ হল কই?

মনপ্রাণ দিয়ে কেউ চায়নি। তাদের চাওয়ার ভাব ছিল অন্যরকম। তাতে আর যাই থাকুক, আন্তরিকতা ছিল না, বিশ্বাস ছিল না। ভঙ্গী দিয়ে চোখ ভোলানো গোছের একটা উদ্যোগ ছিল।

কিন্তু সুযোধন চেয়েছিল, একজন, মাত্র একজন কৌরব-পাণ্ডবের প্রকৃত শুভাকাঙ্ক্ষী হয়ে, আত্মীয় ও বন্ধু হয়ে নিঃস্বার্থভাবে শান্তির চেষ্টা করুক। কিন্তু হল না। গান্ধারী হঠাৎ ভারী বিষণ্ণ হয়ে গেল। বুকের ভেতর ব্যথিয়ে উঠল। ভিতরকার একটা ক্ষোভ দুঃখকে সামাল দিতে গিয়ে গভীর চাপা শ্বাস পড়ল। একটা আবেগ তাকে দুর্বল করে দিচ্ছিল। কান্না পাচ্ছিল। দাঁতে দাঁত টিপে রইল। বার দুই ঢোক গিলল।

কয়েকটা মুহূর্ত কাটল। শূন্য দৃষ্টিতে অন্য দিকে চেয়ে থেকে ভীষ্মকে বলল, অথচ কত আশা করেছিলাম যদুকুলপ্রদীপ শ্রীকৃষ্ণ কৌরব-পাণ্ডবের পরমাত্মীয় হয়ে সেই অসম্ভব কাজটাই সম্পন্ন করবে। যার সাম্য, প্রেম, মৈত্রী ও শান্তির নীতি সকলের প্রিয় ও শ্রদ্ধেয় হয়েছে সেই শ্রীকৃষ্ণ যখন মধ্যস্থতা করছে তখন কৌরব-পাণ্ডবের আর কোন বিরোধ থাকবে না। সুযোধন বহু প্রত্যাশা নিয়ে শ্রীকৃষ্ণকে উষ্ণ অভিনন্দন জ্ঞাপনের সব রকম আয়োজন করল। পথে যাতে কোন ক্লেশ না হয় তার জন্য পথে পথে পর্যাপ্ত বিশ্রামের জন্য মনোরম গৃহ, আহার, পানীয় এবং তদারকীর সুবন্দোবস্ত করল। আপনি নিজেও তার সঙ্গে যদুপতির অভ্যর্থনার সময় উপস্থিত ছিলেন। নিজের চোখেই দেখেছেন শ্রীকৃষ্ণ তার ভালবাসা, আন্তরিকতাকে কীভাবে অপমান করেছে? তার দেওয়া রত্ন, কামিনী, কাঞ্চন, উপঢৌকনাদি প্রত্যাখ্যান করল। অভ্যর্থনার জন্য যে এত আয়োজন সমারোহ করা হল যদুপতি তা চেয়েও দেখল না। আত্মীয়ের সঙ্গে সামান্য একটু সৌজন্যসূচক শিষ্ট ব্যবহারও করল না। এমন কি তার আতিথেয়তাকেও প্রত্যাখ্যান করল। শ্রীকৃষ্ণ চেয়েছিল এই যুদ্ধ হোক। তাই, সুযোধনকে অপমান, অসম্মান করা দরকার ছিল। সুযোধনের আগ্রহের সততাকে অবিশ্বাস করে, তার প্রতি সুগভীর বিশ্বাসকে সন্দেহ করে কৃষ্ণ নিজেই শান্তি স্থাপনের পথে কাঁটা হল। শান্তি স্থাপনের বড় কথা বিশ্বাস। বিশ্বাসের পরিবেশ গড়ে তোলেনি শ্রীকৃষ্ণ। পিতৃব্য আপনিও জানেন, দূতের কর্তব্য করেনি যদুপতি। তার কোন কাজই নিরপেক্ষ নয়। বিরোধ জিইয়ে রাখার মনোভাব নিয়ে সে হস্তিনাপুরে পাল্টা আক্রমণের প্রস্তুতি নিয়ে সে শান্তির দ্যুতিগিরি করতে কেউ আসে না। এসব জেনেও যদুপতি নিজে সে কাজ করল।

ভীষ্ম ম্লান একটু হেসে বলল, আমি জানি। শ্রীকৃষ্ণের অনুরাগী হয়েও বলব, সুযোধনের প্রতি তার যথেষ্ট অমনোযোগ এবং অবহেলা ছিল বলেই শান্তির পরিবেশ গড়ে উঠল না। অথচ, এতবড় কঠিন কাজটা একমাত্র সেই সম্ভব করে তুলতে পারত।

অবহেলা কার নয়? মহর্ষি দ্বৈপায়ন এসে তাকে খানিকটা গালমন্দ করলেন। তিনি উভয়ের পিতামহ। তবু পাণ্ডবদের সব ভাল, আর কৌরবদের সব খারাপ বলে বিরোধটাকে আরো জটিল করে তুললেন। সুযোধনকে দোষী সাব্যস্ত করে চলে গেলেন। পিতৃব্য, আপনি সুযোধনকে খারাপ ভাবছেন না তো?

ভীষ্ম একটু চমকে উঠল। কষ্টের সঙ্গে হাসল। কয়েবার ঠোঁট কাঁপল। গান্ধারীর মুখটা আরো একটু ভাল করে দেখল ভীষ্ম। তার চোখ দুটোয় কেমন একটা অস্বাভাবিক উজ্জ্বলতা। গান্ধারীর জিজ্ঞাসায় হঠাৎ একটা অতীত ঝলকে গেল তার মনের অভ্যন্তরে। শ্মশ্রুমণ্ডিত জটাজুটধারী ঋষি দ্বৈপায়নের মাংসল ভারী মুখখানা তার চোখের সামনে ভাসতে লাগল। এই মানুষটা যে কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধের কারণ এবং নেপথ্য নায়ক। সেকথা গান্ধারী জানে না। কেউ জানতে পারবেও না কোনদিন। কেবল সে জানে একা। লোকচক্ষুর আড়ালে, গোপনে এবং নিঃশব্দে তার ও দ্বৈপায়নের মধ্যে যে সংঘাতের সূচনা হয়েছিল অতীতে, কুরুক্ষেত্রের আসন্ন সংঘর্ষ তার পরিণাম। এই দ্বন্দ্বের বীজ সে ও দ্বৈপায়ন। কৌরব বংশের অভ্যন্তরে আর্য-অনার্য বিরোধের এক আবর্ত তৈরি হল। সে নিজের বীজ বপন করেছিল। অদৃষ্টের অদ্ভুত খেয়ালে তারা পরস্পরে ভাই সম্পর্ক। তাদের পিতা-মাতা এক নয়। গোষ্ঠী, বংশ, রক্ত আলাদা। তবু এক অদ্ভুত স্বার্থের পাশে তারা গাছের মত পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে। নিজের ভুলেই কৌরববংশের অভ্যন্তরের আর্য-অনার্য বিরোধের এক আবর্ত তৈরি হল। নিঃশব্দে সেই ঝড় কেন্দ্রীভূত হতে লাগল কৌরববংশে। দ্বৈপায়নের মাধ্যমে সৃষ্টি হল এক নতুন বংশধারা। এক নতুন প্রজাতির জনক সে। সিংহাসনের উত্তরাধিকারী নিয়ে তার ও দ্বৈপায়নের মধ্যে ঠাণ্ডা বিরোধের প্রথম সূত্রপাত। তারপর সেই শান্ত, নম্র, সংযত বিরোধের বিরোধের ক্ষেত্রটা

পাণ্ডুর সঙ্গে কুন্তীর বিবাহে কিছুটা জট পাকাল। কুন্তী দ্বৈপায়নের নিজের পছন্দ করা মেয়ে। এই বংশের সন্তানদের ওপর দ্বৈপায়নের কর্তৃত্বকে সে মেনে নিতে পারেনি। কারণ, পাণ্ডুর কোন ব্যক্তিত্ব নেই। কুন্তীই তাকে পরিচালনা করে। কুন্তীকে সামনে রেখে দ্বৈপায়ন হস্তিনাপুরের রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তার করছিল। তার প্রভাব কমানোর জন্যেই মদ্র রাজকন্যা মাদ্রীর সঙ্গে সে পাণ্ডুকে পুনরায় বিয়ে দিল। এতে তার নিজের জেদ ও কর্তৃত্ব বজায় থাকল। কর্তৃত্ব ও অধিকার নিয়ে তাদের দু'ভাইয়ের বিরোধ ও সংঘর্ষের সেই শুরু। তারপর বিরোধের ক্ষেত্রটা ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুকে ঘিরে আরো জটিল হয়ে উঠল। দুজনের কেউ নিরপেক্ষ থাকতে পারল না। বেশ বুঝতে পারছিল, লড়াইয়ের ক্ষেত্রটা তার ও দ্বৈপায়নের মধ্যে আর সীমাবদ্ধ নেই। ক্রমেই সেই ঝড়ের আবর্ত প্রসারিত হয়ে যাচ্ছিল এক বৃহৎ জটিল ভারত রাজনীতির মধ্যে।

ভীষ্ম কথা বলছিল না। কেমন একটা উদাস অন্যমনস্কতার গভীরে ডুবে আছে। শূন্য দৃষ্টি। দুই ভুরুর মধ্যস্থল কুঁচকে আছে।

ভীষ্মকে চুপ করে থাকতে দেখে গান্ধারীর খুব অভিমান হল। ভারী অস্বস্তিবোধ করতে লাগল। প্রশ্নটা এমন কিছু সাংঘাতিক নয়। তবু ভীষ্ম যেন তার জবাব খুঁজে পেল না। ভীষ্মের এই নীরবতার কোন অর্থ আছে বলে মনে হল না। কয়েকটা মুহূর্ত নিঃশব্দে কাটল। গান্ধারী মনে মনে সময়ের হিসেব করে নিয়ে আচমকা প্রশ্ন করল, পিতৃব্য আমার প্রশ্নের কোন জবাব পেলাম না। একটা কিছু তো বলবেন।

ভীষ্মের প্রস্তরবৎ আচ্ছন্নতা একটু চমকাল। নিজের মনেই হাসল। সস্নেহে গান্ধারীর দিকে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। একটুও দ্বিধা না করে বলল, বউমণি, নিজের মত চলতে পারার জন্যে দাম দিতে হয় অনেক। সুযোধনকে সেই দাম দিতে হচ্ছে।

জানি।

ভীষ্ম হাসি হাসি মুখ করে মাথা নেড়ে বলল, কিছু জানো না যে। রাজনীতিতে থাকলে বুঝতে পারতে, অনেক কিছু তুমি না চাইলেও, অনেক অন্যায়কে, অসত্যকে চোখ বুজে দেখতে হয় এবং প্রশ্রয় দিতে হয়। আজ অবস্থা এমনই হয়েছে যে, কেউ যদি বলে, সুযোধন কোন অন্যায় করেনি, দুর্নীতির আশ্রয় নেয়নি, অকারণে মিথ্যে বলেনি, অধর্ম করেনি, তাহলে বিশ্বাস করবে? তুমিও উত্তর জান না। অথচ এইসব অন্যের করা দোষের ভাগ নিতে হয় নিজের ঘাড়ে। সুযোধনকেও সেই বোঝা বইতে হচ্ছে।

ভীষ্মের কথাগুলো এত সহজ যে, গান্ধারীর বুকের ভেতরটা টনটন করে গিয়ে লাগল। একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল। মায়ের মন ব্যাকুল হল। উদ্বিগ্ন গলায় ডাকল, পিতৃব্য, এখনও বোধ হয় সময় আছে। চেষ্টা করলে হয়ত এই যুদ্ধ বন্ধ হয়। আমি বড় আশা নিয়ে এসেছি। আপনাকে একবার সন্ধির প্রস্তাব দিয়ে যেতে হবে। দু'পক্ষকে থামানো একমাত্র আপনার পক্ষেই সম্ভব।

ভীষ্ম একটু থমকে চেয়ে থাকল গান্ধারীর মুখের দিকে। তারপর হতাশায় আস্তে আস্তে মাথা নেড়ে বলল, বুড়ো বয়সে অপমান হলে বড় কষ্ট লাগবে।

গান্ধারী ভাষাহীন চোখে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকল। তারপর হতাশ গলায় বলল, একথা বলছেন কেন? আমি তো ফিরব বলে আসিনি পিতৃব্য।

বউমণি, এই যুদ্ধ নিয়ে বহু জল ঘোলা হয়েছে। এই যুদ্ধটা এখন আর কৌরব-পাণ্ডবের ভেতর নেই। গোটা ভারতবর্ষ এই যুদ্ধের শরিক। বিভিন্ন রাজ্যের স্বার্থ ও উদ্দেশ্য যুক্ত হয়ে পড়েছে এই যুদ্ধের সঙ্গে। কৌরব-পাণ্ডবের ভ্রাতৃবিরোধের ভেতর দিয়ে যুদ্ধটা প্রকাশ পাচ্ছে। কিন্তু তারা দু'জন এই যুদ্ধের দুটি বিবাদমান পক্ষ নয়। কৌরব-পাণ্ডবের ভ্রাতৃদ্বন্দ্বকে ভাঙিয়ে নিজ নিজ স্বার্থ নিয়ে লড়ছে। দু'পক্ষের রাজন্যবর্গ কৌরব-পাণ্ডবকে সবচেয়ে প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী বলে ধরে নিয়েছে।

গান্ধারী থম থমে মুখ করে চেয়ে রইল। দাঁতে দাঁত দৃঢ়বদ্ধ। কথা বলতে পারল না। ভীষ্ম খুব শান্তভাবে তার দিকে চেয়ে রইল। কিন্তু বুকের ভেতর একটা অস্থিরতা টের পাচ্ছিল। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, বাইরে থেকে অনেকরকম শোনা যায়। লোকে রটাতেও ভালবাসে। কিন্তু যে জানে সেই শুধু জানে। তুমিও বোঝার চেষ্টা করলে দুঃখ পাবে না। হস্তিনাপুরের সিংহসনে

কে বসবে, যুধিষ্ঠির অথবা সুযোধন যেই জিতুক তাকে তাদের কী লাভ? নিজের স্বার্থ এবং লাভালাভের প্রশ্ন না থাকলে এমন করে সর্বস্ব পণ রেখে মরণ-পণ কেউ লড়াই করে? তাই বলছিলাম, আমার কোন চেষ্টাই কাজে লাগবে না। সারাজীবন ধরে আমি এদের দেখে এসেছি। শত চেষ্টাতেও পাথর গলবে না, ভবিও ভুলবে না। সাম্য-প্রেম-মৈত্রীতে বিশ্বাসী কৃষ্ণ চাইলেই যে শান্তি আসত, তা যখন এল না তখন বুঝতে হবে কৃষ্ণও তাদের হাতের যন্ত্র। নিজের ইচ্ছেয় চলার স্বাধীনতা তার ছিল না। তাই, লোক দেখানো একটা শান্তির চেষ্টা করেছিল। বিপক্ষদলের স্বার্থ রক্ষা করতে অত্যন্ত অবহেলায় শান্তির পরিবেশ বিষিয়ে তুলল। কিন্তু তার সব দায়টা সুযোধনের ওপর দিয়ে তারা নির্দোষ সেজে রইল।

গান্ধারী দু'চোখে বিস্ময়। স্তব্ধ হয়ে একদৃষ্টে চেয়ে ছিল ভীষ্মের দিকে। শরীরের ভেতর গভীর অবসাদ টের পাচ্ছিল। বড় ক্লান্তি লাগল। মাথাটা ঘোলাটে। সে কিছু ভাবতে পারছিল না। শুকনো ঠোঁট জিব দিয়ে ভেজানোর চেষ্টা করল। ব্যর্থতাবোধের, বির্বণ, বিষণ্ণ হাসি ওষ্ঠা প্রান্তে ফুটে উঠল। দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, তবু, একবার শেষ চেষ্টা করে দেখতে দোষ কি? মহৎ কাজে নিজেকে উৎসর্গ করে ব্যর্থ হলেও অপমান হয় না। শ্রীকৃষ্ণের উদ্যোগে সততা না থাকলেও শান্তি প্রস্তাবের ব্যর্থতায় তার চরিত্রের গৌরব কিছু কমেনি। বরং উজ্জ্বল হয়েছে।

গান্ধারী কথাগুলো ভীষ্মকে চমৎকৃত করল। কয়েক নিমেষে জন্য তার ভেতরের স্পন্দন স্তব্ধ করে দিল। যেন বা থেমে গেল রক্তের প্রবহমানতা। ভীষ্মের সব কথা হারিয়ে গেল। কয়েকটা মুহূর্ত চুপ করে ভাবল। বিস্ময় বোধ স্তিমিত হলে বলল, বুঝলাম। কিন্তু যুদ্ধের আর কয়েকদিন মাত্র বাকি। দু'পক্ষে সমান উত্তেজনা। এখন কিছু হবে বলে বিশ্বাস হয় না।

কেন হবে না?

আমি তো আর নিরপেক্ষ নই। বিপক্ষদল আমাকে বিশ্বাস করবে কেন? এই প্রস্তাবে তারা হাসাহাসি করবে। টিটকারি কাটবে। অবিশ্বাস করবে। আমার সৎ-উদ্যোগকে তারা যুদ্ধের সময় হরণের কৌশল বলে সন্দেহ করবে। কাজেই বৃদ্ধ বয়সে আমাকে আর এসব কূট সন্দেহের মধ্যে জড়াও কেন? তবে, তোমার প্রস্তাব নিয়ে কিছু একটা করব। কিন্তু অনুনয়-বিনয় করে নয়। মাথা উঁচু রেখে পাণ্ডবপক্ষকে সতর্ক সাবধান করে তাদের শুভবুদ্ধি উদ্রেকের চেষ্টা করব। তাদের বোঝাব কৌরবপক্ষে করুণা কিংবা ভিক্ষা চাইতে আসিনি। এই যুদ্ধ বন্ধ করার জন্যে তাদেরও কিছু সামাজিক দায়িত্ব ও মানবিক কর্তব্য আছে। কৌরবেরা কারো ওপর যুদ্ধ চাপিয়ে দিতে চায় না। যুদ্ধ যখন একেবারে অবশ্যম্ভাবী হবে তখনই তারা যুদ্ধ করবে। অসম শক্তি নিয়ে কৌরবেরা পাণ্ডবদের পরাভূত করতে চায় না। পাণ্ডবেরা ভেবে দেখুক, এই অসমযুদ্ধ তারা করবে কি না? অষ্টাদশ অক্ষৌহিনীর মধ্যে শুধু কৌরবদের একাদশ অক্ষৌহিনী। ভারতবর্ষের রাজন্যবর্গের সমর্থন তাদের পক্ষেই বেশি। এমন কি পাণ্ডবের পরম আত্মীয় মদ্ররাজ শল্য এবং বান্ধব যাদব রাজ্যের একটা বড় অংশ কৌরবপক্ষে যোগ দিয়েছে। পাণ্ডবের অভিন্ন-হৃদয় বলরাম এই যুদ্ধে পাণ্ডবপক্ষ ত্যাগ করছে। এই অন্যায় যুদ্ধের সঙ্গে কোনরূপ সম্পর্ক বলরাম রাখতে অনিচ্ছুক বলেই দ্বারকা ত্যাগ করছে। অস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্য প্রিয় শিষ্য অর্জুনকে ত্যাগ করে কৌরবপক্ষবালম্বন করেছেন। সুতরাং, সময় থাকতে পাণ্ডবপক্ষে শুভবুদ্ধির উদয় হলে এক বিরাট রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে বহু হতাহত থেকে ভারতবর্ষ রক্ষা পায়। মানুষের ও জগতের মঙ্গল ও কল্যাণের কথা ভেবেই যুধিষ্ঠির এবং শ্রীকৃষ্ণের উচিত কপট চক্র পরিহার করে এক সম্মানজনক শান্তি প্রস্তাবে রাজি হওয়া। আমার নিজের দায়িত্বে সুচতুর বুদ্ধিমান, কূটজ্ঞ উলূককে পাণ্ডব শিবিরে পাঠাব। তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে ফিরে যাও।

পিপাসার্তের মত গান্ধারী মুগ্ধ চোখে ভীষ্মের দিকে চেয়েছিল। গভীর শ্বাস ফেলে বলল, বাঁচালেন পিতৃব্য। কৃতজ্ঞতাবোধে গান্ধারীর দু'চোখের পাতা নিবিড় হয়ে এল।

যুদ্ধের কথা ভাবলে মনটা খুব খারাপ হয়ে যায় গান্ধারীর। তাই, এসব কথা একেবারে ভাবতে চায় না। মনে হলে বুকের ভেতর ঝড় ওঠে। সুযোধন ঠিকই বলে, ভণ্ডামি করে, বুজরুকি করে

যারা শান্তি শান্তি করে তারা কাচের শান্তি গড়ে, ইস্পাতের নয়। শকুনিও বলে, ভারতবর্ষের রাজনীতিতে এখন কাক-শকুনের ভিড়। এরা মড়ক চায়। রক্তে স্নান না করলে এই কাক শকুনের পেট ভরবে না। কথাগুলো ভীষণ সত্য। নির্ভেজাল এবং সরল সত্য। গান্ধারীও তা বুঝতে পারে। কর্ণের কথাগুলো আরো মজার। পৃথিবীটাই বদলে গেছে মানুষের পাল্লায় পড়ে। যেভাবে বদলালে পৃথিবীর ভাল হত, বোধ হয় সেভাবে বদলায়নি। মানুষের স্বভাবও চরিত্রের মত বদলেছে।

গান্ধারীরও মনে হয়, হয়ত হয়েছে। হয়ত কেন নিশ্চয়ই হয়েছে। পৃথিবীতে শুধু অশান্তিই থেকে গেল। কুচক্রী লোভী মানুষের জন্য থাকবেও বোধ হয় চিরকাল। দুর্যোধন তাই তাকে বোঝানোর জন্যে কতবার বলেছে, শান্তি জিনিসটা কখনও নরম মানুষের জন্যে নয়। বিচারে অস্ত্রশক্তিই শান্তিরই উৎস। শান্তির জন্যে যুদ্ধের হুংকার যেমন জরুরী, তেমনই যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হতে হয়। যুদ্ধই শান্তি, শান্তিই যুদ্ধ। এইসব পরস্পর-বিরোধী কথায় গান্ধারীর বুকের ভেতরটা তোলপাড় করে। কত চেষ্টা করে এসব কথা থেকে মনটাকে মুক্ত ও পরিচ্ছন্ন রাখতে। কিন্তু কিছুতে হয় না। নিজের অজান্তে মনে পড়ে। আসলে যারা একটু ভাবাবেগসম্পন্ন, কিংবা ভাবাভাবি করে; নানা ভাবনাই আসে তাদের মনে। এসব কথায় মনে বড় ক্ষোভ জমে।

সুযোধনের 'মা' ডাক শুনে হঠাৎ একটু চমকে উঠেছিল গান্ধারী। তার ঐ ডাকটা শুনলেই মনটা খুশিতে ভরে যায়। কে জানে? কী থাকে কী আছে তার গলার স্বরে। কিন্তু আজ প্রথম বিরক্ত বোধ করল। গান্ধারী তাই একটু অবাক হল।

সুযোধনের সুন্দর পুরুষালি গলা ভেসে এল ঘরের বাইরে থেকে। ক্লান্ত গলায় সাড়া দিল, কী? কী হল?

কী হয়নি? আমার সম্মানের চেয়ে তোমার কাছে শান্তি ভিক্ষে চাওয়া বড় হল। উলুক শুধু শুধু তোমার জন্যে অপমানিত হয়ে ফিরল।

এমন করে বলছ যেন, আমার নিজের জন্যে চেয়েছি।

চাওয়ারও একটা নিয়ম আছে। কিন্তু মেয়েমানুষ বড় কাঙাল। চাওয়াটাই তাদের স্বভাব। তোমরা যখন ভিখিরী হও তখন তোমাদের আত্মসম্মানজ্ঞান লোপ পায়। আত্মম্মানজ্ঞান আর ভিক্ষে চাওয়া এই ব্যাপার দু'টো একসঙ্গে হয় না।

গান্ধারী বেশ একটু ক্ষুণ্ণ হয়ে ঝংকার দিয়ে বলল, এসব কথার মানে কী। কী বলতে চাও?

একবার শান্তির পরিবেশ বিষিয়ে গেলে আর যে শান্তি ফিরে আসে না, কি তুমি বোঝ না? তোমার কী দরকার ছিল ছিল পিতামহকে দিয়ে উলুককে পাণ্ডব শিবিরে পাঠানো? তুমি কিন্তু কাজটা একটুও ভাল করনি।

আমি তুমি কেউ বিচারক নই। ইতিহাস তার বিচার করবে। তবে, সব কাজের পেছনে প্রত্যেকের একটা ভাবনা, পরিকল্পনা থাকে। আমারও ছিল। আমি কোন ভুল করিনি। উলুক ফিরে আসবে আমি জানতাম। তবু তাকে পাঠালাম।

কেন পাঠালে? পাঠিয়ে লাভ কী হল ?

প্রত্যেক লাভের হিসেব তো আলাদা আলাদা। লাভ যে একেবারে হয়নি তা নয়। পৃথিবীর মানুষের জানাটা তাতে একটু এলোমেলো হয়ে গেল। ঘেন্নায় হলেও স্বীকার করতে হবে সুযোধন যুদ্ধবাজ নয়, সে সত্যিই যুদ্ধ চায় না। তার ওপর কৌশল করে যুদ্ধটা চাপিয়ে দেওয়া হল। ফল যাই হোক, অপবাদের বোঝাটা তো একটু হাল্কা হল। কৌরবেরা আগামীকালের ভরসা এবং প্রত্যাশার জন্যে কিছু করেনি, পারিবারিক ও মানবিক সম্পর্ক হত্যা করেছে; নিন্দুকের এই অপ্রীতিকর আলোচনায় তো বাদ সাধা গেল। এও এক ধরনের লাভ।

সুযোধন বিস্ময়ে একটু হতবাক হয়ে গেল। তার দুই চোখ গান্ধারীর চোখের ওপর স্থির। মৃদু হেসে বলল, এই সুন্দর পৃথিবীতে তোমার মত মানুষেরই বাঁচার অধিকার আছে। কিন্তু তোমাদের সেই বাঁচার পৃথিবীটা লোভ আর লাভের হিসাব কবে আমরা নোংরা করে দিয়েছি। মহৎ মানবিকবোধের কোন মূল্য নেই। মানুষের চরিত্রে ঘুণ ধরে গেছে। চরিত্র আর সম্ভ্রান্ততাকে কুরে কুরে খেয়ে গেছে

মানুষের চালাকি, ভঙ্গীসর্বস্ব লোক ঠকানোর কৌশল। তাই এত তাপ জমে উঠেছে। বিবাদে, বিদ্বেষে, বিরোধে ভরে গেছে মানুষের ঘর। কিন্তু প্রকৃতির ঘরে শান্তি আছে, সুখ আছে, বিশ্বস্ততা আছে। একটুও তা নষ্ট হয়নি। আর মানুষের ঘরে শুধুই শূন্যতার হাহাকার। লোভের ময়াল সাপ তাকে টানছে। তোমার ভালবাসায় ভরপুর প্রাণ দিয়েও পারবে না, শূন্যতাকে ভরে তুলতে। শুধু শুধু অপমান হবে। নিজের মত করে ভাবো, কিন্তু পরিবৃত হয়ে থাকার চেষ্টা কর না। একা থাকো।

সুযোধনের কথা শুনে গান্ধারীর বড় কষ্ট হচ্ছিল। আক্ষেপ করে বলল, পৃথিবীতে মানুষের ঘরটা সত্যিই নষ্ট হয়ে গেছে। স্বপ্নের পৃথিবীতে মানুষের ঘর নষ্ট হয়ে গেলে কী নিয়ে থাকবে? কী নিয়ে বাঁচবে মানুষ?

পৃথিবী মরে না। মৃত্যু-জন্ম, ধ্বংস ও প্রলয়ের মধ্য দিয়ে সে আবার নবীন হয়ে ওঠে। যুদ্ধের মারণনৃত্যে পৃথিবী কখনও নষ্ট করে দেয় না; তাকে ধ্বংসও করে না। এক বিরাট ক্ষয়ক্ষতি মৃত্যুর মূল্যে পৃথিবী আবার নতুন হয়। পৃথিবীর স্বাস্থ্য ফেরাতে, মালিন্য ঘোচাতে জরা-মৃত্যুর মতই যুদ্ধ আসে। যুদ্ধ ভয়ের কিছু নয়। যুদ্ধ জীবনের আশীর্বাদ। যুদ্ধে জীবনের কল্যাণ হয়। যুগান্তরের সূচনা করে। কিন্তু আমার বুকটা যে কেমন করে। দিন যত কমে আসে ততই মনে হয়, আমার কি যেন চুরি হয়ে গেল। সব কিছু হারিয়ে বোধ হয় নিঃস্ব হয়ে যাব।

মা, এত ভেঙে পড়লে চলে? তুমি দুর্বল হয়ে পড়লে কে আমাদের শক্তি, সাহস, উৎসাহ দেবে? তোমার চোখে আগুন দেখলে তবেই তো বীর্যে, তেজে জ্বলে উঠবে আমার ভেতরের শক্তি। তুমি আমার শক্তিময়ী দেবী, আমার আরাধ্যা শক্তি। আশীর্বাদে আমাকে ধন্য কর জননী।

গান্ধারী সুযোধনের মাথা আঘ্রাণ করল। বুক ভরে পুত্রকে আদর করল। চোখের জলে বুক ভাসল। গান্ধারীর সহসা মনে হল, ঐ অশ্রুস্রোতে তার বুকের স্নেহ শতদল ভেসে গেল। অমনি বুকের ভেতর হাহাকার করে কান্না নামল। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদল অনেকক্ষণ। সুযোধন বাধা দিল না। কারণ কান্না মানুষকে নবীকৃত করে।

গান্ধারী ভাবাবেগ সংযত করে আস্তে আস্তে অস্ফুট স্বরে বলল, মিথ্যের ধ্বংস হোক। সত্য ও ধর্মের জয় হোক। ধরিত্রীতে শান্তি আসুক ফিরে।

সুযোধন জননীর পদধূলি গ্রহণ করে বলল, মা, আমাকে আলাদা করে কিছু বলবে না?

গান্ধারী অসহায় দৃষ্টিতে পুত্রের মুখ নিরীক্ষণ করল। ঠোঁট দুটি থর থর করে কেঁপে গেল। দাঁতে দাঁত দিয়ে ভেতরের কান্নাটকে চেপে ধরল। কষ্টে কয়েকবার ঢোক গিলল। একটু দম নিয়ে ক্লান্ত গলায় বলল, পুত্র, ইচ্ছে তো কত কিছুই করে। কটি ইচ্ছে আর পূর্ণ হয় বল? ইচ্ছের কথাটা অন্তর্যামী জানেন। সে কথা বলতে বিবেকে লাগে। বিবেক বিবশ হলেই তবে বলা যায়। এই পৃথিবীতে জয় হয় শুধু মিথ্যের আর ভণ্ডামির। আমি কোনদিন ভণ্ড হতে শেখাইনি তোমাদের। অথচ দেখছি জয়ী হবার সহজ উপায় বিবেকহীন হওয়া। জননী হয়ে আমি কেমন করে উচ্চারণ করি সে কথা। আমি তো কুন্তী নই। তাই আবার বলছি, মিথ্যের ধ্বংস হোক। সত্যের জয় হোক। তুমি মিথ্যে-জয়ী হও। সত্যের জন্য, ধর্মের জন্য যদি পরাজয়ও হয় তবু অধর্ম কর না। এও জানি, মিথ্যের ধ্বংসের জন্য মানুষকে অনেক মূল্য দিতে হয়। এক জীবনে তার দেনা শোধ হয় না। অনেক জীবন ধরে অনেক মূল্য দিতে হয়। তাই তো এত ভয়ে-ভয়ে থাকি।

এত ভয় কিসের?

হারানোর।

কৌরবপক্ষের জয় পাণ্ডবপক্ষকে হতাশ এবং বিমর্ষ করল। ভীষ্ম প্রতিদিন বিপুল সংখ্যক সৈন্য বধ করছে। অভিযানের সাফল্যের, আক্রমণের সার্থকতায়, জয়ের উন্মাদনায় কৌরব শিবির মুখর।

সঞ্জয়ের প্রতিদিনের কাজ হল যুদ্ধের সর্বশেষ বার্তা মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে শোনানো। তার বর্ণনার গুনে কুরুক্ষেত্রের সমরক্ষেত্র ধৃতরাষ্ট্রের কল্পনায় ছবি হয়ে ওঠে। কৌতূহলই বোধ হয় চোখের একটা

বিশেষ দৃষ্টি দেয়। তাই, ধৃতরাষ্ট্রের মনে হত চোখের সামনেই সে যুদ্ধ আর যুদ্ধক্ষেত্রটা দেখছে। দেখছে ভীষ্মের পরিচালনায় সৈন্যবাহিনী বীরের মত নির্ভয়ে মরছে এবং শত্রুসৈন্য মারছে। তাদের জোরাল আক্রমণের সামনে পাণ্ডবসৈন্য ছত্রভঙ্গ হয়ে প্রাণভয়ে পালাচ্ছে। ধৃতরাষ্ট্র কল্পনায় দেখছে, কৌরবপক্ষের সৈন্যরা তাদের তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। অনাবিল একটা সুখ ও আনন্দে ধৃতরাষ্ট্রের আত্মবিস্মৃতি ঘটল। সেও উত্তেজনায় হইহই করে উঠল।

কৌরবপক্ষের সাফল্য ও কৃতিত্বের গৌরবতৃপ্তি সুগন্ধের মত ধৃতরাষ্ট্রের মন ছেয়ে রইল। কেমন একটা আচ্ছন্নতার মধ্যে থাকত সেই মুহূর্তটা। সুখ ও আনন্দটা স্থায়ী হয়ে গেলে মানুষ বোধ হয় নিজেকে গোপন রাখতে পারে না। তাই, সঞ্জয়ের সামনেই তার উচ্ছ্বাস, কৌতূহল, আনন্দ প্রকাশ হয়ে পড়ত।

কিন্তু গান্ধারী থাকত ভীষণ নীরব এবং নির্লিপ্ত। তার কোন বাহ্য অভিব্যক্তি ছিল না। বুকের অভ্যন্তরে ছিল তীব্র প্রতিক্রিয়া। মনের গভীরে সুখ ও আনন্দের সঙ্গে মিশে ছিল গভীর বিষাদ। এই বিষাদে তার মনের সুখ আনন্দ কুরে কুরে খেল। মিথ্যের এতবড় বিপর্যয়, ধ্বংস এক জীবনে হয়, এই বিস্ময়টা তার কিছুতে কাটছিল না। কিন্তু রণক্ষেত্রে বহু বহু মানুষের মৃত্যুর চিন্তা এবং তাদের শোকসন্তপ্ত পরিবারের পরিজনদের দুঃখ, হাহাকারের কথা ভেবে গান্ধারী স্বস্তি পাচ্ছিল না। ওদের কষ্টটাই তার বুকে বিঁধছিল।

যুদ্ধের নবম দিন হয়ে গেল। ফলাফলের কোন পরিবর্তন হল না। বরং পাণ্ডবপক্ষের পরাজয়টা দিন দিন নিদারুণ হল। মিথ্যের পরাজয়, সত্য ও ধর্মের জয় দেখেও পাণ্ডবেরা অবিচল। তাদের মনোবল কিংবা আত্মবিশ্বাসে এতটুকু চিড় ধরল না। সন্ধি কিংবা আত্মসমর্পণের কথাও ভাবল না। প্রতিদিন নির্বিকার ভাবে বিক্রমের সঙ্গে, তেজের সঙ্গে, প্রত্যয়ের সঙ্গে যুদ্ধ করল। এই শক্তির উৎস কোথায়? গান্ধারী নিজেকে প্রশ্ন করল। কিন্তু উত্তর খুঁজে পেল না। অথচ প্রত্যেক মানুষ কোন কিছুর প্রত্যাশা নিয়েই জীবন-পথ চলে। প্রতিদিনের প্রচণ্ড ব্যর্থতার পরে পাণ্ডবেরা কেমন করে প্রত্যাশা করে এ যুদ্ধে তারা জয়ী হবে? যুধিষ্ঠির নিজেও জানে না বোধ হয় জয় আকাঙ্ক্ষা তাকে শুধু নিষ্ঠুর করছে।

যুধিষ্ঠির ভুল করতে পারে। কিন্তু পান্ডব-সখা কৃষ্ণের তো ভুল হবার কথা নয়। সব দিকে তাঁর নজর। তবে, তিনি কী ভাবছেন? মানুষের এত বড় সর্বনাশ দেখেও শ্রীকৃষ্ণ নীরব কেন? তার এই নীরবতাই গান্ধারীকে ভাবিয়ে তুলল। এর কি কোন অর্থ আছে? কাকেই-বা জিজ্ঞেস করে উত্তরটা জানবে? সব প্রশ্ন ছাপিয়ে গান্ধারী চোখের তারায় কৃষ্ণের মুখ ভেসে উঠল।

শ্রীকৃষ্ণের এই চোখ বুজে থাকা নীতি গান্ধারীর ভাল লাগল না। যত অপমানই হোক, সত্যকে অকপটে স্বীকার করলেই হত। চোখ বন্ধ করে থাকার জন্যে প্রতিদিন কত লোক মরছে, কত ঘর ভেসে যাচ্ছে। কত মা সন্তান হারাচ্ছে, কত বধূ স্বামী হারাচ্ছে, কত সন্তান পিতাকে হারাচ্ছে। এদের হৃদয় মথিত দীর্ঘশ্বাস আর হাহাকারে কুরুক্ষেত্রের বাতাস ভারী হয়ে ওঠছে। নদী চঞ্চল হয়ে উঠেছে, গাছ উতলা হয়ে ওঠেছে। তবু শ্রীকৃষ্ণের বুকে এক ফোঁটা করুণা কিংবা মমতা জাগল না। অথচ পাণ্ডবেরা বলে মানুষকে প্রেম দিতে এসেছে কৃষ্ণ। মানুষের ভালবাসার কাঙাল সে। এই কি তার মানবপ্রীতির নমুনা? মানুষের সর্বনাশ দেখেও তার হৃদয় গলল না! অন্তরে ছিটেফোঁটা সহানুভূতি পর্যন্ত জাগল না। প্রেমের কাঙাল কৃষ্ণ এমন পাষাণ হল কেমন করে?

কৌরবপক্ষের সেনাপতি পিতামহ ভীষ্মের প্রাণ ফেটে যাচ্ছে স্বজন হারানোর কান্নায়। প্রতিদিন এত মানুষ হত্যায় তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়ছেন। এই বীভৎস হত্যাদৃশ্য সইতে পারছেন না। অনুতাপ, অনুশোচনায় তাঁর হৃদয় বিদীর্ণ হচ্ছে। কার মঙ্গলের জন্য এই নিষ্ঠুর নরমেধ যজ্ঞ? মৃত সৈনিকদের মেদের ওপর কোন নতুন মেদিনী জন্ম নেবে? মানুষকে সেই নতুন পৃথিবী কি দেবে? কোন্ নতুন প্রত্যাশা সৃষ্টি করবে আগামী প্রজন্মের কাছে? এই সব প্রশ্নে ভীষ্মের হৃদয় মথিত হতে লাগল। মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে যুদ্ধের প্রতি ক্রমে বিতৃষ্ণ হয়ে পড়ল। রক্তাক্ত সংগ্রামে অনীহা এল। এই মন নিয়ে, ভীষ্ম আর কতদিন যুদ্ধ করবে? যে মানুষ নিজের সঙ্গে প্রতিমুহূর্ত যুদ্ধ করছে

তার পক্ষে এই যুদ্ধ বেশিদিন চালিয়ে যাওয়ার মত শাস্তি আর নেই। গান্ধারীর চোখে ভীষ্মের মুখখানা ভাসতে লগাল। সকৌতুকে তার দিকে তাকিয়ে ভীষ্ম যেন বলছে : বৌমণি, প্রতিটি মুহূর্তের জাগ্রত সত্তা কেবল যুদ্ধ করে, নিধন করে, জয় করে। রাতের অন্ধকারে শুধু যুদ্ধের কথা, নিধনের কথা ভাবি, যুদ্ধক্ষেত্রের দৃশ্য দেখি। যুদ্ধ ছাড়া কোন কাজ নেই, চিন্তা নেই। শ্রান্তিতে দু'চোখের যখন নিবিড় ঘুম নেমে আসে তখনও আহত মানুষের কাতর আর্তনাদ, মৃত্যুর শারীরিক যন্ত্রণজনিত আর্তস্বর কানে বাজে। চমকে ঘুম ভেঙে চিৎকার করে উঠি। আমার আর যুদ্ধ করতে ইচ্ছা নেই। আমি ক্লান্ত। শৌর্যবীর্যের গৌরব নিয়ে রণক্ষেত্রে বীরের মতই মরতে পারলেই আমি খুশি। ঈশ্বরকে মনে মনে বলি, এই অভিশপ্ত কুলক্ষয়ী যুদ্ধের সব ঋণ আমার মৃত্যু দিয়ে শোধ হোক। আমার ভুলের প্রায়শ্চিত্ত আমাকে করতে দাও। অভিশাপের শেষ হোক। শান্তি আসুক নেমে।

ভীষ্মের মুখে এসব কথা শোনা থেকে গান্ধারীর মনটা ভাল ছিল না। তার নিজের মনেই অতৃপ্তি। ভীষণ অতৃপ্তি। এই অতৃপ্তির কোন নাম নেই। কারণ, এটা বোধ হয় খুব স্বাভাবিক জিনিস নয়। বিবেকহীন হতে না পারার কষ্ট। সুযোধন তার দোলাচল মনকে শান্ত করতে কতবার সান্ত্বনা দিয়েছে, যুদ্ধ নরম মানুষের জন্যে নয়; বিবেকবান মানুষের জন্যে তো নয়ই। যুদ্ধে আঘাত দেওয়া এবং আঘাত পাওয়ার জন্যে মনকে তৈরি করতে হয়। যাদের বিবেক থাকে তারা শুধু কষ্ট পায়। সত্তার যে অংশে নিজেকে অভিব্যক্ত করতে পারে না, এই কষ্টটা কি তারই যন্ত্রণা? পাণ্ডবেরা তাদের সহিষ্ণুতা দিয়ে বোধ হয় এই যন্ত্রণাই নিংড়ে বার করে আনতে চায়। গান্ধারীর মনে হল, পাণ্ডবদের সহিষ্ণুতা হল নীরব চক্রান্ত। শ্রীকৃষ্ণের খল বুদ্ধিকে বিশ্বাস করাই শক্ত।

গান্ধারীর নিজের মনও ভাল নয়। নিজের মনেই চিন্তা করছিল ভীষ্মের মানসিক পরিবর্তন এবং দুর্বলতার রন্ধ্রপথ দিয়ে যদি কোন পরাজয় আসে তা-হলে কৌরবপক্ষের প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে পড়া খুবই সম্ভব। শ্রীকৃষ্ণের অটল সহিষ্ণুতা কি তার সংকেত।

নির্বিচারে মানুষ হত্যার দৃশ্য সহ্য করার মত মনোবল ছিল না ভীষ্মের। পাপ আর অনুশোচনাবোধে তার হৃদয় জর্জরিত হল। প্রতিদিন ধরে এই আত্মিক মৃত্যুর কষ্ট ভোগ করার চেয়ে দৈহিক মৃত্যু তার কাছে শ্রেয়বোধ হল! তাই যুদ্ধের একাদশ দিনে ভীষ্ম একরকম যুদ্ধাস্ত্র ত্যাগ করল। আর পাণ্ডবের বীরশ্রেষ্ঠ অর্জুন নিরস্ত্র ভীষ্মের ওপর শরবর্ষণ করতে একটুও কুণ্ঠিত হল না। একাদশ দিন ধরে যুদ্ধে তার অন্তরে পরাভবের যে তীব্র গ্লানি এবং ক্রোধ জমেছিল তা অর্জুনকে ভয়ংকর নিষ্ঠুর আর হিংস্র করে তুলল। বৃদ্ধ পিতামহের শরীরটাকে শরে শরে সে ঝাঁঝরা করে দিল। এরকম নিষ্ঠুর, করুণ, বীভৎস মৃত্যু পৃথিবীর কোন বীরের ভাগ্যে ঘটেনি। ভীষ্মের মৃত্যুটা তাই কোনদিন কেউ ভুলবে না।

ভীষ্মের মৃত্যু গান্ধারীকে বিমর্ষ এবং হতাশ করল। নিজেকে তার বড় অবলম্বনহীন আর অনাথ বোধ হল। যে মানুষটা তার সব কিছু দিয়ে কৌরববংশকে আগলে রেখেছিল তার মতন সবচেয়ে আপন, সবচেয়ে প্রিয় মানুষটাকে হারানোর জন্যে গান্ধারীর বুকের ভেতরটা কেমন করতে লাগল। শূন্যতায় নিষ্পেষিত হতে লাগল তার হৃদয়। নিজেকে তার বড় বিপন্ন; অসহায় বোধ হল। মনে হল, এতকাল যে দুর্ভেদ্য প্রাচীরের আড়ালে বাস করছিল, হঠাৎ ভুমিকম্পে তা ধূলিসাৎ হয়ে গেল। সামনে পেছনে প্রতিরোধ বলে কিছু রইল না। মাথার উপর ছাদটা ঝড়ে উড়ে গেলে মানুষ যেমন অসহায়, নিরাশ্রয়, বিপন্ন বোধ করে অনেকটা সেরকম একটা বিস্ময়বোধে হতভম্ব হয়ে গেল সে।

ভীষ্মের কথা ভাবলে গান্ধারীর দু'চোখে জল ভরে যায়। এক আশ্চর্য সুন্দর মানুষ এই গাঙ্গেয়। নিজের জন্যে কিছুই আকাঙ্ক্ষা নেই তাঁর। যা কিছু করছেন সব কৌরববংশের স্বার্থে, তার গৌরব ও সুনামের জন্যে। শুধু তাই নয়, আমৃত্যু এই বংশের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কও ত্যাগ করেনি। যক্ষের মত আগলে রেখেছিল এই বংশকে। আজ তাঁর মৃত্যুতে অভিভাবকহীন হল কুরুবংশ। মাথার ওপর ন্যায়-অন্যায় বলার আর কেউ থাকল না। মানুষটা অনেক বড় বলেই কোন কিছুতে

তাঁর লোভ ছিল না। অথচ ইচ্ছে করলে সব কিছু পেতে পারতেন। রাজ্য, সাম্রাজ্য ঐশ্বর্য, সম্পদ সব। তবু এই সবে নিস্পৃহ ছিল। কিন্তু নির্লিপ্ত ছিল না। পাণ্ডব-কৌরবের বিরোধে কৌরবের পক্ষ নিল সে শুধু কৌরববংশের প্রতি প্রীতি ও অনুরাগবশত। এই বংশই ছিল তাঁর কাছে স্বর্গ। এই স্বর্গ ছেড়ে কোথাও গেলেন না তিনি। গান্ধারী মুখে গম্ভীর বিষাদ ও শোক থমকে আছে। তার বুকের ভেতরটা উথাল-পাতাল করছিল। সে কিছুতেই নিজেকে সামলাতে পারল না। স্বাভাবিক নারীধর্ম অনুসারে হাতে মুখ ঢেকে কাঁদতে লাগল।

অনেকক্ষণ ধরে কাঁদল। কেঁদে কেঁদে হাল্কা হল। তারপর, থম ধরে বসে রইল। দুর্যোধনের ডাকে একটু চমকে তাকাল। পুত্রকে দেখামাত্র গান্ধারীর বুকর ভেতর হু হু করে উঠল। বড় শূন্য আর নিঃস্ব মনে হল। আর্ত যন্ত্রণায় ব্যাকুল হয়ে বলল, সুযোধন, পিতামহের মৃত্যুটা আমি সইতে পারছি না। এই পৃথিবীতে যে ধর্ম বলে কিছু নেই, পিতামহের মৃত্যুটা তারই প্রমাণ। যে মানুষটা সারাজীবন ধরে সত্য কথা বলল, সৎপথে থাকল, ধর্মপথে চলল তার এ গতি কেন হল? তবে কি বুঝব সত্য ও মিথ্যার যুদ্ধে, ধর্ম ও অধর্মের সংঘর্ষে সত্যের মৃত্যু, ধর্মের পরাজয় হয়েছে? ভীষ্মের মৃত্যু মানে সত্য ও ধর্মের পরাজয়। আমার মন্দ কপালের জন্যে পিতামহকেও হারাতে হল। এই দুঃখ আমার মরেও যাবে না। বলতে বলতে গান্ধারী হাউ হাউ করে কাঁদল।

সুযোধন জননীকে সান্ত্বনা দেওয়ার কোন চেষ্টা করল না। নিজের শ্বাসেও মৃদু কম্পন টের পেল। একমুখী স্রোত দুরন্ত গতিতে তাকেও ভাসিয়ে নিয়ে গেল। উজান বাইবার শক্তি তার ছিল না। বেশ বুঝতে পারছিল, জননীর উদ্বেগের মত সেও ভেসে যাচ্ছিল এক অমোঘ লক্ষ্যে। নিয়তির নির্দ্দেশে। কিছুক্ষণ কথা না বলে সুযোধন জননীর মুখের ওপর চোখ পেতে রাখল। তারপর চোখ সরিয়ে নিয়ে বিষণ্ণ গলায় বলল, তোমার অনুমান বোধ হয় মিথ্যে নয়। পিতামহের মৃত্যুটা অর্জুনের বীরত্বের কলংক হয়ে থাকবে চিরকাল। তাকে হত্যা করে পাণ্ডবেরা ধর্মযুদ্ধের ইতি ঘটাল। ভীষ্মের মত সত্যাশ্রয়ী মহামানব হলে তাদের অধর্ম যুদ্ধের প্রথম বলি। শিখণ্ডীর মত এক অসম বালক যোদ্ধার সঙ্গে যুদ্ধ করা তাঁর মত মহারথীর শৌর্য-বীর্যের অপমান। তাই, প্রতিবাদের বাণে নিরস্ত্র ভীষ্মকে নিষ্ঠুর ব্যাধের মং হত্যা করতে একটুও কুণ্ঠিত হল না। পিতামহের মৃত্যু হল। একেই বলে অদৃষ্টের পরিহাস। মানুষের বিবেকহীনতা।

গান্ধারীর বুকের ধকধকানিটা আবার আবার শুরু হল। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল : সুযোধন, অন্য কথা বল।

কী আর বলব। পাণ্ডবেরা বুঝেছে ধর্মপথে ন্যায়যুদ্ধে কৌরব পক্ষকে হারানো অসম্ভব। তাই ক্ষাত্রনীতি ত্যাগ করে এক ভয়ংকর অন্যায় যুদ্ধের তারা মেতে উঠল। যে কোন ধরনের হীন ছলনা এবং মিথ্যের আশ্রয় নিতে তাদের কোন কুণ্ঠা ছিল না।

সুযোধনের বিষণ্ণ থমথমে গম্ভীর মুখের দিকে তাকিয়ে গান্ধারী বেশ বুঝতে পারছিল, পুত্র তার কিছু বলতে চায়। এ হল তার ভূমিকা। সেই চরম কথাটা কী হতে পারে, তাও সে আন্দাজ করতে পারছিল। তাই, তীব্র উৎকণ্ঠায় তার বুকের মধ্যে একটা চিনচিনে আনন্দ ও ভয় হচ্ছিল ভীষণ। তবু মনের উদ্বেগ চেপে রাখা তার কঠিন হল। হতাশ গলায় জিগ্যেস করল, আবার কি হল?

গান্ধারীর উৎকণ্ঠিত জিজ্ঞাসায় সুযোধন একটু বিব্রত হল। বুকের মধ্যে তার নানারকম বিস্ফোরণ ঘটে গেল। কয়েকটা মুহূর্ত সে কোন কথা বলতে পারল না। তারপর খুব কুণ্ঠিত গলায় বলল : মা, আরো এক বিপর্যয় হয়েছে।

বিপর্যয়!

কৌরবপক্ষের আরো একটি নক্ষত্রের পতন হল। অস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্য নিহত।

সুযোধন! গান্ধারী আকুল করা অসহায় আর্তনাদ তার বুক চিরে বেরিয়ে এল। মুখে যন্ত্রণার চিহ্ন ফুটল। কেমন উদ্‌ভ্রান্ত আর অপ্রকৃতিস্থ মানুষের মত স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল সুযোধনের মুখের দিকে। গান্ধারীর অশ্রুহীন দুটি চোখ রৌদ্রতপ্ত নিদাঘের মত জ্বল জ্বল করতে লাগল। শূন্য

দৃষ্টি। তার মাথার মধ্যেও ফাঁকা। অনুভূতি, রাগ, বিদ্বেষ কিছু ছিল না। মুখও কেমন অন্যরকম দেখাল। বড় নিঃস্ব আর রিক্ত মনে হল।

গান্ধারী চমকানো আর্তস্বর সুযোধনের সমস্ত শরীরে শাঁখের মত বেজে গেল। একটু থমকে চেয়ে থাকল গান্ধারীর মুখে দিকে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল কয়েকমুহূর্ত। আস্তে আস্তে বলল, অবাক হওয়ার কিছু নেই। ধর্মযুদ্ধের ইতি ঘটেছে। এর মন্ত্রণাদাতা তোমার যদুকুলপতি শ্রীকৃষ্ণ। তার প্ররোচনায় ও পরামর্শে নির্বোধ যুধিষ্ঠির অশ্বত্থামা নিহত হওয়ার মিথ্যে সংবাদ রটিয়ে দিল যুদ্ধক্ষেত্রে। স্নেহবৎসল পিতা দ্রোণাচার্যের কানে পুত্র হত্যার মর্মান্তিক সংবাদ পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে এক প্রলয় ঘটে গেল। বাঁচাটা তাঁর কাছে নিরর্থক রোধ হল। পৃথিবীটা তাঁর কাছে শূন্য হয়ে গেল। যুদ্ধের ইচ্ছেটাই মরে গেল। তৎক্ষণাৎ অস্ত্রত্যাগ করলেন দ্রোণ। শোকে, তাপে, দুঃখে তাঁর হৃদয় বিদীর্ণ হতে লাগল। রথে নিশ্চল হয়ে বসে রইলেন। শোকস্তব্ধ দ্রোণাচার্যকে নীরব ও নিরস্ত্র দেখে পাঞ্চাল রাজপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন তস্করের মত চুপিসাড়ে রথে ওঠে তার শিরচ্ছেদ করল।

গান্ধারী পাষাণ মূর্তির মত নিশ্চল আর স্তব্ধ। তার কোন প্রতিক্রিয়া ছিল না। পুতুলের মত নির্বিকার দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। গান্ধারী তার পায়ের নিচে মৃদু একটা ভূমিকম্প টের পাচ্ছিল। আসলে এটা কোন ভূমিকম্প ছিল না। অমঙ্গল আশংকায় তার নিজের শরীরের এক অপ্রতিরোধ্য আন্দোলন। গান্ধারীর মনে হল, কৌরবের ভাগ্য যেন প্রবলবেগে নিচের দিকে আকর্ষণ করছে। আর তারা চেষ্টা করেও ঠেকাতে পারছে না তার নিম্নগতি। অসহায়ভাবে তার এক কাল্পনিক পরিণতির কথা ভাবতে লাগল। এরকম এক অদ্ভুত ভাবনা তার জীবনে প্রথম।

গান্ধারীর নীরবতা সুযোধন সইতে পারছিল না। তার বুক তোলপাড় করছিল। অস্ফুটস্বরে বলল, তুমি চুপ করে আছ কেন? এত ভাবার কী আছে? ভীষ্ম, দ্রোণ ছাড়া কি বীর নেই? যোদ্ধা নেই? পিতামহ এবং আচার্যের মৃত্যুতে আমাদের বহু ক্ষতি হয়েছে। সেই ক্ষতি কোনদিন পূরণ হবে না জানি। তাঁদের কথা মনে পড়লে বুক ব্যথিয়ে ওঠে। একটা তিক্ত হতাশায় খাঁ খাঁ করে বুক। তবু ভেঙে পড়লে কিংবা বিমর্ষ হলে তো চলবে না। ভিতরকার ক্ষত রক্তপাত ভুলে আবার যুদ্ধের জন্যে তৈরি হতে হবে। পিতামহ এবং আচার্যের মৃত্যু আমাদের সতর্ক ও সাবধান হওয়ার শিক্ষা দিল। একে আমাদের জীবনে আশীর্বাদ বলতে পার।

গান্ধারী কিন্তু সুযোধন বাক্যে উদ্দীপিত হল না। তার চোখমুখের ভাবে কোন পরিবর্তন হল না। ভীষ্ম ও দ্রোণের মৃত্যুর পেছনে পাণ্ডবদের যে শঠতা ও কপটতা ছিল তা কিছুতে ভুলতে পারছিল না। অথচ এই দুজনেরই অর্জুন ও যুধিষ্ঠিরের প্রতি একটা চিত্ত-দৌর্বল্য ছিল। তাঁদের সেই অন্ধ স্নেহ মমতার এরূপ অপব্যবহার করতে অর্জুন কিংবা যুধিষ্ঠিরের বিবেকে বাধল না। স্বার্থের জন্যে যুধিষ্ঠির যে এত নীচে নামতে পারে সে নিজেও জানত না। জয়ের জন্যে মানুষ এত পাষণ্ড, বিবেকহীন হয়ে কেমন করে? অপত্য সম্পর্ক বলে কি কোন সম্পর্ক বিবাদের সময়, যুদ্ধের সময় থাকে না? ভবিষ্যতেও থাকবে না? কোথায় যেন গান্ধারীর স্বপ্নভঙ্গ হল। তীব্র আত্মগ্লানিতে দগ্ধ হচ্ছিল তার ভেতরটা। ইচ্ছে করছিল, নিজের হাতে গলা টিপে ধরে তার বিশ্বাসকে।

সুযোধনের কথাটা শুনে গান্ধারী খুব স্থির চোখে অনেকক্ষণ লক্ষ্য করল। দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, বিশ্বাস গেলে বাঁচার আনন্দ ফুরিয়ে যায়। অথচ আমি সারাজীবন ধরে বিশ্বাস করেছি, যথা ধর্ম তথা জয়। কিন্তু এই চরম অবিশ্বাসের যুগে কোন মানুষ ধর্মের ওপর নির্ভর করে থাকতে পারছে না। সত্য ভঙ্গ করার জন্যে, ধর্ম লংঘন করার জন্যে কারো মনে কোন অনুশোচনা, যন্ত্রণা, কিংবা পাপবোধ নেই। কেবল আমিই মনে মনে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছি। জ্বলে মরছি শুধু আমি সেই বিশ্বাস-ভঙ্গের গ্লানিতে। আজ কোন্ বিশ্বাস নিয়ে তোমাকে বল। "যথা ধর্ম তথা জয়।" বিশ্বাস একবার ভেঙে গেলে আর জোড়ে না। কথাগুলো বলার সময় গান্ধারীর মুখে এক গভীর বিষাদ নেমে এল।

দুর্গতোরণের স্তম্ভশীর্ষে দাঁড়িয়ে গান্ধারীর কেবল একটাই যুদ্ধ দেখল। সে যুদ্ধ কর্ণ ও অর্জুনের।

শৌর্য-বীর্যের দম্ভ নিয়ে দুই বীরের বহুকালের অমীমাংসিত বিতর্কিত লড়াই দেখতে রাজঅন্তঃপুরের ললনারা ভীড় করল স্তম্ভশীর্ষে। ভানুমতীই জোর করে গান্ধারীকে দুর্গতোরণে টেনে আনল। গান্ধারীকে নিজের পাশে বসাল। গান্ধারী ভীষণ শান্ত এবং মৌন। সে ভাবছিল, এই যুদ্ধের পরিণতি কী? ভবিতব্য-ই বা কি হতে পারে? কর্ণের হাতে অর্জুন যদি সত্যিই নিহত হয়? এরকম চিন্তায় বুকটা ছ্যাঁৎ করে ওঠল। অব্যক্ত একটা শিহরন্ খেলে গেল সঙ্গে সঙ্গে। মনটা হঠাৎ এক জায়গায় আটকে গেল। চোখ বুজে নানারকম দুঃস্বপ্ন দেখতে লাগল।

গান্ধারী কেমন একটা অচ্ছন্নতায় আক্রান্ত। বহুক্ষণ বিবশ হয়ে বসে রইল। বুক জোড়া ভয়, উৎকণ্ঠা, দ্বিধা, মাথায় হাজার এলোমেলো অদ্ভুত চিন্তা। বহুক্ষণ ধরে একটা কথা বার বার মনে হচ্ছিল কর্ণ ও অর্জুন দুই ভাই। ভাই-ভাইয়ের এই যুদ্ধের ফলাফল নিয়ে জল্পনা-কল্পনার অন্ত ছিল না। কিন্তু গান্ধারী সে-সব কিছুই শুনছিল না। বরং তাদের কথাবার্তায় মুখে থমথমিয়ে উঠল কান্না।

হেমন্তের কবোষ্ণ রোদে এক ঝিমঝিম নেশাড়ু মাদকতা ছড়িয়ে রেখেছে চারধারে। কুরুক্ষেত্রের কাঁকরে রাঙানো মাটিতে ফর্সা চাদরের মত টানটান রোদ। আর সে দুর্গতোরণের ছাদের নিচে স্নিগ্ধ ছায়ায় বসে আছে এক স্থবির মহাবৃক্ষের মত। তার স্নিগ্ধ ছায়ায় কর্ণ ও অর্জুন সমান। দুজনের জন্যেই সমান টনটন করে বুক। সমান স্নেহ, সমান ভালবাসা। দুজনের সঙ্গে তার সমান সম্পর্ক। দুজনের জন্যে তার মন সমান বিচলিত।

অথচ কী আশ্চর্য, এরা উভয়েই কুন্তীর সন্তান। কর্ণের জন্যে কুন্তীর বুকে এক ফোঁটা স্নেহ যদি থাকত তা-হলে দুই সহোদর ভাইয়ের ভেতর এই মরণপণ লড়াই হত না। কর্ণ-অর্জুনের বিরোধ, সংঘর্ষ, শত্রুতা, দ্বন্দ্বযুদ্ধের জন্যে দায়ী তাদের উভয়ের মাতা কুন্তী। কথাটা মনে হলে গান্ধারী মাথা আর বুক জুড়ে ঘৃণা আর ধিক্কারের ঝড় বয়ে যায়। কুন্তীকেই সব ঘটনার জন্যে দায়ী মনে হয়। কুন্তীর মত এমন স্নেহহীন জননী পৃথিবীতে বিরল। তার মাতৃস্নেহেও যথেষ্ট খাদ। মমতার অভাব। স্বার্থের কথা ভেবেই পাণ্ডবদের বড় দুঃসময়ে কুন্তী তাকে পুত্র বলে স্বীকার করল। কর্ণের স্নেহ-কাঙাল অন্তরকে সুকৌশলে কৌরবদের বিরুদ্ধে লাগানোর জন্যে এবং তাকে কৌরবপক্ষ থেকে পাণ্ডবপক্ষে টেনে আনার জন্যে কপট পুত্র-স্নেহ দেখাতে কুন্তী কোন লজ্জা অনুভব করেনি। অর্জুনের সঙ্গে তার বিরোধ মেটাতে, তাদের মরণপণ লড়াইর ইচ্ছেতে ইতি টানতে কুন্তীর অভিনয়। কৌন্তেয়দের রাজ্যলাভে কর্ণ প্রধান বাধা বলেই সব লজ্জা বিসর্জন দিয়ে কর্ণকে পুত্র বলে স্বীকার করল। কিন্তু বড় দেরি করে ফেলল কুন্তী। অনেক আগেই ঘটতে পারত এই মিলন। কৌরব-পাণ্ডব অস্ত্র প্রতিযোগিতার দিনই যদি সর্বসমক্ষে কর্ণকে পুত্র বলে কোলে টেনে নিত তাহলে এত বিবাদ-বিরোধের উত্তাপ জমত না। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হত না। কর্ণও তাকে প্রত্যাখ্যান করত না।

গান্ধারী অন্যমনস্ক। কিছুই দেখছিল না। একটু থম-ধরা ভাব ছিল। আচমকা যুদ্ধের উত্তেজক উল্লাসে সে চমকে তাকাল। চোখ তুলে রক্তে-রাঙা কুরুক্ষেত্রের প্রাঙ্গণের দিকে তাকাল। এক কালান্তক মূর্তি নিয়ে দুই বীর সৈন্যদের নিয়ে সমরক্ষেত্রে প্রবেশ করল। রণ দুন্দুভি বেজে উঠল। বিবদমান দুইপক্ষ একে অপরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। মুহূর্তে অশ্বের হ্রেষায়, হস্তির বৃংহনে, অস্ত্রের ঝনঝনায় আর আহতদের আর্তনাদের মুহূর্তে যুদ্ধক্ষেত্র মুখরিত হয়ে উঠল। বাতাসের সাঁ সাঁ শব্দের সঙ্গে অস্পষ্ট চাপা কান্নার গোঙানি মিশে গেল।

হঠাৎ এক নাটকীয় ঘটনা ঘটল। কর্ণ এসে দাঁড়াল একেবারে অর্জুনের রথের সামনে। হাত উঁচু করে অর্জুনকে থামতে বলল। দু'পক্ষকে থামাল। সকলকে সচকিত করে ঘোষণা করল, আজকের যুদ্ধ কর্ণ আর অর্জুনের। আর কারো নয়। তবে সৈন্যরা কেন মিছেমিছি লড়াই করে মরবে। যে যার শিবিরে ফিরে যাক্। যুদ্ধ হোক আমাদের দুজনের। আমৃত্যু দ্বন্দ্বযুদ্ধ। একজনের জয়ে, আর একজনের নিধনে যার শেষ। আজকের জয়-পরাজয় আমাদের একজনের মৃত্যু দিয়ে শেষ হোক।

কথা শেষ হল না, অমনি ক্ষিপ্র হাতে দুই বীর দুজনকে লক্ষ্য করে তীর নিক্ষেপ করল। আরম্ভ হল রোমহর্ষ দর্শনীয় যুদ্ধ। কর্ণ দুর্জয় ক্রোধে, প্রতিহিংসায়, নিদারুণ অভিমানে, অপমানে জ্বলে উঠল। আর অর্জুন দানবীয় প্রতিহিংসা নিয়ে আক্রমণ করল সর্বাগ্রজ কর্ণকে। কর্ণের দু'চোখে রোষ, কিন্তু মুখে করুণ প্রশান্তি।

কর্ণের রথের চাকা অর্জুনের মারাত্মক বাণের আঘাতে হঠাৎ ভেঙে অচল হল। এক মুহূর্ত দেরি না করে অতিরিক্ত রথের চাকাটি বদলানোর জন্য কর্ণ একটু সময় চাইল। অর্জুন রাজিও হল। কিন্তু পার্থসারথি শ্রীকৃষ্ণ কানের কাছে ফিসফিসিয়ে কুমন্ত্রণা দিল। কর্ণের দিকে তর্জনী নির্দেশ করে বলল, হাঁ করে দেখছ কী সখা? ঐ তো সামনে নতজানু হয়ে বসে আছে পুত্রহন্তা কর্ণ। সপ্তরথী মিলে যারা বালক অভিমন্যুকে বধ করেছিল, তাদের মাথা, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় ছিল সুত পুত্র কর্ণ। তোমার শৌর্য-বীর্যের চির প্রতিদ্বন্দ্বী ও। ওকে বাঁচতে দিও না। ও তোমার পথের কাঁটা। ও তোমার যশ ও গৌরব হনন করতে এসেছে। এই হল সুযোগ পার্থ। ধনুকে তীর লাগাও। এফোঁড় ওফোঁড় করে দাও ওর বুক। ওর নধর শরীর। এই সুযোগ একবার হারলে, কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ থেকে ফেরা তোমার সাধ্যাতীত হবে। শত্রুকে শক্তি সংগ্রহের কোন সুযোগ দিতে নেই। শত্রুকে হত্যা করাই শাস্ত্রীয় বিধি। প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে ক্ষাত্রনীতি মেনে যুদ্ধ করে না কেউ। লক্ষ্মণও কৌশলে ইন্দ্রজিৎকে নিরস্ত্র অবস্থায় হত্যা করেছিল। যে কোন অবস্থায় শত্রুকে জয় করাই হল প্রকৃষ্ট যুদ্ধনীতি।

কৃষ্ণ বারে বারে পার্থের কানে গুঞ্জন তুলল। অর্জুন বিভ্রান্ত হল। তীব্র হয়ে উঠল তার চোখের দৃষ্টি। সব দ্বিধা দ্বন্দ্বের অবসান ঘটিয়ে নিরস্ত্র কর্ণের ওপর তীর বর্ষণ করল। ঝাঁকে ঝাঁকে তীরে এসে কর্ণকে ঝাঁজরা করে দিল। তবু কর্ণ রণক্ষেত্রে লুটিয়ে পড়ল না। নিজের হাতে নিজের গা থেকে .তীরগুলো টেনে টেনে তুলল। কিন্তু, কটা তুলবে? তারপর রক্তাক্ত দেহে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। সংজ্ঞা হারাল।

অর্জুন সোল্লাসে চিৎকার করে উঠল, আমি জয়ী। বছরের পর বছর ধরে যার মৃত্যু কামনা করেছি সে আজ সত্যিই মরল। আমি নিশ্চিন্ত। আর কোন প্রতিদ্বন্দ্বী থাকল না আমার। জয় আমাদের সুনিশ্চিত। হস্তিনাপুর প্রাসাদ শীর্ষে উড়িয়ে দেব পাণ্ডবের বিজয় কেতন। কৌরবের আর রক্ষা নেই।

দুর্গতোরণ হঠাৎ শব্দহীন হয়ে গেল। অর্জুনের কোন কথাই শোনা গেল না। কর্ণের রক্তমাখা স্থির দেহটার দিকে তাকিয়ে গান্ধারী সরু সুরে চিৎকার করে কেঁদে উঠল একবার। অস্বাভাবিক সেই কান্নার সঙ্গে দুর্গতোরণে হাহাকার বেজে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে গান্ধারী মূর্ছা গেল।

•

কৌরবপক্ষের একে একে নিহত হল শল্য, জয়দ্রথ, বিকর্ণ, দুঃশাসন, শকুনি। সৈন্যরাও মনোবল হারিয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে মরতে লাগল। এক ভয়ংকর ভাগ্য বিপর্যয় ঘটল কৌরবদের। ধ্বংসের হতাশার বিষণ্ণতা প্রাসাদের অন্তঃপুরেও পৌঁছল। দুর্যোধনের শিবির ভেঙে পড়ল। ভীষ্মের পতনের মাত্র সাতদিনের মধ্যে কৌরবপক্ষের পরাজয় এত নিশ্চিত করার মূলে ছিল পাণ্ডবসখা শ্রীকৃষ্ণ। সে হল পাণ্ডবদের নেতা, পরামর্শদাতা, পরিচালক, নিয়ন্ত্রক। নিজে যুদ্ধ করেনি সে, অস্ত্রও ধরেনি। পাণ্ডবদের যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করেছে, তাদের ভেঙে পড়া মনোবলকে পুনর্জীবিত করেছে। শ্রীকৃষ্ণের বুদ্ধিবল, কুটকৌশল কারো রুখবার শক্তি ছিল না বলেই পাণ্ডবেরা কৌরবদের প্রায় অর্ধেক সৈন্য নিয়ে যুদ্ধে জয়ী হল। শ্রীকৃষ্ণ যে সত্যিই শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি এই মহাযুদ্ধে আরো একবার প্রমাণ করে দেখাল।

ভীষ্ম জীবিত থাকতে কোন অন্যায় যুদ্ধ মাথা চাড়া দেয়নি। কিন্তু অধর্মযুদ্ধের তার পতনের পর থেকে পাণ্ডবেরা এক অধর্ম যুদ্ধের সূত্রপাত করল। শ্রীকৃষ্ণ তার প্রবর্তক। ধর্মকে সংহার করে দৈবকে জয় করেছে। দৈবই মানুষের ভাগ্য নিয়ন্তা। আসল যুদ্ধ তো ভাগ্যের সঙ্গে। শত পুরুষকার দিয়ে ধর্মে কিংবা সত্যে অবিচলিত থেকে যে সাফল্যকে জয় করা যায় না তার মস্ত প্রমাণ তো কৌরবেরা! ভাগ্য মানুষ নিজে তৈরি করে। সত্য ত্যাগ করে, অধর্ম অবলম্বন করে পাণ্ডবেরা সেই ভাগ্য গড়েছে। পাণ্ডবেরা যদি অধর্ম না করত তা হলে তাদের একজনও জীবিত থাকত না। ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, জয়দ্রথ কেউ প্রাণ হারাত না।

মৃত্যুর পর মৃত্যু, শোকের পর শোক, গান্ধারীকে পাথর করে দিল। দৃষ্টিহীন নিষ্প্রাণ চোখ থেকে গড়িয়ে পড়ছিল অশ্রুধারা। সে অশ্রুর বিরাম নেই। পাগলের মত কাঁদে আর নিজের মনে বলে, এই যুদ্ধ হওয়ার আগে আমার মৃত্যু হল না কেন? এত মৃত্যু দেখেও বুক ফেটে চৌচির

হয়ে যাচ্ছে না কেন? এখন কার মৃত্যু দেখার আশায় আছি? সুযোধন ছাড়া সবাই মরেছে। সে ছাড়া আর কার কেউ নেই তার। এখন সব শঙ্কা শুধু তার জন্যে।

গান্ধারীর কান্না পেল। সমস্ত অন্তর ডুকরে কেঁদে উঠল।

এখনও শেষ অঙ্ক বাকি। আরো কত মৃত্যু দেখতে হবে তাকে? কতো শোক সইতে হবে? শোকের শেষ হয়নি, এখনো নামেনি কৃষ্ণ যবনিকা। গান্ধারী কপাল চাপড়ে কাঁদল। এখনো সুযোধনের মৃত্যু দেখতে হবে। অপেক্ষা করতে হবে তার জন্যে।

গান্ধারী দুঃখে শোকে তাপে কষ্টে কপাল চাপড়ে নিরুপায় গলায় বলল, মা হয়ে সন্তানদের মৃত্যুশোক আর কত সইব?

এক বুক কান্না নিয়ে ভয়ার্ত ব্যাকুল কণ্ঠে সুযোধনকে অনুনয় করে বলল : পুত্র, ঘনিয়ে আসছে সর্বনাশ। বাঁচার পথ নেই। থাকার মধ্যে আছ তুমি, আচার্য কৃপ আর অশ্বত্থামা। এখন কী করবে? এত মৃত্যুর শোক যে আর সইতে পারছি না।

দেশ স্বাধীনতা ও মা আর মাটির জন্যে মরণেও সুখ। তাই তো এত মানুষ ঝাঁকে ঝাঁকে মরছে। হাসিমুখে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতেও ভয় পাচ্ছে না। মাগো, অমরত্ব যদি কোথাও থাকে তা আছে এই আত্মদানের মহাযজ্ঞে।

সৈন্যরা ক্লান্ত। অস্ত্রের ভাণ্ডারের টান ধরছে। মানুষ শোকে কাতর। সন্তান, স্বামীর শোক আর কত সইবে? যেদিকে তাকাও জলভরা করুণ আঁখি মেলে তাকিয়ে আছে জননীরা, বধূরা। সে চোখে আশা নেই, আনন্দ নেই। হতাশায় বিবর্ণ, শোকে শ্রীহীন। আমার মতই তারা অভাগিনী। আমার মত তাদেরও বুক-ভরা হাহাকার আর অনুশোচনা। বলতে বলতে আকুল কান্নায় কাঁদতে কাঁদতে বলল, কী নিয়ে আমি বাঁচব। তুমি চলে গেলে আমার কী আর রইল? কৌরববংশে বাতি জ্বালানোরও কেউ থাকল না। শুধু বংশের কথা ভেবে যুদ্ধ ত্যাগ করে সন্ধি কর পুত্র। যুদ্ধ করে আর কী হবে?

সুযোধন গান্ধারীর কথার কোন উত্তর দিল না। নিজের অভিভূত শোকাচ্ছন্নতাকে চট করে লুকিয়ে প্রবোধভরা স্নিগ্ধহাসি হেসে বলল, মা, তোমার মত অনেক জননীর দুর্ভাগ্য এবং শোকের কারণ আমি। আমি যে ইচ্ছে করে সব করেছি তাও নয়। আমার অদৃষ্টাই মন্দ। জন্ম থেকে শুধু মানুষের অভিশাপ, গালমন্দ পেয়েছি। তবু তাদের নিন্দের ফাঁদে পা দেইনি। দুরাত্মার মত কোন কাজ করিনি। পাষণ্ডের মত কোন বিবেহীন আচরণও করিনি। বরং, দুর্নাম আর কলংকগুলো মিথ্যে এবং অর্থহীন করে দেবার জন্যে সৎ থেকেছি। পরাজয় আসন্ন জেনেও অধর্ম করিনি। জননীর একমাত্র ইচ্ছে শিরোধার্য করে ধর্মে অবিচল আছি। তবু জননীর আশীর্বাদ সত্য হল না। পুরুষকার কিংবা সততা দিয়ে ভাগ্য জয় করতে পারলাম কই? ভাগ্যফল আমি স্বীকার করে নিয়েছি। তার অমোঘ পরিণামের জন্যে তৈরি আমি! যারা যুদ্ধক্ষেত্রে মরল তারা সকলে একটা সত্যের জন্যে, আদর্শের জন্যে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিয়েছে। তাদের ইচ্ছে আকাঙ্ক্ষাকে জলাঞ্জলি দিয়ে কাপুরুষের মত প্রাণ নিয়ে বেঁচে থাকা কি খুব সুখের হবে ভাবছ?

পুত্র, সন্ধি করায় কোন অপমান নেই। এটা একটা সাময়িক চুক্তি।

সুযোধন রুদ্ধ কণ্ঠে অতি কষ্টে বলল . একথা অন্য কেউ বললে, এই মুহূর্তে তার শিরচ্ছেদ করতাম।

আর্ত চিত্তের ব্যাকুল কণ্ঠে গান্ধারী বলল : কত পত্নী তার স্বামীর জন্যে হা-হুতাশ করছে, কত মা ভয়ার্ত ব্যাকুল স্বরে কেঁদে কেঁদে বলছে, হে ঈশ্বর বন্ধ হোক এই নরঘাতী যুদ্ধ। আমাদের রাজা দুর্যোধনকে একটু সুমতি দাও। তাদের সে শোক বেদনা তো শুনতে তোমাকে বাইরে যাওয়ার দরকার নেই, নিজের অন্তঃপুরেই শুনতে পাবে। এর পরেও এই যুদ্ধ করতে কারো ইচ্ছে হয়?

ইচ্ছে হয় না মা, কিন্তু প্রায়শ্চিত্ত তো করতে হবে। প্রত্যেক তার নিজের মত করে সান্ত্বনা খোঁজে। আমার যা কিছু সান্ত্বনা তা আছে যুদ্ধের উত্তেজনা ঘিরে। তোমার ভাবনার সঙ্গে আমার ভাবনাটার ফারাক খুব বেশি। যুদ্ধে যারা হারাল, পেল না কিছুই, তাদের শোকসন্তপ্ত, নিরাভরণ অবলা বিধবা

কিংবা রোদুদ্যমানা জননী আমাকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করতে দেখলে কী বলবে? তাদের কি বলে কৈফিয়ত দেব? তারা যদি প্রশ্ন করে তুমিই কি হস্তিনাপুরের রাজা? মৃত্যুঞ্জয়ী বীর দুর্যোধন, না যুদ্ধভীরু শশকচিত্ত কাপুরুষ দুরাত্মা দুর্যোধন? তখন দেবার মত জবাব, আমার কী থাকল? বল?

তবু, অবুঝ হৃদয় মানে না। গাছ গেলে তো আর ফল পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। ওরা সব হারিয়েছে, কিন্তু তুমি তো থাকবে। তুমি সকলের আশার প্রদীপ হয়ে জ্বলবে। এখন তুমি ছাড়া—

মা, চুপ কর। এই যুদ্ধের পরিণাম আমি জানি। কৌরবংশের ধ্বংস হতে আর দেরি নেই। সে অংক শেষ হবে আমাকে দিয়ে। তবু অনুরোধ কর না আমায়। যুদ্ধে এত মানুষকে মেরে ফেলে আমি সন্ধি করব কোন মুখে? নিজেকেই বা কি বলে কৈফিয়ত দেব? শত্রুরা কাপুরুষ বলবে? শোকাতুর জনক-জননী, বধূরা আমাকে ঘেন্না করবে? এই সন্ধির চেয়ে মৃত্যু অনেক ভাল। স্নেহবশে এবং শোকেতে অবুঝ হয়ে তুমি যা বলছ তা হয় না। তুমি আমাকে দুর্বল করে দিও না।

সুযোধন, একবার ভেবে দ্যাখ। আমি অভাগী মা!

মায়েদের কান্না আমার বুকের গভীরে অগ্নিময় ক্রোধ আর প্রতিশোধ স্পৃহা আগ্নেয়গিরির লাভার মত ফুটছে। তার বিস্ফোরণ ঘটবে আগামীকাল অষ্টাদশী দিনের যুদ্ধে। জয়-পরাজয়ের মীমাংসা হয়ে যাবে কাল। শুধু এই রাত্রিটুকু তোমার আর আমার।

সুযোধন! বুক ফেটে যাচ্ছে আমার!

মা, তুমি তো কতদিন বলেছ, পার্থিব জীবন একান্ত নশ্বর। অমরত্ব যদি কোথাও থাকে তা আছে পরজন্মের স্মৃতির মুকুরে। খ্যাতি মানুষকে অমর করে। পরবর্তী যুগে সেই খ্যাতির গৌরবের স্বর্ণ সিংহাসন পেলেই আমি খুশি থাকব।

গান্ধারী আর্তগলায় কেঁদে উঠল। ব্যাকুল গলায় বলল, নিষ্ঠুর; ভীষণ নিষ্ঠুর।

সুযোধনের মুখে আত্মতৃপ্তির দীপ্তি নিবে গেল সঙ্গে সঙ্গে। এবং এক গভীর বিষাদ নেমে এল তার মুখে। গভীর কোন দুঃখের কথা বলতে বোধ হয় গলার স্বর বসে যায়। দুর্যোধনেরও গেল। বিষণ্ণ স্বরে বলল, আমাকে দুর্বল করে দিও না। যদি তোমার কথা সত্য হয়—'যথা ধর্ম তথা জয়' তাহলে এ যুদ্ধে আমি জিতব। আমি কোন অধর্ম করিনি। চিরদিন জীবনের সর্বক্ষেত্রে জিতেছি। জেতার জন্যই তো বেঁচে আছি।

গান্ধারী নিরুত্তর। বদ্ধ ঠোঁট দুটি কয়েকবার নড়ল শুধু। পলক পড়ল না চোখের। স্থাণু হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। নিশ্চল হয়ে গেলে ব্যাকুল দুটি হাত।

হেমন্তের শেষ পড়ন্ত রোদ রক্তের লাল সূর্যের গনগনে ভাবটা একটু একটু করে নিভে এল। কিন্তু আকাশ হল রক্তের সমুদ্র।

চারদিক থেকে কুয়াশার মত আঁধার গড়িয়ে আসছে। দিগন্ত, বনস্থলী ধরিত্রীর বাস্তবতা হারিয়ে যাচ্ছে এক রহস্যময় কুহেলিকায়। কেমন একটা স্তব্ধতায় থমথম করছে চরাচর।

কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ শেষ হয়নি।

শেষ পর্বের সামান্যই বাকি।

বাকি আছে ছলনার শেষ আর ধর্মের পতন।

মহাযুদ্ধের অন্যতম নায়ক রাজা দুর্যোধনের ধ্বংস। দুর্যোধন বেঁচে আছে মানেই শত্রু ও শত্রুতার শেষ হয়নি। জয় পরাজয়ের চূড়ান্ত মীমাংসা তো তার মৃত্যুতে। কুরুক্ষেত্রের রণক্ষেত্র তার জন্যে অপেক্ষা করছে।

রুদ্ধদ্বার প্রকোষ্ঠে গান্ধারী একা বসে সেই কথা আপন মনে ভাবছিল। তার চোখের সামনে মস্ত নীল আকাশ অস্তরাগে রশ্মি আভায় উজ্জ্বল। মানুষের কত যন্ত্রণা ও দুঃখের সাক্ষী ওরা। কিন্তু ওদের নিজের কোন দুঃখ-যন্ত্রণা নেই। ওরা নিজের জগতে সুখী এবং নিশ্চিন্ত। ওদের জীবনে কোন দ্বন্দ্ব নেই, বিরোধ নেই। নীরব নিস্পন্দ বনস্থলীরও কোন যন্ত্রণা নেই। বনচর প্রাণীদেরও

কোন ক্ষোভ নেই, শোকের উচ্ছ্বাস নেই, বিদ্রোহ নেই, নালিশ নেই। কেবল মানুষের জীবন বিধাতা একটু আলাদা করে গড়েছেন। কী দারুণ, অতৃপ্তি, জ্বালা, দাহ তার প্রাণে। তার তৃষ্ণার শেষ নেই, কোন কিছুতে স্বস্তি নেই, শান্তি নেই। তার জয়ের এবং আকাঙ্ক্ষার আরম্ভও নেই, শেষও নেই। মানুষের এই অদ্ভুত প্রকৃতি ও স্বভাবের সাক্ষী এ বিশাল আকাশ। গান্ধারীর সহসা মনে হল, ঐ আকাশটা ঘুরছে তাকে কেন্দ্র করে। তার সমস্ত বর্তমান, ভবিষ্যৎ চক্রাকারে ঘুরতে লাগল তার স্নায়ুমণ্ডলীর ভেতর। তার মাটিতে পা নেই। সে এই ঘরের ভেতরেও নেই। শূন্যে ভাসছে। মহাশূন্যের দিকে অবিরাম ছুটে চলেছে।

যুদ্ধের অষ্টাদশ দিন আজ। জ্যোতিষীর গণনা অনুসারে অষ্টাদশ দিন ধরে কৌরব-পাণ্ডবের যুদ্ধ হবে। কথাটা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আতঙ্কে উদ্বেগে, উৎকণ্ঠায়, দুর্ভাবনায় তার বুকের ভেতরটা থর থর করে কেঁপে গেল।

আঠারো দিন ধরে একটানা সে যুদ্ধ করছে। কত মৃত্যু সে হেনেছে। তবু তার গায়ে আঁচড়টি লাগাতে পারেনি কেউ। কিন্তু প্রতিদিন যুদ্ধ করে সে ভীষণ শ্রান্ত হয়ে পড়েছে। তবু অস্ত্রে বর্মে সজ্জিত হয়ে যুদ্ধে গেল। যাওয়ার আগে মায়ের আশীর্বাদ নিয়ে গেল। জিতব বলে তিন সত্য করে গেল। কিন্তু সঞ্জয়ই প্রথম বলল, সুযোধন ধনুক ভেঙে ফেলেছে। সে অত্যন্ত বিপন্ন এবং অসহায় হয়ে পড়েছে। ঝাঁকে ঝাঁকে শত্রুপক্ষের তীর এসে বিঁধতে লাগল শরীরে। বর্ম ভেদ করতে পারছিল না। কিন্তু অর্জুনের মারাত্মক তিনটি তীরের আঘাতে মারাত্মকভাবে জখম হল। নিজের হাতেই তীরগুলো টেনে টেনে তুলল। তাকে আহত দেখে সৈন্যসামন্তরা প্রাণের ভয়ে ছুটে পালাতে লাগল। রক্তাপ্লুত দুর্যোধন তাদের মনোবল ফেরানোর জন্যে সৈন্যদের ধর্মের কথা শোনাল। বলল, সব মানুষই মরণশীল। কিন্তু সৈনিক খোঁজে মৃত্যু উত্তরণের পথ। বীরের মত মৃত্যুকে পরোয়া না করে যুদ্ধের ভয়াল আবর্তের মধ্যে, অকুণ্ঠ উৎসাহে ঝাঁপ দেয়। মৃত্যুতে সে নির্ভয়। যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যু হলে সৈনিকের পুণ্য হয়। কিন্তু তাতেও যখন ফল হল না তখন তাদের ভর্ৎসনা করে বলল; পালিয়ে তোমরা কোথায় যাবে? জঙ্গলে, পাহাড়ে, লোকালয়ে যেখানেই আত্মগোপন কর, পাণ্ডবেরা ঠিক তোমাদের খুঁজে বার করবে। রেহাই পাবে না। বন্দীর মত অসহায় বোধ করল। বিপদ ঘনিয়ে ওঠার আগেই নিজের ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে পাণ্ডবদের চোখে ধূলো দিয়ে পূব দিকে দ্বৈপায়নের হ্রদের দিকে পালিয়ে গেল।

তারপর আর কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না। প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে কালান্তক যমের মত পঞ্চপাণ্ডব গোটা রণক্ষেত্র হন্যে হয়ে খুঁজল। কুরুক্ষেত্র থেকে দ্বৈপায়ন হ্রদ পর্যন্ত উন্মাদের মত ছুটে বেড়াল ভীম।

সংবাদটা সঞ্জয়ের মুখে শুনে গান্ধারী আঁতকে উঠেছিল। বুকের ভেতরটা যেন থেঁতলে দিল সঞ্জয়। ভীষণ ভয়ে তার হাত পা কাঁপছিল। কী শুনবে এই ভয়ে সে পাথর হয়ে গেল। সে পাথরের গভীরে শোকানলের জ্বালা ফুটছিল আগ্নেগিরির লাভার মত।

গান্ধারী ভুরু কোঁচকাল। দুচোখের মণি ছোট হল। দৃষ্টি শূন্য। নিশ্চল চোখের তারায় কোন ভাব নেই। প্রস্তরীভূত প্রায় তার অবস্থা। দমকা বাতাসে একমাত্র প্রদীপটিও নিভে গেলে যেমন অন্ধকারে মানুষ অসহায় এবং বিপন্ন বোধ করে তেমনই এক অতল অন্ধকারে তলিয়ে গেল গান্ধারীর সব আশা, ভরসা, বিশ্বাস। যা কিছু ছিল তার গর্ব, পরিচয়ের, শ্লাঘার তার সব অস্তিত্বই হারিয়ে বসল। সে নিজেই মূল্যহীন হয় পড়ল। জীবনটাই তার বৃথা। এক গভীর দুঃখের সঙ্গে মিশে গেল তার বুকভরা কান্না, হাহাকার। যে কান্না, শোক গান্ধারীর একার। যার ভাগ সে আর কাউকে দিতে রাজি নয়।

বীর পুত্রের জন্যে গৌরবের চেয়ে তার বিরহ তাকে কাতর করল বেশি। গান্ধারী নিজেকে প্রবোধ দিতে পারছিল না। একটা ভীষণ অস্থিরতায় ছটফট করছিল। পুত্র হারানোর আংশকায় দুঃখে ও বিষাদে তার মন ছেয়ে রইল। সুখ-দুঃখের কাতরতা নিয়ে, তার হৃদয় ভরা জিজ্ঞাসা নিয়ে নিরুচ্চারে মনে মনে বলল, ভীম পালাও। আমার কত পুত্রকে তুমি মেরেছ। তুব তোমার জিঘাংসা মেটেনি?

তুমি কি পাথর দিয়ে তৈরি? তোমার প্রাণে দয়া মায়া বলে কিছু নেই? তোমার কোন অনুভূতিও নেই কি? জননীর মনের কথা টের পাও না, কেমন পুত্র তুমি? অন্ধ পিতৃব্য আর হতভাগিনী এক মায়ের কথা চিন্তা করে তুমি ভয়ংকর প্রতিহিংসা পরিহার করে বাঁচাও সুযোধনকে। আমি তোমার কাছে ভিক্ষা চাইছি ভীম। আমার তো সব গেছে। শুধু সুযোধন আছে। ওই বংশ-প্রদীপকে নিভিয়ে দিও না। ভীমসেন তুমি ওকে মেরো না। ও বড় পরিশ্রান্ত, আহত। ওর সাথে আর যুদ্ধ কর না। সন্ধি কর। ভাই বলে বুকে টেনে নাও। শুধু আমার কথা ভেবে, তুমি সুযোধনকে ক্ষমা করে দাও। মধ্যম পাণ্ডব, তোমার ভয়ংকর ক্রোধ সংযত কর। জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব, বড় মা বলে যদি শ্রদ্ধা কর, তাহলে ভীমকে তুমি নিবৃত্ত কর। আমি ওই ভয়ংকর দৃশ্য সইতে পারব না। তার আগে আমার শিরে যেন বজ্রাঘাত হয়।

গান্ধারীর দুচোখের কোণ দিয়ে কয়েক ফোঁটা জল গাল বেয়ে বুকের ওপর পড়ল। সুযোধনের পাছে অকল্যাণ হয়, তাই আঁচল দিয়ে জল মুছল তাড়াতাড়ি। তবু শোক, দুঃখ, উদ্বেগ যায় না। ভালবাসায়, স্নেহে, মমতায় যদি এত কষ্ট তা'হলে এই স্নেহ-মমতা বিধাতা মানুষের বুকে দিল কেন? এই কষ্ট যন্ত্রণা তো পশুদের নেই। শুধু মানুষ একাই ভোগ করে। এ ভীষণ কষ্ট, ভীষণ যন্ত্রণার।

এক বুক জ্বালা নিয়ে সে সুযোধনের প্রতিকৃতির দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল। শরীরটা কিন্তু বেশ। ইস্পাতের মত টানটান। মজবুত। বুদ্ধিদীপ্ত, উজ্জ্বল। বড় বেশি দুঃসাহসী। মনের ভাললাগাটা কিছুতে খুশিতে ভরে উঠল না। আনন্দটাই যেন কোথায় হারিয়ে গেছে। প্রকৃতির সৌন্দর্য চোখে ছায়া ফেলে দ্রুত সরে যাচ্ছে। মস্তিষ্কে সেই ছায়া পৌঁছে দিতে পারছে না চোখ। কারণ সেখানে গভীর বিষাদ থমথম করছে। মনের সেই অবস্থার সঙ্গে,কথা বলতে গেলে বোধ হয় গলার স্বর বসে যায়। মনে মনে বলল : সুযোধন ভীম তোমাকে খুঁজছে। পালাও পুত্র, পালাও। তুমি গেলে আমি একেবারে সন্তানহীন হব। কৌরববংশ অবলুপ্ত হবে। তুমি পালাও। পালানোয় আজ কোন লজ্জা নেই। কী আছে তোমার? দর্প গেছে, অহংকার গেছে, বন্ধু, ভ্রাতা, পুত্র, স্বজন মরেছে। আমিও কত প্রিয়জন হারিয়েছি। তোমার মতই নিঃস্ব রিক্ত। এখন আমার বলতে তুমি ছাড়া কেউ নেই। তুমি জীবিত থাক এই আমি চাই। কিন্তু—। না, সুযোধন। না। আত্মসম্মান গেলে মানুষের আর কী থাকল! কাপুরুষের মত লুকিয়ে থেক না। তা-হলে কুন্তীর কাছে আমি হেরে যাব। বীরপুত্রের জননী বলে গর্ব করার আর কিছু থাকবে না আমার। লোকের কাছে লজ্জায় মুখ দেখাতে পারব না। এই যুদ্ধের পরিণাম আমি জানি। সময়ও খুব বেশি নেই। তবু যুদ্ধ তোমাকে করতেই হবে। যতক্ষণ জীবন থাকবে ততক্ষণ মৃত্যুর সঙ্গে কোন সন্ধি কর না। ভাগ্যকে যখন স্বীকার করে নিয়েছ তখন ভাগ্যের অমোঘ দানের জন্য তৈরি হও পুত্র। অমরত্ব যদি কোথাও থাকে তবে এই রণক্ষেত্রেই আছে। পরজন্মের স্মৃতির মুকুরে তোমার মহান আত্মদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে সুযোধন। বোবা কষ্টে গান্ধারীর বুকটা মথিত হতে লাগল। বদ্ধ নিঃশ্বাসের কষ্ট বুকের ভেতর হাহাকারের মত ছড়িয়ে পড়ল।

হঠাৎ প্রবল কান্নায় বুক ছাপিয়ে উঠল। আবেগকে দমিত করার মত মনের জোর ছিল না। অথচ বুকের ভেতর চকিত শিহরনের তরঙ্গ খেলে গেল। আর সংযত করতে পারল না। এক বুক কান্না নিয়ে সরু স্বরে কেঁদে ওঠল। পাগলের মত তরতর করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে দুর্যোধনের ঘর থেকে নিজের ঘরে দিকে দৌড়ে গেল।

বালিশে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে কতক্ষণ ধরে যে কাঁদল গান্ধারী জানে না। একা একা কাঁদল। অনেকক্ষণ। সান্ত্বনা, সহানুভূতি জানাতে কেউ ছুটে এল না। আসবে কোথা থেকে? শোকহীন রমণী একজনও ছিল না অন্তঃপুরে। অন্দরমহল শোকের সাগর। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের স্বামী-পুত্র হারিয়ে শোকে সব পাথর হয়ে গেছে। দৃষ্টিহীন নিষ্প্রাণ চোখ থেকে তাদের গাড়িয়ে পড়ছে অশ্রুধারা। কারো চোখে অশ্রুর বিরাম নেই।

নিজেকে গান্ধারীর অভিশপ্ত মনে হয়। সবাই এড়িয়ে চলে তাকে। প্রত্যেকেই দুর্ভাগ্যের জন্যে মনে মনে তাকেই দোষী করে। গান্ধারীরও মনে হয় তাদের অভিযোগ নিরর্থক নয়। কিছু সত্য হয়ত তার ভেতরে আছে। তার ভাল মানুষীর রন্ধ্রপথ দিয়ে নিয়তি প্রবেশ করেছে কুন্তীর বেশ

ধরে। কুন্তীকে হস্তিনাপুরে ঢুকতে দিয়ে সে ভুল করেছে। ভুল হয়েছে পিতৃব্য বিদুরকে বিশ্বাস করে। প্রকৃতপক্ষে তার গোপন চক্রান্ত ডেকে এনেছে নিষ্ঠুর সর্বনাশা যুদ্ধ। কুরুবংশের ধ্বংস। এই ধ্বংসের কারণ বিদুর, আর সে ইন্ধন। অনুতাপে, দুঃখে, অনুশোচনায় গান্ধারীর মুখে থমথমিয়ে ওঠল কান্না।

দুঃখ ছাড়া বোধ হয় কোন গভীর সত্যকে জানা যায় না। গভীর দুঃখের মধ্যে গান্ধারী তার ভুলটাকে টের পেল। বিদুরকে বিশ্বাস করা তার মারাত্মক ভুল হয়েছে। কে জানত, বিদুর কুন্তীর গোপন প্রণয় সিংহাসনের উত্তরাধিকারী নিয়ে ভেতরে ভেতরে এক নিঃশব্দ ষড়যন্ত্র করেছে? ভুল করছে শতশৃঙ্গ পর্বত থেকে প্রত্যাগত কুন্তী ও তার পুত্রদের ঘরে আশ্রয় দিয়ে। ভিন্ন পরিবেশে ধৃতরাষ্ট্র এবং কৌন্তেয়দের আচার-আচবণ এবং মানসিকতার কোন মিল ছিল না। তাদের বিপরীত মানসিকতার সমঝোতা হওয়া ছিল কঠিন। তবু ইচ্ছে থাকলে কিংবা কুন্তী-বিদুর চাইলে ভ্রাতায় ভ্রাতায় সেই হৃদ্য সম্পর্ক গড়ে উঠত। ওরা দু'জনে সেই সম্পর্কটা গড়ে ওঠার পথে সবচেয়ে বড় বাধা ছিল। সুকৌশলে কৌন্তেয়দের উস্কে দিয়ে গান্ধেয়দের সঙ্গে একটা পারিবারিক বিরোধ বাধিয়ে দিত। গান্ধেয়দের অপরাধী ও দোষী করে একটা মিথ্যে প্রচারে তাকে ক্রমাগত পুত্রদের প্রতি বিমুখ করে তুলল। গান্ধেয়রা উদ্ধত, দুর্বিনীত, পাষণ্ড, দুরাত্মা ইত্যাদি তিরস্কারে তার মনটাকে বিষিয়ে তুলল। তার সরল বিশ্বাস ও ভালমানুষীর সুযোগ নিয়ে পুত্রবৎসল ধৃতরাষ্ট্রের স্নেহপ্রবণ হৃদয়ের দুর্বলতার সম্পর্কে নানা অভিযোগ করে সন্তান নিয়ে তাদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একটা ঠাণ্ডা বিরোধ জিইয়ে রাখল। বিদুরের সমগ্র ভূমিকাটি আজ দিনের আলোর মত তার কাছে স্পষ্ট। ধর্মের মুখোশ পরে বিদুর তাকে ঠকিয়েছে। এই অপমান এত গভীরভাবে তার মনে বাজল যে প্রবল আত্মানুশোচনায় সে কেঁদে ফেলল।

ভাগ্যের হাতে মার খাওয়ার চেয়ে কুন্তীর কাছে হেরে যাওয়াটা তাকে ভীষণ বিঁধছিল। অথচ তার দুর্ভাগ্য কুন্তীর তৈরি। তার সঙ্গে কোন বিবাদ বিদ্বেষ ছিল না। কিন্তু লোকচক্ষুর বাইরে একটা সংঘর্ষ অবশ্যই ছিল। সেখানে পুত্রদের শ্রেষ্ঠত্ব এবং জননীর গর্ববোধ নিয়ে ছিল রেষারেষি। দুই আপাত সমভাবাপন্নর মধ্যে ভাবনা ও উচ্চাশার সংঘর্ষ। সে সংঘর্ষ ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে। কুন্তীর মনের অভ্যন্তরে সেই লড়াইটা পরিবার অনুমোদিত সংঘর্ষের রাজঅন্তঃপুরে সবার দৃষ্টির সামনে যখন ঘটে তখন তাকে বলা হয় গৃহবিবাদ। গৃহযুদ্ধের নীতিই হল লড়াইকে বাইরে টেনে আনা। কুন্তীর সে কাজে হাত পাকা। তাই গান্ধারী খুব সহজে তার চক্রান্তের শিকার হল। কৌরবদের ছোট ও হেয় করাই ছিল কুন্তীর নীতি। কুন্তীর কাছে পরাভবের সেই সুচনা। কুন্তী ও বিদুরের চতুর ছলনায় ভুলে শুধু অভিমান নিয়ে স্বামী-পুত্রদের কাছ থেকে দূরে সরে থাকল। তার অভিমান যে পুত্রদের জীবনে অভিশাপ হয়ে দেখা দেবে কে জানত?

একটা চকিত বিদ্ধ কষ্ট ও আচ্ছন্নতার মধ্যে নিঝুম হয়ে বালিশে মাথা দিয়ে শুয়েছিল। চোখের ওপর দেখতে পাচ্ছিল ঝড় ছুটেছে শালের বনে ধুলো উড়িয়ে।

অনুতাপ অনুশোচনায় গান্ধারী বুক জ্বালা করতে লাগল। পুত্রবধূদের কাছে আজ সে অপরাধী। তার ছায়া দেখলে শিউরে ওঠে তারা, চোখ চোখ পড়লে ভয়ে জড়সড় হয়ে যায়। তার সঙ্গে বধূরা ভাল করে কথা পর্যন্ত বলে না। দাস-দাসীরা মুখেও লক্ষ্য করেছে এক উদ্বিগ্ন অসহায়তা, সবাই যেন বুঝে নিয়েছে অপরাধী সে। তার একটা ভুল আর নীরব ঔদাসীন্যই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের জন্য দায়ী। নিজের ওপর ভীষণ ঘেন্না হল। পৃথিবীতে তার মতন মানুষের কোন প্রয়োজন ছিল না, তবু কষ্ট-দুঃখ, যন্ত্রণা, অপমান ভোগের জন্যে জন্মাতে হল কেন? এই প্রশ্নের কী জবাব দেবে গান্ধারী? তবু এই প্রশ্নে ক্ষতবিক্ষত হতে লাগল সে।

গান্ধারী ঘরে একাকী খুব কাঁদল। কেঁদে কেঁদে একসময় ক্লান্ত, অবসন্ন হয়ে চুপ করল। নরম বালিশে আধো ডুবন্ত মুখ রেখে শূন্য চোখে সে চেয়ে রইল সামনের দিকে। চোখে এখন তার জল নেই। শুকনো দু'চোখে শুধু জ্বালা। জ্বালাভরা দু'চোখে সে অন্ধকার দেখছিল।

অন্ধকার আকাশ। অন্ধকারে লুপ্ত হয়ে গেল বিশ্বপৃথিবী। সবকিছু একাকার হয়ে গেল ঘন কালো অন্ধকারে। ঘরে দীপ জ্বলেনি কারো। গোটা নগর নিষ্প্রদীপ! দীপ জ্বালানোর ইচ্ছেটাই মরে গিয়েছিল

নগরবাসীর। অন্ধকারে কারো কোন অস্তিত্ব থাকে না। এক অনস্তিত্বের মধ্যে অর্থহীন হারিয়ে যাওয়া। অন্ধকার গৃহে গান্ধারী কিছুই দেখতে পাচ্ছিল না। এমন কি নিজেকেও। শুধু অনুভূতি দিয়ে টের পাচ্ছিল সত্তার অস্তিত্বকে। অন্ধকারেই মানুষ নিজেকে আপন করে পায়। গান্ধারীও ভাবছিল কি করে মিথ্যে আভিযোগ, অসত্যের গ্লানি থেকে নিজের নামকে মুক্ত করতে পারবে? সত্যের দায় বইতে প্রস্তুত, কিন্তু মিথ্যের দায় কেন নেবে? গান্ধারী আতঙ্কিত চোখে জানালার দিকে চেয়ে রইল।

অন্ধকারে অনেক জোনাকী পোকা ঘুরে ঘুরে উড়ছিল। গাছের ডালে বনস্থলীতে রহস্যময় কত সব শব্দ হচ্ছিল। শিয়াল ডাকছিল দূরে।

এখন মধ্যরাত্রি।

খোলা জানালার সামনে দাঁড়িয়ে গান্ধারী বিচিত্র রাত্রি দেখছিল। চারদিকে অন্ধকার ঘন হয়ে উঠল। কাস্তের মত কৃষ্ণ-চতুর্দশীর চাঁদ প্রশ্নচিহ্নের মত তার মুখের দিকে চেয়ে আছে। আকাশে অজস্র তারাগুলি নিষ্প্রভ, ম্রিয়মান, কত মানুষের কত যন্ত্রণার সাক্ষী হয়ে লক্ষ লক্ষ চোখ মেলে তাকে দেখছে। গান্ধারী ভারাক্রান্ত চিত্তে ঊর্ধ্ব মুখে চেয়ে রইল আকাশের দিকে। আর একটা আচমকা অপরাধের অনুভূতি হতে ক্লিষ্ট হতে লাগল গান্ধারী। তার দু'চোখ ভরে এল জল। হঠাৎ-ই তার বুক তেকে ঊর্ধ্বে ধাবিত হল পুঞ্জীভূত অভিমান। হে ঈশ্বর, সত্যি কি অপরাধী আমি? আমার দোষ কি? কুরুবংশ ধ্বংস হয়ে গেল কার দোষে? বল, আমি ডেকে এনেছি কি এই সর্বনাশ? চিরদিন সত্যে অবিচল থেকেছি। ধর্ম ত্যাগ করিনি কোনদিন। তবু এ কলঙ্ক কেন? আমি কী করেছি? গান্ধারী দুই চোখ আবার অশ্রু-ভারাক্রান্ত হল। গান্ধারীর সমস্ত ধারণা, বিশ্বাস গোলমাল হয়ে গেল।

অনেকক্ষণ জানলার সামনে নীরবে দাঁড়িয়ে থাকল গান্ধারী। মাথার চুলে এলেমেলো হাওয়া এসে লাগল। কুরুক্ষেত্রের বুক থেকে শবের গন্ধ বয়ে নিয়ে হু-হু করে কত জায়গা ছুঁয়ে ঠাণ্ডা হাওয়া এল আহত মুমূর্ষু মানুষের কাতর আর্তনাদ নিয়ে। গান্ধারীর বুকটা কেমন করে উঠল। মনটাও উতলা হল ভীষণ। মনের গতি তখন উত্তাল। কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধে মুমূর্ষু মানুষের গোঙানি, আর তাদের কণ্ঠনিঃসৃত কষ্টকর অস্ফুট আর্তস্বর তার সমস্ত চিন্তাকে ছুঁয়েছিল। আর কি ভীষণ কষ্ট পাচ্ছিল সে।

অমাবস্যার কালো আকাশ অনন্ত প্রশ্নচিহ্নের মত তার চোখের সামনে স্থির। প্রশ্নে প্রশ্নে মন অস্থির হল। কেন এমন ঘটনা হল? এমন ঘটনা ঘটার কি সত্যি কোন প্রয়োজন ছিল? প্রয়োজনের জিজ্ঞাসার যেমন আরম্ভটা ছিল না, তেমনি শেষও ছিল না। কিন্তু ঐ প্রশ্নটাই তাই সমস্ত মনকে টানতে লাগল। আর গান্ধারী তার প্রবল আকর্ষণে ক্রমাগত বর্তমান থেকে অতীতের দিকে চলেছিল।

সময় প্রবহমান। তার কোন অবস্থান নেই। সামনেই বা কি, পিছনেই বা কি ফেরা যায় বিনা আয়াসে। সময়ের কোন গন্ডি থাকে না তখন। অনাদি, অনন্ত মহাকালের সঙ্গে মুখোমুখি বসার, কথা বলার এবং দেখার কোন বাধা থাকে না।

গান্ধারী মহাকালে প্রবিষ্ট হল। পঞ্চেন্দ্রিয় দিয়ে সে তার চেনা পৃথিবীর বর্তমান এবং অতীতকে দেখতে পেল। কিন্তু সে দেখাটা ছিল বড় যন্ত্রণার। বর্তমান থেকে অতীতে ফেরা, আলো থেকে অন্ধকারে ফেরার মতই যন্ত্রণার। কিন্তু তবু এক এক সময় যখন সমস্ত অতীত বর্তমান জুড়ে চলে তার মানসপরিক্রমণ।

গান্ধারীর চোখের জল শুকিয়ে গিয়েছিল। দুচোখ শুকনো। কিন্তু শরীর অবসন্ন। ক্লান্তিতে নুয়ে পড়ছিল। মুখখানা বেদনায় থমথম করছিল। চোখের চাহনিতে কেমন একটা উদাস করা গভীর বিষণ্ণতা! কিছু ভাল লাগছিল না তার। বুকের মধ্যে একটা কান্না গুমরে গুমরে উঠছিল। থম-ধরা ব্যথায় বুকটা টনটন করছিল। আর মাথার ভেতর শিরা-উপশিরাগুলো দপদপ করছিল।

কুরুক্ষেত্রের প্রান্তর থেকে খুব সরু সুরে কাতর কান্নার অস্ফুট শব্দ বয়ে নিয়ে এল উত্তরের বাতাস। সুযোধনের গলা শুনতে পেল; 'মা-গো বড় কষ্ট। আর পারি না। বড় তেষ্টা।' দৈহিক যন্ত্রণাকে খুব কষ্টে দমন করে কথাগুলো গিলে গিলে টেনে টেনে কাতর গলায় যেন বলছিল সুযোধন, 'মাগো আমার সম্বন্ধে চিরকাল তোমার একটা গভীর দুঃখ আছে। আমি জানি, আমার ব্যবহারে তুমি আঘাত পেতে। সারাজীবন অবাধ্য থেকেছি, কথা শুনিনি। তোমাকে এড়িয়ে চলেছি। কিন্তু তুমি কোনদিন কাছে টেনে নাওনি। মাগো, ছোটবেলা থেকে আমরা মাতৃস্নেহ হতে বঞ্চিত। তাই

বোধ হয় আমার উদ্ধত, দুর্বিনীত এবং অবাধ্য হয়েছিলাম। তোমার স্নেহ-ভালবাসা চিরদিন রহস্যাবৃত রয়ে গেল। তোমার চোখে আমরা শুধু খারাপই রয়ে গেলাম। আমাদের ভাল করার, ভাল হওয়ার কোন চেষ্টা তুমি করনি। তাই জীবনের স্পন্দন বন্ধ হওয়ার আগে জিগ্যেস করব, তোমার কাছে আমি কী দোষ করেছিলাম? 'জয়ী হও' কথাটা মুখ ফুটে বললে না কোনদিন। কেন? কী অপরাধ করেছিলাম? তুমি তো চেয়েছিলে জয় হোক ধর্মের, সত্যের। কিন্তু ধর্মের সত্যি জয় হল কোথায়? জ্ঞানত যুদ্ধনীতি লংঘন করিনি। অধর্মও করিনি। তবু জয় হল কই? পাণ্ডবেরা কত ছলনা, প্রতারণা করল, অধর্ম করল; তবু পরাজয় হল কই? ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, জয়দ্রথ, শল্য কাদের ছলনায়, প্রতারণায় নিহত হল? ভীম যুদ্ধনীতি ক্ষাত্রনীতি লংঘন করে আমাকে যেভাবে আঘাত করল তাকে কি ন্যায়যুদ্ধ বলবে? তোমরা জনগণমণ অধিনায়ক শ্রীকৃষ্ণ, মহর্ষি ব্যাসদেব, পিতৃব্য বিদুর কেউই ধর্মযুদ্ধ কুরুক্ষেত্রে নিরপেক্ষ ছিল না। এই সত্যটা জেনে রাখ। এমন কি তুমিও না জননী! প্রত্যেকের বহুবিধ স্বার্থের এক মিশ্র প্রতিক্রিয়ার ফলশ্রুতি কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ। প্রতিহিংসা, প্রতিশোধ, শত্রুতা, বিদ্বেষ, ঘৃণা যে যুদ্ধের পশ্চাৎপট সে যুদ্ধ কখনও ধর্মযুদ্ধ হয়? না হতে পারে? জয় হল প্রতিহিংসার। মা-গো অনন্ত সময় চলে যাচ্ছে। আর কিছুক্ষণের মধ্যে সুযোধনের প্রাণস্পন্দন থেমে যাবে। কুরুবংশের শেষ দীপশিখা নিভে যাওয়ার আগে আমি ঊর্ধ্বমুখে প্রার্থনা করছি : 'হে ঈশ্বর, ক্ষমা কর মানুষের শত্রুতার, ক্ষমা কর ধর্মের ভণ্ডামির। ধর্মে মানুষকে সুন্দর কর, বিশ্বাসে শক্তিমান কর।'

গান্ধারী বাতায়নের সামনে চিত্রর্পিতের মত চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল। দুই-গণ্ড তার ভেসে যাচ্ছিল চোখের জলে। নিঃশব্দ রাতের গভীরতা তার একাকীত্বকে আরো গভীর করে তুলল। দীর্ঘশ্বাস পড়ল। একসময় কান্নাও থেমে গেল। কিছুটা শান্ত প্রকৃতিস্থ হল। আর তখনই মনে হল, বাতাসে একথা তো সুযোধনের কথা নয়, এ তো তারই গভীর অভ্যন্তরের কথা। বাতাসে সেই অপরাধবোধের কথাই ছড়িয়ে যাচ্ছিল। গান্ধারীর নাভিমূল থেকে উৎসারিত হল একটা গভীর লম্বা দীর্ঘশ্বাস।

গান্ধারী বুকের মধ্যে মহাকালের পদধ্বনি শুনতে পাচ্ছিল। সে নিজেই নিজের বিচারক। তার এক চোখ বর্তমানে আর এক চোখে অতীতে। তার সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ শক্তিতে সবই ধরা পড়ল। হাসি-কান্নার তরঙ্গে দুলছিল তার অতীত। বুকের ব্যথায় গুঁড়িয়ে যাচ্ছিল। স্মৃতি তোলপাড় করে উঠল। অতল থেকে তাকে তুলে আনা বড় কষ্টের, ভীষণ যন্ত্রণার।

অপরাহ্ণ থেকে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত গান্ধারী নিজের কক্ষে বসে একা যখন দুর্যোধনের কথা ভেবে, কেঁদে বুক ভাসাচ্ছিল তখন কুরুক্ষেত্রের প্রান্তরে অন্য এক ঘটনার আয়োজন চলছিল।

দ্বৈপায়ন হ্রদ। পাহাড় ঘেরা প্রাকৃতিক পরিবেশ এক আশ্চর্য সুন্দর জলাশয়। চারদিকে চোখ-জুড়ানো সবুজ গাছপালায় নিবিড় বন। স্ফটিকের মত স্বচ্ছ নীল জলে পড়েছে তার ছায়া। নীল আকাশখানা যেন হাসছে তার বুকে! হরেক রকম রঙিন মাছ খেলছে, ছুটছে। এখানে ওখানে লাল নীল কমল ফুটে রয়েছে। ফুরফুরে বাতাস আঁশের মত দাগ কেটে যাচ্ছিল জলে। এর নীচে যে সুরম্য প্রাসাদ আছে বাইরে থেকে বোঝার সাধ্য নেই কারো। উপরে হ্রদ আর নীচে রমণীয় প্রাসাদ।

শল্য নিহত হওয়ার পর দুর্যোধন পালাল। কিন্তু কোথায় পালাল? তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না কোথাও। স্বয়ং যদুপতিরও বিস্ময়ের শেষ নেই। পঞ্চপাণ্ডবসহ যদুপতি এবং অজস্র গুপ্তচর, অনুচর তন্ন তন্ন খুঁজল সুযোধনকে। তবু তার হদিস পেল না কোন। যদুপতির মত পঞ্চপাণ্ডবও চিন্তিত, উদ্বিগ্ন। তীরে এসে নৌকা ডোবানোর মত অবস্থা। বিজয়ের আর সামান্যই বাকি। বাকি শুধু দুর্যোধনের মৃত্যু। দুর্যোধন বেঁচে থাকা মানেই জয়-পরাজয়ের চূড়ান্ত মীমাংসা অসমাপ্ত থাকা। একটা ভবিষ্যৎ যুদ্ধ সম্ভবনার পথ খুলে রাখা। শত্রুতাকে জিইয়ে রাখা। তাই তার ধ্বংস, মৃত্যু উভয়ই দরকার। মৃত্যুই সমাধানের পথ। দুর্যোধন অভাবে সেই সমাধান হবে কেমন করে? হস্তিনাপুরে সিংহাসন গ্রহণের ব্যাপারে প্রশ্ন উঠতে পারে। যে রাজ্য লাভের জন্য এতবড় লোকক্ষয়ী যুদ্ধ, নিধন ছাড়া সেই রাজ্যলাভ মোটেই নিষ্কণ্টক হওয়ার কথা নয়। ভাগ্যের কী বিচিত্র গতি। একাদশ অক্ষৌহিনীর সেনাপতি, রাজনৈতিক নেতা, যুদ্ধের মহানায়ক, কুরুকুলপতির বীর দুর্যোধন মৃত্যুবরণের

জন্যে সৈনিকদের উৎসাহিত করল, আর নিজে জয়ের সব আশা পরিত্যাগ করে আত্মগোপন করল। প্রাণে বেঁচে থাকার জন্যে মানুষের কী অদম্য প্রয়াস! কিন্তু দুর্যোধনেব বেঁচে থাকা পাণ্ডবদের কাছে নিরাপদ নয়। কারণ যে মানুষ সর্বস্ব পণ করে যুদ্ধ করল তার কাছে নিজের বাঁচা যে কখনো বড় নয় শ্রীকৃষ্ণ জানে। তার আত্মগোনের পেছনে একটা বড় উদ্দেশ্য আছে। সেই উদ্দেশ্য হল নতুন করে সৈন্য, বন্ধু, অর্থ সংগ্রহ করে আবার পাণ্ডবদের সঙ্গে ভাগ্য জয়ের শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হওয়া। কিন্তু দুর্যোধনকে সেই সুযোগ পাণ্ডবরা দেবে না। শত্রুর শেষ রাখা তাদের যুদ্ধের নীতিবিরুদ্ধ।

হেমন্তের অমবস্যার বিকালে যুধিষ্ঠির, অর্জুন, ভীম, নকুল, সহদেব, জনার্দন ঘোড়ায় চেপে চারদিকে সুযোধনকে খুঁজে ফিরছিল। কৌরবপক্ষের চূর্ণ-বিচূর্ণ বিধ্বস্ত শিবিরে চারপাশ ঘুরল। কৌরব শিবিরে জনমানুষের চিহ্ন নেই। শিবির শূন্য এবং খাঁ খাঁ করছে। কৌরব শিবিরের আশেপাশে ঘুরে তারা খুব নিরাশ হল। প্রত্যেকের চোখে হতাশার ভাব ফুটল। যুধিষ্ঠিরের মত শ্রীকৃষ্ণও দুর্যোধনের জন্যে বিচলিত। উভয়কে ভীষণ অস্থির এবং অশান্ত দেখাচ্ছিল। তাদের দেখেই বোঝা যাচ্ছিল তারা খুব স্বাভাবিক অবস্থায় নেই। বেশ একটা উন্মত্তা এবং উত্তেজনা রয়েছে সবার মধ্যে। যুদ্ধ জয়ের পর তুষ্টির ভাব থাকলেও মনের মধ্যে স্বস্তি ছিল না।

দুর্যোধনকে খুঁজে না পেয়ে তারা বিষণ্ণ মুখে শিবিরের দিকে এগোল। শিবিরে ফিরে তাদের একমাত্র আলোচনার বিষয় হল অশ্বত্থামা, কৃতবর্ম, কৃপাচার্য, এখনও জীবিত। দুর্যোধন পলাতক। এর মধ্যে কোন নতুন ষড়যন্ত্র আছে কি না, এই আশঙ্কায় তারা কণ্টকিত হতে লাগল।

এমন সময় ভীম এসে শ্রীকৃষ্ণকে বলল, কয়েকজন ব্যাধ দুর্যোধনকে দ্বৈপায়ন হ্রদের জলস্তম্ভের মধ্যে প্রবেশ করতে দেখেছে। হ্রদের অদূরে গাছপালার ছায়ায়, ঝোপের আড়ালে তিনজন যোদ্ধাকে দেখেছে। ব্যাধদের একজন কৃপাচার্যকে চেনে বলল। তা হলে আর দেরি কেন সখা?

সহসা শ্রীকৃষ্ণের বুকে হৃৎস্পন্দনের শব্দ বেড়ে গেল। আশার নাকাড়া বাজল বুকের ভেতর। গভীর এক দৃষ্টিতে পাণ্ডবদের দিকে তাকিয়ে হাসি হাসি মুখ করে বলল : চল, আমরা দ্বৈপায়নেই যাই।

সূর্য তখন অস্তাচলে।

আকাশ রক্তের মত লাল। পাখিরা গাছের ডালে ডাক ভুলে নিশ্চুপ হয়ে বসে আছে। একটা কিছু ঘটার আশংকায় তারা পাথরের মত স্তব্ধ, শান্ত নির্বিকার।

পশ্চিম দিগন্তে ঢলে-পড়া বেলা ধীরে ধীরে গড়িয়ে আসছে চাবদিক থেকে। একটা ঠাণ্ডা ভাব নামছে খুব ধীরে। কিন্তু পঞ্চপাণ্ডব এবং তাদের সখার কোন শীতবোধ নেই। যদিও যুদ্ধে তারা কেউ একেবারে অক্ষত নয়। তবু পোশাকের অনাবৃত শরীরের অংশে নানা ক্ষতের দাগ। সেখান থেকে রক্তে চুঁইয়ে পড়ছিল। কিন্তু সে-সব ভ্রূক্ষেপ করল না। চতুর্দিকে সজাগ দৃষ্টি রেখে তারা কুয়াশার মাখা অমাবস্যার অন্ধকারে দুর্যোধনকে খুঁজছিল।

পথে ভীম একটা কথাও বলল না। তার চোখের তারায় ভাসছিল পাশা খেলার দৃশ্য। লাঞ্ছিতা; অপমানিতা, অর্ধবিবস্ত্রা দ্রৌপদীকে দুর্যোধন হাতছানি দিয়ে ডাকছে। উরুর ওপর বসার জন্যে বার বার ইশারা করছে। সেই দৃশ্য, দুর্যোধনের চোখ, চাহনি সব ভীমের মনে এমন করে গেঁথে দিয়েছিল যে তেরো বছর পরে তা ম্লান হল না। দুঃশাসনের বক্ষরক্ত পান করে সে পাঞ্চালীর অপমানের শোধ নিয়েছে। বাকি আছে দুর্যোধনের উরুভঙ্গের শপথ। যাত্রাকালে পাঞ্চালী তার কানে কানে বলে দিয়েছে : প্রিয়তম, ভুলো না পাঞ্চালী শুধু তোমার মুখ চেয়ে বেঁচে আছে। পাঞ্চালীর সব দুঃখের সান্ত্বনা তুমি। তুমি ছাড়া পাঞ্চালীর নিজের বলতে কে আছে। পাঞ্চালীকে সার্থক করেছ, ধন্য করেছ। তুমিই আমার পরম গতি। তোমাকে ছাড়া কাকে বলব আমার সে অপমানের কথা? কে আছে পাঞ্চালীর? প্রিয়তম, মনে আছে, দুর্যোধন তার উরুর ওপর আমাকে আহ্বান করেছিল। মনে আছে, কী প্রতিজ্ঞা তুমি করেছিলে? মনে আছে?

পাঞ্চালীর বাক্যে ও প্রশ্নে ভীমের ভেতরটা কেঁপে উঠল। আর অদ্ভুত এক অনুভূতিতে তার ভেতরটা টইটম্বুর হয়ে যাচ্ছিল। দুই চোখে কেমন একটা নিবিড় ব্যাকুল ভাব ফুটে ওঠল। অন্তহীন বিস্ময় নিয়ে ভীম দ্রৌপদীর দিকে চেয়ে মাথা নাড়ল। অস্ফুট গলায় বলল, মনে আছে।

স্বপ্নাতুর দুটি চোখ ভীমের চোখের ওপর রেখে পাঞ্চালী বলল, স্মরণে থাকবে?

কথাগুলো ভীমের বুকের ভেতর ঝংকার বেজে গেল। গদগদ স্বরে বলল, কতকাল হল, তবু সেই অপমানটা বুকের ভেতর থাবা গেড়ে আছে। তার পরেই তার কণ্ঠস্বরের ধ্বনি বদলাল। বলল, যুদ্ধে লিপ্ত হলে আমার হয়ত কিছুই মনে থাকবে না।

দ্রৌপদী ভুরু টান টান করে মদির কটাক্ষ হেনে বলল, প্রিয়তম, পাঞ্চালীকেও তোমার মনে পড়বে না? তোমার শপথ, সত্য, ভুলতে পারবে?

পাঞ্চালী, প্রতিদ্বন্দ্বী দুর্যোধনকে গদাযুদ্ধে হারানো সোজা কথা নয়। সৎপথে থেকে যুদ্ধে হারানো তাকে সহজ নয়। একাগ্রতা ভিন্ন তার সঙ্গে যুদ্ধ করা যায় না। একটু অন্যমনস্ক হলেও তার মুষলের আঘাতে পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হতে হবে। তুমি অবুঝ হয়ো না। সখা কৃষ্ণকে বল। যথা সময়ে তিনি যেন আমাকে প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করিয়ে দেন।

শ্রীকৃষ্ণের ডাকে ভীমের চমক ভাঙল। সখা এই হল জনস্থানমধ্যবর্তী দ্বৈপায়ণ হ্রদ। কৌরব-পাণ্ডবের যুদ্ধের শেষ রণক্ষেত্র। এই যুদ্ধই শেষ যুদ্ধ। তোমাকে লড়তে হবে। মনকে শান্ত এবং সংযত রাখ। কোনরকম উত্তেজনায় মনকে চঞ্চল কর না। একাগ্রতা চাই।

ভীমকে জলস্তম্ভের সামনে পাহারা বসিয়া কৃষ্ণ চার ভাইকে আর কিছু সৈন্য নিয়ে ঘোড়া ছুটিয়া গুপ্ত দ্বার খুঁজে বেড়াল। যুধিষ্ঠির দ্বৈপায়ন হ্রদের ধারে গিয়ে দুর্যোধনের নাম ধরে কত ডাকল। কত ভাল কথা বলল। আশ্বাস দিল। তবু কোন সাড়া মিলল না। অবশেষে ক্ষুব্ধ কণ্ঠে নানারকম যাচ্ছেতাই ভাষায় কটূক্তি করে তাকে ডাকতে লাগল।

চতুর শ্রীকৃষ্ণের পরমর্শে অবশেষ অর্জুন অশ্বত্থামা এবং কৃপাচার্যের গলা নকল করে দুর্যোধনের নাম ধরে ডাকল। বলল, প্রিয় দুর্যোধন, আমরা তোমার মঙ্গলকাঙ্ক্ষী। আত্মগোপনের চেষ্টা যখন জানাজানি হয়ে গেল, তখন পালিয়ে থাকাটা বিড়ম্বনা এবং অপমানের। তোমার মত বীরের এবং মহারথীকে কখনও তা মানায় না। তুমি বেরিয়ে এস। যথার্থ বীরের মত যুদ্ধ করে হয় জয়ী হও অথবা মৃত্যুবরণ কর। তোমার মত বীরের এই কাপুরুষতা মানায় না।

এবার হ্রদের অভ্যন্তর থেকে দুর্যোধনের স্বর শোনা গেল। বলল, বন্ধু অশ্বত্থামা, দুর্যোধন যুদ্ধের ভয়ে ভীত নয়। সে কাপুরুষও নয়। যথাসময়ে আত্মপ্রকাশ করবে। এখন সে রণক্লান্ত, ভীষণ আহত। একটু বিশ্রাম করতে দাও। পাণ্ডবদেরও বিশ্রাম করতে বল। শরীর একটু চাঙ্গা হলেই আবার যুদ্ধ করব।

যুধিষ্ঠির প্রতুত্তরে বলল, আমাদের যথেষ্ট বিশ্রাম হয়েছে। এখন আমরা চাই তোমাকে। তোমার সঙ্গে শেষ বোঝাপড়া বাকি আছে। যুদ্ধের জয়-পরাজয়ের চূড়ান্ত মীমাংসা হওয়ার পর অনন্ত বিশ্রামের সময় পাবে। এখন গুপ্তগহ্বর থেকে বেরিয়ে এস। আমরা শত্রুর শেষ রেখে ঘরে ফিরব না। নরকের কুকুর বেরিয়ে এস। দ্বৈপায়ন হ্রদ থেকে পালানোর সব পথ তোমার বন্ধ। মিথ্যে কালহরণ করে কোন লাভ নেই।

দুর্যোধন ভেঙে পড়ল। হতাশ গলায় বলল, পরাজয়ের আর কি বাকি আছে? সকলেই নিহত। শুধু একা আমি মৃত্যুর সঙ্গে লড়ছি। আমি বিনা যুদ্ধেই পরাজয় মেনে নিচ্ছি। তুমি নিশ্চিন্ত মনে হস্তিনাপুরে ফিরে যাও যুধিষ্ঠির। রাজ্য-সিংহাসনে আমার আর কোন লোভ নেই। তুমিই ভোগ কর। আমি কোন দাবি করব না। যুদ্ধ করব না। তোমরা ফিরে যাও। আমি বাকি জীবনটা মুনিঋষির মত ফলমূল খেয়ে বনে বনে কাটিয়ে দেব।

যুধিষ্ঠিরের মনে যুগপৎ ভয় ও বিস্ময়। সে একটু থমকে গেল। কী জবাব দেবে ভেবে পেল না। অসহায় দৃষ্টিতে কৃষ্ণের মুখের দিকে তাকাল। কৃষ্ণ ইশারা তাকে কটুবাক্যে আরো উত্তেজিত করতে বলল। দুর্যোধনের বীর্যবর্তার দম্ভে ও অহংকারে আঘাত দিয়ে বলল, তোমার সেই দম্ভ, আস্ফালন কোথা গেল দুর্যোধন? তুমি এত ভীরু, কাপুরুষ স্বপ্নেও কল্পনা করিনি। তোমার মত নিবীর্য কাপুরুষকে যুদ্ধে আহ্বান করতেও লজ্জা হয়। কিন্তু আমরা শত্রুতার কোন শেষ রাখতে চাই না। শত্রুর কথার দাম নেই। তাকে বিশ্বাসও করি না। তার কোন করুণা কিংবা দান আমরা চাই না। আমরা যুদ্ধ করে জয়ী হতে চাই। তুমি চিরদিন কুমতলবী। তোমার উদ্দেশ্য ভাল নয়।

তোমাকে জীবিত রেখে সিংহাসনে বসব এত বোকা আমি নই। তাছাড়া তুমি পরাজিত। তুমি রাজ্য দেবার কে? রাজ্য আমরা যুদ্ধ করে নেব। তুমি যুদ্ধ চেয়েছিলে। মনে পড়ে, পাঁচখানি গ্রাম ভিক্ষার জবাবে কী বলেছিলে? মনে পড়ে, বিনা যুদ্ধের নাহি দেব সূচাগ্র মেদিনী? আজ বিনা যুদ্ধে সেই মেদিনীর ভার তোমার হাত থেকে নিতে পারি আমরা? দুর্যোধন, মনে পড়ে, একদিন বিষ দিয়ে তুমি ভীমকে হত্যা করতে চেয়েছিল? মনে পড়ে, পাণ্ডবেরা এবংশের কেউ নয়। তারা কুন্তীর জারজ পুত্র? দুর্যোধন, তুমি যদি ধৃতরাষ্ট্রের জারজ সন্তান না হও তা-হলে বেরিয়ে এস গুপ্ত গহ্বর থেকে। এস, আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ কর। প্রমাণ কর, গান্ধারীর জারজ সন্তান তুমি নও।

দুর্যোধন আর থাকতে পারল না। ধৈর্যের বাঁধ ভাঙল। দারুণ ক্রোধে উত্তেজনার তার সর্বশরীর থর থর করে কেঁপে উঠল। নির্মল চরিত্রের সতীসাধ্বী জননীর চরিত্রেও নামের গায়ে এতবড় অপবাদ আর কলংক লাগার আগে তার মৃত্যু ভাল। দুর্যোধন যুধিষ্ঠিরের অপবাদের জবাব দিতে জলস্তম্ভের প্রবেশ দ্বার খুলে বেরিয়ে এল। কাঁপতে কাঁপতে বলল, যুধিষ্ঠির তুমি যে এত নীচ, কর্কশভাষী জানতাম না। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের তোমার ধর্মের ভেকটা খসে গেল। তুমি আর ধর্মাত্মা নও, পাপাত্মা। স্বার্থের জন্যে, লোভের জন্যে তুমি করনি এমন হীন কাজ নেই। তুমি আমার সতীসাধ্বী মাকেও অপমান করলে। তোমাকে আর ক্ষমা করতে পারি না। আমার হাতে আজ তোমার পরিত্রাণও নেই। যদিও ভীষণ আহত, রণক্লান্ত, একা, অস্ত্রহীন, তবু যুদ্ধ করব। কেবল অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে একটু রণনীতি পরিবর্তন করতে অনুরোধ করব। তোমাদের অস্ত্র, রথ, সৈন্য সব আছে। কিন্তু আমার তো কিছু নেই। আমাকে তোমাদের অস্ত্র দাও মুষল দাও, ধনু, তূণ, শর দাও। তারপর এক একজন করে তোমরা পাঁচজনে আমার সঙ্গে দ্বৈরথ যুদ্ধ কর।

যুধিষ্ঠির একরকম একটা অদ্ভুত আবেদনে অস্বস্তি বোধ করল। চট করে জবাব দিতে পারল না। উদ্বেগে তার বুকের ভেতরটা শুকিয়ে গেল। কিন্তু খুব অল্পক্ষণের জন্যে। বিস্ময়ের ঘোর কেটে গেলে সে কৃষ্ণের দিকে তাকাল। কৃষ্ণ ইশারায় তাকে সম্মতি দিতে বললে যুধিষ্ঠির বলল, বেশ তাই হোক। তোমার যে অস্ত্র পছন্দ বেছে নাও। যুদ্ধ হোক মাটিতে। আর আমাদের যাকে খুশি তুমি রণে আহ্বান কর। আমাদের একজনকে হত্যা করে যদি তুমি জিততে পার তা-হলে আমাদের রাজ্য-সিংহাসন তুমিই পাবে।

মুষল যুদ্ধে পারদর্শী দুর্যোধন সর্বাগ্রে একটি গদা বেছে নিল। তারপর তার চির প্রতিদ্বন্দ্বী ভীমকে আহ্বান করল দ্বৈরথ সংগ্রামে।

আরম্ভ হল তুমুল গদাযুদ্ধ। আক্রমণ প্রতি আক্রমণ গদাযুদ্ধ জমে উঠল। চোখ কেড়ে নেওয়ার মত গদাযুদ্ধ। দুই বীরের জীবন-মরণ লড়াই। ভীম আক্রমণ ঠেকাতে গিয়ে মাটিতে পড়ে গেল। দুর্যোধন আঘাতে সে বেশ কিছুক্ষণ অচৈতন্য হয়ে পড়ে রইল। কৃষ্ণ প্রমাদ গনল। দুর্যোধন রণশ্রান্ত হলেও তাকে পরাস্ত করা খুবই কঠিন। অন্যায় যুদ্ধ ছাড়া তাকে হারানো অসম্ভব। কৃষ্ণ তখন নিজের উরুতে বারংবার আঘাত করে ভীমকে দুর্যোধনের উরুভংগের সংকেত করল। ভীমেরও মনে পড়ে গেল প্রতিজ্ঞার কথা। দুর্যোধন ভীমকে মরণ আঘাত হানার জন্যে শূন্যে লম্ফ দিয়ে গদা চালাল। সেই সুযোগে ভীম দুর্যোধনের জানু ও তালপেট লক্ষ করে গদা ছুড়ে মারল। দুর্যোধন একবার 'মা' বলে আর্তচিৎকার করে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। আর উঠল না।

দুই জানু ভেঙে দুর্যোধন রক্তপ্লুত কলেবরে মাটিতে পড়ে ছটফট করছিল। মাঝে মাঝে রক্তবমন হচ্ছিল। সেই করুণ, ভয়ংকর মৃত্যু দেখতে, তার কাতর আর্তস্বর শুনতে কোন প্রিয় আপনজন তার পাশে ছিল না। তার মৃত্যুর সময় কেউ এক ফোঁটা চোখের জলও ফেলল না। এক নিদারুণ বিশ্বাসঘাতকতার অপঘাতে মৃত্যু হল দুর্যোধনের।

চারদিক থেকে অমাবস্যার কালো অন্ধকার এসে ঢেকে দিল দুর্যোধনের শব। জলস্থল অন্তরীক্ষের সব বাস্তবতা হারিয়ে গেল দুর্যোধনের চৈতন্যের অতলান্ত গভীরে। কৌরব-পাণ্ডব যুদ্ধের ওপর যবনিকা পড়ল। রাগ, বিদ্বেষ, ঘৃণা, প্রতিহিংসা অপমানের অবসান হল। কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধের শেষ হল।

কুরুবংশের শেষ বীর এবং বংশধর দুর্যোধন দ্বৈপায়ন হ্রদের ধারে নিশ্চল হয়ে পড়ে রইল। টান টান শুয়ে আছে দুর্যোধন। মুখ খোলা। ঠোঁটের ফাঁকে ঝকঝকে দাঁতের সারি। উন্মুক্ত ঠোঁটের দুর্বোধ্য কষ্টে একটা ক্ষীণ অস্পষ্ট গোঙানির শব্দ থেমে থেমে হতে লাগল। প্রাণটা তখনও বুকের ভেতর ধুক্‌ধুক্ ধুক্‌পুক্ করছিল। আর তাকে ঘিরে মাংসভুক পশুর চোখগুলো ক্ষুধায়, লোভে অন্ধকারের মধ্যে জ্বলজ্বল করে জ্বলছিল। পশুরা তার চারপাশে বেশ অধৈর্য হয়ে উঠল। তবু দুর্যোধন ক্ষীণ ক্ষমতা নিয়ে হাত তুলে তাদের তাড়াতে লাগল। ক্রমে যে ক্ষমতাটুকু আর থাকল না। একটু একটু করে লুপ্ত হয়ে এল তার চেতনা। বেশ একটা গভীর ঘুমের মধ্যে সে তলিয়ে যেতে লাগল। অন্ধকার আরো কালো হয়ে এল। চোখের দৃষ্টি ঘোলাটে। কিছুই দেখছিল না সে। বেশ বুঝতে পারল, একটা সাহসী জানোয়ার তার হাত থেকে এক খাবলা মাংস তুলে নিল। তারপরেই বুকের ওঠা-নামা শ্বাসও থেমে গেল। নিষ্প্রাণ দুর্যোধনকে অমনি জানোয়ারেরা ঘিরে ধরল। থাবা দিয়ে, দাঁত বসিয়ে শরীর থেকে মাংস ছিঁড়ে নিতে লাগল।

খবরটা পৌঁছতেই যা দেরি। প্রিয়তম পুত্র দুর্যোধনের পতন সংবাদ শুনে গান্ধারী আর স্থির থাকতে পারল না। পুত্রবধূ ভানুমতীকে নিয়ে সেই রাতেই সব বাধা, ভয় ঠেলে দ্বৈপায়ন হ্রদে এল। মশালের আলোয় যা দেখল গান্ধারী সহ্য করতে পারল না। মূর্ছা গেল।

সূর্যের আলো আর পাখির ডাকে তার জ্ঞান ফিরল। চোখ মেলল। চেয়ে দেখল ভানুমতী দুর্যোধনের মৃতদেহ কোলে নিয়ে পাথরের মূর্তির মত বসে আছে। দৃষ্টিহীন নিষ্প্রাণ চোখ থেকে গড়িয়ে পড়ছিল অশ্রুধারা। গান্ধারী চোখেও অশ্রুর বিরাম নেই। যে দুর্যোধনের মস্তকে হেমছত্র শোভা পেত, তুষারশুভ্র নরম কোমলশয্যা ছাড়া যার নিদ্রা হত না, সে আজ ধূলিধূসরিত মাটিতে অনাদরে অবহেলায় পড়ে আছে। সুন্দরী রমণীরা যার পাশে পরিচর্যার জন্যে সর্বদা বিরাজ করত, আজ তার পাশে বিরাজ করছে ক্ষুধার্ত নরমাংসভুক শ্বাপদেরা। বড় বড় রাজা মহারাজা যার পাশে উপবেশন করে ধন্য ও গর্বিত হত, আজ নিহত ধরাশায়ী সেই রাজা দুর্যোধন শকুন শকুনি পরিবেষ্টিত হয়ে বিরাজ করছে। কুরুক্ষেত্রে মহাশ্মশানে সুযোধনের অসহায় জীবনহীন দেহের চারপাশের দৃশ্য দেখে জননীর মাতৃহৃদয় হাহাকার করে উঠল। বুকের ভেতর প্রলয় ঘটে গেল। এক গভীর যন্ত্রণা আর শূন্যতাবোধ প্রমত্ত ঝড়ের মত ধেয়ে এে তাকে ছিন্নভিন্ন করে দিল। বিধাতার এ এক নিষ্ঠুর পরিহাস। বুকের ভেতর ঝড় উঠল গান্ধারীর। হাউ হাউ করে কাঁদল গান্ধারী।

দু'চোখ বন্ধ করে রাখল গান্ধারী। চোখ খুললেই মৃত পুত্রে ছিন্নভিন্ন দেহাবশেষ তাকে দেখতে হবে। ভানুমতীকে তার বুকেতে শক্ত করে চেপে ধরে বলল, ভানুমতী, তোমার মতই আমিও বড় দুঃখী। সব দোষ আমার ভাগ্যের। ভাগ্যের চেয়ে বড় কিছু নেই। পুরুষকার হল বীর্যবান পুরুষের মিথ্যে দম্ভ আর আস্ফালন। এর জন্যেই কত তরবারি খুলল। কত মানুষ মরল। আর তার পায়ে পায়ে হেঁটে এল আমাদের সর্বনাশ। ভানুমতী তুমি চুপ করে থেক না। কাঁদ। যুদ্ধের মহাশ্মশানে পাণ্ডবেরা কাকে জয় করল জান? শোককে, মৃত্যুকে! শক্তি দিয়ে, অসুরত্ব দিয়ে, অধর্ম দিয়ে তারা জয় করল দুর্ভাগ্য, সর্বনাশ, হতাশা। ভাগ্যের কাছে পাণ্ডবেরা একটা জয় ছাড়া কিছু পায়নি। কিছু নেইও আর। সব গেছে। ভাগ্য যুদ্ধের কর্কশ হিংসার ঘায়ে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গেছে। সব নিশ্চিহ্ন করেছে মহাকাল। সব ধ্বংস, সব মৃত্যু শেষে অনির্বাণ শুধু সুযোধনের গরিমা। অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে তার নাম। দেশের জন্যে, স্বাধীনতার জন্যে, মানুষের মঙ্গলের জন্যে পৃথিবীর ধ্বংসের শেষদিন পর্যন্ত দুর্যোধন বেঁচে থাকবে সুযোধন হয়ে। সেই তো আমাদের গর্ব। আমার সকল দুঃখের সান্ত্বনা। কথাগুলো কেঁদে কেঁদে, টেনে টেনে বলল গান্ধারী।

ভানুমতীর কোন প্রতিক্রিয়া নেই। সে নড়ল না, কথা বলল না। শোকে নিশ্চল শিলামূর্তির মত মণিহারা দুই চোখ মেলে চেয়ে রইল গান্ধারীর মুখের দিকে। শূন্য দৃষ্টি। বিলাপ নয়, ক্রন্দন নয়, পাথার-চাপা হৃদয় গহ্বর থেকে উৎসারিত হল যন্ত্রণার হিমবাষ্প। একগভীর দুঃখের সঙ্গে মিশে দীর্ঘশ্বাসের মত পড়ল যার নাম হাহাকার।

গান্ধারীর কাছে জীবনের অর্থটাই বদলে গেল। জীবনে যে এমন ঘটনা ঘটতে পারে কোন মানুষই ভাবতে পারে না। কিন্তু ঘটনার বাস্তব নিষ্ঠুরতায় তার মন ছেয়ে আছে। বিষাদে বিস্বাদে ভরে আছে। শুধু পুত্র শোকের দুঃখ নয়, স্বজন বিয়োগের ব্যথা, অনাত্মীয় সুযোধনের প্রিয় সহযোদ্ধা এবং সাধারণ যোদ্ধা, যারা সুযোধনের স্বার্থে নিহত হল তাদের বিয়োগ-ব্যথায় গান্ধারীর হৃদয় আকুল হল। সুযোধনের শোকটা তাদের শোকানুভূতিতে রূপান্তরিত হল। এইসব সাধারণ মানুষের নিজের জীবনটুকু সম্বল। আর ঢাল, তরোয়াল, বর্শা, ধনুক, শর হল মূলধন। এই নিয়ে নিঃস্বার্থে আত্মদানে দুর্যোধনের জয় হল কৈ? অথচ কত দেশ, কত গ্রাম থেকে তারা প্রত্যাশা নিয়ে এসেছিল, তাদের জীবনের বিনিময়ে দেশ বাঁচবে, জাতি বাঁচবে, রাজা দীর্ঘজীবী হবে। কিন্তু তাদের সেই প্রত্যাশা পূরণ হল কৈ? তাদের কর্তব্যের তো কোন ত্রুটি ছিল না। নিঃস্বার্থ প্রাণদানে কোন কৃপণতা ছিল না। তা-হলে এই পরাজয় হল কেন? এইসব নামহীন, পরিচয়হীন সন্তানদের দুঃখ, শোক বেদনায় অনুশোচনায় গান্ধারীর বুকের ভেতরটা টাটাতে লাগল।

সুযোধন নেই। তার একটি সন্তানও বেঁচে নেই। সারা কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধে তার বলতে একজনও নেই। দুর্যোধনের একজন বন্ধুও নেই, কোন সৈনিকও বেঁচে নেই। শুধু সে আছে, আর ঘরশত্রু বিদুর আছে। আরো আছে অসংখ্য বিধবা, শোকাকুলা রমণী, গান্ধারীর মতই শোকে পাথর হয়ে।

নিহত সৈনিকদের কথা ভাবলে গান্ধারীর বুকটা কেমন করে ওঠে। তাদের মৃত্যুর সময় এক ফোঁটা চোখের জল ফেলার মত একজন প্রিয়জনও ছিল না তাদের পাশে। অপরিচিত বিদেশে শুধু একজন রাজার স্বার্থ, জাতির স্বার্থ বাঁচাতে নিষ্ঠুর পরিবেশ তারা নিশ্চিহ্ন হয়েছে। কল্পনায় দেখতে লগাল তাদেব মৃত দেহগুলি মুখ থুবড়ে পড়ে আছে মাটিতে। কিছু পচা দুর্গন্ধ শব দাহ করছে সহযোদ্ধারা, কিছু ফেলেছে পরিখার গর্তে, বাকি ভেসে গেছে হিরন্ময়বতীর জলে। এদের কথা ভাবতে ভাবতে গান্ধারীর দু'চোখ জলে ভরে গেল। মৃত্যুকালীন তাদর দুঃখটা গান্ধারী নিজের বুকে অনুভব করল। নিহত সৈনিকের জন্যে সে কাঁদল শোকের কান্না। মৃত্যুর আগে তাদের প্রত্যেকেই স্নেহশীল একখানা মুখ খুঁজেছিল নিষ্ফল হয়ে কত কষ্ট আর আপশোষ নিয়ে চোখ বুজেছিল। সে কথা মনে হলে সুযোধনের মুখখানা মনে পড়ে। তখন রুদ্ধ প্রকোষ্ঠে আর তিষ্ঠতে পারে না। বড় ভার লাগে বুক। আর নিজেকেই অপরাধী মনে হয়। তাপিত অন্তরের সান্ত্বনা খুঁজতে সে কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গণে যাবে বলে রথে উঠল।

বাতাস কেটে রথ ছুটল। বাতাসের সাঁ সাঁ শব্দ ছাড়া তার কানে আর কিছু যাচ্ছিল না। উদাস চোখ দুটি ছড়িয়ে দিয়ে বাইরের দিকে চেয়েছিল। দৃশ্যের পর দৃশ্য সরে যাচ্ছিল। কিন্তু কিছুতেই তার মন ছিল না। কেবল একটা ব্যথা, দুঃখ, অনুশোচনায় তার বুক জ্বালা করছিল। একটা হাহাকার দীর্ঘশ্বাসকে পাক দিয়ে ঘুরতে লাগল। গান্ধারী নিঃশব্দে অশ্রু বর্ষণ করছিল।

দীঘল পথের চিত্রময় নিস্পন্দ অরণ্যের সারি সারি বৃক্ষ যেন কুরুক্ষেত্রের রণে নিহত সৈনিকদের শোকস্তব্ধ বিবর্ণ, বিষণ্ণ জনক-জননী, জায়া এবং প্রিয়জন। ভর্ৎসনার চোখে তারা যেন তাকিয়েছিল। কত জায়গা, কত দেশ ছুঁয়ে, কত হাওয়া দুঃখী, তাপিত, মানুষের কান্না, হাহাকারের বাণী নিয়ে ছুটে এল তার দিকে। তীক্ষ্ণ ছুরির ধারের মত তার বুকের ভেতরটা খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে দগ্‌দগ্‌ করে ফেলল। নিজেকে বড় নিরুপায় আর অসহায় মনে। এই মুহূর্তে স্বজন হারানোর সান্ত্বনা এবং দুঃখ দুর করার সহনুভুতির যদি দেখাতে পারত নিহত পরিবারের স্বজনদের তা-হলে এই কষ্টটা, এত তীব্র লাগত না। কিন্তু নিজের পথ নিজে খুঁজে নেওয়ার কোন উপায় নেই। নেবে কেমন করে? নিজের বুকটাই যে শোকের সাগর হয়ে আছে।

কুরুক্ষেত্রে প্রান্তরে এসে রথ থাকল। বিশাল প্রান্তরে সবুজের কোন চিহ্ন নেই। মাটি কর্ষিত। চাপচাপ শুকনো রক্তে কালো হয়ে আছে জায়গাটা। মৃতদেহের তলায় চাপা পড়ে আছে সবুজ তৃণভূমি। যতদুর দৃষ্টি যায় গান্ধারী দেখল শব আর শব। বাতাস দুর্গন্ধময়। আর্ত মনটা গান্ধারীর কেমন করে উঠল। চোখ ভরে জল নামল। শ্রাবণ ধারার মত।

কিন্তু এ কোন দৃশ্য দেখল গান্ধারী? কত রমণী এসে তার পুত্র, স্বামী এবং পিতাকে খুঁজছিল। মৃতস্তূপের মধ্যে একখানা চেনা মুখ খুঁজে পাওয়ার জন্যে পাগলের মত করছিল তারা। আর না পেয়ে হতাশ হয়ে বুক চাপড়াচ্ছিল। দীর্ঘশ্বাস ফেলছিল। হা-হুতাশ করছিল। কেঁদে কেঁদে তাদের অনেক চোখ ফুলিল, গলা ভাঙল। তবু শোকে তাদের বুকের ভেতরটা জ্বলে যাচ্ছিল। ছিন্ন শির নিয়ে কেউ বিলাপ করছিল। কখনও মুণ্ডুটা কবন্ধ মৃত দেহে জোড়া দিয়ে তাকে সনাক্ত করার চেষ্টা করছিল। আর আকুল হয়ে কাঁদতে লাগল। কত সুখ-দুঃখের স্মৃতি রোমন্থন করে তারা হাহাকার করছিল। নিষ্প্রাণ রক্তমাখা বিবর্ণ মুণ্ডুটি মুখে চেপে ধরে এক হতভাগিনী আদর করছিল। আর নিজের মনেই সমস্ত কথা বলে যাচ্ছিল। আর দুর্ভাগিনী রমণীকে কাতর স্বরে বিলাপ করতে শুনল; আকাশভরা তারার মাঝখানে আমি তারাহীন হয়ে বাঁচতে পারব না গো? কথাগুলো গান্ধারীকে ছুঁয়ে গেল। তার হৃদয় বিদীর্ণ হল। অভাগিনীর মধ্যে বুকের আধখানা হাহাকার করে উঠল। অনুশোচনায় বুক জ্বালা করতে লাগল। কুরুক্ষেত্রে প্রাঙ্গণ জুড়ে অভাগিনী রমণীদের বুকফাটা কান্না শুধু। কত শূন্যতা নিয়ে, অনিশ্চয়তা নিয়ে আগামী দিনগুলো ফাঁকির বাঁশি বাজিয়ে কাটাতে হবে তাদের সেই দুঃখ শোক হাহাকারে তাদের হৃদয় মথিত হতে লাগল।

ঈশ্বরের কাছে নালিশ জানাল। মানুষের নিষ্ঠুরতার, লোভ, স্বার্থকে অভিশাপ দিল। এরকম একটা ভয়ংকর নিষ্ঠুর দৃশ্য তাকে শোকে স্তব্ধ করল। আকাশের দিকে দীন নয়নে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, কার পাপে হে ঈশ্বর! মানুষের এত বড় সর্বনাশ হল? এই যুদ্ধের জন্যে যে দু'জন সবচেয়ে বেশি দায়ী সেই বিদুর আর শ্রীকৃষ্ণকে তুমি ক্ষমা কর না। শুধু শ্রীকৃষ্ণ চাইলেই এত রক্ত ঝরত না, এত মানুষের অসহায় কান্নায় পৃথিবী বিষণ্ণ হত না। মহাশ্মশানে দাঁড়িয়ে রিক্ত হয়ে গান্ধারীকে বিলাপ করতে হত না। মানুষের চোখে তার পুত্র আজ পাপী। সব অপরাধ তার। আর তার যন্ত্রণা শাস্তি তাকে ভোগ করতে হল। আর যে, নিজের স্বার্থে যুদ্ধ চেয়েছিল সেই কৃষ্ণ নিরপরাধ। এই মানুষটাই পৃথিবীর সবচেয়ে ক্ষতি করেছে? এই লোকটার কাছে শিখলাম সত্যবাদিতা পাপ, এই মানুষটা চোখে আঙুল দিয়ে দেখাল যুদ্ধে ধর্ম বলে কিছু নেই। মানুষকে ছলনা করায় কোন দোষ নেই, মিথ্যে বলা কোন অধর্ম নয়, অধর্ম করলে পাপ হয় না। দুর্যোধন আমার কথা শুনেই ধর্ম পথে থেকেছে। মিথ্যেক পাপ বলে পরিহার করেছে। তাই সে হেরেছে, মানুষের বিচারে সে অপরাধী। সব সহানুভূতি থেকে বঞ্চিত। আমি তাকে ঠকিয়েছি। তাই এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত্য করতে হে ঈশ্বর, তুমি আমাকে বাঁচিয়ে রাখলে। এখনত আমার ভুল ভেঙেছে। শিক্ষা হয়েছে। এখন তুমি আমাকে তুলে নাও। মানুষের পৃথিবীটাকে চেনাতে তো তুমি এত সব করলে। তবে আর কেন, আমাকে তুমি মুক্তি দাও। আর কত যন্ত্রণা দেবে? বলতে বলতে গান্ধারী দুই চোখের কোণ দিয়ে টপটপ করে জল পড়তে লাগল। অঝোরে। গান্ধারী মুছল না। এ তার অশ্রু তর্পণ। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে নিহত সব মৃতের অতৃপ্ত আত্মার দুঃখকষ্টকে অশ্রুর প্রলেপ দিয়ে সে যেন মুছে দিতে লাগল।

গান্ধারী নিজের মনেই বিলাপ করছিল। আকাশ বাতাস অন্তরীক্ষ থেকে তার ক্ষীণ আর্তস্বর একমাত্র সাবধানবাণীর মত শোনাতে লাগল! মানুষের পৃথিবীতে এক একটা সময় আসে যখন সমাজ সংসারে প্রত্যেকেটি মানুষ নিজেকে প্রবঞ্চনা করে একটা অদ্ভুত আত্মপ্রসাদ লাভ করে। আর সেই প্রবঞ্চনার প্রতিযোগিতায় হেরে গেলেই আত্মহননের পথ ধরে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধও বোধ হয় তেমনি। নিজের ও পরের সঙ্গে প্রবঞ্চনা করতে করতে যখন ধরা পড়ে যায় তখন নিজের আদর্শ, বিশ্বাস ভেঙে তছনছ করে তার অভাবের ক্ষোভ মেটায়। বিদ্রোহ করে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধেও তাই হয়েছিল। এ ফাঁকির প্রতিযোগিতায় পাণ্ডব-কৌরব, কৃষ্ণ-বিদুর, ভীষ্ম-ব্যাসদেব কেউ কারো চেয়ে কম যায়নি। বলতে কি ফাঁকির প্রতিযোগিতার উন্মত্ত হয়েছিল। তাই যথা ধর্ম তথা জয় আশীর্বাদ সুযোধনের জীবনের অভিশাপ হল। এই অবিশ্বাসীর যুগে তার শুভ কামনার কোন মূল্যই নেই। তবু ভেবেছিল, এই পৃথিবীর কোথাও না কোথাও একজন বিশ্বাসীপ্রাণ মানুষ আছে। সে মানুষ এখনও সততা, সত্যবাদিতাকে বিশ্বাস করে, বিশ্বাস করে ধর্মকে, বিশ্বাস করে ভালবাসাকে, বিশ্বাস করে ঈশ্বরকে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে সেই মানুষটার নাম সুযোধন। তার পুত্র সুযোধন। কিন্তু তার বিশ্বাসের কোন মূল্যই নেই। এই বিশ্বাসটা জয়ী হলে পৃথিবীটাকে স্বর্গ হয়ে যেত। কিন্তু শয়তানরা

পৃথিবীকে কিছুতেই স্বর্গ হতে দেয় না। ঈশ্বরকে সেই মানুষের সত্তাকে মানুষের অন্তরে অমর তুলতে বোধ হয় হাজার হাজার বছর অপেক্ষা করতে হয়।

গান্ধারীর শোকদগ্ধ অন্তরের সেই বিলাপ, উচ্ছ্বাস, সান্ত্বনার বাণী কুরুক্ষেত্রের ধূ ধূ প্রান্তরে বাতাসে মিশে গেল। কেউ শুনতে পেল না। কিন্তু তার বলারও বিরাম থাকল না। নীল আকাশের দিকে তাকিয়ে বলল, হে মানুষের ঈশ্বর, এই যুদ্ধেই শেষ হোক মানুষের সব শত্রুতা। বিদ্বেষ, ঘৃণা, প্রতিহিংসা অবসান হোক এখানে। সামনে অনন্ত জীবন। মৃত্যুর মূল্যে অভিষেক হোক নবজীবনের। জন্ম হোক নতুন পৃথিবীর। হে ঈশ্বর। মানুষের পৃথিবীকে সুন্দর কর, সুখের কর, শান্তির কর। মানুষকে বিশ্বাস করার শুভ শক্তি দাও। মানুষ ধর্মে সুন্দর হোক, সত্যে মহান হোক, বিশ্বাসে শক্তিমান হোক।

সর্বেজ্জত্র সুখীনঃ সন্তু
সবে সন্তু নিরাময়াঃ
সবে ভদ্রাণি পশ্যন্তি
মা কশ্চিৎ দুঃখং আপ্নুযাৎ!

হঠাৎ পিছন থেকে ভেজা গলায় ডাকল, গান্ধারী জননী।

আচমকা জননী ডাকে চমকাল গান্ধারী! ভেতরটা তার শির শির করে উঠল। বুকের মধ্যে একটা বিদ্যুৎ বয়ে গেল। এই সংসারের তাকে জননী বলে ডাকার যে কেউ আছে একথাটা ভুলেই গেছিল। কিন্তু অপ্রত্যাশিত সেই ডাকে বুকের ভেতর জমানো অপত্য স্নেহ ফেয়ারার মত ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে এল। কিন্তু সেই মুহূর্তে অভিভূত আচ্ছন্নতার গলা দিয়ে স্বর বেরোল না। কিন্তু গলার স্বরটা খুবই চেনা মনে হল। তবু বিশ্বাস হল না। কোন অশরীর ডাক কিংবা নিজের মনের ভ্রম মনে করে আতঙ্কে ও ভয়ে হৃৎপিণ্ড স্তব্ধ হয়ে রইল।

আবার ডাকল, জননী গান্ধারী!

জননী ডাকটা তার বুকের মধ্যে প্রলয় ঘটাল। এ দারুণ মুগ্ধ-চমকে চমকে উঠল গান্ধারীর। বলল, কে ডাকে আমাকে জননী বলে?

আমি কৃষ্ণ।

গান্ধারী স্তব্ধ। কী বলবে ভেবে পেল না। কৃষ্ণের দিকে অবাক চোখে চেয়ে রইল। পলক পড়ে না মোটে। কৃষ্ণের চোখের আয়নায় গান্ধারী নিজের অচেনা মুখ দেখল। থর থর করে তার শরীর কেঁপে উঠল। সব কেমন গোলমাল হয়ে গেল মস্তিষ্কের মধ্যে। কৃষ্ণের অদ্ভুত ঠাণ্ডা এই দ্বেষহীন ডাক তাকে ভিতরে ভিতরে ভীষণ এক যন্ত্রণা দিল। প্রতিকারহীন যন্ত্রণা। তবু ঐ জননী ডাকের দুর্বলতা তার বুকের ভেতর কী সব জমে থাকা জিনিস-টিনিসকে গলিয়ে দিল। রুদ্ধ অভিমানে বলল, কৃষ্ণ, তুমি! আসতে পারলে? এখনও সাধ পূর্ণ হয়নি। দেখতে এসেছ আমার কত কষ্ট? গান্ধারীর নয়নের বারি?

না, আমার দুঃখ শুধু এই যে, তোমার এত কষ্ট আমাকে দেখতে হল।

এখনও ছলনা করছ কৃষ্ণ?

ওরকম করে ভাবলে, আমাকে শুধু দুঃখ দেওয়া হবে। আমার সকল অপরাধের ক্ষমা, সকল দুঃখের সান্ত্বনা, তোমার কাছে ছাড়া আর কোথায় পাব?

চমৎকার! আমার কী রেখেছ তুমি? সব কেড়ে নিয়েছ। ভিখারী করেছ আমায়। একটি পুত্রও তুমি জীবিত রাখনি। শুধু বাকি ছিল এই পরিহাস। তাও তুমি করলে। অবাক হয়ে আমি আমার ভাগ্যের খেলা দেখছি।

জননী! উপহাস করব এতবড় নরাধম নই। তোমার বুকের ভেতর জ্বলছে, তবু মনের গভীরে কী অপার প্রশান্তি। তোমার সব প্রার্থনা আমি কান পেতে শুনেছি। আর অপরাধে, অনুশোচনায় দুঃখে মন ভরে গেছে। এই বোবা কান্না বয়ে বেড়ানো বড়ই কষ্ট। দমবন্ধ এই বোবা পাথরের ভার থেকে মুক্তি পাওয়ার প্রায়শ্চিত্ত আমাকে করতে হবে জননী। কৃষ্ণের গলার দ্রবীভূত স্বর কেমন ভারী হয়ে উঠল।

গান্ধারীর চোখ ঝাপসা হয়ে এল মুহূর্তের জন্যে। জলভরা দুটি চোখ মেলে তাকাল কৃষ্ণের দিকে। অনেকক্ষণ ধরে কি যেন খুঁজল। তারপর একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, প্রায়শ্চিত্ত কি শুধু মুখের কথা!

প্রয়োজনের চেয়ে অনেক বেশি জোরে মাথা নেড়ে কৃষ্ণ বলল, না, দেবী।

গান্ধারীর গভীর দীর্ঘশ্বাস পড়ল। খুব দুঃখিত এবং বিষণ্ণ দেখাল তাকে বলল, মায়ের বুকে চিতা জ্বালিয়ে প্রায়শ্চিত্ত ভিক্ষে করার মত নিষ্ঠুর কৌতুক করতে তোমার কষ্ট হল না কৃষ্ণ? তোমার এই ধৃষ্টতার কোন মার্জনা নেই কৃষ্ণ। তুমি ক্ষমার অযোগ্য। আমি তোমাকে অভিশাপ দেব।

কৃষ্ণ এই কথাটা শোনার জন্যেই যে, উন্মুখ, উৎকর্ণ, উৎসুক হয়ে ছিল। কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে সে লুফে নিয়ে বলল, তাই দাও জননী। তোমার তাপিত হৃদয় যদি তাতে শান্ত হয়, স্বস্তি পায়, সুখী হয়, পৃথিবীর শত শত মাতৃহৃদয়ের শোকের অনল যদি তাতে নিভে পৃথিবীতে শান্তি ফিরে আসে, ধর্মের নবজন্ম হয়, তা-হলে তুমি আমাকে সেই অভিশাপই দাও। সেই হবে আমার মুক্তি। আমার সকল অপরাধের যোগ্য প্রায়শ্চিত্ত।

গান্ধারীর চমকানো বিস্ময়ে বলল, কৃষ্ণ!

জননী! আমি অন্যায় করেছি। পাপ করেছি। সত্যভঙ্গ করেছি। আমার অপরাধ আমি ভুলতে পারছি না। ভুলতে পারি কই কুরুক্ষেত্রের ভয়ংকর দৃশ্য। পতি-পুত্রহীনা রমণীদের বক্ষবিদীর্ণ ক্রন্দন, হাহাকার এবং দীর্ঘশ্বাস আমাকেও আকুল করে। বুকটা ফেটে চৌচির হয়ে যায়। মনে হয় অপরাধ আমার। তোমার কথাই ঠিক, প্রবঞ্চনার প্রতিযোগিতায় হেরে গেলেই তখন সবাই আত্মহননের পথ ধরে। আমিও তাই করেছি। আমার ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করতে তুমি যদি অভিশাপ দাও সে হবে আশীর্বাদ।

চমকানো বিস্ময়ে গান্ধারী চমকে উচ্চারণ করল : তুমি এত মহৎ, কৃষ্ণ!

দেবী, তোমার মত আমিও নিজেকে প্রশ্ন করি, এই যুদ্ধে কাকে জয় করলাম? নিজের ভুলে কাকে ধ্বংস করলাম—হৃদয়কে? অধর্মকে? ধর্মকে? প্রেমকে? কী দিয়ে কী জয় করলাম? আর কি পেলাম? সবই ভাগ্য। আমার নিয়তি। ভাগ্যের চেয়ে বড় আর কিছু নেই।

কৃষ্ণ!

দেবী!

অবাক দুনয়নে গান্ধারী সবিস্ময়ে কৃষ্ণের দিকে তাকিয়ে রইল অনেকক্ষণ মুগ্ধ গলায় বলল, কৃষ্ণ!—

দেবী!

কে দিয়েছিল তোমার ঐ নাম?
তোমার রহস্যবাঁকা ওষ্ঠাধরের দিকে তাকালে,
জুড়িয়ে যায় সব বেদনা,
নিভে যায় আগুনের তাপ,
হারিয়ে যায় অন্তরের কথা, ভুলে যাই শোক—
তাপ, জ্বালা, যন্ত্রণা—সব।
কে, কে তুমি কৃষ্ণ?

যদি রাধা না হ'ত

অশোক কুমার ভট্টাচার্য

ও

মঞ্জু ভট্টাচার্য

সুহৃদবরেষু

দৃষ্টিকোণ

"শ্রীকৃষ্ণ পুরুষোত্তম"-এর পাঠক-পাঠিকাদের অনেক কালের চাহিদা ও অভাব পূরণের প্রতিশ্রুতি নিয়ে প্রকাশিত হল ঃ "যদি রাধা না হত।"

'শ্রীকৃষ্ণ পুরুষোত্তম' শ্রীকৃষ্ণের জীবন বৃত্তান্তের একটি পূর্ণাঙ্গ রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক কাহিনী। মহাভারত, হরিবংশ, বিষ্ণুপুরাণ, শ্রীমদ্ভাগবতের কাহিনী ছেঁকে শ্রীকৃষ্ণকে নতুনরূপে দেখেছি। এই জীবন বৃত্তের ভেতর শ্রীরাধা কোথাও নেই। তাই শ্রীরাধার কালজয়ী স্বর্গীয় প্রেমকে সত্যের খাতিরে উপরোক্ত উপন্যাসের আয়তরেখায় ধরাতে পারিনি।

প্রকৃতপক্ষে পুরাণে রাধা এসেছে কৃষ্ণের অনেক পরে। ইতিহাস বড় নির্মম! যুগ-যুগান্তরের সংস্কার আর বিশ্বাস ভাঙতে এবং প্রকৃত সত্য প্রকাশ করতে বলা প্রয়োজন, শ্রীকৃষ্ণের তিরোধানের বহুবছর পর রাধাকে পেলাম। শ্রীমদ্ভাগবতের গোপী প্রেমের সঙ্গে মিশে রাধা কবি-মানসী হয়ে উঠল ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে। রাধা মাতা নয়, কন্যা নয়, বধূ নয়, পরাণবঁধু—শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তি।

উৎস থেকে মোহনার দিকে গেলে দেখতে পাই, পাণ্ডব বংশের অভিমন্যুর পুত্র পরীক্ষিত রাধার স্বামী আয়ান হয়ে জন্মান। তাহলে, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের বহুবর্ষ পরে এবং শ্রীকৃষ্ণের তিরোধানের পরে কালজয়ী অমর প্রেম কথার অনন্যা নায়িকা শ্রীরাধা এসেছে মানুষের কল্পনায়। কিন্তু কি করে যে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে যুক্ত করা হল তাকে এটাই পরমাশ্চর্য! সেই পরমাশ্চর্যের আর এক বিস্ময় হল শ্রীরাধা; বয়সে কৃষ্ণ অপেক্ষা বড়। অর্থাৎ রাম না হতে যেমন রামায়ণ তেমনি কৃষ্ণ না হতে রাধা। বাস্তব ঘটনার ঠিক বিপরীত। তাই আয়ান সম্পর্কে এই তথ্যটি ত্যাগ করতে হয়েছে। এই উপাখ্যানটি গ্রহণ করলে রাধা কৃষ্ণের চিরন্তন প্রণয় কাহিনী একটা বিশ্বাসযোগ্য গল্প হয়ে ওঠে। আলোচ্য উপন্যাসে আমি উক্ত উপাখ্যানকে অবলম্বন করেছি।

পদাবলী সাহিত্যে রাধা-কৃষ্ণের প্রণয়ে দাহ, জ্বালা যন্ত্রণা, দুঃখ, উৎকর্ণ, ভয় নিন্দা সব কিছু রক্তমাংসের মানব-মানবীর প্রেমের এক বাস্তবঘন রূপ। তাই আত্মদানের সংকীর্ণ গণ্ডী অতিক্রম করতে পারেনি। এই সংকীর্ণতা রাধা-কৃষ্ণের প্রেমে ভক্তির নামে কদর্য দেহবদ্ধ প্রেমের এক নির্লজ্জ রুচিবিকার আমদানি করেছে।

বিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে পৃথিবী এবং জীবনবোধ বদলে যাচ্ছে দ্রুত। সেই পরিবর্তিত জীবন-বোধের সঙ্গে অন্বিত করে রাধা কৃষ্ণের কালজয়ী প্রেমের বংশীধ্বনি করেছি। বংশধ্বনি কৃষ্ণ প্রেমের সজীব প্রতীক। বাঁশীর সুরে রাধা তাই আকুল হয়। ভেদজ্ঞান লুপ্ত হয়। সংসার বন্ধন তুচ্ছ হয়ে যায়। রাধার নিদ্রিত সত্তার ঘুম ভাঙে। আত্মার ভেতর, সমস্ত অনুভূতি ও উপলব্ধির ভেতর খুঁজল সে তার কৃষ্ণকে। এই অন্বেষণের সূত্র ধরে বর্তমান থেকে অতীতে, অতীত থেকে বর্তমানের ভেতর নিরন্তর পরিক্রমণ করেছে। আর সেই সূত্রেই তার আত্ম-অন্বেষণ সম্পূর্ণ হয়েছে।

রাধার পূর্ণাঙ্গ জীবন বৃত্তান্ত নিয়ে কার্যত কোন বই নেই বললে হয়; যা পেয়েছি তাতে বিকৃত কাম ক্ষুধার ফাঁদে রাধা-কৃষ্ণ বন্দী। যে কৃষ্ণ ভারতীয় জীবনের আদর্শ, যিনি মহান, আদর্শমান, শ্রেষ্ঠ বীর, জণগণমন অধিনায়ক, যাঁর ছত্রছায়ায় গোটা ভারতবর্ষের মানুষ এসে দাঁড়িয়েছে, যিনি পুরুষোত্তম, ভীষ্ম যাঁকে শ্রেষ্ঠ পুরুষের অর্ঘ্য দিয়েছে সেই মহামানব কখনও চরিত্রহীন, লম্পট, কামুক হয়? না, হতে পারে? 'যদি রাধা না হত' উপন্যাসে আমি কৃষ্ণ চরিত্রের এই কলঙ্ক স্খালন করেছি। গোপীদের বস্ত্র হরণ, নৌকায় রাধিকার শ্লীলতাহানির মত আজগুবি গল্প অন্যভাবে বিচার করেছি। জীবাত্মা-পরমাত্মার দার্শনিক ব্যাখ্যা দিয়ে যাঁরা ঐ ঘটনাগুলোকে টিকিয়ে রাখার পক্ষপাতী আমি তাঁদের দলে নই। স্থূল চোখে ঘটনাগুলো কৃষ্ণ চরিত্রের গৌরব মর্যাদা কিছুমাত্র বাড়ায় না আবার কোন সত্যকে প্রকাশ করে না। সুলতানী রাজের যুগে কৃষ্ণ চরিত্রের মহিমা ও গৌরব হননের উদ্দেশ্যে রাধাকে সৃষ্টি করা হয়েছিল। তাই মানুষের শুভবুদ্ধি এবং তৎকালীন দেশ-কালের রূপরেখায় তাঁকে বিধৃত করেছি। রাধা-কৃষ্ণর লৌকিক উপাখ্যানের যে জনপ্রিয়তা আমাদের ধ্যান-ধারণা আচ্ছন্ন করে আছে তার মোহ থেকে এই উপন্যাসকে মুক্ত করে এক জটিল মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বে রাধা চিত্ত আবর্তিত হয়েছে।

রাধার মানবিক প্রেমের স্বর্গীয় দীপ্তি সঞ্চার করতে আমার উপন্যাসে স্বামী আয়ানের অবদান খুব বেশি। অভিশপ্ত ঋষি পরজন্মে আয়ান হয়ে জন্মালে তার ভেতর ঋষিসুলভ ত্যাগ, সংযম, সহিষ্ণুতা ছিল। আমার মনে হয়েছে লৌকিক কাহিনীতে আয়ানের এই মহানুভবতা, উদারতা এবং মহত্ত্বকে ক্লীবরূপে দেখানো হয়েছে। আয়ান সম্পর্কে এই ধারণা ও বিশ্বাসের মূলে কুঠারাঘাত করিছি। তাই তো রাধার যেটুকু আত্মযন্ত্রণা, জ্বালা, হাহাকার সে তো আয়ানের জন্যই। আয়ানের নিঃস্বার্থ মহান প্রেম, নীরব আত্মদানের মহিমা রাধা ও কৃষ্ণ প্রেমকে ভরন্ত কলসের মত ভরিয়ে তুলেছে। মোটামুটিভাবে, রাধা-কৃষ্ণের প্রেমের যে আধ্যাত্মিক দিক ও দার্শনিক দিক আছে তাকে গ্রন্থের কলেবরে অটুট রাখার চেষ্টা করেছি। প্রচেষ্টা সফল হল কতখানি পাঠকই বিচার করবেন।

গ্রন্থের কলেবরে প্রেমের অনির্বচনীয় রূপকে ফুটিয়ে তুলবার জন্য জয়দেব থেকে রবীন্দ্রনাথের কবিতা যত্রতত্র ব্যবহার করেছি। সংলাপকে অর্থবহ করতে কখনও কখনও কবিতার মূল শব্দ পরিবর্তনে বাধ্য হয়েছি, তার জন্য ক্ষমাপ্রার্থী।

ড. দীপক চন্দ্র

যমুনার বুক থেকে বাঁশীর সুরের মিষ্টি আওয়াজ বয়ে নিয়ে এল দখিনা বাতাস। কত জায়গায় কত গাঁ, গঞ্জ, শহর ছুঁয়ে রাধার কানে কানে ফিস ফিস করে শুধাল :

ওই শোন রাই, মুরলী বাজায়
তোর শ্যামরায়

রাধার বুকের ভেতর জলপ্রপাতের শব্দ। অভিমানের সমুদ্র উথলে উঠল হৃদয়ের অভ্যন্তরে। ঘুমের মধ্যে চোখ মেলল রাধা। এদিক ওদিক চেয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়াল।

মধ্যরাত। ফুটফুটে জোৎস্না। পৃথিবীময় নরম চাঁদের আলো বনফুলের গন্ধের সঙ্গে রাতের গন্ধ, জ্যোৎস্না রাতের গন্ধ, জ্যোৎস্নার গন্ধ মিশল।

স্নিগ্ধ মায়াবীরাত কি সুন্দর! কেবল ঐ বাঁশীর সুরে রাতের স্তব্ধতা বিদীর্ণ হচ্ছিল। ঐ সুর রাধার বুকের ভেতর নরম সব কিছুকে কার্পাস তুলোর মত পিঁজে পিঁজে আকাশময় ছড়িয়ে দিচ্ছিল।

আকাশের তারাগুলো কত উজ্জ্বল! বারান্দায় দাঁড়িয়ে গোটা আকাশ দেখতে পেল না রাধা। চোখের সামনে আধখানা আকাশ প্রশ্ন চিহ্নের মত হাঁ করে চেয়ে আছে তার দিকে। প্রশ্ন, প্রশ্ন, প্রশ্ন—আজ এই প্রশ্ন রাধার মনের ভেতরেও। তবে কি শ্যাম মথুরা থেকে ফিরল? রাধার বুকের ভেতরটা ধক্ করে উঠল। পায়ের নীচে মৃদু একটা ভূমিকম্প টের পেল। মনে হল, তার পা আর মাটিতে নেই। সে এই রাজ্যেও নেই। কোন এক সুদূর অতীতের মধ্যে তার অবলুপ্তি ঘটেছে। সমস্ত অতীত বর্তমান জুড়ে ঐ বাঁশীর সুরের মহোৎসব চলছে তার ভিতরে।

দূরে গোপপল্লীতে সমস্ত প্রাণ, মন, দরদ ঢেলে দিয়ে নিবিষ্টমনে কে যেন রাখালিয়া সুরে বাঁশী বাজাচ্ছিল। এমন মিষ্টি বাঁশীর সুর বৃন্দাবনে অনেককাল শোনে না কেউ। শুনবে কোথা থেকে? বাঁশী বাজানোর মিষ্টি হাত ছিল কৃষ্ণের। তার বাঁশীর সুরে বাতাস মধুর হয়, হৃদয় উতলা হয়, এক অনাবিল প্রশান্তিতে. সুখে, আনন্দে, প্রাপ্তিতে চিত্ত ভরে ওঠে। মুগ্ধতা ও ভাবাবেশে দু'চোখ বুজে যায়। চোখের কোণ বেয়ে গড়িয়ে পড়ে আনন্দাশ্রু। কিন্তু অনেক কাল হল কৃষ্ণ বৃন্দাবন গোলক ত্যাগ করে মথুরায় গিয়েছে। হঠাৎ তার বাঁশীর সুরে রাধার ভেতরটা কাঁপছিল আশায়, আকাঙক্ষায় ও উদ্বেগে। একটা অদ্ভুত অনুভূতি হল রাধার। চোখ বুজে এল জলে। বাঁশীর সুর তার মনের মধ্যে মিশে গেল। ঐ সুর যেন সহসা কথা হয়ে বাজল তার কানে।

বাঁশী কেন বলে রাধা রাধা—

বুকের ভেতরটা শির শির করে উঠল রাধার। একটা স্মৃতি জ্বলে উঠল।

নৃত্যের মুদ্রায় কৃষ্ণ দু'হাতে বাঁশী ধরে তাতে অধর সংস্থাপন করে রাধার দিকে আড়াচোখে তাকিয়ে মৃদু মৃদু হাসে। দু চোখে তার কৌতুক উপচে পড়চে। হঠাৎ বাঁশী বেজে ওঠে। মনমাতানো রসে টৈটুম্বুর হয়ে আঁখিতারা দুটি বুজে যায় কৃষ্ণের। মুগ্ধতা নামে রাধার দু চোখেও। সেই চোখের দৃষ্টি প্রেমের নির্ঝরিণী হয়ে শ্রীকৃষ্ণের মনকে প্লাবিত করে দেয়। অধরের টেপা হাসি তার প্রেমের মুক্তো হয়ে ওঠে।

রাধাকে দেখে শ্রীকৃষ্ণের বুক কাঁপল। মুখ শুকিয়ে গেল, গভীর দীর্ঘশ্বাস পড়ল। রাধার স্খলিত বসনপ্রান্তের স্পর্শে থরথরিয়ে উঠল কৃষ্ণের ভিতরটা। বাঁশীর সুর থেমে গেল। চোখের চাহনি অনুরাগে নিবিড় হল। মনের এমন আকুল উদ্বিগ্নতা চেপে রাখা অসম্ভব হল কৃষ্ণের। বলল, তোমাকে যে আমি ভালবাসি রাই।

রাধা একটুও চমকাল না। সে ঠিকই জানত কৃষ্ণ তার কাছে আসবেই। কানের কাছে বাজবে প্রেমের গুঞ্জন। শোনার জন্য রাধাও ছিল উন্মুখ হয়ে। কৃষ্ণের কথার উত্তরে শান্ত গলায় বলল, আমিতো চাই তোমাকে।

কথাটা বলে রাধা কেমন থমকে গেল। মনের ভেতর তার প্রতিবাদের ঝড় উঠল, এ পাপ, এ অন্যায়। নিজের কাছে সে সত্যভঙ্গ করেছে। পরক্ষণেই প্রশ্ন করেছে কি সে সত্য? রাধা জানে না তার উত্তর। জানার মত মনের অবস্থাও তখন নয়।

কৃষ্ণের ছোঁয়া লাভের জন্য সর্বাঙ্গ তখন ব্যাকুল।

তবু সংস্কার যায় না। মন থেকে মুছেও মোছে না। রাধার মনে হিন্দু নারীর বিবাহের সংস্কার নানা কথা বলে যাচ্ছে। কান তার ঝাঁ ঝাঁ করছে। অসহনীয় জ্বালায় জ্বলছে বুকের ভেতর। পাপবোধ কুরে কুরে খাচ্ছে।

কৃষ্ণের দিকে দু হাত জোড় করে বলল : ভুল। সব ভুল। সব মিথ্যে। তুমি ক্ষমা কর, ক্ষমা কর আমায়।

কৃষ্ণ কথা বলল না। দু হাত বাড়িয়ে রাধার হাতটা ধরল। করপদ্মের মধ্যে চেপে ধরল। কৃষ্ণের হাতের নরম স্পর্শে রাধা যুগান্তরের ঘুম থেকে জেগে ওঠল যেন। তার সমস্ত ইন্দ্রিয় অবশ হয়ে এল। সর্বাঙ্গ দিয়ে অনুভব করল কৃষ্ণের অস্তিত্বের স্পর্শ। কৃষ্ণ রাধার হাত নিজের হাতে রাখল। রাধার হাত কত ফর্সা, আর কত সুন্দর ....ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখল। আর সরল ঈর্ষামিশ্রিত চোখে রাধার দিকে চেয়ে মিট্ মিট্ করে হাসতে লাগল।

অনন্ত সময় বয়ে গেল। কৃষ্ণ রাধার হাত নিয়ে খেলা করতে লাগল। হাতের উপর মাথা রাখল। মুখ রাখল। অজস্র চুমু খেল। আদর করল কত ভাবে। রাধার সাধ্য কি হাতটা ছাড়িয়ে নেয় কৃষ্ণের মুঠো থেকে। সে ছাড়তে চাইছিলও না, চাইছিল শুধু কৃষ্ণের ভুজবন্ধন। কৃষ্ণ একটু বুকে টেনে নিক, তাদের দু জনের মধ্যে যে ব্যবধানটুকু আছে সেটা একেবারে ভেঙে ফেলুক।

কৃষ্ণের হাতের সুখকর স্পর্শে সমস্ত অনুভূতি স্পন্দিত হতে লাগল। হাতটাই যেন কৃষ্ণের শরীর হয়ে উঠল। কৃষ্ণের ভিতরটা মোমের মত গলে গলে পড়ছিল। সে আর নিজেকে সংবরণ করতে পারল না। দু হাতে রাধাকে বুকে টেনে নিল। তার বুকে মুখ ঘষল, কান পেতে শুনল—গভীরে, খুব গভীর আশ্চর্য কোন জন্মান্তরের সুর বাজছে কিনা? কতক্ষণ এভাবে কাটল জানে না। চেতনা ফিরলে দেখল, কৃষ্ণের ভুজবন্ধনে বন্দী সে। আর তার নিজের মুখের ওপর কৃষ্ণের মুখের স্পর্শ অনুভব করল। সারা শরীর যেন নিবিড় সুখের উল্লাসে গান গেয়ে ওঠল।

মম নন্দন অটবীতে—
পিক মুহু মুহু উঠে ডাকি।

শুধু শুচিতা রক্ষার জন্যে রাধা কৃষ্ণের ভুজবন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা করল। বিচ্ছিন্ন হওয়ার জন্যে কৃষ্ণকে দু হাতে ঠেলে দিতে গেল, কিন্তু পারল না। পারবে কোথা থেকে? তার তনু মন প্রাণ যে কৃষ্ণের অঙ্গের নরম মধুর স্পর্শে শিথিল হয়ে পড়েছিল। দেহে কোন বল ছিল না। শরীরটা কেমন হাল্কা হয়ে গিয়েছিল। ভাল করে দাঁড়াতে পর্যন্ত পারছিল না। তার নিঃশ্বাস ভরে ছিল কৃষ্ণের দেহের সুবাস আর চুলের মিষ্টি গন্ধ। রাধার অপলক দুটি আঁখি ধ্রুবতারার মত স্থির হয়ে আছে কৃষ্ণের ওপর। পঞ্চেন্দ্রিয়ের দীপ জ্বালিয়ে রাধা কৃষ্ণকে দেখছিল। বুকের ভেতরটা তার গুনগুনিয়ে ওঠল। মনে মনে বলল—

নবঘন পুঞ্জ পুঞ্জ জিতি সুন্দর।
অনুপম শ্যামের শোভা।
পীত বসন জণু বিজুরী বিরাজিত
তাহে চাতক মনোলোভা।

বিস্রস্ত আঁচল বেশবাস ঠিক করে নিতে নিতে রাধার মনে হল তার কাছে গোটা পৃথিবীর অর্থটা বদলে গেছে। কৃষ্ণের ভালবাসায় মন কানায় কানায় ভরে গেছে। মনে আর একটুও পাপবোধ নেই। অনুশোচনাও নয়। আর এসব হবেই বা কেন? ভালবাসায় তো কোন পাপ নেই। ভালবাসাই ঈশ্বর।

সেদিন রাতে রাধার ঘুম এল না। কৃষ্ণের স্পর্শটা তখনও তার তনুতে লেগে ছিল। বুকের

ভেতর দামামার মত কি যেন বেজে যেতে লাগল। পাশে ঘুমন্ত স্বামী আয়ানের দিকে চোখ পড়তে সমস্ত শরীরে একটা অদ্ভুত অনুভূতি ঢেউ খেলে গেল। এই অদ্ভুত অনুভূতি কতরকম প্রশ্ন করল তাকে। কৃষ্ণের সঙ্গে যা ঘটে গেল তা তো একটা শরীরী ব্যাপার। কিন্তু তার শরীর তো স্পর্শিত! তাহলে দৃষ্টিমাত্র এরকম হল কি করে? রাধা আয়ানকে দেখছিল। কেমন একটা অপরাধবোধে তার বুকের ভেতর গুরু গুরু করে ওঠল। রাধার ইচ্ছে হল এই মুহূর্তে আয়ানের গলা জড়িয়ে ধরে আদর করতে। কিন্তু তার বিবেক প্রতিবাদ করল যেন—না, স্বামী শুধু একটা সংস্কার। ভালবাসা তার চেয়ে বড়। ভালবাসা হল জীবনের প্রকাশ। ভালবাসায় পাপ নেই। আর পাপ হবেই বা কেন? সে তো বাধা দিয়েছে তাকে। পাপ যদি হয়ে থাকে কৃষ্ণের। পুরুষের এতে কোন পাপ হয় না। তাদের চরিত্রও নষ্ট হয় না।

বিস্ময়ের শেষ নেই রাধার। বিশ বছর আগের জীবনটা এখনও তার ভেতর তেমনি আছে। কালের কোন চিহ্নই তার গায়ে লাগেনি। তার নিজের চেহারা কেবল বদলেছে। দর্পণের সামনে দাঁড়ালে দুঃখ বাড়ে মন খারাপ হয়ে যায়। কিন্তু মনটা? মনের তো কোন সীমাবদ্ধতা নেই। বিশ বছরের গন্ডীটা সে তুলে দিয়েছে। মধ্যরাতের বাঁশীর সুর বিশ বছরের দূরত্বটাকে মুছে দিয়েছে।

শোবার ঘরে স্বামী আয়ান অঘোরে ঘুমুচ্ছে। কি গভীর প্রশান্তি মাখানো তার মুখ। কি গভীর ভালবাসা আর বিশ্বাস তার মনে। কোন ক্ষোভ নেই, ঈর্ষা নেই, জ্বালা নেই, সন্দেহ নেই,—ভক্ত পূজারীর মত নিজেকে শুধু নিবেদন করে, পূর্ণ করে। তার পৃথিবীটা তাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হচ্ছে। রবি, শশী, তারার মত প্রেমের দীপ জ্বেলে প্রদক্ষিণ করছে তাকে।

লোকটা সব জানে, তবু কোন রাগ নেই, ঘৃণা নেই। কোন অতৃপ্তিও না। দুঃখ যন্ত্রণা যদি কিছু থাকে সে আছে তার ভিতর। মরুভূমির মত সর্বদা তেতে আছে অভ্যন্তরটা। বিশ বছরের মধ্যে কবে যে তাপটা জুড়িয়ে গিয়েছিল রাধা জানতেও পারেনি। মধ্যরাতের বাঁশীর সুর সব গন্ডগোল করে দিল। আর ভিতরের আমি'র ঘুম ভাঙল। ঐ সুরের ছোঁয়ার ভিতরটা উজ্জ্বল হয়ে ওঠল। বিশ বছর আগের সব ঘটনা এক এক করে মনে পড়ল।

বারান্দায় দাঁড়িয়ে রাধা দেখতে পাচ্ছিল স্বামীর ঘুমন্ত মুখ। তার কাঁচা-পাকা ঢেউ খেলানো কোঁকড়া চুলে পড়েছে জানালা দিয়ে আসা চাঁদের আলো। ভীষণ সুন্দর লাগছিল আয়ানকে। সত্যিই সুদর্শন সে। এখনও শরীরের তার যৌবন টলমল করছে। স্তব্ধ দৃষ্টি মেলে রাধা আয়ানের দিকে তাকিয়ে রইল। নিজের ভাবনাতে নিজে বুঁদ হয়ে থাকল। অতীতকে মনে পড়ল। বর্তমানের মধ্যে কিছুতেই স্থির থাকতে পারছিল না। বাঁশীর সুর বার বার তাকে অতীতের দিকে টানছিল। তিরিশ বছর আগের একটি ঘটনা মনে পড়ল।

জীবনের চল্লিশ বছর কেটে গেল। তবু কি আশ্চর্য, সেই দৃশ্যও ঘটনাগুলো এখনও মনের ভিতর সেই রকমই আছে। কাল তাকে জীর্ণ করেনি। বরং আরো উজ্জ্বল করেছে।

সে দেখতে পাচ্ছিল তার বাবা মা'র কলহ। পিতা বৃষভানু দশ বছরের একরত্তির মেয়েকে কিছুতে বিয়ে দিতে রাজী নয়। জননী কীর্তিকাও ছাড়ার পাত্রী নয়। বৃষভানুর কোন ওজর আপত্তি সে শুনতে চায় না। মেয়ের বিয়ে তার চাই-ই। রাধা তাদের কলহের মধ্যস্থতা করে দিল। কচি গলায় বলল : বাব্বা। শুধু ঝগড়া আর ঝগড়া। থাম তো। আমি বাবাকে বিয়ে করব তাহলে মার কথাও থাকবে, আর বাবাকেও আমার জন্যে কষ্ট পেতে হবে না। আমি বাবার কাছেই থাকব।

রাধার কথা শুনে বৃষভানু হাসিতে ফেটে পড়ল। কীর্তিকাও না হেসে পারল না। সেদিনের মত কলহের ইতি ঘটল।

কিছুদিন পর আবার পুরনো কলহের সূত্রপাত। বৃষভানু কীর্তিকাকে বোঝানোর চেষ্টা করল। বলল : ফুল ফুটলে যেমন মধুকর আসে, তোমার মেয়ের বয়স হলে তেমনি পাত্র আপনিই এসে জুটবে তোমার আমার খোঁজাখুজির কোন দরকার নেই। বিয়ে তো দিতেই হবে। যতদিন পারা যায় একটু কাছে থাকুক না।

কীর্তিকা ঝংকার দিয়ে বলল : তুমি কিছু বোঝ না। দিনকাল ভাল নয়। ঘরে মেয়ে রাখাই দায় হয়ে ওঠেছে। চতুর্দিকে যা দেখছি, ঘেন্না ধরে গেছে। যত তাড়াতাড়ি পার বিদেয় কর। পরের জিনিষ পরের ঘরে না পাঠানো পর্যন্ত স্বস্তি নেই। জান, সই যশোদা একটা ভাল সৎপাত্রের সন্ধান দিয়েছে। আভীর পল্লীর ঐ আয়ান! ছেলেটি নাকি দেখতে খুব সুন্দর। ভালো ছেলে, সৎ, নম্র এবং সরল।

বৃষভানু কুপিত হয়ে বলল : আরে রাম, রাম, সে কি একটা বলার মত পাত্র?

সব তাতে তোমার নাক কুঁচকানো স্বভাব।

আরে তা নয়। ওর কোন ব্যাক্তিত্বই হয়নি।

ওরকম নিরীহ ছেলেই ভাল। আমার রাই-র খুব বাধ্য থাকবে। বেশী দামাল হলেই তো ভাবনা। মদ আর মেয়েমানুষ নিয়ে ডুবে থাকবে। ঘরের লক্ষ্মী চোখের জলে ভাসবে। কাজ নেই আমার ব্যাক্তিত্বের। আমার মেয়ে কিসে সুখী হবে সেটাই তো দেখব।

দ্যাখো, মেয়ে আমার সুন্দরী। তাকে বৌ পাওয়া পুরুষের ভাগ্য। অমন সোনার প্রতিমাকে অযত্ন অবহেলা করার মত পুরুষ মানুষ জন্মায়নি। বুঝলে রাণী, অমন সুন্দরী বৌ-এর আঁচলে ধরে বেড়াতেই পুরুষের বেশি সুখ।

ছিঃ! বাপ হয়ে মেয়ের সম্পর্কে এমন সব কথা বলতে তোমার একটু সরমে লাগল না?

খারাপটা কি বললাম? মেয়ের রূপ নিয়ে বাপের বুকে যে ছোট দেমাকটুকু আছে সেটুকু দেখানো দোষ? পাপ? অপরাধ? মেয়ের ওপর অবিচার তো তুমি করছ। আয়ান শুধু আকৃতিতেই পুরুষ মানুষ। মেয়েকে আমি হাত-পা বেঁধে জলে ফেলে দিতে পারব না।

কীর্তিকা বৃষভানুর গলার স্বর অনুকরণ করে মুখ ভেংচে বলল : জলে ফেলে দিতে পারব না। খুব বাহাদুরীর কথা। তোমাদের মত কয়েকটা অপদার্থ পুরুষমানুষের আদিখ্যেতায় দেশটা গোল্লায় গেল। দিনে দুপুরে মেয়েমানুষ নিয়ে ঢলাঢলি, টানাটানি যে ভাবে বাড়ছে তাতে মেয়েকে ঘরে রাখাই দায় হয়ে ওঠেছে। সোমত্ত মেয়ে পথে দেখলে পাড়ার ছোঁড়াগুলো তাকে খাবলে খায়। কিছু বলতে গেলে রক্ষে নেই। কেলেঙ্কারীর ভয়ে মেয়েগুলো মুখ বুজে সহ্য করে। কি করবে বল? দেশে তো একটা পুরুষ মানুষ নেই। আকৃতিতেই তারা পুরুষ। আয়ানের মতই নিরীহ। আর ব্যাক্তিত্বহীন।

বৃষভানু কথা বাড়াল না। হার স্বীকার করে নিল। কেবল নিজের পৌরুষ দেখানোর জন্য কীর্তিকার দিকে কটমট করে তাকাল। ঐ তাকানোর ভিতর বৃষভানুর যে বেদনা ছিল, যন্ত্রণা ছিল অসহায়তা ছিল; তিরিশ বছর পার হয়ে গেলেও রাধা মর্মের মধ্যে তাকে অনুভব করতে পারল। কথাগুলো কীর্তিকা বৃষভানুকে বিদ্ধ করার জন্য বলেছিল। কীর্তিকার কথাগুলো সত্যকে প্রকাশ করলেও বৃষভানুর গৌরব বাড়ায়নি। কীর্তিকার কথা শুনে বৃষভানুর মুখখানা মুহূর্তের জন্যে মলিন হয়ে গিয়েছিল। কেমন একটা অসহায় লাগছিল কীর্তিকার। অপ্রিয় সত্যকে গ্রহণ করার জন্য মন তার প্রস্তুত ছিল না। কিন্তু অপ্রিয় মিথ্যার আঘাতটা ছিল তার অসহনীয়। তাই, বেশ খানিকটা বিচলিত আর অস্থির হয়ে বলল : তোমার যা ইচ্ছে কর, আমি এই সম্বন্ধের মধ্যে নেই।

বৃষভানু খুব উত্তেজিত হয়ে কথাগুলো বলে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

বিপন্ন মুখে অপ্রস্তুত হাসি নিয়ে রাধা কীর্তিকার দিকে তাকিয়েছিল। অতীতকালের এই প্রত্যক্ষ অনুভূতিকে রূপ দেবার ভাষা তার নেই। কেবল তার চল্লিশ বছর তখন বারো বছরে অনুপ্রবেশ করেছিল।

রাজার কন্যা সে। তার কোন দুঃখ নেই, দৈন্য নেই। কিন্তু বড় নিঃসঙ্গ আর একা। বয়স তাকে কাঙ্গাল করেছিল, লোভী করেছিল। অজ্ঞাত, অপরিচিত, সুদর্শন যুবা পুরুষ আয়ান তার সমস্ত অনুভূতিকে, চেতনাকে কী এক দুরন্ত মোহে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। বয়ঃসন্ধিক্ষণের দুরন্ত কৌতূহল যেন তাকে শেখাল কি করে জীবনসত্যকে জানতে হয়। অদেখা আয়ানকে নিয়ে তার অদ্ভুত অদ্ভুত কল্পনা তো জীবনলিপ্সা। ঐ বয়সে মেয়েরা একটু বেশি স্বপ্ন দেখে, কল্পনা করে। আত্মরতির দহনে তারা রূপ সচেতন ও দেহ সচেতন হয়ে ওঠে।

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে রাধা নিজেকে তন্ন তন্ন করে দেখত। ঠিক দেখা নয়, নিজেকে আবিষ্কার করা, অনুভব করা। কতখানি মেয়ে হয়ে ওঠেছে দেখার কৌতূহলে বুক থেকে শাড়িটাকে সরিয়ে সদ্যোদ্ভিন্ন মুকুলিত বুকের দিকে কী গভীর বিস্ময় নিয়ে তাকাত। আর মনের ভিতরটা এক অদ্ভুত আবেগে কম্পমান হত। মাঝে মাঝে কী এক অদ্ভুত খেয়ালে পয়োধরের উচ্চতা ও পরিধি পরিমাপ করত। কখনও ভুরু কুঁচকে আড়চোখে কটাক্ষ হানত আয়নায়।

তাকে সাজলে কত সুন্দর দেখায় তা দেখার জন্যে রাধা নীলাম্বরী শাড়ি পরে, হাতে গলায় কানে গয়না, পায়ে নূপুর মাথায় টায়রা দিয়ে বধূ বেশ করত। কীর্তিকার সুন্দর টায়রার ওপর তার খুব লোভ ছিল। লুকিয়ে পরত। সামনে চুলের দু'পাশ দিয়ে দুটা হার যেত, আর সিঁথির উপর যে লকেটটা ছিল তা কপালের মাঝখানে ঝুলত। ভীষণ সুন্দর লাগত। মাথায় ঘোমটা টেনে দিয়ে রাধা বউ হত। অমনি কেমন একটা তীব্র তীক্ষ্ম অনুভূতিতে তার বুকের ভেতরটা শির শির করত। রাধার অবাক লাগত। শুধু মাথায় একটা ঘোমটা দিলে অল্প সময়ের ভিতর অনুভূতিটা এমন বদলে যায়? বধূ হওয়ার সুখ কি? কথাটা মনের ভিতর ঘুরত একটা দীর্ঘশ্বাসকে পাক দিয়ে দিয়ে যার নাম সঙ্গীহীনতার যন্ত্রণা।

রাধার অনুভূতির জগৎ জানার সীমা প্রতিদিন বদলে যেতে লাগল। একদিন যেটাকে অভ্রান্ত, নিশ্চিন্ত সত্য বলে জানল পরের দিনই সেইটাকে পরম ভ্রান্তি বলে মেনে নিতে হল। হয়ত এমন না হলে সকলের জীবন ও জানা এক নিশ্চল স্থির বিন্দুতে স্থাণু হয়ে দাঁড়িয়ে থাকত।

অন্ধকারের ভিতর থেকেই দ্বাদশী রাধা যেন বেরিয়ে এল। বিদ্যুৎ বয়ে গেল রাধার শরীর ও মনের ভিতর। কি করে যে সম্ভব হল এটা রাধা ভেবে পেল না। পঞ্চেন্দ্রিয় দিয়ে যে জগৎটাকে সে চেনে, তা তো কালের দ্বারা খণ্ডিত। তার বাইরে পা দিয়ে জীবনকে কখনো দেখেনি। দেখার সাহস হয়নি। আজ হঠাৎ কোথা থেকে এক তীব্র তীক্ষ্ম অনুভূতি উঠে এসে সব গন্ডোগোল পাকিয়ে দিল। খণ্ডিত কালের গন্ডী ভেঙ্গে মনটা প্রসারিত হয়ে গেল। তার শৈশব থেকে কৈশোরে, কৈশোর থেকে যৌবনে এবং প্রৌঢ়ত্বে। নিজেকে কাল থেকে কালান্তরের মধ্যে প্রসারিত করে দিল রাধা। তার মন থেমে ছিল না। অন্তহীন কালচক্রের মধ্যে পরিভ্রমণ করছিল। বারে বারে তাই, কখনো দিনে, কখনো রাতে সে ফিরে ফিরে চলে যাচ্ছিল কখনও আভীর পল্লীতে, কখনও বৃন্দাবনে, কখনও গোকুলে।

ঘটা করে কৃষ্ণের জন্মদিন হচ্ছে গোকুলে, কৃষ্ণ পাঁচ বছর পূর্ণ করে ছয় বছরে পড়েছে। ঐ বয়সে কৃষ্ণ এক অসাধারণ মানব, কত অদ্ভুত অদ্ভুত গল্প কৃষ্ণকে নিয়ে। সত্যিই সে গোকুলবাসীর প্রাণের আরাম, মনের আনন্দ আর আত্মার শান্তি। রাধা তাকে শিশু অবস্থায় দেখেছে। তাকে দেখলে সত্যি চোখ জুড়িয়ে যায়, প্রাপ্তির আনন্দে মন ভরে যায়।

কৃষ্ণের জন্মদিনে দেশের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিরা এসেছেন। লোকজনে ভরে গেছে নন্দের গৃহ।

বৃষভানুরও নিমন্ত্রণ ছিল। কিন্তু শারীরিক কারণে বৃষভানু যেতে চায়নি। কীর্তিকা তাকে বোঝাল : কৃষ্ণকে তুমি দ্যাখনি। চোখ জুড়োনো রূপ তার। একবার তাকালে আর চোখ ফেরানো যায় না। মনটা কানায় কানায় ভরে যায়। তার সান্নিধ্যই মধুর। সে এক অসাধারণ মানবশিশু।

বৃষভানু হ্যাঁ-না কোন জবাব দিল না। শুধু কীর্তিকাকে সন্তুষ্ট করার জন্য সপরিবারের গোকুলে যাত্রা করল।

সাঁ সাঁ করে বাতাসে কেটে রথ ছুটল। রাধার চোখে মুখে বাতাসের ঝাপ্টা লাগছিল। চুলগুলো হাওয়ায় উড়ছিল। মাঝে মাঝে মুখের উপর চুল পড়ছিল। পথের চলমান শোভার দিকে তাকিয়ে রাধা চুপ করে বসেছিল রথে। দৃষ্টি শূন্য। মন উদাস। স্বপ্নের ঘোরে যেন আচ্ছন্ন। বহু দৃশ্য এবং অনুভূতি তার মনের ভিতরে যা কিছু ক্রিয়া করছিল তা অন্য কেউ জানতে পারল না।

বৃষভানু অনেকক্ষণ ধরে তার ভাবলেশহীন দৃষ্টি, থমথমে গম্ভীর মুখ, উদাস অন্যমনস্কতার দিকে তাকিয়ে নিজের মনেই বলল : আজ কৃষ্ণের জন্মদিন। পাঁচ বছর আগে দিনটা ছিল অন্যরকম। সেদিনের ঝড় জলের প্লাবনের ভয়ংকর স্মৃতিটা মানুষ ভুলতে পারেনি। বোধ হয় কোনোদিন তাদের মন থেকে মুছবে না। আচার্য গর্গও চান না। তিথি নক্ষত্রের কারণে দিনটি নাকি খুবই শুভ। একটা বিশেষ সন্ধিক্ষণে কৃষ্ণের জন্ম। যার শুভফল নাকি ইতিমধ্যে ফলতে শুরু হয়েছে।

রাধা কোন কথা বলল না। অধরে তার মধুর হাসি, চোখে স্নিগ্ধ মায়াবী দৃষ্টি। রথের জানালার উপর মাথা রেখে সে গভীর সুখে চোখ বুজল। পুষ্পের মত স্মৃতির সুবাসে মনটা ভরে গেল। গাছ-পালা, পথ-বনভূমি, প্রান্তর সব দ্রুত চোখের ওপর দিয়ে সরে যাচ্ছে। দৃশ্যপট ঘন ঘন বদলে যাচ্ছে। কিন্তু রাধার স্বপ্নমদির আঁখিতারায় তার কোনো দৃশ্য প্রতিফলিত হচ্ছে না। পাঁচ বছর আগের একটি দৃশ্য সে দেখছে।

আর পাঁচ জন আত্মীয় ও প্রতিবেশীর মত রাধা কীর্তিকার সঙ্গে নবজাতক কৃষ্ণকে দেখতে এসেছিল। তখন তার বয়স সাত বছর। সাত বছরের মেয়ের কতটুকু বা অনুভূতি। তবু প্রথম দর্শনে জাগল আনন্দ। আনন্দে জাগল সুর। বিস্ময় তার কণ্ঠে ছন্দবদ্ধ হল। মিষ্টি গলায় উচ্চারণ করল :

এ হেন পুতুলী বেশ মনোহর
অতি সুমধুর রূপ।
নয়ন যুগল করয়ে শীতল
বড়ই রসের কূপ।।

রাধার কথা শুনে ঘরশুদ্ধ লোক তো অবাক। বিস্ময় আর কৌতূহল নিয়ে তারা তাকে দেখতে লাগল। অনেকগুলি কৌতূহলী চোখের সামনে এভাবে বসে থাকতে সে ভীষণ লজ্জা পাচ্ছিল। তার ভিতরটা মৃদু মৃদু কাঁপছিল।

সন্দীপন মুনির বৃদ্ধা জননী পৌর্ণমাসী বিভোল দুই চোখে রাধার দিকে নিষ্পলক কিছুক্ষণ চেয়ে রইল। দু চোখের তারা দুটি মমতায় নিবিড় হল তার। আঙুলের অগ্রভাগ দিয়ে টিকল চিবুক ছুঁয়ে একটু আদর করে গালে ঠোনা দিয়ে বলল :

এ যে দেখি, নব গোরচনে জিনিয়া বরণ তপত
কাঞ্চন গোরি।
ইন্দিবর নিন্দিত, নয়নে অসীম আকাশ সুষমা,
পরণে নীলাম্বরী।

যশোদা তাকে কোলের ভিতর টেনে নিয়ে গাল টিপে ধরে আদর করল। বলল : আহা রে, মধুর তুয়া রূপ। বাঁশীর মত কণ্ঠস্বর! কি নাম রে তোর?

রাধা কিছু বলার আগে কীর্তিকা বলল : আমরা ডাকি রাধা বলে।

বালিকা হলেও রূপের প্রশংসা রাধার মন ছুঁয়ে গেল। কিন্তু এই আশ্চর্য ভাল লাগার উৎস তেত্রিশ বছর পর তার শান্ত স্রোতহীন স্থির জীবনের মাঝখানে একটা লোষ্ট্রপাত করে যে তরঙ্গ বলয় সৃষ্টি করল তার ঢেউ এই মুহূর্তে বাঁশীর মত সমগ্র অনুভূতিতে লেগে রইল। পুলকিত শিহরণের রেশটুকু এমন করে আগে কখনও হৃদয় রাঙিয়ে দেয়নি। রাধা সেই অতীতকে স্পষ্ট এবং উজ্জ্বল দেখতে পাচ্ছিল।

নির্নিমেষ নয়নে সে চেয়ে আছে মরকত মঞ্জুলকান্তি শিশুর দিকে। কেমন একটা ঘোর ঘোর আচ্ছন্নভাবের মধ্যে অতি ধীরে ধীরে মৃণালবৃন্তের মত সুডৌল সুকোমল দুটি ছোট হাত মেলে ধরল। যশোদা নবজাতককে তার কোলে তুলে দিল।

আকাশ যেমন তাকিয়া থাকে পৃথিবীর দিকে, মৃণাল যেমন তাকিয়ে থাকে চাঁদের দিকে, তেমনি রাধা নন্দের নন্দন চন্দ্রের দিকে তাকিয়ে রইল। নবজাতকেরও চোখ মুখ মধুর হাসিতে উদ্ভাসিত হল। এ এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা রাধার। এক অবাক মুগ্ধতা ছুঁয়ে গেল রাধাকে। এক মোহিনী মায়ায়

বুকের ভিতরটা শির্‌শির্‌ করে উঠল। চোখ বুজে গেল। একটা অদ্ভুত অনুভূতিতে তার মুখখানা নবজাতকের মুখের কাছে নেমে এল। মনে মনে বলল : তুমি মধু , তুমি মধুর। আমার পরাণবঁধূ।

তার কান্ড দেখে যশোদা কীর্তিকার দিকে তাকিয়ে মিট্‌ মিট্‌ করে হাসল। মুগ্ধ কণ্ঠে বলল :

তোর দেখি, বিজুরি উজোর অঙ্গ।
আর আমার নন্দন এটি নব জলধর।
কাকে ছেড়ে কার পানে তাকাবো?

পাঁচ বছর আগে দেখা শিশু কৃষ্ণের মুখখানা ভাল করে মনে পড়ে না রাধার। অনেকদিন হয়ে গেছে। তবু, অনেক কথাই তার মনকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে। উন্মুখ মনটা সময়ের স্রোত পেরিয়ে আঠাশ বছর আগের এক স্মৃতির মধ্যে অনুপ্রবেশ করল।

রথের জানলায় মাথা রেখে সে বাইরের প্রকৃতি দেখছিল। চলমান দৃশ্য দেখতে দেখতে কখন যে কৃষ্ণের শৈশবচিন্তার মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হল, জানতেও পারল না। পুতনা কৃষ্ণকে স্তন দিচ্ছে। কৃষ্ণ পয়োধরে মুখ দিচ্ছে না, স্তনবৃন্ত নিয়ে খেলা করছে। খেলাতে মেতে গিয়ে কৃষ্ণ পুতনার গালের মধ্যে হঠাৎ তার হাত ঢুকিয়ে দিল। পুতনা আর্তনাদ করে ঢলে পড়ল মাটিতে। আর উঠল না। এর কিছুকাল পরে আরো একটা ঘটনা রাধার মনে ভীড় করল। কৃষ্ণ আঙিনায় খেলা করছে। হঠাৎ কিছু ভেঙে পড়ার শব্দ শুনে যশোদা পড়িমরি করে ছুটে গিয়ে দেখল একটা শকট ভেঙে পড়ে আছে কৃষ্ণের পাশে। কংসের বিশ্বস্ত অনুচর তৃণাবর্ত চুপিচুপি কৃষ্ণকে হরণ করে নিয়ে আকাশপথে পালাচ্ছিল। অলৌকিক শক্তিবলে শিশু কৃষ্ণ তার ক্ষুদ্র দেহকে এমন ভারী করে ফেলল তৃণাবর্ত তার ভার সইতে না পেরে মাটিতে পড়ে প্রাণ হারাল। ক্রীড়াচ্ছলে তিন বছরের কৃষ্ণ এক বিশাল অর্জুনবৃক্ষ ধাক্কা দিয়ে উপড়ে ফেলল। এমন অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত গল্প মেঘের মত তার মনের ওপর দিয়ে ভেসে যেতে লাগল। কিন্তু এই সব গল্প কতটা সত্য আর কতটা বানানো তাই নিয়ে রাধার মনে নানারকম প্রশ্নের উদয় হল।

আঠাশ বছর আগের কথা। তবু কি বিস্ময় মনের মধ্যে এখনও তার অস্তিত্বের সুখকর স্পর্শ লেগে আছে। কিন্তু কেন? একি তবে ভালবাসা? আঠাশ বছর পর এই প্রশ্নটা তার অনুভূতিতে যন্ত্রণার মত ছড়িয়ে পড়ল। এক অদৃশ্য হাত গোপনে বারো বছর বয়সে কেন, তারও আগে কৃষ্ণের সঙ্গে তার মনকে গেঁথেছিল; কালের অবগুন্ঠন খুলে দেখা হয়নি সে হৃদয় রহস্য। তেত্রিশ বছর পর মধ্যরাতের বাঁশি হঠাৎ তার অবগুন্ঠন খুলল, কেন? এতকাল পরে এমন করে সব মনে আসতে পারে? পুরনো স্মৃতিকথায় এত রক্তক্ষরণ হয়?

নিস্তব্ধ বারান্দায় দাঁড়িয়ে রাধার মনে হতে লাগল, বাঁশির সুরের মত সেও আকাশে ভেসে কোথায় চলে যায়। চাঁদের দিকে তাকিয়ে বিড় বিড় করে বলে, "ধায় যেন মোর সকল ভালবাসা প্রভু তোমার পানে তোমার পানে।" কেন যে কথাগুলো তার মনের মধ্যে নীরব ঝংকারে বেজে উঠল নিজেও জানে না। কিন্তু অনুভূতির গভীরে এই সুর তার গুনগুন করছিল। মনের তারগুলো কে যেন ঐ সুরে বেঁধে দিয়েছিল।

কৃষ্ণের জন্মদিনটা এক আশ্চর্য সুন্দর দিন। উৎসবরে সাজ-সজ্জায় গোকুল নগরী ইন্দ্রপুরী হয়ে উঠেছে। ঘরের সঙ্গে লাগোয়া এক চিলতে সরু এবং ছোট বারান্দায় দাঁড়িয়ে রাধা উৎসবের জাঁকজমক, আমোদ-প্রমোদ হৈ-হুল্লোড় দেখছিল। কৃষ্ণের সঙ্গে তার খুব ভাব হয়েছিল। তার সঙ্গ সুখের কথাটা মনে হতেই রাধার গায়ে কাঁটা দিল। পাঁচ বছরের বালক কৃষ্ণের সঙ্গে বারো বছরে রাধার সম্পর্ক কি? আর পাঁচটা বালকের মত তার দুষ্টুমি, ছেলেমানুষীতে কি আর মন স্পর্শ করে? পাঁচ বছরের বালক কৃষ্ণের চুম্বনে কখনও তার দেহের শুচিতা যায় না। তার দেহস্পর্শে লজ্জাই বা হবে কেন? লজ্জা হয়েছিল এই জন্যেই যে, বয়স্করা তাদের নিয়ে কৌতুক করছিল। বারোবছর বয়সের সব মেয়েই সে কৌতুকের মর্ম ও ইংগিত বোঝে। কিন্তু একটা পাঁচ বছরের বালকের সঙ্গে এরূপ একটা সম্পর্কের কল্পনা তার শরীরে ভিতর একটা অদ্ভুত অনুভূতির ঢেউ দিয়ে গিয়েছিল। অনাগত কালের এক তরুণ কৃষ্ণের কাল্পনিক রূপ চিন্তা করে যে শিহরণ শরীরের কোষে কোষে বিদ্যুৎ খেলে গিয়েছিল

তার অনুভূতি মনেতে লেগে আছে এখনও। তরুণ কৃষ্ণের নীল-নবঘন আষাঢ় গগনের মত অনুপম রূপ, শস্যক্ষেত্রের মত লাবণ্যদীপ্ত শরীর, মৃগের মত দীঘল কালো চোখে প্রেমের মদিরা—সে শুধু প্রেম চায়. প্রেমে পাগল হতে চায়, এমন আশ্চর্য, মানুষ স্বপ্ন ছাড়া সত্যিই হয় না। সত্যি বলে বিশ্বাস করতে তার বুক কেঁপে ওঠে। চল্লিশ বছরের রাধ খোলা চোখে স্থির দৃষ্টিতে সেই স্বপ্নের কৃষ্ণকে দেখছিল। কিন্তু সে আজ পাঁচ বছরের কৃষ্ণ নেই। স্মৃতি অবচেতনের গভীরে যাকে নির্বাসন দিয়েছিল তাকে টেনে আনল মনের মণিকোঠায়।

রাধা তার বারো বছর বয়সে অনুপ্রবিষ্ট—তার সামনে কিংবা পিছনে নেই। ধ্রুবতারার মত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, এই চল্লিশ বছরে পা রেখেও বারো বছর বয়স সীমায়।

বারো বছরে মেয়ে এমন কিছু ছোট নয়। যৌবনের ঢল নেমেছে শরীর জুড়ে। কিন্তু সে যে পাঁচ বছরের বালক কৃষ্ণের ভিতর ঘুমন্ত পুরুষকে অকালে যুগান্তরের ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলবে ভাবতে পারেনি। তাই নির্ভয়ে কৃষ্ণকে হাতছানি দিয়ে কাছে ডাকল। অনুগত ও বাধ্য ছেলের মত কৃষ্ণ তার কোলে এসে বসল। তার ফর্সা সুন্দর হাতখানা নিয়ে খেলা করতে করতে হঠাৎ রাধার মুখখানা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল। আদর করল। রাঙা গালের ওপর ঠোনা দিল। অবশেষে কি ভেবে চুক করে একটা চুমু দিয়ে দুষ্টু ছেলের মত খিল খিল করে হেসে উঠল। এক ঘর লোকের মধ্যে এরকম একটা অদ্ভুত কান্ড করে কৃষ্ণ তাকে যতটা অপদস্থ করেছিল তার চেয়ে বেশী লজ্জায় ফেলেছিল। ভীষণ রাগ হল কৃষ্ণের ওপর। তার কান ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগল। বুকের ভিতর ধক্ ধক্ করছিল। পুরুষ ও মহিলারা নানারকম টিপ্পনি কাটল। অপরিণত দুটি বালক-বালিকাকে নিয়ে বয়স্কদের মস্করা রাধার ভাল লাগল না। সহ্য করতে পারল না। ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল তার। লজ্জায়, দুঃখে, অভিমানে তার চোখ ফেটে জল বেরোল। কারো চোখের দিকে ভাল করে তাকাতে পারছিল না। দুঃখটা বুকের ভেতর মোচড় দিয়ে ওঠল। রাধা মজলিস থেকে বেরিয়ে গেল।

বিকেলে বৃন্দাবন যাত্রার প্রাক্কালে বৃষভানুর সঙ্গে রাধা আচার্য গর্গকে প্রণাম করতে এল। বুকে তার প্রগাঢ় ভক্তি। কিন্তু কেমন একটা লজ্জায় ওঁর চোখের দিকে ভাল করে তাকানোর সাহস হল না। খুব ভয়ে ভয়ে গর্গের পায়ে মাথা রেখে অনেকক্ষণ ধরে প্রণাম করল। গর্গ মাথায় তার অভয় হস্ত রেখে আস্তে আস্তে বলতে লাগল : প্রিয়দর্শিনী রাধা তোমার বয়স অল্প। কৃষ্ণের ছেলেমানুষী নিয়ে বয়স্ক লোকেরা যে কান্ডটা করল তাতে আমিও মর্মাহত। যাই হোক, মনটাকে অস্থির কর না। নিজেকে শান্ত রাখ। মনটা দর্পণের মত স্বচ্ছ, আর আকাশের মত নির্মল রাখ। মনকে বাইরের ঘটনায় কখনও চঞ্চল হতে দিও না। আকাশে মেঘ জমে, বজ্রপাত হয়—কিন্তু আকাশে তার কোন ছাপ থাকে না। মনে বাইরের নানা ঘটনার ছায়া পড়বে আকাশের মত সহজভাবে তা গ্রহণ কর, কিন্তু কখনও নীল সমুদ্রের মত তাকে অশান্ত উত্তাল করে তোলার দরকার নেই—শান্ত হয়ে থেক। তোমার নিজের ভিতর যে মাধুরীলতা আছে তার ডালে ডালে ফুল ফুটবে। শুধু অপেক্ষা কর।

নম্র আবেগে কেঁপে গেল রাধার বুকের ভিতরটা। চোখের তারায় অন্তর্ভেদী নীরবতা। যা কৃতজ্ঞতার অবেগে বিগলিত করে তার মুখ।

আঠাশ বছর পরে রাধা গর্গের সেই সুধাস্নিগ্ধ কণ্ঠস্বর শুনল, হৃদয়ের অভ্যন্তরে। গর্গের ফর্সা গলার উপর সেই অদৃশ্য মালার সুগন্ধ পর্যন্ত পাচ্ছে। আজ এই মুহূর্তে প্রথম সাহস করে কল্পনায় রাধা গর্গের দিকে চেয়ে রইল। কী অসাধারণ তাঁর ব্যক্তিত্ব! সেই ব্যক্তিত্বের আকর্ষণীয় শক্তি কত প্রবল আর গভীর! অমন দেশপ্রাণ, স্নেহপ্রবণ, মধুর স্বভাবের মানুষ হয় না বললেই চলে। বাইরে থেকে তাঁকে খুব গম্ভীর, দাম্ভিক এবং কড়া মেজাজের মানুষ বলে মনে হয়। কিন্তু কথাবার্তা, আচার-আচরণের মধ্যে এতটুকু অবজ্ঞা নেই। গোকুলে, বৃন্দাবনে মথুরায় সবাই তাঁকে মান্য করে, ভালবাসে। শ্রদ্ধা ও আনুগত্য তিনি আদায় করে নিতে জানেন। গর্গ সম্পূর্ণ দোষশূন্য এবং দেবতাতুল্য এক মানুষ, এরকম একটা ধারণা নিয়ে সেদিন গোকুল থেকে প্রত্যাবর্তন করল।

দিনগুলো গড়িয়ে চলে সকাল থেকে সন্ধে। তার ভেতর কোন বৈচিত্র্য নেই। সমারোহ নেই। খালি পুনরাবৃত্তি।

রাত্রি গভীর হচ্ছে। শুক্লাদশমীর চাঁদ বিদায় নিয়েছে। এখন নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। বাঁশীর মিষ্টি সুরে রাধার ভিতরটা যেন মোমের মত গলে গলে পড়ছে। কে যেন আকুল সুরে তাকে ডাকছে। "বাঁশী কেন বলে রাধা রাধা"। ঐ সুরের মধ্যে কৃষ্ণের অস্তিত্বের খবর ভেসে আসছে। রাধার শরীরের ভিতরটা গরম হয়ে উঠল। চোখ মুখ জ্বালা করতে লাগল। শৌচাঘরে গিয়ে চোখে মুখে ভাল করে জল দিল। তারপর দরজাটা আস্তে আস্তে ভেজিয়ে দিয়ে নিজের পালঙ্কে গিয়ে শুল।

প্রদীপের মৃদু আলো পড়েছে ঘুমন্ত আয়ানের মুখে। রাধা বেশ কিছুক্ষণ আয়ানের মুখের দিকে চেয়ে রইল। বুকের মধ্য থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল। শ্বাসের সঙ্গে বেরিয়ে এল 'বেচারা'! সারাটা জীবন তার কোন সাধ বাসনাই পূর্ণ হয়নি। বেচারা কত চায় তাকে, তবু কয়েকটা দণ্ডের বেশি তার কাছে থাকেনি কোনদিন। আয়ানের সম্বন্ধে তার ভয়টা কেটে গেছে। তবু মনটা আজও তাকে মানিয়ে নিতে পারেনি। এখনও বিষাদে ছেয়ে আছে।

চল্লিশ বছর বয়সে যখন আবার বারো বছরের জীবনে প্রবেশ করল তখন আবার ঠিক সেই বারো বছর বয়সে ফুলশয্যার রাতের অনুভূতিটা ফিরে পেল রাধা। ফুল ও চন্দনের সুবাস যেন এখনও তার নিঃশ্বাসে লেগে আছে। বুকের ভিতরটা তার মোচড় দিল। কি যেন শির্ শির্ করে গেল সারা শরীর জুড়ে। এই চল্লিশ বছর বয়সেও সত্তার একটা অংশ এখনো বারো বছর বয়সের অনুভূতিতে ও অভিজ্ঞতায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সেই শরীর নেই, কিন্তু সত্তা আছে, রাধাও আছে। কেবল কালের দুই তীরে সে স্থির দাঁড়িয়ে।

কথাটা কিছুক্ষণ ধরে রাধার মনের ভেতর ঘুরতে লাগল। মনের কষ্টের সঙ্গে শরীরের অব্যক্ত যন্ত্রণাও যোগ হল। প্রতিদিন জননী কীর্তিকার অপমানকর ও অপ্রীতিকর কিছু ঘটনা ঘটে প্রতিবেশীদের কাছে। বিশেষত বাইরের লোকে রাধার বয়স আর রূপ নিয়ে বেশী সমালোচনা এবং নিন্দে করে। নিন্দে, সমালোচনার কেন্দ্র বৃষভানু। কীর্তিকাকে প্রতিদিন শুনতেও হয়, সহ্য করতেও হয়। কিন্তু রাধা জানে পিতা তাকে ছেড়ে থাকতে পারে না, তাই বিয়েটা শুধু বিলম্ব হচ্ছে। ওকেই কীর্তিকা বৃষভানুর অজুহাত এবং ওজর আপত্তি বলে ভাবে। স্বামীকে কেউ অপমান করুক কোন মেয়েমানুষ সইতে পারে না। কীর্তিকা বৃষভানুর মান বাঁচাতে উঠে পড়ে লাগল আয়ানের সঙ্গে রাধার বিয়েটা তাড়াতাড়ি করতে।

পিতার অনিচ্ছাকে জননী প্রতিদিন আঘাত করে, নানা অসম্মানজনক কথা বলে। অপদস্থ করে। এসব রাধার মোটেই ভাল লাগে না। জননীর জুলুমে সে নিজেই অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছিল। নিজেকে তার এই সংসারে এক অবাঞ্ছিত মনে হত। তার অস্তিত্ব সংসারে যেন বিষ হয়ে উঠছে। তার নিজেরও সংসারের প্রতি একটুও টান নেই। আর এক মুহূর্ত থাকতে তার ইচ্ছে করে না। মনের ভিতরও একটা ভিন্ন স্রোত বইতে আরম্ভ করেছিল। এটা তার ঘর নয়। এ সংসারে সে কেউ নয়। দুদিনের অতিথি মাত্র। স্বামীর ঘর তার নিজের ঘর, নিজের বাড়ী। সেটাই তার পৃথিবী, তার স্বর্গ। বাইরে থেকে কেউ তার মনের খবর টের পেল না। কিন্তু মনে প্রাণে সে বৃন্দাবন থেকে পালাতে চাইছিল। আয়ান ছিল তার দিনের ভাবনা, রাতের স্বপ্ন। কল্পনায় আয়ান সম্বন্ধে কত কি ভাবত। বিয়ে হলে স্বাধীন হবে। নিষেধের বেড়ি ভাঙবে। ইচ্ছামত প্রাণ খুলে সকলের সঙ্গে মিশতে পারবে। সন্দেহের যন্ত্রণা থাকবে না।

রাধার মনের কামনায় স্বপ্নের খাদ ছিল বেশি। তাই বিয়ের রাতেই স্বপ্ন ভঙ্গ হল। নিদারুণ মর্ম যন্ত্রণায় তার সব এলোমেলো হয়ে গেল। বারো বছর বয়সেই তার এক নতুন অভিজ্ঞতা হল। কামনা, বাসনা, ভালবাসা — এরা পাশাপাশি ঘেঁষাঘেঁষি বাস করে, কিন্তু সকলে স্বতন্ত্র। বিয়ের পর এদের পার্থক্য অনুভব করল সে। ভালবাসা হল শতদল। জীবনকে শুধু মেলে ধরে, শতদলের মত ফুটিয়ে তোলে, সেখানে মধুকরের নিত্য নিমন্ত্রণ। আর বাসনা হল তার মৃণালদণ্ড, কামনা হল কাঁটা — যন্ত্রণা দেয়, বিদ্ধ করে। কমল ভ্রমে সে মৃণাল ধরেছে। তাই তার ভালবাসায় এত দুঃখ আর জ্বালা। এজন্যে মা-কেই দায়ী করে।

বিয়ের পিঁড়িতে দুজন মুখোমুখি বসেছে। আয়ানের করপদ্মের ওপর তার করপদ্ম সংস্থাপিত। সারা শরীরে যেন কিসের দামামা বেজে যাচ্ছে। বিয়ে বাড়ীর হৈ-চৈ কোলাহল ভেদ করে মন্ত্রধ্বনি উচ্চারিত হচ্ছে। জয়ধ্বনির মত সে মন্ত্র তাকে অভিভূত করছে। নতুন জীবন অভিষেকের মন্ত্র যেন তাকে অভিষিক্ত করতে থাকে প্রতিটি মুহূর্ত। মন্ত্রের কোন অর্থ বুঝতে পারে না। কিন্তু তার বিচিত্র সুর ও ধ্বনি তার সমস্ত মনকে টানছিল।

হৃদয়ের অভ্যন্তরে আত্মনিবেদনের ভাব টৈটুম্বুর হয়ে গেল। মনে মনে বলছিল —

ত্বমসি মম জীবনং
ত্বমসি মম ভূষণং
ত্বমসি মম ভবজলধিরত্নং

মনের মধ্যে এ ভাবটা তাকে কেমন মোহাবিষ্ট করে রেখেছিল।

অগ্নি সাক্ষীর সময় আয়ান যখন তার হাত দিয়ে একটি একটি করে খই অগ্নিতে আহুতি দিল তখন চোখ ফেটে তার জল বেরোচ্ছিল। অবিশ্রান্ত কাঁদছিল। কিন্তু কিছুতেই সংবরণ করতে পারছিল না নিজেকে। কেন কাঁদছিল নিজেই জানে না। বৃন্দে কানে কানে বলল : "এত যদি কান্না তোর, দরকার নেই বিয়ের, তোর জায়গায় না হয় আমি বসি।" বৃন্দের কথাটা কিন্তু মোটেই ভাল লাগেনি তার। বরং মনে হল, বৃন্দে ঈর্ষা করে কথাগুলো বলছে। কিন্তু তবু কাঁদছিল সে। কেন কাঁদছিল কে জানে? পতিগৃহে যাত্রাকালে সব মেয়েই কাঁদে। বাবা মা প্রিয়-জনকে ছেড়ে যাওয়ার জন্য যত কাঁদে তার চেয়ে বেশি কাঁদে একটা নতুন পরিবেশ সম্পর্কে উৎকণ্ঠা আর ভয় থেকে। কিন্তু অগ্নিসাক্ষীর সময় ওসব কিছু মনে হয়নি তার। বরং উল্টোটা হয়েছিল। মন যেন কিছুই মেনে নিতে পারছিল না। বুকের ভেতর হাহাকার দামামার মত বেজে যাচ্ছিল। কিছু ভাল লাগছিল না। কোথায় যেন তার কি হয়েছিল!

দধিমঙ্গল হয়ে গেল। বর কনে বিয়ের পিঁড়ি থেকে বাসর ঘরে এল। তবু মন শান্ত হল না। অগ্নিসাক্ষীর সময় কেমন যেন সব এলোমেলো হয়ে গেল। এরকম একটা বিশ্রী ব্যাপার ঘটল কেন রাধা কিছুই ভেবে পেল না। মনটা কেবল খুঁতখুঁত করতে লাগল।

কান্নার উৎসটা আঠাশ বছর পর অনুভব করল। এই মুহূর্তে সে বারো বছর বয়সে ফিরে এল। সেই সময়ের অনুভূতিটা প্রত্যক্ষ হল চেতনায়। প্রেমের সুতীব্র অনুভূতি তার সমস্ত সত্তায় সত্তায় স্পন্দিত হতে লাগল। সত্যের পূর্ণ মূর্তি দেখতে পেল।

নাটমন্দিরে মালা গাঁথছিল সে। হঠাৎ বেজে উঠল কনকজিঞ্জির। রাধা মুখ তুলে তাকাল। পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছিল যশোদানন্দন গোপাল। শরীরের মধ্যে তার ঘুঙুর বাজছিল। বুকের ভেতর প্রজাপতি যেন পাখা মেলে দিয়েছিল। নীল আকাশ যেন নেমে এসেছিল মাটিতে।

গোপাল তার পাশে চুপটি করে বসল। নির্নিমেষ নয়নে রাধা তার অপরূপ রূপশ্রী দেখতে লাগল। "পুষ্প-গুঞ্জা শিখিপুচ্ছ চূড়ায় ঢলনি।" রাধার গায়ে কাঁটা দিল। একটা অদ্ভুত অনুভূতি হল। এই আবেগটা যে কী রাধা সম্যক জানত না। কেবল প্রাণ যেন বিশেষভাবে ভেঙে পড়তে চাইছিল যা প্রায় অসহনীয়। দ্বাদশবর্ষী রাধার বুকের ভেতর দুর্বার তৃষ্ণা জাগল। প্রমত্ত আবেগে পঞ্চবর্ষী গোপালের গালটা টিপে ধরল। শরীরের কোষে কোষে একটা অব্যক্ত সুরের ঝংকার বেজে যাচ্ছিল। একটা আতপ্ত কামনা অনুভূত হয়েছিল প্রতি অঙ্গে। কামনায় যে এত উল্লাস আর যাতনা থাকতে পারে জানা ছিল না। এক অনির্বচনীয় মহিমময় সুখের ভেতর সে হারিয়ে গেল। গভীর আবেগে পঞ্চবর্ষী গোপালকে বুকে জড়িয়ে ধরল। তার কচি গালে আগ্রাসী চুমু খেল। এবং সমস্ত অভিব্যক্তির মধ্যে ছিল দ্বাদশী রাধার স্নেহবৎসল হৃদয়দানের থর থর আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু প্রাণপণে গোপালকে জড়িয়ে ধরে আদর করার মধ্যে তার আশ্চর্যরকমভাবে একটি ইন্দ্রিয় সজাগ ছিল যা দ্বাদশী রাধাকে চুম্বক আকর্ষণের মত পঞ্চবর্ষী গোপালের দিকে ধাবিত করেছিল। সেই মুহূর্তে মনে হয়েছিল, তার শরীর কেমন হাল্কা হয়ে গেল। সে যেন উড়ে যাচ্ছিল শূন্যে। মনময়ূর যেন কি এক পাওয়ার অসীম উল্লাসে নাচছিল।

গোপাল বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে রাধার চোখের দিকে তাকিয়েছিল এবং আস্তে আস্তে ওর ঠোঁটের কোণে একটু অপ্রশস্ত হাসি ফুটেছিল। সে হাসিতে মৃদু লজ্জার আভাস মাখানো। ভুরু কুঁচকে বলেছিল : তুমি ভারি অসভ্য।

রাধার মুখে চোখে আনন্দ বিস্ময় এবং সূক্ষ্ম অপরাধবোধের এক অভিব্যক্তি ফুটেছিল। বলল : বারে, আমার দোষ কি? মোমের পুতুলের মত দেখতে তুমি। দেখলেই বুকের ভেতরটা উথলে ওঠার ভাব হয়। কি করব বল?

তুমিও তো দেখতে কত সুন্দর! আমার চেয়েও ফর্সা।

যারা হিংসুটে ভগবান তাদের গায়ের রঙ কালো করে দেয়।

ইস্, তোমাকে বলেছে। আমি কালো বলে ত তোমায় এত ভাল লাগে।

অবাক মুগ্ধতা নিয়ে রাধা চেয়ে রইল। তার বুকের ভেতরটা কাঁপছিল। কাঁপা গলায় স্খলিত স্বরে প্রশ্ন করল : কেমন করে বুঝলে তুমি?

পিপাসা লাগলে জলের প্রয়োজন টের পাই। তেমনি আমার বুকের মধ্যে তোমার হৃৎপিণ্ডের ধক্ ধক্ শব্দ শুনেছি। তুমি চোখ বুজে আমার মুখে মুখ রেখেছ, কিন্তু তোমার চোখ দিয়ে জলের ধারা গড়িয়েছে। মা যখন আদর করে তারও চোখ দিয়ে এমন জলের ধারা নামে। আর তখন বুঝতে পারি মা আমাকে খুব ভালবাসে। তেমনি করে বুঝেছি তুমি আমাকে ভালবাস।

মুহূর্তে রাধার অন্তরের মধ্যে কি যেন ঘটে গেল। সে যেন নীল সাগরের মধ্যে তলিয়ে যেতে যেতে অনুভব করল গোটা পৃথিবীর রংটা তার কাছে বদলে গেছে। এ কি তবে ভালবাসা? একে কি প্রেম বলে? প্রণয়ের কি কোন বয়স নেই?

তখনই এক বুকভাঙা নিঃশ্বাস পড়ল। রাধা চমকে তাকাল সে বৃন্দাবনের নাট-মন্দিরে বসে নেই। আভীর পল্লীর আয়ানের কক্ষে নিজের খাটে শুয়ে আছে। এসব চিন্তায় মনটা একবার ছি ছি করল। কিন্তু সেই মুহূর্তে শরীরের অভ্যন্তরে কোষে কোষে এক অদ্ভুত অনুভূতি ঢেউ খেলে গেল। এই অদ্ভুত অনুভূতিটা প্রশ্নে প্রশ্নে তার নিজের সত্তাকে খুঁজতে লাগল। সব ছাপিয়ে ফুলশয্যার রাতের ছবিটা নিদ্রাহীন দুই চোখের তারায় এই মুহূর্তে ভাসতে লাগল।

ননদিনী কুটিলা এবং কিছু মহিলা মিলে আয়ানকে বাসরঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দিল। আয়ানকে সেই প্রথম দেখল। আয়ানের বয়স বিশ, আর তার বারো। আয়ান আট বছরের বড়। নিটোল সুন্দর আর সুপুরুষ। সুন্দর মুখশ্রী। একান্তই ভাল লোক। বিয়ের কনের জড়তা আর লজ্জা ছাড়া অন্য ভয় ছিল না প্রাণে। পরণে ছিল তার নীলাম্বরী রেশমী শাড়ি। কপালে গালে ছিল কনেচন্দন আর সিঁথি ভর্তি সিঁদুর।

পা টিপে টিপে আয়ান পালঙ্কের দিকে গেল। শিকারীর মত সন্তর্পণে এবং চতুর্দিকে নজর রেখে রাধার কাছে বসল। তাতেই সে কেমন একটু ভয় পেল। মানুষটাকে একেবারেই চেনে না। কেমন হবে, কিরকম ব্যবহার করবে এসব ভাবনায় সে ঘেমে নেয়ে গেল। এর সঙ্গে রাতে একই বিছানায় কাটানোর কথা ভেবে তো লজ্জায় মরে গেল। সারা শরীরের ভেতর শির শির করে উঠল। অথচ মা তাকে বার বার বলেছে, স্বামীর কথা শুনতে হয়। সে যা চায় তাতে বাধা দিতে নেই, আপত্তি করতেও নেই। স্বামী সাক্ষাৎ ঈশ্বর। ঈশ্বর সেবায় কোন ত্রুটি হলে মেয়েমানুষের নরকেও স্থান হয় না। কিন্তু এসব কথার অর্থ জানা ছিল না। কিন্তু আয়ান যখন তার কাছে দাঁড়াল তখন বুকটা ধড়াস, ধড়াস, করে উঠল। কেমন একটা ভয় ও ভাবনায় বিব্রত বোধ করতে লাগল।

আয়ানের দুই ঠোঁটে টেপা হাসি। একটা অদ্ভুত আবেগে তার মুখ জ্বলজ্বল করছিল। রাধা তার অভিব্যক্তি দেখেই টের পেয়েছিল আয়ানের অভ্যন্তরটা যেন দুরন্ত অস্থিরতায় পাখা ঝাপ্টাচ্ছিল, কিন্তু সে নিজে নিস্পন্দ, স্থির। পায়ের নিচে মাটি কাঁপছিল। আসলে লজ্জায়, ভয়ে, আতঙ্কে তার নিজেরই শরীরের অপ্রতিরোধ্য আন্দোলন। একটা কল্পিত ভয়ে তার বুকটা টাটাচ্ছিল। চোখও কেমন ছলছলিয়ে উঠল।

সময়ের গতি তখন দুরন্ত। আয়ান তার দিকে দু'হাত বাড়িয়ে ধরল। কাঁধ স্পর্শ করল। চকিত

শিহরণের তরঙ্গ খেলে গেল সারা অঙ্গে। উদ্গত নিঃশ্বাস বুকের খাঁচায় আটকে রইল। তীব্র ব্যথায় টাটিয়ে উঠল। প্রায় কান্নার আবেগে বলল: না, না, আমাকে ছুঁয়ো না। ছেড়ে যাও। আমার ভয় করছে।

আয়ান থমকে গেল। চকিতে শীর্ণ হল তার আবেগ। শিথিল হল বাহু। কিন্তু নিমেষে কাটতে না কাটতে আয়ান তার শরীর ধরে প্রচন্ড ঝাপ্টায় নাড়া দিল। সমস্ত মুখখানা তার লালায় ভিজিয়ে দিল।

আয়ান তাকে বাহুবন্ধনে নিষ্পেষিত করছিল, সে শব্দ করে কেঁদে ওঠল। আয়ান কথা খুঁজে পেল না। অসহায় বোধ করে কেবল ডাকল: রাধা—এই—এই শোন।

এক দুরন্ত আক্ষেপে তার সমস্ত শরীর পাক দিয়ে মুচড়ে উঠেছিল। আর সে কান্নার শব্দকে আয়ানের বুকে চেপে ধরেছিল। কান্না জড়ানো অস্ফুটস্বরে, বলল: আমাকে ছেড়ে দাও—

আয়ানের কথার কোন জবাব শোনা গেল না। অপ্রস্তুতের মত তাকে বুকে আরো নিবিড় করে জড়িয়ে ধরল। পালঙ্কের ওপর বসল। তারপর মুখের খুব কাছে মুখ এনে আয়ান তার চোখের জল, আর বন্ধ শক্ত ঠোঁটের কষে গড়ানো লালায় ভেজা মুখখানা দেখল। খুব আস্তে আস্তে তার গালে হাত দিল। ভেজা চোখের জল আর লালা মুছিয়ে দিল। শিশুর মত ভয় ও কান্নায় তার গলাটা ধরে গেল। অস্ফুট স্বরে নিজেকে ধিক্কার দিল বলল: ছিঃ। ভীষণ অন্যায় করেছি। আমাকে তুমি ক্ষমা করে দাও।

আক্ষেপে আবর্তিত শরীর সহসা রাধার স্থির হয়ে গেল। গলা থেকে স্খলিত হল একটা স্বর: আমার কেন যে ভীষণ ভয়! কথাটা শেষ করতে পারল না।

এই ঘটনার পর কথা বলার আর কিছু খুঁজে পেল না তারা। একটা চাদর মুড়ি দিয়ে আয়ানের দিকে পিছন ফিরে শুল।

আঠাশ বছর আগের দৃশ্য দেখছিল রাধা। দৃশ্যগুলো পর পর তার মনে আসছে কি-না জানে না। তবে বর্তমানের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে সে ভাবছিল তার অতীতও নেই বর্তমানও নেই, তার আগে পরে কিছু নেই। শুধু বাঁশীর সুর তাকে স্পর্শ করে আছে। আর সে ক্ষণে ক্ষণে প্রবিষ্ট হচ্ছে তার বারো বছরের জীবনে।

আশাভঙ্গে ছাই হয়ে গিয়ে আয়ান বলল: যেদিন থেকে তোমার সঙ্গে আমার বিয়ের কথাবার্তা সুরু সেদিন থেকেই মনে কেমন একটা অনুরাগ আর ভালবাসা জন্মেছিল। তোমাকে নিয়েই আমার পৃথিবী তখন। কল্পনায় কত প্রেম করেছি মান অভিমান করেছি তোমার সঙ্গে। শুভদৃষ্টির সময় তোমায় প্রথম দেখলাম। মনে মনে বললাম: আমার জীবন সর্বস্ব। আমার সব কিছু তোমাকে দিলাম। তুমি আমার সুখ-দুঃখ, আমার জীবন-মরণ, আমার অস্তিত্ব-অনস্তিত্ব। কথাগুলো বলার সময় এক গভীর ভালবাসায় আয়ানের গলার স্বর বুজে গিয়েছিল। গলার কাছে কি যেন একটা দলা পাকিয়ে গিয়েছিল।

আয়ানের কথাগুলো তার অন্তর ছুঁয়ে ছিল। আয়ানকে ইচ্ছে করেছিল তার খুব বলতে—প্রিয়তম কল্পনায় আমিও তোমাকে দেবতার আসনে বসিয়ে পূজা করেছি। আমার হৃদয়কে নৈবেদ্য দিয়েছি প্রতিদিন। কথাগুলো তার বুকের ভিতর তোলপাড় করছিল কিন্তু কিছুতেই মুখ ফুটে বেরোল না। নিজের কাছেই কেবল সংগোপনে বলল ভালবেসে কিছু চাওয়া, আর ডাকাতি করা কি এক হল? তুমি ডাকাতি করতে এসেছ।

আয়ানের কোন কথার জবাব দিল না। বেশ বুঝতে পারছিল আয়ানের মধ্যে কেমন একটা অপরাধবোধ ও পাপবোধ কাজ করছিল। আয়ান শয্যা থেকে উঠে জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। তার চোখ উপবাসী ভিখারীর তীব্র ক্ষিদেয় জ্বলজ্বল্ করছিল। আয়ান নিজের মনেই তাকে শুনিয়ে বলল: কোন ইচ্ছে পূরণ করার মধ্যে যেমন তীব্র সুখ থাকে, তেমনি নিজেকে নিবৃত্ত করার মধ্যে তীব্রতর কোন সুখ চাপা থাকে। একটা অতিরিক্ত স্বাভাবিক ভাবাবেগকে গলা টিপে ফেলার নাম বঞ্চনা, ছলনা, জিতেন্দ্রিয়তার ভণ্ডামি।

সময়প্রবাহ থেমে থাকল না। কিন্তু তার মুখে কোন কথা যোগাল না। বড় বড় কথার পাথর চাপিয়ে আয়ান তার আর্ত মনকে আরো ক্লান্ত করে দিচ্ছিল। কিন্তু আয়ান ভালবাসায় সিঞ্চিত এক জ্বালাধরা অনুভূতিতে ছটফট করছিল। বিরক্ত স্বরেই বলল: নিজের স্ত্রীর কাছে চুপ করে থাকার মত যন্ত্রণা আর কিছু নেই। চোরের মত সময় কাটান অসহ্য। কেন যে মানুষ বিয়ে করে? ভালবাসা বোকামি। বোকারা আর কাপুরুষেরা ভালবাসা নিয়ে মাথা ঘামায়। সাহসী মানুষেরা এসব পরোয়া করে না। আমি দুর্বল, ভীরু বলেই ভালবাসি। ভালবাসার মধ্যে হারিয়ে যেতে চাই। কিন্তু একজনের যদি পছন্দ না হয় তাহলে মনে করব সে আমার দুর্ভাগ্য।

আয়ানের কথাগুলো শুনে রাধার কান ঝাঁ ঝাঁ করছিল। একটা অশান্ত অস্থিরতায় মনটা দাপিয়ে বেড়াচ্ছিল। একটা অদ্ভুত সুন্দর অনুভূতিতে মনটা ছেয়েও গেল। স্তব্ধ দৃষ্টি মেলে চেয়েছিল আয়ানের দিকে।

আয়ান জানালার শিক ধরে দাঁড়িয়েছিল। চাঁদের দিকে মুখ করে থাকায় কানের দু'পাশের চুলের ওপর রূপালী আলো পড়েছিল। ঘরের মেঝেয় ছিল তার ছায়া। দ্বিধাগ্রস্ত এবং যন্ত্রণায় কুঁকড়ে যাওয়া শরীরের ছায়া।

আয়ানের কষ্টে তার বুকের বরফ নিঃশব্দে গলতে শুরু করেছিল। বেশ কিছু পরে স্বগতোক্তির মত বলেছিল: জীবনের সব কিছুরই মানে আছে, সব ঘটনারই একটা নিয়ম আছে, একটা নির্ধারিত সময় থাকে। কুঁড়ি ধরার, ফুল ফোটার, ফল হয়ে ওঠার এবং তারপর ঝরে পড়ার। পাতা উদ্‌গম হওয়ার মুহূর্তে কুসুম ফোটাতে চাইলেই কি ফোটে? আমার দুঃখ এই যে, তুমি আমার তৈরি হতে দিলে না।

লাট্টুর মত পাক খেয়ে ঘুরে দাঁড়িয়েছিল আয়ান। দু'চোখে তার অভিমান জোনাকির মত জ্বলছিল। আশা ভঙ্গের বেদনায় হতাশ হয়ে বলল: আমার প্রথম যৌবন থেকে একটা মেয়েকে স্বপ্ন দেখে আসছি, কল্পনা করে আসছি, বুকের ভেতরটা তার সুগন্ধে ভরপুর। এই পেতে চাওয়ায়, এই মিলনবাসনা হঠাৎ একদিনের নয়। তোমাকে স্ত্রীরূপে পাওয়ার পরেই আমার সেই দুকুল ছাপানো ভালবাসার পুকুর যদি প্লাবিত হয়, তাহলে অপরাধ কোথায়? তোমাদের এই মেয়েলী লজ্জা আর এই দেবী দেবী ভাব একটা নাটক। নাটক হয় জীবনের টুকরো ঘটনা নিয়ে। বাস্তবের অনেক কিছু তাতে ধরা পড়ে না। আমার মত একজন রক্ত মাংসের মানুষ তার সবটুকু নিয়ে নাটকের পরিধিতে আঁটে না। নাটকে জীবন কৃত্রিম, তার সবটুকুই অভিনয়, মিথ্যে। কিন্তু জীবন অনেক বড়। জীবনে জীবন যখন যুক্ত হয় তখন জীবনের স্বতঃস্ফূর্ত দাবী, প্রেরণায় ও টানে ভালমন্দ, সুশ্রী কুশ্রী সব আসে। ভালবাসা মানেই শরীর। অন্তত পুরুষের ভালবাসার কেন্দ্রবিন্দু শরীর। যাকে ভালবাসি তাকে যদি শরীর দিয়ে বুঝতে না পারলাম, কিসের ভালবাসা? অমন যে জননীর নিষ্পাপ বাৎসল্য তাতেও আলিঙ্গন, চুম্বন, প্রভৃতি শরীরী ব্যাপারগুলো আছে। ছেলেভুলানো কথা দিয়ে শুধু নারী পুরুষের প্রেম, স্বামী-স্ত্রীর ভালবাসা হয় না। কোনো দিন শুনেছ, ধূপ ধূনো দিয়ে ফুল দিয়ে পূজো করার জন্য কেউ বিয়ে করেছে?

কথাগুলো শেষ করে আয়ান হাঁপাচ্ছিল। জোরে জোরে তার শ্বাস পড়ছিল। অবরুদ্ধ অভিমানে তার ঠোঁট কাঁপছিল। কয়েকবার ঢোঁক গিলে বলল: যে যার কপাল নিয়ে আসে পৃথিবীতে। অভিযোগ অনুযোগ এসব চলে একমাত্র নিজের মা আর ভগবানের কাছে। অরণ্যের রোদন আর কে শোনে? অন্যের কাছে জানাতে গেলে নিজেকেই ছোট করা হয়। আমার কি দায় পড়ে গেছে তোমার কাছে ইনিয়ে বিনিয়ে প্রেমের কথা বলা, করুণা ভিক্ষা করা। চাইনে চাইনে তোমার ভালবাসা। ব্রজেতে এখনও সুন্দরী মেয়ের আকাল লাগেনি।

আয়ানের বুকের ভেতর লাভা স্রোতের মত তার প্রেম টগবগ করে ফুটছিল ক্ষোভে, দুঃখে, যন্ত্রণায়, হতাশায় আর নৈরাশ্যের দাহে। এটুকু বুঝেই সে চুপ করেছিল।

অনেকক্ষণ পর্যন্ত তাদের কোন কথা হয়নি। হঠাৎ রাগ করে একটা চাদর টেনে নিয়ে মেঝেতে শুল সে।

নিস্তব্ধ কক্ষ। দুজনেই নিজের চিন্তায় ও দুঃখে বুঁদ হয়ে রইল। বাইরে চাঁদের আলো বনে এবং

পাহাড়ের গভীরে চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ছিল। রজনীগন্ধা, কনকচাঁপা ফুলের সুগন্ধ নিঃশ্বাস তার বুকের ভিতরটা একটা অদ্ভুত মোহ আর আবেগ সঞ্চার করছিল। মনে হচ্ছিল পুরুষ ও নারী যখন চুপ করে থাকে তখনই তাদের সবচেয়ে সুন্দর দেখায়। আয়ানের দাপাদাপি এবং রাগের চেয়ে এই বিমুখ বিমর্ষ হয়ে থাকা রূপটাই যেন রাধার কাছে বেশি সুন্দর।

বেশ কিছুক্ষণ পর আয়ানের একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস পড়ল। হতাশ গলায় বলল: বরফের মত ঠাণ্ডা তুমি। আজকে সমস্ত সুযোগ ও অধিকার থাকা সত্ত্বেও তোমাকে আমার করে পেলাম না। দুঃখ, তুমি আমার হতে চাইলে না। অথচ, কত স্বপ্ন দেখেছি তোমায়! ফুলের বিছানায় চাঁদের আলোয় শুয়ে রাতভর তোমাকে আদর করছি, সোহাগ জানাচ্ছি, ভালবাসছি—আরো কত কি। তারারা আমাদের প্রেমের সাক্ষী থাকছে, ঝিঁঝিঁরা সঙ্গীত করছে, জোনাকীরা বাসর জাগছে। অপরূপ সে সব স্বপ্ন আমার মাটি হয়ে গেল। কি দোষ করলাম আমি? সহসা আয়ানের কণ্ঠস্বর ভিজে গেল। কাঁদ কাঁদ গলায় বলল: কেন কামনার আগুনে পুড়ে ছাই হতে দিলে না? তোমার কাছে শুধু জ্বালা পেলাম, কিন্তু জ্বলে উঠলাম না। নিজের বুকের আগুনে নিজে জ্বলে মরছি। সবই আমার ভাগ্য! আমার কপালটাই এরকম। মনে মনে তোমাকে ছাড়া দ্বিতীয় মেয়ে কখনও চাইনি। তোমার মত নিষ্ঠুর মেয়ে পৃথিবীতে খুব কম জন্মায়।

কান্না আর হাসির মাঝামাঝি একরকমের অদ্ভুত অনুভূতিতে ভেসে গিয়ে রাধা সহসা উঠে বসল। কিছুক্ষণ পরে আবার, হাতের ওপর মাথা রেখে শুয়ে পড়ল। আয়ান সব দেখল। তারপর থমথমে গম্ভীর গলায় স্বগতোক্তির মত বলল: ভুল করেছি। দেবীকে মানবী বলে ভুল করেছি। কিন্তু আমি তো চেষ্টা করেও দেবতা হতে পারব না। হতে চাইও না। আমি একজন অতি সাধারণ রক্তমাংসের মানুষ। এসব কথা এড়িয়ে গেলে আমি কেমন করে বাঁচব? কি নিয়ে জীবন কাটাব?

কথাগুলো আয়ানের কণ্ঠে হাহাকারের মত শোনাল। কষ্টে বুকটা চেপে ধরল। অভিমানের সমুদ্র যেন তার বুকে উথলে ওঠল। গলার স্বরে তার ঢেউ খেলে গেল। বলল: ঠিক আছে। তোমাকে আর আমি কোনদিন চাইব না! আগামীকালের কোন ভরসা বা প্রত্যাশা রাখব না তোমার কাছে। কিন্তু আমাকে তো বাঁচতে হবে। বাঁচার জন্যে আমার যে কল্পনা আর স্বপ্ন রইল তাকে তুমি ফাঁকি দেবে কেমন করে? তুমি আমার কল্পনা কেড়ে নিতে পারবে না। আমার রাতের স্বপ্ন থেকে তুমি পালিয়েও যেতে পারবে না। আমি চাঁদের পানে চেয়ে তোমার মুখ দেখব, আকাশের নীলিমায় তোমার প্রিয় নীলাম্বরী দর্শন করব। আমার ভালবাসার পৃথিবীটাকে শুধু একটু বদলে নিয়ে আমার করে নেব। এই সুন্দর পৃথিবীতে শুধু সুন্দর পুরুষেরাই বেঁচে থাকে। আমিও বেঁচে থাকব তোমার শ্রদ্ধায় এবং অনুরাগের পাত্র হয়ে। দেহাতীত এক স্বর্গলোক সৃষ্টি করব আমার মনের অভ্যন্তরে। সেখানে তোমার সঙ্গে মনের জানলায় বসে সর্বক্ষণ কথা বলব। অথচ তোমার সাধ্য নেই আমাকে নিবৃত্ত করার। আয়ানের কথাগুলো রাধার মন ছুঁয়ে গেল। বুকের ভিতর কাঁপুনি সৃষ্টি হল। কিন্তু তবু কোন কথা মুখ দিয়ে বেরোল না! চুপ করে রইল। কিন্তু তার চোখ দুটি স্থির হয়ে রইল আয়ানের ভেজা দুই চোখের ওপর।

খোল জানলা দিয়ে আধখানা আকাশ দেখা যাচ্ছিল। শরতের মেঘে মেঘে রাতের খেলা চলছিল। বাইরে শিউলির গন্ধ, আমলকি গাছের পাতারা হাওয়ায় সওয়ার হয়ে ছুটে চলেছে দিগ্বিজয়ে; তার মধ্যে একজন চিরন্তন প্রেমিক, অন্যজন চিরন্তন বিরহিনী। আসল ভালবাসা তো একেই বলে! তার ভিতর পুরো আমিটা কোন একজন মানুষের মধ্যে কখনও আটকে থাকে না। সে উপছে যাবে অন্য মানুষের দিকে। এটাইতো শ্রেষ্ঠ ভালবাসার অন্যতম শর্ত।

পরদিন আয়ানের ঘুম ভাঙল রাধার গুনগুন গানের সুরে। কিন্তু ঘুম থেকে এক নতুন আয়ান জেগে উঠল। এ আয়ান গত রাত্রির নয়। সকালবেলায় নতুন জীবনে জেগে ওঠা আয়ানকে দেখে রাধার বিস্ময়ের সীমা রইল না। অবাক ব্যাপার। আয়ান তার দিকে তাকিয়ে হাসছে। ওর শুকনো ঠোঁটের সেই আশ্চর্য হাসিতে কৌতুক এবং অশেষ ক্ষমা মাখানো।

সংসারের কিছু লোকের মুখে এক আশ্চর্য তন্ময়তা থাকে। আয়ানের মুখটিও তেমন। তার

প্রতি ওর কোন অনুযোগ, অভিযোগ নেই। একেবারেই না। নিজের প্রতিও না। মনটা তার দরদে গলে গেল। চোখ দুটি প্রসন্নতায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠল। বলল: অমন করে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছ কি? আমার বুঝি লজ্জা করে না?

আয়ান ধন্য হয়ে গেল। শুধু এই মুখের কথাটায় সে যেন স্বর্গ হাতে পেল। মনে রাখার মত ওর সে অভিব্যক্তি। আনন্দে খুশিতে গম্‌গম্‌ করে ওঠল আয়ানের গলা। বলল: রাতের সব তারাই আছে দিনের আলোর গভীরে।

কথাটার অর্থ কতখানি বুঝল সে জানে না, কিন্তু কথার উত্তরটা ঠিক মুখে এল। বলল: আমার মত সত্যি করে কেউই জানে না।

মুহূর্তে আয়ানের মুখের রঙ বদলে গেল। অকস্মাৎ উদাস, অন্যমনস্ক হয়ে গেল তার দুই আঁখি তারা। কেমন গম্ভীর হল তার গলার স্বর। বলল: ঠিক বলেছ, তোমার আশ্চর্য সুন্দর সংযম স্থৈর্য, নীরবতার বাণী আমার মনের আবরণ খুলে চিনিয়ে দিল আমাকে। তুমি আমার সত্তার ঘুম ভাঙিয়েছ। আমাকে চিনিয়েছ কে আমি? কে তুমি? কোথা থেকে, কেন এলাম আমরা। এসব আমি স্বপ্নের মধ্যে দেখলাম। সে এক আশ্চর্য কান্ড। শরতের আকাশে তুলোয় পেঁজা সাদা মেঘগুলো হঠাৎ একটা বিরাট রাজহাঁস হয়ে গেল। আমি সেই রাজহাঁসের পিঠে চড়ে স্বর্গে চলেছি। স্বর্গের কাছে পৌঁছতে দরজা বন্ধ হয়ে গেল। অপমানে সেখানে বসেই ধ্যান করতে লাগলাম। কতকাল যে তপস্যায় কেটে গেল জানি না। ঋষির মত আমার কেশ দাড়ি গোঁফ সব শুভ্র। আমার সারা অঙ্গ দিয়ে এক অদ্ভুত জ্যোতি ঠিকরে বেরোতে লাগল। হঠাৎই বিষ্ণু আর্বির্ভূত হয়ে বলল, ঋষিবর আমি তোমার তপস্যায় তুষ্ট হয়েছি। তুমি বর চাও। তোমাকে আমার অদেয় কিছু নেই।

বিষ্ণুর কথা শুনে ঋষি হাসল। চোখে তার কৌতুক মুখে মুক্তার মত বিনয়ী হাসি। বিষ্ণুর দানের ক্ষমতা পরিমাপ করার দুর্মতি হল ঋষির। ঋষি ভাবল সব কিছুর ভাগ দেয়া যায়, কিন্তু স্ত্রীর ভাগ বা অধিকার কাউকে দেয়া যায় না। বিষ্ণুর সেই কোমল জায়গায় আঘাত করে তাকে সত্যভঙ্গ করার প্রবল ইচ্ছা হল ঋষির। বলল: হে দেব সত্যিই যদি তপস্যায় তোমাকে তুষ্ট করে থাকি, তা হলে তোমার লক্ষ্মীর প্রণয় ভাগ দাও আমাকে।

বিষ্ণুর অধরে অনির্বচনীয় হাসির দীপ্তি ফুটল। মৃদু কণ্ঠে বলল: তোমার মনোবাঞ্ছা পূরণ করবে লক্ষ্মী। মর্তভূমিতে লক্ষ্মীর প্রণয় ভাগ পাবে। কিন্তু নব নব দুঃখও সইতে হবে তোমাকে।

এই কথা বলে বিষ্ণু অন্তর্হিত হল। হঠাৎ কোথা থেকে প্রবল ঝড় ধেয়ে এল। নিমেষে আমাকে উড়িয়ে নিয়ে গেল। শূন্যলোকে ভাসতে ভাসতে আমি চলেছি। তারপর দেখলাম আমার চিরপরিচিত আভীর পল্লীতেই ঘুরে বেড়াচ্ছি। তখন আমার ঋষির চুল দাড়ি গোঁফ আর নেই। পরিচ্ছন্ন বেশবাস করে বিয়ে করতে যাচ্ছি। শুভ দৃষ্টির সময় বিষ্ণুর লক্ষ্মী আমার দিকে তাকিয়ে আছে। একসময় সে মুখখানা ধীরে ধীরে তোমার মুখের মধ্যে মিলিয়ে গেল। আর বিষ্ণু আমার দিকে তাকিয়ে মৃদু মৃদু হাসতে লাগল। আমার ঘুম ভেঙে গেল। চোখের পাতা উন্মুক্ত করে যার দেখা পেলাম সে তুমি। লক্ষ্মীর আদল তোমার মুখে।

আয়ানের কথা শুনে রাধা খুব অবাক হল। অনেকক্ষণ পর্যন্ত তারা কোন কথা বলতে পারল না। মন্ত্রমুগ্ধের মত দু'জন দু'জনকে দেখছিল। বিস্ময়ের ঘোর কেটে গেল বলল: স্বপ্ন! স্বপ্ন! ও নিয়ে মাথা ঘামানোর কিছু নেই। যে ভুলতে না পারে, তার মত দুঃখী কেউ হয় না।

মনে আছে, মার উপদেশ মত প্রতিদিন ভোরবেলায় সাবধানে স্বামীর পায়ের ধুলো নিয়ে রাধা বিছানা থেকে উঠত। প্রণাম করাটা তার অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল। প্রণামের সময় মনে হত স্বামীর পায়ের ছোঁয়া পেয়ে সিঁথির সিঁদুর যেন অরুণালোকের উজ্জ্বলতায় জ্বল্‌জ্বল্‌ করে ওঠে। সেদিন প্রণামের সময় আয়ান জেগে গেল। ত্রাস্ত-ভাবে পা টেনে নিয়ে বলল: ওকি রাধা, করছ কি? আমাকে আর অপরাধী কর না। তোমার মধ্যে যে ঈশ্বর আছেন তাকে ছোট করার অধিকার তোমার নেই।

আয়ানের কথা শুনে লজ্জায় রাঙা হয়ে গিয়েছিল। অবাক হয়ে চেয়েছিল তার দিকে। দুচোখে তার নিবিড় লজ্জা। বুকে জড়তা। মনের মধ্যে প্রশ্ন, আয়ান কি ভাবছে লুকিয়ে লুকিয়ে পুণ্য করছে সে? তাই যদি হয়, তবে এ পুণ্যফলের দাবিদার হবে না কেন সে? ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকে করুণ চোখে চেয়ে থাকতে দেখল আয়ান। মধুর গলায় বলল: যুগটা সমান অধিকারের। বেদের যুগে স্ত্রী পুরুষের সমান অধিকার ছিল। সেই যুগে নারীর মর্যাদা ছিল। গোকুলের কিশোর কৃষ্ণ আজ তার আওয়াজ তুলেছে ঘরে ঘরে। আমি তার দাবিকে শ্রদ্ধা করি, সম্মান করি। সুতরাং বুঝতে পারছ প্রেমের সম্বন্ধেই নারী পুরুষ সমান সেখানে প্রণাম করে তুমি তার গৌরব নষ্ট করে দিচ্ছ। বিশ্বাসের ধার ক্ষয়ে যাচ্ছে তাতে।

রাধার বুকের ভেতরটা চমকে ওঠল আয়ানের অদ্ভুত আশ্চর্য যুক্তিতে। চোখের চাহনিতে একটা নিবিড় ব্যথার ছায়া পড়ল তার। সমস্ত চেতনার ওপর নেমে এল বিহ্বলতা। কেমন একটা অভিভূত আচ্ছন্নতায় আবিষ্ট হয়ে গিয়ে বলল: আমার নারী হৃদয় ভালবাসার পূজা করতে চায়। আরতির দীপ জ্বেলে দিতে চায় প্রেমের পূজায়। পূজা যে করে এবং যাকে পূজা করা হয় দুয়ের ওপরই তার স্নিগ্ধ আলো সমান হয়ে পড়ে। কেউ ছোট হয় না। সমান হয়ে থাকবার আনন্দ তাতে বরাবর পাওয়া যায়।

রাধা! চমকানো বিস্ময়ে উচ্চারণ করল আয়ান। একটা অদ্ভুত আশ্চর্য ভাললাগার আবেগে, আনন্দে, গৌরবে তার দু'চোখে চকচক করছিল। থমথমে গলায় বলল: রাণী আমার, সখী আমার—একি অদ্ভুত কথা শোনালে তুমি। ব্রজের শ্রীকৃষ্ণও বোধ হয় এমন হৃদয় নিঙরানো ভালবাসার কথা বলতে পারত না। কিন্তু প্রিয়তম আমার স্বপ্নের পাহাড় ডিঙিয়ে এসে নিজেকে'তো আমি দান করতে পারছি না। স্বপ্ন বৃত্তান্তটা ভুলতে পারছি কৈ? স্বপ্নটা আমাদের সম্পর্কের মধ্যবর্তী হয়ে তোমার আমার ব্যবধানকে শুধু বড় করছে। কতদিন বিয়ে হল, তবু আমরা কেউ কাউকে ছুঁতে পারনি। নক্ষত্রের মত পাশাপাশি ঘেঁষাঘেঁষি হয়ে আছি। দুই নক্ষত্রের মধ্যে যেমন বিরাট ব্যবধান; একে অন্যকে ছুঁতে পারে না; কাছে আসতে পারে না তেমনি একটা ফাঁক ও দূরত্ব আমাদের স্বামী স্ত্রীর সম্পর্কের মধ্যে আছে। সহস্র সহস্র বৎসর ধরে হাঁটলেও একে অন্যকে বোধ হয় আর ছুঁতে পারব না।

প্রিয়তম তুমি আমার পুজো চাও না, সে তোমারই যোগ্য। কিন্তু একটা কাঁচের ঘরে তুমি বাস করছ। আমার ভক্তি দিয়ে তোমার ঐ অহংকার ভাসিয়ে দেবার ব্রত নিয়েছি। রূপের দেমাক দেখাতে গিয়ে উমা শিবের তেজ সহ্য করতে পারেনি। তাই অনেককাল শিবের জন্যে তাকে তপস্যা করতে হয়েছিল। যা মন্দ তার তো একটা শাস্তি আছে। একদিন আমি তোমার সঙ্গে মন্দ ব্যবহার করেছিলাম, আমার সেই অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত তো করতে হবে।

আয়ান তর্ক না করে হাসল রাধার কথায়। বোধ হয় তার মনের মধ্যে যে একটুখানি কাঁটা ছিল সেটুকু আয়ানের অজানা ছিল না। তাই রাধার দুঃখটাই সে শুধু দেখতে পেত, দোষ দেখতে পেত না। তাকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে বলত সত্যের মধ্যে আমাদের পরিচয় যদি পাকা হয় তবেই আমাদের ভালবাসা হবে সার্থক। এখনও পর্যন্ত তুমি যে কাকে চাও তাও জান না, কাকে পেয়েছ তাও জান না।

দূরে ছায়াঘন স্নিগ্ধ তমালকুঞ্জ। ঐখানেই বাঁশি বাজে মোহন সুরে। কৃষ্ণ বাঁশি বাজিয়ে রাধাকে নিরন্তর ডাকছিল। বাঁশির সুর বলছিল গরাদ ভেঙে বেরিয়ে এস। এস হাওয়ায় ভেসে। বুকের ভেতরটা তার যন্ত্রণায় ছটফটিয়ে ওঠল। সারা শরীরও গরম হয়ে গেল। শৌচাগারে গিয়ে চোখে মুখে জল দিয়ে বারান্দায় দাঁড়াল। ফুরফুরে শীতল হাওয়ায় দেহ স্নিগ্ধ হল। কিন্তু বুকের ভেতরটা বাঁশির সুরে মোচড় দিয়ে ওঠল। খুব মিষ্টি বাঁশি। কৃষ্ণের মুখটা মনে পড়ছিল। কিন্তু সেই মুখ কৃষ্ণের দিকে তাকে টানতে লাগল। হৃদয়টা কৃষ্ণময় হয়ে গেল। মনটা অনেক আগেই কৃষ্ণের কাছে

চলে গেল। কিন্তু দেহটাই পড়ে রইল। দেহের যন্ত্রণায় তার মন টাটাতে লাগল। মনকে চোখে দেখা যায় না, স্পর্শ করা যায় না। অনুভূতি, উপলব্ধি দিয়ে তার সবটা পরিমাপও করা যায় না। সে শূন্য নিরাকার। মন চাওয়ার মূল্য কি? ইন্দ্রিয় সর্বস্ব স্থূল দেহই সব। দেহটাকে দেখা যায়, ছোঁয়া যায়, ভাষা দিয়ে ভাব দিয়ে হৃদয়ের অভ্যন্তরে অভিব্যক্তিকে বোঝান যায়। ইন্দ্রিয় সর্বস্ব স্থূল দেহটাই যদি পড়ে রইল তাহলে তার সান্নিধ্য, সঙ্গ পাবে কেমন করে? কেমন করে তার সঙ্গে কথা বলবে? সে বা কার উপর অভিমান করবে? ঝগড়া করবে?

সময়ের সুমদ্র পেরিয়ে রাধার চল্লিশ বছরের এই জীবনসংসার, সমাজের পাহাড় ডিঙিয়ে দেবতার মত স্বামী, ভারতীয় নারীর সুনাম ছেড়ে অভিসারিকার মত বেরিয়ে পড়তে চাইল। মনকে বলল: চলো, চলো কৃষ্ণ একবার তোমাকে দেখতে চাই। বিশ বছর দেখি না তোমায়। তোমার ফাল্গুনের মত যৌবনকে কল্পনা করার চেষ্টা করছি, কিন্তু পাচ্ছি না। আমার দু'চোখের লেগে আছে তোমার মুকুলিত যৌবনের তারুণ্যে ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণী! আমার স্বপ্ন ভঙ্গ না করে কৃষ্ণ তোমায় একবার দেখতে চাই।

রাধার বয়স বাইশ আর কৃষ্ণের পনেরো। বয়সের পক্ষে কৃষ্ণ একটু বেশী বকমের পূর্ণ বয়স্ক। তার বুদ্ধি, সাহস, শক্তি, কৌশল, সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের আশ্চর্য ক্ষমতা তাকে ঐ বয়সেই জনপ্রিয় করেছিল। তার প্রতি মথুরাবাসীর কি দুরন্ত আস্থা আর প্রত্যয়! কৃষ্ণকে নিয়ে কত অদ্ভুত অলৌকিক গল্প প্রতিদিন তৈরি হয়। এসব গল্প করতে এবং বলতে প্রত্যেকের ভেতর কি প্রচন্ড উল্লাস! ভয়ংকর একটা ইচ্ছার জোর যেন ঐসব গল্পে পেত তারা। কার্যত কৃষ্ণকে নিয়ে একটা প্রবল আবেগ সমগ্র মথুরার উপর ভেঙে পড়ল হঠাৎ। সমস্ত মানুষ কৃষ্ণকে পেয়ে সহস্র যৌবনশিখায় জ্বলে উঠল যেন। তাদের শিরার উপশিরায় আত্মসমর্পণের আবেগ। কৃষ্ণের বাঁশীর সুরের সঙ্গে মথুরাবাসীর সুখদুঃখ, হাসিকান্না, ভালবাসা, বিশ্বাস আনন্দ যেন অনির্বচনীয় হয়ে মিশল। কংসের ভয়ংকর অত্যাচারে যে জীবন তছ্নচ্ হয়ে গিয়েছিল, যার থিত ভিত গুঁড়িয়ে গিয়েছিল, হাসি আনন্দ নিভে গিয়েছিল, মনোবল, সাহস শ্বাসরুদ্ধ করা হয়েছিল, কৃষ্ণের বাঁশী যেন পুনরায় ফিরিয়ে দিল তাদের। মরা নদীতে যেন বান এল।

প্রতিদিন আপনার ক্ষুদ্র গৃহকোণে যে ছিল বন্দী, কৃষ্ণ তাকে হঠাৎ বাঁশীর সুরে অজানার দিকে ডাক দিল। সে কিছুই ভাববার সময় পেল না। কৃষ্ণের বাঁশীর আহ্বানে অন্ধকার তুচ্ছ হয়ে গেল। ভয়ে থমকে দাঁড়াল না, কিংবা ভয় পেয়ে সরেও গেল না। উৎসাহের দীপ্তি, আনন্দের আবেগে তার ভিতর বাইরে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বাঁশীর মোহন সুরের এমনি আকর্ষণ যে, অন্ধকারকে অন্ধকার মনে হল না। তার জন্য দীপ জ্বেলে নেওয়ার তর সইল না। কৃষ্ণের বাঁশী সমস্ত মথুরাবাসীর মন প্রাণ এমনি করে ডাকছিল যে সাতপুরুষের ভিটে মাটির মায়া-বন্ধনও শিথিল হল। পড়ে রইল তার ঘরদোর, ক্ষেত-খামার। চোখ বুজে গেল গোকুল থেকে বৃন্দাবনে। এক অন্তহীন আবেগে সে গোটা দেশের মানুষকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। কোথায় চলেছে জানে না তার ঠিকানা। কোথায় পৌঁছবে সে কথাও তাদের মনে উদয় হল না। গোকুল, মথুরা, বৃন্দাবনের মানুষ যেন অন্ধকার রাত্রির অভিসারিকা। অন্ধকারের ভেতর তারা কিছুই দেখছে না। লক্ষ্য তাদের চোখে ঝাপ্সা। পথটাই শুধু সত্য। কৃষ্ণের বাঁশির সুরে তারা উন্মাদ। কেবল আবেগ আর চলাই হল তাদের মন্ত্র: চরৈবেতি, চরৈবেতি।

সেই সময় বৃন্দাবনের চিত্র ও চিত্ত যে কেমন হয়ে গেল তাকে ঠিকমত গুছিয়ে ভাববার মত অবস্থা কোথায় রাধার? কৃষ্ণ তখন বৃন্দাবনময়। মুক্তির হাওয়া লেগেছে মানুষের প্রাণে। ভগীরথের শঙ্খধ্বনির অদ্ভুত আকর্ষণে উন্মত্তপ্রায় হয়ে গঙ্গা যেমন যাত্রাপথের সব অবরোধ, বাধা তুচ্ছ করে অভিসারিকার মত প্রাণ অফুরাণ ছড়িয়ে মর্তভূমির দিকে ধাবিত হয়ে সাগর রাজার ষাট হাজার পুত্রকে যুগান্তরের ঘুম থেকে হঠাৎ জাগিয়ে দিল। বহুকালের জমা করা ছাই ভস্মের স্তূপ যেমন

কথা কয়ে ওঠল, কৃষ্ণের মুরলীধ্বনিও তেমন মথুরাবাসীকে ঘুম থেকে তুলে ডেকে নিল। ঘুম ভাঙতে মুরলীধ্বনি তাদের শিরা-উপশিরার মধ্যে বেজে গেল। সমস্ত মনটা এমন করে বাঁশির দিকে ছুটে গেল যে দ্বিধা করার তর সইল না। মনে হল, বুকের মধ্যে কোন অজানাকে, অপূর্বকে, কোন সৃষ্টিছাড়াকে তারা পেয়েছে যেন। ঘরের মোহ কেটে মনটা অভিসারিকা হয়ে উঠল।

রাধা জানে কৃষ্ণের বাঁশির ডাকের মোহিনীশক্তি কত? ঐ বাঁশি যখন বেজে ওঠে তখন বুক কেমন করে ওঠে? সমস্ত প্রাণ মনঁকে এমন করে টানে যে ঘর, সংসার, স্বামী, সমাজ মনে হল স্থূল। বাঁশিটাই সত্য।

প্রাণ বলে, তোর যা আছে সব
যাক না উড়ে পুড়ে।
ওগো যায় যদি তো যাক না চুকে,
সব হারার হাসি মুখে,
আমি, এই চলেছি মরণসুধা
নিতে, পরাণ পুরে। (রবীন্দ্রনাথ)

তার বুকের ছন্দের সঙ্গে সুর মিলিয়ে চন্দ্রাবলী বলত:

ওগো আপন যারা কাছে টানে।
এ রস তারা কেই বা জানে,
আমার বাঁকা পথের বাঁকা সে যে
ডাক দিয়েছে দূরে।
এবার বাঁকার টানে সোজার বোঝা
পড়ুক ভেঙে চুরে। (রবীন্দ্রনাথ)

পনেরো বছর আগে কৃষ্ণ সম্পর্কে এরকম কোন আবেগ রাধার হৃদয়ছন্দে বেজে ওঠেনি। বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের পদার্পণের পর থেকেই রাধার মনে হত তার ভাগ্যদেবতার রথ এসেছে। কোথা থেকে তার সেই চাকার শব্দ দিন-রাত্রি তার বুকের ভেতর শুনতে পাচ্ছে মৃদঙ্গের মত। প্রতিমুহূর্ত মনে হত একটা পরমক্ষণ বুঝি এল তার জীবনে। এলও অপ্রত্যাশিতভাবে। কিন্তু তার জন্য কোন কামনা ছিল না। কিংবা কোন প্রত্যাশা নিয়ে সে বসেও থাকেনি।

পনেরো বছর বয়সে কৃষ্ণ বৃন্দাবনে এলে, রাধা টের পেল পঞ্চমবর্ষীয় কৃষ্ণের দুষ্টুমী আর ছেলেমানুষী মর্মের কত গভীরে দাগ কেটেছিল। অন্তরের মধ্যে শিশু কৃষ্ণের ত্রিভঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়ে বাঁশী বাজানোর সুর বাজছিল। সেই অনুভূতিকে তীব্র করে তুলল, ললিতা, বিশাখা, চন্দ্রাবতী। হৃদয়ে তার প্রথম স্পর্শ বয়ে আনল বিশাখা। অধরে বাঁশিটি তেমনভাবে ধরে রাখত। চোখের কোণে থাকত বিদ্যুৎ কটাক্ষ। বাঁশির মধ্যে কৃষ্ণের মত ত্রিভঙ্গ হয়ে দাঁড়াল, চোখ বুজে তন্ময় হওয়ার ভান করত। আর বলত :

যখন দেখা দাওনি রাধা, তখন বেজেছিল বাঁশী।
এখন চোখে চোখে চেয়ে চেয়ে সুর যে আমার
গেল ভাসি।
এখন নানা তানের ছলে
ডাক ফিরেছে জলে স্থলে, (রবীন্দ্রনাথ)
এখন আমার সকল ভালবাসা রাধারূপে উঠল ফুটি।

রাত যত গভীর হতে লাগল অন্ধকার তত ঘন আর নিবিড় হয়ে ওঠল। ঘর অন্ধকার। বাইরেও অন্ধকার। আকাশ অন্ধকার। সব অন্ধকার। মানুষের যা কিছু সুন্দর অনুভূতি তা এই অন্ধকারেই পাওয়া। কিছু আশ্লেষে চাওয়া তাও তো এই অন্ধকারেই। তাই অন্ধকারের ভিতরে রাধা একটার পর একটা ঘটনার মধ্যে প্রবেশ করতে লাগল। পনরো বছর আগের কথা। তবু ঘটনাগুলো জীবন্ত।

রাধা অন্ধকারের ভেতর চেয়ে আছে। গাছ পাহাড়েরা যেমন চেয়ে থাকে তেমনি আছে। রাধা ওদের মধ্যেই বেঁচে আছে, বেঁচে থাকবেও! যৌবনে কৃষ্ণের সঙ্গে মেলামেশার মধুর দিনগুলোর স্মৃতি অন্ধকারের ভেতর তাকে টানতে লাগল। বিয়োগান্ত কাব্যের মত যা রাধার জীবনের মধ্যেই অদৃশ্য কালিতে অব্যক্ত ভাষায় লিখেছিল ভাগ্যদেবতা।

বৃন্দাবনের পথে বেনু বাজাতে বাজাতে চলেছে কৃষ্ণ। তার বাঁশীর সুরে রাধার বুক উথাল পাথাল করল। তীব্র আনন্দের উল্লাস সমুদ্রের ঢেউয়ের মত মনের বেলাভূমিতে আছড়ে পড়ল। তার সমস্ত শরীরটা যেন হিমবাহের মত গলে গলে নিঃশব্দে ঐ বাঁশীর সুরের সঙ্গে মিশল। হাতের কাজ ফেলে রাধা জানলার পাশে দাঁড়াল। চিত্রার্পিতের মত দাঁড়িয়ে আছে। গোকুলের সেই ছোট্ট কৃষ্ণ এখন একজন পরিপূর্ণ যুবক। সে এখন রীতিমত পুরুষ মানুষ। তার সামনে বেরোতেই লজ্জা করে। চোখের দিকে ভাল করে তাকানো যায় না। অজানিত লজ্জার আতঙ্কে দেহ শির শির করে ওঠে। রাধার মনে হল: লজ্জা নয়, সে ছিল তার পুলক। ভেতরটা অস্থিরতায় ফেটে পড়ছিল। আর, প্রবল উত্তেজনায় হাত দুটি নিয়ে হাতের মুঠোর মধ্যে সমানে কচলাচ্ছিল।

বিশাখা চুপি চুপি যে কখন তার পিছনে এসে দাঁড়িয়েছিল, রাধা জানত না। লুকিয়ে লুকিয়ে তার কৃষ্ণ দেখার দৃশ্যটাকে ভীষণ উপভোগ করতে লাগল। যতক্ষণ কৃষ্ণকে দেখা গেল এবং তার বাঁশীর সুর শোনা গেল ততক্ষণ পর্যন্ত রাধা জানলার গরাদ ধরে দাঁড়িয়ে রইল। পুলকিত শিহরণে তার দু হাঁটু থরথর করে কাঁপছিল। আর নিজের মনে ভাবছিল; কৃষ্ণ কেন আকুল করে তাকে? বুকের ভেতর কৃষ্ণ সম্পর্কে এ মুগ্ধতা কার সৃষ্টি? কৃষ্ণের প্রতি তার অনুভূতি এমন তীব্র হয়ে ওঠল কিসের আকর্ষণে? দশ বছর পর কৃষ্ণকে দেখল। এখন সে গোকুলের গোপাল কিংবা কানু নয় আর। বৃন্দাবনের মুরলীধর কৃষ্ণ। তার নাম শুনলেই বৃন্দাবনের নরনারী নির্বিশেষে প্রেমে আকুল হয়। অনুরাগে উতলা হয়। কৃষ্ণ নাকি বৃন্দাবনের ঘরে ঘরে। বৃন্দাবনের প্রতিটি মানুষ নাকি আজ কৃষ্ণ। কৃষ্ণ কোন নাম নয়। কৃষ্ণ একটা শক্তি। কৃষ্ণ মানেই বৃন্দাবন। কৃষ্ণ মানুষের প্রেম, ভক্তি, সাহস, বিশ্বাস, উদ্যম, আনন্দ। হৃদয়ের মধ্যে এই সুন্দর অনুভূতির যাতনা এবং উল্লাস তাকে স্থির থাকতে দিল না। তাই একটা আবেগ, সুন্দর একটা অনুভূতির শিহরণ আকাশজোড়া বিদ্যুতের মত তার ভিতর চমকিত হতে লাগল! সমস্ত সত্তা যেন একাগ্র হয়ে স্পন্দিত হতে লাগল। মুগ্ধ রাধা তন্ময়তার গভীরে হারিয়ে গিয়ে বিড় বিড় করে স্বগতোক্তি করে বলল: কৃষ্ণ তুমি কে জানি না, কিন্তু তোমাকে দেখা থেকে আমার হৃদয় মানছে না। মনে হচ্ছে, আমাদের মধ্যে জন্ম-জন্মান্তরের সম্পর্ক। থেকে থেকে মনে হয় তুমি আমার জীবনের একমাত্র আনন্দ। এই একঘেয়ে বধূ জীবনের ক্লান্তির বিষণ্নতায় দমবন্ধ ঘরের লাগোয়া একফালি আলো-হাওয়ার বারান্দা তুমি।

ঘাড় ঘোরাতেই বিশাখার সঙ্গে চোখাচোখি হল রাধার। বিশাখা ফিক্ করে হাসল। রাধা ধরা পড়ে যাওয়ার ভয়মিশ্রিত উত্তেজনাজনিত লজ্জায় সহসা যেন দপ্ করে নিভে গেল। নিমেষে মুখাখানা আঁধারে মলিন হল। বিস্ময় প্রকাশ করতে গিয়ে গলার স্বর লজ্জায় জড়িয়ে গেল। বলল: বি-শাখা-আ! তুই-ই।

বিশাখা তার ভীরু বুকের অভ্যন্তরটা যেন দেখতে পেল। ঠোঁটের কোণে এক চিলতে হাসি ফুটিয়ে বলল : বিস্ময়ে যার এত প্রেম জাগে, সে সখী কেমন বল? কার অনুরাগে বিরহী রাই হয়ে ওঠে চঞ্চল? কার নাম শুনে তার চোখে আসে এত জল? সখী সে কে হয় তোর বল?

বিশাখার প্রশ্ন শুনে কি যেন হয়ে গেল রাধার? একটু থমকে গিয়ে বলল: আমার সুন্দর ভাল লাগার অনুভূতির মধ্যে আর কোন ভাবনা টেনে এনে এই স্বপ্ন নষ্ট কষ্ট করে দিও না। তুমি যা ভাবছ, তার কিছু নেই আমার মনের মধ্যে। সত্যি কিছু নেই।

কথাগুলো বিশাখার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে মাথা গোঁজ করে দাঁড়িয়ে রইল। ইচ্ছে হল বিশাখাকে শুনিয়ে বলে—তুমি কি বুঝবে? আমার ভালবাসা কি এতই তুচ্ছ যে, যাকে তাকে দিয়ে নিঃস্ব হয়ে যাব? আমি তো ভারতীয় নারী। হিন্দু নারীর সংস্কার, বিশ্বাস, পরলোকের ভয়, স্বামী-সংসার-সব কিছুর ভিতর আমার সত্তা টুকরো টুকরো হয়ে আছে। আমরা প্রত্যেকেই তো একই সঙ্গে একাধিক

মানুষকে ভালবাসি। এ ভালবাসার ক্ষমতা সব মেয়ে-পুরুষের আছে। তবে, সেটা কখনও কখনও বিশেষ হয়ে ওঠে। যদি তার এক টুকরো ভালবাসা কৃষ্ণ পেয়ে থাকে—তাতে কি আমি রিক্ত হয়ে যাব? তা কি সত্যিই আমার দেবার ক্ষমতার বাইরে? মেয়েমানুষের স্বভাবই হল অনাবিলভাবে সুস্থতার সঙ্গে কোন সুন্দর কিছুই নিতে শেখেনি সে জীবনে।

এসব কথা কিন্তু তার মুখ ফুটে বেরোল না। শরীর মন আন্দোলিত হল তার। মুখে উদ্‌ভ্রান্তির ছাপ। চোখে একটু বিব্রতভাবও খেলে গেল।

বিশাখা চুপ করে ছিল। কিন্তু সখীর কথাগুলো সে বিশ্বাস করেনি। মুখ টিপে হাসল। মেয়েমানুষই মেয়ে-মানুষের ছলনা, প্রতারণা ঠিক ধরতে পারে। রাধার কথায় বিশাখা কেমন থম ধরা বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর মুখ বেজার করে প্রস্থান করল। কিন্তু তার ঐ নীরব ইঙ্গিতপূর্ণ প্রস্থানের ভিতর একরকমের চাপা নিষ্ঠুরতা ছিল, আর ছিল দুরন্ত, অবিশ্বাসের প্রচ্ছন্ন সংকেত।

বিশাখা চলে গেলে নির্জন ঘরে রাধা নিজের মুখোমুখি বসল। দর্পণের সামনে দাঁড়িয়ে মানুষ যেমন নিজেকে তন্ন তন্ন করে দেখে, রাধাও তেমনি নিজেকে প্রশ্ন করছিল আর নিজেই তার উত্তর দিচ্ছিল। এই অনুসন্ধিৎসা, কৌতূহল সত্যিই কি তার কৃষ্ণপ্রেম? বিশাখাকে দেখে অমন লজ্জা পাওয়াতে সব ব্যাপারটা গন্ডগোল হয়ে গেল। রাধা নিজেও ভেবে পেল না, বিশাখার ওপর অকারণে রুষ্ট আর অসহিষ্ণু হল কেন? পরপুরুষের চিন্তার উষ্ণতাতে তার মনটা যে একটুক্ষণ ভরে দিয়েছিল একথা কেমন করে অস্বীকার করবে? পরপুরুষকে ভালবাসাটা বিকেলের রোদের মত। কিছুক্ষণের জন্য বিকেলের রোদ চারদিক ঝলমল করে দিয়েই মরে যায়। কিন্তু এ যুক্তি এখানে অচল। আয়ান তার জীবনে আসার অনেক আগে কৃষ্ণের সঙ্গে তার একটা মিষ্টি সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল সেই সম্পর্কের সঙ্গে কৃষ্ণের বৃন্দাবনের সম্পর্ক যোগ হয়েছিল। একসঙ্গে দুটো পুরুষকে ভালবাসার কথা সে কখনও ভাবে না। মনেও ঠাঁই দেয় না। সে তেমন মেয়েই নয়।

কিন্তু পরক্ষণেই কেমন একটা সন্দেহ তীব্র হল। নিজেকে শাসিয়ে শুনিয়ে বলল: না, না। আমি তেমন মেয়ে নই। একই সঙ্গে অনেকে হয়তো দুটি পুরুষ মানুষকে ভালবাসে, প্রেমও করে। কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর ভালবাসার মধ্যে স্বামীর মালিকানা আছে। কোন পুরুষই ভালবাসার ভাগাভাগি বিশ্বাস করে না। কোন নারীও চায় না তার শরীরকে পণ্য করতে। শরীরকে না এনেও সুন্দর প্রেমের মধ্যে ডুবে যাওয়া যায়। একজন মানুষ সারা জীবন পথ চলে কোন কিছুর প্রত্যাশা নিয়েই। কিন্তু আয়ান স্বামী হয়ে তার দেহ মনের কোন্ প্রত্যাশা পূরণ করেছে? প্রাপ্তির ঘরেও তার অশেষ শূন্যময়তা। এই শূন্যতাবোধের যন্ত্রণা থেকেই প্রত্যাশার কথা মনে আসছে। সব মানুষই তাই চায়। পাহাড়ে যখন ওঠে, তখন তার চোখ থাকে চূড়োর দিকে; সমুদ্রে ভাসে অন্য তীরের প্রত্যাশায়। তবে কি সে মনে মনে অনুরূপ কোন প্রত্যাশা নিয়ে কৃষ্ণকে দেখেছে? হয়ত তাই-ই। মনের ভেতর তার ভালবাসা পাওয়ার জন্য একরকম কাঙালপনা আছে। তাই বোধ হয় প্রেমহীন জীবনে দৈনন্দিনতার একঘেয়েমি তাব ও আয়ানের সব নিজস্বতা ও আনন্দকে ক্লান্ত আর অবসন্ন করে তুলেছে। বিয়ে হলেই কি স্বামী-স্ত্রীর প্রণয়ের সুন্দর সম্পর্ক গড়ে ওঠে? প্রতিদিনের নিয়মমাফিক সম্পর্ক আর অভ্যাসের মধ্যে অধিকাংশ বিবাহিত ভালবাসা হারিয়ে যায়। যেমন হয়েছে আয়ানের সঙ্গে। ইদানীং তাকে তার মনের মধ্যে কোথাও খুঁজে পায় না। তার সঙ্গে সম্পর্কটা প্রায় মরে যাওয়ার মতই হয়েছে। একরকম নেই-ই বলা যায়। বিশাখাও জানে সেকথা। আয়ান, হারিয়ে যাওয়া গ্রীষ্মের শিমুল তুলোর মত একা। চলেও যাবে একা একাই। আয়ানের প্রাণহীন সম্পর্কটাকে মেনে নেয়া তার অভ্যাস হয়ে গেছে।

কিন্তু পনেরো বছর আগে কৃষ্ণকে সামাজিক বিধি-বিধানের বাইরে দেখতে গিয়ে প্রাণের ভিতর কত বিস্ময়, ভয়, উৎকণ্ঠা, উদ্বেগ জেগেছিল। অজানা ভবিষ্যৎ ও পরিকল্পনা নিয়ে কত জল্পনা কল্পনা বিস্ময় টের পেল। বুকের ভেতর সদ্য আকাংখার এক সমুদ্র সৃষ্টি হয়েছিল তার। বাঁধ দিয়ে তার স্রোতকে ঠেকানোর চেষ্টা করলে নিজেকেই ছোট লাগবে, ভীষণ বঞ্চিত লাগবে, নিজের সম্মান ও গৌরববোধে ঘা লাগবে। কিন্তু এসব কথা তো অন্যকে বোঝানো যায় না ঠিকভাবে। তাই বিশাখাকে

মনের অভ্যন্তরে টৈটুম্বুর সুখের কোন কথাই জানতে বা বুঝতে দেয়নি। এ কিন্তু রাধার চল্লিশ বছর বয়সের অভিজ্ঞতা। কংসকে হত্যা করে কৃষ্ণ যখন বৃন্দাবন ছেড়ে চলে গেল তখনই হৃদয়ের গভীরে টের পেল তাকে। বৃক্ষের শিকড় ছাড়ার কাজটা একেবারে নিঃশব্দে ঘটে চোখের আড়ালে। শিকড়মাত্র নিঃশব্দ সঞ্চারী। যখন প্রোথিত হয় তার মূল, তখন বৃক্ষ ও মাটি টের পায় না মৃত্তিকার অভ্যন্তরে কি ঘটছে। কিন্তু যখন ঝড়ে উৎপাটিত হয় তখনই অনুভব করে কতদূর পর্যন্ত সে মূল প্রসারিত ছিল, আর কিভাবে মৃত্তিকাকে তার একমাত্র অবলম্বন ভেবে আঁকড়ে ধরেছিল। কেন যে এমন বিপজ্জনকভাবে ভাল লেগে যায় এক একজন পুরুষকে এ জীবনে, রাধা তার চল্লিশ বছর বয়সেও ভেবে পায় না।

কৃষ্ণ তার চেয়ে বয়সে ছোট, তবু ভাল লেগে গেল তাকে। ভাললাগার আর ভালবাসার কোন নিয়ম বাঁধন, শাসন নেই। মনও মানতে চায় না নিষেধ। কৃষ্ণের কথা, আর তার বাঁশীর সুর কানে এলেই খুশিতে ভরে যায় মন। কে জানে? কি থাকে, কি আছে তার নামেতে? তার বাঁশিতে?

কৃষ্ণ বৃন্দাবনে আসার পরে একটা অদ্ভুত কান্ড করেছিল। তবে, কত পরে ঠিক মনে নেই সেদিনটা, কিন্তু মনে গেঁথে আছে রাধার। পনেরো বছর আগের ঘটনা হলেও চল্লিশ বছর বয়সেও রাধা ভোলেনি তাকে। নক্ষত্রভরা নীল আকাশের দিগন্তের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে রাধা দেখল নবীন নীরোদ নীল নীরজমনি কৃষ্ণকে। নীলকান্তমনির মত তার রূপ রাতের আঁধারকে ছাপিয়ে যেন আকাশ ছুঁয়েছে। কাঁধের কাছে ঢাল হয়ে আছে একরাশ কোঁকড়া কালো চুল। সমুদ্রের ঢেউ এসে লেগেছে যেন তার গায়। ভ্রমর কালো চোখের উপর কালো পল্লব। আর ময়ূরের মত নীল গ্রীবা। এই কৃষ্ণকেই জানলা দিয়ে চুরি করে দেখেছিল রাধা। দূরে থেকেই তার দৃষ্টিতে ঝড়ে পড়েছিল মুগ্ধতার আলো। শুধু দূর থেকে ঐ দেখাতেই তার হৃদয় মন জুড়ে ছিল সে। একদিন হঠাৎ তার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল পথে! অতখানি মুগ্ধতা যে মানুষের দৃষ্টিতে তার কণ্ঠে না জানি কত সুধা ভরা আছে, এই বিস্ময় এখনও রাধার মনে লেগে আছে।

বেশ কদিন পর মেঘ ছেড়েছে, বৃষ্টি ধরেছে, আবার রোদ উঠেছে। বৃন্দাবনের বাসিন্দাদের মনে কদিন ধরে গুমোট একটা অশান্তিতে ছেয়ে ছিল। সারা দিন ধরে বৃষ্টি পড়তে থাকায় ঘর থেকে কেউ বেরোতে পারেনি। সওদা করতেও যায়নি! বৃষ্টি ধরলে পাড়ার মেয়ে বৌ মিলে কালিন্দী পেরিয়ে মথুরার উপকণ্ঠে বাজারে গেল ঘি, মাখন, ননী বিক্রী করে অন্য পণ্য কিনে আনতে।

বৃন্দাবনের আভীর পল্লীর পুরুষেরা গো-পালন, চাষ-আবাদ এবং ঘি, মাখন প্রস্তুত করে ঘরে বসে। আর বাড়ির মেয়ে বৌরা মাথার পসরা নিয়ে গাঁয়ে গঞ্জে ঘুরে ঘুরে সেই সব দ্রব্যসামগ্রী বেচে। এটাই হল আভীর পল্লীর জীবন ও জীবিকার নিয়ম। কিন্তু রাধা এসব কাজে অভ্যস্ত নয়; স্বামী আয়ান সংসার ছাড়া এক নিরীহ মানুষ। দায়িত্বজ্ঞানহীন এই মানুষটার সংসার বিতৃষ্ণার জন্যে গোটা সংসারের ধকলটা রাধাকে একা সামলাতে হয়। সংসারের ভারে সে ন্যুব্জ হয়ে গেছে। মাঝে মাঝে স্বামীর ওপর দারুণ দুঃখ অভিমান হয়। আজ নিজের মনেই ভাবে এসব মানুষের বিয়ে করতে নেই। কেন যে এরা বিয়ে করে? নিজেরাও কষ্ট পায় পরের ঘরের নিরীহ, নির্দোষ একটা মেয়েকেও যন্ত্রণা দেয়। কিন্তু তারও যে একটা মন বলে পদার্থ আছে, সে কথাটা আয়ান ভাবেনা বলেই দুঃখের সমুদ্র উথলে ওঠে বুকে। নীরব কান্নায় চোখ ঝাপ্সা হয়ে যায়। বৃন্দাবনের বৃষভানু নন্দিনী এখন রাজার ঝিয়ারি নয় আর। সাধারণ গৃহস্থ ঘরের বৌ। সংসারের কঠিন মাটিতে প্রতিদিন ঘা খেয়ে খেয়ে সে নীরব আজ নির্জীব হয়ে গেছে। চঞ্চলা মুখরা ঝর্ণার মত প্রাণ অফুরান ছড়িয়ে আর সে ছুটে চলে না।

বর্ষার জলে তার শূন্য বুক হঠাৎ ভরে উঠল, ধীর স্থির মন্থর গতিতে সে একা একা চলেছিল সকল মেয়ে সঙ্গী-সাথীর পিছন পিছন। দুপাশের গাছের ডালপালায় নুয়ে পড়ে ছুঁয়ে যাচ্ছিল তার সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ। তার ছোঁয়া লেগে ডালপালাগুলো যেন চঞ্চল হয়ে ওঠেছিল। রাধা বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে

তার পরিচিত বনপথের দিকে চেয়ে ছিল। মনে হচ্ছিল এ যেন অন্য কোন মায়াময় রূপ। পাখী ডাকে। বিচিত্র বর্ণের একটা কাঠঠোকরা পাখি ভিজে ডাল ঠোকরাচ্ছিল। তার শক্ত চঞ্চু দিয়ে ক্রমাগত বৃক্ষের কঠিন ত্বককে আঘাত করে চলেছে। নিদারুণ ব্যথায় পাতাগুলো তার কেঁপে কেঁপে উঠছে। পত্রান্তরাল থেকে নাম না জানা একটা পাখীর কর্কশ চিৎকার আকাশ বিদীর্ণ করে গেল কোন সুদূরে। রাধার বুকের ভেতর ভীষণভাবে চমকে ওঠল। কিন্তু ঘাড় ঘুরিয়ে কোন পাখি দেখতে পেল না আকাশে। গোটা নীল আকাশখানা মিষ্টি নরম রোদে ঝলমল করছে। রাধার মনে হল এ হয়তো তারই গভীর অভ্যন্তরে শূন্যতা মথিত জীবনের অসহায় আর্তনাদ! বাতাসে তার করুণ দীর্ঘশ্বাসই হাহাকারেরর মত ছড়িয়ে পড়ছিল।

কিছুটা এগোতে পায়ের শব্দে পিছন ফিরে তাকাল রাধা। কৃষ্ণকে দেখে রাধার অবচেতন মনে কেমন একটা শিহরণ খেলে গেল। চোখের তারা নীরব লজ্জায় নত হল। তবু ভীরু চাহনি মেলে সে কৃষ্ণকে দেখল। মেঘে ঢাকা আকাশের মত থমথমে তার মুখ চোখ। মুখে প্রতিপদের চাঁদের মত একফালি হাসি। তার নীরব প্রীতির স্পর্শটুকু রাধার মন ছুঁয়ে গেল। ইচ্ছে হল তার নীরব অর্থপূর্ণ হাসির উত্তরে, হাসি দিয়ে সাড়া দেয়। কিন্তু কোথায় যেন তার বাধা। পনেরো বছর আগের স্মৃতিকে চেতনার রঙে রঞ্জিত করে তুলেছিল রাধা। কিন্তু তা হল না। নিজের মনেই তার একটা নিষেধের বাধা প্রাচীর হয়ে উঠেছিল। সেটাকে অতিক্রম করতে পারল না।

কৃষ্ণ তার দিকে আসছিল। আর সে বিস্মিত মুগ্ধ চাহনি মেলে কৃষ্ণেব চোখের ভাষা বুঝতে চেষ্টা করছিল। চাহনিটা তার কেমন বিচিত্র ঠেকল রাধার কাছে। কৃষ্ণের চোখে কি আছে জানে না। কিন্তু সেই মুহূর্তে মনে হয়েছিল, সকালের বৃষ্টি ধোয়া নরম রোদের আলোয় কেমন যেন গোটা পৃথিবীর রূপটাই বদলে গেছে। ভালো লাগল এই ভাষাহীন অতল স্তব্ধতার নির্বাক সবুজ সুন্দর পৃথিবী। এখানে সবই স্বপ্ন। নিজেকে মনে হয় তার রঙীন রূপকথার স্বপ্নময় জগতের বাসিন্দা। রাক্ষসপুরীর বন্দিনী রাজনন্দিনী আর কৃষ্ণ সাতসাগর তের নদীর পারের অচিন রাজপুত্র।

কৃষ্ণের দু'চোখে খুশির আভা। এটাই তার সম্পদ। রাধার মনে হল কৃষ্ণের দু'চোখে নিশ্চয়ই জাদু আছে। নইলে তার দর্শনে ও সান্নিধ্যে সব এমন মধুময় হয় কেমন করে? আনন্দের গভীর স্বাদে মন কেমন করে ভরে ওঠে? গহন অতল সমুদ্রের মত নীল দুই চোখের তারায় যেন নীল স্বপ্নপুরীর রাজ্য। একবার দেখলে আর চোখ ফেরানো যায় না।

কৃষ্ণের দু'চোখে বর্ষার সজল মেঘভারাবনত আকাশ সীমার স্তব্ধতা মাখানো। নির্বাক রাধা ভাষাহীনতার অনুভূতিকে অনুভব করেই কৃষ্ণ মৃদু মৃদু হাসছিল। তার হাসি দেখেই বনের পাখীরা মৃদু কলরব করে উঠল। এই নীরব অধরা রূপময়ী বনসীমার মতই তার অতলে মৌন একটা সত্তা আছে; সেও দুঃখ পায়, আনন্দের স্পর্শে সেজে উঠে। রাধার চোখে খুশির আভা ঝলকে উঠে।

স্বপ্নাচ্ছন্ন স্বরে ডাকল : রাধা!

রাধা কথা বলতে পারল না। বুকের ভেতবটা থর থরিয়ে কেঁপে গেল। ভীরু চোখে কৃষ্ণের দিকে চেয়েছিল। তারপর মুচকি হেসে তাকে পাশ কাটিয়ে চলে গেল লঘু পায়ে।

কৃষ্ণ তার অকারণ খুশি আর প্রসন্নতার পানে চেয়ে নিজের মনে কি একটা হারানো কথা স্মরণ করে বলল: তুমি আজও তেমনটি রয়ে গেল। কোন এক নীরব অধরা সৌন্দর্যের স্বপ্নরাজ্যের প্রতিমা তুমি। তোমাকে দেখলে মন ভরে উঠে। কোন দুঃখ থাকে না। প্রাণ খুলে মিশতে ইচ্ছে করে।

তবুও রাধা দাঁড়াল না। মুখ টিপে ঠমকে ঠমকে সে হাঁটছিল। মনের মধ্যে তার বৈশাখী ঝড় তখন। কৃষ্ণ তার পাশাপাশি হাঁটছিল। রাধার বুকের ভেতর খুশির ভাব জাগল। চলতে চলতে কতকগুলো বুনো ঝুমকো লতার ফুল ছিঁড়ে বিনুনীতে গুঁজল। নিজের খুশিতে বিভোর হয়ে বলল: বাঃ! এ দিকটা তো বেশ চমৎকার! ভীষণ সুন্দর!

হঠাৎ হাতের উত্তপ্ত একটা স্পর্শ পেয়ে রাধা চমকে কৃষ্ণের দিকে চাইল। সকালের সূর্যের সোনা রং-এর প্রতিবিম্ব পড়েছিল কৃষ্ণের মুখে। প্রভাতী আভায় শ্যামবর্ণ কৃষ্ণের মুখশ্রী নীল আকাশের মাধুরিমায় ভরে উঠল। পথের মধ্যে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল রাধা। অপলক চোখে চেয়ে রইল কৃষ্ণের দিকে। হাতখানা তখনও কৃষ্ণের হাতে ধরা।

সখীদের ডাক শোনা যাচ্ছিল অনেক দূর থেকে। কিন্তু সে ডাক রাধার কানে গেল না। রূপময়ী কোন অসীম বিশ্বের সৌন্দর্যের আকাশে তার মন প্রজাপতির মতন বিচিত্র বর্ণের ডানা মেলে দিয়ে যেন কোন অসীমে মন উধাও হয়ে গেল। রাধার অপলক দুই আঁখি স্বপ্নাতুর হল।

এমন একটা পরিবেশে তারা নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিল। ভাল লাগছিল এই ভাষাহীন অতল স্তব্ধতার রাজ্য। কৃষ্ণের চাহনিও কেমন যেন হয়ে গেল। কথা বলতে গিয়ে গলার স্বর তার কেঁপে গেল। স্নিগ্ধ গলায় বলল: তুমি যাবে না? সঙ্গীরা তোমাকে ডাকছে। অনেক দুর থেকে তাদের ডাক ভেসে আসছে।

রাধা লজ্জায় চমকে ওঠেছিল। মুখে সলজ্জ হাসির আভা ফুটল। কৃষ্ণের হাত থেকে হাতখানা ছাড়িয়ে নিয়ে সে হাঁটতে লাগল। কৃষ্ণ মরিয়া হয়ে বলেছিল: আর একটু দাঁড়াবে না? বড় ভাল লাগছিল তোমাকে। এখন এমন করে ছেড়ে দিতে ভীষণ কষ্ট হচ্ছে। মায়া হচ্ছে। স্মরণ করে না দিলে ভাল হত।

কৃষ্ণের বচনে রাধার বুকের ভেতর তরঙ্গ খেলে গেল। তথাপি কৃষ্ণকে মেনে নিতে সংস্কারে বাধল। বলল: আমার বিস্ময় ছিলে তুমি। তোমাকে দেখার আকাঙ্ক্ষা আমার চরিতার্থ হল। কিন্তু আর নয়। আমি পরস্ত্রী। তোমার কাছ থেকে একটু তফাতে, একটু দূরে থাকাই আমার ভাল। আর আমাদের দেখাশোনা না হওয়াই উচিত। আমাকে এমন করে লুকিয়ে দেখার আর চেষ্টা কর না। আমাকে মনে মনে ঘেন্না কর।

কৃষ্ণ কিন্তু সঙ্গ ছাড়ল না। রাধার পাশাপাশি হাঁটতে লাগল। স্বপ্নাতুর চোখে রাধার দিকে চেয়ে বলল: আমাকে তোমার খুব খারাপ লাগল; তাই না? আমাকে সন্দেহ করে তো এসব কথা বললে?

রাধা অপ্রস্তুতভাবে হাসল। বলল: জানি না, যাও। তুমি একটা ইয়ে—তারপর কৃষ্ণের খুব কাছ ঘেঁষে গায়ে গা লাগিয়েই হাঁটছিল। যেতে যেতে বলল: আজই শেষ। আর আমাকে কোন দিন দেখতে পাবে না। লোকে যে যা বলুক, আমি জানি, তুমি জাদু জান। গাঁশুদ্ধ লোককে তুমি বশ করেছ। তুমি তাদের ধ্যান জ্ঞান। তোমাকে তারা বিশ্বাস করে। আমার স্বামীও তোমার ভক্ত।

কৃষ্ণের দুচোখে খুশি খুশি ভাব উথলে ওঠল। মজা করার জন্যে বলল: আয়ান তোমায় খুব ভালবাসে, না?

রাধার দুচোখ সহসা জল টলটল করে ওঠল। ধরা গলায় বলল: তা বোধহয় বাসে।

কেন, তুমি জান না?

উত্তরটা এড়িয়ে যাওয়ার জন্যে রাধা বলল: একটু সরে হাঁট। লোকে দেখলে কি ভাববে বলত?

ভাববে, প্রেমে পড়েছে।

ছিঃ! অমন কথা মুখে বলাও পাপ।

সত্যিকারের ভালবাসার কাছে ধরা তো দিতেই হয়।

গোঁফের রেখা ওঠেনি ভাল করে। এর মধ্যে এত ভালবাসা পেলে কোথায়? লোককে মুগ্ধ করার বিদ্যেটা শিখলে কি করে? আজ পর্যন্ত তোমার মত এত দুঃসাহস কেউ দেখায়নি।

ভালবাসি বলেই ঠেকাতে পারে না আমাকে।

সত্যি বলছ?

সত্যি ছাড়া মিথ্যে বলব কেন? সকলকে আমি ভালবাসি। প্রত্যেকের ভাল চাই। মানুষের জন্য, পৃথিবীর জন্য আমার শুধু শুভ কামনা আছে। মানুষ মানুষ হোক। সুখী হোক, সৎ আদর্শবান, বীর হোক এই চিন্তাই করি সারাদিন। প্রেমকে, ভালবাসাকে আমি তার উপকরণ করেছি। এই উপকরণ ভাঙিয়ে মানুষের জীবন ধারণের সমস্যা সব মিটে যাক। সকলে সুখ আর মঙ্গলের ভেতর দিয়ে জীবনের চরিতার্থতা খুঁজে নিক। নিজেকে নিজের কাছে বিলীন করে দিতে পারাতেই সুখ এবং মুক্তি। রাধা তুমি আমি কেউ একা কিংবা বিচ্ছিন্ন নই। আমরা প্রত্যেকেই বিরাট মহান পুরুষের কর্মযজ্ঞের জন্য নিবেদিত। কিন্তু এই অবিশ্বাসের যুগেও আমি বিশ্বাস করি পৃথিবীর কোথাও না কোথাও একজন বিশ্বাসী-প্রাণের মানুষ আছে। সে মানুষ এখনও সততা, সত্যবাদিতা বিশ্বাস করে,

বিশ্বাস করে ধর্মকে বিশ্বাস করে ভালবাসাকে এবং বিশ্বাস করে ঈশ্বরকে। আমি সেই ঈশ্বরকে খুঁজেছি মানুষের প্রেমের মধ্যে। তোমার মধ্যে আমি তাকে দর্শন করেছি রাধা। তুমি আমার শক্তি, সাহস, প্রেরণা। তোমাকে না পেলে আমার প্রেম হবে অপূর্ণ। আমার সব স্বপ্ন ব্যর্থ হবে। সাধনা বিফল হব, প্রেম-বিশ্বাস মিথ্যে হয়ে যাবে। বল রাধা, তুমি আমার হবে। একেবারে সম্পূর্ণ আমার।

কৃষ্ণের প্রগলভতা রাধাকে মুগ্ধ করেছিল। ডাক ভুলে যাওয়া পাখীর মত তার অবস্থা। চোখ স্তিমিত। খুব করুণ দৃষ্টিতে সে কৃষ্ণের দিকে চেয়েছিল কিছুক্ষণ। তার মায়াবী মুখখানা যেন সীমানা ছাড়িয়ে চারদিককার আলোছায়ার মধ্যে প্রসারিত হয়ে যাচ্ছিল। চোখে জল এসেছিল রাধার। গাল বেয়ে টপটপ করে পড়ছিল।

কৃষ্ণ কাছে এসে দাঁড়াল। গালে হাত দিয়ে চোখের জল মুছে দিল। রাধা বাধা দিল না। বরং ভাল লাগার এক আশ্চর্য সুখে কৃষ্ণের হাতটা চেপে ধরল।

সারাদিন কাজের ভেতর রাধা ছিল অন্যমনস্ক। তবু মুখখানা কি এক গভীর দুর্ভাবনায় থমথম করছিল। ভাল করে কারো সঙ্গে কথা পর্যন্ত বলল না। থেকে থেকে বুক ভাঙা নিঃশ্বাস পড়ছিল।

রান্নাঘরের সামনে দাঁড়ালে দেখা যায় বাইরে দোচালার ঘর। ওখানে আয়ান কারিগরদের দিয়ে, দই থেকে মাখন, ননী, ঘি তৈরি করছিল। রান্নাঘরের বারান্দা থেকে আয়ানকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল রাধা। তার সারা মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে মুক্তোর মত। তার ফরসা বুকে ও হাতে ছিল কোঁকড়া কোঁকড়া কালো লোম। ভারি সুন্দর লাগছিল দেখতে। আয়ান ও মাঝে মাঝে তাকে আড়াচোখে দেখছিল। ইশারায় কিছু বলতেও চাইছিল। একসময় জলপানের অছিলায় কাছে এল। চারদিক ভাল করে দেখে নিয়ে কানের কাছে মুখ এনে ফিস্ ফিস্ স্বরে বলল :

বনের হরিণী থাকে কিরাতের সাথে
পিয়াসে হরিণী যেন পড়য়ে সঙ্কটে
স্নেহ-দাবানলে মন যে জ্বলে, হরিণী পড়িল ফাঁদে
নীর লোভে মৃগী পিয়াসে ধাইতে ব্যাধ-শর নিল বুকে।

কপট রাগে রাধা তার মুখখানা সরিয়ে দিল। বিরক্তিতে মুখখানা বেজার করে বলল : যাও, সব তাতে তোমার পরিহাস। মশকরা করার সময় পেলে না।

আয়ান কিন্তু নিরাশ হল না। থেমে থাকল না। হাসি হাসি মুখ করে বলল :

শুনিয়া মুরলী যেমত পাগলী
বনের হরিণী প্রায়
ব্যাধ-বাণ খায়্যা ঘাইল হইয়া
চারদিকে যেন চায়।

রাধা কাজল কালো দুই ভুরু কোঁচকালো। চোখের চাহনি কিঞ্চিৎ ছোট হয়ে গেল। অরণ্যে হরিণীর অসীম মুক্তি লীলায়িত গতি, দীঘল নয়নের অবোধ ভালবাসার আর্তি, ব্যাধের বানে তার আহত হওয়া মৃত্যু, রাধার, এ সবই রূপক। শরীর মন হঠাৎই চমকে ওঠল। সেই মুহূর্তে আয়ানের দিকে ভাল করে তাকাতে পারল না। ভয়ে বুকের ভেতরটা কেঁপে গেল। তাড়াতাড়ি আয়ানের মুখে হাত চাপা দিল। আয়ান কিন্তু তাতে নিরস্ত হল না। কথা বলার প্রবল ঝোঁক তখন পেয়ে বসেছিল তাকে। কিন্তু মুখের উপর রাধার হাতখানা চাপা থাকার জন্য কথাগুলো ভাঙা ভাঙা শোনাল। আয়ান বলছিল :

মিলাইছে শিলারাজি চকিত হইল শশী
মোর কাছে নাচিছে আসিয়া
নারীর যৌবন ধন তাতে তার আছে মন
তেঁই পুরে হাসিয়া হাসিয়া।

রাধা চটে গিয়ে মৃদু ধমকের সুরে তিরস্কার করে বলল : কি যা তা আরম্ভ করলে? কেউ এসব শুনলে কি ভাববে বলত? রসিকতার মাথামুন্ডু নেই। সময় নেই, স্থান নেই—

আছে গো আছে। আমি তোমার বাইরেটা তো দেখি না। তোমার আত্মাকে দেখি।

কথাটা শুনে রাধার শরীর মন দুইই পুনরায় চমকে উঠেছিল। সেই মুহূর্তে নিজের কাছে তার প্রশ্ন তবে কি আয়ানের চোখে ধরা পড়ে গেছে সে? ও কি সত্যিই তার আত্মাকে দেখেছে নিজের বুকের মধ্যে। মনের মধ্যে তার যে ঝড় বইছে তার অস্তিত্বের স্পর্শ কি লেগেছে ওর সমস্ত অনুভূতিতে? রাধার দাঁড়াতে আর সাহস হল না। কপট রাগ দেখিয়ে চলে গেল।

রাধার মনটা খারাপ হয়ে গেল। বুকে অনুশোচনার সমুদ্র। মনকে কিছুতেই প্রবোধ দিতে পারছিল না। ঘরে থাকলে শুধু মনে হয় এ অন্যায়, ভীষণ অন্যায়। আয়ানের সঙ্গে সত্যভঙ্গ করার কষ্ট হয়।

আয়ান ভীষণ ভালবাসে তাকে। কামগন্ধ নেই তাতে। ভালবাসা পুজোর ফুল। পুজারীর মত শুদ্ধচিত্তে তাকে নিবেদন করে শুধু। আর কি আশ্চর্য সুখে ভরে যায় তার দেহ মন। আয়ান খুশি হয়ে বলল : এ হল আনন্দ সাগরে ভাসা। আমার মন ঐ জ্যোৎস্নার মত হয়ে গেছে। সমস্ত নীল আকাশ ছেয়ে আছে আমার প্রেমে। আর তুমি টিপের মত জ্বলছ দূর আকাশে। তোমায় পেয়ে তারারা ঘুঙুর বাজাচ্ছে, আর আমার বুকে, তার তরঙ্গ দুলছে সমুদ্রের বুকে নৌকোর মতন। আমার সকল সুখ, আনন্দ, তৃপ্তি ছড়িয়ে পড়ছে ফুর ফুরে বাতাসে। রাই, তুমি আমার মানস-সরোবর। কোন কিছু ভাবতে গেলেই মনে হয় :

আপনার আমি দেখি গো মধুর রসে।
তোমার মাঝারে নিজের করিয়া দান।

আয়নের বচনে রাধার প্রাণ মন জুড়িয়ে গেল। এক অপ্রতিরোধ্য আবেগে তার বুকের ভেতর কেঁপে ওঠল। তৃপ্তির সুখকর উল্লাসে তার দুই চোখ বুজে গেল। মুগ্ধ হৃদয়ে বলল : অমন করে বল না গো। আমার হাতে অরূপপরতন দিয়ে, শূন্য হাতে ফিরিয়ে দিও না আমায়। আমি যে তোমাকে দুই হাতে পেতে চাই। আমার সর্বাঙ্গ দিয়ে তোমাকে অনুভব করতে চাই। আমাকেও বলতে দাও, আমার সব আনন্দ তোমাকে নিয়ে।

আয়ানের দুই চোখে খুশি উপছে পড়ল। দুটি উজ্জ্বল চোখের ওপরে বাঁকা ধনুকের মত দুখানি ভুরুর রেখা যেন হাসছিল। মুগ্ধ কণ্ঠে বলল : রাই, আমাদের প্রেম তো স্বামী-স্ত্রীর নয়। দেব-দেবীর ভালবাসা।

আয়ানের মুখের খুব কাছে তার মুখ এনে রাধা স্বপ্নাচ্ছন্ন চোখে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। ঠোঁট আর চোখের পাতা তার কাঁপছিল। আস্তে আস্তে বলল : প্রিয়তম, আমরা কেউ দেবতা নই। মানুষ, বড় সাধারণ, ভঙ্গুর, বড় অসহায় মানুষ-মানুষী। স্বর্গে প্রেম নেই। আছে অনন্ত সুখ আর অনন্ত বিলাসিতা। দেব-দেবীর প্রেম আমি চাই না। মানুষের প্রেমে চরিতার্থ হতে চাই।

আয়ানের মুখে অনির্বচনীয় হাসির দীপ্তি। রাধা ভয় পাওয়া কাঠবিড়ালীর মত তার বুকের খুব কাছে দাঁড়িয়ে রইল। আয়ান তার অপ্রতিভ অবস্থার দিকে এক পলক তাকিয়ে বলল : শরীর যখন শরীরের ওপর দখল নেয় তখন আর প্রেম থাকে না। সে হয় হিংস্র পাশবিকতা। পৌরষের আদিমতম কদর্য ঔদ্ধত্যকে প্রেম বলে না।

আয়ানকে শাপগ্রস্ত প্রস্তরীভূত দেবতার মত দেখাচ্ছিল তখন। কিন্তু তার কণ্ঠে অনুশোচনাজনিত প্রায়শ্চিত্তর আর্তি সান্ত্বনা বাণীর মত শোনাল। আয়ান বলল : প্রেম পুজোর ফুল। আর সে ফুলের কীট হল কাম। কীট ফুলের শোভা নষ্ট করে, কাম প্রেমের মহিমা এবং গৌরব। স্বার্থে মলিন হয়। আমার স্বপ্নের ঋষি অন্ধ কামনায় উন্মাদ হয়ে স্বর্গের লক্ষ্মীকে বৈকুণ্ঠ ছাড়া করেছিল। তাকে ব্যাভিচারের মধ্যে টেনে এনেছিল। এ দুঃখ, এ অনুতাপ মরে গেলেও আমার যাবে না।

ক্লান্তস্বরে রাধা বলল : নিজের হাতে তুমি যে ক্ষত এঁকেছ বুকের গভীরে, তার বেদনা আমার সারা অঙ্গে ও মনে। আমি ও তোমার মত পড়ে আছি আহত হয়ে।

যা হবার তাতো হয়েই গেছে এ জন্মের মতন। আয়ান রাধার মুখখানা পূজাঞ্জলি দেয়ার মত করপদ্ম ধরল। অনেকক্ষণ তার দুই চোখের দিকে স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। তার দুই চোখ বোজা। কিন্তু জল টল টল করছিল চোখের কোণে। আয়ানের দীর্ঘশ্বাস পড়ল। গম্ভীর গলায় ডাকল : রাধা। আমার দিকে তাকাও। তুমি যা বলবে, আমি তাই করব।

কথাটা রাধার বুকের ভেতর সপ্তস্বরা বীণার মত ঝংকারে বাজল। তার সমস্ত চেতনার মধ্যে অনাহত স্বরে বেজে যেতে লাগল অনেকক্ষণ। সেই মুহূর্তে মনের ভাবটাকে বর্ণনা করার ভাষা ছিল না। তার সমস্ত শরীর মন জুড়িয়ে যেতে লাগল। নিজের মনই যেন তার সত্তার কাছে প্রশ্ন করল, কি আর চাইবার আছে? এখন যার যার জীবনের ভারে চাপা পড়ে মরার দিন পর্যন্ত প্রতীক্ষা করতে হবে। এখন আর বলাবলি বা ভাবাভাবির আছে কি? এতো হল তার দুঃখের প্রতি, কষ্টের প্রতি আয়ানের সহানুভূতি, সমবেদনা জানানোর ভাষা। একটা মানুষ তার পবিত্র প্রেম ও আনন্দ নিয়ে, দুঃখ কাতরতা নিয়ে তার হৃদয়ভরা জিজ্ঞাসা নিয়ে যেন তার কাছে প্রশ্ন করছে। অকূলে পড়ে নিরুপায় হয়ে আর এক অসহায়ের কাছে সাহায্য চাইছে যেন।

তবু রাধার মনে হল, সামান্য একটু কথা দিয়ে যে এত বড় সুধাসিন্ধু প্রাণের মাঝে বইয়ে দিতে পারে তার মত বড় যোগী আছে কে?

আয়ান তাকে চুপ করে থাকতে দেখে হাতটা তুলে নিল নিজের হাতে। কথাটা আবার পুনরাবৃত্তি করল : বল, বল রাধা কি চাও? তুমি যা বলবে, আমি তাই করব। তোমাকে সুখী করা আমার কর্তব্য।

কথাগুলোর কি অসীম মাধুর্য! হৃদয়কে ফুলের মত মেলে ধরে, কিন্তু তার প্রকাশ একটুও ব্যাহত করে না। তার নিজস্ব গৌরবকে যথাস্থানে রেখে তার থেকে যতটুকু নেয়ার তা গ্রহণ করেই যেন চুকিয়ে দিতে বদ্ধকপরিকর। আয়ানের কথা বলার আশ্চর্য কৌশলটি চল্লিশ বছর বয়সে রাধা গভীর করে অনুভব করল। এ যেন সেই : থাক থাক নিজ মনে দূরেতে; আমি শুধু বাঁশির সুরেতে পরশ করিব তার প্রাণ মন। একসঙ্গে নির্মম দূরত্ব বজায় রেখে অন্তরের গভীরতম স্থানে পৌঁছানর কি এক আশ্চর্য কৌশল অবলম্বন করেছিল সেদিনের উক্তিতে। চল্লিশ বছর বয়সে সে কথা ভাবতে তার বিস্ময় লাগছিল। আয়ানের আবেদন সেদিন তার অন্তরে মহত্বের দীপটিকে উজ্জ্বলিত করে দিল। তাই কি ভিতরটা এত অধীর হয়েছিল? রাধার স্পষ্ট মনে আছে সে কেমন আচ্ছন্ন হয়ে গেছিল। তার সমস্ত সত্তা যেন ডুবে যাচ্ছিল ভাললাগার সুমদ্রে। দেহটা শিথিল হয়ে নুয়ে পড়ছিল।

আয়ান তাকে দুহাতে বেষ্টন করে পালঙ্কে বসাল। একটি চৌকি নিয়ে তার পাশে বসল। তার হাতের উপর হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। বলল :

তোমার কি আমাকে বলতে খুব কষ্ট হচ্ছে?

হ্যাঁ।

তাহলে, কিছু বলতে হবে না। বলার দরকার নেই। শুধু বল, আমি তোমার জন্য কি করব? আমার বিশ্বাস ভঙ্গ করলে যদি সুখী হও তাই কর। তোমার জন্য আমি সব পারি। যে প্রেম শুধু শ্রদ্ধা ভক্তি ভালবাসায় জড়ানো সেই প্রেম ত্যাগে সুন্দর। প্রেম কামে মলিন হলে বড় স্বার্থপর হয়। সে প্রেম শুধু দুঃখ ডেকে আনে। ভালবাসার স্বর্গীয় দীপ্তি ক'জনের জীবনে ঘটে? তোমার মত মেয়েই পারে মহৎ প্রেমে নিজেকে উৎসর্গ করতে। এখন তোমার মনের কথা অকপটে বলে তুমি শুদ্ধ পবিত্র হয়ে যাও।

রাধা কেমন যেন হয়ে গেল। আস্তে আস্তে বলল : তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে, আমি যেন উড়ে যাচ্ছি মেঘের ভেতর দিয়ে। আমার দুধারে নানা রঙের প্রজাপতি উড়ছে। আমার পায়ের তলায় পড়ে আছে রৌদ্রতপ্ত ধরণী। ঐ মাটি আমায় ডাকছে। কিন্তু আমার দেহ হাল্কা হয়ে গেছে, আমি মাটিতে পা দিয়ে দাঁড়াতে পারছি না, আমি শুধু উড়ে যাচ্ছি।

আয়ান খুশিতে গদগদ হয়ে বলল : দুঃখকে আনন্দ করার ভার মনের উপরে।

কিছুদিন থেকে ননদিনী কুটিলাকে নিয়ে বেশ একটা বড় রকমের অশান্তি শুরু হল বাড়ীতে। সে রাধার চেয়ে ছ'বছরের বড়। তবু বন্ধুর মত ছিল। কুটিলার গায়ের রঙ আয়ানের মত ফর্সা নয়। মাজা রঙ হলেও দেখতে খাসা ছিল। সুন্দরী না হলেও হেলা-ফেলা করার ছিল না।

রাধার বিয়ের আগে থেকে একটি দরিদ্র মেধাবী ছেলে তাদের বাড়ী থেকে শাস্ত্র-বিদ্যা অধ্যয়ন করত। নাম ছিল শতানন্দ। সে পড়াশোনায় খুব ভাল, দেখতে সুন্দর এবং অনুগত। কুটিলার সঙ্গে তার একটা হৃদয়ের সম্পর্কও ছিল। আয়ান জননী জটিলা ঠিকই করেছিল শতানন্দের সঙ্গে কুটিলার বিয়ে দেবে। এ বিয়ে স্থির হয়েছিল কুটিলার সাত বছর বয়সে। কিন্তু বিয়ে হল দ্বাদশবর্ষ পূর্ণ হলে। শতানন্দ ঘর জামাই হয়ে থেকে গেল শ্বশুরালয়ে। দশ বছর হল কুটিলার বিয়ে হয়েছে। তবু তাদের কোন সন্তানাদি হয়নি। তাদের দাম্পত্যজীবনও সুখের ছিল না। নিত্য অশান্তি লেগেছিল। শতানন্দ কুটিলাকে সহ্য করতে পারত না। সে ছিল তার দুচোখের বালাই। কুটিলা ঘরে ঢুকলে শতানন্দ তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে যেত। এমন কি শ্বাশুড়ীমাতা জটিলার সঙ্গে দেখা হলেও কথা বলত না। ডাকলেও জবাব দিত না।

পরিবারের মধ্যে রাধাকেই শ্রদ্ধা করত শতানন্দ। কথাবার্তা যা হয় তার সঙ্গেই। শতানন্দের ভাষায় সে হল মরুদ্যানের ফুল, তৃষ্ণাহরণের জল। কতদিন রাধার কাছে স্খলিত ভেজা গলায় অভিযোগ করেছে : বৌঠান, গরীব ঘরের ছেলে হয়ে জন্মানোর মত পাপ নেই। দারিদ্র্য আমার জীবনের অভিশাপ। কুটিলাকে আমার কোনদিন ভাল লাগেনি। কিন্তু এই পরিবার প্রতি আমার একটা কৃতজ্ঞতা ছিল। অন্নের ঋণ শোধ দিতে ইচ্ছের বিরুদ্ধে বিয়ে করেছি।

রাধা একটু অবাক হয়ে বলল : একথা বলা তোমার মত শিক্ষিত পন্ডিতের শোভা পায় না। একদিন তুমি তাকে ভালবাসতে।

শতানন্দের মুখখানা তীব্র বিতৃষ্ণায় এবং বিরক্তিতে ভরে গেল। তীব্র ঘৃণায় উচ্চারণ করল: ভালবাসা না ছাই! বেড়ালটা, কুকুরটা, গাছটা পর্যন্ত মায়াবশে আপনার হয়। কুটিলা সেই খোঁটায় বাধা মায়ার দড়ি। মায়া-প্রেম কখনও এক হয় না বৌঠান! এই বোধ আমার সেই অল্প বয়সে হয়নি। কিংবা হলেও মায়া-মোহবশে মানিয়ে নিয়েছি। ওষুধের মত চোখ বন্ধ করে গিলেছি। রোগের সঠিক ওষুধ না পড়লে যেমন হিতে বিপরীত, আমারও তেমন হয়েছে।

কেন? কুটিলাতো খুব স্বামী-অনুরাগিণী। তোমাকে সব সময় খোশমোদ করে; সর্বক্ষণ পায়ে পড়ে আছে বললেই চলে, তবু তোমার মন উঠছে না। নিজেদের মধ্যে এ বিরোধ অশান্তি ডেকে এনে লাভ কি ভাই? তুমি নিজেও কষ্ট পাচ্ছ, তাকেও কষ্ট দিচ্ছ। আর আমরা যারা আছি তোমাদের চারপাশে তারাও সর্বক্ষণ উৎকণ্ঠা উদ্বেগে, দুশ্চিন্তায় জীবন কাটাচ্ছি। অশান্তি তৈরি করা কিছু কঠিন নয়। তার মধ্যে কোন পৌরুষ নেই।

বৌঠান একটা মিথ্যেকে আর একটা বড় মিথ্যের সঙ্গে মানিয়ে নিতে হয় তখনই বিবেকের বাধা থেকে এই অশান্তির উদ্ভব হয়।

প্রেম-ভালবাসা তো মায়ামোহ ছাড়া কিছু নয়। ঐ মায়ামোহ কখন যে গভীর ভালবাসা, প্রেমপ্রীতির সখ্য হয়ে পাহাড়চূড়া স্পর্শ করে, অণু-অণু, তিল-তিল করে মায়া মোহের গর্ভে প্রেম জন্ম নেয়, কবে কি করে যে, সে ভাব প্রেম হয়ে উঠল শতানন্দ তুমি জানতে পারনি। তারপরেই গলার স্বরটা কেমন আবেগে কম্পিত হল রাধার। বলল : একটাই তো জীবন, এই জীবনকে নয় ছয় কর না। কোনও ছেলেখেলা কর না। তুমি অবুঝ হলে কুটিলার জীবনটাই কানা হয়ে যাবে। তুমি পুরুষ মানুষ। আর একটা বিয়ে করতে তোমার আটকাবে না। কিন্তু কুটিলার তো আর কোন উপায় রইল না। তুমি নিষ্ঠুর হলে বেচারীর জীবনটা নষ্ট হবে। একটা জীবনকে এভাবে নষ্ট করার কোন অধিকার কিন্তু তোমার নেই।

বৌঠান, কোন কিছুর ওপরেই মানুষের হাত নেই। আমাদের দাম্পত্য সম্পর্কের জটটা বাঁধাল কিন্তু কুটিলা। বিশ্বাসের জায়গায় তার সন্দেহ, প্রীতির জায়গায় শত্রুতা, উদারতার জায়গায় বিচ্ছিন্নতা; বোধহয় এই একটা কারণেই তার কাছ থেকে আমাকে দূরে সরে যেতে হচ্ছে। এছাড়াও বিরোধ বেঁধেছে তার দেমাক আর অহংকারের সঙ্গে আমার কৃতজ্ঞতাবোধের আর দারিদ্র্যের। আমি যে তাদের সংসারের আশ্রিত, তাদের কৃপা, অনুগ্রহ, দয়া পেয়ে বড় হয়েছি, মানুষ হয়ে দাঁড়িয়েছি সে খোঁটাটা দিতে সে ভুল করে না। আমার সবচেয়ে দুর্বলতার উপর সে নিষ্ঠুরের মতন চাবুক মারে। আমার দেহ-মন-আত্মা তার চাবুকের জ্বালায় জ্বলছে। সত্তার এই নির্যাতনকে আর চোখে দেখতে পারছি না। তুমি ঠিক বলেছে বৌঠান, মানুষের জীবন একটাই! জীবনের সেই পরম জিনিস হল সত্তা আর মর্যাদাবোধ। আমার সেই সত্তা ভঙ্গুর আর টলমল।

শতানন্দের কথার মধ্যে বিদ্যুৎচমকের মত হঠাৎ যন্ত্রণাবোধ রাধাকে স্পর্শ করে গেল। যন্ত্রণা যন্ত্রণাই। তার মধ্যে নৃশংস মধুর বলে কোন ভাগাভাগি নেই। সব কিছুরই একটা মানে থাকে। কিন্তু তার এই মন খারাপেরও একটা রহস্য আছে। রাধা কিছুক্ষণ নিজের যন্ত্রণায় নিজেই নিশ্চল হয়ে তাকিয়ে থাকে। তারপর সম্মোহিতের মত মুগ্ধ স্বরে বসল : তবু এই আমাদের জীবনের নিয়তি। এবং সংসারের গোয়ালে যার যার খোঁটায় বাঁধা আছি। যার যা মুখের সামনে রাখা জাবনাতে অবোধ পশুর মত মুখ ডুবিয়ে জীবনের জাবনা খাচ্ছি। জান শতানন্দ, যে জীবন আমরা চাই, সব সময় কি পাই? কৈশোরে জীবনের যে স্বপ্ন দেখি, হাল্কা গোলাপী রঙে যে জীবনের ছবি আঁকি, সেই জীবন আমাদের মনোমত হল না বলে জীবনের উপর প্রতিশোধ নেব। বিদ্রোহ করব কেন?

শতানন্দ হাসল। বলল : এ সমাজের আমরা কেউ বেঁচে থাকি না, বাঁচতে জানি না। সংস্কার, বিশ্বাস, কতকগুলো ঠুন্‌কো মুল্যবোধ, নীতিবোধ, লোকভয় আর অভ্যাসের দাসত্ব করি শুধু। আমরা বেশিরভাগ মানুষ প্রেমকে খুন করে তার রক্তে সত্তাকে রাঙিয়ে নিয়ে পুতুলের মত ঘর করি। সেখানে প্রেম নেই বিশ্বাস নেই, ভালবাসা নেই,—শুধু প্রশ্বাস নিই আর নিশ্বাস ফেলি। এই কী জীবন? একে কি বেঁচে থাকা বলে? মাত্র একটা জীবনে, একমাত্র নিজেদের ইচ্ছামত বাঁচতে যারা না পারে তাদের মানুষ বলে না। মেনে নেয়া, সরে থাকা জীবনের ধর্ম নয়। বৌঠান, আমরা বোধ হয় মানুষ নই। তুমি ঠিক বলেছে জাবনার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা খোঁটায় বাঁধা গরু। নিয়মবদ্ধ. মায়াবদ্ধ। বৌঠান, এই মিথ্যে জীবনের বাঁধন ছিঁড়ে চল আমরা পালিয়ে যাই অন্য জীবনের আলোকিত প্রান্তরের দিকে। পারবে? সাহস হবে কি পালানোর! বৌঠান, তুমি না গেলেও আমি পালাব। দুই হাতে তালি দিয়ে কুটিলাকে চমকে দিয়ে আভীর পল্লীর ধুলো-বালি কাঁকর মাড়িয়ে বেরিয়ে যাব এই অন্ধকার গুহা থেকে। বন্যায় তেড়ে আসা জলের মত উন্মত্ত আনন্দে ধেয়ে যাব অবারিত পৃথিবীর দিকে। রাধা মুগ্ধ দুই চোখে শতানন্দের দিকে তাকয়ে থাকে। চিন্তাশূন্য সম্মোহিত। ভিতরে ভিতরে এক বাঁধ ভেঙ্গে যাচ্ছিল তারও। অভ্যাসের বশে কণ্ঠে উচ্চারণ করল : কেন যাবে?

শতানন্দের দৃষ্টি দপ করে জ্বলে উঠল। জীবনটা ব্যর্থ হয়ে যাওয়ার যন্ত্রণায় মোচড় দিল। চোখে জ্বলন্ত ক্রোধ জ্বল্‌জ্বল্ করতে লাগল। বলল : এই বিরাট পৃথিবীর ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র একটি কীটেরও স্বাধীনভাবে শান্তিতে বাঁচার অধিকার আছে। মানুষেরও আছে। আমারও আছে। মানুষ ত কীট নয়, জন্তুও নয়। সে শুধু খেয়ে, ঘুমিয়ে আর রমণ করে বেঁচে থাকতে পাবে না। মানুষের অনেক কিছুই থাকে, অনেক আনন্দ, দুঃখ, বেদনা থাকে যা শুধু মানুষেরই জানার কথা। কিন্তু যখন মানুষ মানুষের ভাষা বোঝে না তখন তার সঙ্গে বাস করা অর্থহীন হয়ে যায়। বৌঠান সন্ধ্যে হয়ে আসছে, দিন ফুরিয়ে যাচ্ছে; এবার আমি যাই। খুশীতে ভরে উঠুক আমার খুশীহীন জীবন। আনন্দম্! আনন্দম্! বৌঠান খুশী হওয়াটা বড় কথা,—কি ভাবে, কোন্ পথে খুশী হচ্ছে তা জানার দরকার নেই। নিয়ে দিয়ে, দিয়ে নিয়ে সকলকে সুধন্য করে চলে যাওয়ার নামই জীবনের সাথর্কতা। আমি সেই সার্থকতা খুঁজতে যাচ্ছি। বাধা দিও না, মায়া বাড়িও না। আমি যাচ্ছি—

শতানন্দ সত্যি চলে গেল রাধার বিয়ের পাঁচ বছর পর। কুটিলাও বদলে গেল। সংসারে উদয়াস্ত

পরিশ্রম করে শতানন্দকে ভুলে থাকে। মাঝে মাঝে নির্জনে বসে একা একা কাঁদে। কাউকে দেখলে তাড়াতাড়ি চোখ মুছে স্বাভাবিক হওয়ার চেষ্টা করে। কবে নাকি মথুরার পথে একবার দেখেছিল তাকে। কোন এক পানশালা থেকে ভীষণ অপ্রকৃতস্থ অবস্থায় বেরোচ্ছিল। তাকে দেখে কুটিলার ভেতরটা চমকে উঠেছিল। কিন্তু তার এক মুখ দাড়ি, অবিন্যস্ত চুলে মস্তকটি বিরাট দেখাচ্ছিল বলে নিসংশয় হতে পারছিল না। লোকটির অবিন্যস্ত মলিন বসন, অসংলগ্ন পদক্ষেপ। বুদ্ধিদীপ্ত দুই চোখে সুরারক্ত দৃষ্টিতে কেমন একটা নেশার ঘোর। দৃষ্টি তার অতি নিস্পৃহ। মুখভাব দেখে মনে হয় জীবনের উপর এবং বিশ্বজনের উপর তার একটা প্রবল বিতৃষ্ণা। জনতার স্রোতে গা ভাসিয়ে চলেছে উদ্দেশ্যবিহীন অলস মন্থরতায়।

সঙ্গী সাথীদের সঙ্গে পশরা নিয়ে কুটিলাও সেই পথে গৃহে ফিরছিল। তাদের দলটি হঠাৎ দেখল পথের পাশে একটা পাগল যানবাহন লক্ষ্য করে বড় বড় অট্টালিকার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে যাত্রাদলের কুশীলবের মত ঘুরে ঘুরে নানারকম গালিগালাজ, অশালীন বাক্য আর অপ্রাসঙ্গিক মন্তব্য করছিল। চেনা কণ্ঠস্বর শুনে কুটিলাও থমকে দাঁড়িয়েছিল। সঙ্গীরা যে যার মত চলে গেল। কুটিলা নিজেকে একটু আড়াল করে শুনতে চেষ্টা করল তার কথা।

শতানন্দ আঙুল নাচিয়ে চেঁচিয়ে সকলকে শোনানো জন্য বলছিল : ভেঙে চুরমার করে দাও সব। কোন কিছুর জন্যে কারো মমতা নেই। আমি চাই সব কিছু ধ্বংস হয়ে যাক। কিন্তু আমি একা বেঁচে গেলে কি হবে? একটু হেসে অদ্ভুত ভঙ্গী করে বলল : কিছুই হবে না। আমার কোন জীবন নেই, আমার কেউ নেই। আত্মীয় না, অনাত্মীয় না, প্রভু না, ভৃত্য না—আমিও না। এই সুন্দরী শুনছ আমি স্বয়ম্ভু। কেউ বলতে পারে না, আমার কি আছে? তবে আমার দুঃখ নেই, থাকবে কেন বল? বাবা-মা আমার নাম খুব অঙ্ক কষে রেখেছিল শতানন্দ। আমার শুধু আনন্দ আছে। আনন্দ করব, মদ নিয়ে খেলা করব, গায়ে মাখব, মেয়েমানুষ নিয়ে নাচব, ভোগ করব, আদর করে মজা করব—অ্যাঁ।

কুটিলা শুনতে শুনতে বধির হয়ে গিয়েছিল। তারপর কচি ছেলের মত ককিয়ে কেঁদে ওঠার স্বর বেরোল গলা থেকে। কাঁদতে কাঁদতে সে দৌড়ে গেল! শতানন্দ কুটিলাকে অমন করে পালাতে দেখে আশ্চর্য হয়ে বলল : যা বাবা, চাইতে এলাম একটু আনন্দ, বেটী কেঁদেই ঠান্ডা হয়ে গেল। দূর থেকে কুটিলা আরো শুনল, শতানন্দের গলার স্বর। আরে ওই তো আরো একটা সুন্দরী যুবতী। সাজ দেখে মনে হচ্ছে নাগরের খোঁজে বেরিয়েছে। ওকেই একটু আদর করব।

কুটিলা মুখ ফিরিয়ে দেখল শতানন্দ সত্যি তার কোমর বেষ্টন করে হাসতে হাসতে চলেছে। শতানন্দের গৃহত্যাগ ও অধঃপতনের জন্য সে দায়ী এই অনুশোচনা ভুলতে পারে না। আয়ানও তার অপরাধকে ক্ষমা করতে পারে না। ভাইয়ের মনোভাব কুটিলার অজানা নয়। কুটিলাও পারতপক্ষে তার সামনে আসে না।

কুটিলা বেচারীর স্বামী থেকেও বিধবার মত নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করে। সেজন্য রাধার খুব কষ্ট হয়। হিন্দু মেয়ে সে। একবার বিয়ে হয়ে গেলে আর বিয়ে হয় না। তাহলে এখন বাকী জীবন ধরে কুটিলা কি করবে? একদিন এই প্রশ্ন নিয়ে সে এল রাধার ঘরে।

অবরুদ্ধ কান্নায় তার গলার স্বর ভাঙা। বলল : বৌঠান এক নারীতে চিরজীবন আসক্ত থাকা বোধ হয় পুরুষের ধর্ম নয়। পুরুষ যা খুশী করে বেড়াতে পারে, আর আমরা নারী বলেই যত দোষ? মথুরা বৃন্দাবনের ঘরে ঘরে মেয়েরা আজ বেলেল্লাপনা করে বেড়াচ্ছে কেন? তাদের বিদ্রোহ সমাজের প্রতি, ক্ষোভ পুরুষের স্বেচ্ছাচারিতা আর অন্যায় জুলুমের উপর। জঙ্গলের জীবনে তাই ফিরে যেতে চাইছে, কেন?

কুটিলার কথা শুনে রাধা অবাক হয়ে গেল। এসব প্রশ্ন এমন গভীর আর জটিল করে তার মন আগে কখনও ভেবে দেখেনি। এই জিজ্ঞাসা থেকেই কি অগ্নি ও স্বাহার গল্প রচনা করেছে পুরানকারেরা? বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর সে আস্তে আস্তে বলল : তোমার এই প্রশ্নের জবাব দেব এমন বিদ্যে বুদ্ধি আমার কৈ? পুরাণের একটা গল্প বললে তুমি বোধ হয় পুরুষ ও

নারীর প্রকৃতি ও স্বভাবকে বুঝতে পারবে। স্বর্গে, অগ্নিদেবতা আকাশময় একা একা ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে একদিন সপ্তর্ষির সাত স্ত্রীকে দেখতে পেলেন। তাদের রূপের ছটায় দশ দিক জ্বলজ্বল করছে। অগ্নিদেব মদনবাণে জর্জরিত হল। মনে তাদের প্রত্যেককে সম্ভোগ করার প্রবল বাসনা। সেই মত কুপ্রস্তাব পাঠাতে দ্বিধা করল না। কিন্তু সাধ্বী রমণীরা অগ্নির নির্লজ্জ, অসামাজিক প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করল। তখন অগ্নি তাদের পাওয়ার জন্যে জঙ্গলে ধ্যান করতে লাগল। ধ্যানে যখন কিছুই হল না, তখন অগ্নি হতাশ হয়ে লজ্জায়, ধিক্কারে, অনুশোচনায় প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে আত্মবিসর্জন করবে বলে সংকল্প করল।

অগ্নির মনোবেদনা এবং দুঃখ দেখে প্রিয়তমা পত্নী স্বাহার ভীষণ কষ্ট হল। নির্লজ্জ স্বামীর মনোবেদনা লাঘব করার জন্য নিজের রূপ পরিবর্তন করে অঙ্গিরার স্ত্রী শিবার রূপ ধারণ করে অগ্নিদেবের সামনে এসে দাঁড়াল। মদনশরে জর্জরিত অগ্নি নিজ স্ত্রী স্বাহাকে চিনতে পারল না। অঙ্গিরার স্ত্রী শিবা ভ্রমে তাকে প্রেম নিবেদন করল। আলিঙ্গন দিল এবং রমন করল। অগ্নির চিত্তে কোন বিকার নেই। কামোন্মত্ত পুরুষকে ঠকানোর মত সহজ বোধ হয় আর কিছু নেই। নারীর এই মোহিনী শক্তির নাগপাশে পুরুষ চিরবন্দী। মায়াপাশে, মোহবশে আবদ্ধ থাকে। এই অভিজ্ঞতা তাকে স্বস্তিতে থাকতে দিল না। নিজেকে প্রতারণা করার আত্মগ্লানি অগ্নিদেবকে মিথ্যাচারের শিকার করা এবং শিবার নিষ্কলুষ চরিত্র ও তার পবিত্র সতীত্বের ওপর মিথ্যে কলঙ্ক লেপন করার প্রবল দুঃখ ও কষ্টে স্বাহার মর্মবিদ্ধ হতে লাগল। তার নিজের এই অনুশোচনার কোন সঙ্গী ছিল না। আত্মদহনে পুড়ে পুড়ে নিঃশেষ হচ্ছিল। কিছুতে ভুলতে পারছিল না, শিবা ভেবে স্বাহাকে অগ্নি যখন আদর করছিল, চুম্বন করছিল, আলিঙ্গন করছিল। অজস্র প্রলাপে নিজেকে উজাড় করে দিচ্ছিল তখন স্বাহার বুকের ভেতরটা দগ্ধ হচ্ছিল। পুরুষ জাতটার উপর তার প্রবল ঘৃণা জন্মাল।

নিদারুণ মর্ম যাতনায় স্বাহার দিন কাটতে লাগল। এই যন্ত্রণা, দুঃখকে ভুলে থাকার জন্য সে ভাবল পাখী হয়ে উড়ে যাবে আকাশে। অথবা অন্য কোথাও। একা একা বনে জঙ্গলে, পাহাড়ে ঘুরবে। তবু এই মিথ্যের পৃথিবীতে আর ফিরবে না। এখানে প্রেম নেই, ভালবাসা নেই, আছে শুধু লোভ-লালসা-ক্ষুধা। কোন পাহাড় চূড়াতে আশ্রয় নিয়ে সে যোগিনী হয়ে কাটিয়ে দেবে বাকী জীবন। কিন্তু ভাবলে কি হবে? জাতে তো নারী। মায়া মোহ নারীর জন্মগত অভিশাপ। স্বাহা পারল না অগ্নিকে ছেড়ে যেতে। সপ্তর্ষি ছয় ঋষির স্ত্রী রূপ ধরে নিত্য নতুন নারী হয়ে সে সন্তুষ্ট করতে লাগল অগ্নিকে। কিন্তু সবশেষে তেজবতী বশিষ্ঠের স্ত্রী অরুন্ধতী রূপ ধরে এল না। স্বাহা হয়েই দেখা দিল। অগ্নিদেব তো তাকে দেখে বিস্ময় চমকে উঠল। বলল : স্বাহা তুমি? তুমি কোথা থেকে এলে এখানে? এই কুঞ্জে তোমাকে মানায় না।

স্বাহা অবিচলিত অকম্পিত স্থির দুই চোখে অগ্নির দিকে তাকিয়ে বলল : স্বামী, যাকে ইচ্ছামত কাছে পাওয়া যায় ; যার ওপর সবকরম দাবি-দাওয়া অত্যাচার চালানো যায়—তার প্রতি তোমার এই উদাসীনতা, উপেক্ষাকে সইতে পারি না। নিজের স্ত্রীকে সহজে পাওয়া যায় বলেই বোধ হয় পুরুষের মন ওঠে না। যা অধরা, যাকে পেতে গেলে অনেক মেহনত করতে হয় তার প্রতি তোমাদের পুরুষ জাতটার লোভ দেখে আমার ঘেন্না হয়।

অগ্নি জবাব দিল না। মাথা হেঁট করে রইল। তাকে নিরুত্তর দেখে বলল : প্রভু একটা কথার সঠিক জবাব দেবে? সপ্তর্ষির ছয় ঋষি পত্নীর সঙ্গে রতিসুখে মত্ত থেকে যে সুখ তৃপ্তি আর আনন্দ তুমি পেয়েছ, সে কি স্বাহা তোমায় দিতে পারত না? স্বাহার হৃদয় দানের সাগর কিন্তু শুকিয়ে যায়নি। সে সমুদ্র মন্থন করলে তুমিও অফুরন্ত ঐশ্বর্যশালী হতে।

অগ্নিদেব ঝাঁঝাল গলায় উত্তরটা দিল : না। এক সঙ্গে রোজ ঘর করলে আর প্রেম থাকে না, ভালবাসা থাকে না। তখন স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক একটা অভ্যেসে গিয়ে দাঁড়ায়। অভ্যাসে একঘেয়েমি আসে। তাই বিয়ে করা বৌতে পুরুষের ক্লান্তি আসে। নারীরও আসে। কিন্তু তাদের মানিয়ে চলা প্রকৃতি, অভ্যাসকে স্বীকার করে নিয়ে প্রমাণ করে নিজেরা বেঁচে আছে। কিন্তু পুরুষ প্রকৃতিটা একটু

অদ্ভুত। সে বড় বেশী বন্য আর স্বাধীন। পুরুষের কাছে প্রত্যেকটি পরিচিত নারীর সঙ্গই ভিন্ন ভিন্ন রকম। কারণ প্রত্যেকের সত্তা প্রকৃতিতে কিছু কিছু বৈচিত্র্য পার্থক্য তো আছে। তাই ভিন্ন ভিন্ন নারী তাকে আকর্ষণ করে। এতে তো লজ্জা পাওয়া কিছু নেই। প্রকৃতির নিয়ম।

স্বাহা অকস্মাৎ খিল্ খিল্ করে হেসে উঠল। সে হাসি থামতেই চায় না। অগ্নির কথাগুলো হাসির বন্যায় সে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। হাসতে হাসতে বলল : তুমি একটা আস্ত নির্বোধ। স্বপ্ন দেখতে সপ্তর্ষির স্ত্রীরা তোমার রূপে প্রলুব্ধ হয়ে আসবেই। মূর্খ, ছয় ঋষির স্ত্রীর রূপ ধরে এই স্বাহাই তোমার কামতৃষ্ণা চরিতার্থ করেছে। তোমার সঙ্গে সেই ভালোবাসা ভালোলাগার খেলা বেশ লাগছিল। কিন্তু অন্য একজন নারী ভেবে তুমি যখন আমার শরীরটা নিঙ্ড়ে নিচ্ছিলে, আমি তোমার শরীরের মধ্যে হারিয়ে যাচ্ছিলাম তখন মেয়েমানুষ হওয়ার এক বিচিত্র লজ্জা অপমান আমাকে কষ্ট দিত। শুধু মনে হত, যে পুরুষ নারীকে নর্মসহচরী করে পেতে চাইল, শুধু শরীর পাওয়ার জন্যেই যার এত কাঙালপনা সে কেমন করে শরীর ফেলে স্ত্রীর গলার স্বর চোখের চাউনি দেখবে, হাতের স্পর্শ অনুভব করবে।

কুটিলা বোবার মতন মুগ্ধ চমক নিয়ে তাকিয়ে থাকে রাধার দিকে। চোখের পলক পড়ে না মোটে। অনেকক্ষণ পর একটা বুকভাঙা নিশ্বাস পড়ল তার। তারপর আস্তে আস্তে বলল : জীবনে যা কিছুই পাওয়া যাক না কেন, সব কিছুর জন্য মূল্য ধরে দিতে হয়। আমাকেও মূল্য দিতে হবে। কথাগুলো বলতে বলতে সে রাধার ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হল।

কুটিলা চলে গেলে রাধা ভাবছিল, অগ্নি-স্বাহার গল্পটা সে করল কেন? এ দিয়ে সে কি বোঝাতে চাইল? কিন্তু এই কথাগুলো বলতে সে একটা ভীষণ সুখ পেয়েছিল মনে। আজ আঠাশ বছর বিয়ে হয়েছে। কিন্তু সেদিনের ছবিটা চোখের উপর জ্বলজ্বল করছে। দর্পণের সামনে দাঁড়িয়ে আছে রাধা। যুগল ভুরুর মাঝখানে সিঁদুরের টিপটি ধ্রুবতারার মত জ্বলছে। তার আঁচল কাঁধ থেকে খসে পড়েছে। বুক থেকে কাপড়টা সরে গেছে। কাঁচুলিবদ্ধ বুকের আশ্চর্য বক্ষসৌন্দর্যে সে নিজেই চমৎকৃত আর অভিভূত হয়ে যায়। ভুরু টান টান করে দেখল বাইশ বছরের অতুলনীয় রূপ আর উদগ্র যৌবনশ্রী। একটা প্রচ্ছন্ন গর্ব অনুভব করল। প্রত্যেক নারীর ভিতরেই আছে এক মহাশক্তিরূপিণী দেবী। নিজের অনির্বচনীয় দেহসৌন্দর্যের দিকে তাকিয়ে মনে মনে বলল : বিধাতার দান এই নারীদেহের রূপলাবণ্য ভোগ করার জন্য উন্মত্ত না হয়ে, দস্যুর মত লুণ্ঠন না করে, শ্রদ্ধা করতে শেখ অগ্নিদেব। স্বাহা তোমাকে সেই শিক্ষাই দিয়েছে। অমনি প্রফুল্লিত আনন্দের শিহরণ তার সারা শরীরে বয়ে গেল। নিজের মনেই গুনগুন করে গাইল :

যৌবন সরসী নীরে, মিলন শতদল,
কোন্ চঞ্চল বন্যায় টল্‌মল্ টল্‌মল্।

আঠারো বছর আগের ঘটনা। তবু কি আশ্চর্য, কি বিস্ময়—সেই অতীত এখনও তেমনি অক্ষয় এবং সজীব হয়ে আছে তার মনে। বিকেলে ঝুল বারান্দায় বসে সকলে মিলে গল্পগুজব করছিল। কেবল আয়ান এক কোণে একা, ছোট্ট এক চৌকির ওপর চুপ করে বসেছিল। মাঝে মাঝে তার গাঢ় গভীর নিঃশ্বাসের শব্দ ভেসে আসছিল বাতাসে। রাধা আয়ানের দৃষ্টি কেড়ে নেয়ার জন্য বেণীটিকে বাঁ কাঁধ দিয়ে নামিয়ে বুকের দুই গোলকের মধ্যে দুলিয়ে দিল। বেলফুলের মালা জড়ানো বেণী এক আশ্চর্য সৌন্দর্য এনে দিল তার অঙ্গে। শ্রাবণের আকাশে বিদ্যুৎলতার মত দেখতে লাগল। কুটিলার বুকের ভিতরটা ঈর্ষায় জ্বলে গেল। জ্বালা ভরা দৃষ্টিতে তাঁর দিকে কট্‌মট্ করে তাকাল। ঠোঁট বেঁকিয়ে চাপা গলায় বলল : কত স্বামী সোহাগিনী আমার! তবু, না যদি জানতাম।

রাধা হাসল। এক ধরনের বিশেষ সহানুভূতি ছিল তার কুটিলার প্রতি। কুটিলা কি করে জানবে, আয়ানের ভালবাসার ধরন কি? বন, নদী, পাহাড়, তারা, মহীরুহকে যেমন করে মানুষ শিশুকাল

থেকে ভালবাসে অনেকটা সেরকম ভালাবাসা। এই ভালবাসায় কোন দাহ নেই, আছে শুধু স্নিগ্ধতা। বোধ হয় একমাত্র আয়ানের মতই ঋষিতুল্য মানুষ এরকম ভালবাসতে পারে।

কুটিলার কথায় রাধা সপ্রতিভ হয়ে বারান্দার এক কোনে দাঁড়িয়েছিল যেখানে রোদ আর ছায়া দেয়ালা করছে। বিকেলে দিনের আলো নিভে আসছে। সব কিছু কেমন নরম আর স্নিগ্ধ হয়ে যাচ্ছে। একটা প্রশান্তি নামছে ধীরে ধীরে। নীড়ের পাখী নীড়ে আসছে অনেক মাঠে, গ্রাম পেরিয়ে। চুপি চুপি পা পা করে হাঁটছে ময়ূর-ময়ূরী। পায়ে পায়ে ধুলোয় ধুলোয় আকাশ ভরিয়ে দিয়ে ধেনুরা গোঠে ফিরছে।

জটিলা আয়ানের খুব কাছে এসে নিচুর গলায় প্রশ্ন করল : হাঁরে, আজকাল তোকে ভীষণ বিমর্ষ দেখি। কেন বলত? বৌমার সঙ্গে কিছু হয়নি তো?

কথাটা শুনে রাধা বিস্ময়ে চমকাল। কিন্তু সে যেমন দাঁড়িয়েছিল তেমনই রইল। উৎকর্ণ উৎকণ্ঠায় দৃঢ় হয়ে ওঠল তার শরীর।

আয়ান নিস্পৃহ গলায় বলল : না, না, ওসব কিছু নয়। দিন কাল ভাল নেই আর। বৃন্দাবনের সহজ সরল অনাড়ম্বর জীবনের যে একটা শান্তি ছিল তা আর নেই।

জটিলা ভাঙা গলায় বলল : থাকবে কি করে? নন্দের ওই কেষ্ট ব্যাটা যত গোলমাল পাকাচ্ছে।

অপরাধবোধে সহসা আয়ান চমকে ওঠল। ত্রাস্ত ও বিচলিত হয়ে উৎকণ্ঠিত গলায় বলল : না, মা। কৃষ্ণ বৃন্দাবনের আশীর্বাদ। তার নামে অপবাদ দিও না। সব দোষ কংসের। কংস দেশটাকে রসাতলে নিয়ে যাচ্ছে। তার ভয় দেবকীর অষ্টম গর্ভের সন্তানকে। কিন্তু নিজের হাতে তাকে হত্যা করেছে সে। তবু তার সংশয় ঘোচে না, ভয় কাটে না। কৃষ্ণকে নিয়ে তার অকারণ উৎকণ্ঠা ও দুশ্চিন্তা দিন দিন প্রবল হচ্ছে। মনের ভিতর তার অসংখ্য জিজ্ঞাসা : কে এই কৃষ্ণ? এত শক্তি কোথা থেকে পেল? কৃষ্ণ তো সাধারণ শিশু নয়। আবার দেবকীর সন্তানও নয়। তথাপি এই শিশুকে উপেক্ষা করতে পারছে না সে। কৃষ্ণ তার রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছে।

জটিলা দুচোখে বিস্ময়ের দীপ জ্বেলে বলল : এসব কি বলছিস বাবা? এমন কথা তো কস্মিনকালেও শুনিনি।

আয়ানের অধরে মধুর হাসি। বলল : কৃষ্ণের কথা শুনলে তোমার হৃদয় অস্থির হয়ে উঠবে। তুমিও জান অঘাসুর, বকাসুর, তৃণাবর্ত, শকটাসুর, পুতনা, কালীয়নাগ সকলেই কংসের বিশ্বস্ত অনুচর এবং অন্ধ সমর্থক। কৃষ্ণকে এরা গোপনে হত্যা করতে এসেছিল। কিন্তু উল্টে শিশু কৃষ্ণের হাতেই তারা প্রাণ হারাল। অবশ্য নিন্দুকেরা বলে বৃষ্ণিদের গুপ্ত সংস্থা অন্তরালে থেকে হত্যা করেছিল এদের। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি না। তাই যদি হবে কংসের মত হিংস্র, নির্ভীক শার্দূল একটা ছোট্ট শিশুকে ভয় পায় কেন? কেন বিচলিত করে তাকে? আবার খুনী বলে একটা দুধের বাচ্চাকে কারাগারেও আটকে রাখতে পারছে না। শিশু কৃষ্ণকে বন্দী করলে কংসের গৌরব বাড়বে না, মর্যাদাও থাকবে না। তাই কংস নিরুপায় রাগে, আর অপমানে ছট্‌ফট্ করছে। হিংস্র রাগের জ্বালা জুড়োতে সে সাধারণ মানুষের উপর অত্যাচার এবং জুলুমকে দিনদিন প্রবল করছে। সাধারণ মানুষকে কৃষ্ণের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলার ফন্দী করছে। কংস চাইছে, সাধারণ মানুষ কৃষ্ণকে প্রত্যাখ্যান করলে, তাকে ত্যাগ করলে কৃষ্ণের সম্পর্কে উদ্বেগ দুর্ভাবনা কমবে। কিন্তু তার এই কূটনীতি ব্যর্থ হল। এখন তাই নতুন ফন্দী এঁটেছে। কৃষ্ণের যারা শক্তি এবং আগামীকালের ভরসা, সেই বৃন্দাবন ও মথুরার তরুণ তরুণীদের এক উচ্ছৃঙ্খল, অসামাজিক জীবন যাপনে অভ্যস্ত করতেই যত্রতত্র পানশালা তৈরী করেছে। সাধারণ মানুষ এর মন্দটা টের পাচ্ছে না। কিন্তু তার ভয়াবহতায় তাদের প্রাণমন আলোড়িত। গোপালনবৃত্তি নির্ভর জীবনযাত্রায় দৈনন্দিন প্রয়োজনগুলো সহজেই মিটে যায়। প্রতিদিনের সাধারণ উদ্বেগ, দুর্ভাবনাগুলো সাধারণ মানুষের মনকে তত বিকল করেনা। সারাদিন কায়িক পরিশ্রমের পর রাত্রিটা ঘুমিয়ে কাটায়। মনটা তাই এখনও আবিল হয়ে উঠেনি। কিন্তু এখন মথুরা থেকে, গিরিব্রজ থেকে কংসের সমর্থনপুষ্ট বহু বণিক বহু বিচিত্র লোভনীয় আনন্দ উপকরণ

নিয়ে ফলাও ব্যবসা করছে। পল্লীর নিরীহ সাধারণ মানুষ তার চাকচিক্য ও বৈচিত্র্যের প্রলোভনে আকৃষ্ট হচ্ছে। দেহোপসারিণী বহু নারীও নাকি সম্প্রতি বৃন্দাবনে এসেছে। উদয়াস্ত পরিশ্রমের পর বৃন্দাবনের পুরুষ ও নারীরা সেই সব উত্তেজক আনন্দ ও পানীয়ের আকর্ষণে ছোটে। সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনির পর এই উত্তেজনা, আনন্দ তার সমস্ত অনুভূতিকে নাকি এক বিস্মৃতির মধ্যে ডুবিয়ে দেয়। তখন নাকি স্বর্গসুখের সঙ্গে বাস্তবের কোন তফাৎ থাকে না।

জটিলা পানের একটা খিলি গালে পুরে দিয়ে চিবোতে চিবোতে বলল : আমিও শুনেছি সন্ধ্যের পরেই নাকি পথের ধারে ধারে সুরার দোকান বসে যায়। আড়কাঠিরা আসে। তারা নাকি মন্ত্র জানে। পুরুষমানুষগুলোকে মন্ত্র দিয়ে ভেড়া করে আর মেয়েগুলোকে পরী করে খারাপ জায়গায় নিয়ে যায়। এমন আশ্চর্য কাণ্ড আগে কখনও ঘটেনি। ঘোর কলি।

আয়ান ভুরুটা কুঁচকে বলল : এদের দোষ দিয়ে লাভ নেই মা। ওরা আমাদের সন্তান। ঘরে খাবার নেই, ওদের সামনে নেই কোন সুনিশ্চিত ভবিষ্যৎ। বেঁচে থাকার মধ্যে কোন সার্থকতা খুঁজে পায় না তারা। পাবে কোথা থেকে? আচার্য পণ্ডিতেরা দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছে। যারা আছে তারাও শিক্ষাদানে নিস্পৃহ। এরা না পাচ্ছে শিক্ষা, না পাচ্ছে জীবন ও জীবিকার নিশ্চিন্ত আশ্বাস। এদের গোটা জীবনটাই অন্ধকারে ঢাকা। তাই আঁধারের রাজ্যে যে পাপ জমা হয়ে আছে তার মধ্যেই খুঁজছে মুক্তির আনন্দ আর জীবনের উল্লাস। তরুণদের পানাসক্ত হওয়ার এটাই অন্যতম কারণ। কংসের রাজত্ব আমাদের জীবনের অভিশাপ। কাল ব্যাধির চেয়ে ভয়ংকর।

রাধা একটু চাপা গলায় সর্তক করে দেবার জন্য বলল : একটু আস্তে বল। চারিদিকে কংসের চর ঘুরছে।

বুকভাঙা শ্বাস পড়ল আয়ানের। বলল : তুমি ঠিক বলেছ। কিন্তু দেশের কথা ভাবতে গেলে মনটা তেতে উঠে। কবে যে এই রাহুর দশা থেকে মুক্ত হব জানি না। প্রতিকারই বা কি তাও বলতে পারে না কেউ। অথচ সকলে আমরা মুক্তি চাইছি।

আয়ানের জন্যে জটিলার বুকটা কেমন করছিল। আয়ানের মাথায় হাত বেখে তাকে আশা দেবার জন্য বলল : কেউ যদি না জন্মায় তাহলে মানুষের মুক্তি আসবে কি করে? পৃথিবীর ইতিহাস কি করে এগিয়ে চলবে? সৃষ্টির প্রয়োজনে বিধাতা তাকে ডেকে আনেন মর্তে। লোকে তাকেই বলে অবতার।

আয়ান কিছুক্ষণের জন্য স্তম্ভিত হয়ে যায়। রাধাও বিস্ময়ে বিভোর হয়ে জটিলার দিকে তাকিয়ে থাকে। বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেল স্তব্ধ বিহ্বলতার ভিতর।

আয়ান স্তিমিত স্বরে বলল : মা, এত সুন্দর করে কথাটা তুমি বললে কেমন করে? পৃথিবীর ভূভার হরণের জন্য তাহলে সেই দেবতা এসেছেন মাটির স্বর্গে। মানুষের সে নারায়ণকে আমি স্বপ্নে দেখেছি। লক্ষ্মীছাড়া হয়ে কমলাপতি আর কতকাল একা স্বর্গলোকে থাকবে? বিরহ সইতে পারেন না শ্রীহরি। তিনি যে সদা আনন্দময়। তিনি আনন্দম অমৃতম। আনন্দ ছাড়া একদণ্ড থাকতে পারেন না তিনি। এক বিরাট জীবন স্রোতের অংশ হয়ে পরম ব্রহ্ম ছিল এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে একা। ভীষণ একা। একা একা তাঁর ভাল লাগল না। রস পান না হলে, জীবনকে অতল গভীরে মানুষের মধ্যে নিত্য নতুন করে অনুভব না করলে আনন্দরূপ প্রকাশ পায় না। নিজেকে তিনি তখন দুই করলেন। রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ, গন্ধের একটা মানে খুঁজে পেলেন। মনের অভ্যন্তরে সৃষ্টি হল এক নতুন বিশ্ব। বিশ্ব পৃথিবী জুড়ে এই সুর। সকলে মিলতে চায়, কেউ একা থাকতে চায় না। একা থাকার বড় কষ্ট। বৈকুণ্ঠপতি নারায়ণ লক্ষ্মীবিরহ সইতে না পেরে এই মর্তের মাটিতে নেমে এসেছেন। বৃন্দাবনের মাটিতে পড়েছে তাঁর পায়ের ধুলো।

এক দারুণ মুগ্ধ চমকে জটিলার দুই চোখ চকচক করে উঠল। দুই চোখে বিস্ময়ের অতলান্ত গভীরতা। মুগ্ধ স্বরে বলল : তোর মুখে এসব কথা শুনলে মনটা কেমন দুর্বল হয়ে যায়। শ্রদ্ধায় ভক্তিতে মাথা নুয়ে আসে। বড় ভাল লাগল রে। তোর স্বপ্নের সে নারায়ণ কে? তাকে একবার দেখতে সাধ হয়। কিন্তু চর্মচক্ষে তাকে দেখব, এমন পুণ্য আমার আছে কি?

রাধা ডাক ভুলে যাওয়া পাখীর মত আয়ানের চোখে চোখ রেখেছিল। বুকে তার অশান্ত ঝড়। কেমন একটা উথলে ওঠা সাগরের মত ভাব। তবু একটা লজ্জায় কাঁপুনি ধরে গেল। বিব্রত ভয়ে সে গভীর এক দৃষ্টিতে আয়ানকে ভ্রূকুটি করে জটিলাকে বলল : জানেন না, আপনার ছেলে অদ্ভুত অদ্ভুত কথা বলে সকলকে বিপন্ন করতে এক ধরনের আনন্দ পায়। আপনি নিশ্চয় আমার চেয়ে সেকথা ভাল করে জানেন। আপনার ছেলের প্রসঙ্গে আপনাকে কিছু বলাতো মা'র কাছে মাসির গল্পের মত ব্যাপার।

জটিলা হাসি হাসি মুখ করে আয়ানের দিকে চেয়ে থাকল। কিন্তু রাধার কথার প্রতিবাদ করল না। খুব বড় একটা শ্বাস ফেলে বলল : সেটা তো ওই জানবে। তুমি কেন ওর মুখ চাপা দেবে?

ভীষণ চমকে ওঠেছিল রাধা। জটিলার শীতল কণ্ঠস্বর ঠাণ্ডা বাতাসের মত তার সমস্ত সত্তাকে কাঁপিয়ে দিয়ে গেল। আয়ানের প্রগলভতাকে ভয় করছিল রাধা।

আয়ান মৃদু মৃদু হাসছিল। বলল : যশোদার ছেলে গোপাল, আমাদের কানু, বৃন্দাবনের কৃষ্ণ সেই বৈকুণ্ঠপতি দীনবন্ধু।

রাধা সহসা কেঁপে গেল। তার চোখ ছলছল করে ওঠল। ঠোঁট কামড়ে বলল : সত্যি তোমার মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে। কৃষ্ণকে তুমি অপমান করলে।

জটিলা একবার হঠাৎ একটু দিশেহারা বোধ করে চুপ করেছিল। তারপর একটু বিরক্ত হয়ে বলল : বৌমা ঠিক বলেছে। তোর বুদ্ধি একেবারেই লোপ পেয়েছে।

আয়ান খুব হাসল। বলল: ছোট থেকেই একথা শুনে আসছি। তোমরা সবাই আমাকে একটু ভুল বুঝলে। কিন্তু আমার দেখায়, অনুভবে কোন ভুল নেই। শুধু তোমাদের ভ্রম ভাঙার জন্যই যা বলার আছে, বলছি। তোমার কিংবা রাধার তো অজানা নয়, জীবনে কখনও মিথ্যাচার করেনি, মিথ্যাকে প্রশ্রয় দেয়নি। তুমি কি বলতে চাও ভগবান স্বর্গের ধরাচুড়ো পড়ে মর্তে নেমে আসবে? ভগবানই এই মানুষের সন্তান। তাঁর দ্বিতীয় কোন সত্তা নেই। ভগবানকে জানাার জন্য চেনার জন্য তিনি আমাদের বোধ বুদ্ধি এবং বিবেচন দিয়েছেন। তা না হলে অন্য প্রাণীদের থেকে অন্যলোক থেকে আলাদা করে দেয়ার সার্থকতা কি? আমাদের বিচারশক্তিই বা তিনি দিয়েছেন কেন? তোমরা চোখ বন্ধ করে সে অনির্দেশ অবাঙ্‌মনসগোচর বিশ্বনিয়ন্তাকে শুধু মনের মাঝে ধ্যান কর, প্রার্থনা কর। কিন্তু মন দিয়ে বুঝতে চাও না, চোখ খুলে দেখতে চাও না তার অভিব্যক্তিকে। এই বিশ্বসৃষ্টির আদি অনন্ত স্বরূপ হয়ে ঈশ্বর আমাদের অন্তরে বিরাজ করছে। তাঁকে শুধু চিনে নিতে হয়। খুঁজে বার করতে হয়। আচ্ছা মা, কৃষ্ণের মত মহান মহানুভবতা মানুষকে তুমি আর কোথাও দেখেছ? তার নিজের জন্য কিছু কামনা নেই। সে সকলের ভাল চায়, মঙ্গল চায়। মানুষের শুভই তার কামনা। সে কামনা করে মানুষের মঙ্গল হোক, মানুষ ধর্ম, কর্মে সুন্দর হোক।

আয়ান কয়েকমুহূর্তের জন্য থামল। জটিলার দুচোখে বিভোর বিহ্বলতা। বিস্ময়দীপিত দুটি চোখ মেলে সে আয়ানকে দেখতে লাগল। মা ও রাধাকে নিরুত্তর দেখে আয়ান বলল: কখনও দেখেছ কারো উপর তার কোন ক্ষোভ আছে? কোন খেদ আছে, তার কথায় মধু, সান্নিধ্য মধুর। গোটা মথুরার মানুষ তার জন্য কাঙাল হয়ে উঠেছে কেন? কি জাদু আছে তার ব্যক্তিত্বে? অবিশ্বাসের যুগে আমাদের কেউ কেউ তাকে মেনে নিতে পারে না। বিশ্বাস করতে পারে না; দেবতা কোন্ দুঃখে মানুষ হয়ে জন্মাবে? বিচার করে দেখ, মানুষের মধ্যে যা কিছু মহৎ, সুন্দর, সত্য আর শুভ তাই তো মানুষের দেবত্ব। ঐ দেবত্বটুকুই তার চরিত্রের শক্তি, অন্তরে সৌন্দর্য, নৈতিক বল এবং মানসিক স্থৈর্য। একমাত্র কৃষ্ণের ব্যক্তিত্বে, চরিত্রে আছে এই গুণ। তাই কৃষ্ণই পারে পৃথিবীকে স্বর্গ বানাতে। সে একা অন্যায়ের প্রতিবাদ করে, কংসের সমর্থনপুষ্ট হয়ে যারা সাধারণ মানুষের উপর অত্যাচার চালায় তাদের সে একা ধ্বংস করেছে। ভাবতো ঐটুকু ছেলের কি বিপুল শক্তি, অসীম সাহস এবং তেজ। গোটা মথুরাবাসী একত্রে কংসের বিপক্ষে দাঁড়াতে ভয় পায়, অথচ কৃষ্ণ একা তাকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখায়। কংস তার ভয়ে বিব্রত, অশান্ত। স্বর্গে ভগবান আছে কিনা জানি না, বিশ্বাসও

করি না—কিন্তু মর্ত্যে শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে ভগবানের ঐশী শক্তি প্রত্যক্ষ করি। তুমি কি শোননি, কৃষ্ণ জননী যশোদা ননীচোরা গোপালের মুখে বিশ্বরূপ দেখেছিল।

আয়ানের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে রাধা বলল: আমি নিজে শুনেছি সেই অদ্ভুত গল্প। গোপাল মুখ ব্যাদান করেছে অমনি যশোদা সেখানে দেখল বিশ্বব্রহ্মান্ডের বিচিত্র দৃশ্যের স্থাবর জঙ্গমের সব কিছু চন্দ্র-সূর্য-তারা-পর্বত-নদী-সাগর-দিগন্তলীন অরণ্য, আকাশ, পৃথিবী ভূমণ্ডলসহ প্রাণী সব।

আয়ান তদগত হয়ে বলল: হাঁ। অবিশ্বাসীর দল বলবে এসব মিথ্যে। কিন্তু যশোদার দেখা সত্য। তার অনুভূতি মিথ্যে নয়। মাতৃস্নেহের প্রভাবে জীবন ও বিশ্ব একাকার হয়ে যায়। বিশ্বের যাবতীয় বস্তুর মধ্যে তখন জননী আপন সন্তানের মাধুর্য ও লাবণ্যকে অনুভব করে। অসীম স্নেহ মমতার সূত্রেই হয়ত বিধৃত হয়ে প্রকাশ পেয়েছে তার অনুভূতি। গোপালের বিশ্বরূপ জননীর কল্পনা। কিন্তু পৃথিবীর কটা মা সন্তানের মধ্যে তার আকাশ, তার পৃথিবী, তার ব্রহ্মাণ্ডকে দেখেছে? কজন জননীর আমিত্ব সন্তানের মধ্যে পরিপূর্ণ হয়ে গেছে? কোনো মায়ের অন্তরে যে অনুভূতি কখনও জাগল না, যশোদার অন্তরে তার দর্শন পেলাম কেন? গর্গাচার্য বলেন, যশোদার এই অভিজ্ঞতাকে বিশ্বরূপ দর্শন বলে। আমার এসব বিশ্বাস, অনুভূতি তোমাদের হয়ত ভাল লাগবে না। তোমাদের চোখে আমি নির্বোধ, স্বপ্নবিলাসী। তাতে আমার কোন ক্ষতি নেই। আজ আমি সমস্ত লাভ-ক্ষতির বাইরে, সংসারের সমস্ত পাওয়া, না-পাওয়ার সীমা অতিক্রম করে কৃষ্ণচিন্তায় বিভোর হয়ে গেছি। আমার চোখে "কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ম্"। আমি তার কিংকর মাত্র।

পঞ্চদশবর্ষী কৃষ্ণের সঙ্গে প্রথম আলাপের পর থেকেই কেবলই একটা আকাঙ্ক্ষা রাধার মনে জাগত। কৃষ্ণের সঙ্গে আবার দেখা হোক, কথা হোক প্রতিদিন এই ইচ্ছা প্রবল হত মনে। আর, নিজেই আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করত কেন এই ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষা? এর কারণই বা কি? এই অতৃপ্তির কোন নাম নেই। আকাশের দিকে তাকিয়ে শুধু প্রশ্ন করল: "আকাশভরা তারার মাঝে আমার তারা কই?"

যত দিন যাচ্ছে, এই অতৃপ্তি লোকের চোখে প্রকট হয়ে উঠছে। রাধা বুঝতে পারছিল, কুটিলা, ললিতা, বিশাখা, বৃন্দের তাকে নিয়ে অনন্ত কৌতূহল। সব বুঝেও রাধা কিছুতে স্থির থাকতে পারছিল না। তার ঐ ঔদাসীন্যের গভীরে, তার অতৃপ্তির মধ্যে যে মন বাস করে তার রূপ কেমন নিজেও জানে না। কিন্তু তার চার পাশে অতৃপ্ত আত্মার যে জ্যোতি ঠিকরে পড়ছিল তাই নিয়ে সখীদের রঙ্গ তামাসার অন্ত ছিল না।

বহুদূর থেকে ভেসে আসা বাঁশীর মিষ্টি সুরের এক আশ্চর্য সুখানুভূতিতে রাধার দেহমন ভরে যাচ্ছিল। ঐ বাঁশীর সুর যে তাকে ঘুমোতে দেবে না কৃষ্ণ জানে। কৃষ্ণ নিজে ঘুমোতে পারছে না, তাই রাধার চোখের ঘুম হরণ করছে। রাধা জানে ঐ বাঁশী কি চায়? তার ভেতরটা মৃদু মৃদু কাঁপছে। ঐ সুরের ছোঁয়ায় তার ভিতরটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। মনটা যেন ডানা মেলে দিল কোন অতীতে। রাধা দেখতে পাচ্ছিল যমুনা তর্ তর্ করে বয়ে যাচ্ছে। আর কৃষ্ণ কদম্বমূলে বসে এক নিবিষ্টমনে বাঁশী বাজাচ্ছে। তার কোঁকড়া চুলে পড়েছে সূর্যের আলো। রাধা তন্ময় হয়ে দেখল তাকে। কৃষ্ণের চোখ বুজে গেছে, চোখের কোণ দিয়ে জল পড়ছে। রাধার সমস্ত অন্তরটা ভক্তিতে, শ্রদ্ধায়, প্রেমে আপ্লুত হয়।

সারাপথ সে ছিল ভীষণ অন্যমনস্ক। কি ভীষণ দরদ দিয়ে কৃষ্ণ বাঁশী বাজাচ্ছে। কানের পর্দায় বাঁশীর সুর বাজছে। 'তুমি মধু, তুমি মধুর নির্ঝর, মধুর সায়র আমার পরাণ বঁধু।' আর তার সমস্ত শরীর মন যেন শিথিল আর অবশ হয়ে যাচ্ছে। চরণ স্খলিত হচ্ছে। আর সে বাঁশীর নিঃশব্দে সুরের মধ্যে কেমন হারিয়ে যাচ্ছে। তার অবস্থা দেখে ললিতা বিশাখা অবাক বিস্ময়ে এ-ওর চোখের দিকে তাকিয়ে মুখ টিপে হাসে। হাসিতে তাদের মুক্তো ঝরে। রাধা ভ্রূক্ষেপ করে না। দুই ভুরু শুধু কয়েকবার কোঁচকাল।

ললিতা বিশাখা ভীষণ ঠাট্টা করে যাচ্ছিল অনেকক্ষণ থেকে। তাদের রঙ্গ-রসিকতায় রাধা যোগ দিল না; চটেও গেল না। তাদের হাসি তামাসা উপভোগ করতে তার খারাপ লাগল না। এর ভেতর তার অবরুদ্ধ মনের কামনা, বাসনা ভাল লাগার ইচ্ছেগুলো এবং আনন্দকে এমন করে পাচ্ছিল যে, মনে হল এই দুই সখী তার মনের বন্ধ দরজাটাকে হাট করে খুলে দিল! সখীদের হাসি-তামাসা-রঙ্গ-কৌতুকের মধ্যে যে এত আনন্দ আর সুখ লুকিয়ে আছে তা এতকাল কখনও এমন করে অনুভব করেনি। এই প্রথম টের পেল তাদের মজার মধ্য দিয়ে কৃষ্ণের আনন্দ ও সুখের একটা আশ্চর্য অনুভূতি তার মনকে প্লাবিত করে গেল। আর সে কেমন যেন হয়ে গেল। ভিতরটা তার ভীষণ অস্থির লাগছিল।

তবু রাধা নির্বিকারভাবে পথ হাঁটছিল। মাথায় কলস। ললিতা রাধার গা ঘেঁষে হাঁটছিল। দুজনের বাহু এবং নিতম্ব উভয়কে ছুঁয়েছিল। ললিতা কানের কাছে মুখ এনে বলল: 'রাধার কি হৈল অন্তরের ব্যথা।'

রাধা কোন উত্তর দিল না। কষ্টে তাকাল বিশাখার দিকে। ঠোঁট দুটো একটু ফাঁক করা। চোখ স্বপ্নাচ্ছন্ন দেখায়। তার পরিষ্কার শ্বাস এসে লাগল বিশাখার গায়। বিশাখার চোখেমুখে হাসির ছটা ঝিলিক দিল। বলল:

নয়নে লেগেছে ভাল
তাই চোখে এত আলো।

ললিতা চপল হেসে রাধার চিবুকটাকে নাড়িয়ে নাচের ভঙ্গী করে বলল:

সই কেন গেলাম যমুনার জলে।
নন্দের নন্দন চাঁদ পাতিয়া রূপের ফাঁদ
ব্যাধ ছিল কদম্বের তলে।।
দিয়া হাস্য সুধা চার   অঙ্গ ছটা আঠা তার
আঁখি পাখী তাহাতে পড়িল।
মনমৃগী সেইকালে   পড়িল রূপের জালে
বাঁশী-ফাঁসি গলায় পড়িল।

রাধার মনের গতি পরিমাপ করতেই বিশাখা কাঁদ কাঁদ গলা করে বলল:

সজনী লো—
ব্রজকুল নন্দন   হরিল আমার মন
ত্রিভঙ্গ দাঁড়ায়ে তরু-মূলে।
কর বাড়াইয়া যাই   নাগাল নাহি পাই
কান্দিতে কান্দিতে আইলাম ঘরে।
নিরমল কুলখানি   যতনে রেখেছি আমি
বাঁশী কেন বলে রাধা রাধা।

বিশাখার কথা শুনে রাধা কেমন আনমনা হয়ে গেল। এই নিষ্ঠুর নির্মম প্রেমহীন পৃথিবীতে কারও বুকে যদি কারো প্রতি প্রেম, করুণা, দরদ, ভালবাসা থেকে থাকে তা আছে ঐ কানুর বুকে। সে কথা মনে হলে এক মহৎবোধে রাধার হৃদয় ভরে ওঠে। ললিতার রসিকতায় তাই সে উত্তেজিত হল না। তার মুখখানা সহসা লজ্জায় এবং এক নিষিদ্ধ ভাললাগায় লাল হয়ে ওঠল। মৃদু স্বরে বলল: যা পারি না, তার পাওয়ার সুখে মন রাঙিয়ে অসুখী করে দিও না। আমার স্বামী আছে। আমার জীবনের অশ্বত্থগাছ সে। তাকে নির্মূল করি এমন সাধ্য আমার নেই। তা করার ইচ্ছেও নেই। যদি গাছ কেটে ফেলি তবু তার শিকড় থেকে যাবে আমার মনের গভীরে। কোন মানুষকে তো সম্পূর্ণ করে পায় না কেউ। আমিও না হয় পেলাম না। মানুষ তো ইষ্টের ছবি দেয়ালে টানিয়ে হৃদয়ের সব নৈবেদ্য নিঃশেষ করে দেয়। আমিও না হয় তাই করলাম।

বিশাখার গলায় নূপুর পরা ঝর্ণার মত সুর বেজে উঠল।

ভালবেসে যদি সুখ নাহি তবে কেন,
তবে কেন মিছে ভালোবাসা।
মন দিয়ে মন পেতে চাহি। ওগো কেন
ওগো কেন মিছে এ দুরাশা।
হৃদয়ে জ্বালায় বাসনার শিখা,
নয়নে সাজায়ে মায়া মরীচিকা,
শুধু ঘুরে মরি মরুভূমে। ওগো কেন,
ওগো কেন মিছে এ পিপাসা।

ললিতা তার সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে গাইল:

সখী, ভাবনা কাহারে বলে।
সখী, যাতনা কাহারে বলে।
তোমরা যে বলো দিবস রজনী ''ভালোবাসা ভালবাসা''
সখী ভালোবাসা কারে কয়!
সে কি কেবলই যাতনাময়।
তাহে কেবলই চোখের জল?
তাহে কেবলই দুঃখের শ্বাস?
লোকে তবে করে
কী সুখের তরে এমন দুঃখের আশ।

তেমনি স্বপ্নাচ্ছন্ন চোখে রাধা নিষ্পলক কিছুক্ষণ চেয়ে থাকে দুই প্রিয় সখীর দিকে। এক মায়াবী আলো যেন ঘিরে আছে তার মুখমণ্ডলে। জীবনে এই প্রথম নিষিদ্ধ ভালবাসার কথা শুনে সে অস্বস্তি বোধ করল না। বরং ভাল লাগল। বুকের মধ্যে সামান্য তরঙ্গ বয়ে গেল। কিছুক্ষণ আগেও তার ভিতরকার যে সত্তাকে সে গলা টিপে ধরেছিল সহসা সেই সত্তাটা যেন চির নতুন হয়ে উঠল তার মধ্যে। স্বপ্ন থেকে চোখ মেলল জাগরণে। একটা স্বস্তির শ্বাস ফেলল সে। তারপর উজ্জ্বল হাসিখুশি মুখে সে ললিতার প্রশ্নের জবাব দিল সঙ্গীত দিয়ে।

আমার চোখে তো সকলই শোভন,
সকলই নবীন, সকলই বিমল,
সুনীল আকাশ, শ্যামল কানন।
বিশদ জোছনা, কুসুম কোমল—
সকলই আমার মতো,
তারা কেবলই হাসে, কেবলই গায়
হাসিয়া খেলিয়া মরিতে চায়
না জানে বেদন, না জানে রোদন,
না জানে সাধের যাতনা যত,
ফুল সে হাসিতে হাসিতে ঝরে,
জোছনা হাসিয়া মিলায়ে যায়
হাসিতে হাসিতে আলোক সাগরে
আকাশের তারা তেয়াগে কায়।
আমার মতন সুখী কে আছে।
আয় সখী, আয় আমার কাছে
সুখী হৃদয়ের সুখের গান
শুনিয়া তোদের জুড়াবে প্রাণ।

প্রতিদিন যদি কাঁদিবি কেবল
একদিন নয় হাসিবি তোরা
একদিন নয় বিষাদ ভুলিয়া
সকলে মিলিয়া গাহিব মোরা।।

বিস্ময়ে ললিতা বিশাখা রাধার দিকে চেয়ে রইল। ঠোঁট চেপে ধরে মৃদু মৃদ হাসছিল। চোখেমুখে তাদের খুশির দ্যুতি ঝরছিল। কিন্তু এ কোন রাধা? যে প্রেমকে রাধা অন্তরে অনুভব করে তাকে কোন নামে শুধাবে ভেবে পেল না তারা। অপাপবিদ্ধ চোখের উৎসুক চাহনিতে তার দিকে চেয়ে বলল: রাই পাহাড়ে, নদীতে অরণ্যে, আকাশে যে শান্ত মধুর সৌন্দর্য প্রত্যক্ষ করি; বারবার হৃদয় ভরে উঠে আনন্দে সুখে এতো সেই প্রেম। সত্যি তোর কৃষ্ণ প্রেমের কোন তুলনা হয় না। কৃষ্ণ শুধু তোর হৃদয়ে নয়, প্রকৃতিতে পরিব্যাপ্ত। তোর হাসিতে, তোর গানে, তোর সখ্যে তোর সব ভাললাগায়, চোখকাড়া সব দৃশ্যে কানভরা সব সুরের মধ্যে সে আছে। এই সুন্দর পৃথিবী জুড়ে সে আছে। কৃষ্ণকে তোর হারানোর ভয় রইল না আর।

বলতে বলতে কেমন যেন হয়ে যায় বিশাখা। শূন্য চোখে সে ললিতার দিকে অনেকক্ষণ চুপ করে চেয়ে রইল। ললিতা ভ্রূকুটি করে নরম রোদের দিকে লোভীর মত তাকিয়ে ছিল। ভেজা গলায় বলল:

মধুর স্বপন প্রাণের মাঝারে বাজিছে মধুর বাঁশিটি।

নিজের ঘরের বারান্দার সামনে দাঁড়িয়েছিল রাধা। মনের মধ্যে তার দাহ। কুটিলা তাকে ভাল চোখে দেখে না। ঈর্ষা থেকে তার মনে সন্দেহ অবিশ্বাস জেগেছে। তাইতো রাধার চলাফেরার ওপর তার তীক্ষ্ণ নজর। কখন কোথায় যায়, কি করে এ সবের ওপর তার দৃষ্টি আছে সর্বক্ষণ। জটিলার কানকেও সে ভারী করে তুলেছে। তার মনকেও দিয়েছে বিষিয়ে। রাধা সম্পর্কে জটিলার মনের ভিতর যে সুন্দর অনুভূতিগুলো ছিল কীটে কাটা ফুলের পাপড়ির মত তার দশা হয়েছে। রাধার মনেতে কষ্টের সীমা নেই। নিজের মনেই তার সংশয় জাগে। তবে কি সত্যিই সে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে! কৃষ্ণ তাকে নষ্ট করছে? কিন্তু কুটিলা একে নষ্ট বলছে কেন? কৃষ্ণ তাকে ভালবাসে। কৃষ্ণের মধুর আলিঙ্গনের মধ্যে যে এত গভীর সব আনন্দ লুকানো ছিল তা আয়ানের সঙ্গে বারো বছর ঘর করেও সে জানেনি কখনও। কৃষ্ণের সঙ্গে সুখের আনন্দে প্রায় পাগলই হয়ে উঠেছে ইদানীং। নিজেকে এমন করে হারিয়ে ফেলেনি কখনও এর আগে।

কুটিলার তাই মর্মান্তিক অভিযোগ: দাদার ভালমানুষীর সুযোগ নিয়ে তুমি গোল্লায় যাচ্ছ। বংশের সুনাম মর্যাদা আর তোমার জন্য রইল না।

রাধা কুটিলার বিষ সন্দেহের প্রত্যুত্তরে কিছু বলে না। কথাটা যে মিথ্যে নয় একেবারে, রাধার চেয়ে আর কে বেশী তা জানে? আয়ান মানুষটা বড় ভাল। ভারী সোজা সরল। শিশুর মত। ওরকম মানুষ হয় না। এরকম মানুষ অচল এ সমাজে। এদের নিয়ে ঘর করা আরো অসম্ভব। এরা না হতে পারে স্বামী, না হয় প্রণয়ী। এরা নিজের অযোগ্যতা আর অক্ষমতা শুধু লুকিয়ে বেড়ায়। পাছে নিজের দুর্বলতা ধরা পড়ে তাই নিজের কাছ থেকে নিজে পালিয়ে থাকে। যদিও ব্যাপারটা তাদের মানসিক। তাই ঠকাতে তাকে বিবেকে লাগে। কিন্তু সে যা করেছে তা ঠকানোর নয়। আয়ানের ধারণা তাকে বিয়ে করে পাপ করেছে, অন্যায় করেছে। অনুশোচনার প্রায়শ্চিত্ত করতে রাধার কাছ থেকে সরে থাকে। আয়ানের সঙ্গে তার জীবনের কোন সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি। যদি কিছু থাকে সে কৃষ্ণের সঙ্গেই আছে। তাদের খোলাখুলি মেলামেশা সম্পর্কে আয়ানের অনুভূতি প্রতিক্রিয়া এটুকুই। কৃষ্ণের মত অফুরন্ত প্রাণপ্রাচুর্যে ভরা, দীপ্ত তারুণ্যে ভরপুর এক মহাপ্রাণ প্রেমিক তার জীবনে বড় বেশী দেরি করে এসেছে। তার ও আয়ানের জীবনে সেটাই দুর্ঘটনা। নইলে, জীবনটা অন্যভাবে সুরু হোত। এই অঘটনের স্মৃতিতে তার মন ভারাক্রান্ত। আরো আগে কৃষ্ণের বৃন্দাবনে পদার্পণ করা উচিত ছিল। তাহলে রাধার নিজস্ব চাওয়া, নিজস্ব বন্ধু এবং নিজস্ব জগৎ বলতে যা বোঝায় তা আরো আগে লাভ হত।

মনে আছে, কুটিলা আয়ানকে সরাসরি স্পষ্টভাষায় বলেছিল: ঘরের বৌ-এর বেলেল্লাপনার জন্য দায়ী তুমি। তোমার কাছ থেকে সাহস পেয়েই ও এত বেড়েছে। লজ্জা, সম্ভ্রমের মাথা খেয়েছে। গুরুজনের সামনে বেহায়ার মত মাথা হেঁট করে দাঁড়াতে তার লজ্জা না থাকতে পারে, কিন্তু আমাদের তো আছে। তোমার আস্কারায় বৌ-মনি মাথায় উঠেছে। তুমি তাকে দেবী করে রেখেছে। কিন্তু দেবীর কোন্ গুণ ওর মধ্যে আছে? তোমার ভালমানুষীর কোন মূল্যই ও দেয়নি। পড়ে পড়ে এই পরিবারের এবং কুলের গৌরব, সম্মান শুধু খুইয়েছে। এখনও বিহিত করতে পার না? তুমি কি পুরুষ?

আয়ানের মুখে হাসি, চোখে কৌতুকের ছটা। কুটিলার অভিযোগে সে রাগ করল না। কুটিলাকে শান্ত করার জন্য মৃদু স্বরে বলল: বিয়ে মানে কি কয়েদ খাটা? শ্বশুরবাড়ী কি কয়েদখানা! বিয়েটা বেঁচে থাকার একটা জরুরী শর্ত। সে শর্ত পূরণ করার অর্থ ব্যক্তিসত্তার দাসখত লেখা নয়। একবার একজনের সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেল, সব কিছু ফুরিয়ে গেল কিংবা নিঃস্ব হয়ে গেল সে তো আমি মনে করি না। জীবন হল 'আনন্দ-রূপম্ অমৃতম্', এই আনন্দের স্বরূপটাকে আমরা বুঝি না, চিনি না বলে যত গন্ডগোল বাধে। আনন্দের স্বরূপটা জলের মত। জলের নিজস্ব কোন বর্ণ নেই। আনন্দের রূপও তেমনি চোখে দেখার জিনিস নয়। জল যে পাত্রে রাখবে, সেই পাত্রের রঙেই তাকে দেখবে। কিন্তু তাতে জলের বর্ণের কোন পরিবর্তন হচ্ছে না। কেবল পাত্রের জন্য তাকে আলাদা দেখছ। পাত্রভেদে আনন্দের রূপও আলাদা। ভালবাসার অনুরাগের ভিতর দিয়ে তো সেই আনন্দের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ ঘটে। পুত্রের প্রতি মাতার স্নেহ, পুত্রের বিরহে মাতার বিলাপ, সখার জন্য সখার অসীম ব্যাকুলতা, প্রভুর প্রতি দাসেরা সেবা, নায়িকার প্রতি নায়কের প্রগাঢ় প্রীতি, কিংবা নায়কের জন্য নায়িকার প্রতীক্ষা, উৎকণ্ঠা, বিরহ—এ সবই তো পাত্রভেদে আনন্দের ভিন্ন ভিন্ন রূপ।

কুটিলা বেশ ঝংকার দিয়ে বলল: উঃ তুমি কিচ্ছু বোঝ না। তোমাকে বোঝানোও দায়। বৌ-মণি তোমাকে জাদু করেছে।

আয়ান মৃদু মৃদু হাসল! বলল: ওরে, মানুষ মাত্রেই কিছু কিছু ব্যক্তিগত ব্যাপার থাকে। সেই ব্যক্তিসত্তা তার একার। সম্পূর্ণ নিজের। আমাকে দিয়েই বোঝ না, তোর বৌ-মণির জীবনের কতগুলো বছর, কত অমূল্য জীবনের সময় আমি নষ্ট করে দিয়েছি। এখনতো সেগুলো ফেরানো যাবে না। অথচ, সে মুখ বুজে এই সংসারের জন্য তার যেটুকু দেবার নিঃশেষে দিয়ে গেছে। তার কোন ঋণ জমা হয়ে নেই। উদ্বৃত্ত বলতে যদি কিছু তার থেকে থাকে, তা যদি নিজের পছন্দমত অন্য কাউকে দেয় তাতে তো কোন দোষ নেই। তা নিয়ে আমিই বা ঈর্ষা করতে যাব কেন? মন দেয়া নেয়াতো কারো দয়ার নয়, কোন এক পক্ষের ঘৃণারও নয়। কিংবা দু পক্ষের উদ্‌ভ্রান্ত উদাসীনতারও জিনিস নয়। এটা হল জীবন! জীবনকে নিয়ে শতানন্দ পাগলামি করেছে, তুই পুতুলখেলা করেছিস। কিন্তু রাধা অনন্য। সে বুঝিয়ে দিয়েছে জীবন মানে আনন্দ। দু পক্ষের তীব্র আসক্তি আর আবেশে ভর করে আসঙ্গর আনন্দঘন আশ্লেষে একে অন্যকে সম্পূর্ণ করে না পেলে যুগল মনের মন্দিরে আরতির ঘন্টা বাজানো আর ধূপ জ্বালানো হয় না। প্রকৃত পুজো তখনই হয়। আমার জীবনে রাধাকে না পেলে এমন করে জীবনের অর্থতো কখনও বুঝতে পারতাম না। রাধা মানে আনন্দ, রাধা মানে প্রেম—রাধার অপর নাম হল জীবন। প্রদীপের বুকে যেমন শিখা, তেমনি জীবনের কামনা বাসনা আনন্দের বুকে রাধা প্রদীপ শিখা হয়ে জ্বলছে। কিন্তু সেজন্য শরীর কোন দহন নেই তার। প্রেমের আনন্দের স্নিগ্ধ মাধুরিমায় ভরে আছে তার বুক। তাই তো রাধাকে সংসারময় দেখি। এই বৃন্দাবনে রাধা ছাড়া আর কি আছে জীবনে?

কুটিলা বলল: তোমার কথাগুলো শুনলে মনে হয় স্বর্গ পৃথিবীতে নেমে এসেছে। তুমি চিরদিন স্বপ্ন দেখে কাটালে। মাটিতে পা ফেলে চললে না কখনও। তাই টের পাওনা সমাজ আছে, আত্মীয়-কুটুম্ব আছে। এদের চোখ তো বৌ-মনি ভ্রষ্টা, একটা নষ্টা মেয়েমানুষ ছাড়া কিছু নয়। স্বামী ছাড়া আর কোন পুরুষকে ছুঁতে নেই! মন চাইলেও সে তা করতে পারবে না বলেই তো সমাজ।

দ্বারের বাইরে দাঁড়িয়ে রাধা কথাগুলো শুনে চমকাল। ঘরের ভেতর একটা প্রদীপ জ্বলছিল।

তার ক্ষীণ মৃদু আলোয় সমস্ত ঘরখানি ছাইরঙা মথের ডানার মত তির তির করে কাঁপছিল। বুকের ভেতর হৃৎপিন্ডটা অনুরূপ দপ্‌দপ্ করছিল। রাধা ফিরে যাওয়ার জন্য মুখ ঘোরাল।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে শুনতে পেল আয়ানের গলা। বলল: ওরে শরীরের নগদ দাম কতটুকু? মন যদি না চায় শরীরটাকে বেঁধে রাখলেই কি সে সতী হয়ে গেল। মনটাই তো সব।

আয়ানকে বোঝাতে ব্যর্থ হয়ে কুটিলা হতাশ হয়ে ফিরে গেল। কিন্তু আয়ানের সামনে মুখ উঁচু করে দাঁড়ানোর অবস্থা ছিল না রাধার। তার মনেতে দ্বিধা, সংশয়ের যন্ত্রণা। কুটিলার কথাই ঠিক ভাবল। সে আর সতী সাধ্বী নয়। মনের দিক থেকেও দ্বিচারিণী। দেহের শুচিতাই বা কোথায়? কৃষ্ণকে সে আলিঙ্গন দিয়েছে, তার অধরসুধা পান করেছে। দেহে-মনে সে কি খাঁটি আছে আর? আগে ভাবত অবহেলায়, ঘৃণায়, বিরক্তিতে, প্রয়োজনে যাকে তাকে মেয়েমানুষ শরীর দিতে বাধ্য হয়, কিন্তু মনের ভালবাসা দেয়া যায় এক জীবনে একজনকে। কিন্তু সে কি আয়ানের মনের ভালবাসা পেয়েছে কখনও? আয়ান তাকে মানবীর চোখে দেখে না। তার কাছে স্বর্গভ্রষ্টা দেবী সে। মানুষী ভালবাসায় সামান্যতায় এবং সীমাবদ্ধতায় রাধাকে টেনে এনে তার মনকে, দেহকে আবিল করেনি কোনদিন। পূজার স্বর্ণসিংহাসনে বসিয়ে নিজেকে শুধু নৈবেদ্য দিয়েছে। শরীর পাওয়ার জন্য ফুলশয্যার রাতের কাঙালপনাটুকু ঘুমের মধ্যে তার পূজার ফুল হয়ে উঠল কেমন করে সেই বিস্ময় রাধার মনকে ছুঁয়ে আছে। আয়ানের এই অদ্ভুত ঠাণ্ডা দ্বেষহীন, ঈর্ষাহীন প্রেম ও ব্যবহার তাকে ভিতরে ভিতরে ভীষণ যন্ত্রণা দেয়। প্রতিকারহীন যন্ত্রণা বড় ধাক্কা দেয় তাকে।

কিন্তু কৃষ্ণ না থাকলে রাধার কি হত তাই শুধু ভাবে মাঝে মাঝে। মনের মধ্যে কৃষ্ণকে নিয়ে যখন ঝড় ওঠে তখন পরিবেশ, জীবন, জীবনযাত্রা সব কিছু সম্বন্ধেই বড়ই বীতশ্রদ্ধ হয়ে ওঠে। কৃষ্ণের কাছে গিয়ে একটু বসলেই কিংবা তার একটু দেখা পেলেই যেন সব শান্তি ফিরে পায় মনে। কৃষ্ণ যেন তাকে নতুন প্রাণ এনে দেয়। ফুরিয়ে যাওয়া রাধাকে নবীন করে তোলে।

কৃষ্ণের চিন্তাটা রাধার মনে এক অদ্ভুত আশ্চর্য অনুভূতির শিহরণ ছড়িয়ে দিল। সে কিছুতে তার অনাস্বাদিত পূর্ণ আনন্দ ও মুগ্ধতাকে ভুলতে পারছিল না। তার সমস্ত শ্বাস-প্রশ্বাসের মধ্যে ছড়িয়ে আছে তার ঘ্রাণ, তার তৃপ্তি ও আনন্দের দ্যুতি।

কৃষ্ণের বাঁশীর সুর এমনভাবে কানে, হৃদয়ে গেঁথে যায় যে, সেই সুর জীবনেরই এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে ওঠে। কিছু মুহূর্ত, কিছু অনুভূতি, কিছু স্মৃতি সেই সব সুরের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে গেঁথে যায় বিনিসুতোর মালায়। মধ্যরাতের বাঁশী সেই সুরের রেশ বহন করে আনল মনে। অমনি আকুলি-বিকুলি করে উঠল তার মনের ভেতরটা। রাধার সমস্ত মনটা, বুকের ভেতরটা কেমন পাগল পাগল লাগে।

কলকল শব্দে বয়ে যাচ্ছে যমুনা। তার একটানা ছলছল শব্দ আর কৃষ্ণের মোহন মুরলীধ্বনি তাকে আনমনা করে দিয়েছিল। নিজের অস্তিত্ব, স্বামীর অস্তিত্ব, স্নিগ্ধ প্রশস্ত নিঃসীম রাতের অস্তিত্ব সবই তার চোখের থেকে চেতনার মধ্যে থেকে সুরের মতই অনেকদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ছিল। সে তার অবচেতনে, অতীতের, তার যৌবনের চব্বিশ বছর বয়সে ফিরে গেল অনেকগুলো বছরকে পায়ে পায়ে মাড়িয়ে।

রাধার অভিমান হয় কৃষ্ণকে কেউ খারাপ বললে। কৃষ্ণ সম্পর্কে কোন দুর্নাম অভিযোগ, নিন্দে সে সইতে পারে না। চোখে জল এসে যায়। স্নানরতা নারীর বক্ষ সৌন্দর্য, অনাবৃত দেহলাবণ্য অথবা অসংবৃত বস্ত্রের অন্তরাল থেকে প্রকাশিত গোপনাঙ্গ দেখার প্রলোভনে কৃষ্ণ নদীতীর সংলগ্ন কদম্বমূলে বসে মুরলী বাজায় এই কথা কুটিলার মুখে শোনা থেকে ঘৃণায় গা রি-রি করছিল তার। সমস্ত অন্তঃকরণ ছিঃ ছিঃ করে উঠল। অমন অদ্ভুত কৃষ্ণ যে, শুধু মানুষের ভাল চায়, তার শুভ কামনা করে, যার অন্তঃকরণটা অতবড় সে এত ছোট হীন কাজ করবে কি করে? কৃষ্ণের মহৎ মানবিকতা উদার আদর্শবাদের আলো এসে পড়েছে গোটা মথুরাবাসীর জীবনে। তার সান্নিধ্যে ছোট ছোট মানুষও

কিছু বড় হয়ে উঠেছে। স্ত্রী পুরুষ সবার সামনে বড় হবার অপূর্ব সুযোগ এসেছে। ত্যাগে, দুঃখে, বেদনায়, বীর্যে অন্যায়ের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়ানোর মহান সাহসে তারা বড় হয়ে গেছে। আজ অগৌরবের কালিমায় সেই কৃষ্ণের জীবনকে এমন অন্ধকারে আচ্ছন্ন করে দিল কে?

সুন্দরী রমণীরা মুনি-ঋষিদের ধ্যানভঙ্গ করে, তাদের সাধনা সংযম ভাসিয়ে দেয়। কৃষ্ণ সামান্য যুবক। এই বয়সে কোন শাসন নিয়ম মানে না। এই বয়সের তরুণ তরুণীর কৌতূহল একটু বেশী উগ্র আর অসংযত। কিন্তু কৃষ্ণ তো সাধারণ মানুষ নয়। রাধার বিশ্বাস প্রবল সংশয়ের অস্তিত্বকে প্রচন্ড ধাক্কায় নিমেষে বহুদূরে সরিয়ে দিল। কৃষ্ণের কলঙ্কের তাপে তার মন পুড়লেও দীর্ঘস্থায়ী হয়নি তার দহন। কোন অজ্ঞান সম্মোহনের তন্ময় প্রভাবে সে কাটিয়ে উঠল তার ব্যথা। চাঁদের কলঙ্ক তার গৌরব, কিন্তু কৃষ্ণের কলঙ্কে গৌরব কোথায় ভেবে আকুল হল রাধা।

লোকে যাই বলুক রাধা তার ধ্যানের দেবতা, মানুষের মঙ্গলদূত সম্পর্কে ঐ ধরনের কোন কুৎসিত চিন্তা কখনো কল্পনাও করতে পারে না। করতে গেলে তার বিবেকে বড় আঘাত লাগে, হৃদয়ে রক্তক্ষরণ হয়। কিন্তু মানুষের স্বভাবঃ মন্দকে বিচার না করে সহজে বিশ্বাস করা, খারাপটাকে সে ডুব দিয়ে তুলে আনে।

বৃন্দাবনের নারীদের অবাধ স্বাধীনতা আছে, তা বলে সেই স্বাধীনতাকে উচ্ছৃঙ্খল, অশালীন, কুরুচিপূর্ণ আচরণ করে রমণীরা নিজেদের অসম্মানের পাত্র করে তুলবে একথা মানতে, বিশ্বাস করতে রাধার মন সায় দিল না। স্বাধীনতা মানে রুচিহীনতা, শালিনতাহীনতা কিংবা কাণ্ডজ্ঞানবর্জিত বিবেকহীনতা নয়।

গোপনারীরা নিবাববণ হয়ে সরোবরে স্নান করে একি বিশ্বাস করার মত ঘটনা? কোন সভ্য মানুষ এরকম অসম্ভব চিত্র কল্পনা করতে পারে মানুষ ভাবতেও পারে না। নিজেকে শুধু অনাবৃত করা সম্ভব দুয়ার রুদ্ধ স্নানের ঘরে। একমাত্র স্নানের ঘরে দর্পণের সামনে নিজেকে নিরাবরণ করে শরীরের সঙ্গে কথা বলা যায়। এই শরীরটাই যে জীবনের সব। একে নিয়ে গর্ব, অহংকার, ঘৃণা, বিতৃষ্ণা। শরীরের মধ্যে তার জীবনদর্শন হয়। এ হয়তো নিজেকে ভালবাসা কিংবা অন্বেষণের এক ধরনের প্রকাশ। একমাত্র স্নানের ঘরে আয়নার সামনে নিবারণ হয়ে কাঁদা যায়, হাসা যায়, নিজের গর্বিত অথবা হীনমন্যতাকে নির্দ্বিধায় প্রতিবিম্বিত করা যায়, ক্ষমা পাওয়া যায়। দর্পণ ছাড়া মানুষের বোধহয় কেউ এত আপন নয়।

কিন্তু স্নান ঘরের বাইবে উন্মুক্ত সরোবরে দিবালোকে নিরাবরণ হয়ে একজন বারবণিতাও স্নানে লজ্জা পায়। লজ্জার কারাগারে বন্দী গোপরমণীরা দুর্লভ লজ্জা কেমন করে ত্যাগ করল রাধার মাথায় ঢুকল না। যত ভাবে তত মনে হয় কুটিলা ঈর্ষায়, ক্রোধে, উন্মাদ হয়ে কৃষ্ণ-নামে কলঙ্ক লেপন করছে।

মনটা অনেকদিন ধরে ভাল ছিল না। কেউ কাছে থাকলেও ভাল লাগত না। শরীরের ভেতর একটা যন্ত্রণার মত কিছু টের পাচ্ছিল। কিন্তু তাকে নিয়ে ললিতা বিশাখার কৌতুকের অন্ত ছিল না। তাদের ঠাট্টা তামাসা, রসিকতা পারে না তার নির্লিপ্ত কাঠিন্যকে বিদীর্ণ করতে। আসলে তার কিছু ভাল লাগছিল না। নিজের সব ভাবনার কথাতো অন্যকে বলা যায় না। বলতেও নেই। লাভ হয় না কোন। এক-একজন মানুষের ভাবনা এক এক স্তরের। একই আকাশে নানারঙের মেঘ যেমন হয় অনেকটা সে রকমই।

মথুরার হাটে পশরা নিয়ে যাচ্ছিল। সহসা আকাশে মেঘ ঘনিয়ে এল। ঘুঘুর ডাকটা মেঘাতুর বিষণ্ণতাকে দ্বিগুণ করল। বেশ একটা ঠাণ্ডাভাব হল। ঝিরঝির করে উত্তরে হাওয়া বইতে লাগল। কদম গাছের পাতারা কেঁপে উঠল। রাধাকে অন্যমনস্ক আর উদাসীন দেখে ললিতা স্বগতোক্তি করে বলল: ব্যথা আমার কুল মানে না। বাধা মানে না—পরাণ আমার ঘুম জানে না, জাগা জানে না।'

বিশাখা রাধার যন্ত্রণাকাতর মুখ, নিশ্চল চাহনির দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। রাধাকে শুনিয়ে শুনিয় বলল: বড় জ্বালা সখী এ বুকে! প্রেমে পড়লে এত যে মন পোড়ে, জানা হল এখন। আমার

পোড়া কপাল!

ললিতা বিশাখাকে কটাক্ষ করল। বলল: প্রেমিক প্রেমিকাদের কত কষ্ট হয় তা হলে!

বিশাখার দীর্ঘশ্বাস পড়ল। হা-হুতাশ করে বলল: মনের কষ্ট শরীরের কষ্ট। বুক হু-হু। আরো কত সব উপসর্গ।

ললিতা অবাক হওয়ার ভাণ করে বলল: আশ্চর্য! তার পরেই সকৌতুকে নিজের মনে ভেঙে ভেঙে আবৃত্তি করে বলল:

মনের মরম জুড়াবার তরে
দ্বিগুণ আগুন সেই জ্বালি দেয় মোরে।।
এত দিনে বুঝিলাম মনেতে ভাবিয়া।
এ তিন ভুবনে নাহি আপন বলিয়া।।

বিশাখা রাধার তন্ময়তা ভঙ্গ করার জন্য কপালে করাঘাত করে কান্না কান্না গলায় সুর করে গাইল:

হায় অভাগিনী পরের অধীনী
সকলি পরের বশে।
সদাই এখনি পরাণ পোড়নি
ঠেকিনু পীরিতি রসে।।
অনুক্ষণ মন করে উচাটন
মুখে না নিঃসরে কথা।
মোর সখীর মুখ করুণ নয়ন
ভাবিতে অন্তরে ব্যথা।

তারপর সে হাসি হাসি মুখ করে খুশিতে ডগমগ হয়ে বলল: ভালোলাগা ভালোলাগা খেলাটাই বেশ। ভালোবাসা, প্রেমে পড়া সব সাংঘাতিক রোগ। অতি বড় শত্রুও যেন এরকম প্রেমে না পড়ে।

রাধা প্রেমের যন্ত্রণায় বুঁ হয়েছিল। সখীদের কোন কথাই তার কানে পৌঁছল না। কলের পুতুলের মত সে হাঁটছিল। মনটা তার শরীরের ভেতর ছিল না। কৃষ্ণের কলঙ্কের ভাবনা তাকে উৎকণ্ঠিত করেছিল।

বৃষ্টি থামল না। কালো মেঘ উড়ে গেল। কিন্তু বেশ একটা ঠান্ডা ভাব নিয়ে এল মুক্তির স্বাদ। শাল, সেগুনের শাখা প্রশাখায় শীত শীত নরম রোদের ছোঁয়া লেগেছে। লাল মাটির পথ থেকে সোঁদা সোঁদা গন্ধ ওঠে আসছে। আর তার ছায়া ছায়া রোদের মধ্য দিয়ে নিঃশব্দে মুখ বুজে সে হাঁটছে। স্নিগ্ধ নীল দীপ জ্বালানো লালের ছোঁয়া লাগা পুবের আকাশের রঙ জল-স্থল পরিব্যপ্ত হয়ে আছে। দূর থেকে মনে হচ্ছে, ওবা যেন মর্তলোকের কেউ নয়।

রাধার বুকের ভেতরটা সহসা কেঁপে গেল। এক অবিস্মরণীয় অতীতকে তার মনে পড়ল। হঠাৎ চল্লিশ বছবের এই গণ্ডীটাকে এক নিমেষে পার হয়ে গেল। তার দৃষ্টি বর্তমানের সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে বহু দূরে চলে গেল। সহসা তার মনে প্রশ্ন জাগল, তবে কি কালের কোন ক্ষয় নেই? কাল কিছুই ধ্বংস করে না? পুরনো করে না? পুরনোকে নতুন করে সৃষ্টি করে। জীবনটা তার পুরনো হয়ে গেছে, ভেতরটা ক্ষয়ে গেছে। যৌবনের সে লালিত্য, মাধুর্য, ঔজ্জ্বল্য আর নেই। চেহারার পরিবর্তন এসেছে। নিজেকে তার কালের এক অপ্রতিরোধ্য সৃষ্টি মনে হল। কিন্তু মন? তাকে কাল কিংবা জ্বরা স্পর্শ করতে নাও পারে। তার কোন সীমাবদ্ধতা নেই। মন তার পিছনে কিংবা পাশে নেই। একেবারে সামনে, প্রকাশের জন্য দাঁড়িয়ে আছে। সব সীমাবদ্ধতার বাইরে সে। তাই নিমেষে চল্লিশ বছরের গণ্ডীটাকে মুছে ফেলে তার চব্বিশ বছরের জীবনে অনুপ্রবিষ্ট হল।

পুরনো শুধু নতুন হয়ে ওঠে। এই উপলব্ধি শরীরের মনের ভেতর এক মুহূর্তের জন্য কোথা থেকে যেন কি ঘটিয়ে গেল।

কলকল করে বয়ে চলেছে যমুনা। খুশীতে উপচে উঠছে তার উর্মিমালা। অজস্র খুশী, আর চপল হাসির আনন্দধারা ছড়িয়ে দিয়ে অভিসারিকার মত চলেছে। রতিরঙ্গের সুখ লেগেছে তার ঢেউয়ের দোলায়। পথের ভয় তার নেই। আছে শুধু পথ চলার বিস্ময়, আর অনাগতকে পাওয়ার আনন্দ।

যমুনার তীর ধরে সখীদের সঙ্গে রাধা চলেছে মথুরার খেয়াঘাটে। ফুরফুরে মিষ্টি হাওয়ায় কেমন একটা শীত শীত ভাব। মেঘে ঢাকা সূর্যের মরা আলোয় চারিদিকটা ম্রিয়মান। এসব ভ্রূক্ষেপ না করেই রাধা মুখে বুজে হাঁটছিল। তাদের অঙ্গসৌরভ মিশে বাতাস হল গন্ধবহ।

যেতে যেতে ললিতা-বিশাখা জোরে শ্বাস নেয়ার শব্দ শুনল। দুরন্ত কৌতূহল নিয়ে তারা পিছন ফিরে তাকাল দেখল দুটি অপরিচিত তরুণ নাক, ঠোঁট, ভুরু কুঁচকে জোরে জোরে শ্বাস নিচ্ছে। এই দৃশ্য দেখে তাদের দুজনের খুব হাসি পেল। নাভিমূল থেকে একটা দুরন্ত বেপরোয়া হাসি যেন ঠেলে এল। যমুনার কল্লোলিত তরঙ্গের মত ভাঁজে ভাঁজে থাকে থাকে বিচিত্র স্বরে সে হাসি অনেকক্ষণ পর্যন্ত হিল্লোলিত হল। রাধার কিন্তু কোন হাসি পেল না। বরং কেমন একটা বিব্রত লজ্জায় আর আতঙ্কে তার বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠল। ললিতা বিশাখার হাসির তরঙ্গধ্বনি তার বুকের ভেতর দ্রুত লয়ে বাজতে লাগল। রক্তে তার বিপুল উৎকণ্ঠা। শিরায় শিরায় যন্ত্রণা।

মথুরার ঘাটে পৌঁছে দেখল মাত্র একখানি নৌকো খেয়াপারের জন্য বাঁধা আছে। তিন-চার জন পুরুষ আগে থেকেই নৌকোটি দখল করে আছে। তাদের জন্যই মেয়েরা খেয়া নৌকোয় উঠতে পারছিল না। ভয় পাচ্ছিল। ভয়টা মাখামাখি হয়েছিল প্রত্যেক রমণীর চোখেমুখে।

ভয় শুধু অচেনা পুরুষকে নয়, ভয় দুরন্ত হাওয়াকে, মেঘলা আকাশকে। কারোকে বিশ্বাস করতে পারছিল না। কে যে কখন তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এই ভয়ে মহিলারা অস্থির হয়ে পড়েছিল। হাওয়ায় এলোমেলো হয়ে যাচ্ছিল তাদের বসন। শাড়ি সামলানো ভীষণ দায় হয়ে পড়ল। কিছুতেই বাগে আনতে পারছিল না। নৌকোয় পুরুষ আরোহীরা বাতাস আর শাড়ীর সঙ্গে মেয়েদের যুদ্ধ দেখে ভীষণ হাসছিল।

রাধা দেখল ললিতা-বিশাখা এবং আর আর মেয়েযাত্রীর চোখেমুখে যে ভয়টা মাখামাখি হয়ে গেছে তার চেয়ে অনেক বড় একটা আতঙ্কে তার বুক কাঁপছে। মুখখানা রক্তশূন্য হয়ে গেছে, ত্বকের টানেই মালুম হচ্ছিল তার।

একটা মস্ত ঝাঁকড়া কদম গাছের ডালে একজোড়া কাঠবিড়ালী ঝাঁপাঝাঁপি করছিল। তাদের দৌড়ে দৌড়িতে, লড়ালড়িতে সরু ডাল মৃদু দুলছিল, পাতা কাঁপছিল, কেঁপেই চলছিল। সেইদিকে তাকিয়ে রাধা কেমন অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। সব কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছিল তার। এই পৃথিবীতে মানুষের থাকার মত কি আর কোন জায়গা নেই? স্বার্থের লোভে মানুষের মনুষ্যত্ব নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আর মনের মধ্যে যত কুৎসিত ক্ষতের সৃষ্টি করে এই পৃথিবীকেই সে বিষিয়ে তুলছে।

আকাশে মেঘ থাকার জন্য রোদের তেজ তেমন ছিল না। কোকিল ডাকছিল গাছের ডালে। বুলবুলিটা চুপ করে একটা ডালে বসেছিল। মাঝি নৌকো থেকে পাত্রে করে জল সেঁচে বার করছিল। অপেক্ষামান মেয়ে যাত্রীরা ঘাটে দাঁড়িয়ে পুরুষ যাত্রীদের উদ্দেশ্যে গালি দিচ্ছিল। তাদের সঙ্গে খেয়া পার হওয়া নিয়ে উঁচু গলায় মহিলা যাত্রীদের মধ্যে দুটি দল হয়ে গেল। এক দল অন্য দলের সঙ্গে ঝগড়া সুরু কর দিল। কোথাও বা একজনের সঙ্গে অন্য জনের বচসা হচ্ছিল। নৌকোর পুরুষযাত্রীরা তাদের কলহ উপভোগ করছিল। তাদের ভিতর একজনেরই কোন প্রতিক্রিয়া নেই। রাধা লক্ষ্য করল, গলুইতে কুণ্ডুলি পাকিয়ে একটা লোক জড়সড় হয়ে দুই হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে চুপ করে বসে আছে। আপাদমস্তক তার শরীরটা একটা ময়লা কাপড়ে মোড়া। ঠাণ্ডা বাতাসে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে। লোকটাকে দেখে রাধার ভীষণ কষ্ট হল, সেই সঙ্গে কিছু মায়া ও করুণাও হল।

বেলা বাড়ার সঙ্গে বচসাও বাড়ল। অবশেষে পুরুষ আরোহীদের কেউ কেউ নেমে গেল। কেবল কুণ্ডলী পাকানো লোকটা রয়ে গেল। মাঝিদের কেউ অসুস্থ ভেবেই মেয়েযাত্রীরা একে একে নৌকোয়

উঠল। ইদানীং নদীতে এক নতুন উৎপাত আরম্ভ হয়েছে। নৌকো পারাপারিতে মেয়েদের নিরাপত্তা কমেছে। খেয়া নৌকো মাঝ গাঙে গেলে যাত্রীদের ভেতর থেকে হঠাৎ কয়েকজন হামলাকারী পুরুষ নিরীহ পুরুষ যাত্রীদের নদীতে ঠেলে দিয়ে নারীদের বস্ত্র, অলংকার, অর্থ সব কেড়ে নেয়। তাদের শরীর নিয়ে টানাটানি করে। সুন্দরী রমণী হলে তো আর রক্ষে নেই। বলপূর্বক নৌকোতেই তার ইজ্জত নষ্ট করতে সরমে বাঁধে না। তাই মেয়েরা দলবদ্ধভাবে সতর্ক এবং সাবধান হয়ে চলাফেরা করে।

ষোল বছরের আগের ঘটনা সমস্ত চেহারা নিয়ে রাধার সম্মুখ হাজির হল।

আকাশে মেঘ খুব ঘন হয়ে এল। দিনের আলো নিঃশেষে নিঙরে নিল কালো মেঘ। নৌকার অস্তিত্ব যমুনার রঙের সঙ্গে এক হয়ে মিশল। দিগন্তের গাছপালা, তীর সব কুয়াশামাখানো অন্ধকারের ভেতর হারিয়ে গেল। আকাশ থমথম করছিল। কিন্তু নদীতে অশান্ত অস্থিরতা। নৌকোর যাত্রীরা নীরব। সকলের চোখেমুখেই উৎকর্ণ ভয় আর আশঙ্কা। নোঙর তুলে মাঝি নৌকোটা স্রোতের মুখে যেই ঠেলে দিল, অমনি পুরুষযাত্রীরা লাফিয়ে নৌকোয় উঠল। চেঁচামেচি, হৈ-হৈ পড়ে গেল নৌকোর মধ্যে। তখন তারা কাকুতি মিনতি করে অভয় দিয়ে বলল: আমরাও মানুষ, চিন্তার কিছু নেই, ভয় পাওয়ারও কোন কারণ নেই। আমাদের ঘরেও বৌ আছে। তোমাদের সকলেরই স্বামী আছে। তবু, ভয় কেন এত?

উজান স্রোতে খেয়া নৌকো মৃদুমন্দ গতিতে ভেসে চলল। পুরুষগুলোর লুব্ধ দুটি চোখ চব্বিশ বছরের রাধার ভরা যৌবনের রূপ দেখছিল। তাব নিটোল সুঠাম দেহকান্তি, উন্নত বক্ষের দিকে তাদের দৃষ্টি আঠার মত লেগে রইল। রাধার বুকের ধক্‌ধকানিটা শুরু হল এসময়। অন্যদিকে সে চোখ ফেরাল। তবু তার সমস্ত অনুভূতির মধ্যে টের পাচ্ছিল তাদের লোভাতুর চাহনি।

ঘাটে যেসব মেয়েরা পুরুষ যাত্রীদের সঙ্গে একসাথে খেয়াপার হওয়া নিয়ে অন্য মেয়েদের সঙ্গে কলহ করেছিল, তারা কিন্তু পুরুষ আরোহীদের সঙ্গে বেশ ভাব করে ফেলল। অল্প সময়ে ভেতর হাসিঠাট্টায় বেশ জমে গেল। কিন্তু তাদের গল্পগুজব, হাসি সব ছিল প্রাণহীন। প্রত্যেকের চোখেমুখে একটা ভয় এবং আতঙ্ক মাখামাখি ছিল। ঐ মেয়েগুলোর দেখাদেখি আর আর মেয়েরাও ভয় এড়ানোর জন্যই যেন ওদের মধ্যে ভিড়ে গেল। হাসি ঠাট্টায় পুরুষদের মজিয়ে রেখে বিপদ এড়ানোর কৌশল নারীর চিরপুরাতন খেলা। এভাবেই বেশিরভাগ মেয়ে পুরুষকে বোকা বানিয়ে জেতার চেষ্টা করে। কিন্তু তারা বোঝে না নিজেদের সস্তা করার রন্ধ্র পথ ধরেই বিপদ আসে অতর্কিতে।

রাধার বুকে ভয় জমে বরফ হয়। বিপদের গন্ধ পাচ্ছিল বাতাসে। শান্ত নিস্তব্ধ প্রকৃতিলোকে নদীতে, পাহাড়ে, দিগন্তলীন অরণ্যে, বিপদের হাতছানি প্রত্যক্ষ করে বার বার শিউরে উঠছিল সে। ভয় থেকে মুক্তি চাইতে গিয়ে এক অদৃশ্য বন্ধনে তার সহযাত্রীরা জড়িয়ে পড়ল। কেবল রাধাই নির্বিকার। প্রকৃতি তাকে এক অদৃশ্য বিপদ সম্বন্ধে সচেতন করল যেন। মনের আবরণ খুলে কৃষ্ণ তাকে চিনতে শিখিয়েছিল গাছ, বন, লতাপাতা, ফুল, জঙ্গল, আকাশ, নক্ষত্র এবং এই পৃথিবীকে যারা সুন্দর করে, মধুর করে, কুৎসিত করে তাদেরও। মেঘে ঢাকা এই কালো আকাশ, নিভু নিভু দিনের আলো যে ভয় দিয়ে একটু একটু করে ঢেকে দিচ্ছিল তা থেকে পালানোর কোন উপায় পৃথিবীরও ছিল না। উৎকণ্ঠা, ভয়, ভাবনায়, অস্থিরতায়, যন্ত্রণায় এবং দারুণ অসহায়তায় নদীর তরঙ্গ যেন বিচলিত। ঢলানি মেয়েব মতো ঢেউর গায়ে পড়ে নৌকা যেন বিপদ রুখছে। কিন্তু এতো মুক্তি নয়, বিপদের সবচেয়ে বড় বন্ধন। এসব ক্ষেত্রে সাহস আর দৃঢ়তার বিকল্প নেই। কিন্তু মেয়েগুলো সহজ স্বাভাবিক পথ ছেড়ে অসংযত আর অশান্ত হয়ে উঠার ফলেই বিপদটা প্রধান হয়ে উঠল। ওরা যদি তাদের উপেক্ষার আবিল দৃষ্টিতে দেখত, অবহেলা, উপেক্ষা করার সাহস দেখাতে পারত তাহলে পুরুষ আরোহীরা সংযত থাকত। তাদের বুকে ভয় থাকত। কিন্তু মেয়েগুলো শরীরের মধ্যে লুকিয়ে থাকা ভয়ের বাঁধনে এমন করে নিজেদের জড়াল যে দড়ির বন্ধনে তাদের সমস্ত সত্তা যেন ফুলে ফুলে লাল হয়ে উঠল। তাদের মুখের ত্বকেও লাল আভা ফুটল। নিজ নিজ মনের কারাগারে যে, তারা রুদ্ধ হয়ে পড়েছিল একথাটা তারা না বুঝলেও রাধা বুঝেছিল। কৃষ্ণের কথা মনে পড়ল: বিপদের সময় নিজেকে খুব চালাক ভেবে সহজে কিস্তি মাত করে যারা জয়

আদায় করতে চায় তারা রসাতলে যায়, জীবনের অন্ধকার গুহায় নির্বাসিত হয়। এদের আকাশ ছোট। অনুভূতির বৃত্ত সংকীর্ণ। এরা নিরুপায়। একেবারেই নিরুপায়। মানুষের জীবনে এরাই সবচেয়ে বড় কারাগার তৈরী করে। লোভের কারাগার, স্বার্থের কারাগারে এরা থাকে বন্দী। আর, যাদের আবেগ, স্বাভাবিকতা চালিত করে তারাই কেবল উছলে উছলে দৌড়ে যেতে পারে এই জীবনের পথ বেয়ে। তারা ঝর্ণার মত মুক্ত, সমুদ্রের মত দুরন্ত, আকাশের মত বিশাল। তারাই মুক্তি, তারাই সুখ, তারাই সত্য। রাধা, তুমি আমার—সেই নিঃসীম নীল অম্বরের মত।

সহসা পুরুষের কণ্ঠস্বর রাধা কানের খুব কাছে শুনল। সুন্দরী তুমি নীরব কেন? এমন বিষণ্ণ দেখাচ্ছে কেন তোমায়?

রাধার শরীরটা শিউরে ওঠল। তন্ময়তা কেটে গেল। চমকে তাকাল। ভয়ে গলা দিয়ে স্বর বেরোল না। কেমন অসহায় কাতর দৃষ্টিতে মিশকালো লোকটার দিকে একবার তাকিয়ে চোখ নামিয়ে নিল। মুখ নীচু করল। দুই হাঁটুর ওপর চিবুক রেখে খুব সতর্ক এবং উৎকর্ণ হয়ে বসে থাকল। তার কম্পমান শরীরের মধ্যে বিদ্যুতের শিহরণ খেলে গেল। বুক থেকে ঝড়ের মত পর পর কয়েকটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল।

মিশকালো লোকটা রাধার পিঠ স্পর্শ করে ফিস্ ফিস করে বলল: সুন্দরী তোমার কোন তুলনা নেই। মথুরা খুঁজলে তোমার মত রমণী একটিও মিলবে না। আগুনের মতন তোমার রঙ, চোখা চোখ, খাসা মুখ, টিকল নাক, জোড়া ভুরু। বিল্বফলের মত যুগল বক্ষের ঐ অপরূপ শোভার নয়নাভিরাম দৃশ্য দেখলে চোখ জুড়োয়। মনটা প্রাপ্তিতে টৈ-টাম্বুর হয়ে যায়।

রাধার শরীরের ভেতর দিয়ে একটা আগুনের হল্কা বয়ে গেল। ছিলাছেঁড়া ধনুকের মত দেহটা টান টান হয়ে দাঁড়ল। ইচ্ছে করল প্রচণ্ড একটা থাপ্পড় মেরে লোকটাকে শিক্ষা দেয়। কিন্তু মাঝ গাঙে নৌকোয় দাঁড়িয়ে সেই দুঃসাহস দেখাতে পারল না। জ্বালা ধরানো ভীষণ ক্রোধটা বুকের ভেতর পুষে রেখে সে একটু সরে দাঁড়াল। লোকটিকে কোন আমল দিল না। তার দিকে ফিরেও তাকাল না।

লোকটা কিন্তু তাতে দমল না। রাধার গালে ছোট্ট একটা টোকা দিয়ে বলল: মাইরী কী নরম। ননীর মত। আহা ননী দিয়ে তৈরী শরীর। কোমলতা যেন চুঁইয়ে পড়ছে গায়।

অপমানে লজ্জায় রাধার দুচোখে আগুন জ্বলল। সে আগুনে একটা তীব্র, রাগ, প্রচণ্ড অসহায়তা এবং অভিমান ছিল। একটু ভেঙে পড়ার ব্যাপার ছিল না। কোষমুক্ত কৃপাণের মত দৃঢ়তায় জ্বলজ্বল্ করছিল। দুপাশের চোয়ালের হাড় তার শক্ত হল। শরীরের কোষে কোষে তার টাটানি। রাধার রূপান্তর দেখে লোকটি কয়েক মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়াল। প্রতিরোধের দৃঢ়তায় তাকে প্রাণপ্রতিষ্ঠিত প্রতিমার মত দুর্জয় লাগছিল।

নৌকোর অন্য প্রান্তে কোলাহল, কান্নাকাটি সুরু হয়ে গেছে। খুব অসহায়ভাবে কাকুতি-মিনতি করছে তাবা। অনেকক্ষণ ধরে যে আনন্দে মশগুল ছিল তারা, নিমিষে তা ছাই হয়ে গেল। লোকগুলো দস্যুর মত ভয়ংকর বর্বর আর হিংস্র হয়ে ওঠল। মাঝিরা চুপ করে ছিল ভয়ে। কোন দিকে না তাকিয়ে হাল ধরে নৌকো সামলাচ্ছিল।

লোকটি দুঃসাহস দেখানোর আগেই রাধা দুর্জয় সাহসে তাকে প্রচণ্ড এক চপেটাঘাত করল। লোকটা বেসামাল হয়ে নদীতে পড়ে গেল। এরকম একটা অদ্ভুত মারের মুখে পুরুষযাত্রীরা হক্‌চকিয়ে গেল। থমকে দাঁড়াল। আশ্চর্য হয়ে তারা যখন রাধার স্পর্ধাকে দেখছিল ঠিক তখনই ঘটে গেল এক আশ্চর্য ঘটনা। গলুইতে চাদর মুড়ি দিয়ে বসে থাকা লোকটা হঠাৎ গায়ের চাদরটা লোকগুলোর মুখের ওপর ছুঁড়ে দিয়ে তেড়ে গেল তাদের দিকে। নৌকোটা বীরপদভারে ভীষণভাবে দুলে উঠল। উচ্ছল তরঙ্গের দোলায় নৌকো এমনি টলমল করছিল, হঠাৎ সেই দোলায় বেসামাল হয়ে পড়ল মেয়েযাত্রীরা। ভাল করে কারো কিছু বোঝার আগে বেমালুম মার সুরু হয়ে গেল তাদের ওপর। দস্যুরা প্রতি-আক্রমণ রচনা করার আগেই ধরাশায়ী হল। কারো কারো মুখ দিয়ে ঝলকে ঝলকে রক্ত পড়তে লাগল। কেউ বা সংজ্ঞা হারাল। গোটা দৃশ্যটা স্বপ্নের মত ঘটে গেল নৌকোয়। চোখ

দুটিতে তখনও আতঙ্ক, ভয় মাখামাখি। এক অদ্ভুত মুগ্ধতা, কৃতজ্ঞতা, বিস্ময় নিয়ে যখন মহিলারা চিনতে পারল কৃষ্ণই তাদের রক্ষাকর্তা তখন নিমেষেই স্বস্তিতে জ্বলজ্বল্ করে উঠল তাদের চোখের মনি। বৃন্দে কৃতজ্ঞতামাখা অস্ফুটস্বরে বলল: ভাগ্যিস তুমি ছিলে কৃষ্ণ।

কৃষ্ণ হাসিমুখ করে বলল: কেমন করে বুঝলে? বৃন্দাবনের বয়স্করা বলে কেলে ছোঁড়া।

কৃষ্ণের কথা শুনে কারো হাসি পেল না। এক গভীর তীব্র দুঃস্বপ্নের সঙ্গে মিশে গেল তাদের প্রত্যেকের অন্তরের এক গভীর ভালবাসা। তাই, কারো মুখে কোন সামান্য কথাও এল না। দুপুরবেলার স্থলপদ্মের মত তাকিয়ে আছে তারা। এমনকি রাধাও। রাধার সারা শরীর শিরশির করে উঠল। মানুষের অনেক অনুভূতি তার শরীরে ঘুমিয়ে থাকে। চোখের চাউনিতে তার আশীর্বাদ ঝরে পড়ে। বিশাখার গলায় শান্ত স্নিগ্ধ ভালবাসার করুণাধারা। কথা বলার সময় বুকের ভেতরটা তার আলোর আভায় ভরে গেছে। আস্তে আস্তে বলল: কালো? তোমায় কালো ছোঁড়া বলে গাঁয়ের লোক!

বৃন্দে মুগ্ধ দুটি আঁখি পেতে রাখল কৃষ্ণের চোখের ওপর। অভিভূত গলায় বলল:

তা সে যতই কালো হোক,
দেখেছি তার কালো হরিণ চোখ।

—কিন্তু তুমি কোথা থেকে এলে? এমন যে ঘটতে পারে তুমি কি জানতে? কেমন করে তুমি টের পাও কৃষ্ণ? বাতাস কি তোমার সঙ্গে কথা বলে?

কৃষ্ণ শুধু হাসে। তার হাসিতে মুক্তো ঝরে। নম্র সে হাসি সব কিছুকে মেনে নেওয়ার এক নীরব প্রশান্তিতে স্নিগ্ধ আর মধুর।

ললিতা অবাক বিস্ময়ে কৃষ্ণের দিকে মুগ্ধ চোখে চেয়েছিল অনেকক্ষণ। রঙ্গ করে বলল: রসের নাগর। তোমার ঐ কালারূপে কি জাদু আছে, জানি না, বাপু? যে দেখে সেই মজে। রাধা শুধু কুল মজাল না, গোটা বৃন্দাবনের রমণীকুলকেও মজিয়ে ছাড়ল।

কুটিলা ভর্ৎসনা করে বলল: ছিঃ ছিঃ! কি লজ্জা। সত্যিই অধঃপতন হয়েছে তোর কানাই। বৃন্দাবনে কাউকে মানিস না। তোর কাজের কৈফিয়ৎ চাওয়ার মানুষ নেই। নিজের খুশিতে যা খুশি করিস। মেয়েমানুষ নিয়ে ছিনিমিনি খেলাই তোর কাজ। বেঁচে থাকতে হলে সব কিছু একটু লুকিয়ে চুকিয়ে করতে হয়। সমাজ-সংসারকে তুই মানিস বা না মানিস কিন্তু সে তো আছে এবং থাকবেও।

সপ্রতিভ কৃষ্ণ উত্তরে বলল: ঠিক বলেছ মাসী। কিন্তু পচা গলা, মরা একটা প্রথাবদ্ধ জীবনের জীর্ণ কারাগারে নিজেকে বন্দী রেখে পরকালের কোন সাধনধামে পৌঁছাবে? অসহায়ভাবে মানুষের এইভাবে ডুবে মরাটাও চোখে দেখতে পারি না। সারা দেশে আজ ভাবের বন্যা বইয়ে দিতে হবে। মানুষকে প্রেমে, ভালবাসায়, সৌভ্রাত্রে, বন্ধুত্বে, মাতিয়ে তুলতে হবে। মুক্তি। সর্বস্তরে সেই মুক্তি আনবে মথুরার ছেলে মেয়েরা হাতে হাত মিলিয়ে। তুমিও।

ভুরু কুঁচকে কুটিলা জিগ্যেস করল: তার মানে? কি বলছ তুমি?

নৌকোশুদ্ধ রমণীর কৃষ্ণের কথা শোনার জন্য উৎকর্ণ হয়ে রইল। কৃষ্ণের মুখে অনির্বচনীয় হাসির ছটা। বলল: মেয়ে হয়ে জন্মেছ বলে, পুরুষের চেয়ে কোন্ দিক দিয়ে তোমরা কম? মেয়েমানুষের রক্তের রঙ, পুরুষের রক্তের রং কি এক নয়? ক্ষুধা, তৃষ্ণা, অনুভূতি, উপলব্ধি, ব্যথা, বেদনা, দুঃখ, হাহাকার, যন্ত্রণা, কষ্ট মেয়ে বলে কি তার আলাদা? তোমরা মেয়েরা ইচ্ছে করেই পরাধীনতা ভালবাস। তোমরা চাও একজন কেউ তোমাদের ওপর জুলুম করুক, জোর করুক, দাবি খাটাক, তোমাদের চালাক, পরাধীন করে রাখুক। অধীনতার এই গ্লানিতে তোমাদের মনপ্রাণ আচ্ছন্ন। এ থেকে মনটাকে মুক্ত করে গণ্ডীর বাইরে যেতে চাওনা। বৃহৎ জীবনকে দেখতে চাওনা, চিনতে চাওনা। ইচ্ছে করেই নিজের ছোট্ট খুপরির মধ্যে জীবনটাকে কাটিয়ে দিতে চাও। কিন্তু কেউ যদি গণ্ডীর বাইরে বেরোতে যায় অমনি অক্টোপাশের মত চারদিক থেকে তোমরা সমাজ, সংসার, সংস্কার,

বিশ্বাস, ধর্ম নিয়ে হৈ-হৈ করে ঝাঁপিয়ে পড়। গেল, গেল বলে চিৎকার জুড়ে দাও। কিন্তু কি হারাল, কি থাকল, কি পেল, আর তার জন্য সংসার, সমাজ ধর্ম কতখানি বদলে গেল, তার হিসাব করলে না কখনও। আক্রমণের ব্যাপারে তোমরা মহিলারা বড় বেশী সচেতন আর নিষ্ঠুর। পুরুষের মত হাতহাতি কর না, কিন্তু মনের অভ্যন্তরে যে চাবুক হান তার জ্বালার দাহ নিদারুণ। সংঘর্ষে জিততে তোমরা কলঙ্ককে, কুৎসাকে, মিথ্যাকে দুর্নামকে অস্ত্র করে তোল। বিবেকহীন, বিচারহীন, মনুষ্যত্বহীন অশালীন আচার আচরণ হল তোমাদের জেতার কৌশল। গৃহযুদ্ধে তোমরা সকলেই বীরঙ্গনা। কিন্তু রণনীতির কারণে শক্তির অপচয় আর বুদ্ধির বাজে খরচ হয়। এটুকুই যা তফাৎ পুরুষের সঙ্গে। যুদ্ধের সামনা-সামনি হলে তোমাদের রক্ত যেমন চন্ চন্ করে ওঠে, তেমনি পুরুষেরও করে। তা-হলে পুরুষের সঙ্গে নারীর ধর্ম, স্বভাব এবং প্রকৃতির পার্থক্য কোথায়? পুরুষ নারী মিলে এই পৃথিবীর স্রষ্টা। বিধাতার সৃষ্টিশালায় নারী সৃষ্টিছাড়া হয়ে থাকবে কেন? সৃষ্টির শরীরকে শরিকানা থেকে বঞ্চিত করার অধিকার বিধাতাও মানুষকে দেয়নি। নারী দৈহিক বলে পুরুষের চেয়ে হীনবল হলেও অনেক ব্যাপারে পুরুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। তার ধৈর্য স্থৈর্যের কোন তুলনা নেই। পুরুষ বেপরোয়া অসংযমী, স্বেচ্ছাচারী। সে সমুদ্রের ঝড়ের মত। সে ভাঙতে পারে, ধবংস করতে পারে, কিন্তু নারী তাকে আগলাতে পারে, গড়তে পারে। স্নেহ, মমতা, সেবা, করুণা, মায়া দিয়ে মহাশ্মশানের বুকে স্বর্গ রচনা করে নারীই। ক্রোধ পুরুষের রিপু, স্থৈর্য নারীর শক্তি। এটাই হল নারীর যুদ্ধে জেতার অন্যতম চাবি। পুরুষ শক্তির সঙ্গে নারীর শক্তির সমন্বয় হওয়া বড় দরকার। আমার চোখে পুরুষ ও নারীর কোন দ্বৈতসত্তা নেই। তারা দুজনে মিলে একজন। তাই তো মথুরার মুক্তিযজ্ঞে যুগ্ম ঋত্বিক পুরুষ ও নারী।

কুটিলা হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল। এসব কথা কতখানি সে বুঝল বোঝা গেল না, কিন্তু চোখেমুখে একটা প্রবল মুগ্ধতার ভাব সঞ্চারিত হল। শুধু কুটিলার নয়, নৌকোর মহিলা যাত্রীদের মনকে বিশ্বাসকে এমন করে কৃষ্ণ নিঙরে নিল যে আকাশের বিদ্যুৎ চমকানোর মতই তারা বুঝল এ মিথ্যে ভাণ নয় কৃষ্ণের। এ সত্যিই তার ভালবাসা থেকে উৎসারিত জীবন সত্য। তার মধ্যে যদি ভণ্ডামি, মিথ্যে ছলনা থাকত তাহলে এমন করে মর্মের গভীরে কখনো দাগ কেটে বসত না।

গাঢ় গভীর নিশ্বাসের সঙ্গে ভেসে এল রাধার কণ্ঠস্বর। কী ভাল যে লাগছে আমার। বলেই কৃষ্ণের খুব কাছে এসে দাঁড়াল। পায়ের তলায় নৌকো টলে যেতে রাধা কৃষ্ণকে ধরে টাল সামলাল। তাতেই ওর চুলের গন্ধে, দেহের ঘ্রাণে কি যেন হয়ে গেল রাধার। মাথার মধ্যে হঠাৎ সব কি যেন ঘটে গেল। চাপ চাপ সবুজ কোমল কচি ঘাসে মুখ ডুবিয়ে চিতল হরিণী যেমন গন্ধ নেয়, তেমন কৃষ্ণের কালো পিঠে কয়েকটা মুহূর্তে মুখ ডুবিয়ে রাধা যেন তার দেহের, যৌবনের সব সৌরভটুকু নিঃশেষে টেনে নিচ্ছিল। কৃষ্ণের শরীরের মধ্যে যে এতসব অসামান্য আনন্দের উৎস লুকোনো ছিল তার আকস্মিক নিবিড় সান্নিধ্যটুকু না পেলে বোধহয় জানা হত না। মানব-মানবীর এই আশ্চর্য শরীরে দহন আর প্রলেপ বোধহয় এমন নিঃশর্তভাবেই নিহিত আছে। বিয়ের পর আয়ানের সঙ্গে এক বিছানায় শুয়েছে, শরীরে শরীরে ছুঁয়ে গেছে আচমকা কিন্তু এ ধরনের কোন হর্ষকর অনুভূতি বোধহয় জাগেনি। শরীরের গভীরে অস্ফুট এক গভীর সুখের শব্দ ওঠছে।

কয়েক মুহূর্তের বিভ্রম। তারপরেই ফিস্ ফিস্ গলায় বলল: তোমার আদর্শের জন্য, সত্যের জন্য না হয়, আমি দুঃখই বইব। জীবনকে সুন্দর করার যে মহৎ আকাঙ্ক্ষা তোমার অন্তরে থরে থরে সাজানো তার জন্য আমি সব করতে পারি। আমি তোমার অনন্ত বাসনায় অমৃত প্রেমশিখা হয়ে থাকব তোমার সকল আকাঙ্ক্ষায়। এতকাল যা পারেনি দিতে, আমি তাই দিলাম তোমায়। আমার সর্বস্ব তুমি নাও-হে পরাণ বঁধু।

নদীতে তখন ঝড় ওঠেছে। শনশন করে বায়ু বইছে স্রোতের ধাক্কায় নৌকো দুলছে। প্রমত্ত ঝড়ের ভেতর কুটিলার ধিক্কার যেন ভেঙে খান খান হয়ে গেল। ছিঃ বৌমণি মেয়ে মানুষের লাজ-লজ্জাটুকু তোর ভেতর আর নেই। এক নৌকো লোকের মধ্যে বেহায়া হতে তোর শরমে লাগল না? তুই মানুষ? ছিঃ। দেবতার মত আমার অমন দাদাও তোর কিছু নয়।

কুটিলার কথা কৃষ্ণের কানে গেল না। বিস্ময়ে আনন্দে চমৎকারিত্বে তার দুই চোখ ঝক্ঝক্ করে উঠল। বুকের ভেতরটায় অশান্ত ঝড়ের উতলাভাব। বিস্ময়ে চমকে বলল: রাধা!

খুশীতে কৃষ্ণের ভেতরটা কি যেন দাপিয়ে বেড়াল অনেকক্ষণ। ঝকঝকে দুই চোখে তার আনন্দের দ্যুতি। আবেগে মাতাল করে অন্তঃকরণ। উত্তেজিত চাপা আনন্দে তার কণ্ঠে স্নিগ্ধ সিক্ততা সঞ্চার হল। বলল: রাধা! মনের কথা বুঝিয়ে বলি এমন মনের অবস্থা আমার নয়। মনে হচ্ছে, এই আকাশ বাতাস, নদী, বন-উপবন, পৃথিবী সব আমার। আমিই এর অধীশ্বর। আমি ইচ্ছে করলেই এই বিশাল পৃথিবীর সবকিছু জয় করতে পারি। আমার ভেতর কোথা থেকে কুল-ভাসানো এই জোয়ার এল? রাধা তুমি আমার বুকের ভেতর প্রমত্ত ঝড়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছ? হালের শাসন যেমন নৌকো মানতে চাইছে না, তেমনি আমার বুক টাটাচ্ছে। সব বাঁধ ভেঙে যাচ্ছে, আকাঙ্ক্ষাগুলো তরল আগুনের স্রোতের মত শিরায় শিরায় বয়ে যাচ্ছে। ভাললাগার মত্ততা প্রতি কোষে যে এত উল্লাস ও যাতনা দিতে পারে তা তো জানা ছিল না। রাধা তোমাকে না পেলে নিজের ভেতর লুকোনো অন্য এক বিশ্বকে কোনকালে টের পেতাম না।

রাধা কথা বলে না। মৃদু মৃদু হাসে। তার দুই চোখ আবেশে আচ্ছন্ন। চোখের ভাষায় কথা বলে ভালবাসি, ভালবাসি। মুগ্ধ অথচ বিচলিত কৃষ্ণের কণ্ঠস্বরও স্খলিত, শিথিল অসাড়তায় ডুবে গিয়েছিল। বলল: রাধা, তুমি কে জানি না? চিরদিন মনে মনে আমি যেমনটা চেয়ে এসেছি কে যেন ঠিক তেমনটাই আমার জন্যে করে রাখে। তুমি আমার একটা বিরাট কাজকে এক কুল থেকে অন্যকুলে নিয়ে যাওয়ার ভেলা। তুমিই অজান্তে আমার মোহন বাঁশীতে সুর ভরে দাও।

ঝড়ের সঙ্গে বৃষ্টি এলো ধেয়ে। বৃষ্টি কখনো মুষলধারে কখনো কিঞ্চিৎ মৃদু, সেই সঙ্গে ঝড়ো বাতাস। বৃষ্টির সঙ্গে হাত ধরাধরি করে মাতামাতি করে, তরঙ্গের সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ে নৌকোর গায়। রাধার মনে হল, যেন দীর্ঘ তপ্ত গ্রীষ্মের পর বৃষ্টি নামল। ভাললাগে কৃষ্ণের এই উজ্জ্বল যৌবন রূপের মাধুরী দেখতে। ভালো লাগল ভরন্ত কলসের মত ভরে উঠতে। মুগ্ধ অভিভূত রাধার মুখ দিয়ে একটি কথাও উচ্চারণ হল না। অনির্বচনীয় মহিমময় এক সুখের মধ্যে সে হারিয়ে যাচ্ছিল। মগ্ন সুখের অভিব্যক্তিহীন এক অচৈতন্য ঘোরে আচ্ছন্ন হয়ে গিয়ে সে মনে মনে বলেছিল: আঃ কি ভাল লাগছে। কী ভীষণ ভাল লাগছে তোমাকে কৃষ্ণ। রাধার ইচ্ছে করছিল বলতে, কৃষ্ণ তোমার আলিঙ্গনের মধ্যে আমাকে ডুবিয়ে দাও। বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে একটু আদর কর। চুম্বনে চুম্বনে ভরিয়ে দাও অধর যুগল।

কিন্তু এসব কিছুই বলতে পারল না রাধা। প্রায় নিশ্বাস বন্ধ করে কৃষ্ণের দিকে মুগ্ধ নয়নে তাকিয়ে রইল। চোখের কোণে আকর্ণ কাজলের মত রেখাটি তার কেমন স্বপ্নালু হয়ে ওঠল। তার সমস্ত অভিব্যক্তির মধ্যে ছিল আত্মদানের থর থর আকাঙ্ক্ষা।

কিন্তু সেই মধুর আবেশটুকু ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল কুটিলার তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বরে। চোখমুখ তার তীব্র ধিক্কারে ঝলকে ওঠল এবং তার ভাষা বদলে গেল।

কৃষ্ণের দিকে তাকিয়ে সে তার নির্লজ্জ আবেশকে তিরস্কার করে বলল: ছিঃ ছিঃ লজ্জাসরমের মাথা খেয়েছিস। এদের পাপ, পৃথিবীও বইতে পারছে না। তাই প্রকৃতি জুড়ে ঝড়ের তান্ডব। দুর্যোগের ঘনঘটা। বিধাতা তোদের ব্যাভিচার ক্ষমা করতে পারছে না বলে নদীতে এত ঢেউ। জীবন বাঁচানো দায়।

রাধা ও কৃষ্ণের মুগ্ধ মুহূর্তের ঘোর কেটে গেল কুটিলার তীক্ষ্ণ বিদ্ধ সন্দেহে। বাস্তবসচেতন হল কৃষ্ণ। রাধা রীতিমত অপ্রস্তুত হল। কেমন যেন অপরাধীর মত দেখাল তাকে। তার সেই ভাব কাটিয়ে তোলার জন্যে কৃষ্ণের দিকে তাকাল। কৃষ্ণের গম্ভীর মুখে হঠাৎ হাসি ফুটল। অপমানের করুণ হাসি সে নয়। পাপজনিত ক্ষমা প্রার্থনাও ছিল না সে হাসিতে। কৃষ্ণের মুখে যে অনির্বচনীয় সুন্দর হাসি লেগে থাকে এ হল সুধা ঝরানো হাসি। এ হাসি দূরে সরিয়ে দেয় না, খুব কাছেও টেনে নেয় না, অথচ একটা গভীর আকর্ষণ অনুভূত হয়। এ হাসি অদ্ভুত সুন্দর। একটু প্রগলভতা ছুঁয়ে থাকে। বলল: কুটিলা মাসি, তোমার কথা শুনে আমি হেসে মরে যাই। তোমার পাগলামির

কি জবাব দেব বলত? তুমি মুখে বলছ পাপ করছি আমরা, কিন্তু পাপবোধের জন্যে তো কোন অনুশোচনা, দুঃখ নেই মনে। এতগুলো লোকের মাঝে দাঁড়িয়ে লজ্জাসরম জলাঞ্জলি দেয়ার মত কোন কাজ করেছি, বল? রাধা তার দেশের মানুষের জন্য ভালবাসা নিবেদন করেছে। আমার আদর্শকে, পথকে ভালবেসে যদি নিজেকে উৎসর্গ করে থাকে, তাতে অপরাধ কোথায়? আমি যদি তাকে শ্রদ্ধা করি, ভালবাসি, হৃদয় নিবেদন করি — তাতে ভালবাসা পাপ কেন হবে? ভালবাসা দিয়েছে কে আমাদের? ভালবাসাই প্রকৃতি, ভালবাসাই ধর্ম, ভালবাসার আর এক নাম ঈশ্বর। এর মধ্যে মিথ্যে কিছু নেই, অন্যায়ও নেই। জীবনের ধর্ম। জীবের ধর্ম। তাহলে তুমি কেন একে পাপ চোখে দেখছ? এমন শান্ত স্নিগ্ধ পবিত্র ভালবাসতে কজন জানে? তোমাদের মত রাধাও মেয়ে। তথাপি তোমাদের দুজনের জগৎ কত আলাদা? তার ভালবাসা, বিশ্বাস, স্বাধীনতা অনেকটা বন, নদী, পাহাড়, মাটি আকাশ তারাকে যেমন করে মানুষ ভালবেসেছে শিশুকাল থেকে অনেকটা সেরকমই। কিন্তু পরাধীনতায়, হীনতায়, নীচতায় তোমার মনপ্রাণ এত সংকীর্ণ ও আচ্ছন্ন যে স্বশক্তির স্বরূপকে তুমি জান না। স্বাধীনতাবোধ না জাগলে চিত্তের বোধন হয় না। স্বাধীনতা মানে নিজেকে বেশি করে বিশ্বাস করতে শেখা, নিজেকে মর্যাদা দেওয়া, নিজের শক্তির উপর ভরসা করার অনুভূতি, উপলব্ধির শিক্ষায় নিজেকে নতুন করে গড়া। তোমার মধ্যে সে বোধ নেই বলে তোমার ক্ষয় হচ্ছে প্রতিদিন, কিন্তু কোন ক্ষতিপূরণ হচ্ছে না।

কুটিলা কোন জবাব দিল না। কেবল একটা গভীর গম্ভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে ক্ষিপ্ত নদীর দিকে চেয়ে বসে রইল।

মহিষকালো আকাশে বাজ-ডাকা বিজলীর হানাহানি। মাটি উপড়ানো বাতাসের নিরন্তর শাসানো, দাপানো, ঝাপটানো ক্রমেই প্রবল হতে লাগল। এমন শন্ শন্ দুরন্ত বাতাসের গতিতে নৌকো তীরে নিয়ে আসাই দায় হয়ে উঠল। প্রাণভয়ে তখন সকলে বিচলিত। ঝোড়ো বাতাস বৃষ্টিকে সঙ্গী করে খোলা নৌকোর বুকে এমনি মাতামাতি, নাচানাচি সুরু করল যে নৌকো প্রচণ্ডভাবে দুলতে লাগল। মাঝে মাঝে ঝড়ে নৌকোর মাথা ঘুরে গেল, কখনও স্রোতের ঝাপ্টায় নৌকো ছিটকে গেল। কখনও বা বাতাসে নৌকো একপাশ কাত হয়ে গেল। মুহূর্তে বেশ খানিকটা জল চল্‌কে ঢুকে গেল নৌকোর ভেতরে। টাল সামলাতে না পেরে রাধা মুখ থুবড়ে পড়ল নদীতে। মহাত্রাসে আর্তচিৎকার করে ওঠল। বিদ্যুৎ ঝিলিক দিল আকাশে। ভয়ংকর আর্তস্বরে মহিষকালো মেঘ ডেকে উঠল। দুরন্ত বাতাসও হায় হায় করে ওঠল।

নিমেষের মধ্যে নদীতে ঝাঁপ দিল কৃষ্ণ। প্রাণভয়ে রাধা সমস্ত শক্তিকে একত্রিত করে কৃষ্ণকে দুহাতে আঁকড়ে ধরল। বাতাসের গোঙানির মধ্যে বিপন্ন রাধার অসহায় কান্না চাপা পড়ে গেল। বৃষ্টিতে তার চোখের জল ধুয়ে গেল। নদীর ক্ষিপ্ত স্রোতের টানে বসন খুলে গেল। লজ্জা ভেসে গেল। নিস্তেজ শরীর প্রাণহীনের মত পরম নিশ্চিন্তে, আর আরামে কৃষ্ণের বুকের ওপর পড়ে রইল। কৃষ্ণকে জড়িয়ে ধরার বাহুর বাঁধনও তার শিথিল হয়ে গিয়েছিল। তার মাথার চুলে ঢেকে গিয়েছিল কৃষ্ণের মুখ, ওষ্ঠ, চোখ। কেমন একটা ঘোরে লাগা আচ্ছন্নতার ভেতর রাধা কৃষ্ণের বুকের ওপর ভাসতে লাগল।

রাধা যখন পঁচিশ বছর বয়সের কথা ভাবছিল, তখন ঐ বিশেষ বছরের কখন কোন ঘটনা কিভাবে ঘটেছে, কোন্‌টা আগে অথবা পরে তার সঠিক সময় তার অনুভূতির ভেতর নেই। অনুভূতিতে সন, তারিখ, বার, সকাল, সন্ধ্যা কিছুই থাকে না। বিপুল ব্যাপ্তি নিয়ে সে তো তার কালের সীমাকে অতিক্রম করে যায়।

এক অদ্ভুত সুখের আনন্দে তার মন আচ্ছন্ন হয়েছিল। সারাটা পথ একা যেতে যেতে তার মনে হল :

হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে।
পরাণ পীরিতি মোর থির নাহি বান্ধে।

আনন্দের হৃৎস্পন্দনে সে কাঁপছিল ক্ষণে ক্ষণে। বিপুল খুশীর এই রেশটুকু, তার কিছুতে শেষ হতে চাইছিল না। আবার এই সুখটুকুকে ও কিছু দিয়ে মাপতেও পারছিল না। সময় দিয়েও নয়। আবার, এর বেদনা যেন ফুরোয় না। স্বপ্নে স্মৃতির মতন মনকে ভরিয়ে রাখে বাসনায়। রাধা একা পথে যেতে যেতে তরুলতা, বনকে তার ভাললাগার কথা শোনাল। বলল : ওগো তরুলতা-বন, ওগো আকাশ, নদী, বাতাস শোন, এ আমার কি হল? আমার সমস্ত শরীরে লেগে আছে কৃষ্ণর নবনীর মত শরীরের স্নিগ্ধ সিক্ততা। ভাললাগার এক অনাবিল আনন্দ ভরন্ত কলসের মত আমার তনু মন প্রাণকে কানায় কানায় ভরে দিচ্ছে। আমার শরীরের ভেতর পুজোর ঘণ্টা বাজছে। আঃ কি যে ভাল লাগছে। আমার অঙ্গে অঙ্গে এ কোন্ সমুদ্রের ঢেউ? নিঃশ্বাসে কার শরীরের গন্ধ লেগে আছে? এ আমার হল কি? মনে হচ্ছে :

লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়া রাখিনু
তবু হিয়া জুড়ন না গেল।

—এই চির অতৃপ্ত কথাটা ভেবে তার চোখে জল ভরে গেল। বৃষ্টি পড়ছিল। কিন্তু হাওয়া ছিল না। প্রকৃতির এই ছটফটানিহীন, শান্ত, ধীর স্থির ভাবটি ভাল লাগল রাধার। নিজের মনের আবরণ খুলে দেখল নিজেকে। আয়ান তাকে চিনতে শিখিয়েছিল। সে মর্তের কেউ নয়। স্বর্গভ্রষ্টা কোন দেবী। আর কৃষ্ণ বৈকুণ্ঠের নারায়ণ। বৈকুণ্ঠপতি বিরহ সইতে পারে না, তাই মর্তভূমিতে তিনিও এসেছেন কৃষ্ণরূপে। কৃষ্ণের শরীরের মধ্যে একাত্ম হয়ে গিয়ে সে এই প্রথম অনুভব করল :

মনে পড়ে কত না দিন রাতি
আমি ছিলেম তোমার খেলার সাথী।

কণ্ঠস্বর সহসা থেমে গেল তার। ঠাণ্ডা হাওয়ায় তার ভিজে শরীর ঠকঠক করে কাঁপছিল। ঘরের কাছাকাছি হতে সম্বিৎ ফিরে পেল। কান ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগল। শরীরের ভেতর যে এত লজ্জা লুকনো থাকে জানা ছিল না তার। নিজের দিকে তাকাতেই লজ্জা করছিল। শায়া কাঁচুলি ছাড়া কিছু ছিল না অঙ্গে। এভাবে ঘরে ফেরাই দায় হল। কী যে করবে ভেবে পেল না। নারীর সব লজ্জা শাড়ীর একটা আশ্চর্য প্রলেপে যে এমন করে ঢাকা থাকে, আগে অনুভব করার সুযোগ হয়নি। খুব ভয়ে ভয়ে আঙিনায় পা রাখল।

সঙ্গে সঙ্গে শাশুড়ী জটিলা তার পথ আগলে দাঁড়াল। রাধাকে দেখে চমকে ওঠল লজ্জায়। ঘেন্নায় ভিতরটা ছিঃ ছিঃ করে উঠল। দরজার কপাটে পিঠ দিয়ে দাঁড়াল। বলল : বৌমা! জটিলার ভুরু কুঁচকে গেল। চোখ দুটো বিস্ময়ে, ক্রোধে ছোট হয়ে গেল। গলায় উত্তাপ ঢেলে বলল : ছিঃ ঠিক করে বল, কি হয়েছে?

রাধা শরমে বিব্রত। কাঁপা গলায় বলল : জানি না মা।

জান না? ন্যাকা—

বিশ্বাস করুন, গল্প মনে হবে। প্রচণ্ড ঝড়ে নৌকো গেল উল্টে। আমি নদীতে পড়ে গেলাম। মৃত্যুভয়ে ভয়ার্ত স্বরে ডাকলাম, হে ঈশ্বর, তুমি যদি সত্যি থাক সতী রাধাকে বাঁচাও। বাঁচাও। ঈশ্বর কোথায় ছিলেন জানি না। ভয়ার্ত সতী নারীর ডাক শুনে বিচলিত নারায়ণ বোধ হয় একটা তমালের গুঁড়ি ভাসিয়ে দিলেন জলে। ডুবে যেতে যেতে দেখলাম, একটা কাঠের কি ভেসে আসছে আমার দিকে। মরিয়া হয়ে প্রাণপণে আঁকড়ে ধরলাম সেটাকে। তারপর, মূর্ছা গেলাম। জ্ঞান হলে দেখি নদীর ধারে পড়ে আছি। কিন্তু সে তমালের কাষ্ঠখণ্ডটি নেই।

করুণায় মমতায় জটিলার প্রাণটা শিউরে উঠল। গলার স্বরে তার বিস্ময়। সে কি? বড় বাঁচা বেঁচে গেছিস আজ। কিন্তু তোর ননদিনী কুটিলা কোথায়?

কিছুই জানি না।

জটিলার বড় একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল। ভেজা গলায় বলল : এখন মেয়েটার কপালে যে কি আছে ঈশ্বর জানেন। যতক্ষণ না তাকে চোখে দেখছি ততক্ষণ মন শান্ত হবে না — জটিলা ভয়ে

চোখ বুজল। বুকের ভেতর থেকে গুরগুর করে একটা কান্না তার গলার কাছে এসে দলা পাকিয়ে রইল।

রাধা কেমন হয়ে গেল। তার এই চল্লিশ বছর জীবনে সবশুদ্ধ সে মাত্র পাঁচ কি ছয় বছরের মত সত্যিকারে বেঁচে ছিল। বাদবাকি দিনগুলি ছিল শুধু পুনরাবৃত্তি মাত্র। কৃষ্ণের সঙ্গে দিনগুলিই ছিল তার জীবনের এক অনাবিষ্কৃত স্মরণীয় অধ্যায়। পৃথিবীর মত সে ঘুরছে না। সূর্যের মত মনের ভেতর স্থির হয়ে আছে। কৃষ্ণ মথুরা ছেড়ে চলে যাওয়ার পর আর তাকে নিয়ে ভাবেনি। একটা বড় আঘাত অনেক গর্বের ঘটনাকে অনুযোগহীনভাবে চিরতরে মস্তিষ্ক থেকে বিদায় দিয়েছে। কিছু কিছু সময় এবং মুহূর্ত আসে সকলের জীবনে যখন হারানো প্রিয়জনের কথা ভাবতে একেবারেই ইচ্ছে করে না। দুঃখ আর কষ্ট তাতে শুধু বাড়ে বলেই বোধহয় মন থেকে তাকে ছুটি দেয়। নিদারুণ অভিমানেই জোর করে ভুলে থাকা। কৃষ্ণ চলে যাওয়ার পর পনেরোটা বছরের সে তার অতীতের মধ্যে প্রবেশ করেনি। সব ভুলে গিয়ে সে সংসারে মন দিয়েছিল। কিন্তু আজ হঠাৎ মধ্যরাতের বাঁশীর সেই সুর তার সব গোলমাল করে দিল। হারানো পনেরো বছর আগের জীবনের ভেতর আবার সে অনুপ্রবেশ করল, সেই আনন্দ, সেই বেদনা, প্রশ্ন ঠিক তেমন তেমন করে তার মনে আসছে।

যমুনায় কৃষ্ণ রাধার শরীরটা বুকে নিয়ে ভাসতে ভাসতে ডাঙায় ওঠল। সেই থেকে কি যেন হয়ে গেল। কৃষ্ণের শরীরের দপদপানি তার শরীরের মধ্যে অনুভব করল। মানব-মানবীর এই আশ্চর্য শরীরের স্পন্দন সুখানুভূতি বোধহয় সকলের মধ্যে একইভাবে নিহিত আছে। বিয়ের পর আয়ানের সঙ্গে তার কোন দেহ সংসর্গ হয়নি, কিন্তু দেহে কামের প্রবল যাতনা, চোখের তৃষ্ণা যে কি, সে টের পেত। কিন্তু এরকম কোন অনুভূতি তার হয়নি। মানুষের শরীরের ভিতরেই কত কি অনুভব করার আছে প্রতিটি মুহূর্ত এবং ঘটনার মধ্যে। কিন্তু তার ভিতর এই অস্থিরতা যন্ত্রণা কি শরীরের না মনের? শরীর এবং মনের কষ্ট, যাতনাতো দেহের ভিতরেই প্রকাশ পায়। তাহলে এই অদ্ভুত অনুভূতির উৎস কোথায়? নিজের ভিতরের রহস্যকে তার খুব জানতে ইচ্ছে করছিল। সত্যিই, সে কি ভ্রষ্টা? কুলটা? নষ্টা?

কত অপ্রয়োজনীয় অপ্রাসঙ্গিক কথা রাধার মাথায় ভীড় করেছিল। চেতনার চারিদিকে আতসবাজির উৎক্ষিপ্ত কণার মত তারা ছিটকে যাচ্ছিল। শুয়ে শুয়ে রাধা দেখতে পাচ্ছিল ঘরের ছাদের কড়ি। দুপুরের রোদ রঙীন মেঝেতে পড়ে কাঁপা আলোতে উদ্ভাসিত করে তুলেছিল ঘরের ভেতরটা।

আয়ানের হঠাৎ চোখ পড়ল রাধার উপর। ইদানীং তাকে সব সময় বড় বিমর্ষ আর চিন্তান্বিত দেখে। দুপুরে প্রায়ই শুয়ে থাকে, আর একরাশ উদাস চোখ নিয়ে সে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকে। আয়ান খুব আশ্চর্য হয়। রাধার জন্য তার ভীষণ কষ্ট হয়। আস্তে আস্তে বলল : আজকাল তোমাকে খুব গম্ভীর দেখি। দুর্যোগের স্মৃতিটা বোধহয় ভুলতে পারছ না। একথা মনে রেখ, মানুষ নিজেই তার দুঃখ-যন্ত্রণার স্রষ্টা। অথচ, সে একটু চেষ্টা করলেই সুস্থ শরীর আর সুস্থ মন নিয়ে কি দারুণভাবে বাঁচতে পারে। সংস্কার, বিশ্বাসের যন্ত্রণা নিয়ে দুহাতে ছিনিমিনি খেলে জীবনকে ফুরিয়ে ফেলা যায়, কিন্তু তাতে ফয়সালা হয় না কিছু। জীবন বাঁচার জন্য খরচের খাতায় লিখে তাকে নষ্ট করলে, মনের সুখ কি জোটে? একটাই তো জীবন। যৌবনও তাই। ঐ একটামাত্র জীবনে যে ঘটনাই ঘটুক তার ভেতরেও দারুণ-ভাবে বেঁচে থাকা যায়। জীবন তো আর ছোট নয়। অনেক বড়। কত কি পড়ে আছে তার সামনে।

আয়ানের কথা শুনে রাধা অবাক হয়েছিল। আয়ান কি অন্তর্যামী? কান্না আর হাসির মাঝামাঝি এক রকমের অদ্ভুত অনুভূতিতে ভেসে গিয়ে সে আয়ানের বুকের উপর মাথা রাখল। বলল : আমার ব্যথাটা যে অন্য জায়গায়। তোমাকে আমার সে লজ্জার কথা বলতে পারছি না। কোন নারী স্বামী ছাড়া অন্যকে শরীর দিতে চায় না, দিতে ইচ্ছাও করে না। কিন্তু আমার সব লাজলজ্জা

যে কৃষ্ণকে কখন দিয়েছি, নিজেও জানি না। আয়ানের অধরে স্নিগ্ধ হাসির বিজুরী। বলল : শরীরের বহিরঙ্গে নারী পুরুষ কেবল আলাদা। কিন্তু অন্তরঙ্গে তাদের রক্তের রঙ এক। হৃৎপিণ্ডের গঠন, শব্দ সব একই। কোষ এবং ধমনীতেও আলাদা কিছু নেই। অনুভূতি, উপলব্ধি, জীবনধর্মেও তারা এক। ভাব ভালবাসাতেও তাদের পার্থক্য নেই। কেবল লৈঙ্গের একটা দেওয়াল সৃষ্টি করে নারী-পুরুষের সম্পর্কটুকুও আলাদা করা হয়েছে। উভয়ের সুস্থ মেলামেশার পথকে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এর ফলে, নারী ও পুরুষ যেন দুটি পৃথক মানবগোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছে। পরস্পরের মধ্যে রেষারেষি আর মন কষাকষি ভাব তীব্র হয়েছে। কৃষ্ণ এই দেওয়ালটাকে ভেঙে ফেলতে চাইছে। মানুষী সত্তার যুগলরূপ তো নরনারী। যুগলরূপেই নারী ও পুরুষ একটি সম্পূর্ণ মানুষ। শুধু পুরুষ, শুধু নারী মানুষের খণ্ডিত সত্তা। দুটির আত্মার মিলনেই মানুষ পৃথিবীতে স্বর্গ রচনা করতে পারে। কিন্তু এতকাল ধরে এর উল্টো কথাটাই ভেবে এসেছি আমরা। নারী পুরুষ পৃথিবীর দুই মেরুতে অবস্থিত। সুমেরু এবং কুমেরুর মত চিরদিনই তারা একা। কিন্তু একথা সত্য নয়। বরং দুই মেরুর মাঝের পৃথিবীতে জীবনের যত কলগীতি। কৃষ্ণ সেই মানব-মানবীকে নিয়ে লৈঙ্গের দেয়ালটা ভেঙে এক বসন্তোৎসব করবে শীঘ্র। কৃষ্ণ আর তুমি যে সেই যুগলরূপের প্রতীক। বিধাতা তাই তোমাদের স্বর্গভ্রষ্টা করেছেন রাধা। রাধা-কৃষ্ণকে না পেলে এত বড় জীবনসত্যটা কোনকালে জানা হত না।

যত দিন যায়, রাধা তবু সংকোচ বোধ করে। প্রেমের অমৃতকে ছাপিয়ে ভয়ের বিষ তার সমস্ত শরীরে সঞ্চারিত হয়। মথুরার হাটে যাওয়া সে ছেড়ে দিল। বাইরে বেরোন বন্ধ করল।

এদিকে তার অদর্শনে কৃষ্ণ উতলা, চঞ্চল, অস্থির, ধৈর্যহারা। ললিতা বিশাখাকে পাঠাল রাধার সংবাদ আনতে। কৃষ্ণের ব্যাকুলতার কথা শুনে রাধা অবাক হল না মোটে। জ্বালাধরা চোখে বিশাখা ললিতার মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তার বুকের ভেতরটা থর থর করে কেঁপে গেল। অনেকক্ষণ পর্যন্ত সে কোন কথা বলতে পারল না। কেমন একটা বিহ্বলতায় সে আচ্ছন্ন অভিভূত হয়ে থাকল।

বিশাখা ললিতা দুজনে তার খুব কাছাকাছি বসে আছে। নীরব অন্ধকার মাখানো আকাশ তাদের ঘিরে আছে। সামনে তাদের নিথর সরোবর। সময়ের মত স্তব্ধ, তরল। সরোবরের জলেতে তাদের ছায়া দীর্ঘাকৃত। চারদিক নিস্তব্ধ। এক আশ্চর্য প্রশান্তির মধ্যে ডুবে আছে চরাচর। কিন্তু রাধাই কেবল অশান্ত। সরোবরের জলের মত থির থির করে কাঁপছে তার অন্তঃকরণ, তার আশা এবং কামনা।

রাধা চুপ করেছিল। বিধুর হয়ে গিয়েছিল তার দৃষ্টি। কথা বলতে গিয়ে গলা কাঁপল। সম্মোহিতের মত বলল : কৃষ্ণের চেয়ে সাত বছরের বড় আমি। তবু তার সঙ্গে প্রেম হয়ে গেল। প্রেম তো কখনও ইচ্ছে করে হয় না। মনের ভেতর থেকে সে আসে। যখন তা ঘটে তখন দোষগুণের প্রশ্ন থাকে না। প্রেমের বয়স নেই। তবু তো পরস্ত্রী আমি। কিন্তু সেজন্য কোন অনুশোচনা কিংবা পাপবোধ আমার নেই। থাকবে কেন? ভালবাসার কোন পাপ হয় না। কৃষ্ণ ছাড়া আমার কি আছে আর? কৃষ্ণ এখন আমার ধ্যান, জ্ঞান, জপ-তপ, মন্ত্র-সাধন সব। ওকে ছেড়ে থাকা আমার খুব কঠিন। একদিকে সমাজ, অন্যদিকে আমার ভালবাসা। এ দুয়ের মধ্যে যে সামঞ্জস্য থাকা দরকার তাতো একমাত্র বিয়ে ছাড়া হয় না। কিন্তু ওকথা আমার মনেও আসে না। আর বিয়ে আমাদের হবেও না। বিয়ে মানে তো শরীরের মালিকানা। শরীরের মধ্যে কিছু নেই। কোষে কোষে ক্ষুধা, তৃষ্ণা জাগানো আছে। বাইরে থেকে অবশ্য মনে হয়, শরীরটাই বুঝি সব। শরীরটাকেই বুঝি ভালবাসি। কিন্তু না। বিশ্বাস কর বিশাখা আমি কৃষ্ণকে খুঁজছি, কৃষ্ণের আত্মাকেও খুঁজছি। কৃষ্ণ তো তার শরীরেই আছে। আর যে কৃষ্ণকে চোখে দেখা যায় না, ছোঁয়া যায় না, অথচ যার অস্তিত্ব সমস্ত অনুভূতির গায়ে বিন্দু বিন্দু আলোর মত স্পন্দিত হতে থাকে। সেই দেহের অতীত কৃষ্ণের সত্তাকে, আমি পাই কৃষ্ণের সান্নিধ্যে থেকে, তাকে স্পর্শ করে এবং কল্পনা করে। এই গভীর অনুভূতি আর উপলব্ধির কথা ঠিক বোঝানোর নয়। কৃষ্ণের বাঁশীর সুরের মধ্যে যেমন তার অস্তিত্বের খবর ভেসে আসে ঠিক সেরকম করে কৃষ্ণ আমার মনোময়। মনের তো আর শরীর নেই।

বিশাখা ললিতা কোন কথা বলল না। চুপ করে বসে রইল। তাদের দীর্ঘশ্বাস ফেলতে দেখে

কিছুক্ষণ পরে রাধা বলল : বিশাখা তুই কথা বলছিস না কেন? আমার দিকে ভাল করে তাকাচ্ছিস না কেন? ললিতা অমনি মুখ নীচু করে আছিস কেন? তোর মধ্যে সেই নির্ভীক নিপুণা রসিকা রমণী কোথায় গেল? আজ তোদের দুজনের দশা দেখে আমার আমি আর স্থির থাকতে পারছি না। সত্যি করে বল, কৃষ্ণ তোদের কি বলেছে? আমি কথা দিচ্ছি কৃষ্ণকে বিপদে ফেলব না। ওর কথার অবাধ্যও হব না।

রাধার প্রতিশ্রুতিতে বিশাখার আশঙ্কা ধুয়ে-মুছে গেল এক মুহূর্তে। তারপর বলল : মথুরার হাটে যাওয়ার পথে খেয়া নৌকোয় জলদস্যুদের উৎপাত বন্ধ হয়েছে। যুবকদের অস্থিরতা কেটেছে। তাদের মতি-গতি ফিরেছে। তারা এখন কৃষ্ণপ্রাণ। কৃষ্ণের বিশ্বস্ত সৈনিক সব। চতুর্দিকে তাদের কড়া নজর। পথে পথে বিপদের আশঙ্কা এবং ভয় দূর হয়েছে। তবু, তুই মথুরার হাটে যাস না কেন? বেচারা কৃষ্ণ তোকে দেখার জন্য আকুল। রোজ মাঝি সেজে খেয়া নৌকোর দাঁড় বায়। এদিক-ওদিক তাকায়। আর দীর্ঘশ্বাস ফেলে। তোকে একটু চোখের দেখা দেখতে পেলেই কৃষ্ণ ধন্য হয়ে যায়। সে শুধু বলে "চোখের লাগিয়া তিয়াসা যাহার সে আঁখি আমার হোক।"

রাধার দুই আঁখি বেদনায় টলমল করতে লাগল। দীর্ঘশ্বাসে বুকের হাহাকার মর্মরিত হল। কণ্ঠস্বর স্খলিত! ভেজা। বলল : শরীরের আনন্দ পেতে আমি চাই না কৃষ্ণকে। সখী তোর কথা শুনে মনে হচ্ছে, কৃষ্ণ আমার ইচ্ছে পূরণ করতে শরীরের দরজা বন্ধ করে মনের দরজা হাট্ করে খুলে দিয়ে গেল। কিন্তু — কিন্তু আমার বলতে খুব লজ্জা করছে, কে যে কার কাছে অসহায়ের মত হেরে যায় তা যদি আগে থেকে জানত তা হলে এমন ভয় করত না। সত্যিই বলছি, চন্দ্রাবলীর মত নারী তার সখী। একথা ভাবতেও আমার কষ্ট হয়। কৃষ্ণকে, আমায় ভুলে যেতে বল। সেই হবে আমার প্রতি তার ভালবাসার সবচেয়ে বড় প্রমাণ।

ললিতা স্তব্ধ বিস্ময়ে রাধার দিকে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। সুতীব্র একটা কষ্টে দুঃখে, রাগে তার মুখখানা গন্‌গন্ করতে লাগল। খুব কষ্টে নিজের হৃদয়াবেগ দমন করল। চোখ বন্ধ করে শান্ত অথচ দৃঢ়স্বরে বলল : না! এ তোর মিথ্যে নারীসুলভ অভিমান, আর অবিশ্বাস। এর পেছনে কোন যুক্তি নেই। তার বাল্যের স্বপ্ন, প্রথম যৌবনের সব অবুঝ অনাবিল পবিত্র ভালবাসা দিয়ে সে তোকে মনের মধ্যে প্রতিদিন তৈরি করেছে। তোকে নিয়ে অনেক স্বপ্ন। তুই তার সাধনার ধন। সাত রাজার এক মানিক। তোকে ফেলে কাঁচকে হীরে ভেবে খুঁটোয় বাঁধার ছেলে সে নয়। তুই তার শক্তি, ভরসা-সব। মথুরার অচল অনড় রথের রশি তোর হাতের ছোঁয়া না পেলে বহুকালের জং ধরা চাকা তার ঘুরবে না। ঘুরবে না এক পাকও।

রাধার স্তব্ধতার দিকে তাকিয়ে বুক কেঁপে উঠল বিশাখার। বিব্রত ভয়ে বলল। সে সব কথা ভাল করে বোঝাই এমন বিদ্যে বুদ্ধি আমার নেই। কাল থেকে আবার হাটের পথে আয়। কৃষ্ণ সরল করে তোকে বুঝিয়ে দেবে সব। তোকে ছাড়া আমরাও বড় নিরানন্দ বোধ করি রে। কাল আবার এক সঙ্গে বেরোব, ছুটব, হাসব, গান গাইব; যমুনায় জল ছিটোব মনের আনন্দে। কি মজা হবে বলত? আর মনের নাগরের সঙ্গেও চোখাচোখি হবে। চোখের দেখায় তা দোষ নেই। চোখের দেখার অনন্ত সুখে তোর হৃদয়ে ভরে উঠবে।

রাধা উদাস চোখে সরোবরের কাজলকালো জলের দিকে তাকিয়ে রইল। অশ্বত্থ গাছের চারা তির্ তির্ করে কাঁপছিল জলে। জননীর স্নেহের মত অশ্বত্থের ছায়া জড়িয়েছিল সরোবরকে। চারদিকে কি নীরব প্রগাঢ় শান্তি। রাধা অন্তরের মধ্যে অনুভব করল তার আবাল্যের কৃষ্ণকে। সন্ধ্যাতারার নরম নীলাভ দ্যুতিতে, কিশোরীর অপাপবিদ্ধ চোখের উৎসুক চাউনিতে, ললিতা বিশাখার রঙ্গ-রসিকতায়, যশোদার বাৎসল্যে, গোষ্ঠবিহারে দৌড়ে যাওয়ায় গাভীকুলের উড়াল ছন্দে, কুটিলার নিষ্ঠুর ঈর্ষায়, বৃন্দাবনের অগণিত মানুষের সরল শ্রদ্ধা ভক্তিতে।

সেদিনই রাতে ঘটল এক অদ্ভুত ঘটনা। রাত তখন নিশুতি। কেবল রাধার চোখে ঘুম নেই। যমুনার কূলে কদমতলায় বসে কে যেন চিত্তের হরিষে বাঁশী বাজাচ্ছিল। ঐ বাঁশীর সুরে তার সব কিছু এলোমেলো হয়ে গেল। ভাল লাগল না শয্যা, গৃহের আকর্ষণ মিথ্যে হয়ে গেল। বুকের

ভেতর কেমন একটা উথলে ওঠা ভাব। রাধার মন অশান্ত হল। সে আর চুপ করে বসে থাকতে পারল না। তার সব যুক্তি তর্ক মিথ্যে হয়ে গেল।

চুপি চুপি শয্যা ছেড়ে উঠল। পায়ের নূপুর কটিভূষণ সব খুলে রাখল। পরে নিল আঁধার রাতের সঙ্গে মিশিয়ে একটা গাঢ় নীল রঙের শাড়ি। তারপর অতি সন্তর্পণে গুটি গুটি পায়ে মাটি মাড়িয়ে বেরিয়ে পড়ল পথে।

বাঁশীর শব্দ অনুসরণ করে রাধা নিঃশঙ্কচিত্তে বনের মধ্যে দিয়ে পথ করে এগোতে লাগল। কখন রাতের অন্ধকার ফুরিয়ে যায়, সেই ভেবে সে বিচলিত। সমস্ত প্রাণ ছট্‌ফট্ করছে। তাড়াতাড়ি চলতে গিয়ে পদতল তৃণাঙ্কুরে ক্ষতবিক্ষত হল। কখন কণ্টকে জড়িয়ে গেল তার নীলাম্বরী। তবু রাধা নিশিপাওয়া মানুষের মত কেমন আচ্ছন্ন হয়ে আবছা অন্ধকারে ঢাকা বনপথ দিয়ে উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়তে লাগল। বাঁশীর সুরে বিষাদের সুর যেন ক্রমশ গভীরতর হয়ে উঠতে লাগল। রাধার অন্তরটা কেমন ব্যাথাতুর আর স্বপ্নাচ্ছন্ন হল। সেই গভীর ব্যথার উজান ঠেলে তরঙ্গায়িত নদীর মত হয়ে দুরন্ত বেগে ধাবিত হল।

কৃষ্ণ উদাস চোখ দুটো দূরে শেষ রাত্রির আকাশে অস্তমান চাঁদের দিকে ভাসিয়ে দিয়ে নিজের স্বপ্নের মধ্যে বিভোর হয়ে যেমন বাঁশী বাজাচ্ছিল তেমন বাজাতে লাগল।

অভিভূত আচ্ছন্নতার ঘোর কাটিয়ে কৃষ্ণ অবাক চোখে দেখল রাধা উদ্‌ভ্রান্তের মত একজন নিতান্ত দীন অনুগ্রহপ্রার্থীর মত তার দিকে এগিয়ে আসছে। তার দুহাতে ধরা একটা সুন্দর বেলফুলের মালা, আর কিছু কদমফুলের গুচ্ছ। কৃষ্ণ কিছু বলার আগেই রাধা তার গলায় পরিয়ে দিল মালা। কয়েক মুহূর্ত কৃষ্ণের হাসি হাসি গোল মুখখানার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। বুকের ভেতর বেদনার সমুদ্র উথাল পাথাল করে ওঠল যেন। আর পারল না রাধা নিজেকে সংযত রাখতে। ঝড়ো বাতাসের মত কৃষ্ণের বুকের ওপর আছড়ে পড়ে তাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগল। কৃষ্ণের খোলা বুকের ওপর মুখ ঢেকে এক অঝোর কান্নায় ভেঙে পড়ল।

কি আশ্চর্য আর অদ্ভুত একটা অনুভূতিতে কৃষ্ণের সারা শরীর অবশ হয়ে গেল। চাপা গলায় ফিস্ ফিস্ করে ডাকল : রাধা! কী মধুর সেই ডাক। কেমন স্বপ্নাচ্ছন্ন বড় বড় নীল চোখ মেলে তাকাল রাধা। কৃষ্ণের পরণেও নীল আকাশের মত বসন। রাধা কেমন যেন হয়ে গেল। গলা দিয়ে তার স্বর বেরোয় না। গভীর অনুশোচনায় পাথরের মত ভারি হয়ে উঠল রাধার মন। প্রতিমার মত অনিন্দ্যসুন্দর মুখে তার কষ্টের ছাপ। আত্মগ্লানিতে তার অন্তঃকরণ পুড়ছিল। আবেগের বশে যা করেছে ভাল করেনি। ঘরে ফেরার পথ তার বন্ধ হল কি? আস্তে আস্তে বলল : তুমি কেন এমনভাবে পাগল করলে আমাকে? তোমার বাঁশী আমার সব গোলমাল করে দিল। তুমি আমার জীবনের শনি। আজকের এই অবস্থার জন্য তুমি দায়ী। আমি এতই বোকা যে তোমার জন্য আমার সব হারাল আজ।

রাধার সুন্দর বাঁকা যুগল ভুরুর মঝখানে সিঁদুরের টিপ জ্বল্‌জ্বল্ করছিল। কৃষ্ণ দু'হাতে তার মুখটা নিজের মুখের খুব কাছে ধরে স্বপ্নালু চোখে দেখতে লাগল। রাধার চোখের কোণে জল টলটল করছিল। কৃষ্ণ মুগ্ধ স্বরে বলল : রাধা তোমাকে এমন করে কাছে পেয়ে আমার মন যে কি অনির্বচনীয় আনন্দে ভরে গেছে তা বোঝাতে পারব না।

রাধার মুখে চোখে কেমন উদাস অন্যমনস্কতা। কি ভাবছিল সে, কে জানে? কৃষ্ণের মুগ্ধ নয়নকোণ থেকে আঁখি তারা সরিয়ে নিতে পারল না। এই ক্ষণটুকু শুধু চিরকাল হয়ে থাক এই আর্তি আকুল করে তুলেছিল রাধাকে। কৃষ্ণের সান্নিধ্য, স্পর্শ, একটা মৃদু সুগন্ধের মত তার মন ছেয়েছিল।

এক দারুণ মুগ্ধ চমকে কৃষ্ণের মুখ চোখ চক্ চক্ করছিল। স্মিত হেসে বলল : রাধা ভয়, ভীরুতা আর লজ্জা মানুষের জীবনে এক দুরন্ত রিপু। এ শুধু মানুষকে বিচ্ছিন্ন আর একা করে রাখে। প্রতিদিনই সে হারানোর ভয়ে বিব্রত। এমন করে একজন মানুষ কি বাঁচতে পারে? যে হারায় তার মত সুখী আর কে আছে? নতুন করে হারানোর তার কোন ভয় থাকে না আর। তুমি এখন থেকে নিঃশঙ্ক হলে। ক্ষুদ্র স্বার্থ দূর হল। তোমার আর কোন বন্ধন রইল না। তুমি মুক্ত স্বাধীন।

এখন তুমি নিজেকে পূর্ণতর করে মরণনৃত্যে ছন্দ মিলায়ে হৃদয় ডমরু বাজাবে — ভীষণ দুঃখে ডালি ভরে লয়ে জীবন অর্ঘ্য সাজাবে। কথাগুলো বলতে বলতে কৃষ্ণ কেমন ভাবাবিষ্ট হয়ে গেল।

রাধার শরীর ও মন জুড়িয়ে গেল। কি এক পরম প্রাপ্তির অনাবিল সুর ও আনন্দে রাধার ভিতরটা টৈটম্বুর হয়ে গলে। অভিভূত গলায় বলল : এ তো ইচ্ছে করেই আমায় কষ্ট দেওয়া তোমার। আমি জানি সব দিক থেকে এক অসীম শূন্যতা আমাকে ছেয়ে আছে। আমি জানি, আমার স্বামী এমন মানুষ যে, কেউ কোনভাবে তাকে বিভ্রান্ত করতে পারবে না। কিন্তু আমি বিভ্রান্ত হতে পারি। আমার মধ্যে নানারকম দুর্বলতা। আমি নিজের ভেতর একজন প্রহরী বসিয়ে রেখেছি, পাছে না হারাই।

কৃষ্ণের অধরে স্নিগ্ধ হাসি ঝকঝক করতে লাগল। বলল : এখন তুমি হৃদয় পানে চোখ মেলেছ, বাহির পানে চাওনি।

অবচেতনের গভীর থেকে মন্ত্রোচ্চারণের মত অসহায়ে উচ্চারণ করল : তোমার সব কথার মানে বুঝতে পারি না। কিন্তু তোমার কথা শুনলে হৃদয় বিকশিত হয়, মন প্রসারিত হয়ে যায়। মনের ভেতরটা একটা অদ্ভুত আবেগে কম্পমান হয়। সামান্য জিনিস অসামান্য হয়ে উঠে। প্রিয় প্রিয়তর হয়, এমন কি অপ্রিয়ও প্রিয় হয়।

কৃষ্ণের মুখে চোখে এক অদ্ভুত অপার্থিব মুগ্ধতার ভাব নেমে এসেছে কখন। চোখ দুটিতে গভীর সম্মোহন। কৃষ্ণ তার গাঢ় গভীর গলায় বলল : রাধা, এ হল তোমার মুগ্ধ বিশ্বাসের উপলব্ধি। প্রেমের মধ্যে যদি বিশ্বাস হারিয়ে যায় তাহলে রইল কি? সৌন্দর্য ছাড়া সত্যের রূপ যেমন কুৎসিৎ তেমনি বিশ্বাস ছাড়া প্রেমের রূপও ভয়ংকর। এই কথাটা তোমার অদর্শনে আমাকে ভয়ংকরভাবে বিঁধছিল।

ভিতরে এক শিহরিত আনন্দের উজ্জীবক স্পর্শ রাধার চোখ মুখকে উজ্জ্বল করে দিল। মৃদুস্বরে বলল : কিন্তু আমি যে তোমাকে এড়াতে চাই। তোমাকে আমার বড় ভয়। ভয় এই কারণে যে, তুমি এত তীব্রভাবে চাও যে 'না' বলতে বুক ভেঙে যায়। কেন বোঝ না আমার স্বামী আছে।

রাধা বেশ বুঝতে পারছিল কৃষ্ণ কিছু বলতে চায়। তার বুকের ভিতর চিনচিনে ভয় ও শঙ্কা মুখের অভিব্যক্তিতে প্রকাশ পাচ্ছিল। কিন্তু কৃষ্ণকে প্রশ্নের কোন অবকাশ না দিয়েই নিজের মনে বলল : সেজন্য মনে একটা দারুণ লজ্জা আর অভিমান। আমার বুকে সবচেয়ে বেঁধে তার পৌরুষের অভাবটাকে। তার কাছে আমার কোন আড়াল নেই, বাধা নেই। এটাই তো আমার সতীত্বের বড় অপমান। নিজের লজ্জায় নিজেই মরে থাকি। আমার ভেতর নারীর সংস্কার-বিশ্বাস আমাকে দগ্ধ করে, কিন্তু তাতে আমার স্বামী তো উজ্জ্বল হয়ে উঠে না।

কৃষ্ণ স্থির চোখে রাধাকে দেখল। চোখ দুটিতে তার গভীর তন্ময়তা। ধীরে ধীরে বলল : আয়ান মহান।

রাধার বুক থেকে একটা গভীর শ্বাস নামল। আচ্ছন্ন গলায় বলল : স্বামী শুধু মহান নয়, সে কৃষ্ণপ্রাণ। আমার কোন কথাই ভাল করে বুঝতে চায় না। মা যেমন নিজের অলঙ্কার দিয়ে মেয়েকে সাজিয়ে দেয় তেমনি তার মহান প্রেম দিয়ে আমাকে নিবেদন করেছে কৃষ্ণ সেবায়। কিন্তু আমি তো মেয়ে। কেমন করে নিজের ঘরে নিজের সুবিধের জন্য আগুন লাগাই বল। তাই তো সমস্ত চোখ কান মুড়ে রাখলাম, নিজেকে ঘরের ভেতর লুকিয়ে রাখলাম। সম্মান নিয়ে বাঁচতে চাই বলে মথুরার হাটে যাই না। ঘরের বাইরেও বার হই না। তুমি তো চন্দ্রাবলীর প্রেমে মশগুল। আমাকে তোমার কি দরকার?

কৃষ্ণের অধরে বঙ্কিম হাসি। লোকে বলে রাধা তুমি বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মী, আর আমি গোলকপতি। সত্য মিথ্যে জানি না। তাই একদিন আমাদের দেখা হল। মনে হল, কত জন্মজন্মান্তরের সম্পর্ক আমাদের। তারপর, একদিন জীবনের দুর্যোগ এল, প্রকৃতির উন্মাদনা আমাদের ভাসিয়ে নিয়ে গেল এক স্রোতে। তুমি আমি একদেহে লীন হয়ে গেলাম। আমার আমিত্বটুকু তোমাকে দিয়ে যে কখন নিঃস্ব হয়ে গেছি জানি না। তাই বাঁশী শুধু বলে রাধা রাধা। বন, উপবন ব্যাকুল বাঁশীর সুরে আহা, আহা করে দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

রাধার বুকের ভেতর কেমন উথলে উঠার ভাব হল। পুলকে আকুল হল তার সারা অঙ্গ। প্রেম মুগ্ধ গলায় বলল : প্রিয়, তোমার পাগল করা ওই বাঁশীর সুর আমার বুকের দরজায় এসে ঘা মারে, জোরে জোরে কড়া নাড়ে। নিজের সঙ্গে নিজের লুকোচুরি খেলা চলে তখন। কিন্তু যে লুকোচুরি খেলায় পালিয়ে থেকেও ইচ্ছে করে চোরকে ধরা দিতে হয় তখন সে খেলার আর কোন সার্থকতা থাকে? থাকে না। থাকবে কোথা থেকে বল? মনের দরজায় এসে বাঁশী যখন রাধা, রাধা করে ডাকে তখন আমার মন শরীর আর ঠিক রাখতে পারি না। সমস্ত অন্তরটা কেমন কাঙাল হয়ে যায়। ভিখারীর মত দ্বারে দাঁড়িয়ে সে শুধু ভিক্ষে চাইছে। অনবরত চোখের জলে ভেজা নিষ্ঠুরতা দিয়ে কি করে ফিরিয়ে দেই বল?

কৃষ্ণের অধরে বিগলিত হাসির প্রসন্নতা চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ছিল। মধুর গলায় বলল : তোমার আমার এই মধুর মিলন অনন্তকালের। এ মিলনই ছিল নিয়তির বিধান।

ভিতরে এক শিহরিত আনন্দের শিহরণে রাধার চোখ মুখ উজ্জ্বল হল। শ্বাস দ্রুত হল। আস্তে আস্তে বলল : সে তোমাকে মনে রাখেনি।

কার কথা বলছ রাধা?

তোমার চন্দ্রাবলী, কুব্জা —

প্রত্যাশায় ব্যথা লাগার চমকানো বিস্ময়ে উচ্চারণ করল : রাধা! যেমন আকাশের চাঁদের স্নিগ্ধ আলো পড়ে তোমার ঐ ললাট অভিষিক্ত করছে তেমনি আমার প্রেমের পরশে দেশের নারীচিত্তের নবজন্ম হয়েছে। আজ দেশের মুক্তিযুদ্ধে নারীচিত্তের অভিষেক চাই। নইলে, তার রণযাত্রার মাঙ্গল্য পূর্ণ হবে কি করে? বড় জায়গায় এসে জীবনকে যখন বড় করে দেখতে পাবে তখন মনের এই দৌরাত্ম্যের মুক্তি হবে। নিজের ভুল নিজের কাছে ধরা পড়বে। তখনই মুক্তি, পরিপূর্ণ মুক্তি।

এক অপূর্ব আনন্দে রাধার মনে অহংকারের দীপ্তি নিভে গেল। ভিতরে একটা ঝড়ের বেগ তাকে এক মুহূর্তে এক কেন্দ্র থেকে আর এক কেন্দ্রে টেনে নিয়ে গেল।

কৃষ্ণের বুকেও ঘটনার বৃত্তান্ত মোহ সৃষ্টি করছিল। তার সমস্ত সত্তার একমুখী স্রোত দুরন্ত এক গতিতে নিয়ে চলেছে তাকে অন্য এক অপার্থিব অমরলোকে। উজান বাইবার শক্তি তার ছিল না। সে ভেসে যাচ্ছিল এক অমোঘ লক্ষ্যে। নিয়তির নির্দেশে। সহসা ডান হাত বাড়িয়ে কৃষ্ণ আলতোভাবে রাধাকে টানল তার বাম পাশে। পাশাপাশি তারা দাঁড়াল এক অদ্ভুত যুগল-মূর্তিতে। মোহন বেণু কৃষ্ণ ও রাধা একত্রে ধরল দুজনে। পাশাপাশি দুটি শরীর স্থির। চোখে তাদের কি অপরূপ মুগ্ধতা! মুখে পূর্ণতার হাসি।

কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ বিদায় নিতে নিতে থমকে দাঁড়াল! গাছের শাখায় শাখায় পাখিরা কলরব করে ওঠল। অবাক মুগ্ধতা নিয়ে রাতের আকাশ চেয়ে রইল যুগল রূপের দিকে। বিধাতা তাদের নতুন করে সৃষ্টি করল যেন। তাই, লক্ষ লক্ষ তারার চোখ দ্যুতিময় হয়ে উঠল। সমীরণ উতলা হল। বন-উপবন পুজোর প্রদীপের মত অপলক চেয়ে রইল।

রাধা একটা দিব্যশক্তি অনুভব করল তার মধ্যে। সেটা এমন কিছু যা আগে কখনও অনুভব করেনি। অন্তরের মধ্যে হঠাৎ এই যে বিপুল আবেগ সঞ্চার হল, এ জিনিষটা কি? নিজের প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে অনুভব করল, এ যেন তার ভিতর এতকাল ঘুমিয়েছিল। এ তার নিজেরই, সম্পূর্ণ নিজের। তবু মনে হল, এ তার সম্পূর্ণ নিজের নয়, এ তার দেশের। তবে কি দেশের জন্য কৃষ্ণ তারও অভিষেক করল? না হ'লে এমন করে বুকের ভেতর সমস্ত জগতের সঙ্গে তার সম্বন্ধের পরিবর্তনবোধ জাগবে কেন? কেমন যেন হয়ে গেল রাধা। তার শুদ্ধ মন তখন মিলনের আনন্দে থর থর করে কাঁপছে। মুগ্ধ স্বরে বলল : ওগো প্রিয়, প্রিয় আমার তোমার হৃদয়ের পরশমণি ছোঁয়ার আগে বসন্তের আকাশে এত মাধুরী ছিল না। এখন আমার সকল ভালবাসা কৃষ্ণরূপে উঠল হাসি। যখন দেখা দাওনি তুমি। তখন বাজিয়েছিলে তোমার বাঁশী। এখন চোখে চোখে চেয়ে তার সুর যে শুধু কাঁদায় আসি।

সূর্যোদয়ের আগেই রাধা ঘরে ফিরল। কিন্তু স্মৃতিতে বিভোর বিহ্বলতা। কৃষ্ণের কথাগুলো অনুক্ষণ

তার কানে অনুরণিত হতে লাগল। কত অনুযোগ আর অভিযোগ কৃষ্ণের। সে সব কথায় ধমনীর রক্তস্রোত কিছু উদ্দাম হল। নিজের মধ্যে এক বেসামাল ভাব টের পেল। মনটা পাখির মত কেমন পালাই পালাই করতে লাগল।

রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কেমন একটা নিশি পাওয়ার ভাব হল রাধার। প্রত্যেকে যে যার কক্ষে দ্বার রুদ্ধ করে অঘোরে ঘুমুচ্ছিল। কিন্তু রাধার ঘুম এল না। জানলার দিকে তাকিয়ে সংকেতের প্রতীক্ষা করতে লাগল। হঠাৎ অন্ধকারে দীপ জ্বলে নিভে গেল। চুপি চুপি রাধা শয্যা ছেড়ে গৃহের বাইরে বেরোল।

অন্ধকার পথ। নির্জন। লোকের চিহ্ন নেই পথে। চরাচর ঘুমুচ্ছে। কেবল রাতজাগা পাখির ডানা ঝাপ্টার শব্দ শোনা যাচ্ছে মাঝে মাঝে। রাধার কোন ভয় নেই। লক্ষ লক্ষ জোনাকী যেন তার যাত্রা পথে আলো জ্বেলে দিয়েছে। আর সে নিশি পাওয়া মানুষের মত কেমন আচ্ছন্ন হয়ে ঝাপসা অন্ধকার ঢাকা পথ দিয়ে উন্মত্তের মত চলছে। মনের অনেক অনেক নীচে গহন লোকের গূঢ় কথা তো বলে বোঝানো যায় না। রাধাও নিজের এই যাত্রাকে কোন কথা দিয়ে প্রবোধ দিতে পারল না। বুকের ভেতর মহৎ আর জ্যোতির্ময় এক সত্তার অস্তিত্ব অনুভব করল।

অস্পষ্ট এক অন্ধকারে ছায়ামূর্তিকে দেখে রাধা চমকে ওঠেছিল। কিন্তু সে শুধু মুহূর্তের জন্য। কৃষ্ণ ডাকল: রাধা!

কৃষ্ণপক্ষের বাঁকা চাঁদ যেন সদ্য ঘুম থেকে ওঠেছে। রাধার অনিন্দ্যসুন্দর মুখের ওপর পড়েছে তার আলো। কৃষ্ণ বিভোর চোখে দেখল রাধাকে। মাঝখানে মাত্র একটা দিন গেছে। তবু মনে হল যেন, কত দিন, কত মাস, কত বর্ষ পর তারা পরস্পরকে দেখছিল। দুচোখ জুড়ে তাদের তৃষ্ণা। রাধার ঠোঁট কাঁপছিল। দেহের ভেতর চন্‌চন্ করছিল। কৃষ্ণের দুচোখে বিহ্বলতা। হাসি হাসি ভাব। হঠাৎ ঝিরঝিরে বাতাস এল পরীদের মত। ডালে ডালে পড়ে গেল হুড়োহুড়ি। রাশি রাশি ফুলের পাপড়ি খসে পড়ল কদম্বের শাখা থেকে। কৃষ্ণ মুগ্ধস্বরে উচ্চারণ করল: মধু, মধুময় সব।

রাধার তবু মনে হর্ষ জাগে। শিহরিত আনন্দের উজ্জীবক স্পর্শ তার বুকের ভেতর যেন ঢেউ দিয়ে গেল। রাধা কৃষ্ণের বুকের ওপর মাথা রাখল। কৃষ্ণ তাকে দুহাতে নিজের বুকে টেনে নিয়ে বলল: দিনের পর দিন, রাতের পর রাত, আমি যে শুধু তোমার কথা ভাবি রাধা। তুমি যে আমার কে জানি না। তবু তোমার কথা ভাবতে, তোমার স্বপ্ন দেখতে ভাল লাগে।

কেমন একটা লজ্জা, নাড়া দেয় রাধাকে। বাতাসে তার বুকের আঁচল অনেকখানি খুলে গেল। সেদিকে তার খেয়াল রইল না। মুখখানা তার কৃষ্ণের মুখের দিকে অনেকখানি তোলা। চোখের তারায় তার স্বপ্নের ঘুম ভাব। নিশ্বাস বুকের খুব কাছে আটকে থাকে। আস্তে আস্তে বলল: তুমি আমার ধ্যানের দেবতা ওগো। বহু ভাগ্যে তোমাকে পেয়েছি।

রাধার অধর স্পর্শ করার জন্য কৃষ্ণের মুখ নেমে আসে তার মুখের খুব কাছে। কিন্তু রাধা লজ্জাবশত তার মুখখানা সরিয়ে নিল। মৃদু স্বরে ভর্ৎসনা করে বলল: ছিঃ!

বঞ্চনার কষ্টে কৃষ্ণের চোখ ছলছল করে ওঠল। তীব্র অভিমানবোধে বুক তার টাটাচ্ছিল। নিজেকে তার বড় প্রত্যাখ্যাত ও ছোট মনে হল। একটা সুতীব্র অপমানবোধ তার মনে একটা গভীরভাবে বেজেছিল যে চকিত বিদ্ধ ব্যথার সঙ্গে সে তৎক্ষণাৎ হাঁটু গেড়ে বসল রাধার ঠিক পায়ের কাছে। দেবীর সামনে ভক্ত তার অসংখ্য কামনা বাসনা নিবেদনের জন্য যেমন করে বসে অনেকটা সেই ভঙ্গিতে বসল। কাতরকণ্ঠে দীন ভিখারীর মত বলল: রাধা আমায় তুমি করুণা কর। তোমার তো ঐশ্বর্যের, সম্পদের অভাব নেই। প্রকৃতি তার তিল তিল সৌন্দর্য দিয়ে তোমাকে সাজিয়েছে। সাগরের মত তোমার হৃদয় টলটল করছে। আমি যদি তা থেকে এক মুঠো ফেনা নিয়ে যাই, তাহলে সাগর কি রিক্ত হয়ে যাবে? বল, রাধা? বল? হিমাদ্রির শিখরের মত তোমার দুই কুচযুগের মধ্যস্থলে যদি একটু আশ্রয় তাই তাহলে হিমাদ্রি কি কৃপণ হবে? তোমার রক্তিম অধরে চন্দ্রের নির্মল কৌতুক, চকোরের মত যদি সুধাপান করি তহলে কি লাজরক্ত হবে সে? রাধা, কেন বোঝ না, তুমি আমার জীবন। আমার তৃষ্ণা। আমার ইহকাল, পরকাল। তোমার সামান্য করুণা পেলে যার জীবন ধন্য

হয়ে যায়, তাকে অবহেলা করে কেন কষ্ট দাও? তুমি তো কোন কালে নিষ্ঠুর নও?

রাধার অধরে গর্বিত হাসি। চোখে কৌতুক; মুখে মুগ্ধতা। কৃষ্ণের স্তুতি সমস্ত মস্তিষ্কের ভিতর একটি স্ফুরিত ঝংকার হয়ে বেজে যাচ্ছিল। এক উত্তেজিত আচ্ছন্ন চেতনায় সে ত্রস্ত হয়েছিল। কৃষ্ণের প্রশংসায় তার সমস্ত অভিব্যক্তি নিমেষে বদলে গিয়েছিল। শুধু নিজের কাছে ভাললাগা ও লজ্জা একসময় তার মুখের চোখের রূপ বদলে দিল। কেমন একটা খুশি আর গৌরববোধ মনে জাগছিল। কথা বলতে ইচ্ছে করছিল। কোমল নরম লজ্জায় তার সারা মুখখানা রাঙা হয়ে গিয়েছিল। কপট ক্রোধে বলল: দেবতারা সব চেয়ে আছে, গাছেরা, পাহাড়েরা, আকাশ রাত্রি সব চেয়ে চেয়ে দেখছে। এদের সামনে এমন করে ভালবাসা, কাঙালপনা দেখালে কৃষ্ণ নামের গৌরব মহিমা কিছু থাকে? শরীরের মধ্যে সম্পর্ককে টেনে এনে এমন সুন্দর সম্পর্ক নষ্ট করে দিও না। শরীরের মধ্যে কিছু নেই। সত্যি কিছু নেই। এই যে চোখে চোখে চেয়ে থাকা, এই যে শরীর মন আন্দোলিত হচ্ছে, পাওয়ার আকাঙ্ক্ষায় ভেতরটা উন্মাদনায় ভরে যাচ্ছে, হৃদয়টা কী এক নেশায় টৈটম্বুর হচ্ছে, মৃগনাভির মত আকুল করা সুখের গন্ধ শ্বাস-প্রশ্বাসে মাখামাখি হয়ে এক অনির্বচনীয় তৃপ্তি সুখের উল্লাসে কলসের মত মনটা ভরে তুলছে এ কি কম পাওয়া জীবনে! অপমানে, প্রত্যাখ্যানে ক্লিষ্ট হয়ে মনের পায়ে উপুড় হয়ে পড়ে কেঁদে কেঁদে বাচ্চা ছেলের মত সে তার দাবী আদায় করে নেয় ঠিকই; কিন্তু সে যে কত অসহায় দান আর অবহেলার কৃপা, দাক্ষিণ্য, চিন্তা করলে কষ্ট হয়। আমার কৃষ্ণকে ছোট হতে দেব না।

কৃষ্ণের মুখে কথা সরল না। চোখে তার নীরব হাসি। রাধা তার চোখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারল গভীর করে এসব কথা ভাববার সময় পায়নি। রাধা তার বড় সুন্দর, বড় স্বপ্নের আবেগকে ধাক্কা দিয়ে বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে প্রেমের ঘরের দরজা বন্ধ করে দিল। সচেতনতায় ফিরল কৃষ্ণ। মুখে তার অনুশোচনার হাসি। মৃদুকণ্ঠে ডাকল: রাধা, আয়ত্তের মধ্যে যা থাকে তাতে ভোগের অধিকার অবাধ। তার সৌন্দর্যও বোধ হয় লোভী মানুষের অত্যাচার এড়াতে পারে না। তাই সদাই ভয়। আমাদের সীমাবদ্ধ প্রেমে বসন্তোৎসবের তরঙ্গ যখন এসে লাগবে তখন সত্যিকারের তার রূপ কেমন নেবে দেখতে ও জানতেই এই প্রেম প্রেম খেলা তোমার সঙ্গে।

রাধার চোখে বিস্ময়, মু॰ টেপা হাসি। প্রতিবাদ করল না। খুব বড় একটা শ্বাস ফেলে বলল: পুরুষের চোখ-মুখ-চেহারা দেখলে মেয়েরা আগে থাকতে অনেক কিছু টের পায়। উন্মত্ত মতিচ্ছন্ন পুরুষ তা জানতেও পারে না। কিন্তু আশ্চর্য সেই মুহূর্তকে চিনতে কোন মেয়েই ভুল করে না। মেয়েরা সবচেয়ে বেশি জানে স্বপ্নের সুগন্ধ ছড়িয়ে মরণ আসে নিভৃতে। পায়ে পায়ে। তাকে চোখে দেখা যায় না। অজান্তে অজ্ঞাতসারে শরীরের গোপন স্নিগ্ধ সুগন্ধ প্রান্তরের নিভৃতে কুঁড়িগুলিকে ছিঁড়ে কুটি কুটি করে সে নিঃশব্দে সরে পড়ে। স্বপ্নের কুঠরী থেকে ধাক্কা খেয়ে বাইরে ছিটকে পড়ার পর তোমারও সম্বিৎ ফিরেছে। তোমার ব্যাকুল প্রতীক্ষা, বঞ্চনার, কষ্ট, তোমার অস্বাভাবিক কণ্ঠস্বর কখনও মিথ্যে বলবে না। তুমি ধরা পড়ে গিয়েছ বন্ধু। মিথ্যে কতকগুলো কৈফিয়ৎ দিয়ে তুমি আমাকে ছলনা কর না। তোমার মিথ্যে আচরণ আমাকে শুধু কষ্ট দেয়। একবার তুমি সত্যি করে বল এসব তোমার অভিনয়, এগুলো কিছুই সত্য নয়!

কৃষ্ণ একটা বিচ্ছুর হাসি হেসে বলল: তাহলে খুশি-হবে?

হবো। তা-হলে এমন খুশি হব যে, যমুনায় ঝাঁপ দিয়ে প্রাণ জুড়বো।

রাধার কথাশুনে কৃষ্ণ যেমন অবাক হল তেমনি বিপন্ন বোধ করল। কৃষ্ণ কিছুক্ষণ থম ধরে বসে রইল চুপচাপ। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল: রাধা, তোমার সমস্যা একটাই। আমি অভিনয় করছি, মিথ্যে বলছি, শুধু এই স্বীকারোক্তি শুনলেই বোধ করি তোমার সমস্যাটা মিটে যায়! কিন্তু আমার সমস্যা অত সরল নয়। তোমাকে না হলে আমার প্রেম হত মিছে। তোমাকে একা পাওয়ার জন্য ব্যাকুল হৃদয়ে অপেক্ষা করার ভেতর কোন মিথ্যে নেই। সৌন্দর্য আনন্দ, ভোগ-উপভোগ প্রকৃতিরই নিয়ম! সেই নিয়মের ভিতর দিয়ে সংসারী, বিষয়ী, ভোগী, সাধু, সকলে চলছে বলে একটি মানুষও আসলে হয়ে যায় অনেকগুলি মানুষের সমষ্টিমাত্র। আমি যদি এটা বলি, তোমার

সৌন্দর্যে অভিভূত যে প্রাণ মন আমার তোমার দিকে ধেয়ে গিয়েছিল সে আমি নই, তাহলে কি তত্ত্বগতভাবে ভুল হবে? না সময়ের দ্রুতগতিতে এত সব ঘটনা দ্রুত ঘটছে যে চোখ যেমন তা ধরতে পারে না, তেমনি যুক্তিতর্ক দিয়ে তৎক্ষণাৎ তাকে বিশ্লেষণ করা যায় না। রাধা, চেয়ে দ্যাখ, এই নির্জন বনভূমি আকাশ, তারা, অন্ধকার আর কৃষ্ণপক্ষের ম্লান জ্যোৎস্নায় গাছপালা সব একাত্ম হয়ে সূর্যোদয়ের তপস্যা করছে। অমন একাত্ম আর ভেদ জ্ঞান লুপ্ত না হলে তো আমরা কংসের কারাগার ভাঙতে পারব না। সামনের বসন্তোৎসবে তার সূচনা হবে। কিন্তু তার আগে নারী-পুরুষের মেলামেশার ভিতরটা কত দৃঢ় আর নির্ভয় হলে শক্তিকে প্রত্যক্ষ করা যায় সেটাই ছিল আমার জানার ইচ্ছে। নারীর মহাশক্তি আমাদের জাগ্রত করে আর তার মোহ আমাদের বিনাশ করে। কিন্তু তোমার প্রেম মরণ নৃত্যের নুপুর ঝঙ্কার বাজিয়ে তুলেছে আমারা হৃৎপিণ্ডে। মুহূর্তের ভ্রমে যে পরমকে হারাতে বসেছিলাম ঠিক সেই সময় তোমার মন্ত্র উদ্যত হল, তাতে তোমার পূজা ও পূজারী রক্ষা পেল একসঙ্গে। সত্যের কঠোর পরীক্ষায় তাপসরা এমন কত ভুলের মাসুলে যে তারা পথভ্রষ্ট হয়ে, সে কথা ভেবে আমার অন্তঃকরণ শিউরে ওঠছে।

বিস্ময় আর অপরাধবোধে নিথর কৃষ্ণকে শাপগ্রস্ত প্রস্তরীভূত দেবমূর্তির মত লাগছিল। রাধার অধর কোণে এক চিলতে হাসি কৃষ্ণপক্ষের চাঁদের মতই বঙ্কিম, শুভ্র এবং নিষ্পাপ। মৃদু হাস্যে বলল: মানুষ বড় আশ্চর্য। তাকে নিয়ে কি প্রচণ্ড রহস্যই না তৈরী হয়ে আছে। প্রত্যেক মানুষের তো নিজের একটা দায়িত্ব আছে। দায়িত্ব কাউকে শেখানোর জিনিস নয়। দায়িত্ব, কর্তব্য সংযম, বিবেক এসব মানুষের ভেতর থেকে আসে!

ভিতরে ভিতরে চমকে উঠল কৃষ্ণ। কিন্তু যতদুর সম্ভব নির্বিকার থাকতে চেষ্টা করল। অনেকক্ষণ পর কৃষ্ণ যেন স্বপ্নাচ্ছন্নের মত বলল: দ্যাখ, রাধা, একটা সুন্দরী কৌতুহলী কাঠবিড়ালী চেয়ে আছে আমাদের দিকে, কি ভাবছে, কে জানে? কিন্তু বিশ্বাস কর রাধা; আমি তোমার শরীরকে নয় শরীরের ভেতর যে আত্মা আছে তাকেই স্পর্শ করতে চেয়েছি।

তৎক্ষণাৎ শরীরের সব রক্ত যেন হঠাৎই দৌড়ে এল মুখে। রাধা এক তীব্র আনন্দ এবং হঠাৎ আসা একটা তীব্র অপরাধবোধ মিলেমিশে ওর রাঙা হওয়া মুখ যেন পরম প্রার্থনার মত কৃষ্ণের চোখের উপর বিদ্ধ। হঠাৎ কৃষ্ণ রাধার হাত ধরল। শুকনো পাতায় মর্মর তুলে অন্ধকারের ভেতর হাঁটতে লাগল। পথে যেতে যেতে রাধা বলল: কৃষ্ণ আমার এ কি হল? আমি নিজেই জানি না আমি কখন এলাম তোমার কাছে। কেন এলাম, তাও বুঝলাম না। আমায় যেন নিশি পেয়েছে।

না, এ স্বপ্ন নয়, এ সত্য। তোমায় না হলে আমার প্রেম হত মিছে তাই তো আমার এত আনন্দ তোমার'পর। তোমার ভেতর আমি খুঁজে পেয়েছি নিজেকে। আমার প্রেমকে, আমার প্রিয়াকে আমার দেশকে।

অমন করে বল না। আমাকে পাগল করে দিও না। রাত শেষ হয়ে এসেছে। এবার আমাকে ঘরে ফিরতে হবে।

—রাধার চোখে ভয়ের চিহ্নমাত্র নেই। রয়েছে আকুতি সব মিলিয়ে এক পবিত্র সৌন্দর্য।

পনেরো বছর পর বসন্তোৎসবের এই স্মৃতি বুকের মধ্যে তরঙ্গিত হতে লাগল। পনের বছর আগে যা ঘটেছে এখন মনের ভেতর তার বাস্তব অস্তিত্ব অম্লান। কালের ক্ষয়, ধ্বংস কাটিয়ে সে কালজয়ী হয়ে আছে মনের ভেতর। বিস্মৃতিই মৃত্যু। কিন্তু তার সমস্ত সত্তার সঙ্গে যা মিশে আছে তাকে বিস্মৃত হওয়া কি সহজ কথা? স্মৃতি শুধু বেদনার। কষ্ট যতই প্রবল হোক তাকে অন্তরের ভিতর অনুভব করার এক আশ্চর্য সুখ মৃগনাভির গন্ধের মত রাধার সমস্ত চেতনাকে আকুল করে তোলে। মনের ঢাকনা যেন খুলে গেল তার একেবারে। ছায়ামূর্তির মত মূর্তি চোখের সামনে ভেসে ওঠে সমস্ত ব্যাপারটাকেই যেন বাস্তব করে তোলে। কিন্তু অনুভূতির এই প্রত্যক্ষতা কিছুতে সেই ভাষা দিতে পারে না। হয়তো এ ধরণের অভিজ্ঞতাকে ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।

রাত্রি গভীর হয়েছে। নিশাবসানের গাঢ় অন্ধকারে চরাচর আচ্ছন্ন। বাঁশীর সুরে বিষাদের সুর ক্রমশ গভীর হয়ে উঠতে লাগল। তার সত্তাকে যেন মন্ত্রাবিষ্ট করল। সে একটু একটু করে তার স্মৃতির ভেতর ডুবে গেল।

হোলির উৎসবের প্রস্তুতি চলেছিল দীর্ঘকাল ধরে। কারণ নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশার ক্ষেত্রকে নির্মল আর পরম সুন্দর করে তোলার এক নতুন জীবনাভূতির দ্বার খুলে দিল সুবল, সুদামা, ললিতা, বিশাখা, রাধা এবং কৃষ্ণ নিজে। প্রেম সূর্যের মত উজ্জ্বল, ভাস্বর। প্রেমের পূজোয় কোন কিছুই অপবিত্র হয় না। প্রেম নির্মল, নিষ্পাপ। প্রেমে কোন ভেদাভেদ নেই। প্রেমে সকলে মিত্র হয়। শত্রুও আপন হয়। প্রেম হৃদয় অন্ধকারকে আলোকিত করে। মনের ক্লেদ, বিকৃতি, প্রেমেই মুক্ত হয়। বায়ুর মত হিল্লোলিত করে জীবনকে। নিরানন্দ প্রাণহীন দেশে একমাত্র মুক্ত প্রেমই বহিয়ে দিতে পারে আনন্দ স্রোত। একমাত্র প্রেম দিতে পারে মানুষকে আত্মপ্রত্যয়, বিশ্বাস, নির্ভরতার শক্তি। কৃষ্ণের মহান প্রেম, ভালোবাসায় শুধু বৃন্দাবনবাসী নয়, মথুরায় সব মানুষ তাদের জীবনের ফাঁক ও ফাঁকি দেখে নির্মল প্রণয়ের দীপ জ্বালাতে বসন্তোৎসবের বেদীতলে সমবেত হল।

সে দিনটা স্পষ্ট মনে আছে রাধার। সে এক বিস্ময়কর দিন। বৃন্দাবনের কোন মানুষ সেই দিনটার কথা ভুলবে? তার কর্মফল এখনও তাকে স্পর্শ করে আছে। বুকের ভেতর তার স্মৃতির দীপ জ্বলজ্বল করে জ্বলে।

রাধা স্তম্ভিত। জীবনে এই প্রথম বোধহয় মথুরা-বৃন্দাবনের কিশোর-কিশোরী, তরুণ-তরুণী, যুবক-যুবতী বিশুদ্ধ ভক্তি ও জ্বলন্ত বিশ্বাসে নির্ভয় হয়ে যেন বসন্তোৎসবে এসেছে। হাত ধরাধরি করে দাঁড়িয়েছে। চোখে তাদের তন্ময়তা! কি সুন্দর আর মিষ্টি দৃষ্টি নিয়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পরনে প্রত্যেকের বাসন্তী রঙের কাপড় বুকে সবুজ উড়নী। আর মেয়েদের বসন হল লাল আর তাদের বক্ষাবরণী হল সবুজ রঙের রেশমী কাপড়। বিশাল প্রান্তরটার দিকে তাকাল বুকের ভেতরটা কেমন আনন্দে নেচে ওঠে।

রাধা তার বিগত পনেরো বছর আগের এই ঘটনার ভেতর ডুব দিয়ে কেমন উৎসুক স্বপ্নাচ্ছন্ন চোখে দূরে তাকিয়ে প্রায় নিঃশব্দে বুকের ভেতর কৃষ্ণের বংশীধ্বনি শুনতে পাচ্ছিল। মুহূর্তে একটা মহৎ, উদার ও পবিত্র অনুভূতিতে আচ্ছন্ন হয়ে গেল তার চেতনা। আর তীব্র আবেগে তার অন্তরটা যেন মহাপ্রাণ কৃষ্ণের এক অখণ্ড জ্যোতির্ময় সত্তার কাছে লুটিয়ে পড়তে চাইল। তার বুকের ভেতর কৃষ্ণের মধুর মুরলীধ্বনি বাজতে লাগল।

বসন্তোৎসবে বৃন্দাবন এবং মথুরা নতুন সাজে সেজেছে। নৃত্যস্থলীর বেদীতে রাধা ও কৃষ্ণ যুগল মূর্তিতে দাঁড়িয়ে। রাধা-কৃষ্ণ দুজনে ধরেছে মোহন মুরলী। বাঁশীতে কৃষ্ণের মুখ। সহসা সমুদ্র তরঙ্গ যেন কল্লোলিত হল বাঁশীর সুরে। গভীর সুখানুভূতির আবেশে কৃষ্ণের দুই চোখ বুজে গেল। মুখমণ্ডলে উজ্জ্বল হাসির দীপ্তিচ্ছটা। বাঁশীর মূর্ছনার ভেতর হারিয়ে গেল রাধার চেতনা। দুচোখে তার স্বপ্নের ঘুম নামল যেন। পূজারিণীর বিনম্র ভঙ্গিতে রাধা প্রথমে কৃষ্ণকে ফাগে ফাগে রাঙিয়ে দিল। অমনি শুরু হয়ে গেল হোলির উৎসব। বিচিত্র হর্ষধ্বনি উঠল বাতাস ভেদ করে। সে জয়ধ্বনি মন্ত্রের মত অভিভূত করল। মেয়ে-পুরুষ নির্বিশেষে বিচারহীনভাবে প্রত্যেকের সঙ্গে ফাগখেলায় মেতে উঠল। অনির্বচনীয় সুখ, তৃপ্তি আর অনাবিল আনন্দে তারা মাতোয়ারা। প্রেমে সব সুন্দর। বৃন্দাবনের সব মানুষ পরস্পরের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা, বিশ্বাস, প্রেম দিয়ে পরম নির্ভয়ে আর নিশ্চিন্ত সুখের উল্লাসে যেন কৃষ্ণের অনন্ত মহিমার কাছে নিজেদের উৎসর্গ করল। নিবেদন করার এক সকরুণ ব্যাকুলতা ফুটে ওঠল তাদের উল্লাসে, আনন্দে, অস্থিরতায়। রাধার বুকের ভেতরও যেন সমুদ্রের উথাল-পাথাল ভাব। কৃষ্ণ তার মঞ্চ থেকে নেমে এসে পরম আদরে রাধাকে নিজের বামপাশে নিয়ে গোটা নৃত্যস্থলীর মানুষের সঙ্গে মিশে গেল। তার মিষ্টি বাঁশীর সুরে বাতাস আকুল হল, নৃত্যস্থলী যেন সমুদ্রের দোলায় দুলতে লাগল।

সর্বত্র নর-নারীর দ্বৈতসঙ্গীতে মুখর হয়ে উঠেছে। প্রাণের আবেগের সে গানে গলা না থাকলেও বেমানান লাগছিল না। বসন্তোৎসবের গানে, নৃত্যে, ছন্দে, বৃন্দাবনের মরা প্রাণ হঠাৎ জোয়ার এসে

লাগল। প্রত্যেকের জীবনের ভেতর এসে ঢুকল তার স্রোত। মনে হল মহাকালের রথ এসেছে। বৃন্দাবনে। তার সেই চাকার শব্দ বৃন্দাবনের মানুষের বুকের ভেতর গুরুগুরু করতে লাগল। প্রতি মুহূর্তে বৃন্দাবনের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার মনে হতে লাগল একটা কি পরমাশ্চর্য যেন এসে পড়ল তাদের জীবনে। ঘরে যে ছিল তারও ঘরে থাকা দায় হল। নারীপুরুষের সংস্কার, পার্থক্য সব ভেসে গেল। উভয়ের মাঝখানের বহু কালের দেয়ালটাও ধসে গেল। পথের সব বাধাই হঠাৎ সরে গেল যেন। এই অবাধ মেলামেশায় কোন লজ্জা ছিল না, কৈফিয়ৎ ছিল না। মুক্ত জীবন আর মুক্ত প্রেমের আশীর্বাদ দেবতার অকৃপণ দানের মত এল।

কৃষ্ণ সর্বান্তঃকরণে চেয়েছিল বাঁশীর সুর যেন গোটা বৃন্দাবনবাসীর সমস্ত শিরায়-উপশিরায় কুহরে কুহরে বাজিয়ে তোলে রুদ্রের ডমরুধ্বনি। তার ভেতর সকল সৃষ্টি ছাড়াটা যেন জেগে উঠে। এগিয়ে চলার মন্ত্র মুখে তার: চরৈবতি, চরৈবতি। দেশের সুরের সঙ্গে জীবনের সুরের এক অদ্ভুত মিল ঘটে গেল বসন্তোৎসবে কৃষ্ণের বাঁশীর সুরে! বিরাট রাত্রির গর্ভের মধ্যে এক ভাবী যুগের ভ্রূণ যে অস্ফুট আকারে ঘুমিয়ে রয়েছে কৃষ্ণ সমস্ত সত্তা দিয়ে অনুভব করল তাকে। মুগ্ধ কণ্ঠে রাধাকে বলল: তোমার মতই যেন বৃন্দাবনের মানুষ আঙিনা ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছে। কোথায় চলেছে, কেন যাচ্ছে,তা যেন ভাববার, প্রশ্ন করার অবসর নেই। সামনের অন্ধকার, পথের বাধা তুচ্ছ করে সে এগিয়ে চলার জন্য প্রস্তুত। বৃন্দাবন যেন অভিসারিকা রাধা! কি ভাল যে লাগছে!

রাধা গাঢ় স্বরে বলল: একটি দীপও নেই তাদের হাতে। দীপ জ্বেলে নেবার সবুর সয়নি তাদের। এ তোমার বাঁশীর সুরের অভিসার।

বিশাখা রাধাকৃষ্ণের খুব কাছে ছিল। কথাটা নিয়ে হাসাহাসি করে। বলল: তোমাদের যুগল রূপ দেখতেই এসেছে লোকে। তোমাদের দেখে তাদের নয়ন জুড়িয়েছে, মন মজেছে। তারা যেন কল্পনায় পৌছে গেছে সব পেয়েছির দেশে। এখন আর কুলের ভয় নেই তাদের। চোখ বুজলে বৃন্দাবন দেখছে।

কৃষ্ণের অধরে বাঁকা হাসি। বলল: আমি কিন্তু চোখ বন্ধ করলে কংসের কারাগার দেখি। কারাগারের বন্ধ দরজায় মাথা কুটছে আমার সর্বরিক্তা জননী। আমি কি সুস্থ থাকতে পারি? বুকের ভেতর আমার অশান্ত সমুদ্র। সেখানে শুধুই ঢেউ। ঢেউয়ের ফণায় দুলছে আমার স্বপ্ন, কামনা, আশা, আকাঙ্ক্ষা আর সার্থকতা।

রাধার সুডৌল মুখে কেমন একটা শান্ত আর স্নিগ্ধ কমনীয়তা। কৃষ্ণের স্বপ্নালু চোখের উপর চোখ রেখে বলল: লক্ষ লক্ষ ঢেউয়ের মত তরুণ-তরুণীদের যৌবন চঞ্চল হয়ে উঠেছে। দ্যাখ ওদের প্রাণে ভয় লেখা নেই। ওরা ঝর্ণার মত উচ্ছল, বায়ুর মত চঞ্চল; জলের মত সহজ। ওদের রক্তে লেগেছে পাহাড়ী ঝর্ণার নাচের নেশা। দ্যাখ কি সুন্দর নাচের তালে তালে একে অন্যকে আবীরে রাঙিয়ে দিচ্ছে। কি দারুণ উল্লাসে ছেলেমেয়েগুলো চিৎকার করছে। মনে হচ্ছে মেয়েরা আগুনের শিখার মত জ্বলছে। আর ছেলেগুলো তার তাপটুকু সব নিয়ে আত্মদানের আবেগে থরথর করে কাঁপছে। সবুজ উত্তরীয় উড়িয়ে, দুবাহু তুলে চক্রাকারে পাক খেয়ে খেয়ে নাচছে। মনে হচ্ছে, ওরা দীপ্ত যৌবনের অভিষেক করছে। ওদের লক্ষ্য স্থির, আদর্শ এক। ওদের হারাবার আর খোয়াবার কোন ভয় নেই।

কৃষ্ণ বলল: উপায় এবং লক্ষ্য দুইই তাদের কাছে ঝাপ্সা। তবু তাদের পায়ে লেগেছে পথ চলার আবেগ। চলার বেগে পায়ের তলায় রাস্তা জেগে উঠবে এই ভরসাটুকু আজ আমার পাথেয়।

প্রিয়তম, কৃষ্ণের বাঁশীতে যদি তাদের সর্বনাশও হয়, যদি কিছু অবশিষ্ট নাও থাকে তাদের, তবু চিত্তে কোন ভাবনা নেই, ভয় নেই। তোমার মোহন বাঁশীর সুরে তাদের সব ভয়, সংশয় জড়তা হারিয়ে গেছে। বৃন্দাবনের প্রতিটি নরনারী মিশে গেছে তার পরিপূর্ণ মানুষী সত্তার সঙ্গে। এখন তাদের কোথায় ভাল, কোথায় মন্দ, আর কোথায় জয়, কোথায় দুঃখ, আর কোথায় কান্না দেখার মত মন নেই। উৎসাহের দীপ্তিতে তার বুকের ভিতরটা জ্বলজ্বল করছে।

কৃষ্ণ কয়েক মুহূর্তে ভেবে নিয়ে গাঢ় স্বরে বলল: রাধা, তুমি ঠিক বলেছ। নারী-পুরুষ একটি

মানুষের দুটি সত্তা। দুয়ের মিলনে মহাশক্তির জাগরণ হয়। আজ যখন আনন্দধারা বহিছে ভুবনে তখন আর মানুষের ভেতর কোন বিকৃতি নেই, তারা কত প্রকৃতিস্থ, কত সুস্থ, স্বাভাবিক, স্বাধীন। প্রতিটি মানুষের ভেতর যতক্ষণ না এই সুস্থ শক্তি বিকাশ হচ্ছে যতক্ষণ সে মনেতে, বিশ্বাসে, মেলামেশাতে সহজ না হয়ে উঠছে ততক্ষণ আনন্দধারা বহে না ভুবনে। আনন্দ না থাকলে সুস্থ, সবল হওয়া বড় কঠিন। আজ সেই কঠিন কাজটা এত সহজে চুকেবুকে যাবে ভাবতে পেরেছিলাম কি রাধা?

অভিভূত গলায় রাধা বলল: প্রিয়তম, তোমার জয়যাত্রা সূচনা হয়েছে। তোমার মন্ত্রশক্তির কি তেজ! ভাবলে বিস্ময় জাগে। প্রতিটি মানুষের চোখের তারায় যে আনন্দ ঠিকরে বেরোচ্ছে সে শুধু প্রাণের লাবণ্য নয়, হৃদয়ের আগুন। এ আগুনকে ঘরের মধ্যে লুকিয়ে রাখে কার সাধ্য? এখন যারা আসেনি, তারাও একে একে আসবে। একটি একটি করে প্রদীপ জ্বলতে জ্বলতে একদিন দেশজুড়ে দেওয়ালী উৎসবে মাতবে ছেলে বুড়ো সবাই। সেদিনেরও খুব বেশী দেরী নেই।

কৃষ্ণের কণ্ঠস্বর আপ্লুত হল। বলল: প্রিয়তমা এই মহিমার নেশায় মাতাল হতেই তোমাকে চেয়েছিলাম। তুমি যদি এগিয়ে না আসতে তাহলে কোথায় পেতাম এই সাফল্যের গৌরব। তোমার ভেতরই নিদ্রিত মহামায়ার মহাশক্তি। তুমি আমার ভেতর দিয়ে তাকে সৃষ্টি করেছ। তোমার হৃদয়ের পরশমণি ছোঁয়া পাওয়ার আগে আমার ভাবনার আকাশে তারা ছিল না।

রাধার দুই চোখ উজ্জ্বল আনন্দে ঝকঝক করতে লাগল। সূর্যাস্তের দিগন্তরেখায় একখানা আগুনভরা রাঙা মেঘের মত রাধা কৃষ্ণের পাশে হাসি হাসি মুখ করে ত্রিভঙ্গ হয়ে দাঁড়াল। ভারী অপরূপ লাগছিল তাদের যুগলরূপ। কৃষ্ণের বাম হাত রাধার কটিতে। সে হাত রাধা সরিয়ে দিল না। থরথর করে কেঁপে উঠল কৃষ্ণের বাহুবন্ধনে। রাধার স্নিগ্ধ শান্ত দুই চোখের উপর চোখ রেখে কৃষ্ণ বলল: আমরা দুজনে সহযোগী মাত্র। আমাদের লক্ষ্য এক। এই যুগলরূপেই আমাদের পরিচয় শাশ্বত।

রাধা মধুর কণ্ঠে আচ্ছন্ন স্বরে বলল: প্রভু আমার, প্রিয়ে আমার, তুমি কি সুন্দর।

বসন্তোৎসব শেষ হল। আবীরে আবীরে রাঙা হয়ে গেছে বৃন্দাবন। বাতাসে আবীর উড়ছে তার গন্ধ ভাসছে। পথ জনাকীর্ণ। রাধা সবার সঙ্গে আবীর মাখতে মাখতে ঘরে ফিরল। মাথা, মুখ, শরীর তার আবীরে আবীরে লাল। জ্বলন্ত আগুনের শিখার মত জ্বলজ্বল করছে।

আঙিনায় পা রাখতে কুটিলা পথ আগলে দাঁড়াল। গলার স্বরে তার ক্রোধ ও জ্বালা ফুটে বেরোল। ঝংকার দিয়ে বলল: ঘরে ঢুকবার আগে দাঁড়িয়ে যাও। জ্বলজ্যান্ত স্বামী থাকতে একটা ফুচকে ছোঁড়াকে প্রভু আমার, প্রিয় আমার বলতে তোমার লজ্জা করল না?

মরালের মত গ্রীবা উঁচিয়ে রাধা গম্ভীর গলার বলল: আর কিছু বলার আছে?

কুটিলার পাশে আয়ান ছিল দাঁড়িয়ে। কাঁদ কাঁদ গলায় কুটিলা ভাইকে শুনিয়ে বলল: শুনলে? কুলটা বৌয়ের কথা! দুধ কলা দিয়ে ঘরে কাল সাপ পুষেছ। এখন তোমার কপালে অনেক দুঃখ আর দুর্নাম আছে।

আয়ানের মুখে স্নিগ্ধ হাসি জ্বলজ্বল করছিল। কুটিলাকে মৃদু স্বরে বলল: এতদিন শুধু তোদের ভয়ে আর পাহারায় মনের কথাটা ও ভাল করে বলতে পারেনি বলেই তো কৃষ্ণের পথ চেয়ে বসেছিল। এতদিন পর বড় সুখে আর আনন্দে কথাগুলো বলতে পেরেছে। ওর কথাগুলো শুনে মনে হল হৃদয়ে আমার সুখের আর প্রত্যাশার নববর্ষা নেমেছে যেন। তোর কথা শুনে যদি আমার অন্তরের কান্না থামাতে চাই, তাহলে এই জগতে আমার দরকার ছিল কি? ওরে আমরা সবাই পূজার ফুল।

চমকানো বিস্ময়ে কুটিলা ডাকল: দাদা! তুমি চিরদিন সহজ আর সরল থেকে গেলে! বৌ-মনি তোমাকে জাদু করেছে। তার সব দোষ, পাপ তুমি কথা দিয়ে ঢেকে দাও। কাপুরুষের মত এইভাবে নিজের অধিকার ছেড়ে দেবে কেন?

আয়ানের চোখেমুখে হাসি উপচে পড়ল। হেসে হেসে বলল: ধরিত্রীর মাটির অভ্যন্তরে ঢোকার

দরজা বন্ধ রাখেনি। যদি রাখত, তাহলে মাটির তলায় লুকনো সোনার ভাণ্ডার, হীরের ভাণ্ডার থেকে আমরা ভাল ভাল সোনা আর হীরে আনতে পারতাম না! মণিকারের হাতেই স্বর্ণ অলঙ্কার হয়, হীরে দ্যুতিমান হয়। কৃষ্ণ রাধাকে শুধু সুন্দর করেছে। নইলে চিরদুঃখের কারাগারে তাকে বন্দী থাকতে হত! দস্যুর মত সারাজীবন তাকে কাঁদিয়ে নিজেকে ধন্য করার ভেতর কোন পৌরুষ কিংবা পুরুষের মহত্ব নেই। রাধা মনেপ্রাণে আমার। সে আমার অন্তরের। তাকে আমার হারানোর ভয় নেই! আমার সবকিছুই রাধাময়।

খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল রাধার গোল মুখখানা। নিজের মনের ভেতর ডুব দিয়ে কেমন উৎসুক স্বপ্নাচ্ছন্ন চোখে আয়ানের দিকে তাকিয়ে মুগ্ধ অভিভূত গলায় অস্ফুট উচ্চারণ করল: তুমি আমার জীবন্ত ঈশ্বর। আমার বুকের ভেতর যে প্রদীপ তুমি জ্বেলেছ তা আমার আত্মাকে জ্যোতির্ময় করেছে, নির্মল করেছে। বলতে বলতে চোখ ফেটে রাধার জল এসে পড়ল। মুখে হাসির নিঃশব্দ ঝরণা। হাসিতে, চোখের জলে তার দৃষ্টি অন্ধ হয়ে এল।

রাধা বুকের ভেতর উথলে উঠা সমুদ্রকে যেন শাসন করতে পারছে না। উত্তুঙ্গস্রোত মুহুর্মুহু প্লাবিত করে যাচ্ছে তাকে। একটা ভীষণ শারীরিক কষ্ট আর একটানা মানসিক যন্ত্রণা তার শরীরের ভেতর টাটাচ্ছে। যন্ত্রণায় নুয়ে পড়ছে শরীর। শরীরের কোষে কোষে বিরহের যে সুতীব্র দাহ আর জ্বালাকে সে ভুলে ছিল পনেরো বছর ধরে সে যেন অন্য এক নতুন অনুভূতিতে জ্বলে উঠল বুকের ভেতর। অভিমানে তার ভাটির টান লাগল। কৃষ্ণের দর্শনলাভের জন্য অন্তর আকুল হল। কতকাল কৃষ্ণকে দেখে না। মানুষটাকে একবার চোখের দেখা দেখতে না পাওয়ার শূন্যতা কতখানি রাধা বুকের মধ্যে এই মুহূর্তে টের পেল। বহুকাল পর কৃষ্ণ বৃন্দাবনে এসেছে। সকলের ভিতরেই সে শূন্যতা। তবু সামনে পেলে রাধা শুধু একবার জিগ্যেস করবে কেমন আছে? সে বলবে ভাল। রাধা শুধু তার মুখের ভঙ্গী লক্ষ্য করবে, চোখের দৃষ্টি পরখ করবে। পরক্ষণে বিমর্ষ ভাবনা গ্রাস করল তাকে। নিজেকে তার প্রশ্ন, কৃষ্ণ কি দিয়েছে তাকে? দুঃখ আর কষ্ট ছাড়া কৃষ্ণ কিছুই দেয়নি জীবনে। তবু কৃষ্ণের চিন্তা ঘুচল তো নয়ই, বরং তার অতি স্পর্শকাতর মনটি কৃষ্ণের কথা ভেবে সবচেয়ে বেশী কষ্ট পায়। সে কথা রাধা পাঁচজনকে বলতেও পারে না। একা একা অন্ধকূপের ভেতর তলিয়ে গিয়ে নিজেকে দেখে। তখন পৃথিবীর আর কোন আত্মজন বা সুহৃদকে নয়, কৃষ্ণকেই মনে পড়ে তার। তবে মাঝে মাঝে তার হৃদয়-বেদনার কথা শুধু আয়ানকেই বলে। আয়ানকে কোনদিনই ফাঁকি দিতে পারেনি রাধা। যে এত ভালবাসে তাকে কি ফাঁকি দেওয়া যায়?

চারদিকে ছোট মনের, ছোট স্বার্থের মানুষজনের মধ্যে অহরহ বাস করতে করতে মনটা, শরীরটা যখন সত্যিই ক্লান্ত আর অবসন্ন হয়ে পড়ে তখন আচমকা হাওয়ার ভেসে আসা বাঁশীর সুর বনফুলের মিষ্টি গন্ধের মত ছড়িয়ে যায় তার সমস্ত চেতনায়। আর তাতেই তার অনুভূতিটা অন্যরকম হয়ে যায়। পনেরো বছর আগের স্মৃতি মনের ভিতর ঘুরতেই লাগল একটা দীর্ঘশ্বাসকে পাক দিয়ে — যার নাম হাহাকার।

বৃন্দাবনে আচমকা মথুরা থেকে কংসের একজন বিশেষ দূত হয়ে অক্রুর এল যেদিন রাধার জীবনে কেন, যশোদা, নন্দের জীবনেও সেটা একটা বিশেষ দিনরূপে চিহ্নিত হয়ে আছে। তার বিপুল ব্যাপ্তি নিয়ে সে ঘটনায় মনটা আচ্ছন্ন হয়ে যায়।

বারান্দায় বসেছিল রাধা। আয়ানও ছিল তার পাশে। কেউ কথা বলছিল না। উৎসুক চোখ মেলে নিঃশব্দে কল্লোলিত যমুনার দিকে তাকিয়ে তার ঢেউ দেখছিল। এখান থেকে যমুনার তীর, গাছপালা সমেত নন্দ ঘোষের বাড়ীর অনেকটা দেখা যায়। বিশেষ করে কারা এল, আর কারা গেল তা সবটাই নজরে পড়ে। উৎসুক চোখে উভয়েই সেদিকে নিঃশব্দে চেয়েছিল।

দ্বিপ্রহর।

অকস্মাৎ রথচক্রের ঘর্ঘর শব্দ এবং অশ্বখুরধ্বনি দ্বিপ্রহরের স্তব্ধতাকে ভেঙে খান খান করল। সুদৃশ্য একটি রাজকীয় রথ এসে থামল নন্দের গৃহের অঙ্গনে।

আচমকা রথের আগমনে নন্দ একটু বিচলিত ও বিব্রত বোধ করল। অতিথিকে কিভাবে আপ্যায়ন ও অভ্যর্থনা করলে সব কুল রক্ষা পায় তার ভাবনায়।

রথ থেকে যে নামল তার লম্বাটে মুখে কটা চোখে হাসি হাসি সরলতা। বেশ একটা উচ্ছ্বাসভাব। হাসির ভিতর উদ্দাম প্রাণের ইশারা।

কিন্তু তারই পাশাপাশি আর একখানা মুখ উঁকি দিল রাধার মনের ভিতর। সে মুখ নন্দের। ভাবলেশহীন নির্বিকার পাথরের মূর্তির মত। তার দুচোখে বিষাদের ছায়া। কিছু যেন হারানোর ভয়ে শঙ্কিত।

পনেরোটা বছর কেটে গেছে তবু চোখের উপর সেই দৃশ্যগুলি ঠিক আগের মতনই দেখতে পাচ্ছিল। নিজের অজ্ঞাতে, অজান্তে রাধা উৎকর্ণ আর উদ্বেগ নিয়ে নিজের মনেই শব্দ করে বলল: এই রে, অক্রুর এসেছে। হাবভাব দেখে বোধ হচ্ছে, কংসের দূত হয়ে এসেছে।

আয়ান বিস্ময়ে চমকে উঠেছিল। বলল: কেন? সে এল কেন? ব্যাপার কি? চল তো দেখে আসি।

বাতাসে খবর ছড়িয়ে পড়ল। বৃন্দাবন ভেঙে লোক এল নন্দের গৃহে।

যশোদা মূর্ছিতা।

নন্দ পাষাণমূর্তির মত স্তব্ধ নির্বিকার। সে কথা বলছে না, কাঁদছে না। থেকে থেকে বুকের হাহাকার চাপা দীর্ঘশ্বাসের মত পড়ছিল।

জনতা হৃদয়ভরা জিজ্ঞাসা আর দুঃখ নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারাও বাক্যহারা। চোখে তাদের জল বাধা মানছে না। প্রাণের কৃষ্ণকে মথুরার দুশমন কংসের কাছে কোন্ প্রাণে পাঠাবে?

ভীড়ের মধ্যে রাধা চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে চিত্রার্পিতের মত। উর্ধ্বমুখে সে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছে।

কিন্তু যাকে নিয়ে এত কান্ড সে নির্বিকার। তার কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। ভয়ওনেই। আনন্দে খুশিতে তার দুচোখের মণি চক্‌চক্ করছে। অক্রুরের দুই হাত ধরে খুশিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলল: এত বড় ধনুর্যজ্ঞে দেশের রাজা তাকে আমন্ত্রণ করেছে, তাঁর নিমন্ত্রণ কখনও প্রত্যাখ্যান করতে পারে? তাতে রাজার আশাভঙ্গ হবে যে! সামান্য প্রজার এত বড় স্পর্ধাও রাজা সইবে না। আবার ভীরু কাপুরুষের কলঙ্ক অগৌরবও বহন করতে পারবে না।

যশোদা মূর্ছা থেকে উঠে বসল। স্বপ্ন থেকে যেন জেগে উঠল। কাঁধ থেকে আঁচল খসে পড়েছে তার। দেহভারে ন্যুজ হয়ে পড়েছে যেন। বেশবাস, কেশ তার আলুথালু হয়ে গেছে। যশোদার অসামান্য মুখশ্রীতে যে কষ্টের ছাপ ও মৃত্যুযন্ত্রণার ভয়াবহতা ফুটে উঠেছিল তা দেখে হকচকিয়ে গেল কৃষ্ণ। তাড়াতাড়ি যশোদাকে ধরল। অস্পষ্ট অর্ধ চেতনার মধ্যে যশোদা কৃষ্ণের প্রশস্ত বুকের উপর মাথা রাখল। একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস পড়ল তার। তারপর খুব ক্লান্ত, অবসন্ন গলায় জিগ্যেস করল: হ্যাঁরে, কানু তুই আমায় ছেড়ে যাবি?

কৃষ্ণ মলিন হেসে অসহায় গলায় ডাকল: মা! সমবেত জনতার প্রত্যেকের দৃষ্টি যশোদা ও কৃষ্ণের উপর স্থির।

যশোদা খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে নীচু ও অদ্ভুত করুণ গলায় বলল: কানু, তুই গেলে আমি বাঁচব না বাবা। এই বৃন্দাবনের যেদিকে তাকাব সেদিকেই দেখব আমার কানু নেই। আকাশ, বাতাস, বন-উপবন, নদী প্রান্তর কেঁদে কেঁদে বলবে কানু নেই, কানু নেই। ধেনুরা হাম্বা হাম্বা করে বলবে, কোথা গেলে কানু পাই। চোখের দেখা দেখতে না পাওয়ার শূন্যতা নিয়ে বাঁচা যায়?

আঁখি গেলে তার কি ছায় জীবনে।
বাঁচিতে কি আর সাধ।

কৃষ্ণের চোখে এক গভীর বিষণ্ণতা নেমে এসেছিল। চমকেও উঠেছিল যেন একটু। চোখের জল মুছে যশোদা নিঃশব্দে অভ্যাসবশত তার শাড়ীটাকে গুছিয়ে নিল। বেদনা-বিধুর দুচোখ ভরে তার জল টলটল করছিল।

কৃষ্ণ নীরব। ভারী অস্বস্তি বোধ করছিল। যশোদা তাকে চুপ করে থাকতে দেখে বলল: অক্রুর যেন ঝঞ্ঝার মত এসে আমার ঘরের সব কিছু ওলোট-পালোট করে দিল। কি এমন বলল, যে মা-র ক্লেশ বেদনাও তোর কাছে তুচ্ছ হয়ে গেল।

চমকানো বিস্ময়ে কৃষ্ণ অসহায় গলায় ডাকল: মা! প্রতিদিন আমি প্রত্যুষে প্রথম সূর্যের দিকে তাকিয়ে মনে মনে বলতাম—হে শাশ্বত ঈশ্বর, আর কতকাল আমি প্রতীক্ষা করব? কবে মথুরাধিপতি কংসের ডাক এসে পৌঁছবে আমার? মা, মাগো আজ আমার জীবনে সেই সূর্যোদয় হয়েছে। আমার দেহ-মন জুড়ে বাজছে আহ্বানের সঙ্গীত। কি এক স্বর্গীয় সুখ আর তৃপ্তির মধ্যে আমার চেতনা ডুবে আছে। মনে হচ্ছে, তোমার এই অশ্রুমাখা চোখের ভিতর আমার দুঃখিনী জন্মদাত্রীকে দেখছি। কংসের কারাগারে বন্দী মা আমার জন্মভূমি। তোমার ভেতর দিয়ে চিনেছি মানুষকে, দেশকে, আমার ইষ্টকে। তুমি আমার ধাত্রীদেবতা।

যশোদার গলা ভারী শোনাল। বলল: কৃষ্ণ, মায়ের মন বড় অবুঝ আর অশান্ত! আমি কিছুতে স্থির থাকতে পারছি না! কত কু কথা মনের ভেতর ঝড় তুলছে। ঝড় প্রলয় না ঘটিয়ে থামবে না!

কৃষ্ণ কেমন উদাস অন্যমনস্কতার ভেতর ডুবে গিয়ে আচ্ছন্ন স্বরে বলল:

কতো দীর্ঘদিন আমি এমন প্রবাসী হয়ে আছি।
বড় দীর্ঘদিন, দীর্ঘবেলা।

কৃষ্ণ হাসল। তার হাসিটা আশ্চর্য। আর পাঁচটা সাধারণ মানুষের হাসির সঙ্গে একেবারেই মিল নেই। মৃদুস্বরে যশোদাকে সমবেদনা জানানোর জন্য বলল: মা, মানুষ হয়ে জন্মেছি বলেই এত দুঃখ আর যন্ত্রণা। দুঃখ-বোধ যার নেই সে তো মানুষ নয়। মানুষকে দুঃখ উপলব্ধি করবার মত শক্তি ও বুদ্ধি যেমন বিধাতা দিয়েছে, তেমনি সে দুঃখ-যন্ত্রণা উত্তরণের শক্তি ও তেজ আছে তার সত্তার মধ্যে নিহিত। মনকে অশুভ করা যেমন সহজ, তেমনি তাকে শুচি করাও কোন কঠিন নয়। দুঃখের সমুদ্র সাঁতরে পার হওয়ার আর এক নাম তো জীবন! তাকে বা তার স্বরূপকে আমাদের অনেকের বোঝার ক্ষমতা হয় না বলেই হয় তো বলি ঈশ্বর নিষ্ঠুর।

যশোদা হতভম্ব। কেমন জমাট শক্ত, বরফের মত শীতলতায় সে স্থবির হয়ে গেল। চোখের মণিতে উদাস অন্যমনস্কতা নিয়ে সে চেয়ে থাকল কৃষ্ণের মুখেব দিকে। মুখে দুশ্চিন্তার গভীর রেখা। চোখের নীচে কাজলের মত কালিমা।

গহন বিষণ্ণতার মধ্যেও সত্যিকারের একটু আনন্দ অস্ফুট হয়ে ফুটল কৃষ্ণের মুখে। চোখ দুটিতে গভীর সম্মোহন বিগলিত গলায় বলল: তুমি আমায় নিজের হাতে সাজিয়ে দাও।

যশোদা কোন জবাব না দিয়ে অশ্রুভরা চোখে ম্লান হাসল। লুব্ধ মন এই আমন্ত্রণের ভালমন্দ বিচার করল না। ভিতরে এক শিহরিত আনন্দের উজ্জীবক স্পর্শ তার চোখমুখকে উজ্জ্বল করে দিল।

রাধার বুকের ধকধকানিটা শুরু হল এ সময়ে। কারণ রাধা জানে যশোদার স্নেহ-কাঙাল মন বরাবরই এরকম ভালবাসা চায়। যাওয়ার সময় কৃষ্ণ তাকে ইশারা করতে ভুল করেনি। রাধাও অনেকক্ষণ ধরে মনে মনে প্রত্যাশা করছিল, কৃষ্ণ নিশ্চয়ই নিভৃতে তাকে ডেকে বলবে কিছু। সেই চরম কথাটা কি তাও সে আন্দাজ করতে পারে। তথাপি কৃষ্ণের চোখের ইশারায় এমন এক বিদ্যুৎ ছিল যে একই সঙ্গে বুকের মধ্যে তীব্র চিনচিনে আনন্দ ও ভয় হচ্ছিল তার।

পনেরো বছর পরেও সেদিনের সেই ক্ষণটাকে ভাবতে, মনের ভেতর রোমন্থন করতে কী আশ্চর্য সুখে, আনন্দে তার দেহ-মন ভরে গেল। অনুভূতিতে তার সকাল, দুপুর, সন্ধ্যা নেই। তার অসীম ব্যাপ্তি ও গভীরতা দিয়ে সে ক্ষণকালিক উপস্থিতিকে অতিক্রম করে গেল।

'ক্ষমা কর', বলে কৃষ্ণ হঠাৎ তার ডান হাতখানা ধরে করপল্লব চুম্বন করল। রাধা অবাক হয়ে কৃষ্ণের মুখের দিকে চেয়ে রইল। চিত্রার্পিতের মত সে তার খুব গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে রইল। তার একটুও সরে যেতে ইচ্ছে করল না। কৃষ্ণের দু হাতের মুঠোয় তার হাতখানা ধরা। রাধার ইচ্ছে

করছিল না ছাড়িয়ে নিতে। অনন্ত সময় বয়ে গেল। তবু, ঐ ধরা অবস্থায় রইল। কৃষ্ণের ঐ সুন্দর মধুর স্পর্শে তার সারা শরীরের মধ্যে তখন ঘুঙুর বাজছিল। কৃষ্ণ তার কোষে কোষে এক অস্থির যাতনা ছড়িয়ে পড়ল। যদিও; কৃষ্ণ এবং রাধার অবস্থানের মধ্যে একটা ব্যবধান বরাবরই ছিল। তবু সে রাধাকে একটুও কাছে টেনে নিল না। রাধার হৃদয় নুয়ে পড়ল। গায়ে কাঁটা দিল।

অনেকক্ষণ তারা দুজনে চুপ করে ছিল। তারপর একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে রাধা আকুল স্বরে প্রশ্ন করল: কৃষ্ণ, তোমার হাতে হাত রাখলে এমন ভাল লাগে কেন?

কি জানি? মানুষের মনের অনেক কিছুই হয়ত হাতের ছোঁয়ায় থাকে। তাই বোধহয় হাতের পরশেই সমস্ত শরীর গলে যেতে চায়।

রাধার ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটল। কৃষ্ণের উত্তর তাকে খুশী করল, কিন্তু তার বাড়াবাড়িতে লজ্জিত হয়েছিল অনেকখানি।

কৃষ্ণ চুপ করে রাধার দু চোখের দিকে চেয়ে রইল। কথা বলল না। এটা কৃষ্ণের অনেক পুরনো খেলা। রাধার চোখের মধ্যে চোখের দৃষ্টি এমন করে ফেলে কৃষ্ণ যেন একটুও উপছে পড়ে নষ্ট না হয়। রাধা কৃষ্ণের এই চাউনি চেনে।

কিছুক্ষণ অপলক চেয়ে থেকে রাধা বলল: হয়েছে এবার ফেরাও তোমার চোখ। যাওয়ার সময় অমন করে তাকিয়ে আর দাগা দিও না।

কৃষ্ণ কথা বলল না। রাধার ডানপাশে এসে দাঁড়াল। ওর হাত ধরল। নিজের হাতের ওপর হাত রাখল। ঠোঁটের কোণে হাসির আভা ফুটল। মৃদু কণ্ঠে বলল: চোখটা বন্ধ করে হাতের পাতা খোল। আমার হাতের ওপর মেলে দাও।

রাধা কৃষ্ণের কথায় তার ডান হাতের পাতাটি মেলে দিল। দুপুরবেলায় স্থলপদ্মের মত দেখতে লাগল সে করপদ্ম। আঙুলে আঙুলে পাতায় পাতায় উষ্ণতায় মিলন হল। রাধার শরীর চিনচিন করে ওঠল। বলল: চোখ খোল এবার।

রাধা চোখ মেলে দেখল, কৃষ্ণের বাঁশী তার হাতে। মুখে বিস্মিত হাসি। চোখে অবাক মুগ্ধতা। বাঁশীটি পরম আদরে গালে ঠেকাতে তার চোখ জলে ভরে গেল। কতবার তার ওপর চুম্বন এঁকে দিল। ছিদ্রের ওপর বার বার মুখ রাখল।

অনেকক্ষণ পর কৃষ্ণ মৃদু গলায় বলল: বাঁশীটা এখন থেকে তোমার কাছেই থাক।

রাধা চমকানো বিস্ময়ে তৎক্ষণাৎ বলল : না, এ বাঁশী বহনের শক্তি আমার কোথায়? শুধু তুমি আরও একটু ধরে থাকতে দাও। কতদিন নিজের হাতে ধরে এমন আদর করিনি। এমন করে হাতেও পাইনি কখনো। আজ আমার মনপ্রাণ ভরে গেল এক অনির্বচনীয় সুখে।

যে বাঁশী নিয়ে তোমার এত আনন্দ, সে বাঁশী তোমার হোক।

সত্যি বলছ! দেবে!

কৃষ্ণ মাথা নাড়ল!

রাধার চোখেমুখে উৎফুল্ল ভাব, বলল: সত্যি? কি যে তুমি আমার মত একজন সাধারণ মেয়ে মধ্যে দেখেছিলে জানি না। তোমার সবচেয়ে প্রিয় বাঁশীটি দিয়ে আমাকে তুমি ধন্য করলে। তোমার ভালবাসার প্রেম আমাকে গৌরবান্বিত করল। আমার জন্ম সার্থক হল। কিন্তু বাঁশী হারিয়ে তুমি যে রিক্ত হয়ে যাবে, এতো আমি চোখ থাকতে প্রাণ থাকতে দেখতে পারব না। বাঁশী কৃষ্ণের অলংকার। বাঁশী ছাড়া কৃষ্ণকে কে কবে ভেবেছে? কৃষ্ণের প্রেমের মিলনদিনে সত্য সাক্ষী যে বাঁশী, তাকে কেমনে নেব গো আমি?

ক্ষণকালের জন্য স্তব্ধ হয়ে যায় কৃষ্ণ। বুকের ভেতর তার অদৃশ্য বাঁশীর সুর বাজতে লাগল। তার চোখের পাতায় ঘন হয়ে এল সুনিবিড় প্রেমের ছায়া। গদগদ স্বরে বলল: রাধা ছাড়া কৃষ্ণের কি আছে পরিচয়? রাধা মানে অনন্ত প্রেম। যেখানে রাধাকৃষ্ণের যুগলরূপ সেখানেই অমর প্রেম। তোমার প্রেমের স্নিগ্ধ মধুরিমায় ভরে আছে এ অন্তর। তাই কিছু হারানোর ভয় নেই আমার।

রাধার উজ্জ্বল চোখের কৃষ্ণতারা দুটো যেন ঝিক্ করে হেসে উঠল। উল্লাসের কলধ্বনি বাজছিল

রাধার বুকের রক্তে। বিপুল এক সুখের ভিতরে এক অপরূপ ইন্দ্রজালের মত খেলা করছে কৃষ্ণের আসন্ন বিচ্ছেদের দুঃখ। উৎকণ্ঠায় সহসা তার বুক টন্‌টন্ করে উঠল। বলল: বাঁশী না থাকলে আমার বংশীধারী কৃষ্ণকে চিনব কি করে? কৃষ্ণ ছাড়া কার ললিত অঙ্গুলি বিন্যাসে বাঁশীর সুর এমন সুদূর লোকান্তপারের সঙ্গীত হয়ে উঠবে? আমার সাধ্য কি তোমার সুরের মুগ্ধতা সৃষ্টি করি বাঁশরীতে? কাজ নেই, তোমার ঐ বেণুতে! ও তোমারই থাক।

বিস্ময়ে ছট্‌ফট্ করে উঠল কৃষ্ণের দুই চোখ। কয়েক মুহূর্ত মাত্র। তারপর কেমন বিচিত্র দৃষ্টিতে তাকাল। বলল: তাহলে, এবার বিদায় দাও সখী।

তার ছেঁড়া বীণার মত নিদারুণ বেদনায় রাধার ভেতরটা ঝংকারে বেজে উঠল যেন। কণ্ঠে তার হাহাকার ছাপিয়ে ওঠল। বলল: সে কি? তুমি বলছ কি কৃষ্ণ? বৃন্দাবন ছেড়ে যাবে কেন? কোন্ দোষে, কি অপরাধে আমাদের ছেড়ে যাচ্ছ প্রিয়তম? তোমার বিহনে রাধার কি হবে ভেবেছ? তুমি গেলে বৃন্দাবনের আর থাকল কি? কোন্ মোহে থাকব এখন?

জীবনটা ব্যর্থ হয়ে যাওয়ার যন্ত্রণায় মোচড় দিল রাধার। কৃষ্ণের চোখে পলক পড়ে না। তার ঘন আয়ত কালো দুই চোখের তারা নিশ্চল বেদনায় থমথম করতে লাগল। কৃষ্ণের সমস্ত চেতনার ওপর নেমে এল বিহ্বলতা। কেমন একটা অভিভূত আচ্ছন্নতায় আবিষ্ট হয়ে গেল সে। শরীরের ভেতর একটা আকুলকরা অস্থিরতা টন্‌টন্ করছিল। একটা নিবিড় যাতনা মেশানোর আবেগে তার বুক ফুলে উঠল।

বাইরে রাধাচূড়ার স্তবকে, কৃষ্ণচূড়ার মঞ্জরীর, পাতায় পাতায় ঝড়ের বিলাপ। ডালে ডালে কাঁপুনি। ঘন কদম গাছের পাতা যেন শ্বাস বন্ধ করে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। রাধার মুখে অব্যক্ত যন্ত্রণার চিহ্ন। উদ্গত নিঃশ্বাস তার বুকের খাঁচায় কদমের মত আটকে আছে। কান্না গিলে গিলে বলল: কৃষ্ণ, মথুরা তোমার স্বপ্নময় পৃথিবী। তোমার স্বপ্নের জগতে তোমার নিমন্ত্রণ আজ। কিন্তু বৃন্দাবন তোমার কৈশোর, যৌবনের লীলাভূমি, গোকুল তোমার শৈশব বাল্যের ক্রীড়াঙ্গন—এদের ছেড়ে যেতে তোমার কষ্ট হবে না?

একটা কষ্টে কৃষ্ণের চোখ ছলছলিয়ে উঠল। কষ্টে বলল: রাই, অমন করে আমাকে দুর্বল করে দিও না। মথুরা সম্পর্কে তোমাদের এত শঙ্কা, উদ্বেগ, অস্থিরতা কেন? মথুরায় কী আমি নির্বাসন যাচ্ছি? মথুরা থেকে আমি ফিরব না, এ অমঙ্গল চিন্তায় তোমরা স্পর্শকাতর হয়ে পড়েছ। তোমরা সকলে অবুঝ আর উতলা হলে আমিই যে দুর্বল হয়ে পড়ব। অথচ, তুমি জান মথুরায় যাওয়া কত দরকার। বিধাতার অমোঘ নিয়মে আমাকে মথুরাতে যেতে হচ্ছে। এজন্য বিলাপ করবে কেন? হর্ষ কর, শঙ্খ বাজাও।

ঘোরলাগা আচ্ছন্নতার ভেতর থমথমে গলায় বলল: প্রিয়তম, কংস ভাল লোক নয়। তাই, তোমাকে ছেড়ে দিতে বড় ভয় করে। মেয়েমানুষের মায়া আর ভয় জন্মগত অভিশাপ।

কৃষ্ণ হাসল। রাধার জন্য তার সত্যিই কষ্ট হচ্ছিল। অনুভূতির রন্ধ্রে রন্ধ্রে একটা অসহনীয় দুঃখবোধ নিবিড় বেদনায় মিশে ছিল। তবু কথা বলার সময় তার কালো দুই চোখের কোণে কেমন একটু নিষ্ঠুরতা ফুটে বেরোল। কণ্ঠস্বর গম্ভীর ও ভারী লাগল। বলল: শুধু অন্ধ মমতা, মোহ আর স্বার্থপর প্রেম নিয়ে অনন্তকালের গতিকে ধরতে চেও না। কাল নিরবধি। বিধাতাও নিষ্ঠুর। জীবন থেমে নেই। পৃথিবীও চলেছে। চলাটাই পরম গতি। তোমার সাধ্য নেই তাকে ধরে রাখি। খড়কুটোর মত সময়ের স্রোতে ভেসে যাওয়ার জন্যই আমরা জন্মেছি। শুধু সময়ের কাছে আত্মসমর্পণ কর। তিনি তোমার নিয়ন্তা। তুমি নিমিত্ত।

রাধা সম্মোহিত। স্তব্ধ। বাক্যহারা। কষ্টে বুকের ভেতর টন্‌টন্ করছিল। তার দুই চোখের তারা কৃষ্ণের চোখে নিশ্চল কিন্তু সে কিছুই দেখছিল না। বুকের ভেতর তার মহাপ্রলয়ের কলরোল বাজছিল। চোখের তারায় অন্তর্ভেদী নীরবতা। ঠোঁটে ঝড়ের কম্পন যা ভেতর থেকে উৎসারিত; দমনে অসহায় এবং দুরন্ত। আনন্দে তার হৃদয় মথিত ও ব্যথিত হতে থাকে। তবু দৃষ্টির রূপ বদলায়। কান্নার আবেগে থর থর করে ঠোঁট কাঁপে। চোখে জল ছলছল করে। নিজের মনের যন্ত্রণায় বুঁদ হয়ে গেল রাধা।

অনেকক্ষণ পর একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল তার। আর সে শ্বাসের সঙ্গে গভীর বেদনায় বেরিয়ে এল রাধার স্বর: বড় কষ্ট ভালবাসায়।

কৃষ্ণ মাথা নাড়ল। বলল: তোমার ভিতরে ভিতরে বড় অস্থিরতা।

ঝাপ্‌সা চোখে রাধা বলল: ঠিকই তো, ভীষণ অস্থিরতা। মনে হচ্ছে, আমি পাগল হয়ে যাব।

কৃষ্ণ একটু থমকাল। ভিতরটা তার ধীরে ধীরে আরো কঠিন হল। বলল: রাই! আমার মন্ত্র হল; প্রেমে হও বলী, চেয়ো না তাহারে এই মন্ত্র কিন্তু তোমার জপতপ হয়নি। অথচ তোমার কাছেই ছিল বেশী প্রত্যাশা।

ওগো প্রিয়, মানলেও হৃদয়ে দিয়ে মানতে পারছি না, হৃদয় আমার ছিঁড়ে যাচ্ছে। রক্তক্ষরণ হচ্ছে।

কেন এমন হল? নিষ্ঠুর হতে পারছি না তাই।

যে প্রেম শুধু কাছে টানে, স্বার্থপরের মত আঁকড়ে থাকে, ধরে রাখে সেই ছোট্ট সঙ্কীর্ণ ভালবাসা তো আমি চাইনি। মানুষের যে প্রেমে ত্যাগের আলো এসে পড়ে সেই মহান প্রেম ত্যাগে কাতর হয় না, দুঃখে বিচলিত হয় না; আমি তোমার মধ্যে তার জ্যোতির্ময় সত্তা দেখেছি। রাই, আমার সে দেখার মধ্যে কী ভুল ছিল? মিথ্যে ছিল?

রাধা সচকিত হয়ে কৃষ্ণের মুখের দিকে তাকিয়ে মুখের ভাবটা বুঝে নেয়। তারপর, দুহাতে মুখ ঢেকে কাঁদল। আস্তে আস্তে তার ভিতরটা কঠিন হল। দানা বেঁধে উঠল দুঃখ প্রতিরোধ। মৃদু কণ্ঠে বলল: ওগো আমার নিষ্ঠুর; আমার প্রিয়, তোমাকে আর মায়া দিয়ে বাঁধব না। ধরেও রাখব না। পিঞ্জরাবদ্ধ পাখীর মত তুমি মথুরার নীল আকাশে ডানা মেলার জন্য ছটফট করছ। তুমি যাও। রাই, তার প্রেমের দীপ জ্বালিয়ে তোমার অপেক্ষায় দিন গুনবে। তুমি এস; সত্যিই এস। অন্তত তোমার রাইয়ের জন্য একবার এস।

তেমনি স্বপ্নাচ্ছন্ন চোখে রাধা নিষ্পলক চেয়ে থাকে নীল আকাশের দিকে। বাঁশরী সুর থেমে গেছে। ভোরের মায়াবী আলো যেন ঘিরে আছে মুখমন্ডলে। পনেরো বছর পর এই প্রথম তার বুকের মধ্যে কিসের একটা তরঙ্গ বয়ে গেল। দুই চোখ তার টনটন করে উঠল জলে। ধরা গলায় বলল: আমি তোমাকে চিনি! খুব চিনি! আমি জানতাম, কৃষ্ণ তুমি আমার জন্যে অন্তত ফিরে আসবে। তোমাকে ভালবাসি বলেই ঠেকাতে পারনি আমাকে। সত্যিকারের ভালবাসার কাছে ধরা তো দিতেই হয়। কৃষ্ণ তুমি আমার মুখ রেখেছ। তুমি এসে আমার গৌরব বাড়িয়ে দিয়েছ।

আকাশে ভোরের আলো উঁকি দিচ্ছে। পাখীরা নীল আকাশে ডানা মেলে দেবার জন্যে ছট্‌ফট্ করছে। দুঃসাহসী দু তিনটা পাখী ঝাপসা অন্ধকাবের ভেতর আকাশে উড়ে গেল।

রাধা স্বপ্নাতুর দুই আঁখি মেলে চেয়ে থাকল ভোরের শুভ্র নির্মল আকাশের দিকে! ভোর যে হয়েছে তার খেয়াল নেই!

আয়ান চুপি চুপি তার পিছনে এসে দাঁড়িয়েছিল। রাধা কিন্তু তার আগমন টের পেল না। বুকের ভেতর থেকে একটা গভীর শ্বাস পড়ল। দরদ ও সহানুভূতিতে আয়ানের বুকের ভিতরটা কেমন করে ওঠল।

মৃদুস্বরে বলল : খুব খারাপ লাগছে, তোমার, না? সারাটা রাত বারান্দায় দাঁড়িয়ে কাটিয়ে দিলে ত? আমাকে ডাকলে না কেন? এত কষ্ট পাবার তো কোন দরকার ছিল না। এখন তোমার কষ্ট দেখে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে তা কি তুমি বোঝ না।

রাধা অপ্রস্তুতভাবে হাসল। আয়ানের দরদ সহানুভূতিব স্পর্শে তার বুকের বেদনার সমুদ্র উথলে ওঠল! কান্না কান্না গলায় বলল : সত্যি তুমি অদ্ভুত মানুষ! কত ভালবাস আমাকে। কিন্তু আমি কি দিয়েছি তোমায়? আমার আনন্দের জন্য সুখের জন্য তোমার হৃৎ-কমল ছিঁড়ে দিয়েছ। যে আমাকে

সব দিল তাকে আমি কি দিলাম? তার বধূ হতে পারলাম না, তার সন্তানের মাতাও হতে পারলাম না। আমার মত দুর্ভাগা কে আছে?

অত উতলা কেন হচ্ছ? এসব প্রশ্ন করে তোমার ভালবাসাকে অপমান কর না। এক মুহূর্তের জন্য কখনও ওসব চিন্তাও করেনি আমি। এসব নিয়ে আমার কোন দুঃখ, ক্ষোভ কিংবা বঞ্চনার জ্বালা নেই। কখনও মনে হয়নি তুমি আমাকে কোন কিছুতে বঞ্চিত করেছ।

রাধা আর থাকতে পারল না। ভীষণ কষ্টে, যন্ত্রণায় আকুল হল বুক। বলল : বিশ্বাস কর আমি তোমায় ঠকাইনি।

কি পাগলামি কর, বলতো? তোমার মত কৃষ্ণপ্রেমে আমিও পাগল। আমার পার্থিব ভোগ আকাঙ্ক্ষা কৃষ্ণের পায়ে সমর্পণ করতে পেরে ধন্য হয়েছি গো। তোমার কাছে যা পেয়েছি তা অতুলনীয়। আমার মনে কোন ক্ষোভ নেই, দুঃখ নেই। শুধু দুঃখ তুমি কষ্ট পেলে। তোমার জন্যই আমার খুব খারাপ লাগছে।

আয়ান রাধার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। আর রাধার বুকের যত জ্বালা আর কষ্ট তা একটু, একটু করে শীতল হয়ে এল। মনে হল তার সব দুঃখের সান্ত্বনা আয়ান। আয়ানই তার মুক্তি।

উদ্ধবের ঘুম ভাঙল, দেখল রোদ এসে পড়েছে তার গায়। পাখী ডাকছে। ওদের ঝাপটানো ডানায় ছিট্‌কে পড়া পালকের গন্ধ ছড়িয়ে আছে বাতাসে। কাছেই কোথাও গলায় ঘণ্টা বাঁধা গরু মাথা নাড়ছে। তার পথ চলার খুরের শব্দ মাটি থেকে উঠে আসছে। দীঘির জলে গাছের ফাঁক দিয়ে গলে পড়া সূর্যের নরম আলো দর্পণের মত টলটল করছে। কাঁপা আলোতে দীঘির জল মাছের আঁশের মত ঝলমল করছে। চোখ রগড়িয়ে একটা হাই তুলে উদ্ধব ভূমিশয্যা ছেড়ে উঠল। দীঘির জলে মুখ ধুল, হাত-পা প্রক্ষালন করল। তারপর কি ভেবে ঠাণ্ডা জলে চান করে নিল। বেশ ঝরঝরে লাগল শরীর। কেমন একটা পবিত্র পবিত্রভাব লাগল। কৃষ্ণের নামে জয়ধ্বনি করে সে পথ হাঁটা শুরু করল।

উদ্ধব গত রাতে মথুরা থেকে এসেছে। কৃষ্ণ তাকে সরজমিনে বৃন্দাবনে পাঠিয়েছে। কিন্তু কৃষ্ণের বৃন্দাবন ত্যাগের পর পনেরোটা বছর কেটে গেছে। বৃন্দাবনের সেই শ্রী আর নেই। গাছের মত এক জায়গায় ঠায় দাঁড়িয়ে। গাছেরা মৌনী নির্বাক। শীতের শেষে ঝরে যাওয়া পাতার মতই তাদের দুরবস্থা। পাতায় পাতায় বাতাসের দীর্ঘশ্বাস হাহাকারের মত বাজে। পত্রশূন্য গাছেরা আকাশের দিকে ডালপালা মেলে যেন বিধাতার কাছে কৃষ্ণের প্রত্যাবর্তনের প্রার্থনা করছে। বৃন্দাবনের প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে উদ্ধবের এসব কথা মনে এল কেন, নিজেও জানে না। স্বগৃহে প্রত্যাবর্তনের ইচ্ছেটা তার মরে গেল। রাত্রিটা কৃষ্ণের প্রিয় কদম গাছের তলায় বসে কাটিয়ে দেওয়া মনস্থ করল। রাখালিয়া বাঁশী হল তার সঙ্গী।

সারারাত ধরে বাঁশী বাজাল। কদম গাছ যেন কায়াহীন কৃষ্ণ হয়ে তার বাঁশীতে এক আশ্চর্য সুর ভরে দিল। আর সে শূন্য কলসের মত বাঁশীর রাগিনীতে ভরে উঠল। তার সুরের মধ্যে ছিল অমরত্বের সংবাদ, যা প্রেমের চির অতৃপ্তি থেকে দেহহীন, স্পর্শহীন এক স্বপ্নের জগতে মনকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল তার ও রাধার। আয়ানের বাড়িতে পা দিয়ে সে তা টের পেল।

উদ্ধবকে দেখেই রাধা দৌড়ে এল। কিছুক্ষণ সপ্রতিভ তাকিয়ে থাকল তার দিকে। রাধার মনে হল সে যেন সহসা কোন দেবলোক থেকে এসেছে কৃষ্ণের আগমনের বার্তা নিয়ে। বিস্ময় এবং নিস্তব্ধতার সেই ক্ষণটুকু বোধ হয় রাধা ও উদ্ধবের সবচেয়ে সুন্দর মুহূর্ত। সমস্ত সৌন্দর্যের শেষ থাকে। ফুরিয়ে যায় এক সময়। ফুরিয়ে যাওয়ার আগের এই নিঃশব্দ শব্দময়তার মধ্যে কিছুক্ষণ তন্ময় হয়ে কাটানোর পর প্রথমে অপ্রতিভ হয়ে, তারপর সপ্রতিভ মুখে একটু হেসে প্রশ্ন করল

: উদ্ধব-দা তুমি এসেছ? কতকাল পরে তোমাকে দেখালাম। সেই যে মথুরায় গেলে, আর একটিবারও খবর দিলে না তোমরা। আমাদের কথা বেমালুম ভুলে যেতে তোমাদের কষ্ট হল না? তোমরা বড় নিষ্ঠুর। হ্যাঁ গো, তোমার বন্ধু কৃষ্ণকে'তো দেখছি না? সে কোথায়?

উদ্ধব এক মুহূর্ত বোবা হয়ে গেল। মাথা নীচু করে বলল : মথুরায়।

প্রত্যাশায় আঘাত লেগে কুঁকড়ে গেল রাধা। বুকের ভেতর তার ঝড় ওঠল। তবু শান্ত গলায় নিরাবেগ চিত্তে বলল : মথুরায়! বৃন্দাবনে আসেনি সে?

উদ্ধব কৃষ্ণের প্রত্যাবর্তনের দোষ ঢাকতে বলল : এখানে আসতে ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল তার!

রাধা দু চোখ কপালে তুলে সবিস্ময়ে প্রশ্ন করল : কষ্ট!

হাঁ গো। সে বলেছিল মথুরা আর বৃন্দাবনের মাঝ দিয়ে যমুনা যেন স্নেহ, মমতা, প্রেমের নদী হয়ে বয়ে গেছে। এপার আর ওপারের মানুষের ভালবাসার দীর্ঘশ্বাসে বাতাস হাহাকার করে। তবু অসহায় মানুষকে নিরুপায়ভাবে মেনে নিতে হয় এই ব্যবধানকে। ঐ ফাঁকটুকু বোধ হয় কোনদিন আর ভরে ওঠবে না। এ হল প্রকৃতির বিধান।

তুমি কোন্ ফাঁকের কথা বলছ, উদ্ধবদা?

জীবনের ফাঁক। মথুরা আর বৃন্দাবনের জীবন একরকম নয়। দুটে দুরকম। এক জীবনের সঙ্গে আর এক জীবনকে মেলানো যায় না। মেলাতে গেলে তাল কেটে যাবে। বেসুর বাজবে।

রাধার বুকের ভিতর থেকে এক গভীর দীর্ঘশ্বাস ওঠে এসে ধীরে ধীরে নেমে গেল। ক্লান্ত ও বিষণ্ণ গলায় বলল : অথচ কত আকাঙ্ক্ষা নিয়ে আমি তার প্রতীক্ষা করছি। কতবার মনে হয়েছে দূরে কোথাও যাই। কতবার স্বামী বলেছে — চল বাইরে কোথাও যাই। কিন্তু এই বৃন্দাবন ছেড়ে যেতে আমার পা উঠল না কিছুতে! মথুরা থেকে কৃষ্ণ এসে যদি দেখে তার রাধা নেই, তাহলে সে কষ্ট পাবে, দুঃখ পাবে। সখার কথা ভেবে যাইনি কোথাও, মাঝে মাঝে নিজেই আশ্চর্য হয়ে গেছি। কেন এই আকাঙ্ক্ষা? ইচ্ছার এত জোর কোথা থেকে আসছে? নিজের মনকে সান্ত্বনা দিয়ে কতদিন বলেছি আমার সকল কাঁটা ধন্য হয়ে ফুটবে গো ফুল ফুটবে। কিন্তু সে যে কুসুমিত হওয়ার আগে কুঁড়ি অব:েতে শুকিয়ে যাবে একথা স্বপ্নেও মনে হয়নি কোনদিন।

রাই তোমার দুঃখটা সত্য, কিন্তু তার দুঃখ কাতরতাতেও কোন ছলনা নেই। তার মধ্যে একরকমের চাপা কান্না আছে। এক অন্ধ ভাবাবেগের প্রবল যন্ত্রণা তার হৃৎপিণ্ডকে কুরে কুরে খাচ্ছে। সেটা যে তার কত বড় ক্ষত, জানলে কখনও তাকে অপরাধী করতে না। বৃন্দাবনের বাঁশী ছেড়ে মথুরার অসি ধরেছে সে। বাঁশীর সুর গেছে হারিয়ে। তাই তো আমাদের কৃষ্ণের দুঃখ গো, বাঁশী কেন রাধা রাধা করে না উদ্ধব। এ বাঁশীর সে মিষ্টি সুর কোথায় গেল? সুরের পর্দায় কাঠামোর ওপর আস্তে আস্তে আলাপটা জমে আর গভীর হয়ে ওঠে না কেন? অথচ একদিন সুরের ভেলায় ভেসে ভেসে কোন্ স্বর্গলোকের দিকে চলে যেতাম, উদাসী বাঁশীর যে সুরে দুগ্ধফেননিভ গাভীরা পুচ্ছ উচ্ছে তুলে, শিং নাড়িয়ে, ঘাড় দুলিয়ে, দৌড়োদৌড়ি করত, রাখাল বন্ধুরা হৈ-চৈ করে খেলায় মেতে উঠত, রাই ও তার সখীরা মথুরার হাটে গজেন্দ্রগমনে যেতে যেতে থমকে দাঁড়াত, বিদ্যুৎকটাক্ষ হেনে দেহের কোষে কোষে যে শিহরণ জাগাত, আমার কাজ ভোলানো সেই বাঁশীর সুর কোথায় ভাসিয়ে এলাম? মথুরায় বৃন্দাবনের সব কথা ভাসিয়ে দিলাম কোন্ কূলে? নিদ্রাহারা রাতের এ গান বাঁধব আমি কেমন করে? এই হাহাকার, বিলাপ কৃষ্ণ কিছুতে কাটিয়ে উঠতে পারছে না। বংশীধারী কৃষ্ণকে বৃন্দাবনের মানুষ চেনে। বেণু ছাড়া কানু মনিহারা ফণীর মতই বৃন্দাবনে।

রাধার গায়ে কাঁটা দিল। ভেতরটা তার মোমের মত করুণায় দুঃখে গলে গলে পড়তে লাগল। অবাক হয়ে উদ্ধবের চোখের দিকে চেয়ে রইল। পুরুষের উপর নারীর চিরসংশয়ী মনটা এসব কথা মানতে চায় না, অথচ সন্দেহও ছাড়ে না। তবু মনে হল, উদ্ধব তার সমস্ত মনটাকে বদলে দিল। বলল : দুঃখ কি ওর একারই? দুঃখী নয় কে? তবে, একথাও ঠিক এ ধরনের দুঃখবোধ নিয়ে সংসারে সকলে জন্মায় না।

উদ্ধব উৎফুল্ল হয়ে বলল : তুমি ঠিক ধরেছ। বৃন্দাবনের জন্য কৃষ্ণের প্রাণ কাঁদে, বুক ফাটে। কাউকে সেকথা বলতে পারে না। কেবল আমি জানি, কি গভীর কান্না বয়ে বেড়াচ্ছে সে। বৃন্দাবনের গোপ-গোপিনীদের স্মৃতি সে ভুলতে পারে না। গোকুলে নন্দ-যশোদার স্নেহ-মমতা তাদের উৎকর্ণ, উৎকণ্ঠা, উদ্বেগ, ব্যাকুলতার কথা মনে হলে তাকে কেমন পাগল পাগল দেখায়। কৃষ্ণের মত এমন বিষণ্ণ মন নিয়ে যেন কেউ না জন্মায়। ওর জীবনটা বড় কষ্টের আর দুঃখের। কৃষ্ণের নিঃশব্দ কান্না আমি সইতে পারি না।

রাধার বুকের ভিতরটা কেমন করতে লাগল। কান্নাটা তার গলার কাছে কাঁটার মত বিঁধে রইল। ভেজা গলায় বলল : উদ্ধবদা, বন্ধুর দোষ ঢাকার জন্য কেন এত মিথ্যে কথার জাল বুনছ? বেশতো ভুলেই ছিলাম। নেভা প্রদীপ তুমি উস্কে দিলে কেন? এমন করে প্রাণে দাহ দিতেই কী আনন্দ তার? এজন্যই কী তোমাকে পাঠিয়েছে? নিষ্ঠুর, ভীষণ নিষ্ঠুর তোমার বন্ধু।

রাধার অভিযোগে উদ্ধব কেঁপে উঠল। বিব্রত গলায় ত্রাস্তস্বরে উচ্চারণ করল : না, না। ওকথা বলে তাকে অপরাধী কর না। তোমার সন্দেহ ভীষণ মিথ্যে। অভিমানে কৃষ্ণকে ছোট করে দিও না। সত্যি, বৃন্দাবনের জন্য তার চোখ সবসময় ছলছল করে।

রাধার বুকের ভেতর একটু অধীরতা জাগল। শরীরের প্রতি কোষে কোষে তার বিরহজনিত কষ্ট, দুঃখ যন্ত্রণা। দু'চোখ তার অভিমানে জ্বলে উঠল। বলল : ওর কোন মানে নেই। দুঃখবিলাস থাকে অনেক ভাগ্যবানের। আর জাগতিক দুঃখ, যন্ত্রণা, কষ্ট থাকে অনেক ভাগ্যহীন মানুষের। জাগতিক দুঃখ না মিটলে দুঃখবিলাসিতা নিয়ে তারা মাথা ঘামায় না। সে কথা তারা বিশ্বাসও করে না।

চমকানো বিস্ময়ে উদ্ধব উচ্চারণ করল : রাধা!

উদ্ধব-দা তুমিতো জান না, সে কি কষ্ট দিয়েছে আমায়? প্রতিটি দিন আমি কত কষ্ট ভোগ করি জান? কাল সারারাত তার সুরে তার মতই বাঁশী বাজালে তুমি, আর আমি ভাবলাম সে বুঝি এল আমার নীরব প্রার্থনায়। হৃদয় আমার প্রাপ্তির আনন্দে ময়ূরের মত নেচে ওঠল। বুকের ভেতর কত স্মৃতি এল আর গেল। কল্পনায় গোটা জীবনটাকে একবার নতুন করে দেখার আর বিচার করার সুযোগ হল। স্বপ্নের দরজা ভেঙে অতীত আমার বর্তমানের মধ্যে প্রবেশ করল। বর্তমানের সঙ্গে মিশে গেল। যে মানুষকে আমি কল্পনায় দেখছি সেই কায়াহীন, স্পর্শহীন মানুষ আমায় কিছুই দেয়নি জীবনে, শুধু কলংক দিয়েছে। আমাকে অপমান করার জন্য আমাকে নিয়ে শুধু খেলা করেছে।

ছিঃ রাই! তুমি ভীষণ উতল হয়ে পড়েছ, দুঃখে তুমি বিচলিত। রাগ, অভিমান তোমাকে মানায় না। লাভ-লোকসানের হিসবের খতিয়ান নয় এ। এমন অনেক ঘটনা ঘটে যার কোন সার্থকতা নেই বাস্তবে, অথচ সেই অবাস্তব অনর্থক ঘটনাগুলো দিয়েই মানুষের আর এক জগৎ সৃষ্টি হয়। তাই তো তুমি কাল সারারাত ধরে নিজের অন্তরের মধ্যে কৃষ্ণের বিশ্বরূপ দর্শন করেছ — সে কি কম পাওয়া?

প্রণয়ের অকালমৃত্যু কোন বিশেষ ঘটনা নয়, এরকম স্মৃতির পীড়া অহরহ হচ্ছে এবং হবে। কৃষ্ণ তোমার কাছে ফিরতে পারল না বলেই তুমি তার দুঃখ ও আর্তি টের পেলে না। বৃন্দাবনে সত্যিই তার আর ফেরার পথ নেই। এখন মথুরার রাজ্য পরিচালনার নেতৃত্ব কার্যত কৃষ্ণের উপর। সেখান থেকে এই মুহূর্তে তার সরে আসা খুব কঠিন। তার জীবনের মূল্যবোধ, মানদণ্ড রাতারাতি বদলে গেছে। এজন্য কৃষ্ণকে অপরাধী করা কিংবা দোষী সাব্যস্ত করা যায় না। দেশ শাসন করতে গেলে শাসক ও শাসিতের মধ্যে দূরত্ব প্রয়োজন। গণতন্ত্রে সকলে সমান হলেও রাজ্য চালনার পোষাক যাকে পরতে হয়, ইচ্ছে করলেও সে আর সাধারণ মানুষের মত জীবনযাপন করতে পারে না। চারদিকে তার বিরাট আড়ম্বর, চোখ ঝলসানো জৌলুষ, নানাবিধ বাধা নিষেধ। এই রাজকীয় ব্যাপারটা কৃষ্ণের সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন। বৃন্দাবনে ফিরে কৃষ্ণ যদি সহজ, সরল সাধারণ মানুষের জীবন গ্রহণ করতে না পারে, তাহলে তার বৃন্দাবনে ফিরে আসার সার্থকতা কোথায়? মথুরার কৃষ্ণের সঙ্গে বৃন্দাবনের কৃষ্ণের তাই তফাৎ আছে।

রাধার স্বরে অবাক বিস্ময়। কথা বলতে গিয়ে তার ভুরুর মধ্যস্থল কুঁচকে গেল। বলল : তফাৎ! তুমি বল, বৃন্দাবনে এসে ধেনু নিয়ে যদি গোঠে যেতে না পারল, রাখাল বালকদের সঙ্গে প্রাণ খুলে মিশতে না পারল, ধুলো, বালি মেখে জননী যশোদার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়তে না পারল, যমুনায় খেয়া নৌকোর হাল ধরতে না পারল, স্নানের ঘাটে তোমাকে ইশারায় বাঁশীর সুরে কাছে ডাকতে না পারল, রাধা রাধা করে অস্থির না করল, তাহলে বৃন্দাবনে থেকে সুখ কী তার? আর এসব না করতে পারলে তার বুকের ভেতরটা হু-হু করবে। বৃন্দাবনে যেভাবে তার জীবন কেটেছে সেভাবে বৃন্দাবনের সঙ্গে যদি মিশে যেতে না পারল তাহলে স্বপ্নভঙ্গ হবে বৃন্দাবনবাসীর। তাদের সে দুঃখ ও দুর্ভাগ্যকে সে চোখে দেখবে কেমন করে? কৃষ্ণ বলে, তার রাজ-পোশাকটাই নাকি কাল হয়েছে বৃন্দাবনে যাওয়ার। বিশ্বাস কর রাই, বৃন্দাবনকে ভোলেনি কৃষ্ণ। কেমন করে ভুলবে তোমাদের? তারা সবাই আছে স্মৃতির দর্পণে।

রাধা করুণ দৃষ্টিতে উদ্ধবের মুখের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকে। একটা বড় করে দীর্ঘশ্বাস পড়ে তার। নিজেকে সেই মুহূর্তে বড় অপরাধী মনে হয়। শরীরের গভীরে অবসাদ টের পাচ্ছিল। ভিতরে ভিতরে একটা অস্থিরতা তাকে ক্রমেই অধীর করে তুলল। আস্তে আস্তে বলল : কৃষ্ণ চিরকাল রহস্যময় মানুষ। কোনদিন তার মনের নাগাল পেলাম না। কি জানি, ওর মনে কি আছে? যে বৃন্দাবনের প্রতিটি ছেলেমেয়ে, আবালবৃদ্ধ, তরুণ-তরুণী অকাতরে তাকে জীবনযুদ্ধে জিতিয়ে দিল, তাদের একবার চোখের দেখা দিতেও তার সম্ভ্রমে লাগল। আশ্চর্য তার সম্ভ্রমবোধ। শুধু একটা পোষাকের অহংকারে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ এত বদলে যায়? তবে, সে মিথ্যে বলল কেন; মানুষের শুভ কামনা করে, মানুষের ভাল চায়। এই কি তার মানুষের প্রতি মানুষের প্রেম, প্রীতি সৌভ্রাত্রের নিদর্শন? হা ঈশ্বর, এতকাল পরে এত বড় একটা মিথ্যে কেন আমাকে শোনালে?

উদ্ধব বিব্রত বোধ করল। অসহায় চোখে তাকাল। শান্ত অথচ গম্ভীর গলায় বলল : আমি চাই, তুমি আরেকটু সহানুভূতির সঙ্গে বোঝার চেষ্টা কর তাকে। তার অবস্থায় পড়লে তবেই তাকে বোঝা যায়। বিচার করা সহজ হবে। তারপর মৃদু হেসে মুগ্ধ গলায় বলল :

কৃষ্ণপ্রেম কি চাইলে মেলে,
অনুরাগ না হলে হৃদকমলে
কৃষ্ণপ্রেম কি ন'কড়া ছ'কড়া
কুড়িয়ে নেবে যারা তারা?

রাধার মুখে কথা যোগাল না। কিন্তু ভীষণ একটা ব্যর্থতার দুঃখে আর যন্ত্রণায় বুক খামচে ধরল। কয়েক মুহূর্ত তার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে নিজের ভেতর ডুবে গিয়ে কথাগুলো স্বপ্নাচ্ছন্নের মত আস্তে আস্তে বলল : আমি যদি তার সঙ্গে দেখা করতে চাই; দেখা করবে?

উদ্ধব থমকে যায়। এক মুহূর্ত কি যেন ভাবল। তারপর শান্ত অথচ গম্ভীর গলায় বলল : মুক্ত প্রাণের দীপ জ্বালিয়ে তুমি পরাণ বঁধুকে প্রেমে বরণ করবে; এ কি প্রশ্ন করে জেনে নিতে হয়? হনুমান এ শরীর মাঝে যার অজয় অমর সত্তার সম্ভার — তার লাগি সারাদিন দীপ জ্বেলে বসে আছে কৃষ্ণ। তুমি সত্যি এই বৃন্দাবন ছেড়ে যাবে রাধা? বল তুমি যাবে?

রাধার বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠল। মনে হল, সে কৃষ্ণপ্রেমে অবিশ্বাস করেছে। তাই, এমন একটা কথা বলতে পারল। অনেকক্ষণ পর্যন্ত সে কথা বলতে পারল না। কথার গভীরতা তাকে স্পর্শ করে রইল। তাই কি ভেতরটা তার এত অধীর? না, অন্য কোন প্রত্যাশা আছে। কি প্রত্যাশা থাকতে পারে? নিজের মনের ভেতর কৃষ্ণকে অন্বেষণ করতে গিয়ে সমস্ত শরীরে একটা অদ্ভুত অনুভূতির ঢেউ খেলে গেল। এই অদ্ভুত অনুভূতিটা রাধাকে প্রশ্নে প্রশ্নে আকুল করল।

মনে হল একটা সূক্ষ্ম শরীর যেন তার স্থূল দেহ থেকে বেরিয়ে এসেছে। সে আর তার স্থূল শরীরের মধ্যে নেই। পঞ্চভূতে যেন বিলীন হয়ে গেছে। আয়ানের কথাগুলো তার কানে বাজল; ধ্যানেই মন সুস্থ আর বিকারহীন হয়। তুমি ধ্যান কর তাকে, শান্তি পাবে। এতেই রাধার মন কানায়

কানায় ভরে ওঠল। অনুভব করতে পারল তার সত্তা দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গেছে। বর্তমান থেকে অতীতের মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুতের তরঙ্গ বয়ে গেল। এই দুঃসহ মানসিক ক্লেশকে প্রকাশ করার তার ভাষা নেই। খানিকটা অসহায়ভাবে মাথা নাড়ল। কিছুক্ষণ পর, তার আবেগ গাঢ় স্বর স্খলিত ভেজা ও ভাঙা শোনাল। বলল : উদ্ধবদা তোমার কথা শুনে চমৎকৃত হলাম। এত গভীর করে কিছু ভাবতে শিখেনি। এখন মনে হচ্ছে কি আশ্চর্য, অলৌকিক তোমার কৃষ্ণ! নিয়তির মত এক অমোঘ সংকেতে রহস্যময়।

উদ্ধবের অধরে স্মিত হাসি! চোখের তারায় যেন অন্তর্ভেদী নিবিড়তা। স্বভাবসিদ্ধ সংযম রক্ষা করে রাধা একটু থেমে আহত ভাঙা গলায় বলল : কথায় সুধা ও বিষ দুই আছে। কথার ধারা কত বলবতী, কি তার বেগ, কত বড় ভয়ংকরকে সে আঘাত করতে পারে বজ্রের মত। আবার কথার অমৃত ধারায় বুক ভাসিয়ে নামে করুণা, মায়া ভালবাসা। এই অনুভূতিতে উপলব্ধিতে তুমি আমার বিরূপ অন্তরকে এমন করে রাঙিয়ে তুললে যে এই বৃন্দাবন ছেড়ে মথুরায় যেতে আর ইচ্ছে করে না! কি হবে মথুরায় গিয়ে? কি পাব সেখানে?

উদ্ধবের মুখে অনির্বচনীয় হাসির দীপ্তি। দু চোখের তারায় রহস্যের দ্যুতি উজ্জ্বল করল তার মুখমণ্ডল। মধুর কণ্ঠে বলল : রাধা, কৃষ্ণ যে তোমার অপেক্ষায় দীপ জ্বেলে দাঁড়িয়ে আছে মথুরার প্রাসাদে।

রাধার বুকের ভেতরটা থর থর করে কেঁপে গেল। অবাক মুগ্ধ মুহূর্তে রাধার মনে হল, প্রেমের আলো অন্তরের গভীরে তাকে জ্যোতির্ময় করে তুলল। সমস্ত অন্তরটা তার আলোয় ভরে গেল। মনের অলিতে গলিতে পর্যন্ত তার আলো জ্বলে ওঠল। তার নিজের যেটুকু ক্ষোভ, অভিমান অহংকার ছিল সব কেমন মিলিয়ে যেতে লাগল। একটু একটু করে ক্ষয়ে যেতে লাগল। সত্যের পূর্ণ মূর্তি দেখতে পেল। বাঁশীর সুর তার প্রাণে যে অনুভূতি জাগাল মনকে চঞ্চল অস্থির করল, অমরত্বের আস্বাদ দিল তাই তো অমর প্রেম। প্রেম, দেহহীন অস্তিত্ব নিয়ে তার মধ্যে বাস করছিল। তাই মনটা তারের বাজনার মত সুরে ভরা ছিল, একটু ছোঁয়া লাগাতেই ঝন্ ঝন্ করে বেজে উঠেছিল। দয়িতের অদর্শনে প্রেম মরে না। প্রেম বিদেহী। তার আত্মা অসীম সীমার মধ্যে তরঙ্গিত।

উদ্ধবের আশ্চর্য সুন্দর কথাগুলো রাধার কাছে জীবনের অর্থটা বদলে দিল। নিজেকে নিজে প্রবোধ দিল। এ জগতে ভালমন্দ, সত্যমিথ্যা কল্পনা ও ঘটনা এসবে কি এসে যায়? তার চেয়ে সত্য কিছু আছে! রাধার মনে বার বার প্রশ্ন জাগল কৃষ্ণ এমন করে মৃত্যুহীন প্রেমকে বিষাদময় করে। এ কোন কঠিন অগ্নিপরীক্ষায় ফেলল তাকে। শুধু চোখের দেখায় কি সব পাওয়া হত তার? তাদের পনেরো বছরে অদর্শন জনিত ব্যবধান কি শুধু কৃষ্ণের উপস্থিতি ঘুচিয়ে দিতে পারত? তাদের যুগলরূপ কি একটি মিলিত বৃত্তে পরিপূর্ণতা পেত? কখনই নয়। তার চেয়ে ধ্যানে শরীরের অত্মাকেই বেশী করে পাওয়া যায়। মোমবাতির মত একটু একটু করে রাধার শরীর গলছিল আর দেহমন জুড়ে এক আলোক শিখা ছড়িয়ে পড়ছিল, আর তার দহনে পুড়ে যাচ্ছিল প্রেমের গর্ব অহংকার অভিমান। রাধা নিজের মনের ভিতর নিঃশেষ হয়ে যেতে যেতে যেন বলছিল : সকল অহংকার হে আমার ডুবাও চোখের জলে। যুগান্তরের সংস্কার, বিশ্বাস, অভিমান, প্রেমের গর্ব দিয়ে গড়া এই অহংকার ইন্ধনের মত জ্বলছিল, আলোয় প্রজ্জ্বলিত হচ্ছিল। আর মনের গুহায় একটু একটু করে যেন আলোয় ভরে যাচ্ছিল। বুকের ভেতর কেমন একটা নুয়ে পড়া শ্রদ্ধার ভাব জাগল। চিত্তে পূজার পবিত্রতা। নিজেকে ধন্য আর পূর্ণ হয়ে উঠার জন্যই মনে মনে নিঃশব্দে উচ্চারণ করল : মাথা নত করে দাও হে গুণী, তোমার চরণ ধুলার তলে।

রাধার নীরবতা দেখে উদ্ধব ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করল : রাধা, কৃষ্ণের উপর তোমার অভিমান এখনও গেল না? তুমি নিরুত্তর কেন, সত্য করে বল?

রাধা অভিভূত হয়ে গেল। দু চোখে তার জল টলটল করতে লাগল। দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে গেল। স্খলিত ভেজা গলায় বলল : উদ্ধবদা, অমন করে তুমি আকুল কর না। এই বৃন্দাবনে কৃষ্ণের

স্মৃতি ছাড়া কি আছে আমার? যে দিকে তাকাই সব কানুময় দেখি। এই বৃন্দাবনের স্মৃতি ছেড়ে আমি কোথাও যেতে পারব না। আমার পা উঠছে না। মন মানছে না। বৃন্দাবন রাধার একান্ত নিজস্ব জগৎ। এর বাতাসে, গন্ধে, স্পর্শে, শব্দে আমি কৃষ্ণকে পাব। মথুরায় আমার বংশীধারী কৃষ্ণকে পাব কোথায়? সেখানে গেলে ফুরাইবে দিন, আলো হবে ক্ষীণ, গান সারা হবে, থেমে যাবে বীণ। মথুরা আমার মরীচিকা। জেনেশুনে কেন মরীচিকার পিছনে ছুটে যাই? মথুরায় যে রাজত্ব করছে সেই কৃষ্ণকে আমি চিনি না, সে অন্য কৃষ্ণ। রাধার কেউ নয়। রাধা তাকে চায় না। সেখানে গেলে রাধার চিত্তে কোন স্মৃতি আর জাগবে না। আশায় মায়ায় গড়া এই বৃন্দাবনই রাধার ভাল। তার আদিও থাকল অন্তও থাকল। আর থাকল অমরত্ব। বলতে বলতে রাধার গলা কাঁপছিল। চোখের কোণ দিয়ে তার জলের ধারা গড়িয়ে এল। আর একটা বুকভাঙা কষ্ট দীর্ঘনিঃশ্বাস হয়ে ঘরের মধ্যে পাক দিয়ে ঘুরছিল।

উদ্ধব চৌকাঠ ডিঙিয়ে ঘরের বাইরে বেরিয়ে শুনতে পেল রাধার কণ্ঠস্বর।

চোখের আলোয় দেখেছিলেম চোখের বাহিরে।
অন্তরে আজ দেখব, যখন আলোক নাহিরে।